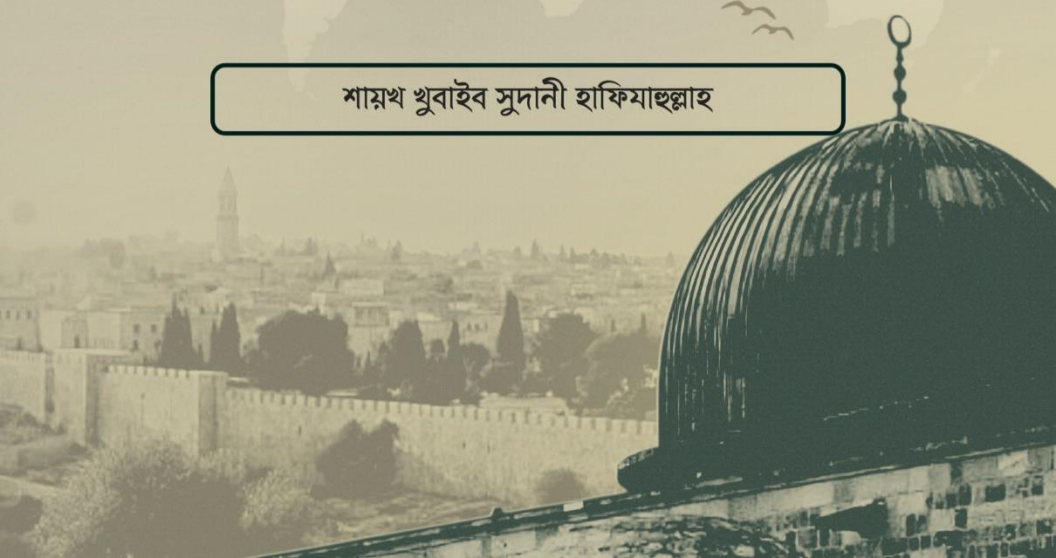
উম্মাহর তরে নিবেদিত আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলন
'তানজীম কায়েদাতুল জিহাদ'–এর নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংকলন

# শাযারাত মিন তারিখিল কায়েদাহ

## (আল-কায়েদার গৌরবময় অতীতের কিছু সোনালী অধ্যায়)



শায়খ খুবাইব সুদানী হাফিযাহুল্লাহ



উম্মাহর তরে নিবেদিত আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলন
‘তানজীম কায়েদাতুল জিহাদ’-এর নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংকলন

# শাযারাত
# মিন তারিখিল কায়েদাহ

**( আল-কায়েদার গৌরবময় অতীতের কিছু সোনালী অধ্যায় )**

শায়খ খুবাইব সুদানী হাফিযাহুল্লাহ

উম্মাহর তরে নিবেদিত আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলন
‘তানজীম কায়েদাতুল জিহাদ’-এর নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংকলন

# শাযারাত
# মিন তারিখিল কায়েদাহ

**( আল-কায়েদার গৌরবময় অতীতের কিছু সোনালী অধ্যায় )**

শায়খ ইবরাহীম আহমাদ মাহমুদ কুসী
(খুবাইব সুদানী) হাফিযাহুল্লাহ

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৪৪৪ হিজরী
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

# সূচিপত্র


**উৎসর্গ** ৮

**অভিমত** ১০

**দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা** ১৫

**প্রথম সংস্করণের ভূমিকা** ১৮

**আনন্দবার্তা** ২৩

**মুখবন্ধ** ২৬

**প্রথম অধ্যায়** **২৮**

অশ্বারোহণ করো হে আল্লাহর সৈনিক ২৮

আফগান জিহাদ: এক সুবর্ণ সুযোগ ৩১

বিস্মৃত ফরয ৩৩

আফগানের মাটিতে আরবের মুসাফির ৩৪

মাকতাবুল খিদমাত: সূচনার গল্প ৩৬

বাইতুল আনসার : আরবদের মেহমানখানা ৪১

আফগানিস্তান: মুসাফিরের নতুন ঠিকানা ৪৫

মা'সাদাতুল আনসার: মহিরুহের অঙ্কুরোদ্‌গম ৪৭

শাবান মাসের লড়াই: ১৪০৭ হিজরী, এপ্রিল ১৯৮৭ ৫২

রমযানের লড়াই: ১৪০৭ হিজরী, জুন ১৯৮৭ ৫৫

শায়খ উসামার জবানিতে রমযানের লড়াই ৫৭

জাজির যুদ্ধ: শিক্ষা ও উপদেশ ৬৫

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প: ৬৫

সত্য কথা যায় না বলা সব সময় ৬৭

শায়খ উসামার বক্তব্য ও কিছু কথা ৬৯

ট্রেইনিং ক্যাম্পের ধারাবাহিক সূচনা ৭১

**দ্বিতীয় অধ্যায়** **৭৯**

আল-কায়েদার পূর্বে আরব মুজাহিদগণ ৭৯

গ্লোবাল জিহাদ : শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি ৮১

আল-কায়েদার সূচনা ৮৫

বাইয়াত ও অঙ্গীকার ৮৬

আল-কায়েদার দর্শন ৮৭
আল-কায়েদার মানহাজ ৮৮
আল-কায়েদার পরিচালনা পর্ষদ ৯১
আবু ইবরাহীম আহমদ বিন নাসরুল্লাহ মিসরীর ঘটনা ৯২
আবু ইবরাহীম মিসরীর ঘটনা ও আমাদের শিক্ষা ৯৩
জালালাবাদের যুদ্ধ ১০০
শায়খ উসামা রহ.-এর জবানিতে জালালাবাদের যুদ্ধ ১০৩
খোস্ত ও গারদেয বিজয় ১০৯
শায়খ উসামা রহ.-এর ফিকির ও মানহাজ পরিবর্তনের সূচনা ও কারণ ১১০
আফগানিস্তানে জিহাদী আন্দোলনের অর্জন ১১৫
আফগান জিহাদে আমেরিকার সাহায্য ও কিছু সংশয় ১১৭
জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ১২১
বিজয় যেভাবে পরাজয়ে বদলে গেল ১২১
সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াই: জিহাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত: ১২৩
তারা কি একে অপরকে এ কাজের অসীয়ত করেছে? ১২৭
জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও কিছু শিক্ষা ১৩০
১. যুদ্ধের প্রকৃতি ১৩০
২. ডিভাইড অ্যান্ড রুল ১৩৩
সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং মুজাহিদদের অবস্থা ১৪১
সৌদির গৃহবন্দি জীবন এবং সফরে নিষেধাজ্ঞা: ১৯৮৯-১৯৯১ ১৪৩
পেশোয়ারে শায়খ উসামাকে হত্যাচেষ্টা ১৪৮

**তৃতীয় অধ্যায় ১৪৯**

ওমর আল-বশীরের ক্ষমতারোহণ: সুদানের হালহাকিকত ১৪৯
সুদান: মুজাহিদদের নতুন আশ্রয় ১৫১
সুদানে শায়খ উসামা রহ.-কে হত্যাচেষ্টা ১৫৬
সুদান থেকে আল-কায়েদার পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ ১৫৯
১. সোমালিয়ার কার্যক্রম ১৫৯
২. আলজেরিয়ার কার্যক্রম ১৭৯
৩. ফ্যাক্সযুদ্ধ ১৮৬
শায়খ উসামা রহ.-কে ফিরিয়ে নিতে সৌদি শাসকদের চেষ্টা ১৯০

৪. ইয়েমেনের কার্যক্রম ১৯১
৫. ইথিওপিয়ায় হোসনি মোবারককে হত্যাচেষ্টা: জুন ১৯৯৫ ১৯৮
৬. চেচনিয়ার কার্যক্রম ২০০
জামাল ফযলের ঘটনা ও শায়খ উসামা রহ.-এর সুদান ত্যাগ ২০৩
জামাল ফযলের আত্মসমর্পণ ও সুদানের সময়কাল: কিছু শিক্ষা, কিছু উপদেশ ২১০
প্রথম উদাহরণ: ২১১
দ্বিতীয় উদাহরণ: ২১২
দক্ষিণ সুদান ও শায়খ উসামার দৃষ্টিভঙ্গি: ২১৬

**চতুর্থ অধ্যায় ২১৮**

নিজ দোষে সর্বনাশ ২১৮
শায়খ ইউনুস খালেসের অতিথি ২১৯
'নাজমুল জিহাদ' কলোনি ২২১
তোরাবোরা পাহাড়ে শায়খ উসামা রহ. ২২৫
জাযীরাতুল আরবে আমেরিকার উপস্থিতি: লক্ষ্য ও বাস্তবতা ২২৬
ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট ২২৯
প্রথম বিবৃতি: জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও ২৩১
শায়খ উসামার দাওয়াতী তৎপরতা ২৩২
শায়খ উসামা রহ.-এর দাওয়াতের সারকথা ২৩৪
মিডিয়া ও সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ ২৩৬
শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু: আমেরিকার মুখোমুখি আফগান নেতৃবৃন্দ ২৪২
নেতৃবৃন্দের শাহাদাত এবং জালালাবাদে তালেবানের প্রবেশ ২৪৫
আমীরুল মুমিনীনের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ২৪৮
তালেবানের কাবুল জয় ২৫১
জালালাবাদ ছেড়ে কান্দাহারের পথে ২৫২
ফুরুয়ী ইখতিলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি: শায়খ উসামার নসীহত ও আমাদের শিক্ষা ২৫৪
কান্দাহার অভিমুখে ২৫৫
তালেবান প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৫৬
আমীরুল মুমিনীনের ঘটনা থেকে শিক্ষা ২৫৯
১. আল্লাহ তায়ালার ওপর আমীরুল মুমিনীনের তাওয়াক্কুল ২৫৯
২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ ২৬০

৩. সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিরোধ ২৬২
৪. আমীরুল মুমিনীনের আত্মবিশ্বাস ২৬২
৫. আল্লাহর সাহায্য ২৬৩
একনজরে তালেবান ২৬৫
আফগানিস্তানে তালেবানের কর্তৃত্ব: আমাদের শিক্ষা ২৭২
কান্দাহার: নতুন ঠিকানায় ২৭৪
নতুন ভাইদের আগমন ২৭৬
তালেবান ও আল-কায়েদা: রণাঙ্গণের অংশীদারি ২৭৭
কাবুলের ডিফেন্স লাইন (প্রতিরক্ষাব্যূহ) তৈরির গল্প ২৭৮
তালেবানের অভিযান ২৮৪
সিআইএ'র তদবীর: টার্গেট শায়খ উসামা রহ. ২৮৫
'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ (গ্লোবাল ইসলামিক ফ্রন্ট) গঠন ২৮৬
জাবহার বিবৃতি ও আল-জামায়াতুল ইসলামিয়া মিশরের অবস্থান ২৯২
অসম যুদ্ধের সূচনা ২৯৬
নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশন ২৯৭
শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু: সৌদির মুখোমুখি আমীরুল মুমিনীন ৩১০
শায়খ উসামা ও আমীরুল মুমিনীনের মতভিন্নতা ৩১৬
'ইত্তিহাদে উলামায়ে আফগানিস্তান'-এর প্রধান মৌলবী আব্দুল্লাহ যাকিরীর ফতওয়া: ৩২০
আমীরুল মুমিনীনের জবাব ৩২২
শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু ও আমাদের শিক্ষা ৩২৪
মার্কিন ড্রোনের আনাগোনা ৩২৭
মার্কিন ডেসট্রয়ার ইউএসএস কোল-এর ওপর হামলা ৩২৯
ওয়েপন অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন বা WMD (গণবিধ্বংসী অস্ত্র) ৩৩৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন ৩৩৯
শত্রুর প্রতি সতর্কবার্তা ৩৪০
আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের গল্প ৩৪২
আস-সাহাব মিডিয়া ৩৪৬
বামিয়ান প্রদেশের বুদ্ধমূর্তি অপসারণ: মার্চ ২০০১ ৩৪৮
আল-কায়েদা ও জামাআতুল জিহাদ (EIJ): একদেহ একপ্রাণ ৩৫২
'এটাই আমাদের বিজয়ের শতাব্দী' ৩৫৫
ঐক্য নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি: শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর মন্তব্য ৩৫৬

ড. আব্দুল্লাহ নাফীসীর কান্দাহার সফর ৩৫৭
আহমদ শাহ মাসউদকে হত্যা ৩৬০
বৈশ্বিক জিহাদী জমায়েত ও উম্মাহর বৈশ্বিক সংকট: সফলতা ও ব্যর্থতার সমীকরণ ৩৬৫

**পঞ্চম অধ্যায় ৩৬৯**
ঝড়ের পূর্বাভাস ৩৬৯
আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ৩৭৩
কেন তারা আমাদের ঘৃণা করে? ৩৭৬
৯/১১ হামলা : কুমিরের সাথে কথা হবে অস্ত্রের ভাষায় ৩৭৯
৯/১১ হামলা : পরিকল্পনার ক্রমবিকাশ ৩৮১
আল্লাহ যখন কিছু চান, তিনিই তার পথ তৈরি করে দেন ৩৮৫
ফ্লাইট অনুসারে দায়িত্ব বণ্টন ও ৯/১১-এর বীরেরা ৩৯৩
দুটি লাঠি, একটি হাইফেন ও কেক থেকে ঝুলন্ত একটি লাঠি ৩৯৭
জিরো আওয়ার ৩৯৯
৯/১১ হামলা ও মার্কিন সংস্থাসমূহের তদন্ত ৪১৬
১১ই সেপ্টেম্বরের বার্তা ৪১৮
আমেরিকার ওপর ৯/১১-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ৪২০
মুসলিম উম্মাহর ওপর ৯/১১-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ৪২২
৯/১১ হামলা: সংশয় নিরসন ৪২৩
অভিযোগ ও জবাব ৪২৫
এ যুদ্ধে সফল কে? ৪৩৫
তাওহীদে আমালীর শিক্ষা ৪৫১
৯/১১-এর পর আমীরুল মুমিনীনের প্রথম ভাষণ ৪৫২
আমীরুল মুমিনীনের দ্বিতীয় ভাষণ ৪৫৭
শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনীর দৃষ্টিতে ৯/১১-এর শিক্ষা ৪৭১
তোরাবোরার যুদ্ধ ৪৭৩
বীরপুরুষের তীর্থভূমি ৪৮৫
কিল্লা-ই-জঙ্গির যুদ্ধ ৪৮৭
৯/১১-পরবর্তী অপারেশনসমূহ ৫০২
মার্কিন বিমানে বিস্ফোরক জুতা অপারেশন ৫০৪
মিশন AWACS এয়ারক্রাফট ৫০৬

অপারেশন জেরবা: তিউনিসিয়া, ১১ই এপ্রিল ২০০২ ৫০৭
অপারেশন এমভি লিমবার্গ: মুকাল্লা, ইয়েমেন, ৬ই অক্টোবর ২০০২ ৫০৮
কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে মার্কিন মেরিন কর্পসের ওপর হামলা: ৮ই অক্টোবর, ২০০২ ৫১৩
ফাইলাকা অপারেশনের তাৎপর্য ৫১৪
ইন্দোনেশিয়ার বালিতে নাইটক্লাবে হামলা : ১২ই অক্টোবর, ২০০২ ৫১৫
পূর্ব আফ্রিকায় ইহুদীদের ওপর হামলা : ২৮শে নভেম্বর ২০০২ ৫১৯
আল-কায়েদার অর্জন ৫২৫
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই ৫২৭
বিকৃত ইতিহাস ও মেকি বাস্তবতা ৫৪১
শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরীর প্রতি শায়খ আহমাদ হাসান আবুল খাইর মিসরীর চিঠি ৫৪২
আল-কায়দার বার্তা ৫৬৮
আমরা কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি? ৫৭০
বিজয়ের পথ কোনটি? ৫৮২
যে পথের বিকল্প নেই ৫৯২
মোকাবিলার সঠিক পদ্ধতি ৫৯৫
বিচ্ছিন্নতার আহ্বান ৬০৪
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শেষের শুরু ৬১৩
দোহা চুক্তি: পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় ৬১৭
গুণীজনের দৃষ্টিতে দোহা চুক্তি : শিক্ষা নাও, হে আরবজাতি ৬২২
তবু কি এটা পাগলামি? ৬২৫
মা'রাকাতুল আহরার ৬৩০
তালেবান আন্দোলন: জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাক ৬৩৭
মিসকুল খিতাম ৬৫৬
আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ. স্মরণে ৬৫৬
শায়খ উসামা রহ.-এর শাহাদাত: যে শোক যায় না ভোলা ৬৭৩
শায়খ উসামা রহ.: যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার প্রতিচ্ছবি ৬৮৪
মাশায়েখের স্মৃতিচারণ ৬৯৫
শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী রহ. ৬৯৫
শায়খ (কমান্ডার) আবু হাফস মিসরী রহ. ৭০১
শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী (আব্দুল্লাহ আহমাদ আব্দুল্লাহ) রহ. ৭০৭

# বানান-সম্পর্কিত জরুরি জ্ঞাতব্য

১. বইয়ে তানজীমের বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২. আরবী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আরবী উচ্চারণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে অনেক জায়গায় একই শব্দের ভিন্ন বানান রাখা হয়েছে। যেমন: মিশর ও মিসরী। যখন আরবীর প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে, তখন 'মিসরী' লেখা হয়েছে। আরবী উচ্চারণের কাছাকাছি থাকার জন্য। আর যখন সরাসরি বাংলা শব্দ হিসেবে লেখা হয়েছে, তখন 'মিশর' লেখা হয়েছে।

৩. কিছু ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থতা নিরসনের জন্য আরবী প্রতিবর্ণীকরণ নিয়মের বিপরীতে গিয়ে ভিন্ন বানান লেখা হয়েছে। যেমন: শরয়ী, দাঈ। নিয়ম অনুযায়ী 'দায়ী' (যিনি দাওয়াত দেন) হওয়ার কথা থাকলেও বাংলা 'দায়ী' (কৈফিয়ত দিতে বাধ্য) শব্দ থেকে স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য 'দাঈ' লেখা হয়েছে।

৪. আরবী নামের শেষে যে নিসবত বা আঞ্চলিক পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ থাকে, সে ক্ষেত্রে 'আল' বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন: আবু হাফস আল-মিসরী না লিখে আবু হাফস মিসরী লেখা হয়েছে। তবে যে-সব নাম 'আল'-সহ প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত, সেগুলো সেভাবেই রাখা হয়েছে। যেমন: আয-যাওয়াহিরী।

৫. বহুল প্রচলিত শব্দগুলো যেভাবে প্রচলিত, সেভাবেই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. তানজীমের বানানরীতি অনুযায়ী আরবী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে মাদ বা টানের প্রতি খেয়াল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ ধরনের স্থানে 'ঈ-কার' ও 'ঊ-কার' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: দীন, ঈমান, শরীয়ত, সূরা ইত্যাদি।

# উৎসর্গ

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর প্রতি, যিনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন; যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের হারানো ইজ্জত-সম্মান পুনর্জীবিত করেছেন; যিনি পথভ্রষ্ট নেতা, আপসকামি দাঈ ও ফকীহদের শিখিয়েছেন—সম্মান ও মর্যাদার পথে কীভাবে অবিচল থাকতে হয়; কুরবানী-আত্মত্যাগ ও ওয়ালা বারা'র ময়দানে যিনি অনন্য নজির স্থাপন করেছেন; কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী ও তাদের অহংকারী নেতাদের প্রতি যিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন; তাদের দেখিয়েছেন প্রকৃত বীর কেমন হয়; যিনি যুগের হুবাল আমেরিকার হুমকি-ধমকির পরোয়া না করে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন।

***

সকল মুজাহিদ আমীর ও নেতৃবৃন্দের প্রতি। বিশেষত ইমামুল জিহাদ মুজাদ্দিদে যামান শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর প্রতি, যিনি এ যুদ্ধের সূচনা করেছেন, অহংকারী আমেরিকাকে মাথানত করতে বাধ্য করেছেন, তাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে তাদেরই ভূখণ্ডে আঘাত হেনেছেন, পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন আর চিরকালের জন্য তাদের পরাজয় ও অপমানের ইতিহাস রচনা করেছেন।[১] যিনি দীন ও উম্মতের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন।

***

উম্মতের মুজাহিদ অগ্রসেনানীদের প্রতি, যারা ইট-পাথরের ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে মাটির বিছানাকে আপন করে নিয়েছেন, প্রতিকূল সময়ে দীনের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন, ইসলামী ভূখণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে ক্রুসেডার ও তাদের দোসরদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন।

***

[১] এই অংশটি শায়খ আবু মুনযির শানকীতী রহ.-এর লেখা শোকবার্তা থেকে নেওয়া হয়েছে, যা তিনি শায়খ উসামা রহ.-এর স্মরণে লিখেছিলেন।

আল্লাহর দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর কুফরের দম্ভকে চূর্ণ করার জন্য যারাই লড়াই করছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার এ বইটি উৎসর্গ করছি।

***

আল্লাহর নগণ্য বান্দা
খুবাইব সুদানী
(ইবরাহীম আহমাদ মাহমুদ কুসী)
বুধবার
১০ই মুহাররম, ১৪৪৩ হিজরী
১৮ই আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

# অভিমত

## শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফিযাহুল্লাহ

ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত একটি বিষয়। এর মাধ্যমে কাগজের পাতায় অতীতের চিত্র যেমন খোদাই করে রাখা হয়, তেমনই আগামী প্রজন্ম ও গবেষকরাও এই ইতিহাস থেকে নতুন জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিপক্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রণাঙ্গণে মোকাবিলার সাথে সাথে শত্রুর এই আক্রমণ প্রতিহত করাও প্রতিটি জাতির সামনেই একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর সেই ইতিহাস যদি হয় আকীদা ও বিশ্বাসের ইতিহাস কিংবা কোনো প্রজন্মের অস্তিত্বের লড়াই বা কোনো জাতির উত্থানের ইতিহাস, তাহলে সেই ইতিহাস সংরক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। 'ইতিহাস তো অতীতের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি আর তাদের ঈমান ও আকীদার সমষ্টিমাত্র'—এ কথা বলে ইতিহাসকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ সত্যের অস্তিত্বের ইতিহাসকেই অস্বীকার করা। কারণ, সত্যের ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনই সত্যকে ধারণকারী ব্যক্তিদের ইতিহাসও সেই সত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। ফিরআউনের বংশের সেই ঈমানদার ব্যক্তি যখন ঘোষণা দিয়েছিল—'তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের সঠিক পথ দেখাব', তখন সে-ই ছিল সত্যের প্রতিনিধি, তাঁর ইতিহাসই ছিল সত্যের ইতিহাস। আমাদের সামসময়িক ইতিহাসও তেমনই মহান এক ইতিহাসের সমষ্টি। তবে আমাদের ইতিহাস এখনো অতীত হয়ে যায়নি, মুমিনরা প্রতিনিয়ত এই ইতিহাস তৈরি করে যাচ্ছে, তাঁদের যাপিত জীবনের ঘটনাবলি থেকেই এই ইতিহাসের জন্ম হচ্ছে। তাই, ইতিহাস তৈরি করা যেমন তাদের কর্তব্য, সেই সাথে এই ইতিহাস সংরক্ষণের চেষ্টা করাও তাঁদের দায়িত্ব। যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ইতিহাসকে ঈমান ও জাহিলিয়াত এবং এই দুই আদর্শের অনুসারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসেবে মনে রাখে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কারো যদি এমন কোনো মুজাহিদের গল্প জানা থাকে, যে জবানের মাধ্যমে, অস্ত্রের মাধ্যমে অথবা বাতিলের সামনে অনঢ় অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে ঈমানজাগানিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তার উচিত এই ইতিহাস সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া, কারণ স্বজাতির বাহাদুর ও মর্দে মুমিনদের ইতিহাস জানা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার। আমাদের এই ইতিহাস সাধারণ কোনো ইতিহাস নয়, এই ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে হক ও সত্যের মর্ম ও সুবাস। ইতিহাসের এই আমানত আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঠিক সেভাবেই পৌঁছে দেব, যেভাবে আমরা একে বুঝি এবং ধারণ করি। জাহিলিয়াতের মানদণ্ডে আমরা এই ইতিহাসকে মূল্যায়ন করব না। জাহিলিয়াত ও ঈমানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু আমাদের কাছে শাহাদাত, কারাগারের বন্দিজীবন আমাদের কাছে খালওয়াত (আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ) আর ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য ভূমিতে চলে যাওয়া আমাদের কাছে হিজরত। কারণ, সবকিছুকে আমরা কুরআন ও তার নুর দিয়ে দেখি, জাহিলিয়াতের চোখে দেখি না। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের এই ইতিহাস পৌঁছে দিতে হবে, যেন তারা জানতে পারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক কিছুই থেকে যায়। যেন তারা জানতে পারে, তাদের পূর্বসূরীদের অন্তরে সত্য ও ঈমানের যে আলো প্রজ্বলিত হয়েছিল, জাহিলিয়াত শত চেষ্টা করেও সেই আলোকে নিভিয়ে দিতে পারেনি; তাদের অন্তরে হকের যে কালিমা খোদিত ছিল, সে কালিমার একটি হরফও জাহিলিয়াত মুছে দিতে পারেনি। এই ইতিহাস আমাদের সন্তানদের জানাতে হবে, যেন তারা বুঝতে পারে, তাদের পুর্বপুরুষরা আমানতের খিয়ানত করেনি; বরং নিজেদের জান-মাল আর রক্ত-ঘাম দিয়ে তাঁরা এই আমানত রক্ষা করেছেন, পূর্বপুরুষদের জানের কুরবানী আর জিহাদের বদৌলতেই তারা এই দীনকে অবিকৃতরূপে পেয়েছে। এই ইতিহাস আমাদের বর্ণনা করতে হবে, যেন অন্যান্য জাতির সামনে আমরা গর্ব করতে পারি এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি এ জন্য যে, এই উম্মতকে তিনি বিশেষভাবে বাছাই করেছেন। এই জাতি তো এমন এক জাতি, যারা আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে রক্ত ও ঘামজড়ানো শরীর নিয়েও উন্নত আখলাকের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। আমাদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে, কেননা এই ইতিহাস সেই হকপন্থি দলের ইতিহাস, বিরোধী কিংবা অসহযোগী কেউই যাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই ইতিহাস আমাদের বর্ণনা করতে হবে, যেন আমাদের সন্তানরা দেখতে পারে, এই দুর্বল মুহাজির আর গোত্রহীন মানুষগুলোকে আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করেছেন, কীভাবে তাদের দিয়ে বিজয়গাঁথা রচনা করিয়েছেন। এভাবেই বদর, উহুদ আর খন্দক বারবার ফিরে আসবে আর ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এভাবেই নতুন বিজয়ের সূচনা হবে। শায়খ খুবাইব সুদানীর লেখা এই বইটি উম্মতের ইতিহাসে এক অমূল্য সংযোজন। উম্মতের পরীক্ষা, সবর ও কুরবানীর গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায় এতে জায়গা পেয়েছে। শায়খকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

লিখেছেন

শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফিযাহুল্লাহ

# শায়খ আবু মুহাম্মাদ মাকদিসী (আসেম আল-বারকাবী) হাফি.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الهمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وقدوة المجاهدين، أما بعد**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

**وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ**

'মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আমার সাথে যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতে চায় না, কিন্তু তাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন আমি পাই না; সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তারা যদি না থাকত, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হওয়া কোনো বাহিনী থেকেই আমি দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হব, আবার আমাকে জীবিত করা হবে; আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে; আবার শহীদ হব, আবার জীবিত করা হবে; তারপর আবারও শহীদ হব।' [সহীহ বুখারী : ২৭৯৭]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এই উম্মতের গৌরব। আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁরাই প্রকৃত সত্যবাদী, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীনের সাহায্যার্থে ধন-সম্পদ ও জীবন কুরবান করে সততার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ**

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'

[সূরা তাওবা (৯) : ১১৯]

ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিজয়ের পূর্বে ইসলামের অসহায়ত্ব ও অপরিচিতির এই যুগে উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল তাঁরাই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا**

'তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (পরবর্তীদের) সমান নয়। মর্যাদায় তারা সে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পর ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে।' [সূরা হাদীদ (৫৭) : ১০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর অবিচল থাকবে। যারা তাদের পরিত্যাগ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) পর্যন্ত তারা এভাবেই (বিজয়ী) থাকবে। [সহীহ মুসলিম : ৪৭৯৭]

আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই শায়খ (খুবাইব) ইবরাহীম আহমাদ মাহমুদ কুসী রচিত 'শাযারাত মিন তারিখিল কায়েদাহ' বইটি আমি পড়েছি। শায়খ যে-সব স্থানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার অধিকাংশের সাথেই আমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে । পড়তে পড়তে হারিয়ে গিয়েছি অতীতের সেই স্মৃতির মাঝে। যে-সব প্রিয় ভাই ও মুজাহিদদের সাথে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল, পাহাড়ি গুহা, সামরিক ঘাঁটি, রণাঙ্গন ও ট্রেইনিং ক্যাম্পে একসাথে দিন কাটিয়েছি; পেশোয়ারের মেহমানখানা ও মারকাযগুলোতে যে-সব মুখলিস দাঈ ও সত্যান্বেষী তালিবুল ইলমদের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছি—তাদের স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে। তাদের অধিকাংশই শাহাদাতবরণ করেছেন আর অল্প সংখ্যক এখনও শাহাদাতের অপেক্ষায় রয়েছেন ।

বইটি পড়ার সময় যখন কোনো পরিচিত মুজাহিদ, প্রশিক্ষক বা নেতৃবৃন্দের নাম এসেছে, স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠেছে তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের দৃশ্যগুলো। ট্রেইনিং ক্যাম্পে, যুদ্ধফ্রন্টে ও কতকের সাথে অভিযানে অংশগ্রহণের সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়েছে। আল-ফারুক, সদা (صدى), জাওর, জিহাদওয়াল—এই ক্যাম্পগুলোতেই একসময় আমি ঘুরেছি, প্রশিক্ষণ নিয়েছি, দরস দিয়েছি। বইয়ের পাতায় যখনই পরিচিত কোনো ক্যাম্পের নাম এসেছে, তাতে কাটানো সুন্দর দিনগুলোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এ স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়। পড়তে পড়তে মনে পড়েছে বরফঢাকা মা'সাদাহ, আরীন ও জাজি'র কথা। আফগানিস্তানের কাঠফাটা রোদ, নদী-নালা, পাহাড় ও বনভূমির কথা। কত ভাইকে আমরা ওই পাহাড়গুলোতে দাফন করেছি! শুভ্র বরফে ঢেকে গিয়েছে তাদের কবর। গুরাবার জীবন কাটিয়ে গুরাবা হয়েই চলে গিয়েছেন তাঁরা।

আরও কতশত স্মৃতি ভেসে উঠেছে হৃদয়ের পাতায়। বইটি পড়ে আপ্লুত হয়েছি, স্মৃতিকাতর হয়েছি। সাথে দুঃখও পেয়েছি। আমাদের এই ইতিহাস শুধু লিখে রাখার জন্য নয়। এর চর্চা হওয়া উচিত। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। অতীতের ভুলগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বাঁচা উচিত। শুধু পড়েই রেখে দেওয়ার মতো নয় এই ইতিহাস। জানা ও পড়ার সাথে যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া হয়, ভালো-খারাপ দিকগুলো আলাদা করা হয়, অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলোর পর্যালোচনা করে তা থেকে করণীয় নির্ধারণ করা হয়,

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও উলামাদের পদক্ষেপ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করা হয়, তখনই কেবল ইতিহাস পড়া সার্থক হয়।

জিহাদী অভিজ্ঞতার সারনির্যাস নিয়ে অনেক আগে আমিও একটি বই লিখেছিলাম।[২] এ ধরনের অভিজ্ঞতা মুজাহিদদের চিন্তার দিগন্তকে বিস্তৃত করে, নিজে উপকৃত হওয়া ও অন্যকে উপকৃত করার সুযোগ তৈরি করে। ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে বেঁচে দ্রুত সফলতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে আরও বিস্তৃত করে তোলে।

আমার বইয়ে আলোচিত অনেক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ বইয়ের সাথে মিলে যেতে পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, আমাদের উৎস এক ও অভিন্ন। আর যদি কিছু বিষয়ে সামান্য মতভিন্নতা দেখা দেয়, তবু অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটাই তো ইজতিহাদ ও গবেষণার প্রকৃতি। অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা দাঈ ও মুজাহিদদের জন্য উপকারী বিষয়। যারা পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়, তারাই টিকে যায়। তারাই অগ্রগামী হয়, ইতিহাস তাদেরই মনে রাখে। কিচ্ছা-কাহিনী ও প্রকৃত ইতিহাসের মাঝে এটাই আসল পার্থক্য।

প্রিয় শায়খ খুবাইব হাফি. যে বইটি লিখেছেন, এতে ইতিহাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনাও যুক্ত করা হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বই দ্বারা সকলকে উপকৃত করুন, একে জিহাদী কাজের পাথেয় ও মুজাহিদদের পথনির্দেশক বানিয়ে দিন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা প্রিয় শায়খকে উত্তম বিনিময় দান করুন, বইটিকে কবুল করে নিন এবং মিযানের পাল্লায় নেকী হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

**وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.**

লিখেছেন

আবু মুহাম্মাদ মাকদিসী

[২] এখানে وقفات مع ثمرات الجهاد بين الجهل في الشرع والجهل في الو اقع বইটির কথা বলা হচ্ছে।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

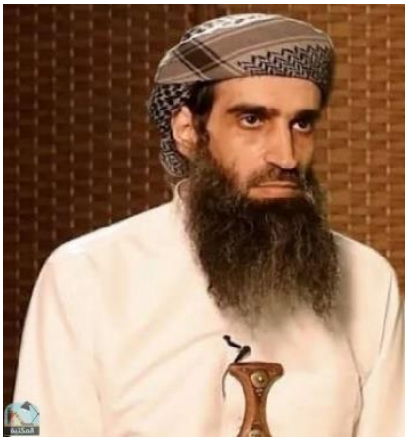
কাযী আব্দুর রহীম বিন আলী বাইসানী রহ. চমৎকার একটি কথা বলেছেন, 'আমি দেখেছি, মানুষ আজ একটি বই লিখলে পরদিনই বলে, এই স্থানে একটু পরিবর্তন করলে ভালো হতো, এটা যুক্ত করলে সুন্দর হতো, এ কথাটি আগে আনলে বা বাদ দিলে চমৎকার হতো। এটি আমাদের জন্য সুন্দর একটি শিক্ষা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, মানবরচিত কোনোকিছুই কখনো ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না।'

ইমাম হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী রহ. 'আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'কুরআন ছাড়া অন্য কোনো বই শতভাগ নির্ভুল হওয়া অসম্ভব, কারণ তা আল্লাহর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। তাই, যারা মানুষের অনেক সঠিক কাজের মধ্যে সামান্য ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, তারাই ন্যায়পরায়ণ।'

আলহামদুলিল্লাহ, 'শাযারাত মিন তারিখিল কায়েদাহ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংস্করণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই যুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রায় ৬০ পৃষ্ঠার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঝে মধ্যে অনেক ভাইয়ের বক্তব্যও যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে ছুটে যাওয়া কিছু বিষয় এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিভিন্ন স্থানে রদবদল করে পুরো বইকেই নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কিছু স্থানে প্রয়োজনমতো সংশোধনও করা হয়েছে।

আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সে মহান ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেই নয়, যিনি আমাকে এই বই লেখার জন্য পদে পদে উৎসাহ দিয়েছেন, উদ্‌বুদ্ধ করেছেন এবং নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন। যখন প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন তিনি দূরে অবস্থান করছিলেন। এ কারণে তার ইচ্ছা ছিল, বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণকে আরও সুন্দর ও চমৎকারভাবে আল-মালাহিম মিডিয়া থেকে প্রকাশ করা। সে লক্ষ্যে তিনি কাজও শুরু করেছিলেন। কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে, তখনই আমেরিকান ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তার প্রস্তুত করা রূপরেখাতেই বইটি প্রকাশ করে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি হলেন জাযীরাতুল আরবের তানজীম আল-কায়েদার মিডিয়া শাখার দায়িত্বশীল শায়খ আবু আব্দুল আযীয হামাদ বিন হামুদ তামীমী আল-আদনানী রহ.। তিনি ছিলেন বুলন্দ হিম্মত, সুন্দর চরিত্র, বিনয় ও উত্তম শিষ্টাচারের অধিকারী; আলেম, ইবাদতগুজার, দুনিয়াত্যাগী ও মুত্তাকী। তাঁদের ব্যাপারে আমাদের ধারণা এমনই, তবে আল্লাহই তাঁর ব্যাপারে সম্যক অবগত। আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করেন। আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করেন, আমীন।



শায়খ আবু আব্দুল আযীয আদনানী
(হামাদ হামুদ তামীমী) রহ.

আমার ইচ্ছা ছিল, হাকীমুল উম্মত শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী (জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই থাকুন, আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন)-এর নির্দেশনা অনুসারে বইটি শায়খদের কাছে পেশ করে তাদের মূল্যবান মতামত নিয়ে এরপর প্রকাশ করব। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আরও অনেক ইচ্ছার মতো এই ইচ্ছাটিও অপূর্ণই রয়ে গেল। পাঁচ বছর আগে বইয়ের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি দেখে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা আরেকজন শায়খ তাঁদের অভিমত জানিয়েছিলেন। অবশেষে সে কথাগুলোকে পুঁজি করেই বইয়ের উভয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী লিখেছিলেন—

> ‘প্রিয় ভাই আমার, আল্লাহ আপনার হাতে ও কলমে বরকত দিন। আপনার কলমের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ওঠা অতীতের অজস্র সুন্দর স্মৃতি আর আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া শহীদানের কথা মনে করে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। তারা ছিলেনই এমন মানুষ, যাদের বিয়োগ-বেদনায় অশ্রুবিসর্জন করা উচিত। এ বই আমাকে অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছে, যেখানে বাস্তবেই একসময় ছিলাম। আপনার এই লেখা আমার সুপ্ত স্মৃতিগুলোকে জাগিয়ে দিয়েছে, ভাবাবেগকে নাড়া দিয়েছে। আমি গর্বিত, আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পেরে। আমি গর্বিত, মৌলবী ইউনুস খালিস, মৌলবী জালালুদ্দীন হক্কানী, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ আর মোল্লা উমরের পতাকাতলে জিহাদ করতে পেরে। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ও তার পূণ্যবান সাথিদের মতো ক্ষণজন্মা বিরল ব্যক্তিদের সাথে ভাই-ভাই হয়ে একসাথে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। আল্লাহ তাঁদের সবার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। সৌভাগ্যবান তারা, যারা তাঁদের সাথে থেকেছেন, মিলেমিশে কাজ করেছেন,

তাঁদের সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আপনার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে আপনার আমলনামায় আজর ও সওয়াব দান করুন। (শায়খ) খুবাইব সুদানী ও তার সঙ্গীদের যাপিত জীবনের স্মৃতিচারণ হিসেবে লেখা আপনার এই রচনাটি আল-কায়েদার ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে চিরকাল রয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল করুন।'

এটি এই দুর্বল বান্দার সামান্য প্রচেষ্টামাত্র। আমি নিজেকে ত্রুটিমুক্ত দাবি করছি না। এতে থাকা সকল ভুলের দায় আমার। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আমার থেকে ভালো যা কিছু হয়েছে, তা যেন কবুল করেন। যত ভুল হয়েছে তা যেন ক্ষমা করেন। তিনিই সর্বোত্তম, আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থান। তিনিই সবচেয়ে উদার ও দয়াশীল। আল্লাহ তাআলার কাছেই আমি সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁর ওপর ভরসা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যার অনুগ্রহেই সমস্ত সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহর ক্ষমার মুখাপেক্ষী
খুবাইব সুদানী
(ইবরাহীম আহমাদ মাহমুদ কুসী)
সোমবার, ১লা যিলহজ, ১৪৪৪ হিজরী

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

**الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، ودعا بدعوته ، ونصر سنته، واهتدى بهداه إلى يوم الدين**

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যতগুলো সশস্ত্র জিহাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, এর অধিকাংশের ইতিহাসই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে শায়খ আবু মুসআব সূরী ফা.আ. লিখেছেন—

> ‘জিহাদী আন্দোলনের ইতিহাস ও শিক্ষা আজ বিলুপ্তপ্রায়। শুধু তাই নয়, জিহাদের একদম সাধারণ ইতিহাসও আমরা ভুলতে বসেছি। এর কারণ একটিই, যারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন অথবা আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভ করেছেন, তারা কেউই এই আন্দোলনের ইতিহাস সংরক্ষণ করেননি। ছোট-বড় অসংখ্য জিহাদী আন্দোলন ঘটে গেলেও আমার জানামতে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের কেউই এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছুই লিখে যাননি। কেউ লিখে থাকলেও তা প্রচার হয়নি। জিহাদী আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত দীর্ঘ এই সময়ে আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম অনেক লড়াই করেছেন। সংরক্ষণ না করার ফলে এ লড়াইয়ের ইতিহাস, এর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, ঘটনাবলি ও তার পর্যালোচনা থেকে এই উম্মত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বঞ্চিত হয়েছে। তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে হাতে কলম তুলে নিয়েছে শত্রুশিবিরের কিছু মানুষ। সাংবাদিকের বেশধারী চেতনা-ব্যবসায়ী আর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে কাল্পনিক ইসলামী জাগরণের ফেরি করে বেড়ানো দশাসই ভুরির মালিকেরা লিখতে শুরু করেছে জিহাদী আন্দোলনের মিথ্যা ইতিহাস।’[৩]

শায়খ আবু মুসআব সূরীর এই মূল্যবান কথার ভিত্তিতে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে যখন আমি চেচনিয়া থেকে ফিরে আসি, জালালাবাদের ‘নাজমুল জিহাদ’ কলোনিতে শায়খ আবু মুসআব সূরীর সাথে আমার দেখা হয়। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমি যেন চেচনিয়ায় ঘটনাগুলো লিখে রাখি। শায়খের কথার গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও ততটা মনোযোগ দিতে পারিনি। ফলে কাজও শুরু করা হয়নি। আসলে তখনও নিজেকে এ কাজের যোগ্য মনে হয়নি।

---

[৩] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ

এরপর বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেল, নানা ঘটনা ঘটতে থাকল, আল-কায়েদার মুবারক জিহাদী কাফেলার প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আশঙ্কাজনকভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে লাগলেন। তখন শায়খের সে কথার গুরুত্ব ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, ইতিহাসের এই সোনালি অধ্যায়টি সংরক্ষণ করা দরকার। অন্যথায় তা হারিয়ে যাবে অথবা শত্রুতা একে বিকৃত করে প্রচার করবে। সত্য লুকিয়ে বিকৃত ও মিথ্যা ইতিহাস লিখতে পারদর্শী ডাকাতরা তো এই অপেক্ষাতেই আছে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আমি ইয়েমেনে যাই। আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরব (AQAP)-এর সম্মানিত আমীর শায়খ আবু বাসীর (নাসির আব্দুল করীম উহাইশী) দীর্ঘদিন শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় শায়খকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই আমি বারবার তাঁকে শায়খের সাথে কাটানো দিনগুলোর ইতিহাস লিখে রাখতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি বরাবরই বড়দের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে কিছু লিখতে অপারগতা প্রকাশ করছিলেন। যেহেতু তখনও হিজরত-জিহাদ, ইলম ও অভিজ্ঞতায় তাঁর চেয়ে প্রবীণ শায়খগণ জীবিত ছিলেন, তাই আগ বেড়ে কিছু করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তিনি বলতেন, এ কাজের জন্য তাঁরাই বেশি যোগ্য। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী, শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী[৪], শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি.।

আল্লাহর রহমতে অধমেরও বেশ কিছু বছর শায়খ উসামা রহ.-এর পাশে থেকে সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। তবে কখনো কল্পনাও করিনি, আমি এ ব্যাপারে কোনো কাজ করব। এরইমধ্যে ৩রা যিলকদ ১৪৩৭ হিজরীতে লেখা শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর একটি চিঠি আমার কাছে আসে।[৫] তিনি তাতে লিখেছিলেন, 'আমি চাই 'ইমামের সাথে অতিবাহিত

[৪] এ বই লেখা শেষ করার আগেই আমার কাছে সংবাদ আসে, আমেরিকার আদেশে ইরানে শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরীকে তার বড় মেয়ে-সহ (হামযা বিন উসামা বিন লাদেনের স্ত্রী) জায়োনিস্ট মোসাদ গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শহীদ করে ফেলেছে। উল্লেখ্য, শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরীর গুপ্তহত্যা ৭ই আগস্ট ২০২০-এ সংঘটিত হয়। ২২ বছর পূর্বে ঠিক এই দিনেই ১৯৯৮ সালে দারুস সালাম ও নাইরোবিতে আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করা হয়েছিল। হয়তো আমেরিকা এর মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা দিতে চায়, যত দেরিই হোক না কেন, তারা প্রতিশোধ নিতে ভুলবে না। তার প্রতিপক্ষ যেখানেই থাকুক, সে কিছুতেই পিছু ছাড়বে না। কিন্তু আমরা আমেরিকাকে সে কথাই বলতে চাই, যা বলেছেন আমাদের প্রতিপালক, "হে নবী, (আপনি) বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দুই কল্যাণের একটির অপেক্ষায় আছ? আমরাও তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষায় আছি, তিনি তোমাদের শাস্তি প্রদান করবেন হয়তো তার পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি।" দুই ঘটনার মাঝে কত ব্যবধান! আমাদের সাথিরা তোমাদের জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে, আর তা কতইনা মন্দ স্থান। আর তোমরা আমাদের সাথিদের জান্নাতে পাঠিয়ে দিয়েছ, যার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের সমান। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি সকল শহীদকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমীন।

[৫] উল্লেখ্য, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. আল-কায়েদার জাযীরাতুল আরবের আমীর শায়খ কাসেম আর-রীমী রহ.-কে জাযীরাতুল আরবের জিহাদের ইতিহাস লিখে রাখতে বলেছিলেন। আমার ধারণা, আল-কায়েদার

দিনগুলো' সিরিজে আপনিও শরীক হোন। আপনার লেখাগুলো 'ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো (উসামা বিন লাদেন রহ.-এর সাথে শায়খ খুবাইব সুদানীর স্মৃতিচারণ)' শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হবে। যেন আস-সাহাব থেকে প্রকাশিত সিরিজের সাথে মিলে না যায়। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন।'

তখন 'আল মালাহিম মিডিয়া'র ভাইয়েরাও আমার কাছে আল-কায়েদা ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে কাটানো দিনগুলো নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক একটি বই লেখার আবেদন করছিলেন। আমিও এর গুরুত্ব বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তাদের আবেদন ও অনুরোধ আমার কাছে কতটা যে ভারী মনে হচ্ছিল, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সহজভাবে বললে, আমি এই ময়দানের লোক নই। যে নিজের সীমা বুঝতে পারে, সেই তো আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। বই খুলে অধ্যয়নের গভীরে ডুব দেওয়াই যেখানে আমার জন্য কষ্টসাধ্য, সেখানে লেখালিখির জন্য কলম তুলে নেওয়া তো রীতিমতো অসম্ভব। তা-ও আবার স্পর্শকাতর ইতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে।

কিন্তু ভাইদের পীড়াপীড়ি ও অনুরোধের কারণে এবং শায়খ আবু মুসআব সূরীর সেই কথা মনে করে আল্লাহর নামে কলম তুলে নিলাম। যেন কোনো শত্রু, সাংবাদিকের বেশধারী চেতনার ফেরিওয়ালা বা জিহাদবিমুখ কেউ এই ইতিহাস বিকৃত করতে না পারে। এরপর শুরু হলো অতীতের স্মৃতি হাতড়ে রচনার এক সুদীর্ঘ কাজ। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'আল-মাসরা' পত্রিকায় '**أيام من مذكراتي**' (স্মৃতির পাতা থেকে কিছুদিন)' শিরোনামে সাত পর্ব প্রকাশিত হয়। গুরুগম্ভীর এই শিরোনামটি পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় আমাকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই ঠিক করেছিলেন। এই নামের দরুন কী পরিমাণ অস্বস্তি অনুভব করেছি, তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, শিরোনামটি তার বিপরীত বার্তা দিচ্ছিল। শিরোনামটি আমাকে এমনভাবে উপস্থাপন করছিল, যেন আমি সে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পছন্দ করে; অথচ আমি তেমন নই। আল্লাহর কসম! মানুষ যদি আমার প্রকৃত অবস্থা জানত, তাহলে সে কথাই বলত, যা বলেছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.—'এখন আবু হানীফার সময় হয়েছে দু'পা ছড়িয়ে বসার'[৬]।

---

প্রত্যেক শাখার আমীরকেই তিনি এই আহ্বান করে থাকবেন। যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও উম্মত এই ইতিহাস ভুলে না যায়। পূর্বসূরীদের ইতিহাস, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তাদের জিহাদ থেকে লব্ধ দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

[৬] প্রবাদতুল্য এই উক্তির কাহিনি হলো, একবার আবু হানীফা রহ. ছাত্রদের সাথে বসে ছিলেন। হঠাৎ একব্যক্তি আসল। তার বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছিল, বড় কোনো আলেম হবেন। তখন আবু হানীফা রহ. [অসুস্থতার কারণে] দু'পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন। সে আলেমের সম্মানার্থে তিনি পা গুটিয়ে নিলেন। আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি

সে প্রবন্ধটিই ধীরে ধীরে আল-কায়েদার ইতিহাস নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বইয়ের রূপ ধারণ করেছে। এই বই রচনায় আমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি। ইতঃপূর্বে যারা এ বিষয়ে লেখালিখি করেছেন, তাঁদের বই থেকেও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে অনেক আলোচনাও এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাথে আমার স্মৃতি থেকেও অল্পবিস্তর সংযোজন করেছি। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাও উল্লেখ করেছি। বইটিকে মোট পাঁচ অধ্যায়ে ভাগ করে ইতিহাসের পাঁচটি পর্ব আলোচনা করেছি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণের সংবাদ শুনে শায়খ উসামা রহ.-এর পাকিস্তানে আগমন থেকে শুরু করে নাইন-ইলেভেনের (৯/১১) বরকতময় ঘটনা পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস এই বইয়ে পেশ করা হয়েছে। ৯/১১ পরবর্তী কিছু ঘটনার সামান্য বর্ণনাও এতে রয়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে অবশেষে বইটি প্রকাশ হচ্ছে, যা এখন আপনাদের সামনে। আমি এর নাম দিয়েছি 'شذرات من تاريخ القاعدة (শাযারাত মিন তারিখিল কায়েদাহ)'।

আল-কায়েদার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অধ্যায় এই বইয়ে আলোচনা করা হয়নি। একটি হলো, ৯/১১-এর পর আফগানিস্তানের মাটিতে তালেবান ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে আমেরিকার দোসর পাকবাহিনী পরিচালিত নোংরা গুপ্তচরবৃত্তি ও আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস। অপরটি হলো, বিশ্বব্যাপী আল-কায়েদার সম্প্রসারণ, আল-কায়েদার সাথে ইরাক, শাম, সোমালিয়া, ইসলামী মাগরিব, মালি ও ভারত উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জিহাদী দলগুলোর সম্পর্ক স্থাপন এবং এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার বাইয়াত গ্রহণের ইতিহাস।

এ বইয়ে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তা আল-কায়েদার গৌরবময় ইতিহাসের দশভাগের একভাগও হবে না বলে আমি মনে করি। এগুলো তো কিছু খণ্ডচিত্রমাত্র, বড় বড় ঘটনার কিঞ্চিত বিবরণ। এটি সে সকল মহান ব্যক্তির ঘটনার সংকলন, যারা এমন সময় আল্লাহর দীনকে সাহায্য করতে জেগে উঠেছিলেন, যখন এ পথের পথিক ছিল নগণ্য। এ পথের ত্যাগ ও কুরবানী ছিল তাঁদের পরম আরাধ্য। আল্লাহর অনুগ্রহে অবশেষে তারাই ইতিহাসের গতিধারা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

---

নিজের পাশে তাকে বসালেন। এরপর ওই ব্যক্তি আবু হানীফা রহ.-কে প্রশ্ন করতে শুরু করল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, হে ইমাম, রোজাদার ব্যক্তি কখন ইফতার করবে? আবু হানীফা রহ. উত্তরে বললেন, যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, সূর্য অস্ত যেতে যেতে যদি মাঝরাত হয়ে যায় তাহলে? আবু হানীফা রহ. তখন দুই পা ছড়িয়ে বসলেন আর বললেন, এখন আবু হানীফার সময় হয়েছে দু'পা ছড়িয়ে বসার। [শায়খ এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন, তাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার যোগ্য নন। মানুষ তার আসল অবস্থা জানলে সেই কথাটিই বলত, যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ. সে লোকটির আসল অবস্থা জানার পর বলেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি শায়খের চূড়ান্ত বিনয়ের পরিচয়।-সম্পাদক]

হে আল্লাহ, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপনার সামনে পেশ করছি। আমি কেবল আপনার ওপরই ভরসা করি।

অন্য দশটি বইয়ের মতো এই বইয়েও ভুল-শুদ্ধ, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি আছে। এতে যা কিছু কল্যাণকর, তা সবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান। আর যা কিছু ভুল ও অকল্যাণকর, তার দায়ভার আমার ও শয়তানের ওপর। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাবতীয় ভুল থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই বইটিকে উপকারী বানিয়ে দেন। সেই দিন একে আমার নেকের পাল্লায় রাখেন, যেদিন ধন-সম্পদ, পরিবার-সন্তান কিছুই কাজে আসবে না; তবে যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে, সে ব্যতীত। আমীন।

আল্লাহর ক্ষমার মুখাপেক্ষী
খুবাইব সুদানী
(ইবরাহীম আহমাদ মাহমুদ কুসী)

# আনন্দবার্তা

**الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.**

আফগানিস্তানের মাটি থেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে বিতাড়িত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। ইতঃপূর্বে ওদের পূর্বসূরী দুই পরাশক্তিও এভাবেই বিতাড়িত হয়েছিল এই মাটি থেকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজ মুখেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলেছে, 'চলমান ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করছে, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো সামরিক শক্তি নেই, যারা সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান খ্যাত আফগানিস্তানের মাটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।'

কিছুদিন আগে ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেলও স্বীকার করেছে, ন্যাটো প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের সবচেয়ে বড় পরাজয় হলো আফগানিস্তানের পরাজয়।

এ বিজয়ে আমরা বিশ্বের সকল মুসলিমকে অভিনন্দন জানাই। বিশেষভাবে আফগান জাতি, তালেবান ও তাদের সর্বোচ্চ নেতা আমীরুল মুমিনীন শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদা-সহ সকল নেতৃবৃন্দ ও মোবারক এই বিজয়ের রূপকার সকল সৈনিকদের মোবারকবাদ জানাই। মুসলিম জাতির কপালে ইজ্জতের তিলক এঁকে দেওয়া ভাইয়েরা আমার, এ মহান বিজয়ে আপনাদের অভিবাদন জানাই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশ্লেষক ও পুরো পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়েছে আপনাদের এই বিজয়। নিঃসন্দেহে এ বিজয় আপনাদের সংখ্যাধিক্য বা সাজসরঞ্জামের বদৌলতে অর্জিত হয়নি; হয়েছে কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে, হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ঈমান, বুলন্দ হিম্মত, অবিচলতা ও পৌরুষোচিত দৃঢ়তার মাধ্যমে, যার সামনে পর্বতশৃঙ্গও অতি তুচ্ছ মনে হয়। আপনারা তো এমন বীরের জাতি, যারা চলমান সংঘাত ও দীন ইসলামের স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। দীনের ব্যাপারে কোনো আপস করেননি এবং এই দীনের জন্য কল্পনাতীত কুরবানী পেশ করেছেন।

হে আফগান জাতি, তালেবান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সন্তানদের নিয়ে আপনাদের গর্ব করা উচিত। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের হাতেই আফগানিস্তানের মাটিতে তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদের কবর রচিত হয়েছে। তাদের হাত ধরেই ফিরে এসেছে ইসলামী ইমারত, যেখানে আল্লাহর শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠিত, যদিও আমেরিকা ও তার দোসররা তা অপছন্দ করে। তাদের হাতেই বাস্তবায়ন হয়েছে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-এর বাণী।

তিনি বলেছিলেন, **'আল্লাহ আমাদের বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। আর আমেরিকা পরাজয়ের হুমকি দিয়েছে। অচিরেই দেখব কার ওয়াদা সত্য হয়।'** হে আফগান জাতি, তালেবানের জন্য আপনাদের প্রতি অভিনন্দন এবং আপনাদের জন্য তালেবানের প্রতি অভিনন্দন।




মার্কিন দূতাবাসের দেওয়াল, কাবুল

**وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ**

'আর আমি চাচ্ছিলাম জমিনে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকেই (সে দেশের ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানাতে।' [সূরা কাসাস (২৮) : ৫]

আর যারা তালেবান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবহারের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, আমরা তাদের এই দুটি ছবি দেখিয়ে বলতে চাই—সত্য সেটাই, শত্রুও যার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং তোমরা হিংসার আগুনে পুড়ে মরো। তোমাদের সব কথাই লিখে রাখা হবে, অতঃপর সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা উভয় জাহানের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের মুখোমুখি হব। যারা জুলুম করেছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে।




‘চলমান ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করল, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো সামরিক শক্তি নেই, যারা সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান খ্যাত আফগানিস্তানের মাটিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।’—বাইডেন।




‘আফগান যুদ্ধের দুই দশকে দৈনিক ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে।’—বাইডেন।

**إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ**

‘নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এভাবেই তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সে সব তাদের পরিতাপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরি করে, তাদেরকে (আখিরাতে) জাহান্নামে একত্র করা হবে।’ [সূরা আনফাল (৮) : ৩৬]

# মুখবন্ধ

শায়খ আবু মুসআব সূরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ'-তে বলেন,

> 'সামসময়িক জিহাদী আন্দোলন এবং মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের জীবন ও সংগ্রামে ছোটবড় ভুল অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ভুলগুলোকে একপাশে রেখে তাদের জীবন ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ারও অনেক কিছুই রয়েছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ভবিষ্যৎ জিহাদী প্রজন্মের জন্য এগুলো জানা ও পড়ার বিকল্প নেই। পাশাপাশি পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা যথাযথ অনুধাবন করে চিন্তা, গবেষণা ও আদর্শে তাদের দেখানো পথে চলতে হবে, তাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যেন দৃষ্টিভঙ্গি আরও উন্নত হয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও শক্তির ভারসাম্যহীন এই লড়াইয়ে জিহাদী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে। হাজারো শহীদের রক্তে রঞ্জিত গৌরবময় এই পথে পূর্ববর্তীদের অর্জিত মহান শিক্ষাগুলো যেন হারিয়ে না যায়, তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের দোসরদের মোকাবিলায় পূর্বসূরীদের কুরবানীগুলো যেন বৃথা না যায়। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ধারাবাহিকতার অংশীদার হতে পারবে এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই মুবারক কাফেলার জন্য পথ তৈরি করতে পারবে; যার বাস্তবায়ন হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ফিরিয়ে আনা এবং খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ।'

তানজীম আল-কায়েদা জিহাদের পথে ঐতিহাসিক কয়েকটি অধ্যায় পাড়ি দিয়েছে। এর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক যুদ্ধের ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। একইসাথে তা মুজাহিদদের কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন এনেছে। এমনকি শায়খ উসামা রহ.-ও এসব ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলো হলো—

**১. আফগানিস্তানের প্রথম অধ্যায়:**

এতে রয়েছে—আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন, শায়খ উসামা রহ.-এর পাকিস্তান আগমন, ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে আল-কায়েদার ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা। অর্থাৎ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মাকতাবুল খিদমাত ও বাইতুল আনসার প্রতিষ্ঠা, আল-মা'সাদা'র সূচনা, জাজির যুদ্ধ ও এর শিক্ষা এবং ট্রেইনিংয়ের সূচনা।

**২. আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠা ও সুদান স্থানান্তর:**

আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে সুদানে স্থানান্তরিত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল। এর মধ্যে রয়েছে জালালাবাদের যুদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়, আফগান জিহাদ ঘিরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, তথাকথিত সন্ত্রাস-দমন কর্মসূচি।

**৩. সুদানের সময়কাল:**

এর মধ্যে রয়েছে—সুদানে শায়খ উসামার আর্থিক বিনিয়োগ, সোমালিয়া ও ইয়েমেনের ঘটনাসমূহ, আদ্দিস আবাবায় (ইথিওপিয়ার রাজধানী) মিশরের সাবেক তাগুত হোসনি মোবারককে হত্যাচেষ্টা এবং ১৯৯৬ সালের মে মাসে শায়খের সুদান ত্যাগ পর্যন্ত আরও অন্যান্য ঘটনা।

**৪. আফগানিস্তানের দ্বিতীয় অধ্যায়:**

সুদান থেকে নির্বাসনের ফলে শায়খ রহ. আফগানিস্তানের জালালাবাদে এসে পৌঁছানোর পর থেকে এই অধ্যায়ের শুরু। এতে রয়েছে—'মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দাও' শীর্ষক বিবৃতি প্রকাশ, কান্দাহারে আল-কায়েদার স্থানান্তর, তালেবানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল-কায়েদার যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ গঠন, নাইরোবি, দারুস সালাম এবং ইউএস কোলের ওপর হামলার ঘটনা ইত্যাদি।

**৫. ৯/১১ হামলা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ:**

৯/১১ হামলা ও তার পরে বহির্বিশ্বে পরিচালিত অন্যান্য অপারেশন, তালেবান ও আফগানিস্তানের জিহাদী দলগুলোর ওপর ৯/১১ হামলার প্রভাব, ৯/১১ নিয়ে বিভিন্ন সংশয়, তোরাবোরার ঘটনা, পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন-সহ আরও অনেক ঘটনা।

আসলে এই ঘটনাগুলো নিয়ে একাধিক বই ও ম্যাগাজিন লিখলেও শেষ হবে না। এ বইয়ের অল্প কিছু পৃষ্ঠায় এর কতটুকুই বা আর লিখতে পারব!

# প্রথম অধ্যায়

# পাকিস্তানে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর আগমন এবং আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মতৎপরতা

## অশ্বারোহণ করো হে আল্লাহর সৈনিক

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৯। সকাল হতে না হতেই সারা বিশ্বে ছড়িলে পড়ল একটি খবর। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছে। সেই যে অশান্ত হলো বিশ্ব, এরপর আর কখনো শান্তির দেখা মেলেনি। জুময়ার খুতবায় উচ্চকিত হলো প্রতিবাদের তীব্র ধ্বনি। মুসলিমবিশ্বজুড়ে কত সেমিনার, কনফারেন্স আর সমাবেশ-মহাসমাবেশের আয়োজন হলো। পত্রিকা, ম্যাগাজিন আর সংবাদমাধ্যমে কত লেখালিখি হলো। সবাই একযোগে আফগান জিহাদের কথা বলতে শুরু করল। দিকে দিকে ধ্বনিত হতে লাগল 'হাইয়া আলাল জিহাদ' (এসো জিহাদের দিকে) আর 'ইয়া খাইলাল্লাহ, ইরকাবি' (হে আল্লাহর সৈনিক অশ্বারোহণ করো)-এর প্রতিধ্বনি।[৭]

শায়খ উসামা রহ.-ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের সংবাদ জানতে পারলেন। এর কিছুদিন পর ১৯৭৯[৮] সালের শেষদিকেই পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর সাথে তিনি যোগাযোগ করেন এবং একটি অনুসন্ধানী সফরে পাকিস্তান আসেন। লাহোরে গিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলামীর আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার কাছে শায়খ রহ. বড় অঙ্কের আর্থিক অনুদান প্রদান করে তা মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর শায়খকে ওয়াদা দেন, তিনি অবশ্যই মুজাহিদদের কাছে তাঁর সাহায্য পৌঁছিয়ে দেবেন।

গুলবুদ্দিন হেকমতইয়ার, সাইয়াফ, রব্বানী প্রমুখ ব্যক্তিরাই তখন আফগান জিহাদের প্রসিদ্ধ নেতা। শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে এ নামগুলো অপরিচিত ছিল না। কারণ, তাদের অনেকেই হজের মৌসুম ছাড়াও বিভিন্ন সময় শায়খের পিতার মেহমানখানায় আসা-যাওয়া করতেন।

---

[৭] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ

[৮] এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। সাংবাদিক ইসাম দারাজ তার মা'সাদাতুল আনসার বইয়ে বলেন, শায়খ উসামা রহ. আফগান যুদ্ধ শুরু হওয়ার ১৭ দিন পরেই আফগানিস্তানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শায়খ উসামা রহ. তার এই সফরের বিষয়টি শুরুতে গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত এই যুদ্ধের ব্যাপারে সৌদি সরকারের অবস্থান স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না।[৯]

শায়খ রহ. বলেন—

> 'তাহদীস বিন নি'মাহ (আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা করা) এবং মুমিনদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য বলছি, আমার ওপর আল্লাহ তাআলার বড় একটি অনুগ্রহ হলো, ১৩৯৯ হিজরীতে যখন শুনতে পাই, মুসলমানদের ভূমি আফগানে সোভিয়েত রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়েছে। আফগানে থাকা আমার মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার জন্য তখনই পাকিস্তানে যাই। এরপর পাকিস্তানে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকি, একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করেন।'[১০]

সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের শুরু থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যে-সকল আরব নাগরিক আফগান মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পাকিস্তান গিয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য; ২০ জনও হয়তো হবে না। তাঁদের মধ্য থেকে যারা আফগানিস্তানে গিয়ে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা আরও কম। এ ছাড়া আফগান মুজাহিদদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য কিছু মুহসিন ব্যক্তিও সে সময় আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন।[১১]

উদাহরণস্বরূপ আরব থেকে সর্বপ্রথম যারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারা হলেন—শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ) হাফি., শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ও শায়খ কামাল সানানীরী (সায়্যিদ কুতুব রহ.-এর বোন আমেনা কুতুবের স্বামী) রহ.। এর মধ্যে শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ) হাফি. এসেছিলেন সবার আগে। সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত মাস আগে ১৯৭৯ সালের জুন মাসে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন। তার দুই বন্ধু আহমাদ মিনয়াবী ও ইসমাইলও ছিলেন তাঁর সাথে।

১৯৮০ সালের গ্রীষ্মকালে আফগান মুহাজির ও মুজাহিদদের জন্য ত্রাণ সহযোগিতা নিয়ে প্রথম তিনজন ডাক্তার পাকিস্তানের পেশোয়ারে আগমন করেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ। চার মাস অবস্থান করে সেবার তিনি দেশে ফিরে যান। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে পুনরায় পেশোয়ারে আসেন। এবার প্রায় দুই মাস থাকার পর আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কারণে বাধ্য হয়ে মিশর ফিরে যান। কিন্তু মিশর পৌঁছানোর সাথে সাথেই

---

[৯] আসাদুল ইসলাম মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকা: ফারিস আয-যাহরানী

[১০] মা'সাদাতুল আনসার: ইসাম দারায

[১১] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ

তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত আর আফগানিস্তানে আসতে পারেননি তিনি।

শুরুর দিকে আরও যারা আফগান জিহাদে শরীক হয়েছিলেন, তারা হলেন—শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ ড. ফযল (সায়্যিদ ইমাম), শায়খ আবু সাইয়াফ উরদুনী (ফাতহী মুহাম্মাদ হাবীব), শায়খ তামীম আদনানী, শায়খ আবু উবায়দা পানশীরী (আলী আমীন রশীদী), শায়খ আবু হাফস কমান্ডার (সুবহি আব্দুল আযীয আবু সিত্তাহ জাওহারী), শায়খ আবু মুয়ায মিসরী (স্বপ্নের তাবীরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন), শায়খ আহমাদ হাসান আবুল খাইর মিসরী (আব্দুল্লাহ রজব), আব্দুল্লাহ জাফর উরদুনী, ওয়াদী আল-হাজ[১২] (আবু আব্দুল্লাহ লুবনানী), ইসাম লীবী, শায়খ আবু ইবরাহীম ইরাকী, শায়খ আবু আইয়ুব ইরাকী প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন, আর যারা এখনো জীবিত আছেন তাঁদের নিরাপদে রাখুন।



শায়খ কামাল সানানীরী রহ.



১৯৮০ সালে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর প্রধান হিসেবে প্রথম সফরে সাইয়াফ। ডানপাশে শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী।

[১২] তিনি বিশ বছর ধরে আমেরিকার কারাগারে বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন। আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততা এবং নাইরোবি ও দারুস সালাম দূতাবাসে হামলার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তার মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

১৯৮৪ সালের আগ পর্যন্ত যে-সকল আরব মুজাহিদ আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে আসতেন, তারা আফগান মুজাহিদদের বিভিন্ন দলের মেহমানখানায় অবস্থান করতেন। এরপর তাদের অধীনে পরিচালিত ট্রেইনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে বিস্তৃত যে-কোনো ফ্রন্টে গিয়ে যুদ্ধে শরীক হতেন। কেননা, তখনও পর্যন্ত আফগানিস্তানে আরবদের জন্য আলাদা কোনো মেহমানখানা, প্রশিক্ষণক্যাম্প বা যুদ্ধফ্রন্ট ছিল না।

## আফগান জিহাদ: এক সুবর্ণ সুযোগ

রুশবিরোধী জিহাদ শুরু হওয়ায় আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্বার্থের লীলাভূমির রূপ ধারণ করল। তৈরি হলো ফায়দা লোটার সুবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ কালেভদ্রে আসে। ফলে নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের আশায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো সবাই। আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলো এই সুযোগে সে-সব জিহাদী দলকে দমানোর চেষ্টা করল, যারা তাদের সরকারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তির মিত্র দেশগুলো বিভিন্ন স্থানে আমেরিকাকে নাজেহাল করে রেখেছিল। তাই আমেরিকার লক্ষ্য ছিল, এই যুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে শীতল যুদ্ধে (কোল্ড ওয়ারে) বিজয় লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে নিযুক্ত গোলাম শাসকদের কাছে আমেরিকা নির্দেশনা প্রেরণ করে, যাতে তারা আগ্রহী মুজাহিদ যুবকদের আফগানিস্তান যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। এভাবে আমেরিকা এ-সব দেশের মিডিয়াগুলোকে আফগান জিহাদের পক্ষে প্রচারণা চালানোর অনুমতিও প্রদান করে, 'আফগানিস্তানে জিহাদ করা ফরযে আইন' মর্মে ফতওয়া দেওয়ার জন্য দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দেয় এবং আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে যুবকদের উৎসাহিত করার জন্য দাঈ, আলেম ও ইমামদের সুযোগ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করে।

এমনকি সৌদি বিমান সংস্থা সৌদি আরব থেকে পাকিস্তানগামী বিমানের টিকিটের মূল্য ৭৫% কমিয়ে দেয়। যাতে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক যুবকরা নিজ দেশে বিমানভ্রমণের চেয়েও কম খরচে[১৩] পাকিস্তান যেতে পারে। এভাবে আমেরিকা পাকিস্তান সরকারকে আরব ও অন্যান্য দেশের মুসলিম যুবকদের জন্য পাকিস্তানের ভিসা উন্মুক্ত করে দিতে আদেশ করে। যাতে মুসলিম যুবকরা পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারে। একইসাথে পাকিস্তান সরকারকে আরব মুজাহিদদের চলাফেরার স্বাধীনতা প্রদান করতেও আদেশ করে।

---

[১৩] *ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী* বইয়ে ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন, "টিকিটের মূল্য কমানোর এই অফার আমেরিকার পক্ষ থেকে ছিল না; বরং আফগান জনগণের জন্য দেওয়া সাধারণ মানুষের অনুদানের টাকার বিনিময়ে তা কমানো হয়েছিল। যা সে সময় বিভিন্ন ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, সৌদি রেড ক্রিসেন্ট ও সালমান বিন আব্দুল আজিজের অনুগত দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

যার ফলে আরবরা আফগানিস্তানের নিকটবর্তী পাকিস্তান-সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ-সব ক্যাম্প থেকে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ প্রদান-সহ আফগান জিহাদের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট সরবরাহ করা হয়। পরিশেষে আমেরিকা কোল্ডওয়ারে (শীতল যুদ্ধে) বিজয় লাভ করে এবং ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের বিজয় সুদৃঢ় করে নেয়। আমেরিকার সাবেক পেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তার প্রসিদ্ধ বইয়ে এই বিজয়কে 'যুদ্ধ ছাড়া বিজয়' হিসেবে উল্লেখ করেছে।[১৪]

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন যে বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেনি তা হলো, কবির ভাষায়—

**ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود**

তুমি যা জানো না, সময় শীঘ্রই তা তোমার সামনে উন্মোচন করবে। এমন সংবাদ তোমার কাছে আনবে, যার প্রস্তুতি তুমি গ্রহণ করনি।

অদৃশ্যের পর্দা সরিয়ে আমেরিকা যদি ভবিষ্যত দেখতে পেত, যদি সে জানতে পারত এই আফগান জিহাদের গর্ভ থেকেই একদিন এমন কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাকে লাঞ্ছিত করবে, তার গর্ব-অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে, যাদের কিছু কাজই আমেরিকাকে 'সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থানে' টেনে আনবে; তাহলে সে কখনোই আরব ও মুসলিম বিশ্বের শাসকদের নির্দেশনা প্রেরণ করে মুজাহিদ যুবকদের আফগান যাওয়ার পথ সহজ করার ঝুঁকি নিত না। কিন্তু কাফেররা ষড়যন্ত্র করেছে আর আল্লাহ তাআলাও কৌশল অবলম্বন করেছেন। যে গর্ত তারা অন্যের জন্য খোদাই করেছিল, তাতে নিজেরাই পড়েছে। কাফেররা মুসলিমদের যে রূপটিকে সবচেয়ে বেশি ভয় করত, অবশেষে তারা নিজেরাই সেটিকে জাগিয়ে তুলেছে।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তার **الأسئلة والأجوبة الجهادية** (জিহাদ-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর) বইয়ে লেখেন—

> 'শেচটারম্যান (Schechterman) নামের জনৈক আমেরিকান আফগান জিহাদ সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কাছে একটি রাজনৈতিক গবেষণা উপস্থাপন করেছে। তাতে সে বলেছে, "What We Have Done? We Have Awakened The Giant" "আমরা কী করেছি? আমরা তো প্রকাণ্ড এক দৈত্যকে জাগিয়ে তুলেছি"। আমেরিকার বাজারে এমন অনেক বই পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, আফগান জিহাদ আমু দরিয়ার সীমানায় ক্ষান্ত থাকবে না। অচিরেই তা পুরো ইসলামী বিশ্বকে জাগিয়ে তুলবে। এই জিহাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর থেকে তার ভিত্তিকে গুড়িয়ে দেবে। অচিরেই এই জিহাদের উত্তাল

[১৪] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ

ঢেউ আছড়ে পড়বে পিরিনীয় পর্বতমালার পাদদেশে, ধীরে ধীরে তা ফ্রান্সে প্রবেশ করবে, অস্ট্রিয়া দখল করে নেবে। হে ইউরোপ, পুনরায় তোমরা মুসলিমদের জিযয়া দেবে, যেমন বিগত পাঁচ শতাব্দী উসমানী খিলাফতকে দিয়েছ।

তখন আমেরিকা নিরুপায় হয়ে যাবে—এভাবেই এই আমেরিকান লেখক কথাটি লিখেছেন—ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। এই যুদ্ধ আফগানিস্তান বা ইসলামী দেশগুলোতে নয়; বরং খোদ ইউরোপের অভ্যন্তরে সংঘটিত হবে। তখন আমেরিকা আফসোস করবে, কিন্তু সে আফসোস কোনো কাজে আসবে না। প্রেসিডেন্ট নিক্সন আমেরিকান টেলিভিশনে বলেছে, "সকল মতপার্থক্য ভুলে ইসলামের জোয়ার ঠেকাতে রাশিয়ার সাথে মিলে কাজ করার সময় এখন।"'

## বিস্মৃত ফরয

আফগানিস্তানে আরব রাষ্ট্রসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র ও মুজাহিদীনের লক্ষ্য বাহ্যিকভাবে এক হলেও মুজাহিদ বাহিনীগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তানকে জিহাদের হারিয়ে যাওয়া ফরয আদায়ের উপযুক্ত স্থান হিসেবে দেখছিলেন। সাথে সাথে এই পরিস্থিতিকে আরববিশ্বের অবৈধ সরকারগুলোর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের এক অবারিত সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর উপলব্ধিও এমন ছিল। তাঁরা মনে করতেন, আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র হলো বিশাল এক সুযোগ, যথাসম্ভব সর্বোত্তম উপায়ে এর থেকে লাভবান হতে হবে।

দীর্ঘদিন পর প্রকাশ্যে খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের পর্দায় জিহাদের আলোচনা হচ্ছিল। মহান দুই শায়খ খুব ভালোভাবেই জানতেন, জিহাদের পক্ষে বিশ্বমোড়লদের এই সহযোগিতামূলক অবস্থান মূলত রাশিয়াবিরোধী জিহাদের সমর্থনের জন্য। আর এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তাদের মূল লক্ষ্য [রাশিয়ার পরাজয়] অর্জন হয়ে গেলে এই জিহাদের ধারা স্তিমিত হয়ে যাবে। এ কারণেই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. পাকিস্তান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সর্বত্র জিহাদের প্রতি মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দেন।[১৫]

মুসলমানদের জীবন থেকে জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ এই ফরয ইবাদতটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই আফগান জিহাদের ব্যানারে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সে সময় যে ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেছিলেন, তাতে জিহাদের ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা শুরু করেন। জিহাদ-সংক্রান্ত ফিকহী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া শুরু করেন এবং জিহাদ নিয়ে তৈরি হওয়া

[১৫] উস্তাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ-এর প্রবন্ধ সংকলন থেকে (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের জন্য তৎকালীন সময়ের সব ধরনের মিডিয়াতেই ব্যাপক কাজ করা শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে আয়াতুর রহমান ফী জিহাদি আফগান (আফগান জিহাদে রহমানের নিদর্শন) ও আদ-দিফা আন আরাদিল মুসলিমীন আহাম্মু ফুরুযিল আ'ইয়ান (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যা তিনি ১৯৮৪ সালে রচনা করেছিলেন।

অন্যদিকে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-ও সৌদি আরবে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী প্রচারণা শুরু করেন। যার ফলে আরব যুবকদের মধ্যে আফগান জিহাদের আগ্রহ তৈরি হয়। তারা দলে দলে আফগানিস্তানে পাড়ি জমাতে শুরু করে এবং আফগান জিহাদে আরব যুবকদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। এদের অধিকাংশই ছিল সৌদি , ইয়েমেন ও মিশরের নাগরিক।[১৬]

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলতেন, 'আমি চাই আরবের প্রত্যেকটি দেশ থেকে কমপক্ষে চল্লিশজন মুজাহিদ আসুক। তাদের অর্ধেক হয়তো শাহাদাতবরণ করবে, আর বাকি অর্ধেক নিজ দেশে জিহাদের দাওয়াত নিয়ে ফিরে যাবে।'

আলহামদুলিল্লাহ, শায়খ রহ. যা আশা করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জিত হয়েছে। আরব ও অনারব মিলে চল্লিশ হাজারের বেশি যুবক আফগানিস্তানে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের অর্ধেকের বেশি সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অর্ধেকের বেশি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত শহীদদের সর্বমোট সংখ্যা হিসেব করলে যাকাতের পরিমাণ ২.৫% থেকে বেশি হবে না। বিগত ৮ বছরের মধ্যে এক হাজারের কাছাকাছি আরব যুবক শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।[১৭]

## আফগানের মাটিতে আরবের মুসাফির

শায়খ উসামা রহ. পাকিস্তান সফরের প্রথম দিন থেকেই লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর কাছে এবং ইসলামাবাদে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের কাছে অনুদান পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯৮৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তার এই যাতায়াত অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শায়খ আফগানিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারে কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন। কেননা, আলে সৌদের সাথে শায়খের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তারা সরকারিভাবে শায়খের কাছে অনুরোধ করেছিল, তিনি যেন আফগানিস্তানে প্রবেশ না করে পেশোয়ারেই মুহাজিরদের নিকট অবস্থান করেন। কারণ, রাশিয়া যদি শায়খের নাগাল পায় বা তাকে বন্দি করতে সক্ষম হয়, তাহলে এটিকে আলে সৌদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবে যে, আলে সৌদ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুজাহিদীনকে সমর্থন করছে।

---

[১৬] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ।

[১৭] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল আলামিয়্যাহ।

কিন্তু শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর উৎসাহে চার বছর পর শায়খের এই ভয় দূর হয়ে যায়। অবশেষে ১৪০৪ হিজরীর রজব মাসে (এপ্রিল ১৯৮৪) তিনি সর্বপ্রথম জাজির উদ্দেশ্যে সফর করেন। জাজিতে পৌঁছানোর পর তার উপস্থিতিতে একটি তীব্র বিমান হামলা চালানো হয়। এতে কয়েকটি বিমান ভূপাতিত হয়। কমান্ডার সাইয়াফের দাবি অনুযায়ী—তখন তিনি আফগানিস্তানে ছিল এবং মুজাহিদদের সংগঠন আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল—সেদিন তিনটি বিমান ও একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়েছিল।

সে সময়ের কথা শায়খের মনে পড়লে, অনেক দুঃখের সাথে বলতেন, '১৪০৪ হিজরী পর্যন্ত সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমার মধ্যে সব সময় ভয় কাজ করত। যারা জিহাদের পথে বাধা দেয়, তাদের কাছে হাজারো অজুহাত আছে এর পক্ষে। অনেকে সুধারণাবশতই বাধা দিয়ে থাকে। কেননা পুরো ইসলামী বিশ্বে [জিহাদ বিমুখতার] এই পরিবেশের সাথেই তারা মানিয়ে নিয়েছে। আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, দীর্ঘ একটি সময় আমিও এই আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। অবশেষে ১৪০৪ হিজরীর রজব মাসে প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানে জিহাদী ক্যাম্পে প্রবেশ করি।'[১৮]

উল্লেখ্য, এর প্রায় বছরখানেক আগে থেকেই আরব মুজাহিদদের কিছু গ্রুপ আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল খোস্তের গ্রুপ। এই গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী হাফি., আব্দুর রহমান মিসরী রহ., আবু হাফস কমান্ডার রহ., আহমাদ হাসান আবুল খাইর মিসরী রহ., সাখরি রহ., ওয়াদী আল-হাজ লুবনানি ফা.আ.।[১৯]

শায়খ উসামা রহ. আফগানিস্তানের দুরবস্থা দেখে খুবই প্রভাবিত হন। একদিকে স্বল্প সামর্থ্যের দুর্বল আফগান মুজাহিদ, অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত অজেয় শত্রু। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারেন, মুজাহিদদের কাছে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ; বিশেষত পরিখা, সুরঙ্গ এবং রসদ সরবরাহের জন্য রাস্তাঘাটের অভাব সবচাইতে বেশি। চাউনি দুর্গে যাওয়ার পথে শায়খ রহ. আরও বুঝতে পারেন, মুজাহিদদের কাছে রসদেরও অনেক ঘাটতি রয়েছে। অন্য প্রদেশ থেকে আগত একটি প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারেন, সেখানে রসদের ঘাটতি আরও মারাত্মক। এর সাথে খাবার ও বস্ত্রের স্বল্পতা, জিহাদের জন্য জরুরি অন্যান্য সামগ্রীর অভাব তো আছেই। সার্বিক অবস্থা দেখে শায়খের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আফগানিস্তানে পাঠানো অনুদানগুলো সঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে না। জিহাদ ও

[১৮] মাআরিকুল বাওয়াবাতিস সখরিয়্যাহ: শায়খ আবুল ওয়ালীদ (মুস্তফা হামেদ)

[১৯] শায়খ সাইফ আল-আদলের বর্ণনা।

মুজাহিদীনের খেদমতের জন্য পাঠানো অর্থ সঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছে কি না—তার নিশ্চয়তা না নিয়েই এত সম্পদ খরচ করে ফেলা উচিত হয়নি। এ জন্য শায়খ খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হন। সে সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে শায়খ রহ. বলেন, 'অস্ত্রশস্ত্র, রাস্তাঘাট, পরিখা—মোটকথা সবক্ষেত্রেই আফগানিস্তানের করুণ অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে ইসতিগফার করলাম। আমি বুঝতে পারলাম, কিছু ভাই, মুরুব্বি ও প্রিয়জনের কথা শুনে অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছি। নিরাপত্তা সমস্যার ভয়ে আফগানিস্তানে না এসে আমি অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি। সাথে সাথে অনুভব করতে পারলাম, আমার এই চার বছর বিলম্ব করার কাফফারা হতে পারে একমাত্র শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ।[২০]

## মাকতাবুল খিদমাত: সূচনার গল্প

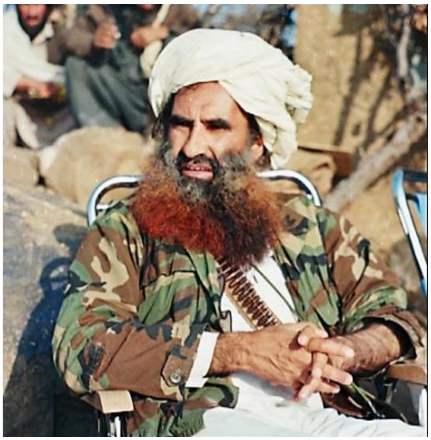
শায়খ উসামা রহ.-সহ মুসলিম বিশ্বের দানশীল ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশ, বিশেষত উপসাগরীয় দেশগুলো আফগান জিহাদের জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও অন্যান্য অনুদান পাঠিয়েছিল। যার পরিমাণ ছিল কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার। এই অনুদানের পুরোটাই দেওয়া হয়েছিল আফগান মুজাহিদদের সংগঠন আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর হাতে। আবদে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ এই সংগঠনের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি পুরো আফগান জিহাদের শরয়ী আমীরের ভূমিকাও পালন করছিল। এই লোকটির আমানতদারি ও সততা নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা ছিল, যা পরে স্পষ্ট হয়েছিল। সে মুজাহিদদের জন্য পাঠানো অর্থ তাঁদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে খেয়ানত করত।

শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ. ১৪০৪ হিজরীর হজের মৌসুমে (সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) শায়খ উসামা ও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর কাছে এ মর্মে প্রস্তাব দেন যে, আরব থেকে আসা আর্থিক অনুদানগুলো কারো মধ্যস্থতা ছাড়া সরাসরি আরব ভাইদের মাধ্যমে যেন বণ্টন করা হয়। সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়, আরব ভাইয়েরা যেন সরাসরি যুদ্ধফ্রন্টে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ময়দানের চাহিদা অনুযায়ী সরাসরি মুজাহিদদের হাতে অনুদান পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন, পেশোয়ারের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে অনুদান না পাঠান। কারণ নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা-সহ নানা অনিয়মের ফলে ময়দানের মুজাহিদদের ঐক্যের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি হয়েছে।[২১]

---

[২০] মাআরিকুল বাওয়াবাতিস সখরিয়্যাহ: শায়খ আবুল ওয়ালীদ (মুস্তফা হামেদ)

[২১] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার। শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)



শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ.

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. ও শায়খ উসামা রহ. অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তবে শরয়ী বৈধতার জন্য সাইয়াফ থেকে এর অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন।[২২] সে-ও তখন মক্কাতেই ছিল। সাইয়াফের সামনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হলে সে বুঝতে পারে, আফগানের ময়দানে তার যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই প্রস্তাবের ফলে তা খর্ব হবে। এ কারণে সে দ্রুত এটাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং শর্ত দেয়, এই কার্যক্রম তার সংগঠন 'আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী লি-মুজাহিদি আফগানিস্তান'-এর ব্যানারে হতে হবে। এ-দিকে এই প্রস্তাব দ্রুত কার্যকর করার জন্য হজের পরপরই 'মাকতাবুল খিদমাত' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে এটাই আফগান জিহাদের জন্য মুসলিমদের অনুদান পাঠানোর সবচেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে পরিণত হয়। বিশেষত সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে এই মাধ্যমেই অনুদান আসতে থাকে। অন্যদিকে যে সমস্ত আরব যুবক মাকতাবুল খিদমাতে কাজ করতে চাইত, শায়খ উসামা রহ. তাদের দেশ থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে দেশে ফেরা পর্যন্ত বাসস্থান, টিকিট, অন্যান্য খরচ ও পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব পর্যন্ত নিয়ে নিতেন।[২৩]

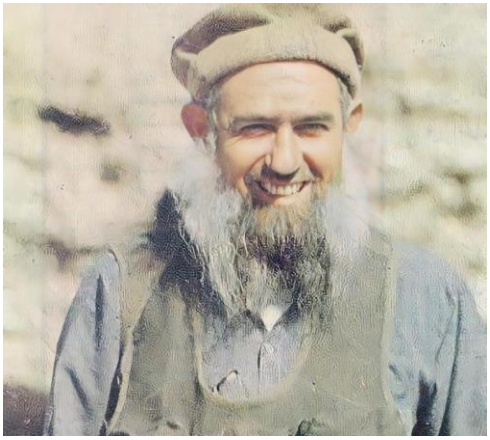
মাকতাবুল খিদমাতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.। মাকতাবের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো বিভাগ গঠন করা হয়। তার মধ্যে ছিল—সামরিক বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রত্যাবাসন বিভাগ (এই বিভাগ মুহাজির কাফেলাগুলোকে আফগান

[২২] যেহেতু সে আফগান জিহাদের শরয়ী আমীর ছিল। তাই তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন। [সম্পাদক]

[২৩] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার। শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)

ভূমিতে প্রেরণের কাজে নিয়োজিত ছিল)। মাকতাবুল খিদমাতের অধীনে আরও কিছু তৎপরতা শুরু হয়, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সদা' এলাকায় সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা, 'আল-জিহাদ' পত্রিকার সূচনা এবং শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর সকল দাওয়াতী সফরের ব্যবস্থা করা। আফগান জিহাদের পক্ষে জনসমর্থন তৈরির উদ্দেশ্যে শায়খ বিভিন্ন দেশে সফর করতেন এবং মানুষকে জিহাদের জন্য উৎসাহ দিতেন। যুবকদেরকে আফগানিস্তানে হিজরত করে জিহাদের ফরয আদায় করতে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের লিখিত প্রথম বই ছিল "আয়াতুর রহমান ফী জিহাদি আফগান (আফগান জিহাদে রহমানের নিদর্শন)"। দ্বিতীয় বই ছিল "আদ-দিফা আন আরাদিল মুসলিমীন (মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা ঈমান আনার পর প্রথম ফরয)"। এই বইয়ে তিনি মাজুর ব্যতীত সকল মুসলমানের ওপর আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরয মর্মে ফতওয়া প্রদান করেন।[২৪]

উক্ত ফতওয়ার সমর্থনে শায়খ রহ. ৮০ জনের বেশি বিশ্ববরেণ্য আলেমের স্বাক্ষর নিতে সক্ষম হন। যাদের শীর্ষে রয়েছেন—শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রহ.-সহ বিলাদুল হারামাইনের প্রথম সারির উলামায়ে কেরাম। আল-আযহারের কয়েকজন আলেম, বিভিন্ন দেশের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কয়েকজন আলেম ও দাঈ এবং পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের আরও কিছু আলেম এতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর এই বই ও ফতওয়া জিহাদের উৎসাহ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৫]



শায়খুল মুজাহিদীন আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

[২৪] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ

[২৫] প্রাগুক্ত

শুরুর দিকে মাকতাবুল খিদমাত পেশোয়ারে অবস্থানরত ৩০ জন আরব ভাইকে নিয়ে কাজ শুরু করে। মাকতাবুল খিদমাতে কর্মরত আরব ভাইদের ভূমিকা কেমন হবে—এ ব্যাপারে শায়খের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এ ক্ষেত্রে শায়খের অবস্থান ছিল খুব দৃঢ়। শায়খ মনে করতেন, আফগানদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করে তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের প্রচার করা, মুজাহিদদের সংগঠনগুলোর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা করে দেওয়া, যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজন হলে তাদের সাথে কিতালে শরীক হওয়া—এগুলোই আরবদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি মনে করতেন, আফগানিস্তানে যুদ্ধের জন্য আরবদের চেয়ে আফগানরাই বেশি উপযুক্ত। আর যুদ্ধের জন্য তাদের লোকবলের তেমন প্রয়োজন নেই।[২৬]



খচ্চরের একটি কাফেলা আফগানিস্তানের ভেতরে
সামরিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র নিয়ে যাচ্ছে

মাঠপর্যায়ে মাকতাবুল খিদমাতের প্রধান কাজ ছিল মুজাহিদদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে মুজাহিদদের ঘাঁটিগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ পৌঁছানোই ছিল মাকতাবের প্রধান কাজ। পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে খচ্চরের কাফেলার মাধ্যমে এসব পাঠানো হতো। একবার সীমান্তবর্তী পথে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটকে গিয়েছিল। ঠিকাদারদের দাবি ছিল, এসব জিনিস বহন করে মুজাহিদদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদদের দলগুলো তাদের পরিবহণ-খরচ পরিশোধ করেনি, তাই তারা সবকিছু সীমান্তেই আটকে রেখেছে। এই পরিবহণ-খরচের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। অবশেষে এই সমস্যা সমাধানের জন্য মাকতাবুল খিদমাতই উদ্যোগ নেয়। তারা

[২৬] মাআরিকুল বাওয়াবাহ আস-সখরিয়্যাহ: শায়খ আবুল ওয়ালিদ (মুস্তফা হামেদ)

সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে কিছু ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটিগুলোতে মালামাল ওজন করে খচ্চর মালিকদের পরিবহণ-খরচ প্রদান করা শুরু করে। অধিকাংশ সময় এই কাফেলাগুলোর সাথে কিছু আরব যুবকও আফগানিস্তানে প্রবেশ করত। তারা মুজাহিদদের মাঝে মাকতাবুল খিদমাতের পাঠানো সামগ্রী বণ্টনের দেখাশোনা করত।[২৭]

শায়খ উসামা রহ. শুধু মাকতাবুল খিদমাতের বিভিন্ন কাজেই প্রতি মাসে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি খরচ করতেন, যা তখনকার হিসেবে প্রায় পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলারের সমান ছিল। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তাঁর অসীয়তনামায় মাকতাবুল খিদমতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি ভাই আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি নিজের সম্পদ দিয়ে এই মাকতাবুল খিদমাতের দেখাশোনা করেছেন। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করেন। তার মতো ব্যক্তি আরও তৈরি করে দেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তার মতো মানুষ আমি পুরো মুসলিম বিশ্বের কোথাও পাইনি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি তার দীন ও সম্পদ হেফাযত করুন, তার হায়াতে বরকত দান করুন।"[২৮]

মাকতাবুল খিদমাত প্রতিষ্ঠা করা কৌশলগত দিক থেকে অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আরবদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মাকতাবের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা ছিল না। এটি ছিল মাকতাবুল খিদমাতের মৌলিক একটি ত্রুটি। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল করতে পারেননি। আরবদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকায় মাকতাবের মধ্যে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে থাকে। পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কোন্দল-সহ নানা জটিলতা তৈরি হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার দরুন মাকতাবের অধীনস্থ আরব মুজাহিদগণ নিজেদের ভূমিকা নিয়ে দ্বিধান্বিত হতে থাকেন। ফলে কেউ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকতা শুরু করেন, কেউ দাতব্য সংস্থার সদস্যের মতো বিভিন্ন যুদ্ধফ্রন্টের সংবাদ ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করেন আর কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে আফগান মুজাহিদীন ও কমান্ডারদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা শুরু করেন এবং পারস্পরিক সংঘাত ও দলাদলি দূর করতে ট্রেইনিং ক্যাম্প তৈরি করেন। এর প্রায় বছরখানেক পর শায়খ উসামা রহ. যখন সশরীরে সামরিক

[২৭] মাআরিকুল বাওয়াবাহ আস-সখরিয়্যাহ: শায়খ আবুল ওয়ালিদ (মুস্তফা হামেদ)।

[২৮] উসামা বিন লাদেন: মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরু আমরিকান : আবু জান্দাল আযদী।

কাজ শুরু করেন, তখন এই অব্যবস্থাপনার দরুন নিজেকে মাকতাব থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।[২৯]

উল্লেখ্য, জাজির যুদ্ধে শায়খ উসামার সফলতা ও রুশ কমান্ডো বাহিনীর পরাজয়ের পর আরবদের সামরিক ট্রেইনিংয়ের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে শায়খ উসামার সিদ্ধান্তের ওপর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আফগান জিহাদে সাধারণ সহযোগিতার পাশাপাশি সামরিক সহায়তা করার ব্যাপারেও শায়খ উসামার সাথে একমত পোষণ করেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. ১৯৮৯ সালে শাহাদাতবরণের কিছুদিন আগে 'আত-তাআমুরুল আলামী' নামে একটি বই লেখেন। তাতে তিনি বলেন, 'কেবল সাহায্য পৌঁছানোই আফগানিস্তানে আমাদের দায়িত্ব নয়; বরং আফগানিস্তানে আমাদের মূল দায়িত্ব হলো আল্লাহর জমিনে তার দীন প্রতিষ্ঠা করা, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাত আসমানের ওপর থেকে আমাদের ওপর ফরয করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য অনুদান সংগ্রহ করা বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করাও নয়। আমরা আল্লাহর সেনাবাহিনী, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে তিনি আমাদের তার দীনের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করেছেন। যারা এই পথে আমাদের সাথি হতে চায়, আমরা তাদের স্বাগত জানাই, বুকে জড়িয়ে নিই। আমরা যাদের নিষ্ঠাবান মনে করি, তাদের ভুলত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি। আর অন্যদের বিষয় আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করি।'

১৯৮৪ সালের শেষ থেকে ১৯৮৫ সালের শেষ অবধি শায়খ উসামা রহ. আফগান রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে পারেননি। যেহেতু মাকতাবুল খিদমাত ও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. আফগানিস্তানের ভেতরে যুদ্ধফ্রন্টগুলোতে মুজাহিদদের কাছে আরবদের অনুদান ও সাহায্য পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট তৎপর ছিলেন; যেহেতু এটাই ছিল প্রধান কাজ আর তা যথাযথভাবেই বাস্তবায়ন হচ্ছিল, তাই শায়খের সরাসরি অংশগ্রহণের প্রয়োজনও ছিল না।[৩০]

## বাইতুল আনসার : আরবদের মেহমানখানা[৩১]

১৯৮৫ সালে মাকতাবুল খিদমাতের তত্ত্বাবধানে পেশোয়ারে দুটি বাড়ি নির্মাণ করেছিল। আরব মুজাহিদদের জন্য মেহমানখানা হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করা হতো। আফগানিস্তানে প্রথম

[২৯] মাআরিকুল বাওয়াবা। শায়খ আবুল ওয়ালিদ মিশরী (মুসতাফা হামেদ)

[৩০] মাআরিকুল বাওয়াবা : শায়খ আবুল ওয়ালিদ মিশরী (মুসতাফা হামেদ)।

[৩১] এই পুরো আলোচনা সালেহ আল-হামী লিখিত 'ফুরসানুল ফরীযাতিল গাইবা: আয-যারকাবী ওয়াল জিহাদুল আফগানী' থেকে নেওয়া।

দুই আরব শহীদের নামে বাড়িদুটির নাম দেওয়া হয়েছিল। তারা হলেন আবু হামযা ফিলিস্তিনী ও আবু উসমান ফিলিস্তিনী রহ.। কিছুদিন পর আবু হামযা ভবনটি বন্ধ হয়ে যায়, কেবল আবু উসমান ভবন খোলা থাকে। এর কিছুদিন পর আরব থেকে ফয়সাল সানিয়ান নামক এক ব্যক্তি আসে। সে অন্য দলের স্বার্থোদ্ধারের জন্য মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে সে পেশোয়ারে আরেকটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেহমানখানা খুলে বসে। সেখানে ভালো-খারাপ সবাইকেই একত্র করা শুরু করে। তার কাছে এমন ব্যক্তিরাও আসা-যাওয়া শুরু করে, যাদের মধ্যে জিহাদবিমুখতা দানা বেঁধেছিল; যাদের হিম্মত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। আর শয়তান তাদের এই জিহাদবিমুখতাকে তাদের কাছে ভালো গুণ হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। মুজাহিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে তাদের চিন্তাধারার বিস্তর ফারাক ছিল। অবশেষে আরব মুজাহিদগণ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা ও আবুল হাসান মাদানী (ওয়ায়েল জুলাইদান)-এর নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হন। তিনজন একমত হয়ে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে [মুজাহিদদের আশ্রয় দেওয়ার] কার্যক্রম শুরু করেন। বাড়িটি সকল স্তরের মুজাহিদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সে বাড়ির নাম দেওয়া হয় 'বাইতুল আনসার'।

বাড়িটি ছিল বেশ বড় ও একাধিক সুবিধাসমৃদ্ধ। সামনে ছিল প্রশস্ত আঙিনা। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামকে এর পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। শায়খ কয়েকজন যোগ্য ভাইকে এর পরিচালার জন্য নির্ধারণ করে দেন। তারা হলেন—শায়খ আবু হাজের ইরাকী (মামদুহ মাহমুদ সালেম) ফাক্কাল্লাহু আসরাহ[৩২], আবু রওযা সূরী রহ., আব্দুল্লাহ জাফর (খালেদ মাহমুদ আব্দুল ওয়াহহাব আসমার) উরদুনী, আবু সালিম সূরী ও আবু আব্দুল্লাহ লুবনানী (ওয়াদী আল-হাজ) ফা.আ.।

---

[৩২] শায়খ আবু হাজের ইরাকী আফগান যুদ্ধের প্রথম সারির প্রবীণ ও প্রখ্যাত নেতা। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রথমবার ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ থেকে, দ্বিতীয়বার শরীয়াহ অনুষদ থেকে। আফগান যুদ্ধের শুরুর দিকে ১৯৮৫ সালে আফগানিস্তান আসেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামার খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। কুরআনের মজবুত হাফেয ছিলেন। রমযানে পেশোয়ারের আল-হেলাল কুয়েতি মসজিদে তিনি তারাবীর নামায পড়াতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দাউদ আ.-এর মতো আকর্ষণীয় কণ্ঠ দান করেছিলেন। শায়খ উসামার সাথে তিনি সুদানেও হিজরত করেছিলেন। শায়খের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। যখন শায়খ উসামা রহ. সুদান থেকে নির্বাসিত হন, তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসার কারণে সেখানে থেকে যান। দারুস সালাম ও নাইরোবিতে হামলার পর তিনি একটি ব্যবসায়ী কাজে জার্মানি গিয়েছিলেন, সেখানে আমেরিকার আদেশে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২০০০ সালে আমেরিকা শায়খকে আল-কায়েদাকে অর্থায়ন করার অভিযোগ এনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। বর্তমানে তিনি আমেরিকার কলোরাডোর ADX Florence কারাগারে বন্দি আছেন। উল্লেখ্য, একবার কারাগারে নামাজের সময় একজন প্রহরী কুরআন নিয়ে ঠাট্টা করে। শায়খ আবু হাজের তার দিকে একটি চিরুনি ছুড়ে মারেন, যা তার চোখে গিয়ে লাগে। এতেই সে অসুস্থ হয়ে যায়। এই ঘটনার কারণে শায়খকে আবার আদালতে হাজির করা হয়।



শায়খ আব্দুল্লাহ জাফর হাফি.



শায়খ আবু আব্দুল্লাহ লুবনানী ফা.আ.



শায়খ আবু হাজের ইরাকী ফা.আ.



পেশোয়ারের বাইতুল আনসার

আরব মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইতুল আনসারে একত্র হতেন। আহত প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অবসর সময়ে মুজাহিদগণ এখানে আসতেন। সবার সাথে সাক্ষাৎ করে আবার ময়দানে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করতেন। মুজাহিদদের এই সাক্ষাৎগুলো খুবই প্রাণবন্ত হতো। তাঁদের অন্তরগুলো ছিল ঈমানে ভরপুর, মনোজগৎ জুড়ে শুধু জিহাদ, চিন্তাধারা ছিল অনেক উঁচু, স্বপ্ন ছিল সুদূরপ্রসারী আর হিম্মত ছিল গগনচুম্বী। তারা দীনের সম্মান ও মুসলিমদের ভূমির প্রতিরক্ষার জন্য সর্বদা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য কামনা করতেন। বিভিন্ন ময়দানের আলোচনা ও শহীদদের স্মৃতিচারণ করে রাত কেটে যেত তাঁদের। একে অপরকে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের উপদেশ দিতেন। জান্নাতে

২০১০ সালের আগস্ট মাসে পুনরায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা শায়খকে দ্রুত কারাগার থেকে মুক্তি দান করুন।

আবার সবাই মিলিত হওয়ার আশা রাখতেন। কত মুজাহিদ বাইতুল আনসারে একসাথে থেকেছেন আর শাহাদাত তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। কত বন্ধু আবার দেখা করার ওয়াদা দিয়ে বেরিয়েছেন, কিন্তু জিহাদের ব্যস্ততার দরুন সে সুযোগ আর হয়নি। বাইতুল আনসার ছিল জান্নাতের পথিকদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, যুগের মহানায়ক আর সিংহপুরুষদের পদচারণায় মুখরিত ছিল সেই জমিন। মৃত্যুর সন্ধানে ময়দানে ময়দানে ছুটে বেড়াতেন তাঁরা। জিহাদের এই ধারা এভাবেই চলত। শাহাদাতের তামান্না আর আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করাই ছিল তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

বাইতুল আনসার ছিল মুজাহিদদের প্রথম মনযিল, ঈমানী দরসগাহ ও পাথেয় সংগ্রহের স্থান। এখান থেকেই ঈমান ও জিহাদের দীক্ষা নিয়ে এবং শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ তামীম আদনানী ও শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের দূরদর্শী নির্দেশনা অনুযায়ী জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁরা। দীর্ঘদিন মুজাহিদগণ এই মুবারক ছায়াতলে একদেহ একপ্রাণ হয়ে জিহাদী কাজ পরিচালনা করেছেন।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে বাইতুল আনসারের কার্যক্রম এভাবেই কয়েক বছর চলতে থাকে। এরপর পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আসে। জাযীরাতুল আরবের কিছু যুবক এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন মুজাহিদদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইয়েমেন ও উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে দলে দলে যুবকরা এসে জড়ো হচ্ছিল। মুজাহিদদের মধ্যেও মিল-মুহাব্বত তৈরি হচ্ছিল। এভাবে মুজাহিদগণ স্বদেশি ভাইদের সাথে মিলে থাকতে শুরু করেন।

পেশোয়ারের বাইতুল আনসারে থাকা এই মুজাহিদদের মধ্যেও চিন্তাগত ও রাজনৈতিক মতভিন্নতা ছিল। এমনই কিছু মতবিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয় এবং কিছু ভাইয়ের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধরনের [মতবিরোধপূর্ণ] শাখাগত কিছু বিষয়কে শরয়ী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক বিষয় হিসেবে দাঁড় করানোর প্রবণতা শুরু হয়। এর ফলে মুজাহিদদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। বাইতুল আনসারের নতুন পরিচালকদের কাছে এই পরিস্থিতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই বাইতুল আনসারের সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য রক্ষার্থে তারা কিছু বিষয়ে আলোচনা করা নিষেধ করে দেন। এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। মুজাহিদদের মধ্যে গোত্রীয় ও জাতিগত মনোভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিছু মুজাহিদ নিজেদের জন্য আলাদা মারকায নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং স্বদেশি জিহাদ-অনুরাগী ব্যক্তিদের থেকে আর্থিক সহায়তা আনার চেষ্টা শুরু করেন। অবশেষে আরব মুজাহিদগণ দেশভিত্তিক একাধিক মারকায প্রতিষ্ঠা করেন। আলজেরিয়ান মুজাহিদদের জন্য একটি, লিবিয়ানদের জন্য দুটি, ইরাকীদের জন্য একটি, সুদানীদের জন্য একটি এবং ইয়েমেনিদের জন্য দুটি মারকায

খোলা হয়। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামকে না জানিয়ে শামের মুজাহিদ ভাইয়েরাও বাইতুশ শুহাদা নামে একটি মারকাযের সূচনা করেন।

## আফগানিস্তান: মুসাফিরের নতুন ঠিকানা

সে সময় মাকতাবুল খিদমাত সম্পর্কে শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে প্রচুর অভিযোগ আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনিও বুঝতে পারেন, যে পদ্ধতিতে এতদিন সহায়তা পাঠানো হচ্ছিল, তা সঠিক ছিল না। তাছাড়া এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে যুদ্ধের ময়দানে যথাযথভাবে সহায়তা পৌঁছানোও সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ১৯৮৬ সালের শুরুর দিকে শায়খ নিজে স্থায়ীভাবে ময়দানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি আফগান জিহাদে নিজেদের অংশগ্রহণ আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামরিক কার্যক্রমও শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি নিজস্ব ট্রেইনিং ক্যাম্প ও স্বতন্ত্র সাপ্লাই লাইন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ মক্কা টানেল নির্মাণের সাথে জড়িত থাকায় এ বিষয়ে শায়খের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মুজাহিদদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রকল্প হাতে নেন। পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করেন এবং বিমান হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সুড়ঙ্গ ও পরিখা খনন করেন।

এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিন লাদেন কোম্পানির দায়িত্বে থাকা তাঁর ভাইদের থেকে সহায়তা নেন। তারা খনন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ট্রাক, বুলডোজার ও জেনারেটর পাঠিয়ে ব্যাপক সাহায্য করেন। এ ব্যাপারে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

> ‘আফগান-সফর থেকে ফেরার পর সেখানকার মুজাহিদদের জন্য সুরঙ্গ ও রাস্তার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমি আরও নিশ্চিত হই। সেখানে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। যেগুলো আছে, সেগুলোও সংকীর্ণ। বিমানহামলা থেকে দূরে পাহাড়ে নিরাপদ অস্ত্রের গুদাম, আহতদের চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিশ্রামাগার তৈরির জন্য সুড়ঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করার সাথে সাথেই কিছু মানুষের বাধার সম্মুখীন হই। তারা সাধারণ কোনো মানুষ ছিলেন না, সবাই জিহাদ ও ইসলামকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তারপরও তারা বাধা দিয়েছিলেন। কারণ, মুসলিমরা আমেরিকা ও রুশ কাফেরদের প্রোপাগান্ডায় প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিল। তারা মনে করত, কাফেররা খুবই শক্তিশালী, তাদের পরাজিত করা সম্ভব না, তাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে, গোয়েন্দা বাহিনী আছে ইত্যাদি। এগুলোর অধিকাংশই ছিল অতিরঞ্জিত ধারণা। এই প্রোপাগাণ্ডায় যদি আমি প্রভাবিত হয়ে যেতাম, তাহলে আমার পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হতো না। তাই প্রথমে আমাকে বলা হলো, “তুমি এতসব ভারী সরঞ্জাম সৌদি থেকে বের করবে কীভাবে? এরপর বলা হলো, “এগুলো পাকিস্তানে প্রবেশ করাবে কীভাবে?” তারপরে

বলা হলো, "তুমি যেখানে কাজ করবে (জাজি), সেখানে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে চায় না। তারা শত্রুর কাছে গোপনে তথ্য পাচার করে। তুমি তো কোনো সাধারণ সাইকেল নিয়ে যাচ্ছ না। এই একেকটি যন্ত্রই তো ট্যাঙ্কের মতো বিশাল। বিশাল বিশাল এই যন্ত্র নিয়ে ঢোকার সাথে সাথে দেখবে বিমান এসে সেটা উড়িয়ে দেবে।" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! যদি সত্যিই এমন হয়, তবু আল্লাহ তাআলার সামনে তো বলতে পারব, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি।" কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সবকিছু খুব সহজেই হয়ে গিয়েছিল। সৌদি থেকে সরঞ্জামগুলো বের করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করানো এবং এখানে [জাজি] পৌঁছানো পর্যন্ত সবকিছু আল্লাহ তাআলাই সহজ করে দিয়েছেন। আমরা মুজাহিদদের নামে সৌদি রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে এগুলো প্রবেশ করিয়েছিলাম।'[৩৩]

অবশেষে শায়খ রহ. সশরীরে কাজ শুরু করেন। রাস্তা, বাঙ্কার ও গুহা তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি কিছু ভাইকে এ কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাছাই করেন। তাঁরা জাজি'র একটি জায়গায় নিজেদের ঘাঁটি গড়ে তোলেন। এর নাম দেওয়া হয় 'আল-আরীন' [সিংহের গুহা]। এভাবেই এই গল্পের সূচনা হয়।



শায়খ উসামা রহ. বুলডোজার দিয়ে নিজেই আফগানিস্তানের পাহাড়ে রাস্তা তৈরির কাজ করছেন

[৩৩] তালাকাতুন ফী সাবীলিল্লাহ: শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)।

## মা'সাদাতুল আনসার: মহিরুহের অঙ্কুরোদ্‌গম[৩৪]

আফগানিস্তান ও জেদ্দায় সাংবাদিক ইসাম দারাযকে শায়খ উসামা রহ. দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তাতে তানজীম আল-কায়েদার সূতিকাগার মা'সাদাতুল আনসারের সূচনার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন—

**الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،**

**أما بعد**

'আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা (তাহদীস বিন নি'মাহ) এবং মুমিনদের উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য বলছি, আমার ওপর আল্লাহ তাআলার বড় একটি অনুগ্রহ হলো, ১৩৯৯ হিজরীতে যখন শুনতে পেলাম, মুসলমানদের ভূমি আফগানে সোভিয়েত রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়েছে। আফগানে থাকা আমার মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার জন্য তখনই পাকিস্তানে গেলাম। এরপর পাকিস্তানে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকলাম, এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করলেন। তখন মুজাহিদদের অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। সৈন্যসংখ্যা ও সাজসরঞ্জাম—উভয় দিক দিয়েই তারা ছিলেন বিপর্যস্ত। বিশেষত যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্বল্পতা ছিল অনেক বেশি। আমি অনুভব করলাম, আফগান ভাইদের হক আদায়ের ব্যাপারে আমরা অনেক অবহেলা করেছি। তাঁদের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করলেই কেবল এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব। আর এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তাদের সাথে সরাসরি কিতালে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শাহাদাতবরণ করা।'

মা'সাদাতুল আনসার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

'আমি লক্ষ করলাম, আরব মুজাহিদদের উপস্থিতিতে আফগানরা অনেক আনন্দিত হয়। আরবদের উপস্থিতিতে আফগানদের ঈমানী শক্তি বেড়ে যায়, তাদের মনোবল মজবুত হয়। আরবদের প্রতি আফগানদের অধিক ভালোবাসার কারণে তারা আরবদের সাথে অতিথির মতো আচরণ করে। তাই যুদ্ধ ও সামরিক কোনো দায়িত্ব তারা আরবদের দেয় না। এ দিকে আরব যুবকরা অন্যান্য মুজাহিদের মতো কাজ করতে চাইত আর সুযোগ না পাওয়ায় তাদের মন খারাপ হতো। এই বিষয়টি বিবেচনা করে আরব মুজাহিদদের জন্য একটি মারকায শুরু করার চিন্তা করি, যেখানে এই যুবকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১৪০৪ হিজরীতে (১৯৮৪ খ্রি.) আফগান মুজাহিদদের সংগঠন আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর আমীরের সাথে কথা বলে অনুমতি নিই এবং আরব ভাইদের

[৩৪] ঘটনাটি ইসাম দারাযের মা'সাদাতুল আনসার বই থেকে সংগৃহীত।

প্রশিক্ষণের জন্য 'صدى - সদা' নামে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করি। ক্যাম্পটি সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায় খোলা হয়, যেন ভাইদের জন্য এখানে আসা সহজ হয়। তখন প্রায় ১০০ জন ভাই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ক্যাম্পে একত্র হন। এই সংখ্যা ছিল খুবই কম। কেননা তখন আরব যুবকরা প্রকৃত সম্মান, দীনের প্রতিরক্ষা আর জিহাদ থেকে বহু দূরে ছিল। অধিকাংশ যুবকই সে সময় জিহাদকে নফল ও মুবাহ ইবাদত মনে করত।

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। [কলেজ-ভার্সিটিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছিল।] গ্রীষ্মের শেষে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস শুরু হলো, তখন আমাদের সাথে থাকা অধিকাংশ ভাই লেখাপড়ার জন্য নিজ নিজ দেশে চলে গেলেন; অথচ তারা সবাই ছিলেন তুলনামূলক ভালো ও নির্বাচিত সাথি। মাত্র জনাদশেক সাথি আমাদের সাথে রয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এরপর আমরা [সীমান্ত এলাকা থেকে] আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে জাজি নামক স্থানে ট্রেইনিং ক্যাম্প স্থাপন করি। আমরা যা পারি, তা-ই অন্য ভাইদের শেখাতে থাকি। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। ততদিনে আমাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবারও একই ঘটনা ঘটল। শীত শেষ হতেই অধিকাংশ ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। [অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল,] দীনের সাহায্য করা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরিপক্ক বুঝ ভাইদের মধ্যে তখনও তৈরি হয়নি।

১৪০৬ হিজরীর শেষে, ১৪০৭ হিজরীর শুরুর দিকে (সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, আমরা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে এই জাজিতেই থাকব। সংখ্যা যতই কম হোক না কেন এই জায়গা আমরা ছাড়ব না। তখন আমরা ছিলাম মাত্র ১১ জন। অধিকাংশই ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনা মুনাওয়ারার। তাদের নামও আমার মনে আছে—শফীক বিন ইবরাহীম মাদানী, তালেব আব্দুল আযীয নাজ্জার (আবু কুতাইবা) সূরী আল-হামাবী মাদানী, ভাই উসামা বিন মোল্লা হায়দার মাদানী[৩৫] ওরফে উসামা আজমিরাই, ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত মদীনার বাসিন্দা ভাই আবু মুয়ায সাদী, ভাই আবু রজা হাসসান আনসারী, তিনিও মদীনার বাসিন্দা; ভাই আহমাদ হামুদ উসমান মিখলাফী, ভাই আলী সুদানী, ভাই মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সালাম ওরফে আবু আনীস এবং ভাই আহমাদ হুসাইন বখশী, তিনিও মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দা ছিলেন।

[৩৫] তিনি এখন আমেরিকার কারাগারে বন্দি আছেন। রামযি ইউসুফের সাথে বোজিঙ্কা অপারেশনের পরিকল্পনায় তিনিও শরীক ছিলেন। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় গ্রেফতার হন। এরপর তাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আমরা ছিলাম মাত্র ১১ জন। আফগান মুজাহিদদের জন্য রাস্তা তৈরি করা, পাহাড়ের মধ্যে সুরঙ্গ ও বাঙ্কার তৈরি করাই ছিল আমাদের কাজ। সে এলাকার সামরিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য শফীক রহ. ও উসামা হায়দার রহ.-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ভাইদের সবার বয়স ছিল বিশের কোঠায়। তারা পড়ালেখা ছেড়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য এসেছিলেন।

এভাবেই আমরা কাজ করছিলাম। এর মধ্যে একদিন শফীক ও উসামা হায়দার ভাই অনুসন্ধান করে আমাদের জানান, শত্রুবাহিনীর ছাউনির খুব কাছেই উঁচু একটি পাহাড় আছে। সেখান থেকে চাওনি দুর্গও দেখা যায়। কমিউনিস্টরা এই দুর্গ থেকেই পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপত্যকা শাসন করে। এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই পাহাড়ে কোনো মুজাহিদ নেই। পরে আমি নিজে সে জায়গাটি পরিদর্শন করে দেখি, বাস্তবেই পাহাড়টি খুব ভয়ানক ও গুরুত্বপূর্ণ। এত স্পর্শকাতর স্থানে হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোনো মুজাহিদ নেই কেন—তা জানার জন্য খোঁজ নিই। জানতে পারি, প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতে শীতকালে এখানকার রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া এলাকাটিতে ব্যাপক বোমাবর্ষণের ফলে যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছানোর উপায় থাকে না। এ কারণে এখানে মুজাহিদরা কখনো অবস্থান করেন না।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, যে মারকাযগুলো আমরা তৈরি করব, এর মধ্যে কেবল আরবদের জন্য বিশেষায়িত একটি মারকায থাকবে। অবশেষে এই দুর্গম পাহাড়েই সেই মারকাযটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিই। এর নাম দেওয়া হয় "মা'সাদাতুল আনসার" [আনসার সিংহদের অভয়ারণ্য]।

শীতকাল ছিল একদম দোরগোড়ায়। এখানে শীতকাল মানে হাড়হিম ঠান্ডা আর ভয়ংকর তুষারপাত। তখন চলাফেরা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে তাঁদের খোঁজ শুরু করি। অবশেষে আব্দুস সামী নামক প্রসিদ্ধ এক নেতার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হই। সে অঞ্চলের মধ্যভাগে শত্রু ছাউনির কাছেই তাঁর মজবুত অবস্থান ছিল। আমি এই আফগান নেতার কাছে আবেদন করি, তিনি যেন শীতে এই এলাকা ছেড়ে না যান; বরং এখানেই অবস্থান করেন। ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য তাদের বাঙ্কার তৈরি করে দেওয়ারও প্রস্তাব দিই, কিন্তু তিনি এ বলে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে এখানে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় পৌঁছানো সম্ভব হয় না। অবশেষে এই স্থান ত্যাগ না করার শর্তে তাঁকে পানি ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করার প্রস্তাব দিই।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অবশেষে মা'সাদাতুল আনসারের জন্য আমরা প্রথম তাঁবু স্থাপন করি। দিনটি ছিল ১৯৮৬ সালের ২৪শে অক্টোবর (১৪০৭ হিজরীর ২০শে সফর)। একই দিনে পাকিস্তান থেকে একটি গোরিয়নভ মেশিনগান ক্রয় করার মাধ্যমে সর্বপ্রথম অস্ত্র কেনা হয়, যা ভাই আজমিরাই নিয়ে আসেন। এই দিনটিকেই মা'সাদাতুল আনসার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হিসেবে ধরা যায়।

যখন মা'সাদাতুল আনসারের মারকায বানানোর কাজ শুরু করি, তখন আমরা মাত্র তিনজন ছিলাম। ভাই শফীক, উসামা মোল্লা হায়দার (আজমিরাই) ফা.আ. আর আমি। বাকিরা কেউ ছুটিতে ছিলেন আর কেউ অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় লোকবলের প্রয়োজন এতই বেশি ছিল যে, একজন ভাইও যদি আমাদের সাথে এসে যোগ দিতেন, তবে সেটাই অনেক সহায়ক হতো। একে তো অপরিচিত জায়গা, তার ওপর আফগান মুজাহিদদের থেকে দূরে এবং শত্রুদের খুব কাছে। তিনজন মিলে সব কাজ করা, আবার পাহারা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এক ভাই সাক্ষাৎ করতে এসে পরিস্থিতি দেখে কাজটি মুলতবি রাখতে বলেন। যখন সবাই আসবেন, তখন করার পরামর্শ দেন। তিনি শফীক ও উসামা ভাইকেও আলাদাভাবে বোঝান। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা রহমত হিসেবে দুইজন ভাইকে পাঠিয়ে দেন। তারা আফগানের অন্য এক ময়দানে যাচ্ছিলেন। পথে আমাদের সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবু যাহাব; মিশরীয় বংশোদ্ভূত সুদানের নাগরিক ছিলেন তিনি। বিশ্রাম শেষে রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে আমার কাছে এসে বললেন, তারা আমাদের সাথেই থাকতে চান। তার কথা শুনে আমি যারপরনাই খুশি হই এবং তাদেরকে আমাদের সাথে রেখে দিই। মারকায বানানোর জন্য যে স্থানটি নির্ধারণ করেছিলাম, সেখানে যাওয়ার রাস্তাটি ছিল একেবারে খোলামেলা। শত্রুরা খুব সহজেই আমাদের দেখতে পেত এবং গোলাবর্ষণ করত। আমরাও দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়তাম। কিছুক্ষণ পর আবার নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতাম।

এই সময়টি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে চমৎকার সময়। একদিকে শত্রুর খুব কাছে থেকে রিবাতের দায়িত্ব পালন করতাম। অন্যদিকে রাস্তা নির্মাণ, বাঙ্কার তৈরির কাজও করতাম। সবাই আমরা এক তাঁবুতেই থাকতাম। এর মধ্যে যবীহ মুহাম্মাদ বিন মুবারক নামে তায়েফের এক ভাই আমাদের সাথে এসে যোগ দেন। নামায, খাওয়া-দাওয়া-সহ সবকিছু একসাথেই করতাম, পালাক্রমে পাহারাও দিতাম। জায়গাটি একেবারে জনমানবশূন্য হওয়ায় সবাই আতঙ্কে থাকতাম। কেউই তাবু থেকে বেশি দূরে যেতে সাহস পেতাম না। একে তো আশপাশে ছিল নির্জন গভীর বন, তার ওপর শত্রুশিবির ছিল একেবারে কাছে। এভাবেই সময় কাটছিল। কিন্তু লাগাতার পাহারা দেওয়া ধীরে

ধীরে আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে আমাদের এক ভাইকে আসতে বলি। ভাই সালেহ গামেদী ওরফে হামযা গামেদী (সালেহ সাইদ আলে বাতিহ) আমাদের সাথে যোগ দেন। এভাবে আমাদের সংখ্যা বেড়ে ৭ জন পর্যন্ত পৌঁছায়। সাথে সাথে আমাদের আশা আরও বেড়ে যায় যে, আমাদের সংখ্যা আরও বাড়বে। দুই মাসের মধ্যে আমাদের সংখ্যা চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এরপর ভাই আবু হানীফা হুসাইন উজাইব আসেন। তার কিছুদিন পর আসেন মুহাম্মাদ সাখরি। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা একজন মানুষ। তাঁর অভিধানে দ্বিধা বলে কোনো শব্দ ছিল না। সৌদি থাকাকালে যখন আফগান সফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তখন একদিন মসজিদে নববীতে ফজরের নামাযের পর তার সাথে দেখা হয়েছিল। আগেই ভাই আবু হানীফা আমাকে জানিয়েছিলেন, একজন ভাই (মুহাম্মাদ সাখরি) আফগানিস্তানে যেতে চান। তবে তিনি এ বছরের লেখাপড়া শেষ করে গ্রীষ্মের ছুটিতে যেতে চাচ্ছেন। আমি সাখরির সাথে দেখা করে কয়েক মিনিট কথা বলেছিলাম। এতেই তার সব দ্বিধা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং পরদিনই আমাদের সাথে আফগান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের কর্তব্য বোঝার সাথে সাথে লেখাপড়া, সার্টিফিকেট আর দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাদের সাথে তিনি চার বছরের মতো ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নেন, তিনি জালালাবাদে শাহাদাতবরণ করেন।'

শায়খ উসামা রহ.-কে মা'সাদাতুল আনসারের নামকরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

'জায়গাটির কী নাম রাখা যায়—তা নিয়ে ভাইদের সাথে পরামর্শ করি। ভাইয়েরা কয়েকটি নাম বাছাই করেন। তার মধ্য থেকে মা'সাদাহ (مأسدة - সিংহের অভয়ারণ্য) নামটি সকলের পছন্দ হয়। এই নামটি আমরা এক সাহাবীর একটি কবিতার চরণ থেকে গ্রহণ করেছি, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রচনা করেছিলেন। কবিতার চরণটি হলো,

**من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا ... كمعمعة الإباء المحرق**

আগুনে পুড়তে থাকা বাঁশের ন্যায় কলরোল সৃষ্টি করে উদ্ধত তরবারির সংঘাত দেখতে যে পছন্দ করে,

**فليأتِ مأسدة تسن سيوفها ... بين المذاد وبين جزع الخندق**

সে যেন এই মা'সাদায় [সিংহের অভয়ারণ্যে] আসে, যেখানে তরবারি শান দেওয়া হয় মাযাদ ও খন্দকের মধ্যবর্তী স্থানে।[৩৬]

[৩৬] খন্দক যুদ্ধের দিন কাব বিন মালেক রাযি. এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন।

কিছুদিন পর ভাই আবু হানীফা জিহাদের প্রতি যুবকদের উদ্‌বুদ্ধ করতে ফিরে যান। ২৩ দিন পর ২৩ জন যুবককে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। এভাবে আমাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং আমরাও আমাদের এই একতাবদ্ধতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করি। ভাইয়েরা আমাকে প্রশ্ন করেন, কেন আমরা আফগান মুজাহিদদের থেকে আলাদা হয়ে এখানে জমায়েত হয়েছি? অবশ্যই এই আলাদা হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। একজন ভাই যখন জিহাদ করার জন্য নিজ দেশ থেকে হিজরত করে এখানে আসেন, তখন তার সামনে একসাথে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে অচেনা জায়গায় ভাষা না জেনে জিহাদ কীভাবে করবেন—তা নিয়ে বিপাকে পড়ে যান। তখন স্বদেশি ভাইদের পাশে পেলে তারা সাহস পান।'[৩৭]

## শাবান মাসের লড়াই: ১৪০৭ হিজরী, এপ্রিল ১৯৮৭[৩৮]

মা'সাদাহ প্রতিষ্ঠার সময় সাতটি কামরা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই কামরাগুলোতে মোট ৭০ জনের মতো যুবক অবস্থান করতেন। কুরবানী ও শাহাদাতের জন্য প্রত্যেকেই ছিলেন সদা প্রস্তুত। কামরাগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো। খাদ্য ও অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য দুটি, রান্নার জন্য একটি, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান সংরক্ষণের জন্য একটি, কমান্ড রুম হিসেবে একটি, মারকাযে বদর ও তায়েফ নামে সাধারণ কাজে ব্যবহারের জন্য দুটি কামরা নির্ধারিত ছিল। অপারেশন শুরু করার জন্য যুবকরা শায়খ উসামার কাছে বারবার আবেদন করতেন আর শায়খ তাদের সবর করতে বলতেন। প্রথমে মজবুত আশ্রয়স্থল ও অবস্থান নির্মাণের গুরুত্বের ব্যাপারে তাদের বোঝাতেন। কাজটি শায়খ উসামা রহ.-এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। যুবকদের জন্যও এভাবে দীর্ঘ সাত মাস শত্রুর একেবারে সামনে অবস্থান করেও কোনো অভিযান না করে আশ্রয়স্থল ও বাঙ্কার তৈরির কাজ করা ছিল আরও কঠিন।

একবার শীত শেষে বরফ গলা শুরু হলো। শায়খ উসামা তখন কোনো কাজে পেশোয়ারে গিয়েছিলেন। শায়খ আবু হাজের ইরাকী ফা.আ. মা'সাদার দায়িত্বে ছিলেন। শায়খ উসামার অনুপস্থিতির সুযোগে যুবকরা শায়খ আবু হাজেরকে অপারেশনের জন্য পীড়াপীড়ি করা শুরু করে। টানা তিনদিনের পীড়াপীড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই তিনি ছোট একটি অপারেশনের অনুমতি দেন। এ বিষয়ে শায়খ আবু হাজের বলেন, 'টানা তিনদিন পীড়াপীড়ি করে তারা আমাকে নিরুপায় বানিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে তাদের দাবি মেনে নিয়ে অপারেশনে বের হতে রাজি হই। শায়খ তামীমের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি আমাদের রেখেই পাহাড়

---

[৩৭] মা'সাদাতুল আনসার: ইসাম দারায।

৩৮ ইসাম দারায লিখিত মা'সাদাতুল আনসার থেকে সংগৃহীত।

থেকে নেমে যান। আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম, তারা বলাবলি করছিল, শায়খ তামীম তাদের বলে গেছেন 'আগামী মোলাকাত হবে জান্নাতে'। তাদের কথাবার্তা শুনে আমি একটু হাসলাম। কিতাল এত সহজ হয় কীভাবে?' আবু মুহাম্মাদ সূরী ছিলেন এই অভিযানের বিপক্ষে। শায়খ আবু হাজের তাকে বলেছিলেন, 'আবু মুহাম্মাদ, আপনি পেরেশান হবেন না। যদিও আমি জানি কাজটি ঠিক হচ্ছে না, তবু আমি তাদের সাথে যাচ্ছি। তারা একাকী যাওয়ার চেয়ে আমার সাথে গেলেই বেশি ভালো হবে।' এই অভিযানে ভাই আহমদ যাহরানী মর্টারের গোলার আঘাতে শহীদ হন। তিনি ছিলেন তায়েফের নাগরিক। তিনিই ছিলেন মা'সাদার প্রথম শহীদ। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ২০ বছর।

শায়খ উসামা রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, মা'সাদার প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার পর শত্রুর ওপর বড় ধরনের আঘাত হানবেন। কাঙ্ক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরির পর ভাইয়েরা শত্রুর ওপর হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। ১৭ই শাবান ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭ সালে মা'সাদার আরব যুবকদের নেতৃত্বে প্রথম আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণের মূল পরিকল্পনা করেছিলেন অফিসার আবু খালেদ। তিনি ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের একজন নেতা ছিলেন। এ ছাড়াও মিশরীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবেও কাজ করেছিলেন। আবু খালেদের পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে আর্টিলারির কভার নিয়ে মা'সাদার সবচেয়ে কাছের দুটি শত্রুঘাঁটি দখল করা হবে। তারপর গনীমত সংগ্রহ করে ঘাঁটিদুটি উড়িয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করাই ছিল এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য। ১২০ জন আরব যুবক এতে অংশ নিয়েছিল। আবু উবায়দা পানশীরী ও শায়খ আবু হাফস কমান্ডার মিলে টার্গেট নির্ধারণ করেন এবং অপারেশনের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শায়খ উসামা রহ. ভাইদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ছোট ওয়ারলেস দেন। এর ফলে যে-কোনো প্রান্তে যে-কোনো সময় মুজাহিদদের নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়ে যায়। আফগান যুদ্ধে সেবারই প্রথম ওয়ারলেস ব্যবহার করা হয়। এ যুদ্ধে শায়খ উসামা রহ. ভাইদের পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তিশালী বাইনোকুলারও সরবরাহ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল নাইট ভিশন বাইনোকুলার। এভাবেই ভাইয়েরা এই এলাকায় প্রথম শক্তিশালী নজরদারি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

মুজাহিদদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ রাখা হয় পেছন থেকে মা'সাদাকে রক্ষা করে শত্রুর ওপর গ্রাউন্ড টু গ্রাউন্ড মিসাইল (GGM) নিক্ষেপ করার জন্য। তাদের দায়িত্বে ছিলেন শায়খ আবু বুরহান সূরী। আর আবু খালেদ মিসরীর নেতৃত্বে আরেক ভাগকে শত্রুর ওপর সরাসরি হামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

লাগাতার কয়েকদিন চিন্তাভাবনা করে হামলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এটি ছিল আরবদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. উপস্থিত ছিলেন, শায়খ তামীম আদনানী রহ.-ও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ছয়টায় অপারেশন শুরু হয়। শত্রুদের প্রথম সারির প্রতিরক্ষা পোস্টগুলোকে টার্গেট করে যুবকরা আঘাত হানে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়। এতে তাদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও এই অপারেশনে যুবকরা শত্রুদের কোনো ক্যাম্প জয় করতে পারেনি। কারণ অপারেশনের শুরুতেই কমান্ডার আবু খালেদ আঘাতপ্রাপ্ত হন। আবু সাহল মিসরীও আহত হন। তারা উভয়ে অপারেশনের শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের বাইরেই ছিলেন। শত্রুদের একদম কাছে ছিল শফীক ভাইয়ের ইউনিট। তার সাথে ৮ জন আরব মুজাহিদ ছিল। তাদের মধ্য থেকে চারজনই আহত হয়ে ফিরে আসে। এতে পুরো অপারেশনের ওপর বিশাল প্রভাব পড়ে। পরে শায়খ আবু উবায়দা পানশীরী নেতৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেন আর তার সহকারী হিসেবে থাকেন শায়খ আবু হাফস কমান্ডার।

বিশেষ কিছু কারণে এ অপারেশনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, যখন অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সময় নির্ধারণ করা হয়, তখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ—বিশেষত গোলাবারুদের—পরিপূর্ণ ব্যবস্থা হয়নি। গোলাবারুদ যতটুকু ছিল, তা-ও সকল ইউনিটের কাছে যথাসময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় এমন হয়েছিল। যার কারণে আক্রমণকারী টিমের কাছে যথাসময়ে গোলাবারুদ পৌঁছায়নি, ফলে গোলাবারুদের অভাবে নির্ধারিত সময়ে আক্রমণ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

আবু মুহাম্মাদ সূরী বলেন—

> ‘আমি আক্রমণকারী ইউনিটের সদস্য ছিলাম। শত্রুর একটি ক্যাম্পকে আমরা “উম্মুল খানাদিক” নামে ডাকতাম। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা এই ক্যাম্পে আক্রমণ করব। সে মতে সামনে অগ্রসর হয়ে ক্যাম্পের খুব কাছে চলে যাই। শত্রু থেকে যখন আমরা ৩০/৪০ মিটার দূরে, তখনই বুঝতে পারি শত্রু পরিপূর্ণ সতর্ক অবস্থায় আছে। এতে আমরা একটু ঘাবড়ে যাই। শত্রুর যে দুটি ক্যাম্পে আমাদের আক্রমণ করার কথা ছিল, সে দুটি ছাড়া আশপাশের ১৬টি ক্যাম্প লক্ষ্য করে মুজাহিদরা তখন গোলাবর্ষণ করছিল। এভাবেই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমরা ধারণা করেছিলাম, অন্য ক্যাম্পগুলোর ওপর হামলা হলে শত্রুরা সেখানে ব্যস্ত থাকবে আর এই সুযোগে আমরা এই দুটি ক্যাম্প দখল করে নেব। কিন্তু আমাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে শত্রুরা সবগুলো ক্যাম্পেই সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাই আমরা ক্যাম্পের কাছাকাছি যেতেই বৃষ্টির মতো

গুলিবর্ষণ শুরু হয়। অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা মাথা-ই ওঠাতে পারিনি। আক্রমণের শুরুতেই আমার দুই পায়ে গুলি লাগে। যে জায়গায় আমরা অবস্থান করছিলাম, তার ঠিক বাম দিকে খোলা টিলার ওপর থেকে শত্রুবাহিনীর গোরিউনোভ (Goryunov) মেশিনগান থেকে অনবরত ফায়ার করা হচ্ছিল। আমরা জানতামই না যে, এখানে শত্রুর মেশিনগান আছে। একটু সামনে এগোতেই বাম দিক থেকে হঠাৎ গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ায় আমরা আঁতকে উঠি। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি ধাক্কা ছিল। এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় মূলত এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পর সবচেয়ে কাছের মারকাযে আমাদের ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হয়। শায়খ উসামা রহ. সেখানেই ছিলেন। ততক্ষণে যেহেতু আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, তাই সকলকে পিছু হটার আদেশ জারি করা হয়, যেন কোনো ভাই প্রাণ না হারান। কিন্তু অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, তৎক্ষণাৎ কারো পক্ষে পিছু হটাও সম্ভব ছিল না। রাতের অন্ধকার নেমে আসলে ধীরে ধীরে সবাই গোপনে পিছু হটতে থাকেন। পাঁচটি ইউনিট ময়দানে সক্রিয় ছিল। তাদের মধ্য থেকে চারটি ইউনিট মা'সাদায় পৌঁছাতে পারে। একটি ইউনিট পথ হারিয়ে ফেলায় মা'সাদায় পৌঁছাতে পারেনি। মধ্যরাত পর্যন্ত তারা নিখোঁজ ছিল। এই যুদ্ধে আমি ও ইদরিস ভাই আহত হয়েছিলাম।'

এরপর শায়খ আবু উবায়দা পানশীরীর নেতৃত্বে পূর্ণ একমাস লাগাতার অপারেশন চালানো হয়। ১৭ই রমযানের লড়াই পর্যন্ত মোট নয়টি সংঘর্ষ ও খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সকল অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এর মধ্যে একবার টহল দেওয়ার সময় তিনজন ভাইয়ের মাঝখানে একটি বোমা এসে পড়ে। এতে আবু যাহাব ভাই শাহাদাতবরণ করেন এবং আজমিরাই ভাই আহত হন। এই লড়াই চলাকালে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে শত্রুবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। এতে ৪৫ জন সৈনিক ও অফিসার হেকমতিয়ারের অনুগত আল-হিযবুল ইসলামীর এক নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

## রমযানের লড়াই: ১৪০৭ হিজরী, জুন ১৯৮৭[৩৯]

এই যুদ্ধ সম্পর্কে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

'মা'সাদাহ প্রতিষ্ঠার পর বড় এক অধ্যায়ের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে শুরু করি। ১৪০৭ হিজরীর রমযান মাসে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু তথ্য পাই। তবে এ

[৩৯] ইসাম দারায লিখিত মা'সাদাতুল আনসার থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত।

ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পরিখা তৈরির কাজে মনোনিবেশ করি। আনুমানিক ১৪ই রমযানের দিকে আমরা একটি অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নিই। সে সময় আফগান নেতা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার সেই এলাকায় ছিলেন। শায়খ সাইয়াফও সেখানে উপস্থিত হন। পরে আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ২৬শে রমযান আক্রমণের পরিকল্পনা করি। নির্ধারিত সময়ে পাহাড়ের ঢালুর দিকে অবস্থিত শত্রুবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করি। জবাবে দূরের একটি জায়গা থেকে আমাদের দিকে বিএম-২১ রকেট লাঞ্চারের গোলা আসতে শুরু করে।

এই যুদ্ধ প্রায় তিন সপ্তাহ চলতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছিল, শত্রুবাহিনী আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। অন্যদিকে আমরা কেবল এক দিনের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। শত্রুদের লক্ষ্য ছিল, এই ক্যাম্প (মা'সাদাহ) ধ্বংস করে আফগানিস্তানে সাহায্য আসার প্রধান রাস্তা জাজির সীমান্তপথ বন্ধ করে দেওয়া। মূলত আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হতে দেখে প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ সেনাবাহিনীকে আফগান থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত জেনারেলরা শেষবারের মতো একটি সুযোগ চেয়ে নিয়েছিল এবং একে নিজেদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। জেনারেলরা প্রেসিডেন্টকে এ আশ্বাসও দিয়েছিল যে, তারা মুজাহিদদের পাকতিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে পাক-আফগান সীমান্তের খাইবার পাস পর্যন্ত দখল করে নেবে। এই লড়াইয়ে সফল হলে সোভিয়েত জেনারেলগণ গর্বাচেভের সাথে নেওয়া চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হতে পারত। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদদের মাত্র ৭০ জনের একটি দল তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। কলেজপড়ুয়া, অল্পবয়সি, হালকা-পাতলা গড়নের এই আরব যুবকগুলো পিকে মেশিনগান হাতে রুশ বাহিনীর আগ্রযাত্রা রুখে দেয়। তাদের একটি ফায়ারেই রুশ কমান্ডো বাহিনীর তিন-চারজন সৈন্য অনায়াসে কুপোকাত হচ্ছিল। অথচ [রুশ বাহিনী এতটাই সতর্ক ছিল যে, জোরে কোনো কথাও বলত না।] পাখির আওয়াজের মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ করত। এমনকি তারা ছদ্মবেশ ধারণে এতটাই পারদর্শী ছিল যে, হঠাৎ সামনে চলে আসায় অনেক যুবকই চিনতে না পেরে হকচকিয়ে যেত।

লড়াইটি বাস্তবিক অর্থেই অনেক কঠিন ছিল। এতে রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী অংশগ্রহণ করেছিল। পুরো এলাকাটিকে অসংখ্য সৈন্য ও আর্টিলারি দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চেয়েছিলেন, মুমিন বান্দারা বিজয়ী হবে। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছিল এবং সত্য হয়েছিল আল্লাহর এই বাণী—

إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ

'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না।' [সূরা আলে ইমরান (৩): ১৬০]

كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةَۢ كَثِيرَةُۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

'এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয়।' [সূরা বাকারা (২): ২৪৯]

## শায়খ উসামার জবানিতে রমযানের লড়াই[৪০]

এ যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শায়খ রহ. বলেন—

'২৯শে রমযান আফগান সরকার ও রুশ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হয়। আমরা জানতে পারি, অগ্রবর্তী বাহিনীর সংখ্যাই ১০ হাজারের কাছাকাছি। এদের মধ্যে রাশিয়ান বাহিনীর তিনটি রেজিমেন্টের পাশাপাশি রাশিয়ান কমান্ডোও আছে। শত্রুবাহিনী আমাদের দিকে আসতে শুরু করে। ট্যাংকগুলো যখন মুজাহিদদের ফায়ারিং রেঞ্জে প্রবেশ করে, আমরা বিসমিল্লাহ বলে তাকবীর দিয়ে আক্রমণ শুরু করি। ওয়ারলেসে সকল আর্টিলারি ইউনিটকে একযোগে আক্রমণ করার সংকেত প্রেরণ করি। সকল ইউনিট থেকে একসাথে তাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হয়। আমি ঘাঁটি থেকে হামলার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত বোমা শত্রুদের ওপর পড়ছিল আর তাদের সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল।

হামলার প্রচণ্ডতায় পাহাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমাদের কোনো ভাই আহত হননি। মাগরিব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। ঘাঁটি থেকে ফিরে এসে আমি ভাই আবু উবায়দা পানশীরীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি কুরআনের হাফেয ছিলেন। আমরা বুঝতে পারি, রুশ বাহিনী আজকের আক্রমণের পর চুপ করে বসে থাকবে না। আগামীকাল তারা আরও তীব্র আক্রমণ করবে। এ জন্য আমরা ৩০ জন আরব মুজাহিদকে আমাদের পেছনের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা তখন ৭০ জনের মতো ছিলাম।

[৪০] প্রাগুক্ত

যা অনুমান করেছিলাম, পরদিন ঠিক তা-ই ঘটে। দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে প্রচণ্ড বোমা হামলা শুরু হয়। মা'সাদায় ৪০ জনের মতো ভাই অবস্থান করছিলেন। আমি নয়জন ভাইকে সাথে নিয়ে আল-মুতাকাদ্দিমা নামের একটি গুহায় অবস্থান করছিলাম। গুহাটি ছিল অনেক ছোট। ভারী বোমার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। শত্রুরা বিমান থেকে হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা [আশপাশে] নিক্ষেপ করছিল। ক্ষণে ক্ষণেই পাহাড়গুলো কেঁপে উঠছিল।

আমরা আগেই ভাইদের সাথে কথা বলে একটি সংকেত ঠিক করে রেখেছিলাম, যখন ভাইয়েরা বুঝতে পারবেন, শত্রুবাহিনী ঘাঁটি ঘেরাও করবে, তখন তারা পরপর তিনবার ফায়ার করবেন। হঠাৎ ডান দিকের বদর মারকায থেকে সাইফুল্লাহ মাগরিবী ভাই আমাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, বিশেষ বাহিনীর পোশাক পরিহিত প্রায় দু'শ রাশিয়ান সৈন্যকে তিনি গোপনে ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। তখন ভাই সতর্ক সংকেত অনুযায়ী পরপর তিনবার ফায়ার করেন। সাথে সাথে আমি মুজাহিদদের প্রধান ঘাঁটিতে সংবাদ প্রেরণ করি যে, শত্রুরা ঘাঁটি ঘেরাও করার জন্য এগিয়ে আসছে, তোমরা প্রস্তুত হও। এরপর আমার সাথে থাকা ভাইদেরকে অস্ত্র নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে বলি। আমরা ছিলাম মাত্র ১০ জন। কিন্তু, ভাইয়েরা ভীত না হয়ে সামনে আগানো শুরু করেন। তারা জানতেন, শত্রুর সংখ্যা দু'শর কাছাকাছি।

আমরা কেউই প্রশিক্ষিত সৈনিক ছিলাম না; সবাই ছিলাম সাধারণ মানুষ। তারপরও কেউ বিচলিত হইনি। আল্লাহ তাআলা সকলকে সম্মানিত করুন। সকলে অস্ত্র হাতে সামনে আগাতে থাকি। আমাদের টার্গেট ছিল, কোনো উঁচু টিলা থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ করা। শত্রুর নজর এড়াতে ভাইদের কয়েক দলে ভাগ করে দিই। ভাই যবীহ ও আবু সাহল মিসরী রহ.-কে একটি ওয়ারলেস দিয়ে আল-মুতাকাদ্দিমা গুহায় রেখে যাই। ভাই আবু হানীফার সাথে কয়েকজন ভাইকে ডান দিকে যেতে বলি। আর বাকিদের নিয়ে আমি সামনের দিকে এগিয়ে একটি টিলার চূড়ায় উঠে পড়ি। আমরা ছিলাম মাত্র তিনজন। খিযির ভাই ও মুখতার ভাই (দুজনেই দাম্মামের বাসিন্দা) আর আমি। কিছুক্ষণ পর খালেদ কুর্দি এসে আমাদের সাথে যুক্ত হন। আমি তাকে পানি, খেজুর ও আরপিজির জন্য আরও কিছু গ্রেনেড আনতে পাঠাই। তিনি চলে যাওয়ার পর আবারও আমরা তিনজন হয়ে যাই। দুইশত কমান্ডোর সামনে আমরা মাত্র তিনজন কী আর করব? কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের তিনজনকেই দৃঢ়পদ রাখেন। সুবহানাল্লাহ, আমাদের মধ্যে

ভীতি বা উৎকণ্ঠার লেশমাত্র ছিল না। অথচ আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম, এই বাহিনীর বিশেষ টার্গেট হলো আমাকে বন্দি করা।

প্রত্যেকের মাঝে দশ মিটারের মতো দূরত্ব রেখে আমরা তিনজন টিলার ওপর এমনভাবে অবস্থান নিই, যেন একে অপরকে দেখতে পারি। পরিস্থিতি দেখে অন্য ভাইদের কাছে সাহায্য চাই। কিন্তু তারা আমাদের থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টার দূরত্বে ছিলেন। তখন খিযির ভাই এসে আমাকে বললেন, মুখতার ভাই টিলার নিচে গাছপালার মধ্যে খুব কাছ থেকে রুশ বাহিনীর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। আমরা তখন সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সাহায্য আসার আগেই রুশ বাহিনী এসে পড়েছিল। সাথে সাথে আমি সবাইকে টিলার চূড়ায় একত্র হতে বলি। ঠিক এমন মুহূর্তে খালেদ ভাই এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। আবু উবায়দাও এসে পৌঁছান। তিনি এখানে আসার আগেই বদর ক্যাম্প থেকে একটি ইউনিটকে শত্রুর আগ্রগামী বাহিনীকে থামানোর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা বামদিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর শত্রুরা ডানদিক দিয়ে আসছিল। কিছুদূর এগিয়ে আমরা একটি টিলায় উঠি। টিলাটি আয-যাহরানী নামে পরিচিত ছিল। আহমাদ যাহরানী রহ. এই টিলার ওপর শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাই টিলার এই নাম। টিলার নিচে শত্রুদের দেখতে পেয়ে তাদের ওপর আক্রমণের জন্য হ্যান্ড গ্রেনেড বের করি। শত্রুরা আমাদের নিচে থাকায় আমরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলাম। গ্রেনেড প্রথমে আমিই বের করি। কিন্তু ভাই আবু উবায়দা বলেন, শত্রুদের সবাই পরিপূর্ণভাবে আমাদের আওতায় আসা পর্যন্ত যেন বিলম্ব করি। এরমধ্যে হঠাৎ চারজন মুজহিদ ভাই আমাদের সাহায্যে এসে উপস্থিত হন, অথচ তাদের কেউ আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতেন না। ভাইদের পায়ের আওয়াজ শুনে রুশ বাহিনী সতর্ক হয়ে যায়। তারা ধারণাও করতে পারেনি, এখানে কোনো মুজাহিদ থাকতে পারে। তারা ভেবেছিল, লাগাতার পাঁচদিন বোমা হামলার কারণে মা'সাদার সবাই হয় নিহত বা আহত হয়েছে।




২৬শে মে ১৯৮৭ সালের জাজির রণক্ষেত্র[৪১]

[৪১] মাআরিকুল বাওয়্যাবতিস সাখরিয়্যাহ: আবুল ওয়ালীদ মিসরী

রুশ বাহিনী আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধীরে ধীরে সে জায়গা থেকে সরে যেতে শুরু করে। মা'সাদাহ ক্যাম্প থেকে এত আগে মুজাহিদদের দেখে তারা ভড়কে গিয়েছিল। এখানেও কেউ থাকতে পারে—তারা কল্পনাও করেনি। তাদের ফেলে যাওয়া ওয়ারলেসে কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারি, আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে তাদের আর্টিলারি ইউনিটকে জানিয়ে দিয়েছে। রুশ আর্টিলারি ইউনিট সামনে যা পায়, তা-ই তছনছ করে ফেলে। আমি হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে তাদের অপেক্ষা করতে থাকি। ততক্ষণে পলায়নরত সৈন্যরা প্রায় দু'শ মিটার পেছনে সরে গিয়েছে। ঠিক তখনই আমাদের ওপর বৃষ্টির মতো মর্টার হামলা শুরু হয়। হামলা এতটাই তীব্র ছিল, নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না।

প্রায় এক ঘণ্টার মতো বিরতিহীন ভারী বোমাবর্ষণ চলে। এরই মাঝে মিনিটখানেকের জন্য হামলা বন্ধ হলে আল্লাহর রহমতে আমরা সেখান থেকে সরে আসি এবং আমাদের ক্যাম্পের সীমানার ভেতরে একটি জায়গায় তাদের জন্য অ্যাম্বুশ তৈরি করি। বিরতিহীন এই বোমা হামলার পর তারা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এই টিলায় কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। তাই অনেকটা নির্বিঘ্নেই ওপর উঠতে থাকে। টিলার ওপরে আসতেই আমরা তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করি। এতে তাদের কয়েকজন সৈন্য নিহত হয় আর বাকিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা বিমানবাহিনীর সহায়তা তলব করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটি যুদ্ধবিমান এসে মিসাইল নিক্ষেপ করা শুরু করে। এর সাথে কিছু স্মোক গ্রেনেডও নিক্ষেপ করা হয়। চারদিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় ভাইদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, এগুলো কোনো বিষাক্ত গ্যাস কি না। পরে অবশ্য বুঝতে পারি, এগুলো সাধারণ স্মোক গ্রেনেড। দীর্ঘ সময় ধরে হামলা চলতে থাকায় সকলেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অবশেষে হামলা থেকে বাঁচার জন্য পেছনের এক ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

আমরা রাতে সেখান থেকে চলে আসি। মা'সাদায় তখন শুধু আফগান ও আরব ভাইদের একটি ইউনিট অবস্থান করছিল। আল্লাহর রহমতে ততক্ষণে আফগান মুজাহিদদের পক্ষ থেকে সাহায্য চলে এসেছিল। তারা রাশিয়ান কমান্ডো বাহিনীর ওপর লাগাতার ৩৫টি আরপিজি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। কমান্ডো বাহিনীর ধারণা ছিল, ক্যাম্পে যারা আছে সবাই আহত। কিন্তু মুজাহিদদের এই আচমকা হামলায় তাদের ধারণা বদলে যায়। তারা ধরে নেয়, মা'সাদার ভেতরে এখনো অনেক বড় বাহিনী আছে। তাই তারা আক্রমণ বন্ধ করে ক্যাম্পে বসেই রাত কাটিয়ে দেয়। আসলে তারা আমাদের ক্যাম্পের ওপর হামলা করতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে ক্যাম্পে তখন বড় কোনো বাহিনীই ছিল না। সবই আল্লাহ তাআলার দয়া।

সকালে ভাইদের দুই দলে ভাগ করে দিই। একদল মা'সাদায় চলে যায়, আরেকদল মাঝপথে অপেক্ষা করতে থাকে। আমরা রাস্তা ও আশপাশ পরিদর্শন শেষে তাদেরকেও ক্যাম্পের (মা'সাদাহ) দিকে অগ্রসর হতে বলি। ওই জায়গাটিকে পুরো অঞ্চলের হৃৎপিণ্ড মনে করা হতো। তাই জায়গাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে শত্রুরা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিল।

তখন ভাই আবু উবায়দা পরামর্শ দেন, তিনি ৮ জন ভাইকে সাথে নিয়ে রাশিয়ান বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে পেছন থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করবেন। আমি আবু উবায়দাকে বললাম, বাম পাশ তো খালি হয়ে যাবে। সেখানে কে থাকবে? তখন আমি অসুস্থ ছিলাম। হাঁটতেও অনেক কষ্ট হতো। কিন্তু ভাই আবু উবায়দা আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, আমি যেন বাম পাশে থাকি। কথামতো আমি বাম পাশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার সাথে মাত্র তিনজন ভাই ছিলেন। মুহাম্মাদ উতাইবী রহ. (আবুল ওয়ালীদ), ইয়াসিন কুর্দী ও আসাদুল্লাহ সানাদী।

ভাই আবুল হাসান মাদানী আমাদের দেখতে এসেছিলেন। এই মেহমান ভাইও আমাদের সাথে যুক্ত হন। আমরা ৫ জন মিলে শত্রুর বাম বাহুর দিকে রওনা করি। চতুর্দিক থেকে শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে ছিলাম আমরা। তবু অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে বাম দিকে যাত্রা শুরু করি। প্রত্যেকের হাত ছিল বন্দুকের ট্রিগারে। বাম পাশের সম্মুখভাগে পৌঁছাতেই পাঁচজন ভাইকে ডানে-বামে ভাগ করে দিই। ভাই আবু উবায়দা আরপিজি নিয়ে একাই ডান পাশে দাঁড়িয়ে যান। ভাই আসাদুল্লাহ গোরিউনোভ মেশিনগান (মাঝারি মানের মেশিনগান) নিয়ে বাম পাশে দাঁড়িয়ে যান। ইয়াসিন কুর্দী পেছন থেকে কভার দেন। মাঝখানে আমি আর আবুল হাসান মাদানী অবস্থান গ্রহণ করি। ভাইদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে না দিতেই দেখি রুশ বাহিনী [মা'সাদাহ] ক্যাম্পের সম্মুখভাগের কামরা থেকে মাত্র ৭০ মিটার দূরে অবস্থান করছে। আমরা ছিলাম কামরার পেছন দিকে। তখনই তাদের সাথে আমাদের হালকা গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকি। ইয়াসিন কুর্দী ও আবুল ওয়ালীদকে সামনে অগ্রসর হয়ে বাম দিক থেকে আক্রমণ করতে বলি, যেখানে রুশ সৈন্যদের দেখতে পেয়েছি। আমাদের হামলার জবাবে শত্রুরা ক্লাকোভ [একে-৭৪] দিয়ে গুলি করতে শুরু করে। ক্লাকোভের [একে-৭৪] শব্দ কালাশনিকভ [একে-৪৭] থেকে অনেকটা আলাদা। এটি রাশিয়ার স্পেশাল ফোর্সের অস্ত্র হিসেবে পরিচিত আর কালাশনিকভ হলো আফগান কমিউনিস্ট বাহিনীর অস্ত্র।

ঈদের দিন এমন প্রতিরোধের মুখে পড়ে রুশ কমান্ডো বাহিনী একটু অবাক হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা পিছু হটতে শুরু করে। তাদের এক দল অন্য দলকে কভার দিচ্ছিল। [আমরা শত্রুদের বাম পাশ দিয়ে পেছনে চলে এসেছিলাম। তাই শত্রু যখন পিছু হটতে শুরু করে,] তখন ইয়াসিন ও আবুল ওয়ালীদ ভাইকে [আমাদের অবস্থান থেকে] ১৫০

মিটারের ভেতরে আক্রমণ করতে বলি। আমার ধারণা ছিল, তারা পিছু হটতে হটতে এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তখন পর্যন্ত আমি ভাবছিলাম, আক্রমণ শুধু বাম দিক থেকে আসবে। কিন্তু যখন ওয়ারলেসে কথা বলার জন্য টিলার চূড়ায় উঠি। তখন আচমকা শত্রুদের মধ্যবর্তী স্থান থেকে আমার দিকে আরপিজি থেকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। গ্রেনেডটি আমার পাশ দিয়ে গিয়ে কাছেই বিস্ফোরিত হয়, তবে আমার গায়ে এর কোনো আঁচড় লাগেনি। মনে হচ্ছিল সামান্য মাটি আমার ওপর ঝরে পড়েছে। আমি শান্তভাবে নিচে নেমে ভাইদের জানাই, শত্রুরা কেবল বাম দিকে নয়, মাঝখানেও আছে।

আবু উবায়দার সাথে যে দলটি রুশ বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্য গিয়েছিল, আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। অনেকবার চেষ্টা করেও কোনো সাড়া পাই না। তাদের নিয়ে চিন্তা হতে থাকে। যোগাযোগের চেষ্টা বন্ধ করলেও ওয়ারলেস খোলা রেখে দিই। এরই মধ্যে শত্রুরা আবার নতুন করে এই স্থানে বৃষ্টির মতো ট্যাংক ও কামান থেকে বোমা হামলা শুরু করে, সাথে বিমান হামলাও চলতে থাকে। আমরা সবাই সেখান থেকে নেমে গুহায় প্রবেশ করি আর গুহার বাইরে এক ভাইকে পাহারায় রাখি, যেন রুশবাহিনী এ দিকে আসলে আমরা জানতে পারি। গুহায় বসে ট্যাংক ও কামানের গোলাবর্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। যখনই আক্রমণ সরাসরি আমাদের ওপর হতো, আমরা গুহায় আশ্রয় নিতাম। কিন্তু হামলা যখন একটু দূরে হতো, তখন আবার গুহা থেকে বের হয়ে টিলার ওপরে উঠে আসতাম। নতুন এই কৌশলটি এই যুদ্ধেই আমরা রপ্ত করেছিলাম। কেননা বোমা বর্ষণের আড়ালে শত্রুদের সামনে অগ্রসর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। একদিকে ট্যাংক ও মর্টার থেকে ২০০ মিটার দূরে গোলাবর্ষণ করবে, অন্যদিকে এই হামলার কভার নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে।

শত্রুদের পেছন থেকে আক্রমণ করতে যাওয়া ভাইদের নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল। হঠাৎ ওয়ারলেস থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করে, এতে আমার হালে পানি ফিরে আসে। ভাই আবু উবায়দা বলছিলেন, 'আবুল কা'কা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' আমি দ্রুত ওয়ারলেস উঠিয়ে বলি, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন।' আবু উবায়দা বললেন, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা রুশ কমান্ডোদের হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। তারা এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আল্লাহু আকবার।'

তাকবীরের আওয়াজের সাথে সাথে ভাইদের মধ্যে বিজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর এমন অনুগ্রহে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হই। পেছন দিক থেকে রুশ বাহিনীর ওপর ভাইদের এই আক্রমণ রুশ বাহিনীর কল্পনারও বাইরে ছিল। ভাইয়েরা এমন জায়গা থেকে হামলা করেছিলেন, যেখান থেকে হামলা হতে পারে এমন ধারণাও রুশ বাহিনীর ছিল না। ভাই মুহাম্মাদ আযমান ওরফে মুখতার একাই এক হামলায়

ছয়জনকে হত্যা করেন।[৪২] হামলায় মেশিনগান আর হ্যান্ডগ্রেনেড ব্যবহার করা হয়। এতেই কমান্ডো বাহিনীর মনোবলে ভাঙন ধরে। রাশিয়ার দুইশত কমান্ডোর বিপরীতে ভাইদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। কিন্তু ভয়ের কারণে তারা ভাইদের শক্তি আন্দাজ করতে পারেনি। গাছপালা ও জঙ্গলের কারণে আক্রমণকারীর সংখ্যাও বুঝতে পারেনি। আচমকা এই হামলা তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলে। প্রায় ৩৫ জন কমান্ডো ও অফিসার নিহত হয়। বাকিরা প্রাণের ভয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে পালিয়ে যায়। এই বিজয়ে শুধু এই অঞ্চলেই নয়, পুরো আফগানিস্তানের মুজাহিদদের মনোবল বেড়ে যায়। এটা ছিল ভাইদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ।'

জাজির লড়াইয়ের পর নেতৃস্থানীয় আরব মুজাহিদগণ পেশোয়ারে একত্র হন। কাজের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়। শায়খ উসামা রহ.-কে আরবদের আমীর ঘোষণা করা হয়। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-কে সদা (صدى) ট্রেইনিং ক্যাম্পের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করা হয়। আবুল হাসান মাদানী (ওয়ায়েল জুলাইদান)-কে পেশোয়ারের দায়িত্বশীল নির্বাচন করা হয় এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন, শায়খ আবু উবায়দা পানশীরী, আবুল হাসান মাদানী, শায়খ আবু হাজের ইরাকী, ইসাম লীবী ও শায়খ আবু হাফস কমান্ডার—এই ছয়জনের সমন্বয়ে একটি সামরিক কমিটি গঠন করা হয়।[৪৩]



আবুল হাসান মাদানী (ওয়ায়েল জুলাইদান) হাফিযাহুল্লাহ

[৪২] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, 'কমান্ডো বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ওই আক্রমণে শায়খ আবু হাফস রহ. অংশগ্রহণ করেছিলেন; বরং তিনি ছিলেন ওই ইউনিটের আমীর আবু উবায়দা পানশীরী রহ.-এর সহকারী। তিনি আমাকে বলেন, যখন রুশ বাহিনী টার্গেট এরিয়ার মধ্যে চলে আসে, সকল ভাই তাদের ওপর একসাথে গুলি চালানো শুরু করেন। তাদের মধ্যে মুখতার ভাইও ছিলেন। তাই নির্দিষ্ট করে কারো ব্যাপারে বলা যায় না যে, তিনি এতজনকে হত্যা করেছেন।'

[৪৩] খিয়ানাতুন আলাত তরিক: শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)

## জাজির যুদ্ধ: শিক্ষা ও উপদেশ

**প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প:**

আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান ছিল মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ প্রদান। যুদ্ধের পরও এর গুরুত্ব পূর্বের মতো বহাল ছিল। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ধ্বজাধারী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও তাদের দোসররা ট্রেইনিংয়ের এই ধারাকে বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। আফগানিস্তানে থাকা বেশ কিছু দক্ষ প্রশিক্ষককে তারা হত্যা করতে সক্ষমও হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছিল। চেচনিয়া, বসনিয়া, সোমালিয়া, তাজিকিস্তান-সহ ইসলামী বিশ্বের পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের দরুন খাঁটি আরব ও ইসলামী পরিচয় ধারণকারী একাধিক প্রশিক্ষিত বাহিনী ততদিনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী জিহাদ ছড়িয়ে পড়ার পেছনে আফগানিস্তানের জিহাদী ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণ নেওয়া মুজাহিদদের অনেক বড় অবদান ছিল। তাই আফগানিস্তান থেকে মুসলিমরা যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।[৪৪]

মাকতাবুল খিদমাতের অধীনে পরিচালিত সদা (صدى) ক্যাম্পটি ছিল আরবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ১৯৮৪ সালের শেষদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জাজির কাছাকাছি একটি স্থানে এর সূচনা হয়। শুরুর দিকে প্রশিক্ষণের মান ছিল খুবই সাধারণ। সাধারণ কিছু অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। শায়খ আবু বুরহান সূরী[৪৫] রহ. যখন ক্যাম্পের

---

[৪৪] খিয়ানাতুন আলাত তরিক: শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)

[৪৫] একজন প্রবীণ মুজাহিদ শায়খ। 'মাওসুআতুল জিহাদ' নামে ৯/১০ খণ্ডের সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। প্রথম জীবনে সিরিয়ান সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে আশির দশকে শামের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ডাকে জিহাদে যোগ দেন। সেখানে মুজাহিদদের ওপর নিপীড়ন ও ধরপাকড় শুরু হলে তিনি আফগানিস্তান চলে আসেন এবং প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। স্বভাবগতভাবে তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে হিজরত করে সুদান চলে যান। সেখানে শায়খ উসামা রহ.-এর কিছু প্রকল্প দেখাশোনার কাজ করতে থাকেন। শায়খের মজলিসে শূরার সদস্যও ছিলেন তিনি। সুদান থেকে শায়খ উসামা রহ. নির্বাসিত হওয়ার পর শায়খের ফেলে আসা কাজগুলো তিনিই দেখাশোনা করতে থাকেন। শায়খ আবু বুরহান রহ. ছিলেন একজন ইবাদতগুজার, অধিক সিয়াম পালনকারী ও তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তি। একাকিত্ব, নির্জনতা ও আল্লাহর সান্নিধ্যকে তিনি ভালোবাসতেন। নাইবোরি ও দারুস সালাম হামলার পর যখন সুদান সরকার শায়খ উসামার সকল প্রকল্প বন্ধ করে দেয়, তখন তিনি খার্তুম থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। রাজধানী থেকে দূরে এক নির্জন গ্রামে জমি কিনে সেখানে চলে যান। নিজের থাকার জন্য একটি মাটির ঘর আর ঘরের সাথেই এলাকাবাসীর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। গ্রামের মানুষ ভ্রান্ত সুফিবাদে লিপ্ত ছিল। তিনি মসজিদে নামায পড়াতেন আর এলাকাবাসীর মাঝে সহীহ দীনের দাওয়াত দিতেন। এই বইয়ের কাজ শেষ করার আগেই সুদান থেকে খবর আসে, শায়খ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাআলা শায়খকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে তাঁকে জান্নাতে উঁচু মাকাম নসীব করুন, আমীন।

দায়িত্ব নেন, তখন থেকে এর মান উন্নত হতে শুরু করে। তিনি উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। জিহাদের ময়দানে আসার আগে তিনি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন।

টেপ রেকর্ডে সংরক্ষিত শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ১৯৮৪ সালে সদা (صدى) ক্যাম্পে মুজাহিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন। এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ২৫ জন হয়। ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই সংখ্যা ২০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এখানে প্রশিক্ষণরত মুজাহিদগণ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন। তবে বেশিরভাগই ছিলেন সৌদি, মিশর ও ফিলিস্তিনের নাগরিক।

মা'সাদার ইতিহাসে জাজির শাবান ও রমযান মাসের যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এই যুদ্ধ মুজাহিদদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, তাদের সামরিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ একেবারেই দুর্বল। এটিই ছিল এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। যা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।[৪৬] এর কারণ ছিল, সে সময় পুরো আফগানিস্তানে কোনো উন্নত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল না। তাই যুবকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে ভাইয়েরা প্রশিক্ষকদের জন্য কোর্সের ব্যবস্থা করা শুরু করেন। অবশ্য প্রশিক্ষণের দুর্বলতার পেছনে যুবকদেরও কিছু দায় ছিল। অনেক যুবক জিহাদের প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আফগানিস্তানে আসত। তারা অল্প সময়ে সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ নিয়েই যুদ্ধের ময়দানে নেমে যেত। অথচ যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল না।[৪৭]

এ কারণে জাজির যুদ্ধের পর শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যুবকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এ উদ্দেশ্যে শায়খ আবু উসামা মিসরী [৪৮](আব্দুল আযীয আলী)-

---

[৪৬] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, সে সময় খোস্তের মুজাহিদ গ্রুপের পক্ষ থেকেও মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছিল। শায়খ আবু হাফস কমান্ডার খোস্ত গ্রুপের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের কিছু স্বেচ্ছাসেবী আফগানিস্তানে আসলে খোস্তের মুজাহিদগণ তাদের থেকে কিছু প্রশিক্ষণ নেন। এ উদ্দেশ্যে তারা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন।

[৪৭] মা'সাদাতুল আনসারিল আরব বি-আফগানিস্তান: ইসাম দারায।

[৪৮] শায়খ আবু উসামা আব্দুল আযীয আলী মিসরী রহ. ছিলেন হাসানুল বান্না রহ.-এর সময়ে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সামরিক শাখার একজন দায়িত্বশীল। ১৯৪৮ সালের প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দৃঢ় মনোবল, অসামান্য গাম্ভীর্য আর যশ-খ্যাতিতে তিনি ছিলেন অনন্য। সিরিয়ার জিহাদ চলাকালেও তিনি মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন। পরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া গোলযোগ ও নেতৃবৃন্দের বিচ্যুতির কারণে তিনি ইখওয়ান থেকে আলাদা হয়ে যান। আফগান যুদ্ধের

কে ডেকে আনা হয় এবং শায়খ উসামার সাথে যুদ্ধফ্রন্টে কাজ করতে ইচ্ছুক যুবকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের শুরুর দিকে পেশোয়ারে ওয়ারসাক (ورسك) ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণের পরপরই শায়খদ্বয় ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেন। মূলত শায়খ আবু উসামা মিসরী ছিলেন আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কড়া সমালোচক। তিনি মনে করতেন, আফগানের জিহাদী দলগুলোর নেতারা জিহাদের নামে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করেন, নেতৃত্ব নিয়ে টানাটানি করেন আর মুসলমানদের নামে মিথ্যা ছড়ান। তার এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার কারণে ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন আফগান মুজাহিদদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা না বলেন। কিন্তু তিনি সে শর্ত রাখতে পারেননি। একে তো তিনি কঠিনভাবে কথাগুলো বলতেন, তার ওপর তার এমন চিন্তাভাবনা পুরোটাই ছিল শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামার কথার বিপরীত। রাখঢাক ছাড়াই এ ধরনের কথাবার্তা বলার কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে।

পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, যদি কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হতো, তাহলে যুবকরা মুজাহিদদের প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে ময়দান ছেড়ে চলে যেত। তাই বাধ্য হয়ে শায়খ আবু উসামাকে অপসারণ করে ওয়ারসাক (ورسك) ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে শায়খ আবু উসামা পাঁচজন ভাইয়ের প্রশিক্ষণ শেষ করাতে পেরেছিলেন। এদের প্রত্যেকেই আবু উসামার সাথে ক্লান্তিকর কঠোর প্রশিক্ষণে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে তারাই আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন। শায়খ আবু উসামা রহ.-এর এই অবদান যদিও খুবই সামান্য, কিন্তু এ কারণেই তাকে আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণের পুরোধা মনে করা হয়।[৪৯]

**সত্য কথা যায় না বলা সব সময়**

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। শায়খাইনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। যেহেতু শায়খ আবু উসামা মিসরী রহ. আফগানিস্তানের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কঠোর

সময়ও তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত আফগান নেতৃবৃন্দের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, আফগানের এই নেতারা প্রতারক, তারা জিহাদ করতে চায় না, তারা শুধু নিজেদের পকেট ভারী করতে চায়, নেতৃত্ব আর ক্ষমতার জন্যই তারা লড়াই করে আর মুসলিমদের নামে মিথ্যা বলে বেড়ায় ইত্যাদি।

[৪৯] খিয়ানাতুন আলাত তরিক: শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী।

সমালোচনা করতেন। তিনি মনে করতেন, আফগান নেতারা স্বার্থান্বেষী, হত্যাকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইসলামী আদর্শের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। এ কারণেই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা রহ. তাঁকে শর্ত দিয়েছিলেন, তিনি যেন আফগান মুজাহিদদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা না বলেন।

কেউ বলতে পারেন, শায়খ আবু উসামা মিসরীর কথা তো ঠিক ছিল, তারপরও কেন তাকে এ সব বলতে বাধা দেওয়া হলো?

হ্যাঁ, শায়খ আবু উসামা মিসরীর কথা সত্য ছিল। কিন্তু সব সত্য সব জায়গায় সবাইকে বলা যায় না। কেন? কারণ এতে অনেক সময় লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। শায়খদ্বয় এ মূলনীতির আলোকেই তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শায়খ আবু উসামা মিসরীর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসা অধিকাংশ যুবকই শুধু জিহাদের পথেই নতুন ছিল না, দীনচর্চার ক্ষেত্রেও তারা ছিল একেবারে নতুন। এমন অপরিপক্ক যুবকদের সামনে আফগান নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি নিয়ে আলাপ করলে শরয়ী দিক থেকেও বিশেষ কোনো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া আফগান নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি নিয়ে শুধু আলাপ করলেই পরিস্থিতি পালটে যাবে—এমন কোনো সম্ভাবনা আদৌ কি ছিল?

অবশ্যই না। কোনো লাভ না হলেও এর দ্বারা নিশ্চিত ও অনিবার্য কিছু সমস্যা তৈরির আশঙ্কা ছিল। [আফগান নেতৃবৃন্দের সমালোচনার ক্ষেত্রে] শায়খ আবু উসামার অবস্থান ছিল শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শায়খ আবু উসামা মিসরীর মতো সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থেকে এমন কথা শুনে যুবকদের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই যুবকদের মধ্যে অস্থিরতা ও হতাশা সৃষ্টি হতো। ফলে এমনও হতে পারত যে, তারা জিহাদের ময়দান ছেড়ে নিজ দেশে চলে যেত এবং তাগুত শাসকদের অধীনে ভোগ-বিলাসের জীবন কাটানো শুরু করত। অথচ সে সব দেশের তাগুত শাসকদের কুফর, রিদ্দাহ ও ফাসাদ ছিল আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি থেকেও শত-সহস্র গুণ মারাত্মক।

জিহাদী নেতৃবৃন্দের দুর্নীতির দোহাই দিয়ে যুবকরা যদি দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুর মোকাবেলা ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে যেত, তাহলে কী লাভ হতো? অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো—নেককার ও ফাসেক উভয়ের অধীনেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ অব্যাহত থাকবে।

২০০৭ সালে '**السبيل لإحباط المؤامرات** (ষড়যন্ত্র ধ্বংস করার উপায়)' শিরোনামে শায়খ উসামা রহ. একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে শায়খ আবু উসামার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—

> 'একজন মুজাহিদ শায়খ ছিলেন। বয়স ও মর্যাদা, উভয় দিক থেকেই আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন তিনি। মানুষের সাথে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে মানুষ চেনার ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। এ ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথার্থ। যদিও সে সময় আমরা তার কঠোর মতামতকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলতেন, "এই নেতারা হলো ব্যবসায়ী। নিজেদের কর্তৃত্ব কীভাবে টিকিয়ে রাখবে—এ নিয়েই তাদের সব চিন্তা। জাতির চাইতেও ব্যক্তিস্বার্থই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বেশি।" এই হলো তাঁর চিন্তার সারাংশ। তখন আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করিনি, যার কারণে মানুষ চিনতে আমাদের সময় লেগেছে। তবে তাঁর কথা গ্রহণ করলে, তখন বিশাল ক্ষতির আশঙ্কা ছিল—এটা তো সবার কাছেই স্পষ্ট। এরপর সময় যত গড়িয়েছে, একের পর এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, আমাদের সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে অনেক নেতার ব্যাপারেই তাঁর কথার যথার্থতা বুঝতে পেরেছি। অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও বয়সের অপরিপক্কতার কারণে আমরা যে বিষয়গুলো তখন বুঝতে পারিনি; বরং অসম্ভব মনে করেছি, সময়ের সাথে সাথে এমন অনেক বিষয় আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে। এখন তো আপনারা সকলেই জানেন, রব্বানী ও সাইয়াফের নেতৃত্বাধীন নর্দার্ন অ্যালায়েন্স পশ্চিমাদের সাথে মিলে আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইরাকেও একই অবস্থা তৈরি হয়েছে। হিযবে ইসলামী ও কিছু মুজাহিদ দল মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহযোগিতা করছে। অথচ এই কাজটি সুস্পষ্ট কুফর ও প্রকাশ্য রিদ্দাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

### শায়খ উসামার বক্তব্য ও কিছু কথা

আমরা যদি ধরেও নিই, [তৎকালীন আফগান নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি নিয়ে] শায়খ আবু উসামা যে বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছিলেন, শায়খ উসামা ও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামও তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবু কি এই দুর্নীতি নিয়ে সাধারণ মুজাহিদদের সামনে কথা বলা তাঁরা উচিত মনে করতেন? হিকমত ও শরয়ী রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে মুজাহিদদের সামনে আফগান নেতৃবৃন্দকে স্বার্থান্বেষী, মিথ্যুক ও ক্ষমতালোভী বলে তাঁরা সমালোচনা করতেন?

আমি মনে করি, তাঁরা কখনোই এমনটা করতেন না। কারণ, তাঁরা উভয়েই বুঝতেন, দুর্নীতির বিষয়টি তাঁরা এবং বিশেষ কিছু ব্যক্তি জানলেও সাধারণ মুজাহিদগণ এগুলো কিছুই জানেন

না। তা ছাড়া এ সকল নেতৃবৃন্দ তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো কুফরি কাজ করেনি, যেমনটা বর্তমানে করেছে; বরং সাধারণ মানুষের কাছে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার পাত্র ছিলেন। রুশবিরোধী জিহাদ এবং তারও আগে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা যে কুরবানী পেশ করেছেন, সে জন্য বিশ্বের সকল মুসলমান, বিশেষ করে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত আরব-অনারব মুজাহিদগণ তাদের ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন।

এর ভিত্তিতে বলা যায়, শায়খদ্বয় যদি আফগান নেতৃবৃন্দের দোষত্রুটি নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতেন, তাহলে তাদের অনুগত সাধারণ আফগান মুজাহিদগণ—যারা নেতাদের দুর্নীতি নিয়ে কিছুই জানতেন না—স্বভাবতই কষ্ট পেতেন। তাঁদের মধ্যে জাত্যভিমান ও সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এভাবে আফগান মুজাহিদ ও তাদের আরব ভাইদের মধ্যে মারাত্মক ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতো।

সাইয়াফ যেহেতু আফগান মুজাহিদদের সংগঠন আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর আমীর ছিল, সে সুবাদে আরববিশ্ব ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত অনুদানের অর্থ তার কাছে জমা হতো। এই পরিস্থিতিতে শায়খ উসামা ও আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সর্বোচ্চ যে কাজটি করতে পারতেন তা হলো, এ সকল ভ্রষ্ট নেতাদের হাতে অনুদানের মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। এই নেতারাও এই বিষয়টির ভয় করত। এ জন্য তারা সততার ভণিতা করে বেড়াত।

সীরাতের কিতাবগুলোতে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। বনু মুসতালিক যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন উবাই দলবল নিয়ে শরীক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর এলো, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলেছে, 'আল্লাহর শপথ, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মদীনার মর্যাদাবানরা নীচদেরকে শহর থেকে বের করে দেবে।' এ কথা শুনে উমর রা. রাসূলের কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারণ করে বললেন, 'উমর, তুমি যদি তাকে মেরে ফেল, তখন লোকে বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ তার সাথিদের হত্যা করে।' এরপর মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে ওহী নাযিল হলো। ফলে পরিস্থিতি আপনাআপনি এমন হয়ে গেল যে, সে কোনো বিশৃঙ্খলা করলে, তার গোত্রের লোকেরাই তাকে তিরস্কার করত এবং কঠোরভাবে দমন করত। এরপর একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রাযি.-কে বলেছিলেন, 'উমর, দেখলে তো, [পরিস্থিতি কীভাবে বদলে গেল]! আল্লাহর কসম, আমার কাছে যে-দিন তুমি তাকে হত্যার অনুমতি চেয়েছিলে, সেদিন যদি তাকে হত্যা করতে, তাহলে কিছু লোক তার পক্ষ নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ত। (অর্থাৎ তাদের মাঝে গোত্রপ্রীতি ও জাত্যভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।) কিন্তু সেই লোকদেরই যদি আজ আমি তাকে হত্যা

করতে বলি, নির্দ্বিধায় তারা করে ফেলবে। উমর রা. বললেন, 'আল্লাহর কসম, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আমার সিদ্ধান্তের চেয়ে রাসূলের সিদ্ধান্তই অধিক বরকতপূর্ণ।'[৫০]

নিঃসন্দেহে শায়খ আবু উসামা রহ. ছিলেন প্রবীণ মুজাহিদ, সেই সাথে সৈনিক গড়ার দক্ষ কারিগর। তারপরেও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা রহ. বাধ্য হয়ে ওয়ারসাক ট্রেইনিং ক্যাম্প বন্ধ করে শায়খ আবু উসামার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাদের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। কারণ শায়খাইন বুঝতে পেরেছিলেন, আফগানযুদ্ধ হলো এক সুবর্ণ সুযোগ। যথাসম্ভব সর্বোত্তম উপায়ে এর থেকে লাভবান হতে হবে। জিহাদের যে বিধান জাতি বছরের পর বছর ভুলে ছিল, আজ তা নিয়ে আবারও আলোচনা হচ্ছে। খবরের কাগজে, টেলিভিশনের পর্দায় শুধু জিহাদ নিয়েই কথা হচ্ছে, জিহাদের সংবাদ প্রচার হচ্ছে। তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন, রুশবিরোধী জিহাদের পক্ষে বিশ্বমোড়লদের এই সহযোগিতামূলক অবস্থান বেশি দিন স্থায়ী হবে না। স্বার্থ হাসিল হলেই তারা জিহাদের এই আওয়াজ বন্ধ করে দেবে, সমূলে উৎখাত করার চেষ্টা করবে। তাই উভয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে মুসলিম যুবকদের বড় একটি অংশ যেন আফগান রণাঙ্গনে একত্র হয় এবং এখান থেকে জিহাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। এ জন্যই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলতেন, 'আমি চাই প্রত্যেক আরব রাষ্ট্র থেকে কমপক্ষে ৪০ জন যুবক আসুক। তাদের অর্ধেক শহীদ হলেও বাকি অর্ধেক যেন জিহাদের দাওয়াত নিয়ে নিজ দেশে ফিরতে পারে।'

### ট্রেইনিং ক্যাম্পের ধারাবাহিক সূচনা

ওয়ারসাক ক্যাম্প বন্ধ হওয়ার পর ভাইয়েরা খোস্ত প্রদেশে 'জাওর ট্রেইনিং ক্যাম্প' নামে নতুন একটি ক্যাম্প শুরু করেন। শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ.-এর অধীনস্থ একটি ঘাঁটিতে এই ক্যাম্পটি শুরু করা হয়। এর কিছুদিন পর সামরিক প্রশিক্ষণ ও ছোটখাটো অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে লীজা নামক জায়গায় আরেকটি ক্যাম্প শুরু করা হয়। এই ক্যাম্প থেকে পরিচালিত এক অভিযানে কিছু মুজাহিদ মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর ভাইয়েরা সেখান থেকে সরে আসেন। সে বছরের শেষদিকে জাওর ক্যাম্পের কাছেই হেকমতিয়ারের কর্তৃত্বাধীন জিহাদওয়াল নামক স্থানে আরেকটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। একে একে সেখানে আরও চারটি ক্যাম্প গড়ে ওঠে। সেগুলো হলো— **১. আল-ফারুক ক্যাম্প:** এটি সকল মুজাহিদদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। **২. জিহাদওয়াল ক্যাম্প:** এতে সাধারণত বিশেষ প্রশিক্ষণ হতো। পাশাপাশি প্রশিক্ষক ও নেতৃবৃন্দের আরও উন্নত প্রশিক্ষণের আয়োজনও এখানেই করা

[৫০] সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৯ (দারুল কিতাব আল-আরাবী থেকে প্রকাশিত)

হতো। **৩. আস-সিদ্দীক ক্যাম্প:** এখানে বিশেষভাবে ইয়েমেনি ভাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। যারা অল্প সময়ের জন্য ময়দানে আসতেন, তাদেরও এখানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। **৪. খালেদ বিন ওয়ালীদ ক্যাম্প**।

জালালাবাদের কাছে 'গানি খেল' নামক জায়গায় 'আবুশ শহীদ কাতারী' নামে আরও একটি ক্যাম্প ছিল। এ ছাড়া বিভিন্ন জিহাদী দলেরও একাধিক ট্রেইনিং ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পগুলো রুশবিরোধী জিহাদের শেষ পর্যন্ত চালু ছিল। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য মুজাহিদ ও আরব যুবক এ ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞই পরে তানজীম আল-কায়েদার অসম্ভব সব সামরিক অপারেশনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল।

শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী তার বই সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার-এ লিখেছেন—

> 'আফগানিস্তানের আরব মুজাহিদদের উচ্চতর ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের ধারা শুরু হয়েছিল মিশরীয় অফিসার হায়দারা ওরফে আলী মুহাম্মাদ আবুস সাউদের হাত ধরে। মিশরীয় বংশোদ্ভূত হলেও তিনি আমেরিকার নাগরিক ছিলেন এবং পেশাগত জীবনের অংশ হিসেবে কিছু সময় আমেরিকান সেনাবাহিনীতে কাজও করেছিলেন। তার পরিচিত কিছু মিশরীয় সেনা অফিসার ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের হয়ে কাজ করতেন। ১৯৮৮ সালে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি পেশোয়ারে আসেন।[৫১] এখানে তিনি ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও তানজীম আল-কায়েদার নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেন। এটা স্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না। হায়দারা এই দুই তানজীমকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তা সবদিক দিয়েই তখনকার সময় থেকে অনেক অ্যাডভান্স ছিল। তার এই অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পেশোয়ারের আরব-অনারব সব দলে এর চর্চা হতে থাকে। মূলত দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহীরা যখন মার্কিনিদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন তা দমন করার

[৫১] শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন, 'কমান্ডার আবু খালেদ ও আমি নিউইয়র্কে ভাই মুস্তফা শালাবী রহ.-এর বাসায় হায়দারা ভাইয়ের সাথে দেখা করেছিলাম। আবু খালেদ ভাইয়ের আত্মীয় কামান্ডার সায়্যিদ মুসা রহ. ছিলেন হায়দারা ভাইয়ের সহকর্মী। উভয়ে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সে কাজ করতেন। সায়্যিদ মুসা রহ. আবু খালেদের সাথে পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন। তিনি জাজির মারকায এবং অন্যান্য ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলো প্রাথমিক পরিদর্শন করেছিলেন। পেশোয়ারে পেটব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। প্রথমে মনে হয়েছিল, টাইফয়েডের কারণে পেটব্যাথা হয়েছে। পরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তিনি স্প্লিন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। দিন দিন তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল, অতঃপর পেশোয়ারে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এই ঘটনা শুনে হায়দারা ভাই অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য পাকিস্তান আসার সিদ্ধান্ত নেন।

জন্য মার্কিন স্পেশাল ফোর্স বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করেছিল। হায়দারা সেই অপারেশনে অংশগ্রহণ করে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের অত্যাধুনিক ট্রেইনিং গ্রহণ করেছিলেন। সেই ট্রেইনিংই তিনি পেশোয়ারের মুজাহিদদের দিয়েছিলেন।'[৫২]

হারুন ফযল তার বই 'আল-হারবু আলাল ইসলাম'-এ এই ট্রেইনিং সম্পর্কে লিখেছেন—

'এই ট্রেইনিংয়ে শহরকেন্দ্রিক গেরিলা স্লিপার সেলের কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি শেখানো হতো। শহরেকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব, তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন-সহ সকল ইউনিটের কাজের ধরন শেখানো হতো। সাংকেতিক বার্তা ডিকোড করা, স্কেচ আঁকা, গোয়েন্দাদের অপহরণের পরিকল্পনা করা, অন্ধকার কক্ষে মুসলিম বন্দিদের রাখা হলে শত্রু-মিত্র আলাদা করে মুসলিম বন্দিদের নিরাপদে মুক্ত করা; বিমান, সাধারণ ভবন বা গাড়ি থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা, রশি বেয়ে বিল্ডিংয়ে ওঠা, কঠিন পরিস্থিতিতে মুখোমুখি লড়াই করা-সহ নানা বিষয় শেখানো হতো।' এ ছাড়াও মুজাহিদদের তিনি রিভলবারের ব্যবহার, গাড়ি ও মোটরসাইকেল থেকে অস্ত্রচালনা এবং গাড়ি থেকে লাঁফ দেওয়ার প্রশিক্ষণ দিতেন।

হায়দারা ভাই মুজাহিদদের মিলিটারি জেনারেলদের সমমানের প্রশিক্ষণও প্রদান করতেন। বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনা করা, প্লাটুন থেকে শুরু করে ব্রিগেড পর্যন্ত বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া, মানচিত্রের ব্যবহার, সামরিক মানচিত্র অনুযায়ী বাহিনীর বিন্যাস করা, বিশ্বের সকল সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত সামরিক চিহ্নগুলোর পরিচিতি, রণক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, ব্যাটালিয়ন, কোম্পানি, প্লাটুন ও ইউনিটের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ও তার প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পেশোয়ারের হায়াতাবাদে তিনি বিশেষ কিছু কোর্স করাতেন। তাতে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়—তা শেখাতেন। এতেও অনেক ভাই অংশগ্রহণ করতেন।

ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সামরিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতা হায়দারার কাছেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পরে তারা মিশরে ফিরে গিয়ে সংগঠনের সক্রিয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তানজীম আল-কায়েদাও হায়দারার কাছ থেকে অনেক উপকৃত হয় এবং তার তত্ত্বাবধানেই আল-কায়েদার ট্রেইনিং কোর্সগুলো তৈরি করা হয়। হায়দারার হাত ধরেই আল-কায়েদার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক টিমের জন্ম হয়।

[৫২] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী।

জিহাদের বিভিন্ন ময়দানে হাজারো যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।[৫৩]

মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে হায়দারা ভাইয়ের অবদানের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. বলেন—

'হায়দারা ভাই প্রথমে শাহিকোটের একটি ক্যাম্পে তিন মাস মেয়াদি একটি কোর্স করান। এরপর একটি সফরে যান। বছরখানেক পর আবার ফিরে আসেন। সফর থেকে এসে আগের জায়গাতেই আগের কোর্সটি দ্বিতীয়বার করান। তার করানো প্রথম কোর্সটিতে শুধু ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের ভাইয়েরাই শরীক হয়েছিলেন। দ্বিতীয় কোর্সে সম্ভবত আল-কায়েদার কিছু ভাইও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর কুনার প্রদেশে তিনি তৃতীয় কোর্স করান, এতে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও আল-কায়েদা—উভয় তানজীমের ভাইয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। এরপর পেশোয়ারে ও জালালাবাদে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও আল-কায়েদার অনেকগুলো কোর্সে তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়েদার ভাইদের সাথে অনেকগুলো গোয়েন্দা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

শাহিকোট ও কুনারের তিনটি কোর্সের পর ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের ভাইয়েরা ফার্মা সি-এর কাছেই জালালাবাদে তিনটি ক্যাম্প (মুআসকার) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাম্প তিনটি হলো—বদর ক্যাম্প, আল-কাদেসিয়া ক্যাম্প ও আল-কা'কা ক্যাম্প। এই ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মিশরের জিহাদকে শক্তিশালী করার জন্য মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা। এগুলো থেকে প্রায় ২০০ মুজাহিদ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাদের অধিকাংশকেই মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ক্যাম্পগুলোর পরিচালনায় ছিলেন—কমান্ডার শায়খ আবু খালেদ (আব্দুল আযীয জামাল) হাফি.। তার সাথে ছিলেন—শায়খ মুহাম্মাদ সালাহ (নাসর ফাহমী নাসর) , ফাতহী (তারেক আনওয়ার) ও আবু মুহাম্মাদ সালেম (যাকী ইযযত যাকী) রহ. প্রমুখ। এখান থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আবু হামযা মুহাজির, আবু দুজানা পাশা, আবু আইমান মিসরী ও আবু হামযা রবী রহ.-সহ আরও অনেকে।

[৫৩] খিয়ানাতুন আলাত তরিক- সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার: শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী।

হায়দারা ভাইয়ের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি. বলেন—

> 'আল-কায়েদার সাথে হায়দারা ভাইয়ের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল খোস্তে। সেখানে তিনি চার মাসের মতো অবস্থান করেন এবং ধারাবাহিক কয়েকটি কোর্স করান। হায়দারা ভাই থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমাদের উল্লেখযোগ্য সামরিক নেতা ও প্রশিক্ষকদের প্রায় সকলকেই সেখানে জমা করা হয়েছিল। ক্যাম্পের দেখাশোনা ও প্রশিক্ষণের তদারকির দায়িত্ব আমার ওপরে ছিল। তখন হাতের আঘাতের দরুন আমি অসুস্থ ছিলাম। তিনি খার্তুমেও ভাইদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।'

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, আমেরিকা ও ব্রিটেনে অনেক মুজাহিদ ভাই ছিলেন। নাইরোবি ও দারুস সালাম আক্রমণের আগেই শায়খ উসামার নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে সরে যেতে বলা হয়েছিল। যেন আক্রমণের পর তারা ধরপাকড়ের সম্মুখীন না হন। কিন্তু কপালের লিখন না যায় খণ্ডন। এই সতর্কবার্তা ভাইদের তেমন কাজে আসেনি। ভাইয়েরা বিলম্ব করে ফেলেন। এ দিকে তানজানিয়া ও কেনিয়ায় দূতাবাসে হামলার পরেই মার্কিন সরকার তাদের গ্রেফতার করে ফেলে। তাদের মধ্যে ছিলেন—হায়দারা ভাই, ওয়াদী আল-হাজ, ইহাব নববী। ব্রিটেন থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন শায়খ খালেদ আল-ফাওয়ায। আল্লাহ তাঁদের সকলের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

পূর্ব আফ্রিকার আক্রমণের আগে থেকেই এ সকল ভাইদের ব্যাপারে আমেরিকার কাছে অনেক তথ্য ছিল। এ সব তথ্য তারা জামাল ফযল সুদানী থেকে সংগ্রহ করেছিল। সামনে তার ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়। আল-কায়েদার এমন অনেক নেতা রয়েছেন, যারা প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু এই বইয়ে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাদের অনেকে তো শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তাদের ছবি সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। আর অনেকে এখনো জীবিত আছেন। নিরাপত্তার কারণে এখানে তাদের নাম উল্লেখ করছি না।

দোয়া করি আল্লাহ তাঁদের কাজগুলো কবুল করুন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, উম্মতের সন্তানদের জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন; অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার এই যুগে তাদের ইজ্জত ও সম্মানের সবক দিয়েছেন। তাঁদের এই মেহনতের বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

# আল-কায়েদার নির্বাচিত প্রশিক্ষকবৃন্দ



আলী মুহাম্মাদ আবু সাউদ (হায়দারা) ফাক্কাল্লাহু আসরাহ



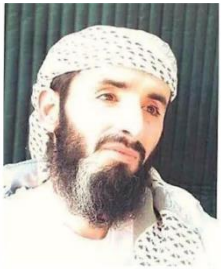
শায়খ আবু মুসআব সুরী
(মুস্তফা বিন আব্দুল কাদের সিত মারইয়াম) ফা. আ.



শায়খ আবু আতা তিউনিসী
(হাবীব শুশান) রহ.



শায়খ সাইফ আল-আদল
(মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যাইদান) হাফি.



শায়খ আবুল ফারাজ লীবী ফা. আ.



আনাস আল-লীবী রহ.



শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-মিসরী রহ.



আবু ইসলাম আল-মিসরী রহ.



আবু যিয়াদ আল-ইরাকী রহ.



আব্দুর রহমান আল-মুহাজির রহ.



আব্দুল ওয়াকীল রহ.



তালহা সুদানী রহ.



শায়খ খালেদ আল-ফাওয়ায
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু



শায়খ আবু খালেদ সুরী রহ.



হারুন ফযল রহ.



সা'দী (আহমাদ মুহাম্মাদ হামেদ) রহ.



শায়খ কাসেম আর-রীমী রহ.



আবুল হাসান সায়ীদী রহ.



খালেদ আল-মাকদিসী (সা'দুফ) রহ.



কমান্ডার আব্দুল আযীয আল-মুকাররিন (আবু হাজের) রহ.



শায়খ নাসর আনিসী রহ.



শায়খ ইউসুফ আল-উয়াইরী রহ.



খালেদ হাবীব রহ.

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠা থেকে সুদান হিজরত

## আল-কায়েদার পূর্বে আরব মুজাহিদগণ

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে আল-কায়েদার সূচনা হয়। এর আগ পর্যন্ত আফগানিস্তানের আরব মুজাহিদগণ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা রহ.-এর নেতৃত্বে কাজ করতেন। উভয় শায়খের মাঝে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যত দিন যাচ্ছিল, কাজের অগ্রগতি হচ্ছিল, যুবকরাও দলে দলে ছুটে আসছিল জিহাদের ময়দানে। ফলে বিশৃঙ্খলা দূর করতে নতুন নতুন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। আরব মুজাহিদদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কৌশলগত কিছু বিষয়ে উভয়ের মাঝে কিছু মতভিন্নতাও দেখা দিচ্ছিল। আরবরা কি আফগানদের সাথে মিলে যাবে, না-কি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে—এ বিষয়েও শায়খদের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল।

১৯৮৭ সালের আগ পর্যন্ত আরব মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল একেবারেই কম। তাই শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. আরবদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো দল গঠনের পক্ষে ছিলেন না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—আরব মুজাহিদগণ আফগান মুজাহিদদের সাথে মিলে যাবেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবেন, তাঁদের মাঝে ইসলামী আদর্শ ছড়িয়ে দেবেন। কখনো মুজাহিদদের মাঝে মতবিরোধ হলে তাদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করবেন। সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে আফগান মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন। এর পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব নিজেরাও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। [যেহেতু শায়খের দৃষ্টিতে যুদ্ধ করা প্রধান লক্ষ্য ছিল না,] এ জন্য তিনি আরবদের আলাদা দল গঠন করার বিরোধিতা করতেন।

অন্যদিকে শায়খ উসামা রহ. মনে করতেন, পেশোয়ারে আরব মুজাহিদদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে বেঁচে যাওয়া অর্থ আফগানিস্তানের ভেতরে মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করা উচিত। কারণ কমিউনিস্ট শাসন ধ্বংস হয়ে যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে মুজাহিদদের ওপর অনেক দায়দায়িত্ব এসে পড়বে, ফলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। [কমিউনিস্ট শাসন ধ্বংস করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু শায়খের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল,] এ জন্য শায়খ উসামা রহ. আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে সামরিক

কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সরাসরি যুদ্ধে আরবদের কার্যকারী ভূমিকা রাখার প্রতি জোর দিতেন। কিন্তু আরবরা যদি আফগানদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের জোরালো ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। বিশেষত যখন কি-না সব আফগান নেতাই আরবদেরকে নিজের দলে শামিল করার চেষ্টায় লিপ্ত। তাই শায়খ উসামা রহ. আরবদের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। পাশাপাশি আফগানদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার নীতি গ্রহণ করলেন।[১]

এর ভিত্তিতেই শায়খ আবু উবায়দা পানশীরী, শায়খ আবু হাফস কমান্ডার, শফীক মাদানী রহ. এবং অন্যান্যদের নিয়ে শায়খ উসামা রহ. জাজির পাহাড়ে মা'সাদাতুল আনসারের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আফগান জিহাদের উদ্দেশ্যে আগত আরব যুবকদের এই ঘাঁটিতে সংঘবদ্ধ করা এবং রুশ ভল্লুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

এ ব্যাপারে শায়খ সাইফ আল-আদল শায়খ উসামা রহ. থেকে বর্ণনা করেন—

> 'যখন দেখলাম আফগানদের সহযোগিতার জন্য বহু মানুষ তৈরি হয়ে আছে, তখন চিন্তা করলাম আফগানদের সামরিক সহযোগিতার জন্য আমরা কোনো সংগঠন তৈরি করছি না কেন। এমন একটি সংগঠন, যার লক্ষ্যই হবে প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানদের সামরিক সহযোগিতা দেওয়া।' এই চিন্তা থেকে শায়খ উসামা রহ. ময়দানের প্রবীণ ভাইদের সাথে পরামর্শ করেন। তাদের কেউ কেউ তাঁর এই চিন্তাকে নাকচ করেন, কারণ তাদের কাছে এটি ছিল নতুন আরেকটি দলের সূচনামাত্র। [অথচ ময়দানে তখন অনেক দল ছিল।] আর কেউ কেউ এই চিন্তাকে স্বাগত জানান। তাঁদের হাত ধরেই পরে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে একটি "সামরিক সেবাদানকারী সংস্থা" হিসেবে আল-কায়েদার সূচনা হয়।'

আল-জাযীরার সাংবাদিক তাইসীর আল্লুনীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়খ উসামাকে আল-কায়েদার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

> 'নামটি অনেক পুরোনো। কোনো ধরনের পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মূলত সন্ত্রাসী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবু উবায়দা পানশীরী রহ. একটি ট্রেইনিং ক্যাম্প শুরু করেছিলেন। সেই জায়গাটিকে আমরা অন্যান্য সামরিক ট্রেইনিং ক্যাম্পের মতোই 'আল-কায়েদা' (ঘাঁটি) বলতাম। পরে ধীরে ধীরে এই নামটিই সংগঠনের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তবে

[১] উসামা বিন লাদিন মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরু আমরিকান : ফারিস আয-যাহরানী (ঈষৎ পরিবর্তিত)

আমরা কখনোই উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না, আমরা এই উম্মতেরই সন্তান, এই উম্মতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

## গ্লোবাল জিহাদ : শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি[২]

পূর্বে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও শায়খ উসামা রহ.-এর মধ্যে আরবদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। এটি ছিল নিরেট কৌশলগত একটি মতভিন্নতা। আরবদের সংখ্যা কম হওয়ায় শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. মনে করতেন, আফগান জিহাদে কেবল সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণের মাঝেই আরবদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অন্যদিকে শায়খ উসামা রহ. মনে করতেন, আরবদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত।

আফসোসের বিষয় হলো, অনেকেই শায়খাইনের এই কৌশলগত ক্ষুদ্র মতভিন্নতাকে অতিরঞ্জিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। এমনকি একজন তো 'الجهاد المعاصر بين عزام و ابن لادن' (আযযাম ও বিন লাদেনের দৃষ্টিতে সমকালীন জিহাদ) শিরোনামে রীতিমতো প্রবন্ধও লিখে ফেলেছেন। পাঠকের সামনে এই সামান্য মতভিন্নতাকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন 'বৈশ্বিক জিহাদের ব্যাপারে দুই শায়খের মধ্যকার আদর্শিক ও স্পর্শকাতর মতবিরোধ' হিসেবে।

অথচ এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল আফগান জিহাদের নির্ধারিত একটি সময়ের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে নেওয়া কৌশলগত একটি সিদ্ধান্তমাত্র। এর পেছনে যথাযথ কারণও তখন ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের লেখক ইতিহাস বিকৃত করে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে শায়খের কথার মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিতে বৈশ্বিক জিহাদের অর্থ হলো মুসলিমবিশ্বের নানা প্রান্তে জিহাদ হবে এবং মুজাহিদরা হিজরত করে যে-কোনো ময়দানে যাবেন ঠিকই, তবে তারা স্থানীয় মুজাহিদদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না এবং কোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রমে জড়াবেন না; বরং সহযোগিতামূলক কাজেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবেন। যদি কখনো সুযোগ হয়, তখনই কেবল যুদ্ধে শরীক হবেন। অথচ শায়খ রহ. এমন কথা কখনো বলেননি, এমন কোনো উদ্দেশ্যও তাঁর কখনো ছিল না।

[২] 'আলামিয়্যাতুল জিহাদ ফী মানযুরিশ শাইখাইন আযযাম ওয়া বিন লাদিন' শিরোনামে উম্মাতুন ওয়াহিদা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত খাত্তাব হাশেমীর প্রবন্ধ অবলম্বনে।

শুধু এতটুকুই নয়। পাঠকদের মনে গ্লোবাল জিহাদের একটি সংকুচিত ধারণা তৈরির চেষ্টাও তিনি করেছেন। একধাপ এগিয়ে তিনি পাঠককে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, [তার মনোমতো ব্যাখ্যা করা] শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের এই দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক। আর শায়খ উসামা রহ. নিজের মতো করে বৈশ্বিক জিহাদের রূপরেখা তৈরি করে মূলত নিজ মুরুব্বি শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের অনুসৃত শরয়ী মূলনীতি ও সাংগঠনিক মূল্যবোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, শায়খ উসামার এই পদ্ধতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। যেমন: গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একনায়কতান্ত্রিকতা, অদ্ভূত মাধ্যমের ব্যবহার, গণবিচ্ছিন্ন কর্মসূচি ও প্রকাশ্যে মারামারি-হানাহানিতে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি সূক্ষ্মভাবে এই মহান দুই ইমামের জিহাদী জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে এবং ইনসাফের সাথে উভয়ের চিন্তাধারার প্রতি নজর বুলায়, তাহলে বুঝতে পারবে, প্রবন্ধের লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাস্তবতাবিরোধী। মূলত বৈশ্বিক জিহাদের ব্যাপারে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, জাজির যুদ্ধে রুশ কমান্ডো বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর আরব ভাইদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শায়খ উসামার এই সফলতা দেখে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-ও শায়খের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন এবং সামরিক ক্ষেত্রে আরবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন। এরই ভিত্তিতে উভয়ে স্থির করেন, আফগানিস্তানে সেবামূলক মানবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামরিক সহযোগিতাও সমানভাবে দেওয়া হবে এবং এই কার্যক্রম একইসাথে [আফগানদের সঙ্গে] সম্মিলিত ও [আফগানদের থেকে] স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবে। এই পুরো কার্যক্রম আফগান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের সর্বসম্মত নীতিমালার আলোকে চালানো হবে। পাশাপাশি আফগান মুজাহিদদের সব দলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদে না জড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা হবে। রুশ বাহিনীর পতন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পিছু হটার আলামত যখন মোটামুটি স্পষ্ট, তখন উসামা বিন লাদেন ও আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান যে, পূর্ব থেকে পশ্চিমের বৈশ্বিক কুফরি শাসনের আধিপত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গোটা মুসলিম জাতিকে সামরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. জীবনের শেষ দিকের—বিশেষ করে শাহাদাতের আগের দু'বছরের—সব আলোচনা, সভা-সেমিনার ও গবেষণাকর্মে সমকালীন জিহাদের ব্যাপারে নিজ বক্তব্যের পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ইসলামের চলমান লড়াইয়ের বাস্তবতা এবং এর দাবি নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন। অতীত ও বর্তমান লড়াইয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে উম্মতে মুসলিমা যে গভীর সংকটে পড়েছে, তা নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। শায়খের কিছু বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হচ্ছে।

- শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তার জীবনের শেষদিকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পুরো ইসলামী বিশ্ব কাফেরদের আগ্রাসনের শিকার। মুসলিম ভূখণ্ড থেকে এই আগ্রাসি শত্রুদের বহিষ্কার করার জন্য বৈশ্বিক জিহাদ শুরু করা উম্মতের ওপর ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন—

  > 'যতদিন পর্যন্ত ইসলামের কোনো একটি অঞ্চলও কাফেরদের দখলে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী প্রতিটি মুসলিম গুনাহগার হতে থাকবে। প্রত্যেক মুসলিমকেই আল্লাহ তাআলা আন্দালুস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ফিলিপাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। মুসলিমদের হারানো প্রতিটি ভূখণ্ড সম্পর্কে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।'

  তিনি আরও বলেন—

  > 'বর্তমানে যে মুসলিম জিহাদ করবে না, সে ফাসেক। যদিও সে সারাদিন মসজিদে পড়ে থাকে, অনেক বড় আবেদ ও যাহেদ হয়।'

  তিনি বলেন—

  > 'আমাদের সর্বদা জিহাদের সাথে লেগে থাকতে হবে। জিহাদ অল্প সময়ের কোনো ফরয আমল নয়; বরং সারা জীবনের আমল। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন-সহ যেখানেই কোনো অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর শাসন আছে, সেখানেই জিহাদ ফরয হয়ে আছে।'

- এমনইভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুসলিম দেশগুলোর ওপর চেপে বসা দখলদার জায়নবাদী-ক্রুসেডার শত্রুদের দমনের একমাত্র উপায় হলো ন্যায়ভিত্তিক ফরয ইরহাব (ভীতিপ্রদর্শন)-এর বাস্তবায়ন এবং 'সহিংসতার বিপরীতে সহিংসতা'র নীতি গ্রহণ। এটাই তাদের উপযুক্ত পাওনা। এ জন্যই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট ভাষায় তার সেই ঐতিহাসিক কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন—**'হ্যাঁ আমরা ইরহাবী (সন্ত্রাসী); তারা জেনে নিক, ইরহাব (সন্ত্রাস) আমাদের দীনের একটি ফরয বিধান'**। রক্তের নিরাপত্তা কেবল রক্তের মাধ্যমেই সম্ভব। এই জায়নবাদী-ক্রুসেডার শত্রুর কাছে মধ্যমপন্থার অর্থ হলো, 'আমেরিকান ইসলাম' গ্রহণ করা। অথচ এই আমেরিকান ইসলাম আল্লাহর নাযিল করা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত, যে ইসলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ তাআলা যাকে মানুষের জন্য নির্বাচন করেছেন।
- শায়খের আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিল, যে বা যারাই দখলদার জায়নবাদী-ক্রুসেডার শত্রুদের সাহায্য করবে বা সমর্থন দেবে, [কৌশলগত দিক থেকে] তারা তাদেরই

অন্তর্ভুক্ত। যদিও সে ইসলামের অনুসারী ও আমাদের জ্ঞাতিভাই হয়। মুসলিম জাতির বর্তমান সংকট সঠিকভাবে বোঝার জন্য সঠিক রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝার বিকল্প নেই। আর তা হলো, **আঞ্চলিক তাগুতগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য আগে 'বৈশ্বিক কুফরি শক্তির মাথা'র বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।**

- শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিল, বৃহৎ আন্তর্জাতিক যে শক্তিটি মুসলিম ভূখণ্ডগুলো দখল করে বসে আছে, তার শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মুসলমানদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। অহংকারের আতিশয্যে নিজ থেকে যে চোরাবালিতে সে ঢুকে পড়েছে, সেখানেই তাকে ডুবিয়ে মারতে হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, যেন জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সে বাধ্য হয়েই মেনে নেয় এবং এই চোরাবালিতে আটকে পড়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে করতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে শায়খ আযযাম রহ. বলেন—

  'আমরা যদি রাশিয়াকে এই জালে আটকে ফেলতে পারি এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারি, যাতে আফগানিস্তানে তাদের সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে অর্ধ মিলিয়ন পর্যন্ত নিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে এর অর্থ হলো আফগানে তাদের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার। কারণ, তখন পুরো এশিয়ার জন্য রাশিয়ার রিজার্ভ ফোর্সের পুরোটাই আফগানে মোতায়েন করতে হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা এই ভুলটিই করেছিল। এত বিশাল ব্যয় সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনোভাবেই বহন করতে পারবে না। রাশিয়া এমন ভুল করবে এমন সম্ভাবনা যদিও নেই। তবু আমাদের কাজ হলো, এমন এমন মারাত্মক ও বিধ্বংসী হামলার পরিকল্পনা করা, যাতে রাশিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য মাতাল হয়ে ওঠে এবং বেশি বেশি সৈন্য মোতায়েন করে নিজের ক্ষতিও বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলে। এতে তাদের যুদ্ধের মনোবলও ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকবে এবং বুখারা ও তাশখন্দের মতো অধিকৃত ইসলামী ভূখণ্ডের মানুষেরাও রাশিয়ার দুর্বলতা ধরতে পারবে।'

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর বয়ান-বক্তৃতা ও গবেষণায় এ ধরনের কথা অনেক আছে। আমরা সামান্য কিছু উল্লেখ করেছি। শায়খ আযযামের এই চিন্তাধারাই পরবর্তীতে তার শিষ্য শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্ট্র্যাটেজিক ভিত্তি তৈরি করেছে। গ্লোবাল জিহাদের যে দর্শন আল-কায়েদা গ্রহণ করেছে, সেটাও এই চিন্তাধারার ওপরেই গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি শায়খ উসামা রহ.-এর বিপ্লবী প্রতিভা, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীল কর্মপন্থা এই দর্শনকে আরও গতিশীল করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, শায়খ আযযাম ও শায়খ উসামার মধ্যকার ক্ষুদ্র মতভিন্নতাকে যারা 'গ্লোবাল জিহাদের ব্যাপারে মানহাজগত মৌলিক বিরোধ' বলে চালিয়ে দিতে চায়, তাদের দাবি নিতান্তই অমূলক ও মিথ্যা। এমনইভাবে তাদের কথাও ভিত্তিহীন, যারা বলতে চায়, শায়খ আযযাম রহ. যে শরয়ী মূলনীতি ও সাংগঠনিক আদর্শ মেনে চলতেন, শায়খ উসামা রহ. তা লঙ্ঘন করে নিজের মনোমতো জিহাদের ব্যাখ্যা করে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন।

## আল-কায়েদার সূচনা

শায়খ ফারিস যাহরানী তার 'উসামা বিন লাদেন: মুজাদ্দিদুয যমান ওয়া কাহিরুল আমরিকান' বইয়ে লিখেছেন—

> 'নির্দিষ্ট করে বললে আল-কায়েদার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। ততদিনে জিহাদী চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যুদ্ধের ময়দানগুলোও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং দায়িত্বও বেড়ে গেছে। শায়খ উসামা রহ. খেয়াল করে দেখলেন, আরব মুজাহিদরা ব্যাপকভাবে আসা-যাওয়া করছেন এবং বিভিন্ন ফ্রন্টে সরাসরি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করছেন। এমনকি হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। অথচ এই পুরো কার্যক্রমের কোনো রেকর্ড তার কাছে নেই। সৌদি ও ইয়েমেন থেকে আগত মুজাহিদদের পরিবারের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যেই তার সাথে যোগাযোগ করা হয়, কখনোবা তারা লোক পাঠিয়ে পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে খোঁজ নেয়। তাদের সন্তোষজনক কোনো উত্তর না দিতে পারায় শায়খ রহ.-কে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।
>
> এই সমস্যা সমাধানের জন্য শায়খ উসামা রহ. আরব মুজাহিদদের তথ্যসম্বলিত একটি রেকর্ড তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। যাতে মুজাহিদদের আগমন এবং আহত-নিহত ভাইদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তীতে এই চিন্তাকে আরও সম্প্রসারণ করে আফগানিস্তানে আগত প্রত্যেক আরব মুজাহিদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শায়খ উসামার তত্ত্বাবধানে বিশেষ একটি দল পুরো বিষয়টির দেখাশোনা করা শুরু করে।
>
> রেকর্ডে ধারাবাহিকভাবে তথ্যগুলো তুলে রাখা হতো। একজন ব্যক্তি কবে আফগানিস্তানে আসলেন, বাইতুল আনসারে কবে যোগ দিলেন, ট্রেইনিং ক্যাম্পে ভর্তি হওয়ার বিবরণ, যুদ্ধফ্রন্টে যোগ দেওয়ার বিবরণ—সবই এতে লিখে রাখা হতো। রেকর্ড রাখার কাজটি বড় হতে হতে একসময় স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। তখন নিজেদের মধ্যে পরিচিতির জন্য এর একটি নাম দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। শায়খ উসামা রহ. তার

সহযোগীদের সাথে পরামর্শ করে এর নাম রাখেন 'আল-কায়েদার (ঘাঁটি) রেকর্ড'। কেননা, আল-কায়েদা (ঘাঁটি) শব্দের মধ্যে বাইতুল আনসার, প্রশিক্ষণক্যাম্প এবং যুদ্ধফ্রন্ট—সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

## বাইয়াত ও অঙ্গীকার

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে আল-কায়েদা আনুষ্ঠানিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে-সব যুবক শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে থেকে জিহাদী কাজ করতে চায় এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে চায়, শায়খ তাদের থেকে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত নেওয়া শুরু করেন। শুধু সৌদি বা আরব যুবকদের মাঝেই এই বাইয়াত সীমাবদ্ধ ছিল না; আরব-আজম সকলেরই বাইয়াতের সুযোগ ছিল।

ক্যাম্পগুলোতে অসংখ্য মুজাহিদদের ট্রেইনিং দেওয়া হলেও খুব অল্পসংখ্যক মুজাহিদকেই তানজীমের সাথে কাজ করার জন্য নির্বাচন করা হতো। নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াটিও সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা হতো। ৪৫ দিনের মৌলিক কোর্স শেষ করার পর ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষ তাঁদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্যের আলোকে সন্তোষজনক রিপোর্ট করলেই কেবল তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। তানজীমে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। পাশাপাশি আরেকটি লাভও হয়েছিল। যেহেতু কেউ চাইলেই যখন-তখন তানজীমের সদস্য হতে পারত না, বরং কর্তৃপক্ষ থেকে সদস্য বাছাই করা হতো। ফলে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য মুজাহিদরাই কেবল তানজীমের সদস্য হতো। আল-কায়েদার জিহাদী কার্যক্রমের ওপর এই নীতির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। তানজীমের লক্ষ্য ছিল এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি করা, যাদের ওপর কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও নির্ভয়ে আস্থা রাখা যায়। এ জন্যই আল-কায়েদার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন সবর ও ইয়াকীনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৩] অন্যদের পক্ষে যা অসম্ভব, আল-কায়েদার সদস্যরা অনায়াসেই তা করে ফেলতে পারতেন। নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজ স্থানেই তাঁরা অবিচল থাকতেন। তাঁরা নিজেদেরকে জিহাদী অট্টালিকার সামান্য ইট বলে বিশ্বাস করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মুবারক হাদীস তারা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন—

**طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ**

'জান্নাতের সুসংবাদ তার জন্য, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে সদা প্রস্তুত থাকে। যার চুল এলোমেলো, পা ধুলোমলিন। তাকে [বাহিনীর অগ্রভাগে] পাহারায় নিযুক্ত করলে,

[৩] উসামা বিন লাদেন: মুজাদ্দিদুয যমান: ফারিস যাহরানী

পাহারাতেই নিয়োজিত থাকে আর বাহিনীর পেছনে রাখলে, সেখানেই থাকে।' [সহীহ বুখারী: ২৮৮৭]

আমীরের আনুগত্য ও সঙ্গীদের সাথে কোমল আচরণের ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বাস্তব নমুনা হিসেবে তৈরি করেছিলেন তাঁরা।[৪]

## আল-কায়েদার দর্শন

অন্যান্য জিহাদী জামাতের মতো আল-কায়েদা আঞ্চলিক চিন্তাধারার কোনো তানজীম নয়; বরং সূচনালগ্ন থেকেই তা বৈশ্বিক চিন্তাধারা লালন করে আসছে এবং এর সদস্যদের মধ্যেও নানা দেশের মানুষ আছে। শায়খ উসামা রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, জিহাদের এই নবজাগরণ যেন [রুশ হামলার] নিরেট প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং আদর্শিক নেতৃত্বহীনতার শিকারে পরিণত না হয়। সাইকস-পিকোর বেঁধে দেওয়া কাঁটাতারের সীমানার মধ্যেও যেন জিহাদ সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। তিনি মুজাহিদদের এমন এক সুশৃঙ্খল, দ্রুত ও মজবুত বাহিনী তৈরি করতে চাচ্ছিলেন, যারা মুসলমানদের বিপদে মুহূর্তে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না, দূরত্ব যাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের সাহায্যে যারা সুদূর চীনেও ছুটে যাবে।

আল-কায়েদার এই দর্শনের সারকথা ছিল, ইসলামের এই জিহাদ কোনো শহর বা দেশের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না; বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যেন মানবজাতি মাখলুকের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে খালেকের গোলামি করতে পারে। এটাই আল-কায়েদার দর্শন। আর এই দর্শনের সূচনা হয়েছে আফগানের ভূমিতে। আফগানিস্তান হলো জিহাদের যাত্রাপথের একটি মনযিল, দুর্গম ও দীর্ঘ পথের পথিকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার স্থান। শায়খ উসামা রহ. তানজীমের এই লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে বলেন—

> 'আমাদের এই জিহাদ শুধু আফগানিস্তানকে মুক্ত করার জন্য নয়। আফগানিস্তান ইসলামী বিশ্বের একটি অংশমাত্র। আমাদের লক্ষ্য হলো [আফগানের ভূমিতে] আরব ও মুসলিম যুবকদের সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যেন তারা আফগান মুজাহিদ ভাইদের সাথে মিলে এমন একটি ইসলামী বাহিনীর ভিত রচনা করতে পারেন, যারা মুসলমানদের সকল ভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে।'[৫]

[৪] ফুরসানুল ফারীযাতিল গায়েবা: সালেহ আল-হামী

[৫] তানজীমুল কায়েদা: আন নাশআহ, আল-খলফিয়্যাতুল ফিকরিয়্যাহ, আল-ইমতিদাদ: সাঈদ আলী উবাইদ আল-জুমাহী

এভাবেই ছোট একটি বাহিনী হিসেবে আল-কায়েদার সূচনা হয়। যারা বাস্তবিক অর্থেই আমীরের আনুগত্য, স্থিরতা ও শৃঙ্খলার জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন। বিস্তৃত চিন্তা আর উদার মানসিকতার একঝাঁক নেতার অধীনে পরিচালিত পরিকল্পনার আলোকে যে-কোনো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা ছিলেন সদাপ্রস্তুত। তারা কাজ করতেন ভবিষ্যতের জন্য। তাঁদের পরিকল্পনা আবর্তিত হতো আফগানিস্তান থেকেও বহুদূরের ভূমি ও মানুষকে ঘিরে। অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত করতেন। এতদসত্ত্বেও আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দকে সর্বদা উত্তপ্ত রণাঙ্গণেই পাওয়া যেত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, মুজাহিদদের মনোবল শক্তিশালী করা আর মুসলিমদের ভূমিগুলোকে কাফেরদের দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁরা বরাবর যুদ্ধের ময়দানেই থাকতেন। তীব্র যুদ্ধ চলাকালে যতবারই শায়খ উসামা রহ. উপস্থিত থাকতেন, প্রতিবারই শাহাদাতের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। অনেকবার এমন হয়েছে, তিনি নিশ্চিত হয়ে গেছেন এবার তিনি শহীদ হয়েই যাবেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।[৬]

## আল-কায়েদার মানহাজ

কিছু ভাই শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তানজীমের জন্য একটি লিখিত মানহাজ প্রণয়ন করেন। যে মানহাজের আলোকে তানজীম কাজ করবে এবং যা অন্যান্য দল থেকে তানজীমকে আলাদা করবে। কিন্তু শায়খ উসামা রহ. খুব সহজভাবে ভাইদের বলেছিলেন—

> ‘আমাদের মানহাজ তো তা-ই, যা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহতে এসেছে; যা হেয়াদেতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী উম্মাহর সালাফদের পথ ও পদ্ধতিতে রয়েছে।’

এ ব্যাপারে শায়খ হুসাইন বিন মাহমুদ তার ‘هذه هي القاعدة (এটাই আল-কায়েদা)’ শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন—

> ‘আল-কায়েদার বই-পুস্তকে ‘আল-কায়েদার জন্য বিশেষায়িত’ কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। লিখিতভাবে আল-কায়েদার আলাদা কোনো আকীদা বা মানহাজ নেই। যা আছে তা হলো, উদ্ভূত নানান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ফিকহী সিদ্ধান্তের সংকলন। এ ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ সাধারণত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদ ও গবেষণা

[৬] ফুরসানুল ফরিযাতিল গায়েবা: সালেহ আল-হামী

থেকে সহায়তা নেন। আল-কায়েদার আলাদা মানহাজ বা আকীদা না থাকাটা আসলে অজ্ঞতা বা অপারগতার কারণে নয়; বরং এটা প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ। কেননা, প্রতিটি মুসলিমের প্রকৃত মানহাজ তো আল্লাহর যিম্মায় (কুরআনে) লিখিত ও সংরক্ষিত আছে। অতএব কোনো দলের জন্য নতুনভাবে বিশেষ কোনো মানহাজ লিখে মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্রতা তৈরি করে তার আলোকে ওয়ালা-বারা'র আকীদাকে পুনর্মূল্যায়ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পূর্ববর্তী অনেক আলেমই বিশুদ্ধ ইসলামী মানহাজের ব্যাপারে লিখে গেছেন। গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ দলীলই মুজাহিদদের মানহাজ।

সালাফে সালিহীন যেভাবে কুরআনুল কারীম ও রাসূলের সুন্নতকে বুঝেছেন, সেটাই আল-কায়েদার মানহাজ। ইসলাম বলতে আমরা একেই বুঝি। কুরআন ও সুন্নতে যা কিছু আছে, সালাফের ব্যাখ্যার আলোকে সেটাই আল-কায়েদার আকীদা। এই আকীদাই আমরা লালন করি। প্রচলিত অর্থে আল-কায়েদার আকীদা ও মানহাজ প্রণয়ণের জন্য আলাদা কোনো তাত্ত্বিক নেই, যেমনটা অন্যান্য দলের আছে। আল-কায়েদা কেবল কুরআন, সুন্নত এবং উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করে, যারা শরয়ী নুসুসের প্রশস্ত সীমার মধ্যে থেকে ইজতিহাদ ও গবেষণার গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। ইজতিহাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রে আল-কায়েদাকে দিকনির্দেশনাদানকারী এই উলামা ও তালেবে ইলমগণ সাধারণত উম্মতের প্রাচীন ও সমকালীন আলেমদের ফিকহী মাযহাব, দেশ বা সাংগঠনিক পরিচয়কে একপাশে রেখে তাদের গ্রহণযোগ্য মতামত থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল-কায়েদার কাছে কেবল শরীয়তের দলীলই গ্রহণযোগ্য। যখন কোনো বিষয় শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে, সেটাই আল-কায়েদার কাছে মাযহাব ও মানহাজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।[৭]

এর দ্বারাই স্পষ্ট হয়, আল-কায়েদা প্রচলিত অর্থে সাধারণ কোনো সংগঠন নয়; বরং আল-কায়েদা মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। উম্মত থেকে আল-কায়েদাকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মিডিয়া যতই প্রোপাগাণ্ডা করুক, সরকার যতই চেষ্টা করুক, উলামায়ে সু আল-কায়েদাকে উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যত নাম ও উপাধিই দিক, কারও পক্ষেই আল-কায়েদাকে উম্মতে মুসলিমা থেকে আলাদা করা সম্ভব না। তারা আল-কায়েদাকে 'সন্ত্রাসী' বলে, 'গোমরাহ ফেরকা' বলে, 'চরমপন্থি' বলে,

[৭] দলগতভাবে আল-কায়েদার কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব নেই। যেহেতু আল-কায়েদা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি সংগঠন আর এতে সারা বিশ্বের নানা দেশের নানা মতের মানুষ কাজ করে, তাই প্রত্যেক দেশের মানুষ এবং তাদের ফিকহী মাযহাবকে আল-কায়েদা সম্মান করে। নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব আল-কায়েদা করে না। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, সালাফী—সকলেই এক পতাকাতলে যেন একতাবদ্ধ হতে পারেন, এ জন্য আল-কায়েদা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করে না। আল-কায়েদার কোনো মাযহাব নেই—এ কথার উদ্দেশ্য এটিই। [সম্পাদক]

'বোমাবাজ' বলে, 'উগ্র' বলে, 'খারেজি', 'তাকফীরী'-সহ আরও অনেক নামে ডাকে, বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তাদের দেওয়া এ সকল অপবাদ চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়।'

আল-জাযীরার সাংবাদিক তাইসীর আল্লুনী শায়খ উসামা রহ.-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ব্যক্তি উসামা বিন লাদেনের সাথে আল-কায়েদার সম্পর্ক ও অস্তিত্ব কতটা নির্ভরশীল?' এ প্রশ্নের জবাবে শায়খ রহ. জোর দিয়ে বলেন—

'আপনি যে ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে আমি আগেও কথা বলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখানে আমি বা আল-কায়েদা কোনো বিষয় না; বরং আমরা উম্মতে মুসলিমার সন্তান, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমাদের রব এক, আমাদের নবী এক, আমাদের কিবলা এক, আমাদের কিতাব এক, আমরা এক জাতি। এই সম্মানিত কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নত আমাদেরকে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তাই সকল মুমিন ভাই ভাই। 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরে ভাই ভাই'। [সূরা হুজুরাত (৪৯): ১০)

পশ্চিমারা যেভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে যে, এই নামে বিশেষ একটি দল রয়েছে, আসলে বিষয়টি তেমন না। নামটি অনেক পুরোনো। কোনো ধরনের পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মূলত সন্ত্রাসী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবু উবায়দা পানশীরী রহ. একটি ট্রেইনিং ক্যাম্প শুরু করেছিলেন। সেই জায়গাটিকে আমরা অন্যান্য ট্রেইনিং ক্যাম্পের মতোই 'আল-কায়েদা' (ঘাঁটি) বলতাম। পরে ধীরে ধীরে এই নামটিই সংগঠনের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তবে আমরা কখনোই উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না, আমরা এই উম্মতেরই সন্তান, এই উম্মতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূর্ব দিকের ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারত, পাকিস্তান-সহ মৌরিতানিয়া পর্যন্ত এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তরের অব্যক্ত কথাই আমরা বলি। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে যে যুবকরা নিজেদের কুরবানী করেছে, আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করুন, তারা উম্মতের চেপে রাখা বেদনাকেই উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছে। এই উম্মতের প্রাণের দাবি একটিই—সকল জালেম, অত্যাচারী, অপরাধী, নিরপরাধ মানুষদের ভীতিপ্রদর্শনকারী আসল সন্ত্রাসীদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। সব সন্ত্রাস নিন্দনীয় নয়; কিছু সন্ত্রাস নিন্দনীয় আর কিছু আছে প্রশংসনীয়। চোর পুলিশকে ভয় পায়, তাই বলে কি আমরা পুলিশকে বলব, তুমি চোরকে ভয় দেখাচ্ছ, তাই তুমি একজন সন্ত্রাসী? যদি আমরা পশ্চিমাদের কথা মেনে নিই, তাহলে তো পুলিশও সন্ত্রাসী। কিন্তু আমরা তা বলি না। কেননা, চোরের বিরুদ্ধে পুলিশের সন্ত্রাস প্রশংসনীয় সন্ত্রাস। আর নিরাপদ মানুষদের বিরুদ্ধে অপরাধীর সন্ত্রাস

হলো নিন্দনীয় সন্ত্রাস। আমেরিকা ও ইসরাইল এই নিন্দনীয় সন্ত্রাস চর্চা করছে, আর আমরা ফিলিস্তিন ও অন্যান্য ভূখণ্ডে এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আমাদের সন্তানদের জীবন রক্ষা করতে প্রশংসনীয় সন্ত্রাসের চর্চা করছি।'[৮]

## আল-কায়েদার পরিচালনা পর্ষদ

আল-কায়েদার কার্যক্রমসমূহ কয়েকটি কমিটির অধীনে পরিচালিত হতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- আল-লাজনাতুল আসকারিয়্যাহ (সামরিক শাখা): এই শাখার অধীনে ট্রেইনিং ক্যাম্প, যুদ্ধফ্রন্ট ও বাহিরের সকল অভিযান পরিচালিত হতো। এর দায়িত্বশীল ছিলেন শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ.।
- আল-লাজনাতুল আমনিয়্যাহ (নিরাপত্তা শাখা): এর দায়িত্বশীল ছিলেন শায়খ সাইফ আল-আদল হাফিযাহুল্লাহ।
- আল-লাজনাতুল মালিয়্যাহ ওয়া শুউনিল আফরাদ (অর্থ ও সদস্য শাখা): এর দায়িত্বশীল ছিলেন শায়খ সাঈদ (মুস্তফা আহমাদ উসমান আবুল ইয়াযীদ) রহ.।
- আল-লাজনাতুশ শরইয়্যাহ (শরীয়াহ শাখা): এর দায়িত্বে ছিলেন শায়খ আবু ইবরাহীম মিসরী। পরে সুদানে শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফি. তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
- আর ছিল ছোট্ট পরিসরে একটি মিডিয়া শাখা। এর কাজ ছিল বিশ্বের চলমান ঘটনাবলি ও সংবাদ পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে পত্রিকা আকারে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন যুদ্ধফ্রন্ট, মারকায ও মুজাহিদদের কাছে সরবরাহ করা।

পেশোয়ারে আল-কায়েদা সদস্যদের বিশেষ মেহমানখানার নাম ছিল বাইতুস সালাম। আরেকটি ভবন ছিল, যা শরয়ী ইনস্টিটিউট হিসেবে ভাইদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে বিভিন্ন ধরনের শরয়ী কোর্সের আয়োজন করা হতো।[৯] তানজীমের একজন প্রশাসনিক ভাই সব সময় সেখানে থাকতেন। তিনি সেখানে থাকা আল-কায়েদা সদস্যদের যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্বশীল ছিলেন এবং তানজীমের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করতেন। ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে একজন মুজাহিদ প্রশিক্ষণ শেষ করে বের হওয়ার পর আল-কায়েদার কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে যখন বাইয়াত করতেন, তখন তার বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুযায়ী তাকে তানজীমের কোনো একটি শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো। শায়খ আবু হাফস কমান্ডার

[৮] শায়খ উসামা রহ. এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন।

[৯] উল্লেখ্য, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফি. এই কোর্সগুলোর অন্যতম প্রশিক্ষক ছিলেন।

রহ.-ও এই বাড়িতে থাকতেন। ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ ও কমান্ডাররা আলোচনা করতে আসলে তিনি তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করতেন এবং জটিল বিষয় নিয়ে শলাপরামর্শ করতেন।

শায়খ উসামা রহ. আল-কায়েদা ও আল-কায়েদার বাইরের শত শত বিবাহিত মুজাহিদ ভাইয়ের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করতেন। তাদের অনেকের বাড়িভাড়া দিয়ে দিতেন, আবার নিজ খরচে অনেককে ঘরও বানিয়ে দিতেন। আল-কায়েদার কিছু অবিবাহিত ভাইকেও তিনি নিয়মিত মাসিক ভাতা দিতেন। বাইতুল আনসার-সহ আল-কায়েদার অনুগত না এমন কিছু মেহমানখানার খরচও শায়খ নিজেই বহন করতেন। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে সামরিক খাতেও শায়খ সহযোগিতা করতেন। তার এই অনুদান খোস্ত, গারদেয ও জালালাবাদের বিভিন্ন ট্রেইনিং ক্যাম্প ও যুদ্ধফ্রন্টে সরবারহ করা হতো। ময়দানে সক্রিয় অন্যান্য আঞ্চলিক জিহাদী দলগুলোকেও তিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন, যে-কোনো নেক কাজে তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেন। এমনকি শায়খ রহ. অনেক মুজাহিদ ভাইয়ের যাতায়াতের জন্য বিমানভাড়াও দিয়ে দিতেন। পাকিস্তানের বাইরে অত্যাধুনিক হাসপাতালে আহত ভাইদের চিকিৎসার জন্যও তিনি খরচ দিতেন। এ ছাড়াও ভাইদের দিয়ত (রক্তপণ) আদায়, বিবাহের খরচ এবং হজ করতে ইচ্ছুক ভাইদের হজের খরচও তিনি বহন করতেন।

## আবু ইবরাহীম আহমদ বিন নাসরুল্লাহ মিসরীর ঘটনা

আলেম হিসেবে পেশোয়ারে এই লোকটির খুব নামডাক ছিল। এমনকি এক সময় তিনি তানজীমের শরয়ী শাখার দায়িত্বশীলও ছিলেন। জিহাদ, রিবাত, শাহাদাতের ফযীলত-সহ অনেক বিষয়ে তিনি অনেকগুলো বই ও রিসালাও লিখেছিলেন। তার এ সমস্ত বই-পুস্তক মুজাহিদদের মেহমানখানাগুলোতে বিতরণ করা হতো, বিভিন্ন ময়দানে ও মারকাযে এগুলো রাখা হতো। তিনি সব সময় কোনো না কোনো ইলমী বিষয়ে কোর্স করাতেন। মাঝে মাঝে আল-কায়েদার মেহমানখানা, বাইতুল আনসার এবং অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে দরস দিতেন ও নসীহত প্রদান করতেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অনেকের সাথে তিনিও সুদানে হিজরত করেছিলেন। পরে সম্ভবত ১৯৯৪ সালে তিনি সুদান থেকে ইয়েমেন চলে গিয়েছিলেন।

ইয়েমেন গিয়ে এই ব্যক্তি সেখানকার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আল-কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদী দলকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র তৈরি করে তাদের কাছে পেশ করে। তখন হিযবুল ইসলাহের

অনেক সদস্য এজেন্সিতে সক্রিয় ছিল। তাদেরই একজন[১০] তার ফাইলটি গোপনে মুজাহিদ ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। ফলে ভাইয়েরা তাকে বন্দি করেন এবং হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সে ভাইদের কাছে মিনতি করে বলে, তার অবস্থা নাকি সাহাবী হাতেব বিন আবি বালতাআ রাযি.-এর মতো। অর্থাৎ সে মুনাফেকি করেনি, সে যা করেছে তা কেবল জীবিকার তাড়নায় বাধ্য হয়ে করেছে। তার এমন দাবির ফলে ভাইদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে যায় এবং তাকে নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। পরে ভাইয়েরা তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সে পালিয়ে মিশর চলে যায়। সেখানে যাওয়ার পর তার আসল পরিচয় প্রকাশ পায়। মূলধারার পত্রিকাগুলোতে তার ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশিত হয়, 'মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থা তাদের এক এজেন্টকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে'। এক সাক্ষাৎকারে সে গর্বের সাথে নিজেকে 'একজন সফল এজেন্ট' বলেও দাবি করে। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিরাপত্তা ও দৃঢ়তা কামনা করছি।

## আবু ইবরাহীম মিসরীর ঘটনা ও আমাদের শিক্ষা

আবু ইবরাহীমের ঘটনায় শিক্ষণীয় এমন অনেক কিছুই আছে, যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফি. তার প্রবন্ধ রজউস সাদা–তে[১১] এর সারসংক্ষেপ আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন—

১. এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, নিজ পরিণতির ব্যাপারে ভয় করা। নিজের ওপর অধিক ভরসা না করা। সর্বদা আল্লাহ তাআলার মুরাকাবা করা, তার প্রতি মনযোগী থাকা এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকা। ইলম, ইবাদত ও জিহাদে কোনো ব্যক্তির অবস্থান যত উঁচুতেই হোক না কেন, ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। মানুষ যত বড় হবে, তার ফিতনা ও পরীক্ষা তত মারাত্মক হবে, তার পতন তত কঠিন হবে। এ জন্য মানুষের ইলম ও মর্যাদা যত বৃদ্ধি পায়, তার ফিতনার আশঙ্কাও তত বৃদ্ধি পায়। তাই অধিক সতর্ক ও ভীত থাকা উচিত। আমি সব সময় সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর একটি কথা বলে থাকি। একবার তিনি

[১০] হিযবুল ইসলাহের যে ভাই মুজাহিদদের কাছে আবু ইবরাহীমের ফাইল পৌঁছে দিয়েছিলেন, মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার পরিচয় বের করেছিল। ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে এক ব্যাবসায়িক সফরে থাকাকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে 'আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে' তাকে মার্কিন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গ্রেফতারের পর তাকে গুয়ান্তানামো কারাগারে পাঠানো হয়। আজ অবধি তিনি সেখানে বন্দি আছেন। মার্কিন সরকার তাকে-সহ আরও কয়েকজনকে 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি'র অভিযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

[১১] ২০১৭-১৮ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফি. নিয়মিত লেখালিখি করতেন। তার এই লেখাগুলোর একটি সংকলন বের হয়েছে 'শুযুরুয যাহাব' নামে। এই সংকলনে উল্লিখিত লেখাটি আছে।

কাঁদছিলেন। লোকেরা মনে করল, তিনি হয়তো গুনাহের কথা স্মরণ করে কাঁদছেন। এ কথা বুঝতে পেরে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'মৃত্যুর সময় ঈমান হারানোর ভয়ে আমি কাঁদছি।'

এই ব্যক্তি (আবু ইবরাহীম) কিছুদিন আগেও মানুষকে নসীহত করেছে, মৃত্যুর সন্ধানে যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ আজ তার পরিণতি কী হয়েছে দেখুন। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, প্রত্যেকের ভীত থাকা উচিত। অন্তরের পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ভয় ও শঙ্কা নিয়েই বাঁচা উচিত।

২. এ ধরনের ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় এবং সতর্ক করে যে, দীনের প্রকৃত খাদেমদের কাছে প্রতারকদের আসল চেহারা একদিন না একদিন উন্মোচিত হবেই। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের ওপর রহম করেছেন। যারা গোপনে এই উম্মত ও জিহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, আল্লাহর দীনের সাথে প্রতারণা করে এবং এই উম্মতের সাথে খেয়ানত করে, তিনি কিছুদিন তাদের বিষয়গুলো গোপন রাখেন। তবে একদিন আল্লাহ তাআলা তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দেন। যতই নিজেদের গোপন করার চেষ্টা করুক বা আড়ালে থাকুক না কেন। এ সকল লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতি এটাই—তিনি তাদের লাঞ্ছিত করেন, তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন এবং তাদের অপমানিত করেন, যাতে দীনের নিবেদিতপ্রাণ খাদেমগণ প্রতারণার এই অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারেন।

আমাদের সালাফগণ সত্যই বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করবে, সকালবেলা লোকেরাই তার ব্যাপারে বলাবলি করবে, অমুক মিথ্যাবাদী'। আল্লাহর দীন ও জিহাদের ব্যাপারে কেউ মিথ্যা বলে সারা জীবন লুকিয়ে থাকতে পারবে, এমন ভাবার সুযোগ নেই। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, মৃত্যুর আগেই আল্লাহ তার সব জারিজুরি ফাঁস করে দেবেন। আল্লাহ তাআলাই মানুষের মুখে তার ওপর লানতের ধারা চালু করে দেবেন। এই লানতের বোঝা সে বেঁচে থাকতেও বহন করবে, মৃত্যুর পরেও বহন করবে। মানুষ তার নাম শুনলেই পাথর নিক্ষেপ করবে, যেমন আবু রুগালের কবরে নিক্ষেপ করে থাকে।

৩. গুপ্তচরবৃত্তি প্রাচীন কৌশল। কোনো সমাজই এর থেকে শতভাগ মুক্ত থাকতে পারে না, তা যতই পবিত্র আর নিরাপত্তাবেষ্টিত হোক না কেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো যিন্দিকের উপস্থিতি প্রকাশ পেলে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীকে দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু এই দীনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোথাও নেই। তা হলো, আল্লাহ তাআলা এই দীনের সাথে খেয়ানতকারীদের কীর্তি একসময় না একসময় ফাঁস করেই দেন। তার আগ পর্যন্ত তাকে ছাড় দেন, তার অপকর্মগুলো গোপন রাখেন। এর দ্বারা আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন আর অপেক্ষা করেন, সে তাওবা করে কি-না। এ কারণে মুজাহিদ, আলেম ও সাধারণ

মানুষের প্রতি আমাদের সুধারণা রাখা উচিত, যতক্ষণ না তাদের ব্যাপারে বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দায়িত্ব এতটুকুই। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা আমরা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেব। আল্লাহ তাআলাই তাকে লাঞ্ছিত করবেন, তার কুকীর্তি ফাঁস করবেন এবং তাকে অপদস্থ করেই ছাড়বেন। নির্ধারিত সময় আসলে তিনিই তার সম্মানকে লাঞ্ছনায় পরিবর্তন করে দেবেন, তার নামকে অপমান আর ভর্ৎসনার পাত্র বানিয়ে দেবেন এবং দীনের উসিলায় যে মর্যাদা অর্জন করেছে, তা বিলীন করে সাধারণ মানুষের মাঝেই তার প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দেবেন।

এই আবু ইবরাহীমের আসল পরিচয় প্রকাশ হওয়ার পেছনে তাকদীর কীভাবে কাজ করেছে, তা জানলে আপনিও অবাক হবেন। প্রতারকদের পরিচয় ফাঁস হওয়ার এই সুন্নত যদি না থাকত, তাহলে কেউই তার ব্যাপারে একটি কটুবাক্যও বলতে পারত না।

আমি এ সব বলছি কেবল আল্লাহর ক্রোধ থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য; আল্লাহর এই 'মুখোশ উন্মোচনের সুন্নত' থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস আছেই বা কার!

সাথে সাথে এই ঘটনা মুসলিমদের নিশ্চিত করেছে, এই দীন চিরকাল নিরাপদ থাকবে। এটা আল্লাহ তাআলার দীন, তিনিই এই দীনকে সকল অনিষ্টকারী ব্যক্তি ও কথা থেকে রক্ষা করবেন। এই ঘটনায় ভয়ের কিছুই নেই। এর কারণে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অনাস্থা তৈরির কোনো সুযোগ নেই, কারো গোপন বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করারও প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি মানুষের গোপন বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, আল্লাহ তাআলা তার গোপন বিষয়গুলো মানুষদের সামনে প্রকাশ করে দেন, যদিও সে তার অন্দরমহলে অবস্থান করে।

এই ঘটনা আমাদের আরও শিক্ষা দিচ্ছে, শত্রুরা আমাদের পছন্দসই মাধ্যম অবলম্বন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের দোসরদের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তারা হাত দেয়নি। দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সুযোগসন্ধানীদের খুঁজে বের করে নিজের শিকারে পরিণত করতে তাদের সর্দার ইবলিসেরও চেষ্টার কোনো শেষ নেই। ইলমের ময়দান বা জিহাদের ময়দান—কোনো ক্ষেত্রেই ইবলিস ও তার দলবল কখনো হতাশ হয়নি। কোনো না কোনো ভাবে নিজেদের লোক তারা তৈরি করে নিয়েছে। তাই দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সকল পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এটা আমাদের জন্য কঠিন কিছু না। তারা আপনার সামনে আসবে দাড়ি-টুপি আর দীনী লেবাসের বেশ ধরে। কখনো আসবে ভক্তি, মুহাব্বত আর জিহাদপ্রেমের খোলস জড়িয়ে। এ ধরনের দীনী আবেগ ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ করাই তাদের জন্য সবচেয়ে

সহজ। কিন্তু দিনশেষে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া আর মানসম্মান হারিয়ে অপদস্থ হওয়াই তাদের ভাগ্যের লিখন। তবু সতর্ক থাকা আমাদের কর্তব্য।

শত্রুদের ব্যবহৃত এসব কূটকৌশল যত জানবেন, তাদের ভেতরের কদর্যতা ততই আপনার সামনে স্পষ্ট হতে থাকবে। দীনদার ব্যক্তিদের তারা এমন এমন ফাঁদে ফেলে দেয়, যে সম্পর্কে দীনদার ব্যক্তিরা কিছুই জানেন না। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে, মনে হবে তারা মাতাল হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এ সকল নির্লজ্জ কাজ দেখে বুঝতে পারবেন, তারা ঠিক কতটা নিকৃষ্ট। আসলে তাদের অপরাধ ও কদর্যতার কোনো সীমা নেই।

৪. এটাই আমাদের জীবন। কোনো ভয়ভীতির পরোয়া না করে আমরা আমাদের জীবন কাটাব। কেউ ভালো কাজের আহ্বান করলে আমরা সাড়া দেব। আর কেউ মন্দ কাজের আহ্বান করলে উপেক্ষা করব। আমরা মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাদের বিচার করব আর অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেব। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো মানহানি করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। সত্যের যেমন আলামত আছে, মিথ্যারও রয়েছে হাজারো আলামত।

এই মুজাহিদ [আবু ইবরাহীম] যদি ফিতনার শিকার হওয়ার আগে শাহাদাতবরণ করতেন, তাহলে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে যেতেন। মনে রাখতে হবে, দীনী যত আলোচনা তিনি করেছেন, তা শুধু এ জন্য বাতিল হবে না যে তিনি খারাপ। হক সর্বদা হকই থাকে, যদিও তা কোনো অযোগ্য ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয়। তেমনই বাতিল সর্বদা বাতিলই থাকে, যদিও তা কোনো ওলীর মুখ থেকে বের হয়। [এ ধরনের ঘটনা] আপনার মনোবলে যেন চিড় ধরাতে না পারে। আপনি নিজেকে দীনের কাজে নিয়োজিত রাখুন। হক ও হেদায়েতের পরিচয় লাভ করাই আপনার কাজ। শয়তান যদিও মিথ্যাবাদী, তবু সে আপনাকে কখনো সত্যও বলতে পারে। হক-বাতিলের অন্তর্নিহিত পরিচয় প্রকাশ করার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। আপনি যেন হকপন্থি হতে পারেন আর হকের ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারেন, শুধু এ দিকেই মনোযোগ দিন।

কথাগুলো লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য—

**প্রথমত:** আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি, যখন হক ছেড়ে বাতিলের দিকে হিজরত করা আর দীনের পথ থেকে ছিটকে পড়ার জোয়ার শুরু হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনাকে এই ফিতনা থেকে হেফাযত করেন, আমৃত্যু এই পথে অটল রাখেন।

দ্বিতীয়ত: নিজেকে এবং ভাইদের সতর্ক করার জন্য। যেন আল্লাহর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ মন্দ অবস্থায় না হয়।

**তৃতীয়ত:** সাদিকীন ও হকপন্থী ভাইদের এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সত্য ও হকের পথে অল্পসংখ্যক মানুষই বাকি আছে, তাই ধৈর্য ধরুন।

**চতুর্থত:** সকলকে এই বার্তা দেওয়ার জন্য, যে আল্লাহর সাথে শক্তিপরীক্ষায় নামে, আল্লাহই তার ওপর জয়ী হন। 'আর আল্লাহ নিজ কাজে পূর্ণ ক্ষমতাশীল।' [শায়খের কথা এখানেই শেষ]

এই ঘটনা থেকে আরও কিছু শিক্ষা আমরা নিতে পারি—

অনেকে আল-কায়েদার সাথে কাজ করতে ভয় পায়। তারা বলেন, 'এই ব্যক্তির মতো গোয়েন্দা যদি তোমাদের দলে অনুপ্রবেশ করে শরয়ী বিভাগের দায়িত্বশীল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, তার মানে তো তোমাদের পুরো জামাতটাই গোয়েন্দাদের দখলে।'

তাদের উত্তরে আমরা বলব, আল্লাহ তাআলার এই আয়াতটির কথা চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ

'আর তোমাদের আশপাশের মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক কঠোর মুনাফিকিতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি।' [সূরা তাওবা (৯) : ১০১]

খাইরুল কুরুনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনাতেও মুনাফিক ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের উল্লেখ করছেন 'নিফাকের ক্ষেত্রে কট্টর' বলে। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে জানতেন না। সাহাবীদের যুগেই যদি এই অবস্থা হয়, আমাদের এই যুগ তো সাহাবীদের যুগ থেকে অনেক নিম্নমানের, তাহলে এই যুগের অবস্থা কেমন হবে?

এতটুকুই নয়; বরং বর্তমানে আমাদের সমাজে গোয়েন্দা তৎপরতার যে মুসীবত ছড়িয়ে পড়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় মদীনার সোনালি সমাজও এই মুসীবত থেকে মুক্ত ছিল না। মুসলমানদের শত্রু খ্রিষ্টানদের গুপ্তচরেরা মদীনার ভেতরেও সক্রিয় ছিল। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে কোনো সাহাবীকে দলে টানার কোনো সুযোগই তারা হাতছাড়া করত না। সীরাতের কিতাবগুলোতে জলীলুল কদর সাহাবী কাব বিন মালেক রা.-এর ঘটনা বিস্তারিত এসেছে। বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে যখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে বয়কট করেছিলেন, তখন

তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে ঘটনার কথা কাব বিন মালেক রা. নিজেই বলেন—

> 'আমি একদিন মদীনার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম, এ সময় মদীনার বাজারে শাকসবজি বিক্রির উদ্দেশ্যে আগত সিরিয়ার এক কৃষক বলতে লাগল, আমাকে কাব বিন মালেকের ঠিকানা বলতে পারে এমন কেউ আছে কি? লোকেরা ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিলে সে আমার নিকট আসল এবং গাসসানী সম্রাটের একটি চিরকুট দিলো। (চিরকুটটি এক টুকরো রেশমের ওপর লেখা ছিল।) যেহেতু আমি লেখাপড়া জানতাম। তাই তা পড়লাম। এতে লেখা ছিল, "আমি জানতে পেরেছি, তোমার সঙ্গী মুহাম্মাদ তোমার প্রতি জুলুম করেছে; অথচ আল্লাহ পাক তোমাকে এমন জায়গায় থাকতে বাধ্য করেননি, যেখানে তোমাকে লাঞ্ছিত করা হয় আর তোমার অধিকার খর্ব করা হয়। সুতরাং তুমি আমাদের নিকট চলে এসো। আমরা তোমাকে আমাদের অংশীদার বানিয়ে নেব।' [সহীহ বুখারী : ৪৪১৮; সহীহ মুসলিম : ৬৭৬০]

সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কঠিন মানদণ্ডের বিষয়টি তো সবাই জানে। দৃঢ়চেতা, আমানতদার, বিশ্বস্ত, মুত্তাকী, পরহেযগার ও আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রতি যত্নবান ব্যক্তি ছাড়া তিনি কাউকে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কাজে নিয়োগ দিতেন না। এতকিছুর পরও তার কর্মকর্তাদের মধ্যে এক মুনাফিক ছিল। 'উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ' কিতাবে ইবনুল আসীর রহ. বর্ণনা করেন, একমাত্র হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের ব্যাপারে গোপন তথ্য দিয়েছিলেন। এ জন্য উমর রা. তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো মুনাফিক আছে? হুযায়ফা রা. বললেন, হ্যাঁ একজন আছে। উমর রা. তার পরিচয় জানতে চাইলে হুযায়ফা রা. তার পরিচয় দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হুযায়ফা রা. বলেন, এরপর উমর রা. সেই লোকটিকে বরখাস্ত করেছিলেন। সম্ভবত উমর রাযি. লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন।

খাইরুল কুরুনেই যদি মুনাফিকদের এই অবস্থা হয়, তাহলে হাজার বছর পরে এসে কী অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য। আল-কায়েদার মতো একটি দল, যাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের কুফফার গোষ্ঠী নিজেদের সিক্রেট এজেন্সিগুলোকে লাগিয়ে রেখেছে; যাদের সদস্যদের ধরার জন্য নিজেদের সকল শক্তি ব্যয় করছে; যাদের মানহাজ ও নেতৃবৃন্দকে বিকৃতভাবে জনসম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য দরবারী আলেম আর সরকারি-বেসরকারি মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করছে—এমন একটি দল মুনাফিকদের থেকে মুক্ত থাকবে কীভাবে? **مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ** (তোমাদের কী হলো, তোমরা কেমন বিচার করছ!)

শায়খ সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. তার তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআনে' বনু মুসতালিক যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলিমদের মধ্যে মুনাফিকরা প্রবেশ করে দীর্ঘ ১০ বছর এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দল থেকে বের করে দেননি এবং আল্লাহ তায়ালাও মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তাদের নামধাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়েছেন। এর আগে বিস্তারিতভাবে কখনো জানাননি। যদিও তাদের কথার ভাবভঙ্গি, ছলচাতুরি আর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসূল তাদের চিনতে পারতেন। এত দীর্ঘ সময়েও আল্লাহ তাআলা রাসূলকে মুনাফিকদের বিস্তারিত বিবরণ জানাননি। কারণ, মানুষের অন্তরের বিষয়কে আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে চান না। অন্তর কেবল তারই নিয়ন্ত্রণে, তিনিই জানেন মানুষের অন্তরে কী আছে এবং তিনিই তার হিসাব নেবেন। মানুষ শুধু বাহ্যিক বিষয়কেই বিবেচনা করবে। তারা সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে অভিযুক্ত করবে না, কারও ব্যাপারে শুধুমাত্র বিচক্ষণতা (!) ও দূরদৃষ্টি (!)-র নামে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যখন তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জীবনের শেষ দিকে কট্টর মুনাফিকদের পরিচয় জানান, তখনও তিনি তাদেরকে মুসলিমদের দল থেকে বের করে দেননি। কারণ তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিত এবং ইসলামের বিধানগুলো পালন করত। মুনাফিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একাই চিনতেন। সাহাবীদের মধ্যে শুধু হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.-কেই তাদের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। তিনিও বিষয়টি মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দেননি। এমনকি হযরত উমর রা. নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য হুযাইফা রা.-এর কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের তালিকায় উমরের নাম বলেছেন কি না জিজ্ঞাসা করতেন। তখনও হুযাইফা রা. শুধু এতটুকুই বলতেন, হে উমর, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। এর চেয়ে বেশি কিছুই বলতেন না।

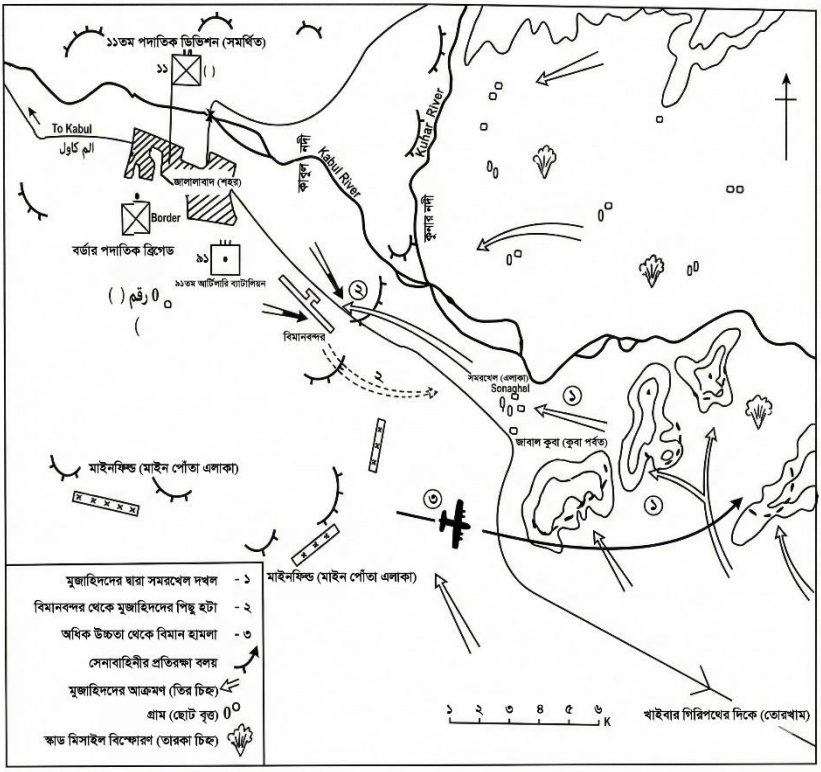
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করেছিলেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম রা. যখন দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তির জানাযায় নেই, তারা বুঝে নিতেন লোকটি মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর হুযাইফা রা. মুনাফিকদের জানাযায় যেতেন না। উমর রাযি. হুযাইফা রাযি.-কে লক্ষ

করতেন। যদি দেখতেন হুযাইফা রা. জানাযায় উপস্থিত হয়েছেন, তাহলে বুঝে নিতেন মৃত লোকটি মুনাফিক না। তখন তিনিও জানাযায় শরীক হতেন। আর যদি তাকে না দেখতে পেতেন, তিনিও জানাযায় শরীক হতেন না। তবে কিছু বলতেনও না। তাকদীরের লিখন অনুযায়ী এভাবেই সময় এগিয়ে চলছিল নিজ লক্ষ্যপানে। এর পেছনে ছিল অনেক রহস্য ও উদ্দেশ্য। এর মধ্যে ছিল তারবিয়াত ও শিক্ষা; শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা ও উত্তম চরিত্রের উপকরণ।'

## জালালাবাদের যুদ্ধ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে শায়খ উসামা রহ.-এর নেতৃত্বে আল-কায়েদা বড় বড় যে যুদ্ধগুলো করেছে, জাজির যুদ্ধের পর জালালাবাদের যুদ্ধটি ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কমিউনিস্ট সরকারের বাহিনী আরবদের অবস্থান লক্ষ্য করে এই আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। সাংবাদিক ইসাম দারায তার মা'সাদাতুল আনসার বইয়ে শায়খ উসামা রহ. থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। শায়খ রহ. বলেন—

'আরব মুজাহিদগণ যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে শহরকেন্দ্রিক যুদ্ধ ছিল এটাই প্রথম। যুদ্ধটি ব্যাপক পরিসরে সংঘটিত হয়েছিল। আফগানিস্তানের অন্যান্য যুদ্ধ থেকে জালালাবাদ যুদ্ধ ছিল সবদিক থেকে আলাদা। আগের যুদ্ধগুলো হয়েছিল শত্রুদের বিভিন্ন ঘাঁটি ও দুর্গকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে জালালাবাদ হলো আফগানিস্তানের বড় শহরগুলোর একটি, আবার এর অবস্থান রাজধানী কাবুলের সবচেয়ে কাছে। জালালাবাদের এই যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ মুজাহিদদের হাতে ছিল না। কারণ, ততদিনে শহরের আশপাশে থাকা শত্রুদের অনেকগুলো ঘাঁটি মুজাহিদদের দখলে চলে এসেছিল। এমনকি আফগান মুজাহিদগণ জালালাবাদ বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় শত্রুবাহিনী শহর রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মুজাহিদগণ যদি পিছু হটে, তাহলে তাদের সকল পরিশ্রম ও অর্জন নিমেষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধটি শুরু হয়, যা লাগাতার কয়েক মাস অব্যাহত থাকে। ভাইয়েরা এই যুদ্ধ থেকে এমন অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো যুদ্ধে অর্জিত হয়নি।




জালালাবাদ যুদ্ধের ম্যাপ[১২]

'জালালাবাদের আশেপাশে আরব মুজাহিদদের ১৮টি ক্যাম্প ছিল (মা'সাদাতুল আনসার)। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে শক্তি ধরে রেখে লাগাতার কয়েক মাস যুদ্ধ পরিচালনা করা আমাদের জন্য কষ্টকর ছিল। দীর্ঘ এই যুদ্ধ চালাতে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য, রসদ এবং যথাসময়ে বারুদ, ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট লাঞ্চার দরকার ছিল। আহত-নিহত ভাইদের উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে হচ্ছিল। যারা নিহত হয়েছেন আল্লাহ তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন। তা ছাড়া শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে সব সময় কারো না কারো উপস্থিতি জরুরি ছিল, যেন শত্রুপক্ষের কোনো তৎপরতা দেখলেই গুলিবর্ষণ করতে পারেন। এই যুদ্ধে ভাইদের রকেট লাঞ্চার, মিসাইল ও মর্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। হামলার জন্য ভাইয়েরা মানচিত্র ব্যবহার করেন। সঠিকভাবে দূরত্ব নির্ণয় করা এবং লক্ষ্যবস্তুকে টার্গেট করে নিখুঁতভাবে

[১২] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : শায়খ আবুল ওয়ালীদ (মুসতাফা হামেদ)

হামলা করার ক্ষেত্রে ভাইয়েরা স্থানাঙ্ক (কোঅর্ডিনেট) ব্যবহার করেন। নতুন এই অভিজ্ঞতার কারণে আরব ভাইদের মধ্যে দক্ষ একটি দলের জন্ম হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ও তারা ছিলেন অবিচল। মাসের পর মাস এমন প্রচণ্ড যুদ্ধের মুখে টিকে থাকতে পারা কোনো সহজ কাজ ছিল না।

পরিবহণ-মাধ্যম, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় অন্যান্য দলের চেয়ে আরব ভাইদের তৎপরতা ছিল গতিশীল। যোদ্ধাদেরকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে প্রত্যেক ইউনিট-কমান্ডারকে গাড়িও দেওয়া হয়েছিল। কমান্ডার খালেদের নেতৃত্বে একটি অ্যাসল্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন জালালাবাদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আফগান কমান্ডার। এই মহান কমান্ডারের হাতে অনেকগুলো জায়গা বিজয় হয়েছিল। আরব ভাইদের দলই ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচিত। কিছু কিছু অভিযানে আক্রমণকারীদের সবাই থাকত আরব, শুধু কমান্ডার খালেদই থাকতেন একমাত্র আফগান। কারণ তার অনুগত অধিকাংশ আফগান মুজাহিদই পূর্বের যুদ্ধগুলোতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আরব মুজাহিদদের আরেকটি ইউনিট কমান্ডার সাযনুরের অধীনে ছিলেন। আরব মুজাহিদদের অংশগ্রহণে আল্লাহ তায়ালা তাদের হাতেও অনেকগুলো ঘাঁটির বিজয় দান করেন। তার মধ্যে একটি ছিল তাবাব (ফারকান্দ), যাকে সারাকাহ সামরিক ঘাঁটি বা সাখরী ঘাঁটি বলা হতো। সেখান থেকে আরব ভাইয়েরা অনেকগুলো দূরপাল্লার হেভি ট্যাংক গনীমত লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো সাধারণ ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান গনীমত হিসেবে লাভ করেছিলেন। ভাইদেরকে এ সমস্ত অস্ত্র—বিশেষ করে ট্যাংক—ব্যবহারের জন্য সফলভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের শেষদিকে যখন কমিউনিস্ট বাহিনী আরবদের অবস্থান লক্ষ্য করে সর্বশেষ আক্রমণ করেছিল, তখন ভাইয়েরা তাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক ব্যবহার করেছিলেন। সে সময় নতুন করে আরও অনেকগুলো ট্যাংক গনীমত হিসেবে হাতে এসেছিল।'



শহীদ কমান্ডার সাযনুর রহ.



শহীদ কমান্ডার খালেদ রহ

## শায়খ উসামা রহ.-এর জবানিতে জালালাবাদের যুদ্ধ[১৩]

যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে শায়খ রহ. বলেন—

‘১৪০৯ হিজরীর ১০ই যিলহজ (৩রা জুলাই ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) শত্রুবাহিনী আমাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা শুরু করে। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল আরব মুজাহিদদের অবস্থানকে ধ্বংস করা এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে জীবিত বন্দি করা। কারণ, আরব মুজাহিদদের কাছে তখন বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ ছিল, যেগুলো আমরা পাকিস্তানের অস্ত্রবাজার থেকে কিনে রেখেছিলাম। প্রায় ৩০ ট্রাক গোলাবারুদ কিনে জমা করা হয়েছিল। এ কারণে জালালাবাদের আশপাশে থাকা আফগান সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল ও তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করা আমাদের জন্য সহজ ছিল। একদিন জানতে পারি, শত্রুর বিশাল এক বাহিনী এ দিকে আসছে। আমরা সেই বাহিনীর ওপর লাগাতার তিনদিন হামলা চালাই। এই হামলায় ৭০ জন হিন্দু সৈন্যও নিহত হয়। মূলত রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পর আফগান সরকার ব্যাপক সৈন্যঘাটতির মুখে পড়ে গিয়েছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছিল। অথচ রুশ বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও প্রায় ২০ হাজার রাশিয়ান সৈন্য তখনও আফগানিস্তানে অবস্থান করছিল।

এ দিকে আফগান মুজাহিদদের গোলাবারুদ ছিল শেষের পথে। তাই আমাদের কাছে থাকা গোলাবারুদ ব্যবহার করেই শত্রুকে চাপের মধ্যে রাখতে চাচ্ছিলাম। এ জন্য টানা তিন সপ্তাহ আমরা শত্রুর স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে বিরতিহীন আক্রমণ করতে থাকি। ততদিনে সরকারি বাহিনী বুঝে গিয়েছিল, আরবরা তাদের গলার কাঁটা হয়ে আটকে আছে। তাই তারাও আমাদের DC ফিল্ড গান আর রকেট লাঞ্চারের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমানহামলা শুরু করে। তখন আমাদের কাছে মাত্র দুটি রকেট লাঞ্চার ছিল। শত্রুরা যখন দেখল বিমান থেকে বোম্বিং করে আর মিসাইল অ্যাটাক করেও আমাদের আর্টিলারিকে থামানো যাচ্ছে না, তখন তারা আমাদের অবস্থান টার্গেট করে স্কাড মিসাইল নিক্ষেপ শুরু করে। স্কাড মিসাইল হলো মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল, এই ধরনের মিসাইল দ্বারা মূলত শহরে আক্রমণ করা হয়; কিন্তু তারা সেটা আমাদের ও আমাদের আর্টিলারির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এতেও যখন তেমন সফলতা দেখল না, তখন আমাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলা করার জন্য বিশাল সামরিক শক্তি প্রস্তুত করা শুরু

[১৩] মা’সাদাতুল আনসার: ইসাম দারায

করে। এই বাহিনীর চিফ কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় রহিমী নামক এক ব্যক্তিকে আর সেকেন্ড ইন কমান্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইসমাইল নামক আরেক কমান্ডারকে। তারা নজিবুল্লাহ সরকারের কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, এইবারের অভিযানে তোরখাম পর্যন্ত বিজয় করে ফেলবে। তোরখাম হলো পাক-আফগান সীমান্তবর্তী একটি এলাকা, জালালাবাদ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। স্থলপথে কাবুল থেকে জালালাবাদ হয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারের সাথে সংযুক্ত মহাসড়কের পাশেই এর অবস্থান।

১৯৮৯ সালের ৩রা জুলাই আক্রমণ শুরু হয়। ১৪০৭ হিজরীর জাজির যুদ্ধের পর এটাই ছিল আরব মুজাহিদদের জন্য সবচাইতে মারাত্মক ও ভয়াবহ যুদ্ধ; বরং এই যুদ্ধ ছিল আগের চেয়েও বেশি কঠিন। কারণ, জালালাবাদের আশপাশের অঞ্চলগুলো সমভূমি হওয়ায় সাঁজোয়া যান ও ভারী যুদ্ধযান চলাচলের উপযোগী ছিল। অন্যদিকে [জাজির যুদ্ধ পাহাড়ি এলাকায় হওয়ায়] সাঁজোয়া যান সেখানে বেশি সুবিধা করতে পারেনি।

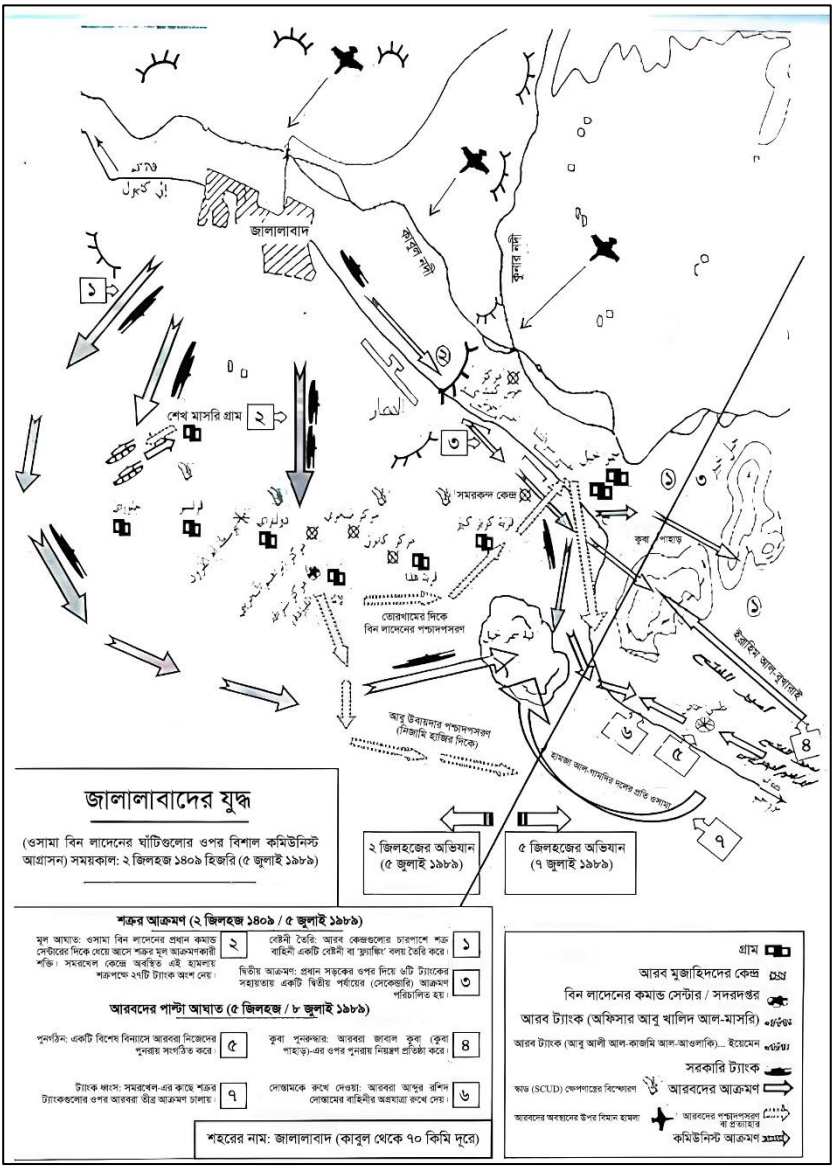
প্রথমেই তারা আমাদের বাম বাহুর দিকে বাহিনী পাঠায়। সেখানকার মুজাহিদগণ ফজরের পর আমাদের সাথে যোগাযোগ করে জানান, অনেকগুলো ট্যাংক তাদের দিকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে, তাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা তাদের জন্য দুটি গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র-সহ কিছু ভাইকে পাঠাই। এর কিছুক্ষণ পর ডান বাহুর মুজাহিদগণ যোগাযোগ করে জানান, তাদের দিকেও ট্যাংক বহর এগিয়ে আসছে। ডান বাহুর অবস্থান ছিল জালালাবাদ বিমানবন্দরের কাছেই। তাদের অবস্থান থেকে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ছিল। তারাও সাহায্যের আবেদন করেন এবং মিসাইল নিক্ষেপের জন্য লাঞ্চার পাঠাতে বলেন। তাই আমরা একটি রকেট লাঞ্চার ডান বাহুর দিকে, আরেকটি বাম বাহুর দিকে রওনা করিয়ে দিই। দুই বাহুর মাঝখানে মুজাহিদদের কিছু ছোট ছোট চৌকি ছিল, তারাও যোগাযোগ করে সাহায্যের আবেদন করেন। কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে থাকা রিজার্ভ ফোর্সের সাথে কিছু অস্ত্র দিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু এ সব ছিল শত্রুর কৌশলমাত্র। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে আক্রমণ করা। [উভয় দিকে বাহিনী পাঠানোর ফলে যখন কেন্দ্রীয় ঘাঁটি খালি হয়ে গিয়েছিল,] তখন কেন্দ্রীয় ঘাঁটির দিকে শত্রুর ২৭টি ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানের বিশাল একটি বহর অগ্রসর হতে শুরু করে। এ সময় তারা আকাশ থেকেও জোড়ালো বিমান হামলা শুরু করে। ফজরের পরপরই তারা ৭টি স্কাড মিসাইল নিক্ষেপ করে। খুব ভেবেচিন্তেই তারা হামলার জন্য এই দিনটি বেছে নিয়েছিল। কারণ, সেদিন ছিল ঈদুল আযহার প্রথম দিন। আফগান মুজাহিদদের অভ্যাস তাদের জানা ছিল। বছরের বেশিরভাগ সময় আফগান মুজাহিদরা পরিবার থেকে দূরে যুদ্ধের ময়দানে থাকত আর ঈদের দিনগুলো পরিবারের সাথে কাটানোর জন্য বাড়ি চলে যেত।

শত্রুবাহিনী ক্রমেই আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন ঘাঁটিতে আমরা মাত্র ৩০ জন বা তার চেয়েও কম মুজাহিদ ছিলাম। আমাদের ওপর ২৭টি ট্যাংক একযোগে আক্রমণ করে। পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের কাছে যে রিজার্ভ ফোর্স ছিল, তাদের তো আগেই ডান ও বাম বাহুর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। একটি ট্যাংক ছিল, সেটাও প্রধান সড়কের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেন সেদিক দিয়ে কোনো হামলা না হয়। T62 মডেলের আরেকটি ট্যাংক ছিল, সেটি বাম বাহুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে শত্রুরা কেন্দ্রীয় ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করে। ঘাঁটিতে থাকা ভাইদের কাছে অস্ত্র বলতে শুধু একটি আরপিজি ছিল। কিছুক্ষণ প্রতিরোধের পর আরপিজি বহনকারী সে ভাই শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। অবশেষে আমাদের কাছে একটি 75 mm অ্যান্টি ট্যাংক গান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভাই শফীক মাদানী অ্যান্টি ট্যাংকটি স্থাপন করেন। সাধারণত যুদ্ধের সময় একটি 75 m.m অ্যান্টি ট্যাংক পরিচালনা করতে পাঁচজন সৈন্যের প্রয়োজন হয়।[১৪] কিন্তু শফীক ভাই একাই অ্যান্টি ট্যাংকটি প্রস্তুত করে তা থেকে হামলা করা শুরু করেন। ট্যাংক-বিধ্বংসী অন্যসব অস্ত্রের তুলনায় 75 mm অ্যান্টি ট্যাংক থেকে গোলা নিক্ষেপ করা অনেক বেশি কঠিন। কারণ এটায় প্রথমে তার ভেতরে মিসাইল রেখে তা ফায়ার করতে হয়, এরপর মিসাইলের শেল বের করে পুনরায় আরেকটি মিসাইল স্থাপন করতে হয়।



জালালাবাদ যুদ্ধে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে কামান্ডার আবু আইয়ুব ইরাকী

[১৪] ছোট অ্যান্টি ট্যাংক চালাতে দুই বা তিনজন সৈন্যের প্রয়োজন হয়।


জালালাবাদ
কাবুল নদী
কুনার নদী
শেখ মাসরি গ্রাম
সমরকন্দ কেন্দ্র
কুবা পাহাড়
তোরখামের দিকে
বিন লাদেনের পশ্চাদপসরণ
আবু উবায়দার পশ্চাদপসরণ
(নিজামি হাজির দিকে)
হাফজা আল-গামদির দলের প্রতি ওসামা
হাজি আল-শাগালাই
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
জালালাবাদের যুদ্ধ
(ওসামা বিন লাদেনের ঘাঁটিগুলোর ওপর বিশাল কমিউনিস্ট আগ্রাসন) সময়কাল: ২ জিলহজ ১৪০৯ হিজরি (৫ জুলাই ১৯৮৯)
২ জিলহজের অভিযান (৫ জুলাই ১৯৮৯)
৫ জিলহজের অভিযান (৭ জুলাই ১৯৮৯)
শত্রুর আক্রমণ (২ জিলহজ ১৪০৯ / ৫ জুলাই ১৯৮৯)
মূল আঘাত: ওসামা বিন লাদেনের প্রধান কমান্ড সেন্টারের দিকে ধেয়ে আসে শত্রুর মূল আক্রমণকারী শক্তি। সমরখেল কেন্দ্রে অবস্থিত এই হামলায় শত্রুপক্ষে ২৭টি ট্যাংক অংশ নেয়।
২
বেইনী তৈরি: আরব কেন্দ্রগুলোর চারপাশে শত্রু বাহিনী একটি বেইনী বা 'ক্ল্যাম্প' বলয় তৈরি করে।
১
দ্বিতীয় আক্রমণ: প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে ৬টি ট্যাংকের সহায়তায় একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের (সেকেন্ডারি) আক্রমণ পরিচালিত হয়।
৩
আরবদের পাল্টা আঘাত (৫ জিলহজ / ৮ জুলাই ১৯৮৯)
পুনর্গঠন: একটি বিশেষ বিন্যাসে আরবরা নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করে।
৫
কুবা পুনরুদ্ধার: আরবরা জাবাল কুবা (কুবা পাহাড়)-এর ওপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।
৪
ট্যাংক ধ্বংস: সমরখেল-এর কাছে শত্রুর ট্যাংকগুলোর ওপর আরবরা তীব্র আক্রমণ চালায়।
৭
দোস্তামকে রুখে দেওয়া: আরবরা আদুর রশিদ দোস্তামের বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দেয়।
৬
শহরের নাম: জালালাবাদ (কাবুল থেকে ৭০ কিমি দূরে)
গ্রাম
আরব মুজাহিদদের কেন্দ্র
বিন লাদেনের কমান্ড সেন্টার / সদরদপ্তর
আরব ট্যাংক (অফিসার আবু খালিদ আল-মাসরি)
আরব ট্যাংক (আবু আলী আল-কাজমি আল-আওলাকি)... ইয়েমেন
সরকারি ট্যাংক
স্কাড (SCUD) ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণ
আরবদের আক্রমণ
আরবদের অবস্থানের উপর বিমান হামলা
আরবদের পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাহার
কমিউনিস্ট আক্রমণ

জালালাবাদ যুদ্ধে মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটিতে কমিউনিস্ট বাহিনীর আক্রমণের ম্যাপ

‘শত্রুবাহিনী আমাদের চারপাশ থেকে ঘেরাও করার চেষ্টা করছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, তারা আরব মুজাহিদদের জীবিত বন্দি করতে চায়। অ্যান্টি ট্যাংক আরপিজি দিয়ে তেমন কোনো প্রতিরোধ করা যাচ্ছিল না। কারণ আরপিজির রেঞ্জ ছিল মাত্র ৩০০ মিটার। এই সুযোগে শত্রুবাহিনীর ট্যাংকগুলো অনেকটা নিশ্চিন্তেই আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করছিল। এ জন্য আমি ভাইদের বললাম, ট্যাংকগুলো ৩০০ মিটারের ভেতরে পৌঁছানোর পর যেন তারা আরপিজি ব্যবহার করেন। ট্যাংকগুলো ৩০০ মিটারের ভেতরে আসার পর ভাইয়েরা আরপিজি দিয়ে হামলা শুরু করেন। কিন্তু ২৭টি ট্যাংকের সামনে একটিমাত্র আরপিজি তেমন কোনো কাজেই আসছিল না। এ দিকে আরপিজি বহনকারী আরেক ভাই ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। ট্যাংকগুলো আমাদের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল, আসতে আসতে তারা আমাদের ঘাঁটির প্রথম টিলার কাছে চলে আসে। এই পাথুরে টিলাটি ছিল শত্রুদের সামনে আমাদের প্রথম অবস্থান।

শফীক ভাই শত্রুদের দিকে 75 mm অ্যান্টি ট্যাংক দিয়ে হামলা করা শুরু করেন। তখন ট্যাংকগুলো আমাদের থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে ছিল। ট্যাংকের পাশাপাশি মেশিনগান থেকেও গুলিবর্ষণ করছিল তারা। তীব্র বোমাবর্ষণ করে পুরো এলাকাটিকে ঝাঁঝরা বানিয়ে ফেলছিল। যে দুই টিলায় আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম, এর মাঝে একটি সমতল ভূমি ছিল। শত্রুদের সাঁজোয়া যান এই সমতল ভূমিতে প্রবেশ করলে ভাইয়েরা ছড়িয়ে পড়েন। সাঁজোয়া যান থেকে নেমে সৈন্যরা যখন টিলায় উঠতে শুরু করে, ভাইয়েরা তাদের ওপর গোরিউনোভ মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করেন। এভাবে আনুমানিক চার ঘণ্টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। সামনে শত্রুবাহিনীর ২৭টি ট্যাংক আর আমাদের কাছে মাত্র একটি অ্যান্টি ট্যাংক, যা মাত্র একজন ভাই চালাচ্ছেন। এতকিছুর পরও আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেন।

আমরা যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে টিলা থেকে নেমে পেছনের একটি জায়গায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ওই জায়গাটি অনেক গাছপালা আর টিলাবিশিষ্ট হওয়ায় ট্যাংকের জন্য দুর্বল পয়েন্ট ছিল। ময়দানে থাকা অন্য ভাইদেরও সেখানে চলে যেতে বলি। জায়গাটির নাম ছিল ‘সামার খেল’। ইতোমধ্যে আফগান মুজাহিদদের কাছেও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু পরেই শত্রুরা সামনে অগ্রসর হয়ে আমাদের ঘাঁটি দখল করে নেয়। আল্লাহর রহমতে তখন আমাদের কেউ সেখানে ছিল না। শফীক ভাই অ্যান্টি ট্যাংক চালানো অবস্থাতেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যেভাবে শাহাদাত চেয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা ঠিক সেভাবেই তাকে

শাহাদাত দান করেন।[১৫] আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যে তিনজনের হাতে মা'সাদার সূচনা হয়েছিল, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। শফীক ভাইয়ের শাহাদাত আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

আমাদের নতুন জায়গায় চলে যাওয়া দেখে শত্রুরা বীরদর্পে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমরাও কয়েক দিন তাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকি। প্রধান সড়কে যে ভাইয়েরা ছিলেন, তারাও শত্রুদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। এভাবে ৯ দিন চলে যায়। দশম দিনের আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। পুরো জালালাবাদের তাপমাত্রা সেদিন ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মাগরিবের ঘণ্টাখানেক আগে তারা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে আমরা তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাই। ভাই ইয়াকুব আল-বাহর 82 mm অ্যান্টি ট্যাংক দিয়ে শত্রুদের একটি ট্যাংক ধ্বংস করতে সক্ষম হন। আরেক মুজাহিদ ভাই মিলান (MILAN) অ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল দিয়ে শত্রুদের আরও একটি ট্যাংক ধ্বংস করেন। মাঝরাত পর্যন্ত এভাবে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে।

ফজরের পর ভাইয়েরা শত্রুদের অবস্থান অনুসন্ধান করে দেখতে পান, তারা ১৮টি অক্ষত ট্যাংক ফেলে রেখে পেছনে সরে গেছে। ভাই সালেহ গামেদী ওরফে হামযা এবং আমীরুল ফাতাহ মিসরী ট্যাংক চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারা ট্যাংকে উঠে শত্রুর ওপর হামলা চালান। কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর আরও একটি ট্যাংক তারা দখল করতে সক্ষম হন। হামযা ভাই ট্যাংক চালিয়ে যাহরানী নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। শত্রু বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ৪২টি ট্যাংক তারা হারিয়েছিল। এর মধ্যে ২০টিরও বেশি ট্যাংক সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় মুজাহিদদের হাতে এসেছিল। আরব ভাইদের ভাগে পড়েছিল পাঁচটি ট্যাংক, তার মধ্যে দুটি ছিল T-62 মডেলের। এ লড়াইটি ছিল জালালাবাদ যুদ্ধের সর্বশেষ লড়াই। আফগান যুদ্ধে বিগত কয়েক বছরে যতজন আরব মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন, শুধু জালালাবাদ যুদ্ধেই আরব শহীদদের সংখ্যা তা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।'

[১৫] শফিক মাদানী রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, দুনিয়াতে যেন তার কোনো কবর না হয়। তিনি যখন অ্যান্টি ট্যাংক দিয়ে বিশাল ট্যাংক বহরের মোকাবিলা করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে একটি বোমা সরাসরি তার শরীরে আঘাত হানে। ফলে তার পুরো শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পরে তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

## খোস্ত ও গারদেয বিজয়

খোস্ত ও গারদেয বিজয়েও আল-কায়েদা অংশগ্রহণ করেছিল। মুজাহিদদের কাছে খোস্ত শহরটি 'ছোট মস্কো' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খোস্ত জয় করতে পারলে আরও কিছু শহর এমনিতেই মুজাহিদদের হাতে চলে আসত। তাই শহরকে কঠোরভাবে অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলাকালে বাতলুন এলাকায় আল-কায়েদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবরোধকে মজবুত করার জন্য স্থল ও আকাশ উভয় পথেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল। এ জন্য শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ) খোস্তের পুরোনো বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন। এই বিমানবন্দরটি ছিল শহরের ধমনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ। শহরে আটকে পড়া বাহিনীর কাছে অস্ত্র, রসদ ও সাহায্য পৌঁছার একমাত্র পথ ছিল এই বিমানবন্দর।

শায়খ আবুল ওয়ালীদের পরিকল্পনা ছিল, বিমানবন্দরের রানওয়ের বিভিন্ন অংশকে লক্ষ্য বানিয়ে রকেট লাঞ্চার স্থাপন করে শত্রুদের রসদপত্র ও যুদ্ধসামগ্রী বহনকারী প্রতিটি বিমানের ওপর হামলা করা। রাতের বেলা যখন শত্রুপক্ষের রসদবাহী বিমানগুলো খালাসির জন্য অবতরণ করবে, ঠিক তখন কাতিউশা (Katyusha) রকেট লাঞ্চার থেকে মিসাইল অ্যাটাক করে পুরো রানওয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এ জন্য মোট পাঁচটি কাতিউশা লাঞ্চার স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে আল-কায়েদার পক্ষ থেকে ১২ ব্যারেলযুক্ত একটি কাতিউশা রকেট লাঞ্চার পাঠানো হয়। সাথে লাঞ্চার পরিচালনাকারী একটি টিম এবং ১২০০ মিসাইলও ছিল। অবশেষে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে অভিযান শুরুর এক মাসের মাথায় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আর শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরীর চেষ্টায় পুরোনো বিমানবন্দরটি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই এক মাসের মধ্যে মুজাহিদরা শত্রুবাহিনীর ১৪টি বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হন।

পুরোনো বিমানবন্দর বন্ধ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই খোস্ত শহরের নিরাপত্তায় থাকা সেনা গ্যারিসন তড়িঘড়ি করে নতুন আরেকটি বিমানবন্দর চালু করে। শায়খ আবুল ওয়ালীদ তো এই অপেক্ষাতেই ছিলেন। ১৪১১ হিজরীর রমযানে (১৭ই মার্চ ১৯৯১ সালে) যখন নতুন করে খোস্তের ওপর আক্রমণ শুরু করা হয়, তখন শায়খ আবুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে আল-কায়েদা নতুন বিমানবন্দরটির ওপর আক্রমণ শুরু করে। আগেরবারের মতো এবারও ছয় থেকে সাতটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। অবশ্য এর জন্য ১৪০০-এর মতো মিসাইল নিক্ষেপ করতে হয়। এই বিমানবন্দরটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় খোস্ত বিজয় সহজ হয়ে যায়। অভিযান শুরুর মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় মুজাহিদদের হাতে খোস্তের পতন ঘটে।[১৬] আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের পর নিঃসন্দেহে এটি শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরীর কৃতিত্ব ছিল। তিনি সিংহের মতো ধৈর্য

[১৬] খোস্ত ও গারদেয শহরের বিজয়ের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরীর *'ফাতহু খোস্ত'* ও *'জরদীয ওয়া তাসাকুতুল মুদুন'* বইদুটি পড়া যেতে পারে।

নিয়ে এই হামলার পরিকল্পনা করতেন, প্রস্তুতি নিতেন। এমনকি অভিযান চলাকালে প্রায় দিনই তার নাইট ভিশন বাইনোকুলার হাতে বিমানের অপেক্ষায় সারা রাত জেগে থাকতেন। বিমানের দেখা পেলেই "يا خيل الله اركبي" বলে রকেট লাঞ্চার ইউনিটগুলোর কাছে আক্রমণের নির্দেশ পাঠাতেন।

খোস্ত বিজয়ের পর আল-কায়েদা-সহ মুজাহিদদের সকল প্লাটুন গারদেয শহর অভিমুখে রওনা হয়। গারদেয আর কাবুলের মাঝে লোগার প্রদেশের অবস্থান। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে তুষারপাত শুরুর আগেই মুজাহিদগণ গারদেযের ওপর হামলা শুরু করেন। তীব্র আক্রমণের মুখে একদিনেই শহরের দুটি ডিফেন্স লাইন ধ্বংস হয়ে যায়। মুজাহিদরাও শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যান।[১৭] গারদেয বিজয়ের আগেই ১৯৯২ সালের ১৩ই এপ্রিল শায়খ আব্দুর রহমান কিন্দী রহ.-এর নেতৃত্বে মুজাহিদগণ লোগার প্রদেশ জয় করে ফেলেন। এ কারণে গারদেযে থাকা জেনারেলরা আর কোনো উপায় না পেয়ে শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ.-এর সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়ে যায়। তাদের নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে মুজাহিদদের হাতে তারা শহর ছেড়ে দেয়। অবশেষে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে ১৯৯২ সালের ২২শে এপ্রিল মুজাহিদগণ গারদেয শহরে প্রবেশ করেন। এর মাত্র তিনদিন পর মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতন ঘটে। ১৯৯২ সালের ২৫শে এপ্রিল মুজাহিদগণ বিজয়ী বেশে কাবুলে প্রবেশ করেন।

## শায়খ উসামা রহ.-এর ফিকির ও মানহাজ পরিবর্তনের সূচনা ও কারণ[১৮]

শায়খ উসামা রহ. বাল্যকাল থেকেই দীন পালনের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। আফগানিস্তানে আসারও অনেক আগে তার সম্মানিত পিতার কাছ থেকেই তিনি জিহাদের ভালোবাসা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর পিতা ইমাম মাহদীকে সাহায্য করার জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার জমা করে রেখেছিলেন।[১৯] পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই পরিমাণ অর্থ ছিল অনেক বেশি।

শায়খের পিতাকে আল্লাহ তায়ালা এমন মর্যাদার অধিকারী বানিয়েছিলেন, যা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। হারামাইন শরীফাইন তথা মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের কাজ আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েই করিয়েছেন। সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞের মূল খরচ বাদ দিয়ে

---

[১৭] গারদেযের ওপর এই হামলা পরিচালনা করেছিলেন শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ.। কিন্তু পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্সের অপতৎপরতা আর কাবুল থেকে সাহায্য পৌঁছে যাওয়ায় তখন গারদেয বিজয় করা সম্ভব হয়নি। মুজাহিদরা গারদেযের সামনে থেকে পিছু হটতে বাধ্য হন। পরে ১৯৯২ সালের ২২শে এপ্রিল গারদেয বিজয় হয়। [সম্পাদক]

[১৮] শায়খ আবু মুসআব সূরীর দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ অবলম্বনে।

[১৯] শায়খ উসামা রহ.-এর পিতা মুহাম্মাদ বিন আউয বিন লাদেন ১৯৭০ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। তখন শায়খ উসামা রহ.-এর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর রহম করুন।

তিনি মাত্র এক রিয়াল লাভ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর যখন জানতে পারেন, জর্ডান সরকার বাইতুল মাকদিসের কুব্বাতুস সাখরা মেরামত করার জন্য টেন্ডার ছেড়েছে, তিনি সকল ইঞ্জিনিয়ারকে একত্র করে তাদেরকে লাভ ছাড়া এই প্রকল্পের মূল ব্যয়ের হিসাব দিতে বলেন এবং এই টেন্ডারটিও তিনি লাভ করেন। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে (কাজের সুবাদে) কখনো কখনো একই দিনে তিন মসজিদে নামায আদায়ের সৌভাগ্য তাঁর হতো। এমন পিতার সন্তান ছিলেন শায়খ উসামা রহ.। সিংহের বাচ্চা তো সিংহই হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।



শায়খ মুহাম্মাদ বিন আউয বিন লাদেন (শায়খ উসামার পিতা) রহ.

শায়খ উসামা রহ. প্রথমবার যখন আফগানিস্তান আসেন, তখন বিলাদুল হারামাইনের সহওয়া আন্দোলনের চিন্তা ও মানহাজ লালন করতেন। এই সহওয়া আন্দোলন ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও সারুরী চিন্তাধারার মিশ্র রূপ। সৌদি থেকে আগত অন্যান্য মুজাহিদের মতো তিনিও আলে সৌদের শাসনকে শরয়ী শাসন বলে বিশ্বাস করতেন। বাদশাহ ফাহাদ ও আলে সৌদের ফাসেকি ও জুলুম সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে তাদেরকে মুসলিমদের উলুল আমর মনে করতেন। হাইয়াতু কিবারিল উলামার সরকারি আলেমদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা লালন করতেন এবং তাদের ফতওয়ার ওপর আমল করতেন।

১৪০৭ (১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) হিজরীর রমযান মাসে জাজির যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয় পর্যন্ত শায়খ এই চিন্তা ও মানহাজ-ই লালন করতেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টি বিষয়কে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

১. সাধারণ লক্ষ্য: আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করা। আফগানিস্তানকে স্বাধীন করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা 'আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন' প্রতিষ্ঠার সূতিকাগার হবে এবং আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিরাপদ ঘাঁটি ও আশ্রয়স্থলের ভূমিকা পালন করবে। এই পর্যায়ে আফগানিস্তানের বাইরে আল-কায়েদার উল্লেখযোগ্য কোনো জিহাদী তৎপরতা ছিল না। শুধু ১৯৯১ সালে ইতালির রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জহির শাহকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ছোট একটি অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। সাংবাদিক পরিচয় ধারণ করে মুজাহিদ ভাই আবু আব্দুল্লাহ পর্তুগালী রহ. এই সাহসী অপারেশনটি পরিচালনা করেছিলেন।

২. বিশেষ লক্ষ্য: দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত শায়খ রহ. নিজে এই পরিকল্পনাটির তদারকি করেন। একীভূত হওয়ার আগে দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের প্রায় সকল প্রস্তুতিই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইয়েমেনের উলামা-মাশায়খ, প্রবীণ সালাফী দাঈ—যাদের মধ্যে শায়খ মুকবিল বিন হাদী আল-ওদায়ী ছিলেন শীর্ষে—এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতৃবৃন্দের কাছে কার্যকরভাবে জিহাদ শুরুর ব্যাপারে শায়খ রহ. যোগাযোগ করেন। জিহাদের জন্য তাদের আগ্রহী করে তুলতে শায়খ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ইয়েমেনের কয়েকটি গোত্রকেও জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে বিশাল অংকের অর্থ খরচ করেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই শায়খকে হতাশ করেন; এমনকি অনেকে জিহাদের জন্য পাঠানো অর্থও আত্মসাৎ করেন। এই সুযোগে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিজের দলে ভিড়িয়ে নেয়, তাদের পদ, ক্ষমতা, উপহার-উপঢৌকন আর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চুপ করিয়ে রাখে।

সত্তর ও আশির দশকে কিছু দেশের সরকারের সাথে জিহাদী আন্দোলনের সরাসরি সংঘাত শুরু হয় এবং তা বড় আকার ধারণ করে। এই সংঘাতে জানমালের বিপুল ক্ষতি হয়। জিহাদী আন্দোলনগুলোও সরকারি গোয়েন্দাদের ধরপাকড়ের শিকার হয়। ঠিক তখনই আফগান জিহাদ শুরু হলে সহওয়া আন্দোলন, বিশেষ করে জিহাদী আন্দোলনের সামনে সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার খুলে যায়। সে সকল আন্দোলনের বড় বড় নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই জিহাদী চিন্তাধারা ও ইখওয়ানী-সারুরী চিন্তাধারার মাঝে তখন ইসলামের বুনিয়াদি আকীদা আর আফগান মুজাহিদদের সহায়তার বিষয়টি ছাড়া কোনো বিষয়েই ঐক্য ছিল না। কর্মপন্থার বৈপরীত্য, জিহাদী দর্শনের ব্যাপারে ভিন্নতা, বাস্তবতার উপলব্ধি ও শরয়ী রাজনীতির বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার মতবিরোধ ছিল স্পষ্ট বিষয়। স্বয়ং জিহাদী দলগুলোর মধ্যেও এই বৈপরীত্য ছিল।

সার্বিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, জিহাদী দলগুলোর জন্য আফগানিস্তান ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। এখানে আসার ফলে জিহাদী দলগুলোর মধ্যে চিন্তাবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়, মুসলিমদের বিভিন্ন সংকট ও সমস্যার সাথে সকলে পরিচিত হয়। এর ফলে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ ধারণ করে, ধীরে ধীরে তা পরিপক্ক হয়ে ওঠে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যায়। পাক-আফগান সীমান্তবর্তী শহর পেশোয়ার তখন আরব ও ইসলামী আন্দোলনের সকল ধারা-উপধারা, দল ও মতাদর্শের এক উন্মুক্ত কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ ছিল এই গণজমায়েতের স্বর্ণযুগ। এই সময় পেশোয়ার যেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী আন্দোলনের চিন্তা, দর্শন, গবেষণা ও মানহাজ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। দাওয়াত, ইসলাহ, জিহাদ, সিয়াসাত—সব বিষয়েই কথা হতো। এমনকি উগ্র তাকফীরী চিন্তাধারার ছোট্ট একটি গোষ্ঠীও এখানে এসে সমবেত হয়েছিল। [পেশোয়ারের] জিহাদী দর্শনের বিনির্মাণে মিশরের আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ ও ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানহাজগত প্রভাবশালী ভূমিকা ছিল। কিছু সালাফী তালিবে ইলম, দাঈ এবং সৌদি ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত সারুরী চিন্তাধারার ব্যক্তিও সেখানে ছিলেন। তাদের দাওয়াতী মেহনতের বদৌলতে হাকিমিয়্যাহ, ওয়ালা-বারা ও জিহাদী দর্শনের মৌলিক অনেক বিষয় সেখানকার আরব-অনারবদের মাঝে প্রসার লাভ করে, যারা আফগান জিহাদের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। সেই সাথে সিরিয়ার জিহাদ নিয়ে লেখা বিভিন্ন বইপত্র জিহাদী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সিরিয়ার জিহাদ নিয়ে শায়খ আবু মুসআব সূরী ফা.আ.-এর লেখা বই ও দরসগুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশোয়ারে থাকা আরবদের ওপর জিহাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করে।



শায়খ আবু মুসআব সূরী ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

এভাবে ধীরে ধীরে জিহাদী পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। জিহাদী চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও প্রশস্ততার কারণে এবং দলীলনির্ভর অনুসরণের চর্চা শুরু হওয়ায় সকলের কাছে সত্য স্পষ্ট হতে শুরু করে। আরবদের মধ্যে জিহাদী চেতনা প্রবল হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এটিই অধিকাংশের আদর্শে পরিণত হয়। ইসলামী বিশ্ব থেকে আগত হাজার হাজার যুবক জিহাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করে নেয়। এভাবে জিহাদী আন্দোলনের নতুন এক ধারার জন্ম হয়, পরবর্তীতে এরাই 'আফগানি আরব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই শায়খ উসামা রহ. জিহাদী চিন্তাধারা লালনকারী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করতেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি তাদের এই চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে একেই নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং একসময় তিনিই এই আদর্শের প্রাণপুরুষ ও অগ্রসেনানী হয়ে ওঠেন।

নির্দিষ্ট করে বললে, শায়খের চিন্তাধারা ও মানহাজ পরিবর্তনের পেছনে দুটি মৌলিক কারণ ছিল। চিন্তার এই পরিবর্তনই তাঁর ও আল-কায়েদার আমেরিকাবিরোধী অবস্থান হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কারণ দুটি হলো—

১. ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ (EIJ) ও অন্যান্য অঞ্চলের একাধিক জিহাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মেহনতের ফলস্বরূপ আল-কায়েদার সূচনা হয়েছিল। [প্রাথমিকভাবে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার আগে] তারা সকলেই নেক কাজে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে [পেশোয়ার ও আফগানিস্তানে] মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে শরীক হয়েছিলেন। তাঁরা [মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি] তাদের মাঝে নিজেদের জিহাদী দর্শন প্রচার করতেন। তাদের হাত ধরেই ওয়ালা-বারা, হাকিমিয়্যাহ-সহ শরয়ী রাজনীতি ও ফিকহুল ওয়াকে (فقه الواقع)-এর মতো বিষয়গুলো ক্যাম্পগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় পরিস্থিতি এমন হয়ে যায়, সৌদির নাগরিকরা প্রশিক্ষণের সময় বাদশা ফাহাদ ও সৌদি যুবরাজদের ছবি টানিয়ে তার ওপর শুটিং প্র্যাকটিস করা শুরু করে। যদিও এ সকল দাঈদের সবাই আল-কায়েদায় সরাসরি যুক্ত হননি, কিন্তু তাঁদের বইপত্র, লেকচার ও আলোচনা আল-কায়েদার ভিত রচনাকারী যুবকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। পরে একসময় শায়খ উসামা রহ.-ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

২. উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক কুয়েত দখল করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯১ সালে সৌদি সরকার ও সরকারি আলেমদের সিদ্ধান্তে হারামাইনের পবিত্র মাটিতে মার্কিন বাহিনী প্রবেশ করে। পরবর্তী ঘটনাবলি ধীরে ধীরে শায়খ উসামা রহ.-এর সামনে এই মুসীবতের গভীরতা, জাযীরাতুল আরবে কাফেরদের আধিপত্য ও সরকারি দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফিকির চিত্র স্পষ্ট করে দেয়। শায়খ রহ. তাঁর বাস্তববাদী চিন্তা ও বিচক্ষণতার বদৌলতে বুঝতে পারেন,

মার্কিন বাহিনীর আগমনের পেছনে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য এবং ক্রুসেডার-মনোভাব থেকে জন্ম নেওয়া গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। মার্কিন বাহিনীর আগমন আর স্থায়ী অবস্থানের বৈধতা তৈরির জন্য উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল অজুহাতমাত্র।

## আফগানিস্তানে জিহাদী আন্দোলনের অর্জন

বিশ্ব-ইতিহাসে আফগানযুদ্ধ ছিল একটি বৃহৎ টার্নিং পয়েন্ট। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুত্বপূর্ণ এই ময়দানে জিহাদী আন্দোলনের অর্জন ছিল বহুমুখী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. মুজাহিদগণ প্রমাণ করেছিলেন মুসলমানদের করুণ দশার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে আনতে তারা সক্ষম। বিশ্বকে তারা দেখিয়েছিলেন, ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। দীর্ঘ ১০ বছরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়। হাজার হাজার আহত-নিহত সৈন্য, ৫০ হাজারের বেশি যুদ্ধসরঞ্জাম আর শত শত বিধ্বস্ত বিমানের স্তূপ আফগানের মাটিতে ছেড়ে তারা পালাতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ে মুজাহিদদের শৌর্যবীর্য আর বীরত্বগাঁথা ভাস্বর হয়ে ওঠে।[২০]

২. আফগানযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মুসলিম যুবক, বিশেষত আরব যুবকদের উপস্থিতি একে আঞ্চলিক ইস্যু থেকে আন্তর্জাতিক ইস্যু বানিয়ে দিয়েছিল। তাই আফগানযুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে জিহাদের বিশ্বায়ন (গ্লোবালাইজেশন), বিভিন্ন দেশের জিহাদী নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক পরিচিতি, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জিহাদী আন্দোলনের বিস্তৃতি। এই যুবকরাই আফগানিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়া ও চেচনিয়ায় জিহাদের বিস্মৃত ফরযকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। তা ছাড়া আফগান জিহাদ ছিল মুসলিম যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণপর্ব। এই জিহাদই তাদের ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যে লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ হবে বিশ্বনেতৃত্বের একচ্ছত্র অধিপতি পরাশক্তি আমেরিকা।[২১]

৩. মুসলিম যুবকদের মনমস্তিষ্কে 'পরাশক্তিভীতি' শিকড় গেড়ে বসেছিল। আফগানযুদ্ধ তাদের সেই 'কাল্পনিক পরাশক্তিভীতি'-কে সমূলে উৎখাত করে। চোখের সামনে সোভিয়েত পরাশক্তির পতন আর আফগানিস্তান থেকে পলায়নের দৃশ্য দেখে তাদের ভেতরে থাকা ভয়ভীতি কর্পূরের মতো উবে যায়। যেখানে পরাশক্তির ভয়ই তাদের ছিল না, সেখানে

[২০] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যা: শায়খ আবু মুসআব সূরী

[২১] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী: শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

পরাশক্তির তল্পিবাহক আঞ্চলিক শাসকরা তো কোন ছার। আফগান জিহাদের উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন ছিল এটি।

৪. রাশিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার-পরবর্তী আফগানিস্তান ছিল ইসলামের শত্রুদের আজ্ঞাবাহী নিমকহারাম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এক বাস্তব নমুনা। আফগানিস্তানের তৎকালীন শাসক নজিবুল্লাহ নামায পড়ত, রোযা রাখত, হজও করত। কিন্তু সে ইসলামী শাসনকে অস্বীকার করত, ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাঁত করত, তাদেরকে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশের সুযোগ করে দিত, দীন কায়েম করতে চাওয়া মুসলিমদের কঠোর হস্তে দমন করত। নজিবুল্লাহ ও তার সরকারের বিরুদ্ধে যদি জিহাদ ফরয হয়ে থাকে, তাহলে তার মতো অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসকদের বিরুদ্ধেও তো জিহাদ ফরয হবে।

৫. শত্রুমিত্রের স্পষ্টতা: আফগানিস্তানের চিত্র ছিল স্পষ্ট। মুসলিমরা ইসলামের পতাকাতলে লড়াই করছিল আর বহিরাগত আগ্রাসি শত্রুকে দেশীয় সহযোগী দালাল মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী সাহায্য করছিল। এর ভিত্তিতেই মুজাহিদগণ আফগান রণাঙ্গনে খাঁটি ইসলামী আদর্শ বুকে ধারণ করে মুসলিম ভূমি প্রতিরক্ষার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এটিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ইতঃপূর্বে মুসলিম দেশগুলোতে সংঘটিত অনেক স্বাধীনতাযুদ্ধে ইসলামের সাথে জাতীয়তাবাদী আদর্শ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় সমাজতান্ত্রিক বামপন্থি আদর্শও ঢুকে পড়েছিল। এর ফলে মুসলিম যুবকদের ইসলামী ও জিহাদী আকীদা এবং এর বাস্তবায়নের মাঝে চূড়ান্ত বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের ওপর গড়ে ওঠা ওয়ালা-বারার মতো মৌলিক আকীদার অনুশীলন সমাজ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনের জিহাদ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার জন্য তারা বন্ধুবেশি শত্রুর সাথে জোট করেছিল। জোট রক্ষার জন্য ইসলামী আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে আপস পর্যন্ত করেছিল। ফলাফল কী হলো? তারা শত্রুর সাথে জোটবদ্ধ হলো ঠিকই, কিন্তু ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করতে পারল না; বরং ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অঞ্চল ইসরাইলের কাছে বিক্রি করে দিলো।

আফগান জিহাদের এত অর্জন থাকা সত্ত্বেও আফসোসের বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। শত্রুপক্ষের প্রতারণার রাজনীতির শিকার হয়ে এই সুবর্ণ সুযোগটি মুজাহিদদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। শত্রু এখানেও সেই চালই চেলেছিল, যাতে তারা সিদ্ধহস্ত। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর রাজনীতি আর অধিকাংশ জিহাদী দলের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসা সাইকস-পিকোর চুক্তির বিষাক্ত সংস্কৃতি (জাতীয়তাবাদ)—এই দুটি কৌশল ব্যবহার করে তারা মুজাহিদদের ওপর হামলা করেছিল। এ প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. বলেন—

‘আঞ্চলিক ও গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতামুক্ত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের বেশ ভালো সুযোগ ছিল তখন। আফগান মুজাহিদ ভাইদের মধ্যেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহযোগিতার পরিবেশ ছিল। জাতীয়তা ও আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে পরিস্থিতিও বেশ অনুকূল ছিল। পারস্পরিক সম্মতি-বোঝাপড়া, আগ্রহ ও উদ্দীপনার সুন্দর পরিবেশ ছিল। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-সহ অন্যান্য মুজাহিদগণ আফগানের জিহাদী জামাত, উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে বারবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নসীহতও করছিলেন, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এতেও কোনো লাভ হচ্ছিল না। যাদেরকে নসীহত করা হচ্ছিল, তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। সবাই চাচ্ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক; কিন্তু তা হতে হবে নিজের অধীনে এবং নিজের গ্রামে ও শহরে। [জাতি-গোত্র ও আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতার] এই বিষাক্ত চিন্তা থেকে আমরা বেরই হতে পারছিলাম না। ১০ বছরেরও বেশি সময় এই সুযোগ থাকার পরেও একে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ কেউই নিতে পারেনি।’[২২]

এই বইয়ের শেষে ‘তালেবান আন্দোলন: জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাক’ শিরোনামে একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে। তাতে আমাদের চিন্তাভাবনার জন্য কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তালেবান কীভাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করতে সফল হলো, অথচ অনেক মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলন, এমনকি জিহাদী জামাতও ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে, তালেবানের এই সফলতার পেছনে মৌলিক কারণগুলো কী কী—সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে।

## আফগান জিহাদে আমেরিকার সাহায্য ও কিছু সংশয়

শায়খ আবু মুসআব সূরী তার বই ‘দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ’-তে এই দাবি খণ্ডন করে বলেন—

‘এখানে দুটি সংশয় নিয়ে কথা বলতে চাই। এগুলোকে অবশ্য সংশয় না বলে জলজ্যান্ত মিথ্যা বললেই যথার্থ হয়। পশ্চিমা মিডিয়া এবং আরব ও ইসলামী বিশ্বে তাদের দালাল সংবাদমাধ্যমগুলো এই মিথ্যার জন্ম দিয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে, বিশেষভাবে

[২২] তাওজীহাতুন মানহাজিয়্যাহ: শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.

ইসলামপন্থি ও জিহাদপ্রেমী ভাইদের সামনে এর বাস্তবতা তুলে ধরা উচিত। মিথ্যাদুটি হলো—

১. আফগান জিহাদে আমেরিকার ভূমিকা।

২. আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব ও অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে CIA-এর সম্পর্ক এবং তাদের আমেরিকার এজেন্ট হওয়ার ব্যাপারে সংশয়, পশ্চিমা ও তাদের দোসর মিডিয়াগুলো যা খুব ফলাও করে প্রচার করে।

## আফগান জিহাদে আমেরিকার ভূমিকা

ইহুদী ও জায়নবাদী ক্রুসেডার পরিচালিত আমেরিকান মিডিয়াগুলো বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এই ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছে যে, আফগান জিহাদে মুজাহিদদের বিজয় মূলত আমেরিকার রাজনৈতিক পলিসি ও CIA-এর পরিকল্পনার ফসল। মার্কিনিদের এই প্রোপাগান্ডা অবিশ্বাস্যভাবে অনেকটা সফলও হয়েছে। এ জন্য তারা নানান প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করেছে। এমনকি এ নিয়ে মুভিও তৈরি করেছে। মার্কিন মুভি সিরিজ র‍্যাম্বোর তৃতীয় মুভিটি পুরোটাই আফগানযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত। এতে তারা দেখিয়েছে, র‍্যাম্বো আফগানযুদ্ধে অংশ নিয়ে রাশিয়ান বিমান ধ্বংস করছে; তাদের ঘাঁটি মিসমার করে দিচ্ছে; আফগান-আমেরিকান, এমনকি মুজাহিদ বন্দিদেরও মুক্ত করে আনছে; ঘোড়ায় চড়ে আর্টিলারির নেতৃত্ব দিচ্ছে; রুশ হেলিকপ্টারে চড়ে আকাশে উড়ছে; অনেকবার আহত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মারা যাচ্ছে না; লোহায় মোড়ানো ট্যাংক আগুনের তাপে ঝলসে গেলেও ভেতরে থাকা র‍্যাম্বোর মজবুত মাংসপেশী বহাল তবিয়তে থেকে যাচ্ছে; তার আমেরিকান মাসল দেখে ভক্তিতে গদগদ হওয়া দর্শকদের সামনে মাঝে মাঝে সে বক্তৃতার নামে শেখানো মিথ্যা বুলি আওড়ে যাচ্ছে; শেষে সবাইকে বার্তা দিয়ে যাচ্ছে যে, আমেরিকা দুর্বলদের প্রতি সদয়, মজলুমদের মুক্তির দূত, মুসলিমদের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর আর আফগানদের এই বিজয়ে আমেরিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য; সুদীর্ঘ এই বক্তৃতা শুনে আমেরিকার প্রতি তার ভক্ত-অনুরক্তদের মাথা নুয়ে পড়ছে কৃতজ্ঞতার ভারে। কাল্পনিক এই মুভিতে এভাবেই আমেরিকার ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো তাদের দর্শকদের বোকা বানিয়ে আরেকটি মিথ্যা ছড়িয়েছে। তারা প্রচার করেছে, আফগান জিহাদে মুজাহিদদের বিজয়ের পেছনে আমেরিকার স্টিংগার মিসাইলের অবদান ছিল। এই মিসাইল দিয়ে যখন একের পর এক রাশিয়ান বিমান ভূপাতিত করা হচ্ছিল, তখনই মূলত যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। স্টিংগার মিসাইলের বদৌলতেই মুজাহিদরা তাদের নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ে বদলাতে পেরেছিল। এই হলো তাদের মিথ্যাচারের নমুনা। অথচ এটা সবাই জানে, আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া সৈন্য গুটিয়ে নেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে সামান্য কিছু আমেরিকান স্টিংগার

মিসাইল আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল। তা ব্যবহার করে হাতেগোনা কয়েকটি রাশিয়ান বিমান ভূপাতিত করা হয়েছিল কেবল।

সম্মানিত পাঠক, আপনি নিজেই একটু চিন্তা করে দেখুন, এই যুদ্ধে রাশিয়ার ৫০ হাজারের বেশি যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস হয়েছে, ৩০ হাজারের অধিক রাশিয়ান সৈন্য ও দেড় লক্ষাধিক আফগান কমিউনিস্ট মিলিশিয়া নিহত হয়েছে—এ সবের পেছনে আমেরিকান স্টিংগারের কতটুকু ভূমিকা ছিল? সোভিয়েত আগ্রাসনের আগে পাঁচ বছর আর সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পর কাবুল বিজয় পর্যন্ত তিন বছর-সহ সুদীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে হাজারো অপারেশন মুজাহিদগণ চালিয়েছেন, এ সব অপারেশনে আমেরিকান স্টিংগারের আদৌ কোনো ভূমিকা ছিল কি?

## সিআইএ'র সাথে আরব মুজাহিদদের সম্পর্ক এবং আমেরিকার এজেন্ট হওয়ার অপবাদ

এমন আরেকটি বানোয়াট গল্প মিডিয়াপাড়ায় বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সেটা হলো, 'সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য সিআইএ'র পক্ষ থেকেই আফগানি আরব মুজাহিদীন, উসামা বিন লাদেন ও আব্দুল্লাহ আযযামের মতো নেতৃবৃন্দকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সিআইএ'র এই চাল বুমেরাং হয়েছে। তাদের তৈরি এ সব লোকেরাই নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনে হামলা করেছে। আবার কেউ কেউ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আঞ্চলিকভাবে আমেরিকান স্বার্থে আঘাত হানা, মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করা এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে থাকা আমেরিকার আঞ্চলিক মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। বর্তমানে আরব দেশগুলোতে যে সশস্ত্র জিহাদ শুরু হয়েছে, সেটা মূলত আফগান জিহাদেরই সম্প্রসারিত একটি রূপ। এ সবই মার্কিন গোয়েন্দাদের কাজ, কিন্তু এগুলোর নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।'

অথচ বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। বর্তমানে আরবদের মধ্যে যে জিহাদী জাগরণ শুরু হয়েছে, তা মূলত ত্রিশের দশকে শুরু হওয়া ইসলামী জাগরণের (সহওয়া ইসলামিয়্যাহ) ফসল। তখনকার এই ইসলামী জাগরণের পর ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত; অর্থাৎ আফগান জিহাদের বিশ বছর আগেই বহুসংখ্যক জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদদের অধিকাংশ নেতা ও মাশায়েখ তৎকালীন জিহাদী আন্দোলনের সিলসিলা থেকেই এসেছেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. ছিলেন ফিলিস্তিন জিহাদের একজন প্রবীণ নেতা। শায়খ উসামা রহ. সহওয়া আন্দোলনের পীঠস্থানে সেই সংস্কৃতির মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। আফগানিস্তানে আসার আগে আশির দশকের শুরু থেকেই তিনি আরব ও সিরিয়ার বিভিন্ন জিহাদী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং নিয়মিত তাদের সহায়তাও করতেন।

আফগান জিহাদে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন এবং আফগানিস্তানে আরব জিহাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, এমন নেতা ও প্রশিক্ষক সকলেই আরবের বিভিন্ন জিহাদী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেন থেকে আগতদের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের হাত ধরেই আফগানে আরব সমাজের সূচনা হয়েছে। মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ, মিডিয়া প্রচারণা, সামরিক কার্যক্রম ও মাঠ পর্যায়ে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজগুলো তারাই দেখাশোনা করতেন। এর অনেক পরে বিভিন্ন মুসলিম ও আরব দেশ থেকে দলে দলে মুজাহিদ আসতে শুরু করে। ১৯৮৪ সালে অল্প ক'জন মানুষ নিয়ে শুরু হওয়া আরব জমায়েত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এসে ৪০ হাজারের বিশাল এক বাহিনীতে পরিণত হয়।'

আল-জাযীরার সাংবাদিক জামাল ইসমাইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়খ উসামা রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আন্তর্জাতিক মিডিয়া ফলাও করে এ কথা প্রচার করছে যে, আফগান জিহাদে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাই আপনাদের অর্থায়ন করেছে এবং তাদের সহযোগিতাতেই আপনারা এই জিহাদে টিকতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?' তখন শায়খ রহ. এই দাবিকে শক্তভাবে নাকচ করে বলেছিলেন—

'আমেরিকা যদি দাবি করে, তারা কোনোদিন আমাদের সাহায্য করেছে, তাহলে এটা তাদের মিথ্যাচার। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, তাদের দাবির পক্ষে একটি হলেও দলীল পেশ করুক। উলটো তারাই তো আমাদের ও আফগান মুজাহিদদের ওপর ভরসা করে বসে ছিল। তাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি হয়নি। আমরা তো আফগানিস্তানে ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। ইসলামের জন্য আমাদের এ লড়াই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমেরিকার স্বার্থের সাথে মিলে গিয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে রোম ও পারস্যের মধ্যে ঐতিহাসিক শত্রুতা ছিল, তাদের মাঝে যুদ্ধও হতো। তো মুসলিমরা যখন মূতা প্রান্তরে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল, তাদের এই যুদ্ধ তখন স্বাভাবিকভাবেই পারস্যের পক্ষে যাচ্ছিল। তাই বলে কোনো বিবেকবান মানুষ কিন্তু কখনোই এ কথা বলবে না, মুসলিমরা পারস্যের এজেন্ট ছিল। হ্যাঁ, রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের এই যুদ্ধে পারস্য অবশ্যই খুশি ছিল। কিন্তু কয়েকটি যুদ্ধের পর যখন রোমানরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তখন কিন্তু এই মুসলিমরাই পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাই কোনো কাজ কারো স্বার্থের সাথে মিলে যাওয়া আর কারো এজেন্ট হওয়া এক বিষয় না। আমরা তো অনেক আগে থেকেই আমেরিকাকে নিজেদের শত্রু মনে করি। আমেরিকান পণ্য বয়কট করা এবং আমেরিকান বাহিনী ও অর্থনীতির ওপর আঘাত হানার আবশ্যকতা নিয়ে আল্লাহর রহমতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে হিজায ও নজদের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে।'

## জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে বড় জিহাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আফগান মুজাহিদগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক অকল্পনীয় বিজয় ছিনিয়ে আনেন। সফল এই জিহাদী আন্দোলনের পর থেকেই ইসলামের শত্রুরা ভয়ের মধ্যে ছিল। তারা আশঙ্কা করছিল, দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনে জিহাদের কার্যকারিতা মুসলমানরা না জানি আবার বিশ্বাস করে বসে। এ কারণে যে-কোনোভাবে এই জিহাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়।

[প্রথমত:] মুসলিমদের মধ্যে যে-কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনের সফলতার ব্যাপারে হতাশা তৈরি করতে হবে।
[দ্বিতীয়ত: তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে,] জিহাদের কারণে শুধু ধ্বংস আর বিপর্যয়ই আসে।
[তৃতীয়ত: এ ধারণাও ছড়িয়ে দিতে হবে,] মুজাহিদরা বর্তমানের আধুনিক সমাজ পরিচালনা করতে অক্ষম। উন্নতি-অগ্রগতির এই যুগে তারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।

এর পাশাপাশি এই জিহাদী আন্দোলনে যে সকল আরব প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছে আর যারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তাদের সকলকে বিক্ষিপ্ত করে ধ্বংস করে দেওয়াও জরুরি ছিল। আর এই সবগুলো লক্ষ্য পূরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল আফগানিস্তানের জিহাদী দলগুলোর মধ্যে বিবাদ ও কোন্দল উসকে দেওয়া।

## বিজয় যেভাবে পরাজয়ে বদলে গেল

শায়খ সাইফ আল-আদল তার বই الصراع ورياح التغيير-এর তৃতীয় খণ্ডে আফগানের জিহাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে মার্কিন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন—

> ‘সৌদি অর্থায়ন, পাকিস্তানের মেহনত আর মার্কিন পরিকল্পনার সমন্বয়ে আমেরিকা এক বিস্তৃত প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমে মুজাহিদদের ব্যবহার করে রাশিয়াকে একেবারে দুর্বল বানিয়ে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হবে। তারপর মুজাহিদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এবং মুজাহিদদের পরনির্ভরশীলতা প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধের সমাপ্তি সামরিকভাবে না করে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ক্ষমতার হাতবদল নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিস্ট ও ইসলামপন্থিদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করা হবে এবং এই সরকারকে ব্যবহার করে যুদ্ধপরবর্তী

আফগানিস্তান থেকে আরবদের নির্মূল করা হবে, পাশাপাশি জিহাদী আন্দোলনের এই জোয়ার যেন বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংক্ষেপে বললে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া যে, জিহাদ শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে, নির্মাণ ও উন্নয়ন জিহাদের মাধ্যমে সম্ভব নয়; আফগানিস্তানে মুজাহিদদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে রাজনীতিবিদদের হাতে, যোদ্ধাদের হাতে নয়। এটা স্পষ্টই ছিল যে, তাদের কথামতো কাজ করলে মুজাহিদদের সব ত্যাগ বৃথা যেত আর তাদের লক্ষ্যই বাস্তবায়ন হতো। অন্যদিকে জিহাদ ও কিতালের পথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরো উম্মতের মধ্যে অনাস্থা ও হতাশা তৈরি হয়ে যেত। Afghanistan: The Bear Trap বইয়ের লেখক এবং আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ ইউসুফ এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছিলেন, "বিজয়ের মুখ থেকে পরাজয় ছিনিয়ে আনা হয়েছে।" কী অদ্ভূত উপমা তিনি ব্যবহার করেছেন। বাস্তবেও মুজাহিদদের বিজয় একদম সন্নিকটে ছিল, কিন্তু তারা মুজাহিদদের সামনে বাধার প্রাচীর তৈরি করে তাদের সুনিশ্চিত বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল।'

এই ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার হন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। ১৭ই আগস্ট ১৯৮৮ সালে তাকে গুপ্তহত্যা করা হয়। এর এক বছর পর ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর জুমআর নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে 'সাবউল লাইল' মসজিদে যাওয়ার পথে পেশোয়ারে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামকে তার দুই ছেলে-সহ শহীদ করা হয়।

আফগান মুজাহিদরা যখন কাবুলের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন, তাদের হাতে একের পর এক বড় শহরগুলোর পতন হচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আফগান ও আরবদের টার্গেট করে মার্কিনিদের এই নীলনকশা আফগান রণাঙ্গনে সক্রিয় হয়।[২৩]

১. আফগানদের নিয়ে আমেরিকা ও তার মিত্র পাকিস্তান, সৌদি আরব ও মিশরের পরিকল্পনা ছিল, কোনোভাবেই মুজাহিদদের ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া যাবে না এবং আফগানিস্তান পুনর্গঠনের অবকাশও দেওয়া হবে না। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আফগানিস্তানকে একটি গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। এর ফলে আফগানিস্তানের অস্ত্রের মজুদ ধ্বংস হয়ে যাবে, পাশাপাশি আফগান জিহাদের প্রথম সারির হাজার হাজার নেতা ও কমান্ডাররাও মারা পড়বে। ১৯৯২

[২৩] এই আলোচনাটি দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

২. অন্যদিকে আরব মুজাহিদদের ধ্বংস করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরপর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। আরব মুজাহিদদের মুবারক এই জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আমেরিকার বানানো ঘৃণ্য পরিকল্পনা পাকিস্তান বাস্তবায়ন করা শুরু করে। আরব ও ইউরোপীয় সব দেশ আমেরিকার আদেশ মাথা পেতে মেনে নেয়। আরব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের চালানো অভিযানের ফলে বিরাট একটি অংশ আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরতে বাধ্য হন। নিজ দেশে ফিরে তারা জেল-জুলুমের শিকার হন। সশস্ত্র জিহাদী দলের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের নামে উদ্দেশ্যমূলক হয়রানির মুখোমুখি হন। আর যারা নিজ দেশে ফিরতে পারেননি, তারা বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন; অনেকে এমন আরব রাষ্ট্রে আশ্রয় নেন, যেখানে নিজ দেশের সরকার তাদের নাগাল পাবে না। [পাকিস্তানের চালানো এই অভিযানের ফলে] আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদদের সংখ্যা ৪০ হাজার থেকে কয়েক শ'তে এসে ঠেকে। তারাও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপনে চলে যান।

## সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী লড়াই: জিহাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত:[২৪]

এখানেই শেষ নয়। উপসাগরীয় যুদ্ধ (অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম) শেষ হওয়ার পর জিহাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য আমেরিকা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়। (এই পরিকল্পনাকেই ৯/১১-এর পর জর্জ বুশ ওয়ার অন টেররের রূপ দেয়।) এরই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নামে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিরাপত্তা সম্মেলনের নামে বিভিন্ন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতি ছয় মাসে গড়ে এক বা একাধিক কনফারেন্স হতো। আরব-ইসরাইল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে 'মাদ্রিদ পিস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালের ডেটন কনফারেন্স এবং ১৯৯৬ সালের শারম আল-শেখ কনফারেন্স (পিসমেকার সামিট)-এরও লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। এভাবে লাগাতার কয়েক ডজন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এখনো এই সম্মেলনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি সম্মেলনে আমেরিকা ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়াও ইসরাইল ও বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রও

[২৪] এই পুরো আলোচনা দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলালিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এতে অংশ নেয়। তিউনিসিয়ায় আরব দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়েও ধারাবাহিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি সরকার, বিশেষ করে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নায়েফ বিন আব্দুল আযীয—সন্ত্রাসদমনের ব্যাপারে যে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিল—এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই দশকে শুরু হওয়া সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের এই পরিকল্পনার সারাংশ নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে—

### ১. জিহাদের অর্থনৈতিক উৎস বন্ধ করে দেওয়া:

এ পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ছিল এটি। যে সকল জিহাদী ও 'মৌলবাদী' আন্দোলনকে আমেরিকা ও তার দালাল মুসলিম শাসকগোষ্ঠী 'সন্ত্রাসী' মনে করে, তাদের অর্থনৈতিক উৎসগুলোর ওপর কড়া নজরদারি আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য তারা অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন: গ্রাহকদের ব্যাংক ব্যালেন্স ও আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারি করা, যাকাতের অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তা নিরীক্ষণ করা, বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা বিশেষ করে দীনী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখা ইত্যাদি। এ ছাড়াও [সন্দেহজনক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের] সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া অথবা ফ্রিজ করার মতো কিছু সিদ্ধান্তও তারা নেয়। ফলে অধিকাংশ জিহাদী দল সংকটে পড়ে যায় আর তাদের অর্থের উৎসগুলোও মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে আসে।

### ২. জিহাদী নেতৃবৃন্দকে হত্যা ও গ্রেফতারের ধারাবাহিকতা:

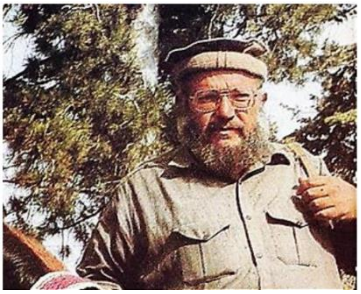
১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-কে হত্যার মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই আমেরিকা তাদের এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। তারও আগে শায়খ তামীম আদনানী রহ. আমেরিকাতে রহস্যজনকভাবে ইন্তেকাল করেছিলেন। ১৯৯১ সালে পেশোয়ারে শায়খ উসামাকেও কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে তারা শহীদ করা শুরু করে (যা Extraordinary rendition নামে পরিচিত)। এরই ধারাবাহিকতায় বসনিয়ার আরব মুজাহিদদের আমীর শায়খ আনওয়ার শাবান রহ.-কে হত্যা করা হয়; ডেনমার্কের রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা মিশরের আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যার আমীর শায়খ তালাত ফুয়াদ কাসেম রহ.-কে ক্রোয়েশিয়া থেকে অপহরণ করে হেলিকপ্টার যোগে ভূমধ্যসাগরস্থ মার্কিন জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে পরে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়; আমেরিকা থেকে শায়খ উমর আব্দুর রহমান রহ.-কে গ্রেফতার করে তার ওপর হাস্যকর কিছু অভিযোগ আনা হয় এবং সে সব অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে ২০০ বছরেরও বেশি সময়ের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ছাড়াও ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স-সহ আরও অনেক দেশে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ওপর আক্রমণ করা হয়। এমনকি আরবের যে-সকল উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের কথা থেকে

পরোক্ষভাবেও জিহাদের দাওয়াত ছড়ানোর সম্ভাবনা ছিল, তাদেরও গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আলজেরিয়ায় শায়খ আলী বেলহাজকে গ্রেফতার করা হয়, শায়খ সাফার আল-হাওয়ালী, শায়খ সালমান আওদা-সহ আরবের সহওয়া আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় একাধিক আলেমকে গ্রেফতার করা হয়। আজারবাইজান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, পাকিস্তান-সহ অসংখ্য দেশ থেকে মুজাহিদদের গুম করা হয়। কাউকে তো অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয় আর কেউ কেউ চিরকালের জন্য অজানা পরিণতি বরণ করে নেন।



শাহাদাতের পর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম ও তার দুই সন্তান মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম



শায়খ তামীম আদনানী রহ.

**৩. আন্তর্দেশীয় বন্দিবিনিময় চুক্তি:**

আরব ও মুসলিম দেশগুলো নিজেদের মধ্যে অনেক মুজাহিদ বন্দিদের বিনিময় করে। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের শেষ অবস্থা কী হয়েছে—তা আজও অজানা। এমনকি অনেক পশ্চিমা দেশ, যারা মুখে মুখে আন্তর্জাতিক আইন আর মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়, তারাও এ ঘৃণ্য কাজে সমানভাবে শরীক ছিল। তারা অনেক নিরপরাধ ভাইদের পরিবার-সহ তাদের সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল।

**৪. নিরাপদ আশ্রয়ের বিলুপ্তিসাধন (Eliminating terrorist safe havens):**

১৯৯৫ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সর্বপ্রথম এই পরিভাষা ব্যবহার করে কার্যক্রম শুরু করে। তার এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। অধিকাংশ আরব-আফগান মুজাহিদ ও জিহাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন। কেউ সুদান, ইয়েমেন, ইরান ও তুরস্কেও আশ্রয় নিয়েছিলেন। উত্তর আফ্রিকার কিছু মুজাহিদ সিরিয়া ও জর্ডানে চলে গিয়েছিলেন। অল্পকিছু মুজাহিদ পাকিস্তানে ছিলেন আর হাতেগোনা কয়েকজন ছিলেন আফগানিস্তানে।

আমেরিকার এই দমননীতির ফলে সুদান থেকে শায়খ উসামা রহ.-সহ মিশরীয়, লিবিয়ান ও অন্যান্য মুজাহিদদের বের করে দেওয়া হয়। বশীর ও তুরাবীর নেতৃত্বাধীন সুদান সরকার লিবিয়ান ভাইদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ইয়েমেনে অবস্থানরত মুজাহিদ পরিবারের নারী-শিশুদের গ্রেফতারের হুমকি দিয়ে ইয়েমেন সরকার তাদেরও দেশ থেকে বহিষ্কার করে; এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের প্রধান ও ইসলামী নেতৃবৃন্দও সরকারকে সহযোগিতা করে। সিরিয়া, জর্ডান ও তুরস্কের সরকারও মুজাহিদদের গ্রেফতার করে তাদের দেশে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা শুরু করে। যারা গ্রেফতারি এড়াতে সক্ষম হন, তারা পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। বলকান যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সরাসরি হস্তক্ষেপে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে ডেটন চুক্তি সম্পন্ন হয়। এর মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার নির্ধারিত শর্তগুলোও বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত ছিল, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা থেকে আরব মুজাহিদদের বহিষ্কার করা। এভাবেই ১৯৯৫ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে মুজাহিদদের জন্য সুবিশাল এই পৃথিবী সংকুচিত হতে শুরু করে।

**৫. আঞ্চলিক নিরাপত্তা-সহযোগিতার বিশ্বায়ন:**

এই সময়েই জটিল প্রকৃতির একাধিক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাচুক্তি সম্পাদিত হয়। এর আলোকে [অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে] নিয়মতান্ত্রিক যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান-সহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।

**৬. সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সম্প্রসারণ:**

আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের অনেক আইন সংশোধন করে। অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে এমন কিছু আইন তারা প্রণয়ন করে, যা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ থেকেও নিকৃষ্ট। সন্ত্রাসবিরোধী আইনগুলো এতটাই ব্যাপক করে যে, এর মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

**৭. মুজাহিদদের কলঙ্কিত করে জনবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে মিডিয়া-প্রোপাগান্ডা:**

সামরিক ও নিরাপত্তামূলক এই আক্রমণের সাথে তাল মিলিয়ে তারা মিডিয়া প্রোপাগান্ডাও শুরু করে। এই প্রোপাগান্ডার লক্ষ্য ছিল, মুজাহিদদের জনবিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দুর্নাম রটানো এবং মুজাহিদদের নীতি-আদর্শ ও কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। তারা মুজাহিদদের ব্যাপারে ফলাও করে প্রচার করা শুরু করে, মুজাহিদরা হলো রক্তপিপাসু খুনি, কট্টরপন্থি ধর্মান্ধগোষ্ঠী; তাদের কাছে উদারতা ও সংলাপের কোনো স্থান নেই। এ জাতীয় নানান মিথ্যাচার আর অপবাদ তারা ছড়াতে শুরু করে। আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সরকারি মদদপুষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই বৈশ্বিক যুদ্ধে তারাই মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রটি সরবরাহ করে।

## তারা কি একে অপরকে এ কাজের অসীয়ত করেছে?

### সন্ত্রাস দমনের নামে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও কিছু কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ঘটনাবলি নিয়ে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ধ্বজাধারীরা যে কৌশলগুলো গ্রহণ করেছে, সেগুলোর কোনোটিই নতুন নয়। বর্তমান কাফেরগোষ্ঠী যে কূটচাল গ্রহণ করেছে, তা মূলত তাদের পূর্ববর্তীদের কূটচালেরই প্রতিচ্ছবি। দিনশেষে সবার উদ্দেশ্য এক স্থানে গিয়েই মিলিত হয়। আর তা হলো 'আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া'। এ কথাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন এই আয়াতে—'**أتواصوا به**' (তারা কি একে অপরকে এ কাজের অসীয়ত করেছে?' তাদের উদ্দেশ্য ও কৌশল সব সময় একই ছিল; পার্থক্য শুধু শব্দ, নাম ও ব্যক্তির মধ্যে।

মুজাহিদদের অর্থনৈতিক উৎস বন্ধ করে দেওয়ার এই পরিকল্পনার কথা সরাসরি কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

**هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ**

'তারাই বলে, তোমরা রাসূলের সাথে থাকা লোকদের জন্য খরচ কোরো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তার কাছ থেকে সরে পড়ে।' [সূরা মুনাফিকুন (৬৩): ৭]

শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ও কামান্ডারদের গ্রেফতার ও হত্যার পরিকল্পনার ব্যাপারটিও কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ**

'(হে নবী, সে সময়কে স্মরণ করো) যখন কাফেররা তোমাকে বন্দি করতে অথবা হত্যা করতে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করতে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল।'

[সূরা আনফাল (৮): ৩০]

চুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে মুজাহিদদের কাবু করার নমুনাও সীরাতে পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কুরাইশের কাফেররা আবু তালেবের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

নিরাপদ আশ্রয় ধ্বংস করার নমুনাও সীরাতে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে মক্কার কুরাইশদের সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল, তিনি আরবের কোনো অঞ্চলে গিয়ে কথার জাদুতে লোকদের আকৃষ্ট করে নিজের অনুসারী বানিয়ে ফেলবেন। এ কারণেই যখন কুরাইশের কানে দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার সংবাদ পৌঁছায়, তারা সাথে সাথে মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতাদের কাছে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার প্রচ্ছন্ন হুমকিও তাতে ছিল। তারা খাযরাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'হে খাযরাজ সম্প্রদায়, আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা আমাদের গোত্রের এই লোকের সাথে দেখা করেছিলে। তোমরা তাকে আমাদের থেকে বের করে নিতে চাচ্ছ; এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে বাইয়াতবদ্ধ হচ্ছ। আল্লাহর কসম, সারা আরবের মধ্যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করাকেই আমরা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি।' [মুসনাদে আহমাদ: ১৫৭৯৮]

নিরাপত্তা-সহযোগিতার নমুনাও সীরাতে পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরতের পর কুরাইশরা সেখানকার বাদশাহ নাজাশীর কাছে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিল তাকে নিজেদের দলে টানার জন্য। মুহাজির মুসলিমদেরকে কুরাইশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা নাজাশী ও তার সভাসদদের টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। সীরাতের কিতাবে এর আরেকটি উদাহরণ হলো গযওয়ায়ে আহযাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইহুদীরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রকে উসকানি দিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিল। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোট সেটারই এক জীবন্ত নমুনামাত্র।

মুজাহিদদের জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রোপাগান্ডার নমুনাও সীরাতের কিতাবে রয়েছে। [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতী কাজ শুরুর পর] হজের মৌসুম ঘনিয়ে আসলে মক্কার মুশরিকরা পরামর্শের জন্য একত্র হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মক্কায় আসা মানুষদের কাছে যেন রাসূলের দাওয়াত না পৌঁছায়—এ উদ্দেশ্যে শলাপরামর্শ হতে থাকে। আরবদের মাঝে রাসূলের দাওয়াত যেন কোনো গ্রহণযোগ্যতা না পায়, সে জন্য তারা রাসূলের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ একটি অবস্থান তৈরি করতে চাচ্ছিল। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'তোমরা সবাই একটি সিদ্ধান্তে একমত হও। নিজেদের কথার মধ্যে ভিন্নতা থাকলে একজনের কথা দিয়েই অন্যজনের কথার মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে।'

তখন লোকেরা তাকেই সিদ্ধান্ত দিতে বললে সে বিষয়টিকে সবার হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের কথা শুনতে থাকে। তখন কেউ প্রস্তাব দিলো, আমরা তাকে গণক বলব। সে বলল, না, আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমরা অনেক গণক দেখেছি। সে গণকের মতো গুনগুন করে না, ছন্দে ছন্দে কথাও বলে না। কেউ বলল, তাহলে পাগল বলব। সে বলল, না, সে তো পাগলও নয়। আমরা পাগল দেখেছি, কোনটা পাগলামি—তা-ও আমরা ভালো করেই জানি। তার মধ্যে তো পাগলামির কোনো লক্ষণ নেই। লোকেরা বলল, তাহলে তাকে আমরা কবি বলব। সে বলল, না, তাকে কবিও বলা যায় না। কবিতার প্রকারভেদ, ছন্দ, সুর সবকিছুই তো আমরা খুব ভালোভাবে জানি; তার কথা কবিতার মধ্যেও পড়ে না। কেউ বলল, তাহলে তাকে জাদুকর বলব। সে বলল, না, সে জাদুকরও নয়। আমরা অনেক জাদুকর দেখেছি, তাদের জাদুও দেখেছি। সে জাদুকরদের মতো ঝারফুঁক করে না, গিটও দেয় না। লোকেরা বলল, তাহলে আপনিই বলে দিন তাকে আমরা কী বলতে পারি? সে বলল, তোমাদের সবগুলো প্রস্তাবের মধ্য থেকে জাদুকর বলাটাই তার ক্ষেত্রে অধিক মানানসই। তোমরা বলবে, সে এমন জাদু জানে, যার দ্বারা সে পিতা-পুত্রে, ভাই-ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

শেষ পর্যন্ত জাদুকর বলার সিদ্ধান্তে সবাই একমত হয়। পরবর্তীতে হজের মৌসুমে কুরাইশের লোকজন রাস্তায় রাস্তায় বসে থাকত। তাদের সামনে দিয়ে যারাই যেত, তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বলে তার থেকে দূরে থাকতে বলত।

সুদুর অতীত থেকে এভাবেই চলে আসছে। এদের [বর্তমান কাফেরদের] পূর্বসূরীরা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছে। তাদের উত্তরসূরীরা আজও সেই পথেই চলছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলবে। আমেরিকার নেতৃত্বে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তও অতীতেরই সিলসিলা। উম্মাহর সন্তানদের যে-কোনো জিহাদী তৎপরতার আভাস পেলেই তারা তা গুড়িয়ে দিতে কালক্ষেপণ করে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশ্বিক সিস্টেমকে ভেঙে দিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো আন্দোলনকে তারা কোনোভাবেই মেনে নেয় না। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই একদিন কাফেরদের চক্রান্ত নস্যাৎ হবে এবং আল্লাহর দীন বিজয়ী হবে। এই উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের পরিত্যাগকারী ও বিরোধিতাকারী কেউই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই সংবাদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

**لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاس**

‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর বিধানের ওপর কায়েম থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ (সহায়তা) ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে, তারা তখনও মানুষের ওপর বিজয়ী থাকবে।’ [সহীহ মুসলিম: ৪৮০২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

**لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ**

‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর বিধানের ওপর কায়েম থেকে লড়াই করতে থাকবে। তারা শত্রুদের মোকাবিলায় অপ্রতিরোধ্য হবে, তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থাতেই অটল থাকবে।’ [সহীহ মুসলিম: ১৯২৪]

## জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও কিছু শিক্ষা

এখানে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা আছে, যেগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত। এমন কিছু বিষয় নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

### ১. যুদ্ধের প্রকৃতি

মুসলমান ও মুজাহিদদের সাথে আমেরিকার এমন দ্বিমুখী আচরণ দেখে যুদ্ধের প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা খুব অবাক হয়। কিছুদিন আগেও আফগান জিহাদের জন্য তারা সবধরনের সুযোগ-সুবিধা দিলো। কিন্তু যখনই তাদের স্বার্থ হাসিল হলো, হাজারো মুজাহিদের রক্তের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থানে রুশ সাম্রাজ্যের কবর রচিত হলো, সাথে সাথে তাদের বোল পালটে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের বন্দুকের সব নল ঘুরিয়ে দিলো মুজাহিদদের দিকে। তাদের দমন করার জন্য নতুন নতুন আইন তৈরি হলো, নানান পরিকল্পনা করা হলো। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে লাগল। গতকালও যারা বীর ছিল, তাদেরই এখন সন্ত্রাসী, অপরাধী ও খুনি হিসেবে উপস্থাপন করতে উঠেপড়ে লাগল সবাই। তাদের পেছনে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হলো, জিজ্ঞাসাবাদের নামে শুরু হলো দীর্ঘ হয়রানির ধারাবাহিকতা এবং সশস্ত্র জিহাদী সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে মুজাহিদদের ওপর শুরু হলো জেলজুলুমের মর্মান্তিক অধ্যায়।

অথচ কিছুদিন আগে মুজাহিদরা যে-সব কারণে আগ্রাসি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, আজও ঠিক একই কারণেই তারা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন। কিন্তু তাদের অপরাধ হলো, তারা এবার আমেরিকার দখলদারিত্ব আর আধিপত্য থেকে নিজেদের দেশ ও পবিত্র স্থানগুলোকে রক্ষার জন্য জিহাদ শুরু করেছেন। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, তারা আমাদের বোঝাতে চায়, চলমান এই যুদ্ধের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা বলে, মুসলমানদের ভূখণ্ডে, বিশেষ করে মুসলমানদের সর্বাধিক পবিত্রতম স্থান জাযীরাতুল আরবে তাদের এত সৈন্যের উপস্থিতি আর ডজন ডজন ঘাঁটি তৈরি করার উদ্দেশ্য দখলদারি প্রতিষ্ঠা করা নয়। আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে তারা এই সামরিক তৎপরতার বৈধতা তৈরি করতে চায়।

মুসলিম ভূখণ্ডে আমেরিকার দখলদারিত্বকে বৈধতাদানকারী উলামায়ে সু-দের সৃষ্ট নানান সংশয় এবং ক্রুসেডার মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা থেকে বাঁচার জন্য চলমান এই লড়াইয়ের প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। কেননা এই লড়াইয়ের প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতেই আরব-আজমের সকল তাগুতের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্বে প্রবেশ করবে। তখন তাদের ও আমাদের সারিগুলো আলাদা হয়ে যাবে, মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে; একটি হবে ঈমানের শিবির, যাতে কোনো নিফাক থাকবে না। আরেকটি হবে কুফরের শিবির, তাতে কোনো ঈমান থাকবে না। এ ব্যাপারে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

> ‘মানুষকে বিভক্ত করে ফেলা বড় বড় এই ঘটনাগুলো মুসলিমদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর সাথে অনেক শরয়ী হুকুমের সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম ও নাওয়াকিযুল ইসলামের সাথেও এগুলো সম্পর্কিত। এ কারণে এই লড়াইয়ের প্রকৃতি ও বাস্তবতা ভালোভাবে অনুধাবন করা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যাতে তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়, তারা কোন দলে থাকবে।’

এই যুদ্ধের প্রকৃতি বুঝতে হবে কুরআনের আলোকে; আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, তার আলোকে। শত্রুরা আমাদের যেভাবে দেখাতে চায়, যেভাবে বোঝাতে চায় সেভাবে নয়। কুরআন আমাদের জানায়, আমাদের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা চিরস্থায়ী, তা কখনো দূর হবে না। দীনী, বিশ্বাসগত ও জাতিগত বিদ্বেষই এর কারণ। কুরআন আমাদের আরও জানায়, আমরা তাদের সাথে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে চাইলেও পারব না। যতদিন আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি তাদের থাকবে, ততদিন তারা আমাদের পিছু ছাড়বে না। আপন-পর কেউই তাদের এই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কুরআন আমাদের জানায়, কাফেরদের দ্বন্দ্ব মূলত ইসলামের ‘নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের’ সাথে। পুরো ইসলামের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব নেই। মুসলমানরা যদি সেই ‘নির্দিষ্ট কিছু বিষয়’ বাদ দিয়ে ইসলাম চর্চা করে, তাহলে তাদের প্রতি

শত্রুরা সন্তুষ্ট থাকবে। কুরআন জানায়, শত্রুরা মুসলমানদের প্রতি কেবল তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন তারা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে তাদের চাহিদার অনুগামী হবে। তাদের শত্রুতা ইসলাম ও ইসলামকে ধারণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟

'তারা (কাফেররা) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।' [সূরা বাকারা (২): ২১৭]

তিনি আরও বলেন—

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا

'তারা (কাফেররা) যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। তখন তোমরা কিছুতেই সফলতা লাভ করতে পারবে না।' [সূরা কাহাফ (১৮): ২০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদী ও নাসারাগণ তোমাদের ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের আদর্শের অনুসরণ কর।' [সূরা বাকারা (২): ১২০]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً

'তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেমন কুফরি করেছে, তেমনি তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা পরস্পর সমান হয়ে যাও।' [সূরা নিসা (৪): ৮৯][২৫]

৯/১১-এর পর আল্লাহ তাআলা অপরাধী নেতাদের মুখ থেকেই এই যুদ্ধের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ. তার বই 'হাকিকাতুল হারবিস সালীবিয়্যাতিল জাদিদাহ'-তে বলেন—

> 'নাম বদলালেও বাস্তবতা কখনো বদলায় না। কাফেররা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার যতই চেষ্টা করুক, মুসলমানদের প্রতি নিজেদের বিদ্বেষকে যতই আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন করুক, আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দেন। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

[২৫] শায়খ হামাদ বিন হামুদ রহ.-এর 'বাইনাল কায়েদা ওয়াল হাইয়াহ' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

'তারা (কাফেররা) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তার দীন পরিত্যাগ করে, তারপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, তবে তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে বৃথা যাবে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।'

[সূরা বাকারা (২): ২১৭]

আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ের সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ প্রকাশ করে দিয়েছেন, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধের বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সন্ত্রাস দমন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—যত নামই তারা দিক, এই সবকিছু মূলত তাদের অন্তরে শিকড় গেড়ে থাকা ক্রুসেডীয় মনোভাব গোপন করার চেষ্টামাত্র। শত্রুতা আর বিদ্বেষে তাদের অন্তরগুলো পরিপূর্ণ, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ২০০১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে মুখফুটে নিজেদের এই বিশ্বাসের কথা বলেই ফেলেছিল। সে বলেছিল, "This crusade, this war on terrorism, is going to take a long time" অর্থাৎ 'এই ক্রুসেড, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে চলবে।' মার্কিন ম্যাগাজিন ন্যাশনাল রিভিউ-য়ে 'এই যুদ্ধ তাদের দেশে গিয়ে লড়তে হবে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়—"এই সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করার মতো বিলাসিতা করার সময় এখন না; বরং ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের হামলার ঘটনা শুনে যাদের চেহারায় হাসি ফুটবে, তারা প্রত্যেকে এই হামলার জন্য দায়ী। তাদের দেশের ভেতরে ঢুকে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, তাদের নেতাদের হত্যা করতে হবে এবং তাদেরকে জোর করে হলেও খ্রিষ্টান বানাতে হবে।"

### ২. ডিভাইড অ্যান্ড রুল

আল্লাহর শত্রুরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, বিবাদ, বিভক্তি ও দলাদলিই হলো এই উম্মতের দুর্বলতা। তারা এটাও বুঝেছিল, এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অনিবার্য পরিণতি হলো ব্যর্থতা ও প্রভাব হ্রাস পাওয়া। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন—

وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ

‘তোমরা বিবাদ কোরো না; তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং (কাফেরদের অন্তর থেকে) তোমাদের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।’ [সূরা আনফাল (৮): ৪৬]

এ জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের জিহাদী জাগরণকে নির্মূল করতে হোক বা মুজাহিদদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য হোক—শত্রুরা যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে তার সবই আবর্তিত হয়েছে মুজাহিদদের মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ উসকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে। শেষমেশ যা মুজাহিদদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে রূপ নিয়েছে। রুশ বাহিনী আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদদের মধ্যকার যুদ্ধ আর ইরাক ও শামের মুজাহিদদের মধ্যকার লড়াই কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রেরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. বলেন,

> ‘মানুষের মধ্যে বিরোধ হয় দুই কারণে। ১. একাধিক নেতা থাকলে ২. চিন্তা ও মতামত প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে। দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যতই ভিন্নতা থাকুক, আল্লাহ ও রাসূলের সামনে আত্মসমর্পণ করলে বিরোধের প্রধান ও মূল কারণটি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয় না; বরং বিরোধ সৃষ্টি হয় মূলত প্রবৃত্তির কারণে। সত্য বোঝার পরেও প্রত্যেকে যখন নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সঠিক মনে করে, তখনই মূলত বিরোধের জন্ম হয়। নিজেকে একদিকে আর সত্যকে আরেকদিকে রেখে সত্যের ওপর নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করাই মূলত প্রবৃত্তি। এই কারণেই বিরোধ সৃষ্টি হয়।’

বিষয়টির স্পর্শকাতরতা বিবেচনা করে সামসময়িক দুটি ঘটনার তুলনামূলক পর্যালোচনা এখানে উল্লেখ করা জরুরি মনে হচ্ছে। এই দুটি ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা নসীহত গ্রহণ করব। সাথে সাথে এ বিষয়টিও দেখার চেষ্টা করব যে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে মুজাহিদদের পরিণতি কেমন হয় আর ঐক্যবদ্ধ থেকে আল্লাহর দীনকে আকঁড়ে ধরলে কেমন ফলাফল হয়।

**প্রথম দৃষ্টান্ত: শাম**

প্রথমত: এ কথা সবার জানা, তথাকথিত ইহুদী রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জায়নবাদী-ক্রুসেডার বিশ্বব্যবস্থা দশকের পর দশক ধরে পরিকল্পনা করে আসছে। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননের পুতুল সরকারগুলোকে তারা এই ইহুদী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় নিয়োজিত করেছে। অন্যদিকে এই দেশগুলোর জনগণের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার, মাদকাসক্তি, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, ফ্রি মিক্সিং-সহ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যাতে তাদের মধ্যে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোকে মুক্ত করার চিন্তাভাবনা তো দূরের কথা, দীনী গায়রত ও আত্মসম্মানটুকুও অবশিষ্ট না থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের পরিকল্পনাকেই তাদের ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দিলেন। সামান্য একটু স্বাধীনতা আর বাঁচার অধিকারের জন্য সাধারণ মানুষ যখন রাস্তায় নেমে এলো, সরকার তাদের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করল। **الأسد أو نحرق البلد।** (আসাদ অথবা আগুন) নীতি বাস্তবায়ন শুরু হলো। সাধারণ কিছু দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে সরকারের এমন আগ্রাসি আচরণ সিরিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ তৈরি করল। তারা আল্লাহ ও দীনের দিকে ফিরতে শুরু করল, জান-মাল-ইজ্জত রক্ষার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিল। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সিরিয়ার মাটিতে অনেকগুলো জিহাদী জামাত আত্মপ্রকাশ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের বিশেষায়িত আক্রমণ ও অপারেশন দামেশকের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করল। মুজাহিদদের পদভারে কেঁপে উঠতে লাগল ইহুদীদের কাছের শহর কুনাইতিরা। জিহাদী দলগুলো যদিও যুদ্ধ করছিল সিরিয়াতে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। মুজাহিদদের উত্থানে শত্রুরা তখন দিশেহারা, তারা কল্পনাও করতে পারেনি, এত অল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: সিরিয়ার নুসাইরী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শামের রণাঙ্গনে হাজার হাজার যুবকের আগমন ঘটে। তাদের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছিল শত শত। জিহাদের ময়দানে এ সকল দেশের নাগরিকদের এমন অভূতপূর্ব সমাবেশ পশ্চিমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেয়।

মাত্র ১৯ জন যুবক আমেরিকার বাহির থেকে এসে ৯/১১-এ যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোন উলফ মুজাহিদগণ সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে মুসলিম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোনো ময়দানে না গিয়েই যে রক্তক্ষয়ী আক্রমণগুলো করেছে তা-ও সবার সামনেই ছিল। তাহলে ইউরোপের যে-সব যুবক জিহাদের ময়দানে গিয়ে নতুনভাবে অনেক কিছু জানতে পেরেছে, জিহাদের চেতনা হৃদয় দিয়ে ধারণ করেছে, উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে, এমনকি নুসাইরীদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধে সশরীরে অংশ নিয়ে ভয়ভীতির সব বাধা ছিন্ন করেছে, এমন ১০০ জন নয়, ১০ জন যুবকও যদি নিজ দেশে ফিরে আসে, তাহলে কী অবস্থা হবে? তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে কীভাবে তার দেশ আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এরচেয়েও বড় বিষয় হলো, এ যুবকদের অধিকাংশই জাবহাতুন নুসরার সদস্য ছিল; যে জাবহাতুন নুসরা সম্পর্কচ্ছেদ করার আগ পর্যন্ত আল-কায়েদার কাছে বাইয়াতবদ্ধ ছিল। নিঃসন্দেহে তারা ফিরে এসে জিহাদী তৎপরতা শুরু করলে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী, যা মুসলিমদের প্রতি এ দেশগুলোর নীতি বদলাতে বাধ্য করবে। বালি, মাদ্রিদ ও লন্ডন বোমা হামলার স্মৃতি তখনও মলিন হয়ে যায়নি।

সম্ভবত এই দুই কারণেই শামের জিহাদকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর শত্রুরা সবচেয়ে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতিটি গ্রহণ করে। অর্থাৎ জিহাদী দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বীজ বপন করে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' তথা বিভক্তির রাজনীতি শুরু করে।

রুশবিরোধী আফগান জিহাদকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিনিরা দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে পরিকল্পনা করেছিল। এই আলোচনা আমরা করেছি। ঠিক একই কায়দায় ক্রুসেডারদের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, বিশেষ করে মার্কিন থিংক ট্যাংক র‍্যান্ড-এর নির্দেশনা অনুযায়ী শামের জিহাদকে নস্যাৎ করার জন্যও তারা দুটি ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে পরিকল্পনা তৈরি করে। একটি হলো শামের স্থানীয় মুজাহিদদের ঘিরে, আরেকটি হলো তাদের ভাষায় বহিরাগত মুজাহিদদের ঘিরে, যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শামের মজলুম মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছিল।

১. শামের মুজাহিদদের নিয়ে পরিকল্পনা: শামের স্থানীয় জিহাদী জামাতগুলোর পাশাপাশি শত্রুরা গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রায় ডজনখানেক দল তৈরি করে। এ সব দল ও সংগঠনকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক দেশ আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদান করা শুরু করে। বাহ্যিকভাবে এই সংগঠনগুলো যদিও ইনসাফ ও স্বাধীনতার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলত তাদের সকলের লক্ষ্যই ছিল একটি—শামের ভূমিতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার যে-কোনো আন্দোলনকে দমন করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা জিহাদী জামাতগুলোর পেছনে লাগে। বিশেষত বৈশ্বিক চিন্তাধারার দলগুলোর (আল-কায়েদা) বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু করে।

শামের আঞ্চলিক জিহাদী দলগুলো আল-কায়েদার সাথে মিলে কোনো জোট তৈরি করতে পারে—এই ভয়ে তারা শামের আল-কায়েদা শাখা জাবহাতুন নুসরার ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা শুরু করে। জাবহাতুন নুসরার সামনে তারা দুটি প্রস্তাব দেয়। হয়তো আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আঞ্চলিক কোনো একটি দলের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে হবে অথবা শাম থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নিতে হবে। এটা স্পষ্টই ছিল যে, দ্বিতীয় অবস্থান গ্রহণ করলে দলের সদস্যদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা হয়তো বন্দি হবে অথবা হামলার শিকার হবে। অবশেষে চতুর্মুখী চাপের মুখে তারা জাবহাতুন নুসরাকে আল-কায়েদা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করে।

শামের আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলো আফগান জিহাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে পারস্পরিক মতবিরোধকে একপাশে রেখে অন্তত সরকার পতনের একটি লক্ষ্যে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। কিন্তু তা না করে নিজেদের স্বার্থ নিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকবল বাড়ানো আর শহর দখলের—বিশেষ করে সমৃদ্ধ শহর—এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হলো তাদের

মধ্যে। ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বের ফলে তাদের মধ্যকার বিরোধ চরম আকার ধারণ করল, এমনকি নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটতে লাগল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। পরিশেষে অপরিহার্য সেই পরিণতি তাদেরও বরণ করতে হলো, যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

'তোমরা বিবাদ কোরো না; তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং (কাফেরদের অন্তর থেকে) তোমাদের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।' [সূরা আনফাল (৮): ৪৬]

সেই জিহাদী দলগুলো আজ কোথায়, শামের বিস্তির্ণ অঞ্চলজুড়ে যারা শান্তি (!) প্রতিষ্ঠা করেছিল? যাদের প্রভাব রাজধানী দামেশকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল, তারাই বা আজ কোথায়?

উল্লেখ্য, ২০১৩-এর অক্টোবরে শায়খ সাইফ আল-আদল হাফিযাহুল্লাহ-এর বই আস-সিরা' ওয়া রিয়াহুত তাগয়ীর (যুদ্ধ ও পরিবর্তনের আভাস)-এর ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ফিতনা শুরুর অনেক আগেই শায়খ এই কিতাবে শামের মুজাহিদদের সতর্ক করেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে সচেতন হতে বলেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন পরবর্তীতে তা-ই হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন—

> 'শামের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের এখনই সচেতন হওয়া উচিত। আফগানিস্তানে রুশবিরোধী জিহাদের ফলে আমেরিকা, সৌদি ও তাদের দোসরদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে। শয়তানদের এই জোট ইসলামের জন্য কাজ করবে, তা অসম্ভব। নিজেদের এবং ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। কোনো দল যদি তাদের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করে, বুঝতে হবে তারা আল্লাহর জন্য নয়, কুফফার জোটের জন্য কাজ করছে। এরা [সৌদি-মার্কিন জোট] প্রথমে জিহাদী তানজীমগুলোকে সদস্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বড় বানাবে, সাথে সাথে নতুন নতুন অনেক তানজীম তৈরি করবে। এরপর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তানজীমকে নির্বাচন করে তাদের বিশেষভাবে সহায়তা দেওয়া শুরু করবে এবং [তাদের ব্যবহার করে] হকপন্থি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। [পরিস্থিতি যখন জটিল আকার ধারণ করবে,] তখন তারাই সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের জিগির তুলবে। অন্যদিকে তাদের তত্ত্বাবধানে জন্ম নেওয়া এবং তাদের অর্থায়নের ফলে বিস্তৃত হওয়া তানজীমগুলোকে সুযোগ বুঝে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেবে। বহির্বিশ্বে থাকা তাদের নেতৃবৃন্দকে হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করবে। আমেরিকা, সৌদি আর তুরস্কের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রের কথা অমান্য করার সাহস বা শক্তি কোনোটিই তাদের থাকবে না। অবশ্য তখনও তারা তানজীমগুলোকে উদারতার সাথে সাহায্য করে

যাবে। পরে যখন মুজাহিদদের বিজয়ের আলামত স্পষ্ট হতে শুরু করবে, ঠিক তখন মুজাহিদদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এমন রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যেতে বাধ্য করবে, যা ইহুদীদের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দেবে। এ কারণে সৌদি রাজপরিবার ও তাদের অনুগত আরব আমিরাতের শাসক পরিবারের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, তাদের উদ্দেশ্যই হলো ইহুদীদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। রাশিয়া, ইরাক, ইরান ও কিছু ধর্মীয় সংস্থা-সহ নুসাইরী রেজিমের মিত্রশক্তিগুলোর ব্যাপারেও মুজাহিদদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের এই জোট ভেঙে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু স্বার্থের কারণেই তারা জোটবদ্ধ হয়েছে এবং প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্বার্থ আছে; তাই অন্য কোনোভাবে যদি তাদের স্বার্থ হাসিল হয়ে যায়, তবে রেজিমের সাথে তাদের এই জোট খুব দ্রুত ভেঙে যাবে।'

২. শামের ভিনদেশি মুজাহিদদের নিয়ে পরিকল্পনা: শামে থাকা ভিনদেশি মুজাহিদদের দমনের জন্য আমেরিকা ন্যাক্কারজনক আইনি ও নিরাপত্তামূলক হয়রানির বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করে। সন্ত্রাস দমনের নামে শুরু হওয়া এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বের সব দেশ মুজাহিদদের পেছনে উঠেপড়ে লাগে, যা এখনও চলছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নেতৃত্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এক জরুরি অধিবেশনের আয়োজন করে।[২৬] এই অধিবেশনে ইরাক ও শামের ভিনদেশি মুজাহিদদের নিয়ে আলোচনা হয় এবং রেজুলেশন ২১৭৮ (S/RES/2178) গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে শামের জিহাদে বিদেশি নাগরিকদের অংশগ্রহণ বন্ধ করা এবং কেউ অংশগ্রহণ করলে শাস্তিদানের জন্য বিশ্বের সকল দেশকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

এই রেজুলেশনের উদ্দেশ্যই ছিল ইউরোপ থেকে আগত মুজাহিদদের ঘরে ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া। তাদের ভয় ছিল, শামের এই মুজাহিদরা ইউরোপে ফিরতে পারলে লোন উলফ আক্রমণ শুরু হতে পারে। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। আইন করেও তা ঠেকানো যায়নি। এই আইন পাশ হওয়ার পরেই বেশকিছু দেশে ইউরোপিয়ান মুজাহিদ ভাইদের হাতেই লোন উলফ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সব জিহাদী হামলায় শত শত কাফের নিহত হয়। আহতও হয় অনেক।

[২৬] বলে রাখা ভালো, সাধারণত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো অধিবেশনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করে না। খুব জরুরি কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলেই কেবল মার্কিন প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করে। আমেরিকার ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঘটনা ছিল, যেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এই ধরনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিল। শামের ভূমিতে ভিনদেশি মুজাহিদদের উপস্থিতি আমেরিকার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, বিশেষ করে শামের ভূমিতে পশ্চিমা দেশের নাগরিকদের উপস্থিতি তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

## দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত: তালেবান আন্দোলন

একতাবদ্ধতার ফলাফল কেমন হবে—সে সম্পর্কে শায়খ উসামা রহ. তাঁর এক বক্তব্যে আলোচনা করেছেন। আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া নব্য ক্রুসেডের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন—

> 'এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মুসলিমদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব উম্মতের পরাজয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংসের অন্যতম কারণ। তদ্রূপ এ বিষয়টিও সর্বজনস্বীকৃত যে, একতা, ঐক্যবদ্ধতা ও সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরাই হলো এই উম্মতের বিজয় ও সাফল্যের চাবিকাঠি; উম্মতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উপায়।'[২৭]

এ কথার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো বর্তমান সময়ের তালেবান আন্দোলন। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখন এই আন্দোলনের বয়স প্রায় তিন দশকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যতই দিন যাচ্ছে এই আন্দোলনের শক্তি ও প্রভাব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তালেবান আন্দোলনের উত্থান কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে। এখানে আমরা যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হলো, তালেবান প্রতিষ্ঠার শুরুলগ্ন থেকেই আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ ও নেতৃত্ব ছিল এক ও ঐক্যবদ্ধ। এ জন্যই এই আন্দোলন প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাওফীক ও সাহায্য লাভ করেছে।

মোল্লা উমর রহ. ছিলেন ইখলাস, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এক আল্লাহর নুসরত আর তাওয়াক্কুলকে পুঁজি করে যখন তিনি কাজ শুরু করেন, তখনই তার পাশে অল্পকিছু আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি সমবেত হন। তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা অনেক শহরের বিজয় দান করেন, অসংখ্য মানুষের হৃদয়ও তারা জয় করে ফেলেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে তালেবান সকল ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং মুনাফিক দলগুলোকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। দেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের সকল প্রদেশ মোল্লা উমরের সামনে আত্মসমর্পণ করে। ১৫০০ আলেম তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' ঘোষণা করে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ২০০১-এর অক্টোবরে মার্কিন ক্রুসেড শুরুর আগ পর্যন্ত মাত্র দুটি প্রদেশ—বাদাখশান ও পাঞ্জশীর—ছাড়া গোটা আফগানিস্তান তালেবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

---

[২৭] বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে বলে রাখা ভালো যে, শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফি. 'আল-আমালুল ইসলামী বাইনা দাওয়ায়িল ইজতিমা ওয়া দুয়াতিন নিযা' নামে একটি রিসালা লিখেছিলেন। শায়খ উসামা রহ. এই রিসালার ভূমিকা লিখেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই রিসালাটি সবারই পড়া উচিত। বিশেষত ইসলামী দলগুলোকে রিসালাটি পড়ার অনুরোধ করব।

৯/১১-এর পর আল্লাহ তাআলার হিকমতপূর্ণ ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটল। শক্তির নেশায় বুঁদ, দাম্ভিক, অহংকারী আমেরিকা আল্লাহ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সদলবলে হামলে পড়ল আফগানের মাটিতে। আফগানের সিংহশাবক, মর্দে মুজাহিদ তালেবান ও তাদের সহযোগীরাও রুখে দাঁড়াল তাদের বিরুদ্ধে। আল্লাহর নুসরতের আশায় বুক বেঁধে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে তারা নেমে পড়লেন জিহাদের ময়দানে। টানা ১৯ বছর মুজাহিদরা ক্রুসেডারদের জাহান্নামে পাঠাতে থাকলেন। হাজারো মিলিটারি এয়ারক্রাফট, ব্যাটেলশিপ, ব্যালিস্টিক মিসাইল আর বিলিয়ন ডলারের বাজেট সত্ত্বেও আমেরিকা ও তার সহযোগী ৫০টি মিত্রদেশ তালেবানের ওপর সামরিক দিক থেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি; এমনকি তারা মুজাহিদদের জিহাদী স্পৃহা সামান্য কমাতেও পারেনি। 'ওয়াশিংটনের চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবতা জিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব না' অথবা 'যুদ্ধ শুধু বিপর্যয় আর ধ্বংসই ডেকে আনবে; আত্মসমর্পণই বাঁচার একমাত্র উপায়'—এ ধরনের পরাজিত মানসিকতাও তারা মুজাহিদদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারেনি।

সিক্রেট এজেন্সি আর প্রতারণার রাজনীতি ব্যবহার করে সোভিয়েত-আফগান জিহাদকে যেভাবে তারা ভণ্ডুল করেছিল, এবার তাদের সেই চক্রান্তও সফল হয়নি। তালেবান আন্দোলন ও জিহাদকে বিপথে নেওয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আফগানিস্তানের সকল জাতি ও গোত্রকে সাথে নিয়েই তালেবানের পথচলা। মজবুত সংহতি ও একতার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ ও কোন্দল ছড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও এবার কাজ করেনি।

মোটকথা, তালেবান মুজাহিদগণ তাদের দৃঢ়তা, অবিচলতা, ঐক্য ও আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে সকল হিসেব উলটে দিয়েছেন। শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তারা যা ভয় পেত, তা-ই প্রমাণ করেছেন। শত্রুদের ভয় ছিল, 'মুসলমানদের দুরবস্থা পরিবর্তনে জিহাদের কার্যকারিতার বিশ্বাস' মানুষের মধ্যে আবারও ফিরে আসবে। বাস্তবেও সেটাই হয়েছে। আল্লাহ তাআলার দয়া আর ইসলামী ইমারতের মুজাহিদদের কুরবানীর বদৌলতে ২০ বছর যাবৎ বুকের ওপর চেপে থাকা মার্কিন দখলদারিত্ব থেকে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছে। আফগানিস্তানের আকাশে পুনরায় ইসলামী ইমারতের কালিমাখচিত সাদা পতাকা স্বগৌরবে উড্ডীন হয়েছে। দীন ও আকীদার আলোকে পরিবর্তনের নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এ অধ্যায় আমেরিকার দখলদারিত্ব ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার অধ্যায়। এ অধ্যায় আমেরিকান গণতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া বিশৃঙ্খলা, ইলহাদ ও কুফরের কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহর জমিন ও বান্দাদের পবিত্র করার অধ্যায়।

শুধু এতটুকুই নয়; বরং ইসলামী ইমারত সফলভাবে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নির্মূল করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বহির্বিশ্বের বাধা-বিপত্তি ও চাপ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বল্প সামর্থ্য নিয়েই ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষি

ও শিল্পোন্নয়ন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, নগরায়ণ ও সেবা প্রদান-সহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তারা দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে। দারিদ্র্যমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গম, চাল-সহ গুরুত্বপূর্ণ সকল পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

## সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং মুজাহিদদের অবস্থা[২৮]

এ পর্যায়ে এসে জিহাদী আন্দোলনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত চলমান এই অধ্যায়কে আমরা 'বিক্ষিপ্ততা ও সাময়িক নিরাপদ আশ্রয়ের অধ্যায়' বলতে পারি। এ সময় সৌদি আরব, ইয়েমেন, মৌরিতানিয়া, জর্ডান-সহ উপসাগরীয় অঞ্চলের হাজারো আরব-আফগান মুজাহিদ নিজ দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, নিজ দেশে বীর মুজাহিদের মতো উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেদের আবিষ্কার করেন অনাহুত নিঃসঙ্গ আগন্তুক হিসেবে। উন্মুক্ত জেলখানাগুলো তাদের অপেক্ষায় ছিল। দেশে ফিরেই তাদের মুখোমুখি হতে হয় দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ আর নির্বিচার হাজতবাসের। তাদের নামে অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়। হাতেগোনা কয়েকটি দেশ মুজাহিদদের সাথে এমন আচরণ করা থেকে বিরত থাকে।

যারা দেশে ফিরতে পারেননি, তারা গ্রেফতারির ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়েন। কেউ রাজনৈতিক আশ্রয় নেন, কেউ রিফিউজির জীবন গ্রহণ করেন, কেউ আত্মগোপনে চলে যান, কেউ বন্দি হন আর কেউবা শত্রুর হাতে নিহত হন। কিছু মুজাহিদ অস্ত্র হাতে অন্য কোনো জিহাদের ময়দানে ছুটে যান, সেখানকার মুজাহিদদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ শত্রুদের কঠোর অবস্থান ও মুজাহিদদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখে নিরাশ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। মুজাহিদদের বরকতময় এই কাফেলা বিক্ষিপ্ত হয়ে যে-সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিচে দেওয়া হচ্ছে—

### ১. ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশসমূহ

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ থাকায় এটি সম্ভব হয়েছিল। সেই সুবাদে আরব মুজাহিদীন ও অন্যান্য দেশের জিহাদী দলসমূহের প্রথম সারির অনেক ব্যক্তিবর্গ ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

[২৮] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ থেকে সংগৃহীত।

### ২. অন্যান্য দেশ

আরববিশ্বে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপত্তা-সহযোগিতার বিষয়টি শক্তিশালী হওয়ার আগে যে-সব দেশ মুজাহিদদের জন্য নিরাপদ ছিল, এমন অনেক দেশে মুজাহিদরা আশ্রয় নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইয়েমেন, তুরস্ক ও সিরিয়া। এসব দেশে আশ্রয় নেওয়া মুজাহিদরা নিজ দেশে তখনও ওয়ান্টেড আসামি ছিলেন।

### ৩. বসনিয়া, চেচনিয়া ও অন্যান্য দেশ

আফগান জিহাদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলে নতুন করে জিহাদের আগুন জ্বলে ওঠে। তাজিকিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিপাইন, আলজেরিয়া, কাশ্মীর, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে হাজারো মুজাহিদ যুবক জিহাদের এই নতুন ময়দানগুলোতে যোগ দেন। আফগান রণাঙ্গন থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া কিছু মুজাহিদ ছিলেন প্রথম সারিতে। শহীদ কমান্ডার খাত্তাব রহ. এবং তার কিছু আরব-আফগান মুজাহিদ সাথি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### ৪. সুদান

১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত সুদান ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদী জামাতগুলোর জন্য বিশেষ নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যারা গ্রেফতারির আশঙ্কায় নিজ দেশে ফিরতে পারেননি, তারা সুদানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুদানের ক্ষমতায় ইসলামপন্থি দলের আগমনের পরই তারা আরবদের জন্য ভিসা ছাড়াই সুদানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ থাকায় সুদান তখন আমেরিকার কালো তালিকাভুক্ত ছিল। পাসপোর্টে সুদানের ভিসা থাকলে যাদের নিরাপত্তাগত ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা ছিল, তাদের ব্যাপারে সুদান সরকার আরও নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। পাসপোর্টধারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি পাসপোর্টে ভিসা না দিয়ে তারা আলাদা সরকারি কাগজে ভিসা সরবরাহ করত। এর ফলে মুজাহিদদের বড় একটি অংশ সুদানে চলে আসে। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ও আল-কায়েদা ছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ (EIJ), মিশরের আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ, লিবিয়ার আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মুকাতিলা (LIFG)-সহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মুজাহিদ নেতাকর্মী সুদানে আশ্রয় নেন।

## সৌদির গৃহবন্দি জীবন এবং সফরে নিষেধাজ্ঞা: ১৯৮৯-১৯৯১[২৯]

সুদানে ওমর আল-বাশীরের নেতৃত্বে সফল অভ্যুত্থানের পর ১৯৮৯ সালের শেষদিকে শায়খ উসামা রহ. সুদান সফরে যান। সেবারই সুদানে তাঁর প্রথম কোম্পানি 'ওয়াদিল আকীক' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর কিছু কাজের জন্য সৌদিতে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার কিছুদিন পর শায়খ রহ. জানতে পারেন, তার ওপর ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। শায়খ রহ. মনে করেছিলেন, হয়তো রাশিয়ার পরাজয় এবং শক্তিধর দেশগুলোর সাথে সৌদির কোনো বোঝাপড়ার কারণে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও মূল কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা হলো—কোনো সরকার বা পরাশক্তির স্বার্থের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে শায়খ রহ. জিহাদ করেননি; বরং তিনি জিহাদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই জিহাদকে গ্রহণ করেছিলেন।

আফগান জিহাদের পরেও জিহাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য শায়খ উসামা রহ. আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সৌদি ও উত্তর ইয়েমেন থেকে দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার ব্যাপারে তার পরিকল্পনাও ছিল। শায়খ রহ. তাঁর সব আলোচনাতেই আফগানিস্তানের পর দক্ষিণ ইয়েমেনকে কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য তার পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরতেন। সৌদি সরকার এ ধরনের কূটনৈতিক ব্যাপারকে খুব একটা পরোয়া করত না। কিন্তু শায়খ উসামার পক্ষ থেকে এমন মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি বিষয়টি গুরুত্ব-সহ বিবেচনা করছেন এবং দায়িত্ব নিয়েই কথাগুলো বলছেন। এই কারণেই বিষয়টি নিয়ে সৌদি সরকার চিন্তায় পড়ে যায়। শায়খ রহ. যখন ইরাকের আগ্রাসি মনোভাবের কথা আলোচনা করে উন্মুক্ত সেমিনারে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরাকের আক্রমণের শঙ্কা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন, এতে সৌদি সরকার আরও বেশি চাপে পড়ে। কারণ ইরাকের সাথে তখন সৌদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তখন সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শায়খের ওপর শুধু ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সরকারিভাবে নোটিশ দিয়ে শায়খকে সতর্ক করা হয়, যে-কোনো প্রকাশ্য তৎপরতা থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন। অন্যথায় তাঁকে গ্রেফতার করা হবে অথবা গৃহবন্দি করে রাখা হবে। সরকারের এমন শত্রুভাবাপন্ন আচরণ দেখেও শায়খ রহ. একটি চিঠি লেখেন। শায়খের এক ভাইয়ের মাধ্যমে চিঠিটি প্রিন্স আহমদ বিন আব্দুল আযীযের কাছে পৌঁছানো হয়। চিঠিতে সার্বিক সংস্কারের আবেদনের পাশাপাশি সাদ্দাম হোসাইনের আগ্রাসি মনোভাব

[২৯] ফারেস যাহরানী লিখিত 'উসামা বিন লাদিন: মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কহিরুল আমরিকান' বই থেকে সংগৃহীত।

এবং অনাগত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে শায়খ রহ. নিজ চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছিলেন।

শায়খ উসামা রহ. কুয়েত দখলের খবর শোনার সাথে সাথে এমন কিছু পদক্ষেপ নেন, যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, তিনি দায়িত্ববোধ থেকেই কাজগুলো করছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সরকারের কাছে আরেকটি চিঠি লেখেন। তাতে ইরাকি আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি কী হতে পারে—সে সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং এই বিপদ মোকাবিলায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারেও অনেকগুলো প্রস্তাব পেশ করেন। সাথে সাথে ইরাককে প্রতিহত করার কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কেও সরকারকে অবহিত করেন এবং শায়খের অনুগত আরব মুজাহিদদের এনে হারামাইনের পবিত্র ভূমির প্রতিরক্ষায় সহযোগিতার প্রস্তাবও তিনি দেন। আগের মতো একই পন্থায় শায়খ রহ.-এর এই চিঠিটিও সরকারের কাছে পৌঁছানো হয়। কিন্তু শায়খের এত আন্তরিকতার বিপরীতে রাষ্ট্রপক্ষ শুধু 'বিবেচনা করা হবে' বলে দায়সারা গোছের একটি উত্তর দেয়।

শায়খ উসামা রহ. আশা করছিলেন, দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সরকার কিছুটা হলেও তার সাহায্য গ্রহণ করবে। তাঁর ধারণা ছিল, সরকার শরীয়তবিরোধী কিছু কাজ করলেও দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কোনো আপস করবে না। কিন্তু তারা শায়খ উসামা রহ.-এর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কুয়েতকে মুক্ত করার অজুহাতে মার্কিন বাহিনীকে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ডেকে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এই একটি সিদ্ধান্তই শায়খের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

হারামাইনের পবিত্র মাটিতে মার্কিন বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানোর খবর শোনার সে মুহূর্তটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শায়খ রহ. বলেন, এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর কাফেররা সামরিক বাহিনী নিয়ে জাযীরাতুল আরবে প্রবেশ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা এটাই ছিল প্রথম। শায়খ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ আমেরিকা জাযীরাতুল আরবে আগ্রাসিভাবে বা আরব শাসকদের অনিচ্ছায় প্রবেশ করেনি; বরং আরব শাসকদের আবেদনেই তারা প্রবেশ করেছিল।[৩০] আরব শাসকরাই জাযীরাতুল আরবকে সোনার পাত্রে তুলে মার্কিনিদের সামনে পেশ করেছিল। শুধু তাই নয়, জঘন্য এই কর্মকাণ্ডকে আবার তথাকথিত সর্বসম্মত ফতওয়া

[৩০] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, 'সঠিক কথা হলো, আরব শাসকদের পক্ষ থেকে মার্কিনিদের কাছে সৈন্য পাঠানোর জন্য আবেদন করা হয়নি; বরং মার্কিনিরাই আগ বেড়ে সৈন্য পাঠিয়েছিল। শায়খ উসামা রহ. বলেন, জর্জ ডব্লিউ বুশ (সিনিয়র) বাদশাহ ফাহাদকে বলেছিল, আমরা আসছি। বাদশাহর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোনোটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু বিষয়টিকে এভাবেই প্রচার করা হয়েছে যে, বাদশাহ তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।'

জারি করে সমর্থনও করা হয়েছিল। ফতওয়ায় বলা হয়েছিল, ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্যই মার্কিনিরা এখানে এসেছে। যারাই তাদের এই মহান কাজে বাধা দেবে, তাদেরকে আল্লাহর শত্রু বলে বিবেচনা করা হবে এবং বিশৃঙ্খলার দায়ে কুরআনের আইন অনুযায়ী হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা হাত-পা কেটে দেওয়া হবে।

আরবের এমন ভয়ানক পরিবর্তন দেখে শায়খ উসামা রহ. আরবের ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন, নসীহতের মাধ্যমে শাসকদের সংশোধন করার পদ্ধতি এখন আর কাজে আসবে না; বরং নতুন কোনো পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শায়খ উসামা রহ. নিম্নোক্ত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

১. প্রত্যেক মুসলিমের জন্য, বিশেষ করে জাযীরাতুল আরবের মুসলিমদের জন্য যুদ্ধের ইদাদ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া বের করা। শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. এই ফতওয়া দেন। শায়খ উসামা রহ. এই ফতওয়াকে সামনে রেখে আরব যুবকদের নতুন করে আফগানিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। অসংখ্য যুবক শায়খের ডাকে সাড়া দিয়ে বাস্তবেই প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

২. হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে সৌদির সর্বোচ্চ উলামা কাউন্সিল হাইয়াতু কিবারিল উলামা বৈধতার ফতওয়া দিয়েছিল। শায়খ রহ. দেখলেন, এই কাউন্সিল সরকারের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। তাই তিনি হাইয়াতুল কিবারিল উলামার বিকল্প হিসেবে সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়া বোর্ড গঠন করে তার অধীনে আলেমদের একত্র করার চেষ্টা করেন। যা সাধারণ মানুষের কাছে আস্থার জায়গা বলে বিবেচিত হবে।

শায়খ উসামা রহ.-এর চলাফেরা যদিও সীমাবদ্ধ ছিল, অনেকটা গৃহবন্দির মতো, তা সত্ত্বেও তিনি নিজের অনেক পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে প্রথম পরিকল্পনাটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়েছিল। কিন্তু আলেমদের নিয়ে স্বতন্ত্র শরীয়া বোর্ড গঠনের ব্যাপারে তেমন সফল হতে পারেননি। এর অবশ্য কিছু কারণও ছিল। প্রথমত: শায়খের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: উলামায়ে কেরাম, বিশেষত তরুণ আলেমরা স্বতন্ত্র শরীয়া বোর্ডের চিন্তার সাথে তখনও পরিচিত ছিলেন না।

শায়খ উসামা রহ. তার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধগুলো খুব একটা আমলে নিতেন না। বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অনেক সেমিনারে তিনি বক্তৃতা দিতেন। উলামায়ে কেরাম, দাঈ ও এক্টিভিস্টদের নিয়ে অনেক আলোচনাসভাও করতেন। শায়খের এ কাজগুলো সরকার পছন্দ

করত না। এ জন্য একাধিকবার তাঁকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছে এবং তার তৎপরতা বন্ধ রাখার তাগিদ দিয়ে কঠোরভাবে সতর্কও করা হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

জেদ্দার উপকণ্ঠে শায়খের একটি ফার্মহাউজ[৩১] ছিল। শায়খকে ভয় দেখানোর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে একবার ন্যাশনাল গার্ডের একটি ইউনিট এই ফার্মহাউজে অতর্কিত তল্লাশি অভিযান চালায়। তখন শায়খ রহ. সেখানে ছিলেন না। তারা পুরো ফার্মহাউজে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা ফার্মহাউজের জিনিসিপত্রের একটি তালিকা তৈরি করে এবং পুরো ফার্মহাউজ, এর গোডাউন এবং অন্যান্য সব রুমের ভিডিও ধারণ করে নিয়ে যায়। শায়খ উসামা রহ. এ ঘটনা জানতে পেরে খুব রাগান্বিত হন এবং প্রিন্স আব্দুল্লাহর কাছে চিঠি লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। শায়খ উসামা রহ. আরও বেশি আশ্চর্য হন, যখন তার কাছে প্রিন্স আব্দুল্লাহর এই জবাব পৌঁছায় যে, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সাথে সাথে তিনি জড়িতদের শাস্তি দেওয়ারও আশ্বাস দেন।



সাদ্দাম হোসাইনের হাত থেকে হারামাইনের প্রতিরক্ষায় ইদাদের ফরযিয়ত বিষয়ক এক সেমিনারে শায়খ উসামা রহ. বক্তব্য দিচ্ছেন

এই অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই শায়খের দিন কাটতে থাকে। শায়খ রহ. বসে থাকার মানুষ ছিলেন না। জিহাদ ও সফর ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমন কর্মচঞ্চল জীবনে হঠাৎ করেই গৃহবন্দি হয়ে পড়ায় সবকিছু স্থবির হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর জাযীরাতুল আরবে ক্রুসেডার বাহিনীর উপস্থিতি শায়খের মর্মপীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

[৩১] শায়খ রহ. এই ফার্মহাউজের নাম রেখেছিলেন 'আল-বুরুদ বা শীতলতা'।

জাতীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে একের পর এক এমনসব ঘটনা ঘটায় শায়খ গুরুত্ব সহকারে দেশত্যাগের চিন্তা করতে শুরু করেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হওয়ায় শায়খের জন্য গোপনে দেশ ছাড়া সহজ ছিল না। তা ছাড়া তার বাড়িতেও প্রশাসনের সার্বক্ষণিক নজরদারি ছিল। এ জন্য শায়খ রহ. একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করেন এবং এতে সফলও হন।

শায়খের এক ভাই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রিন্স আহমাদ বিন আব্দুল আযীযের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শায়খ তার ভাইকে বলেন, পাকিস্তান ও অন্য কিছু জায়গায় তার কিছু আর্থিক লেনদেন আছে; তা ছাড়া দেনাপাওনার কিছু বিষয়ও আছে, যা কোনো প্রতিনিধি পাঠিয়ে করা সম্ভব না। কারণ এ লেনদেনগুলো ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আস্থার সাথে জড়িত। তাই তার যাওয়া খুবই জরুরি।

শায়খের ভাই বুঝতে পারেন এবং প্রিন্স আহমাদ বিন আব্দুল আযীযের কাছে বিষয়টি খুলে বলার ওয়াদা করেন। এ দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফের ছুটিতে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তাই শায়খের ভাই প্রিন্স নায়েফের ছুটিতে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এরপর তিনি প্রিন্স আহমাদের সাথে আলোচনা করে শায়খের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সফরের অনুমতি দিতে রাজি করান। প্রিন্স আহমাদ শায়খের ভাইয়ের কথায় রাজি হন এবং শায়খকে শুধুমাত্র একবার সফরের অনুমতি দেন। সেই সাথে নিরাপত্তা বাহিনীকে তার ওপর নজর রাখার আদেশ দেন। এভাবেই শায়খ উসামা রহ. স্বাভাবিকভাবেই দেশ ছাড়তে সক্ষম হন।

১৯৯১ সালের এপ্রিলে শায়খ উসামা রহ. পাকিস্তানের পেশোয়ারে পৌঁছান। প্রথমেই তিনি ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবেগঘন একটি চিঠি লেখেন। ভাইকে জানান, আপাতত সৌদিতে ফেরার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি আরও লেখেন, তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণে হয়তো প্রিন্স নায়েফের সামনে তিনি [শায়খের ভাই] বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়বেন। এ জন্য তিনি ক্ষমা চেয়ে লেখেন, যথাযোগ্য কারণেই তিনি বাধ্য হয়ে এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন।

শায়খ রহ. এমন সময় পেশোয়ারে এসেছিলেন, যখন আফগানিস্তানে একদিকে কমিউনিস্ট শাসন ভেঙে পড়েছিল, অন্যদিকে আফগানের জিহাদী দলগুলোর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এ অবস্থায় শায়খ উসামা রহ. দুটি পদক্ষেপ নেন। প্রথমেই আরব যুবকদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা জারি করেন, তারা চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিপূর্ণরূপে এড়িয়ে চলবেন, বিবাদমান কোনো দলেই তারা যোগ দেবেন না এবং এই রক্তপাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবেন। দ্বিতীয়ত: তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করে বিবাদমান আফগান দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা করানোর চেষ্টা করেন। শায়খ উসামা রহ. কয়েক মাস পেশোয়ারে অবস্থান করে আফগান দলগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শায়খের কোনো চেষ্টাই উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। প্রতিবারই তিনি ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা করার পথই বন্ধ হয়ে যায়।

## পেশোয়ারে শায়খ উসামাকে হত্যাচেষ্টা

শায়খ উসামা রহ. তখন পেশোয়ারেই ছিলেন। শায়খকে হত্যা বা গুম করার ব্যাপারে সৌদি সরকারের ইন্টেলিজেন্স প্রেসিডেন্সির তৎকালীন প্রধান তুর্কি ফয়সালের নেতৃত্বে সৌদি ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এটি মূলত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে হত্যার আন্তর্জাতিক চক্রান্তেরই একটি অংশ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে তাদের সব চেষ্টা বিফলে যায়। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থায় শায়খের হিতাকাঙ্ক্ষী[৩২] কিছু ব্যক্তি ছিলেন। তারা যে-কোনো সংবাদ দ্রুততম সময়ে শায়খের কাছে পৌঁছে দিতেন, ফলে শায়খও সতর্ক হয়ে যেতেন। তাদের সহযোগিতায় এই চক্রান্ত থেকেও তিনি বেঁচে যান।

কিছুদিনের মধ্যেই শায়খ বুঝতে পারেন, পাকিস্তান ও সৌদি সরকার জোটবদ্ধভাবে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, তাতে পাকিস্তানে থাকা তাঁর জন্য আর নিরাপদ নয়। তারা নানাভাবে তাঁকে হত্যা বা গুম করার চেষ্টা করতেই থাকবে। তাই শায়খ ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পেশোয়ার ছেড়ে এমন কোনো স্থানে চলে যাবেন, যেখানে নিরাপদে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কাজ করতে পারবেন এবং সেখান থেকে অন্যান্য ভূখণ্ডের জিহাদী আন্দোলনকে সহযোগিতা করতে পারবেন। শায়খের বরকতময় পদচারণায় ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে সুদান। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে ভাইয়েরা শায়খের জন্য গোপনে সুদান সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। শায়খের খুব কাছের এক বন্ধু সৌদির এক ব্যবসায়ীর প্রাইভেট বিমানে শায়খ রহ. পাকিস্তান থেকে সুদানের উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

সুদানে হিজরতের সিদ্ধান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল-কায়েদার ভাইদের ইচ্ছা ছিল তারা পাকিস্তানেই থাকবেন। সে সুবাদে পাকিস্তানি ভাইদের সম্মতিক্রমে পেশোয়ারের বাবি নামক স্থানে আরব ভাইদের থাকার জন্য প্রাথমিকভাবে ৩০টি ঘর বানানোর কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভাইয়েরাও সুদানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

---

[৩২] নেককার বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি অনুগ্রহ হলো, যে-কোনো যুগে, যে-কোনো স্থানে কঠিন বিপদের সময় তাদের জন্য শত্রুর প্রধান কেন্দ্রেও এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি করে দেন, যারা সকল ঝুঁকি ও বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে আল্লাহর নেককার বান্দাদের সতর্ক করার দায়িত্ব পালন করেন। তাদের এই কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহর নেককার বান্দারা সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু কিছু মানুষ তো আছেই নেককারদের বদনাম রটানোর জন্য। তারা এই ঘটনাগুলোকে ব্যবহার করে নেককারদের ওপর শত্রুর সাথে আঁতাঁতের অপবাদ যেন না দিতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তাআলা খোদ কুরআনেই এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এই অপচেষ্টার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ফিরআউনের সেই সভাসদের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি মূসা আ.-কে সতর্ক করার জন্য শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌঁড়ে এসেছিলেন আর মূসা আ.-কে বলেছিলেন, ফিরআউনের সভাসদরা আপনাকে হত্যার ফন্দি করছে, আপনি দ্রুত শহর ছেড়ে চলে যান।

# তৃতীয় অধ্যায়

# সুদানের সময়কাল: ১৯৯৬ সালের মে মাসে শায়খ উসামা রহ.-এর সুদান ত্যাগ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ

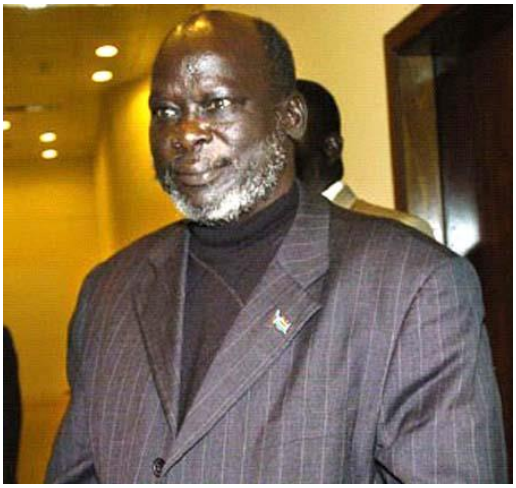
## ওমর আল-বশীরের ক্ষমতারোহণ: সুদানের হালহাকিকত

১৯৮৯ সালের জুন মাসে ওমর আল-বশীর ও তার সহযোগীদের নেতৃত্বে সাদেক আল-মাহদী সরকারের বিরুদ্ধে একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ইসলামপন্থিরা সুদানের ক্ষমতা লাভ করে। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তখন সুদানের পুনর্গঠন ও ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু আমেরিকা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দেওয়ার জন্য দক্ষিণ সুদানের সশস্ত্র বিদ্রোহীগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা শুরু করে। বশীর সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সংঘাতের প্রধান লক্ষ্যই ছিল শরীয়া আইন বাতিল করা।

জন গ্যারাং-এর নেতৃত্বে সুদান পিপল'স লিবারেশন আর্মি (SPLA) ১৯৮৩ থেকেই সুদানের মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। নিরেট ক্রুসেডীয় আদর্শের জায়গা থেকেই তারা এ লড়াই করত। উত্তর সুদানের আরব মুসলিমদেরকে তারা প্রকৃত আফ্রিকান সুদান তথা দক্ষিণ সুদানের দখলদার মনে করত। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন এবং 'সেপ্টেম্বর আইন ১৯৮৩' বাতিল করা ছিল তাদের প্রধান দাবি। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সে ঘোষণার প্রেক্ষিতে 'সেপ্টেম্বর আইন ১৯৮৩' পাশ হয় এবং তখন পর্যন্ত দেশের সকল আদালত এই শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত হতো।

প্রেসিডেন্ট বশীরের অভ্যুত্থানের পর সুদানের ইসলামী আন্দোলনের কিছু নেতা শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে যোগাযোগ করে তাঁর কাছে নিজেদের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্তরিক অভিব্যক্তির কথা তুলে ধরেন। এ ছাড়াও শায়খ রহ. তার সাথি-সঙ্গী ও বিভিন্ন স্থানের ইসলামী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সুদান সরকারের ইসলামী মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও শরীয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের দৃঢ়তার কথা শুনতে পান। এর ভিত্তিতেই ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুসন্ধানী সফরের উদ্দেশ্যে তিনি সুদান যান। সফরে সেখানকার

দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, মতবিনিময় করেন এবং ভালো কাজে তাদের সহযোগিতার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন।



ক্রুসেডার জন গ্যারাং (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি)

শরৎকাল এলেই ইথিওপিয়া-সুদানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এসপিএলএ-এর তৎপরতা শুরু হতো। ইথিওপিয়ার সমর্থন থাকায় তারা তাদের ভূমি ব্যবহার করে সুদানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করত এবং সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের হত্যা, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন, মসজিদ অবমাননা, কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে (নাউযুবিল্লাহ) টিসু হিসেবে ব্যবহারের মতো ঘৃণ্য সব অপরাধ করত। মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে হওয়ায় সুদানের সরকারি বাহিনী এই অঞ্চলের সংরক্ষণ ও মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হতো। তা ছাড়া প্রবল বর্ষণের কারণে রাস্তাঘাটে কাঁদা জমে থাকায় সামরিক যানবাহন চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ত।

নেক কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে শায়খ উসামা রহ. সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থায়নে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ দামাযিন-কুরমুক মহাসড়ক নির্মাণ করে দেন। এর ফলে প্রত্যন্ত এই অঞ্চলগুলো দামাযিন শহরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। দামাযিনে সুদানি বাহিনীর বড় একটি ক্যাম্প ছিল। দামাযিনের রোজাইরিস বাঁধ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ খার্তুমে সরবরাহ করা হতো। এই মহাসড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল, সুদানি সেনাবাহিনী যেন এই প্রান্তিক অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর কোনো আক্রমণ হলে সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে পারে।

সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও দেখাশোনার জন্য শায়খ উসামা রহ. ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে ওয়াদিল আকীক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল সুদানে শায়খের প্রতিষ্ঠিত প্রথম

কোম্পানি। আফগান ফেরত কিছু মুজাহিদ ভাই খার্তুম থেকে কোম্পানিটি পরিচালনা করতেন। তারা হলেন—

১. প্রসিদ্ধ নাশিদশিল্পী আবু যুবাইর মাদানী (মুহাম্মাদ হাবশী) রহ.।

২. সৌদির আবু উনাইস (মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সালাম)। তিনি সেই অদম্য ১১ জন মুজাহিদের একজন, যারা ১৯৮৬ সালে আফগানিস্তানের জাজি রণাঙ্গনে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে অবিচলতার সাথে লড়াই করেছিলেন।

৩. আবু হুমাম মুহাসিব। সৌদির নাগরিক।

৪. আবুল হাসান সুদানী।

মহাসড়ক নির্মাণের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আবু মুয়ায সাদী ফিলিস্তিনী। তিনিও সেই ১১ জনের একজন, যারা ১৯৮৬ সালে আফগানিস্তানের জাজি রণাঙ্গনে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে অটল থেকে লড়াই করেছেন।

## সুদান: মুজাহিদদের নতুন আশ্রয়

বশীর সরকারের তখনকার ইসলামী মনোভাবের ফলে আরবদের জন্য ভিসা ছাড়াই সুদানে আসার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে তখন জিহাদী জামাতগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে সুদান সকলের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে অসংখ্য জিহাদী জামাত সুদানে আসতে থাকে। জিহাদী দলগুলোর মধ্যে আল-কায়েদাই প্রথম সুদানে আসে। এরপর পেশোয়ারে থাকা অন্যান্য জিহাদী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মীরাও সুদানে এসে আল-কায়েদার সাথে মিলিত হতে থাকে। এদের মধ্যে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি.-এর ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ (EIJ), শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ.-এর আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ মিসরিয়্যাহ, আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-লিবিয়্যাহ আল-মুকাতিলাহ (LIFG), আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-জাযাইরিয়্যাহ আল-মুসাল্লাহাহ (GIA) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরও কিছু আঞ্চলিক দলও ছিল। প্রতিবেশী দেশ ইরিত্রিয়ার জিহাদী জামাত আল-জিহাদুল ইসলামী আল-ইরিত্রীর উভয় শাখাও (শায়খ আরফাহ ও শায়খ আবু সুহাইল রহ.-এর নেতৃত্বে) সুদানে চলে এসেছিল।

শায়খ উসামা রহ. সুদানে গিয়ে খার্তুমের রিয়ায নামক গ্রামে বাস করা শুরু করেন। সুদানে আসার পরেই তিনি কয়েকটি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আল-হিজরাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়; শায়খ আবু ইবরাহীম ইরাকী ছিলেন এর পরিচালক। কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য 'আস-সিমারুল মুবারকাহ', আমদানি-রফতানির জন্য 'ত্ব-বা ট্রেডিং কোম্পানি' এবং

পরিবহন খাতে বিনিয়োগের জন্য 'কুদরাত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ওয়াদিল আকীক' ছিল প্যারেন্ট (প্রধান) কোম্পানি; অন্যসব কোম্পানির কাজকর্ম এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। শায়খ উসামা রহ. ছিলেন ওয়াদিল আকীক গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান।

১৯৯২ সালের শুরু থেকেই পাকিস্তান থেকে দলে দলে আল-কায়েদার ভাইয়েরা সুদানে আসতে থাকেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে বিবাহিত ও অবিবাহিত সকলের জন্যই ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। এরপরই শায়খ রহ. সুদানের নতুন পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ ভাইদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। শায়খের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক উৎস তৈরি করা, যা জিহাদী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নিরাপদ আর্থিক জোগান নিশ্চিত করবে। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সম্পদ জিহাদের জন্য ধমনির মতো গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া তিনি আশঙ্কা করছিলেন, কোনো না কোনোদিন সৌদি সরকার তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। বাস্তবেও এমনটাই হয়েছিল। ১৯৯২-এর শেষদিকে সৌদি সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শায়খ উসামা রহ. শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে যুবকদের বিভিন্ন কোম্পানিতে নিয়োগ দেন। যে যে-কাজে দক্ষ, তাকে সে কাজেই নিযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ভাইয়েরা সেখানে ছিলেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার; একাউন্টেন্ট, ড্রাইভার, রাজমিস্ত্রি, কামার, কাঠমিস্ত্রি, কৃষক-সহ নানা পেশার দক্ষ যুবকদের সমাগম ছিল সেখানে।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এমন কিছু ভাইও শায়খের সাথে ছিলেন, যারা সুদানে অবস্থান করা এবং ওমর আল-বশীরের সরকারকে সহায়তার কারণে শায়খের সমালোচনা করতেন। তাদের যুক্তি ছিল, বশীর সরকার যেহেতু পরিপূর্ণ শরীয়ত বাস্তবায়ন করছে না, তাই তাকে সহায়তা করা উচিত না। তখন শায়খ উসামা রহ. তাদের বলেছিলেন, 'পৃথিবীর মানচিত্র এনে আমাকে দেখাও—কোথায় সুদানের চেয়ে ১ পার্সেন্ট বেশি ইসলাম বাস্তবায়ন করা হয়। আমি সেখানেই চলে যাব।'

এ ব্যাপারে শায়খ রহ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর একটি ফতওয়া অনুযায়ী আমল করতেন। মুসলমানরা যদি দুর্বল হয় আর তাদের কোনো রাষ্ট্রও না থাকে, এমন অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এক ফতওয়ায় বলেন, 'এ পরিস্থিতিতে এমন দলের খোঁজ করতে হবে, যারা ইসলাম পালনে তুলনামূলক বেশি অগ্রসর এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী। তাদের সাথে মিলিত হয়ে কিতাল করতে হবে।' এ কারণে শায়খ উসামা রহ. মনে করতেন, সুদান সরকার ইসলামী মনোভাবের কারণে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সম্মিলিত আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখে পড়েছে।

এমনইভাবে শায়খ বিশ্বাস করতেন, কৌশলগত দিক থেকে সুদান হারামাইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সুদান সীমান্ত থেকে মক্কা মুকাররমার দূরত্ব ২৮০ কিলোমিটারেরও কম। তিনি বলতেন, ক্রুসেডার জন গ্যারাংয়ের হাতে যদি সুদানের পতন ঘটে, তাহলে—আল্লাহ না করুন—সে ২৮০ কিলোমিটার রেঞ্জের মিসাইলের মাধ্যমে মক্কা মুকাররমার ওপর আক্রমণ করতে পারে বা হুমকি দিতে পারে। শায়খ বিশ্বাস করতেন, মুসলিম হিসেবে পরস্পরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। আর ঈমান আনার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করা আর এ জন্য কোনো ধরনের শর্ত নেই।

পাশাপাশি শায়খ বিশ্বাস করতেন, সে সময় সুদান ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়, যা আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতে মুজাহিদদের দান করেছেন। কারণ, জিহাদ ও মুজাহিদদের নির্মূল করার জন্য পাকিস্তান তখন পুরোদমে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। ফলে মুজাহিদদের জন্য পাকিস্তানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

সুদান-অধ্যায় ছিল ভাইদের জন্য বিশাল এক পরিবর্তন। যুদ্ধের উত্তপ্ত ময়দান আর ট্রেইনিং ক্যাম্প ছেড়ে রাতারাতি ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির কর্পোরেট জীবনে চলে এসেছিলেন তারা। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের পরম আরাধ্য। তাই তাদের যখন যে কাজই দেওয়া হয়েছে, নির্দ্বিধায় তা মেনে নিয়েছেন। যাকে আগে রাখা হয়েছে, তিনি আগেই থেকেছেন আর যাকে পেছনে রাখা হয়েছে, তিনি পেছনেই থেকেছেন। এই ঈমানী মনোবল নিয়েই তারা কোম্পানির কাজ শুরু করেছিলেন। আফগানিস্তানে তখন আল-কায়েদার হাতেগোনা কয়েকজন সদস্য অবস্থান করছিলেন। আল-ফারুক ও জিহাদওয়াল ক্যাম্পে তারা প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আবু আতা তিউনিসী রহ. ও আবুল ফারাজ লীবী ফা.আ.-এর তত্ত্বাবধানে এই দুটি ট্রেইনিং ক্যাম্প তখনও চালু ছিল।

এই সময়ে শায়খ শরয়ী ইলম অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। মৌরিতানিয়ার তিনজন বিজ্ঞ আলেমকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইলমুল কিরাআতে পারদর্শী। অন্য দু'জন ছিলেন ফিকহ ও আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ। আল-কায়েদার লাজনাতুশ শরীয়াহ (শরীয়াহ বোর্ড)-এর পক্ষ থেকে ১০ জন ভাইকে শরয়ী ইলমে পাণ্ডিত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মৌরিতানিয়া পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন—শায়খ আবু ইয়াসির মিসরী, শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ লীবী, শায়খ আব্দুল হক লীবী[১], শায়খ আবু সাহল লীবী, শায়খ আব্দুল হামিদ লীবী ও শায়খ ইবনে মাসউদ চাদী।

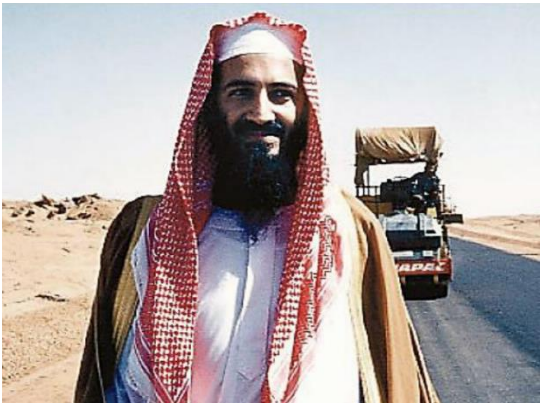
[১] শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযীদ রহ.-এর আত্মীয়।

সুদানের কাজকর্ম ভালোভাবেই শুরু হয়। আল-হিজরাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি সরকারের সাথে ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ আত-তাহাদ্দি সড়ক নির্মাণের চুক্তি করে। এ সড়ক রাজধানী খার্তুমকে উত্তরাঞ্চলীয় শহর আতবারার সাথে যুক্ত করে দেয়। এই প্রকল্পের খরচ ছিল প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার। শায়খ রহ. আশাবাদী ছিলেন, সুদানের কাজ যদি দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকে, তাহলে এই প্রকল্পগুলো থেকে ভালো লাভ আসবে। কেননা, বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্প—বিশেষ করে কৃষি প্রকল্পগুলো—থেকে লাভ আসতে সময় লাগে, আবার কাজ শুরুর সময়ও ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হয়। যেমন: আস-সিমারুল মুবারাকাহ কোম্পানির মালিকানায় দামাযিন শহরে ১ লক্ষ একর অর্থাৎ ৪২০ মিলিয়ন বর্গমিটার বৃষ্টিপ্রধান জমি ছিল। এর পুরোটাই ছিল অনাবাদি। পুরো জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘন গাছপালা কেটে পরিষ্কার করা ছাড়া সেখানে চাষাবাদ করা অসম্ভব ছিল। এ ছাড়াও কোম্পানির মালিকানায় কাসালা শহরের কাছেই কাশ অঞ্চলে হাজার হাজার একর জমি ছিল। এই জায়গাটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমি মনে করা হয়। এখানকার জমিতে একবার সেচ দিয়েই এক মৌসুমে টানা তিনবার চাষ করা যায়। এই জমিতে চাষাবাদ করার জন্যও কোম্পানির অনেক খরচ বহন করতে হতো। কারণ পুরো জমিতে সেসবানিয়া গাছের ঘন জঙ্গল ছিল। ২৫ সেন্টিমিটার গভীর থেকে এই গাছগুলো কেটে শেকড়-সহ জ্বালিয়ে দিতে হয়, যেন আবার না গজায়। শায়খ রহ. এই উর্বর জমিগুলোর প্রতি অনেক আগ্রহী ছিলেন। পুরো কাশ ব-দ্বীপে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০০ একর। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি।

কুদরাত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি রাশিয়া থেকে পরীক্ষাস্বরূপ চারটি MAZ ট্রাক আমদানি করে এবং সুদানে ট্রাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ডিলারশিপ নেওয়ার জন্যও তারা চুক্তি করে।

সুদানে শায়খ উসামা রহ.-এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছিল তা হলো—সুদানের মুদ্রার দরপতন। ডলারের বিপরীতে সুদানি পাউন্ডের মান ক্রমাগত কমেই যাচ্ছিল। সুদান সরকারের সাথে চুক্তি ছিল, শায়খ উসামাকে তারা ডলারের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান করবে। কিন্তু সুদানের অর্থ মন্ত্রণালয় শায়খ উসামাকে কখনোই ডলার দিত না। এর পরিবর্তে তারা কিনানা সুগার কোম্পানি থেকে শায়খ উসামা রহ.-কে প্রাপ্য অংশ পরিমাণ চিনি প্রদান করত। শায়খের মালিকানাধীন ত্ব-বা ট্রেডিং কোম্পানি সেই চিনি স্থানীয় বাজারে ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করত, এরপর সেই ডলার আল-হিজরাহ কোম্পানির একাউন্টে ট্রান্সফার করা হতো। মাঝে মধ্যে সুদান সরকার ডলারের অফিসিয়াল রেট অনুযায়ী সুদানী পাউন্ড প্রদান করত। অফিসিয়াল রেটের সাথে মার্কেট রেটের বিরাট তফাত থাকায় কোম্পানির ব্যাপক লোকসান হতো। সেই পাউন্ড দিয়ে ত্ব-বা ট্রেডিং কোম্পানি তিলের মৌসুমে বিপুল পরিমাণ তিল কিনে রাখত। তারপর সেই তিল পরিশোধন ও প্যাকিং করে ডলারের বিনিময়ে রপ্তানি করত।

একবার সুদান সরকার শায়খের লভ্যাংশ পরিশোধের জন্য আল-হিজরাহ কোম্পানির কাছে আট মিলিয়ন ডলারে একটি ট্যানারি বিক্রি করেছিল [এবং বিক্রির টাকা দিয়ে কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ শোধ করেছিল]। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ, সুদান সরকার ট্যানারির যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল, তা প্রকৃত মূল্য থেকে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু শায়খ উসামা রহ. এতেও সম্মতি দিয়েছিলেন।



আত-তাহাদ্দি সড়কের নির্মাণকাজ পরিদর্শনকালে শায়খ রহ.



খার্তুম-আতবারা আত-তাহাদ্দি মহাসড়কের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে শায়খ উসামা রহ. ও শায়খ আবু ইবরাহীম ইরাকী রহ.

বশীর সরকারের সাথে সব চুক্তিতেই শায়খ উসামা রহ. এমন উদারতা, ধৈর্য ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের মূলধন উসুল করার ব্যাপারেও অনেক ছাড় দিয়েছেন। শায়খের নিয়ত ছিল, এর মাধ্যমে তিনি একটি মুসলিম দেশকে সহযোগিতা করছেন। মুসলিমরা এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। যদিও এতে নিজের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু তিনি কখনোই একে ক্ষতি হিসেবে দেখেননি।

সব কিছুতেই শায়খের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রশস্ত ও সূক্ষ্ম। সুদান সরকারের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে লাভক্ষতির হিসেব না করে আন্তরিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। তিনি জানতেন, যতই দিন গড়াবে প্রতিবেশী ও অন্যান্য শক্তিধর দেশের পক্ষ থেকে সুদানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। এর প্রথম কারণ হলো—সুদান সরকারের ইসলামী মনোভাব। দ্বিতীয় কারণ হলো—সুদানের বিভিন্ন স্থানে আল-কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদী দলের উপস্থিতি ও তৎপরতা। যেমন: সুদানে শায়খের অবস্থান, সৌদিবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা আর সৌদি ফিরতে অস্বীকার করার কারণে সৌদি সরকার সুদানের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল। সুদানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বাদশাহ ফাহাদের পক্ষ থেকে ক্রুসেডার জন গ্যারাংকে বিপুল পরিমাণে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতো। জন গ্যারাং এই অর্থ ব্যয় করত সুদান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এমনইভাবে সুদানে তখন মিশরের দুটি জিহাদী দল—ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ—সক্রিয় ছিল। তারা সুদান থেকে মিশরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করত। যার কারণে মিশরের সাথেও সুদানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। বিশেষ করে ১৯৯৫ সালে আদ্দিস আবাবায় মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর দু'দেশের মধ্যে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়। হোসনি মোবারক সরাসরি সুদানকে দায়ী করে বলেছিল, সুদানের সমর্থন ও সহযোগিতাতেই এই হামলা হয়েছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। মিশর সরকার সুদানকে যুদ্ধে টেনে আনার জন্য সুদান সীমান্তে সেনাবাহিনী জমায়েত করে হালাইব ট্রায়াঙ্গেল ও শালাতিন এলাকা দখল করে নেয়। এ ছাড়াও সুদানে তখন আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-লিবিয়্যাহ আল-মুকাতিলাহ (LIFG) সক্রিয় ছিল। যার কারণে গাদ্দাফিও সুদান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ক্রুসেডার জন গ্যারাংকে বিপুল পরিমাণ সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করত।

## সুদানে শায়খ উসামা রহ.-কে হত্যাচেষ্টা

১৯৯৩ সালের শুরুর দিকে শায়খের ওপর এই হামলা চালানো হয়। তিনজন কট্টর তাকফীরী এতে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল সুদানের; আরেকজন ছিল লেবাননের, তার নাম ছিল খুলাইফি। হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো তারা খার্তুমের এক থানা থেকে সংগ্রহ করেছিল।

দুই সুদানি ঘাতকের একজন ছিল কামার। সে নিজ হাতে প্রথমে ট্রানকুইলাইজার বন্দুক (যে বন্দুক দিয়ে তীরের মতো ধারালো ফলা নিক্ষেপ করা হয়) বানিয়েছিল। তারপর এটা নিয়ে তারা থানায় আক্রমণ করে পুলিশের অস্ত্র হাতিয়ে নিয়েছিল। থানা থেকে লুট করা অস্ত্র নিয়ে তারা প্রথমে উম্মে দুরমান শহরে জামাআতু আনসারুস সুন্নাহর একটি মসজিদে জুমআর নামাযের সময় আক্রমণ করে। আনসারুস সুন্নাহর নায়েবে আমীর শায়খ আবু যায়েদ মুহাম্মাদ হামযা তখন মসজিদে ইমামতি করছিলেন। ঘাতকরা মসজিদে ঢুকেই উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। এতে জামাআতের ১৮ জন মুজাহিদ শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন। আক্রমণকারীরা পরে পালিয়ে যায়।

মসজিদে আক্রমণের পরের দিনই খারেজি ঘাতকেরা খার্তুমের রিয়ায গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করে, যেখানে শায়খ উসামা রহ. থাকতেন। শায়খের বাড়ির পাশেই ৩০ মিটার দূরে একটি মেহমানখানা ছিল। শায়খের অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন বিকেল ৫ টায় বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে মেহমানখানায় যেতেন। তখন সাধারণত তাঁর সাথে একজন বা দু'জন নিরাপত্তারক্ষী থাকতেন। তারা হলেন—আব্দুল হাদী উরদুনী ও আবু খলীল মাদানী রাহিমাহুমাল্লাহ। ঘাতকরা আগেই শায়খের মেহমানখানায় আসা-যাওয়ার রুটিন দেখে রেখেছিল। আক্রমণের জন্য এই সময়কেই তারা নির্বাচন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কী অসীম কুদরত যে, ঠিক সেদিন সে সময়েই যখন শায়খ ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন শায়খের ছেলে আব্দুল্লাহ দরজায় দাঁড়িয়ে শায়খের কাছে বিদ্যুতের অসুবিধা নিয়ে অভিযোগ করছিলেন। ফলে শায়খের বের হতে দেরি হয়েছিল।

ঘটনা ছিল, শায়খ রহ. ও তাঁর আরেক ছেলে আব্দুর রহমান বিদ্যুৎ কম খরচের ব্যাপারে একমত ছিলেন। তাই প্রতিদিন সকালে তিনি (আব্দুর রহমান) তিন তলার পুরো বাড়ির বিদ্যুতের ফিউজ খুলে রাখতেন। (ফলে সারাদিন বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকত না। আবার সন্ধ্যাবেলা ফিউজ লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু পরিবারের সবাই মনে করত বিদ্যুতের সমস্যা হচ্ছে।) আব্দুর রহমান টানা ৬/৭ মাস এমন করেছেন, কিন্তু তার পরিবার এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। (তারা মনে করতেন, বিদ্যুতের সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন)। শায়খ উসামা রহ. নিজ পরিবার, সন্তান ও অন্যান্য সাথি-সঙ্গীদের যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করতেন। প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করাকে শায়খ বিলাসিতা ও দুনিয়াদারি মনে করতেন। কারণ, বিদ্যুৎ দুধারি তরবারির মতো। খারাপ কাজেই বিদ্যুতের ব্যবহার বেশি হয়, যার অসংখ্য প্রমাণ আছে।

আব্দুল্লাহ বিন উসামা যখন বিদ্যুতের এই সমস্যা নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শায়খের কাছে অভিযোগ করছিলেন, ঠিক তখনই খারেজি ঘাতকেরা শায়খকে হত্যার উদ্দেশ্যে মেহমাখানায় পৌঁছায়। গাড়ি থেকে নেমে তাদের একজন মেহমানখানার বাইরে পাহারায় থাকে আর দু'জন

মেহমানখানায় প্রবেশ করে। মেহমানখানার সামনে একটি বাগান ছিল। দুই ঘাতক বাগানে ঢুকে যাদেরই পেয়েছিল, তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। বাগানে তখন চারজন ভাই ছিলেন। শায়খ আবু আলী হারেসী রহ. (কায়েদ সালেম সিনান হারেসী)-এর উরুতে একটি গুলি বিদ্ধ হয়। শায়খ গাযওয়ান হাযরামী রহ.-এর পেটে তিনটি গুলি লাগে। তার আঘাত অনেক গুরুতর ছিল। শায়খ আব্দুর রহীম ইয়ামানী রহ. (ইবরাহীম বিন মাবখুত ওয়াসসাবী)-এর বাহু ভেদ করে একটি গুলি বেরিয়ে যায়। আর ভাই আবুল ইয়াসার তিউনিসী রহ.-এর উরুর ওপর দিকে একটি গুলি লাগে। তারপর ঘাতকরা মেহমানখানার ভেতরে প্রবেশ করে শায়খ উসামা রহ.-কে খুঁজতে থাকে। কিন্তু শায়খকে না পেয়ে এবং ভাইদের পাল্টা গুলিবর্ষণের মুখে তারা দ্রুত বের হয়ে যায়।



শায়খ আবু খলীল মাদানী রহ.



শায়খ আব্দুর রহীম ওয়াসসাবী রহ.



শায়খ আবু আলী হারেসী রহ.

অন্যদিকে যে ঘাতক বাইরে অপেক্ষা করছিল, সে শায়খের নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। শায়খের নিরাপত্তারক্ষীরা তখন শায়খকে মেহমানখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আবু খলীল মাদানী তখন মেহমানখানার ভেতরেই ছিলেন। ভেতর থেকে দুই ঘাতক বের হয়ে আসার পর তিনি দরজার আড়াল থেকে রিভলভার দিয়ে ফায়ার করা শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ তার রিভলবার জ্যাম হয়ে যাওয়ায় তিনি পিছু হটেন। ঘাতকরা দ্রুত গাড়িতে উঠে প্রধান সড়ক ধরে ডান দিকে চলে যায়। সড়কের শেষ প্রান্তে সুদানি সেনাবাহিনীর এক অফিসারের বাড়ি ছিল। সেখানে সুদানি সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য ছিল। তারা গোলাগুলির শব্দ শুনে শায়খ উসামা রহ.-এর বাড়ির পাহারায় থাকা সেনাদের সাথে যোগাযোগ করে। তাদের থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে তারাও সতর্ক হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই তাদের দিকে ঘাতকদের গাড়ি আসতে দেখে দেওয়ালের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করে। ঘাতকদের গাড়ি ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে আসা মাত্রই তারা গুলি করে। এতে দুই সুদানি ঘাতক ঘটনাস্থলেই মারা যায় আর লেবানিজ ঘাতক গুরুতর আহত হয়। তাকে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা ও সুস্থতার পর তাকে আদালতে পেশ করা হলে কিসাসের সিদ্ধান্ত হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বলে রাখা ভালো, তখন শায়খ রহ.-কে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সুদানি সেনাবাহিনীর এক ইউনিটের ওপর। তাদের সাথে শুধু দু'জন মুজাহিদ ভাই থাকতেন—আবু খলীল মাদানী ও আব্দুল হাদী উরদুনী রহ.। পুরো ইউনিটের কাছে অস্ত্র বলতে শুধু রিভলবার থাকত। কিন্তু এই ঘটনার পর ১৫ জন মুজাহিদ ভাইকে শায়খের দেহরক্ষী ইউনিটে যুক্ত করা হয় এবং সকলকে কালাশনিকভ দেওয়া হয়। তারা সকলে হায়দারা ভাইয়ের কাছে ক্লোজ প্রোটেকশন অপারেশন (CPO)-এর ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

## সুদান থেকে আল-কায়েদার পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

সুদানে থাকাকালে আল-কায়েদা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কিছু সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমও পরিচালনা করেছিল। সংক্ষেপে সেগুলো হলো—

১. সোমালিয়ার কার্যক্রম

২. আলজেরিয়ার কার্যক্রম

৩. ফ্যাক্সযুদ্ধ

৪. ইয়েমেনের কার্যক্রম

৫. আদ্দিস আবাবায় মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে হত্যাচেষ্টা

৬. চেচনিয়ার কার্যক্রম

### ১. সোমালিয়ার কার্যক্রম

কুয়েতের স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে ১৯৯১ সালে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে পা রাখে ক্রুসেডার বাহিনী। এই ঘটনাটি ছিল ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট, একইসাথে এটি ছিল মুসলিম উম্মাহর দীনী গায়রত ও আত্মসম্মানের ওপর কুঠারাঘাত। এ ঘটনা মুসলিমদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। ইরাকের কুয়েত দখলের চেয়ে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে পশ্চিমা ক্রুসেডার বাহিনীর আগমন এবং তাদের থেকে আরবদের সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি মুসলমানদের মধ্যে বেশি তোলপাড় সৃষ্টি করে। এ কারণে ১৯৯১ সালেই আল-কায়েদা পেশোয়ারে কয়েকটি গোপন বৈঠক করে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা আল-কায়েদার জন্য সোমালিয়ার মাটিতে অনুকূল পরিবেশও তৈরি করে দেন।

১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে ইথিওপিয়া সমর্থিত গোত্রীয় জোট সোমালিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সিয়াদ বারিকে উৎখাত করে। এর পরেই গোত্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়,

যা ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। এর ফলে সোমালিয়ার রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুরোপরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং দেশজুড়ে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ মারা যায়। চলমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আমেরিকা সোমালিয়া দখল করে এ অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারা শুরু করে। সোমালিয়ায় মার্কিন দখলদারিত্বের বৈধতা তৈরির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রেজুলশন ৭৯৪ গৃহীত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, সোমালিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানো হবে। এ অপারেশনের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন রিস্টোর হোপ' (Operation Restore Hope)। ১৯৯২ সালের ৫ই ডিসেম্বর এই বাহিনী সোমালিয়ায় প্রবেশ করে।

সোমালিয়ায় আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী নামে সালাফীদের একটি দাওয়াতী সংগঠন ছিল। সিয়াদ বারির পতনের পর পুরো দেশেই তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছিল। দাওয়াত ও তরবিয়তের মাধ্যমে সোমালিয়ার সকল গোত্রের লোকজনকে তারা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মাঝে ওগাদেন[২] গোত্রও ছিল, যারা দখলদার ইথিওপিয়ার অধীনে বাস করত। আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর উত্থান এবং জনপরিসরে এর গ্রহণযোগ্যতার ফলে সমাজ থেকে সব ধরনের দূর্নীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা সরকার গঠনের ব্যাপারেও আশাবাদী ছিল।

শুরুর দিকে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে জড়িত ছিল না। কিন্তু জেনারেল আইদিদ ও ইথিওপিয়ান দখলদাররা সোমালি জনগণের ওপর লাগাতার সীমালঙ্ঘন করেই যাচ্ছিল। ততদিনে রুশবিরোধী আফগান জিহাদ শেষে সোমালি মুজাহিদরাও দেশে ফিরতে শুরু করেছিলেন। আফগান জিহাদ দ্বারা তারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দেশে ফিরেই তারা ইথিওপিয়ান দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদী জাগরণের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তাদের দাওয়াতে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর অনেক নেতা প্রভাবিত হন। অবশেষে ইথিওপিয়ান দখলদারদের দমন করার লক্ষ্যে দলটি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। একদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ায় তারা জেনারেল আইদিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক লড়াই শুরু করেন, অন্যদিকে উত্তর সোমালিয়ায় ইথিওপিয়া সমর্থিত তথাকথিত স্বৈরশাসক আব্দুল্লাহ ইউসুফের বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ইত্তিহাদের মুজাহিদগণ আব্দুল্লাহ ইউসুফকে তার কিছু নিরাপত্তারক্ষী-সহ গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়ার আগ মূহূর্তে দলের ভেতরে থাকা তার গোত্রের লোকেরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এতে ওগাদেন গোত্রের মুজাহিদগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কারণ তারা শুধুমাত্র দীনের স্বার্থে এবং মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উত্তর সোমালিয়ায় এসেছিলেন। এই ঘটনার পর ওগাদেন মুজাহিদরা আল-

[২] ওগাদেন অনেক বড় একটি গোত্র। দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়ু থেকে কিয়াম্বোনি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে তাদের বসবাস। এ ছাড়াও উত্তর-পূর্ব কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলেও তারা বাস করে।

ইত্তিহাদুল ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিযবুল ইত্তিহাদিল ইসলামী আল-ওগাদিনী নামে নতুন একটি দল গঠন করেন। আব্দুল্লাহ ইউসুফ তার গোত্রের সহায়তায় সোমালিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পুন্টল্যান্ডের বাণিজ্যিক রাজধানী শহর বোসাসো থেকে মুজাহিদদের তাড়িয়ে দেয়। এই গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে উত্তর সোমালিয়ার ময়দান মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে যায়। একটি দল ভেঙে সোমালিয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভাগে অনেকগুলো দলের উদ্ভব ঘটে।[৩]

এরইমধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রেজুলেশন ৭৯৪ গৃহীত হয় এবং গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সোমালিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনী সোমালিয়ায় প্রবেশে করে। তখন আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর মজলিসে শূরা আশ্চর্য এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসে। তারা ঠিক করে, এই আগ্রাসি শক্তির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে যাবে না; বরং নিজেদের সব অস্ত্র হয়তো মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে অথবা বিক্রি করে দেওয়া হবে। তাদের যুক্তি ছিল, তারা এখন মক্কী জীবনের দাওয়াতী মারহালায় আছেন। এ সিদ্ধান্তে যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তাদের অধিকাংশই সৌদির ইরজায় আক্রান্ত শায়খদের থেকে ইলম শিখেছিলেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে দলের নেতৃবর্গ নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিণতিতে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে এমন কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নেতা তখনও ছিলেন, যারা দলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ হাসান তাহের, শায়খ হাসান তুর্কী এবং শায়খ আব্দুল্লাহ সাহল উল্লেখযোগ্য। আল-কায়েদার সাথে মিলে হাজার হাজার মুজাহিদ নিয়ে তারা এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইথিওপিয়ান ও মার্কিন আগ্রাসন নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

১৯৯২ সালের শুরুর দিকে সোমালিয়া থেকে উলামায়ে কেরামের একটি জামাত সুদানে আসে। তাদের মধ্যে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর আমীর শায়খ হাসান তাহের উয়াইস ও শায়খ হাসান তুর্কীও ছিলেন। তাদের আগে ইত্তিহাদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে দুই তরুণ নেতা[৪] শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে দেখা করে ইত্তিহাদের মাশায়েখের সাথে শায়খ উসামার সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করেছিলেন। তাঁরা শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে বসে সোমালিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং আল-কায়েদার অধীনে সোমালি মুসলিমদের প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি ক্যাম্প খোলার সিদ্ধান্ত নেন।

---

[৩] হারুন ফযল রহ. রচিত আল-হারবু আলাল ইসলাম থেকে সংক্ষেপিত।

[৪] তাদের একজন ছিলেন শায়খ আব্দুস সালাম রহ.। তিনি আল-ইত্তিহাদুল ইসলামী আল-ওগাদেনীর নেতা ছিলেন। আরেকজনের নাম নিরাপত্তার খাতিরে উল্লেখ করছি না।

আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করা, বিভক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা, দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া এবং এতদঅঞ্চলে মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক শক্তিশালী বাহিনীর ভিত তৈরির উদ্দেশ্যে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ সোমালিয়াকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান নেন। 'আল-মানদেব' প্রণালী এবং আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের প্রাণকেন্দ্র জাযীরাতুল আরবের কাছাকাছি হওয়ায় ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও সোমালিয়ার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ কারণে অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও জনবলের দিক থেকে আমেরিকাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করার জন্য সোমালিয়া ছিল আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের পছন্দের শীর্ষে। এ উদ্দেশ্যে আল-কায়েদা সব রকমের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে আফগানিস্তান, সুদান ও ইয়েমেন থেকে তানজীমের সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ সামরিক প্রশিক্ষকগণ সোমালি যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সোমালিয়ায় আসা শুরু করেন।

সোমালিয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য তানজীমের প্রথম দলটি জিবুতি থেকে রওনা হয়। তাদের মধ্যে শায়খ কমান্ডার আবু হাফস, শায়খ আবু মাহদী আওলাকী (ইয়াসলিম বারাসিন) এবং আরও কয়েকজন ভাই ছিলেন। সুদান থেকেও ভাইদের একটি দল সোমালিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করে। আবু তুরাব কীনী, আবু তালহা সুদানী, আবু হুরাইরা সোমালী, আবু ইউসুফ সোমালী, আবু আহমাদ রাযী ইয়ামানী এবং আরও অনেকে ছিলেন এই দলে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী আসার আগেই ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে এই দলদুটি সোমালিয়ায় প্রবেশ করে।

প্রশিক্ষক ভাইয়েরা সোমালিয়ায় প্রবেশ করে দুই দলে ভাগ হয়ে যান। একদল ইথিওপিয়ার দখলদারিত্বে থাকা ওগাদেন অঞ্চলে প্রশিক্ষণের জন্য, আরেকদল সোমালিয়ায় দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আসা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হন। ওগাদেন শাখায় ছিলেন—এ শাখার আমীর আবু ইসলাম মিসরী, আবু খালেদ হাবীব, সা'দুফ (খালেদ মাকদিসী), আব্দুস সবুর মিসরী এবং হারুন ফযল কুমুরী[৫]-সহ আরও অনেকে। আল্লাহ সকলকে কবুল করে নিন। অপরদিকে সোমালি শাখায় ছিলেন—আমীর খালেদ ফাওয়ায ফাক্কাল্লাহু আসরাহু, আব্দুল ওয়াকীল মিসরী, শুয়াইব মিসরী (সা'দী), আবুল হাসান সায়ীদী, মুহাম্মাদ আওদাহ এবং আরও কয়েকজন।[৬]

সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ভাইদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজটি ছিল ওগাদেন অঞ্চলে পৌঁছানো। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা নিয়েই তারা সফর শুরু করেছিলেন। এত কঠিন পরিস্থিতিতেও ভাইদের অবিচলতা থেকেই বোঝা যায়, তাদের মধ্যে সবর ও

[৫] আল-কুমুর বা কমোরোস দ্বীপপুঞ্জ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র।

[৬] হারুন ফযলের লেখা 'আল-হারবু আলাল ইসলাম' থেকে সংক্ষেপিত।

আযীমত, ঈমান ও ইয়াকীন কতটা মজবুত ছিল। বিপদসংকুল এই পথে চলতে গিয়ে কেমন প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়েছে—তা জানার জন্য আমরা হারুন ফযলের আত্মজীবনী থেকে কিছু অংশ তুলে ধরব। তিনি তার আত্মজীবনী 'আল-হারবু আলাল ইসলাম'-এ লেখেন—

'ওগাদেনের পাহাড়ি অঞ্চল সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতাম না। তার ওপর পরিস্থিতিও ছিল অস্থিতিশীল। এমন অবস্থায় সেখানে পৌঁছানোটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব আফ্রিকায় কাজ করতে গিয়ে যত বাধা এসেছে, তার মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে কঠিন। পহেলা রমযান একটি ট্রাকে ৮ জন আরব প্রশিক্ষককে সাথে নিয়ে আমরা রওনা হই। এই পুরো সফরে আমাদের সাথে বিভিন্ন সময় মোট ৬০ জন মুজাহিদ শরীক হয়েছিলেন। ট্রাকে করে আমরা সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে আসি। অন্য মুজাহিদদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যে জায়গাটি ঠিক করা হয়েছিল, তা লুক শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে ছিল। এ পর্যন্ত এসে ট্রাক ছাড়তে হয়। নিজের সাথে শুধু ব্যক্তিগত একটি অস্ত্র, একটি পানির বোতল আর একটি ছোট ব্যাগ রেখে অতিরিক্ত সব জিনিসপত্র উটের পিঠে চাপিয়ে দিই। ব্যাগে তিন ম্যাগাজিন গুলি ও দুটি বোমা ছিল। শায়খ আব্দুল্লাহ সাহল বার্ধক্যের কারণে আমাদের সাথে সফর করতে পারেননি। এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অচেনা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আমাদের সফর শুরু হয়।

বিশ্বাস করুন ভাই, অচেনা জায়গায় সফর করার চেয়ে কঠিন কাজ আর একটিও নেই। এই সফরেও আমরা গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। শুধু এতটুকু জানতাম, আমাদের ওগাদেন শহরে পৌঁছুতে হবে। সামনে ছিল প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের পথ। সফরের কারণে রোযা রাখাও সম্ভব ছিল না। দীর্ঘ ও কঠিন এ সফর আল্লাহর তাওফীক ও নুসরতে পরিপূর্ণ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এ সফরে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষত সবর ও সহনশীলতার এক নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। সফরসঙ্গীদের ব্যাপারেও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে।

সোমালি যুবকরা মরুভূমিতেই বেড়ে ওঠে। পশুপালন তাদের প্রধান পেশা। পশুর পাল নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে তারা অভ্যস্ত। এ জন্য স্থায়ীভাবে কোথাও তারা বসতি গড়ে তোলে না। তাদের কেউ কেউ তো দুই সপ্তাহে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতেও অভ্যস্ত। আমরা যেহেতু বেদুইন না, তাই তারা ভেবেছিল, মরুভূমির এই কঠিন প্রকৃতিতে একদিনও টিকতে পারব না। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে জানিয়ে দিলাম, আমরাও কম নই। এই সফরে কী ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে—আমরা তা আগে থেকেই জানতাম। নিরাপত্তার কারণে ইচ্ছা করেই দীর্ঘপথ ধরেছিলাম। ফলে গন্তব্যে

পৌঁছাতে স্বাভাবিকের চেয়ে দেরি হয়ে যায়। টিগ্রে[৭] বাহিনীর ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ পথ এড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। রমযানের প্রথম ১০ দিন সারাদিন চলতাম। বিকেলের দিকে জিনিসপত্র রেখে বিশ্রাম করতাম। তখন আমাদের প্রধান খাবার ছিল উটের দুধ। কালেভদ্রে কখনো উট কখনোবা বকরি জবাই করতাম। গোশত ও দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না। তবে সবচেয়ে দুর্ভোগের বিষয় ছিল পানির স্বল্পতা। মাঝে মাঝে তো একটু পানির জন্য সারাদিনই পথ চলতে হতো।

পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে কয়েকজন গাইড ছিলেন। একেক জায়গায় একেকজন গাইড দায়িত্ব পালন করতেন। কিছু মানচিত্রও নিয়ে এসেছিলাম আমরা, সেগুলো দেখে কূপ খুঁজে বের করতাম। কিন্তু মানচিত্রগুলো পুরোনো ছিল। মাঝে মাঝে মানচিত্রে দেখানো কূপের স্থানে পৌঁছে দেখতাম সেখানে কূপের কোনো নাম-গন্ধও নেই; মাটি দিয়ে ভরাট হয়ে আছে। এভাবে ফজরের পর থেকে যোহর পর্যন্ত লাগাতার পথ চলতাম। যোহরের পর বিশ্রামের জন্য থামতাম। প্রায় দিনই গড়ে ৪০ কিলোমিটার চলতাম। মাঝে মধ্যে জায়গার ভিন্নতার দরুন গতি কমিয়ে আনতে হতো। মরুভূমি, সাভানার[৮] তৃণভূমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল আর পূর্ব আফ্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কাঁটাযুক্ত বনে চলার গতি এক রকম হতো না।

এত দীর্ঘ পথ চললেও কোথাও কোনো মানুষের দেখা পেতাম না। চলার পথে উত্তর দিক-নির্দেশকারী দীর্ঘ রেখাগুলো দেখে খুব আশ্চর্য লাগত। যেন এগুলোর কোনো শেষ নেই। এগুলো মূলত ভূতাত্ত্বিক দিক-নির্দেশক রেখা; পশ্চিমা কিছু কোম্পানি সোমালিয়ায় খনির অনুসন্ধান করার সময় এগুলো তৈরি করেছিল। পথ চলতে চলতে অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ কোনো নিঃসঙ্গ বেদুইনের সাথে দেখা হয়ে যেত। একটি খঞ্জর আর দুধ বা চায়ের পাত্র ছাড়া তাদের সাথে আর কিছুই থাকত না। এমন বিপজ্জনক অঞ্চলে ভাবলেশনহীনভাবে তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখে বেশ অবাক হতাম আমরা। এ অঞ্চলের প্রতিটি কোনাই ঝুঁকিপূর্ণ, হিংস্র প্রাণীদের অভয়ারণ্য। রাতে আগুন না জ্বালিয়ে ঘুমানোর কথা চিন্তাও করা যেত না। আগুন দেখলে পিছু নেওয়া বাঘ, সিংহ, হায়েনা ও নেকড়ের দল কাছে আসার সাহস পেত না।

[৭] Tigray People's Liberation Front (TPLF) হলো উত্তর ইথিওপিয়ার টিগ্রে ভাষাভাষী সশস্ত্র বামপন্থি জাতীয়তাবাদী দল।

[৮] সাভানার তৃণভূমি বলতে এমন জায়গাকে বোঝানো হয় যেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ঘাস জন্মে। গাছপালাও থাকে। তবে গাছপালাগুলো দূরে দূরে হওয়ায় পুরোপুরি বনের মতো পরিবেশ তৈরি হয় না।

আমাদের সফরটি এক অর্থে আনন্দভ্রমণই ছিল; তবে সর্বোচ্চ স্তরের। রাসূল ﷺ বলেছেন, سياحة أمتي الجهاد[৯] (জিহাদ হলো আমার উম্মতের আনন্দভ্রমণ)। তবে পুরো সফরের একটি বিশেষ আনন্দ ছিল শিকার। স্নাইপার হওয়ায় শিকারের দায়িত্ব আমিই পালন করতাম। আফ্রিকার এই বনাঞ্চলগুলো হরিণে ভরা। হরিণগুলোও বেশ মূল্যবান। বনের হরিণ শিকার করা ছিল আমার কাজ। দলের আমীর সাইফুল ইসলাম ভাই আমাকে ঘোরাঘুরির অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। সোমালি যুবকদের একটি অগ্রবর্তী দল ছিল। এই অঞ্চলের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তারা বেশ ভালো জানত। আমি তাদের সাথে থাকতাম। মূল দলের আগে আগে থাকত তারা। যে-কোনো কূপের কাছে মূল বাহিনী পৌঁছানোর ১৫ মিনিট আগেই আমরা পৌঁছে যেতাম। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কোথাও থামার সিদ্ধান্ত হলে সবার আগে সেই জায়গার চারপাশে অনুসন্ধান চালিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতাম, প্রতিরক্ষার জন্য সেখানকার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে পাহারার বন্দোবস্ত করতাম। কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পালা করে পাহারা দিতাম আমরা। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল ওগাদেন শহরের কেন্দ্রে পৌঁছানো। টিগ্রে বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতাম। আশপাশে টিগ্রে বাহিনীর উপস্থিতি টের পেলে কখনো কখনো একই জায়গায় দিনদুয়েক ঘাপটি মেরে বসে থাকতে হতো। গুপ্তচরদের পক্ষ থেকে সংকেত আসলেই কেবল নতুন করে পথচলা শুরু হতো। শত্রুদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সফরের শেষদিকে মধ্যরাতে উঠে ফজর পর্যন্ত পথ চলতাম আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম। সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে ইশার পরে আবার চলা শুরু করতাম। যতই ওগাদেনের কাছে যাচ্ছিলাম, সরকারি বাহিনীর উপস্থিতি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

কাফেলার সোমালি অংশের আমীর ছিলেন আব্দুল ওয়াহিদ ভাই। তিনি আগে সোমালি বাহিনীর রিকনিসেন্স টিমের অফিসার ছিলেন। এই অঞ্চলের অলিগলি ছিল তার নখদর্পণে। সফরে আমরা কম্পাস আর মানচিত্র ব্যবহার করলেও তিনি ও অন্যান্য গাইডরা গাছপালা আর প্রাকৃতিক বিভিন্ন আলামত দেখে পথ চলতেন। খালেদ হাবীব ও সুলাইমান সা'দুফ যেহেতু চশমা পরতেন, তাই রাতের অন্ধকারে পথ চলতে তাদের কিছুটা অসুবিধা হতো। এ ছাড়া পুরো সফরে নিরাপত্তাগত কোনো সমস্যা হয়নি। তবে পানি-সংকট, সাথিদের অসুস্থতা ও দুধ-চিনির অপর্যাপ্ততার মতো সাধারণ সমস্যাগুলো মাঝে মধ্যেই দেখা দিত। বলে রাখা ভালো, সোমালি মুসাফিরদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো চা। চা ও চিনি থাকলে দুনিয়ার কোনোকিছু নিয়েই তারা মাথা

[৯] সুনানে আবু দাউদ : ২৪৮৬

ঘামায় না। তারা সব ত্যাগ করতে রাজি, কিন্তু চা-চিনি শেষ হলে যেভাবেই হোক তার ব্যবস্থা করেই ছাড়বে।

হিট স্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশন (পানিশূন্যতা) থেকে বাঁচার জন্য আমরা পানিতে চিনি মিলিয়ে রাখতাম এবং প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতাম। কারণ, ভাগ্য সব সময় ভালো হতো না। পথে পরিষ্কার সুপেয় পানি পেলে তো তা দিয়েই তৃষ্ণা মেটাতাম, গোসল করতাম এবং পানির ড্রামগুলো ভরে নিতাম। কিন্তু মাঝে মাঝে লবণাক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত পানিই হতো একমাত্র সম্বল। অন্য কোনো উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে তা-ই ব্যবহার করতে হতো। মরুর বুকে মৃত্যু থেকে বাঁচতে সে পানি দিয়েই তৃষ্ণা মেটাতে হতো, রান্না করতে হতো। বানর ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী যেখান থেকে পানি পান করত, আমরাও সেখান থেকেই পানি সংগ্রহ করতাম। বন্য প্রাণীগুলো পুরো সফরে আমাদের সাথেই ছিল। মাঝে মধ্যে বুনো হাতির পায়ের ছাপ দেখা যেত। দূর থেকে আমাদের দেখে কাছে আসতে থাকা হিংস্র নেকড়ে ও সিংহের গর্জন কানে আসত। তবে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশ আমাদের কারোরই ছিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। বন্য প্রাণীগুলো যেমন তাদের কাজে বের হতো, আমরাও আমাদের কাজে থাকতাম। তারাও আল্লাহর মাখলুক, আমরাও আল্লাহর মাখলুক। মুজাহিদদের কষ্ট দেওয়া তাদের কাজ না।

সফরে একদিন অনেক বেশি কষ্ট হয়েছিল। সেদিনটিকে আমরা 'আব্দুস সবুর সায়ীদী দিবস' নাম দিয়েছিলাম। সেদিন ফজরের পরপর হাঁটা শুরু করেছিলাম। আশা ছিল সকাল দশটা নাগাদ পানির দেখা মিলবে। কিন্তু যেখানে পানি থাকার কথা ছিল, সেখানে পৌঁছে দেখি পানির কোনো চিহ্নই নেই। বন্যার পানির সাথে আসা মাটিতে পুরো জলাশয় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সেখানে শুষ্ক মরুভূমি খাঁখাঁ করছে।

আমাদের অভ্যাস ছিল, কোনো কূপের কাছাকাছি পৌঁছালে জমিয়ে রাখা পানি খেয়ে ফেলতাম। সেদিনও অভ্যাস অনুযায়ী জমিয়ে রাখা পানি আগেই খেয়ে ফেলেছিলাম। পরে জলাশয়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, পানির ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। তাই জিনিসপত্রও উটের পিঠ থেকে নামানো হয়নি। অন্য কোনো কূপের সন্ধানে আবারও সামনে চলা শুরু করলাম। ধীরে ধীরে সূর্য ঢলে পড়তে লাগল। দিন যত গড়াচ্ছিল ক্লান্তি ও আবসাদও আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছিল। ধু-ধু মরুর কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। গ্লুকোজ ও সামান্য সংরক্ষিত পানি ছাড়া আর কোনো পানিই তখন ছিল না আমাদের সাথে। এভাবে চলতে চলতেই একসময় সূর্য ডুবে গেল। তখনও পানির দেখা মেলেনি। এই কঠিন সময়েও আমাদের মাঝে রসিকতা চলছিল। বিভিন্ন গল্প শুনিয়ে একে অপরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। মিশরীয়রা রসিকতায় বেশ পটু। কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা রসিকতার সুযোগ হাতছাড়া করবে না। সেদিনও তা-ই হয়েছিল।

আমাদের সাথে আলী নামে এক গাইড ছিলেন। তাকে কূপের কথা জিজ্ঞেস করলেই সামনের দিকে আঙুল তুলে খুব সহজভাবে বলতেন أفرساعة অর্থাৎ আর মাত্র চার ঘন্টা লাগবে। তার বলার ভঙ্গি এতটাই স্বাভাবিক হতো, যে কেউ বিশ্বাস করে ফেলত যে, আর চার ঘন্টা হাঁটলেই পানি পাওয়া যাবে। আমরাও প্রথম প্রথম তার কথায় সান্ত্বনা পেতাম, যাক আর মাত্র চার ঘন্টা পরেই পানির দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিন সকাল থেকে ইশা পর্যন্ত হাঁটার পরেও যখন পানির দেখা মিলল না, তখন আমরা তার 'চার ঘন্টার' রহস্য বুঝতে পারলাম। তারপর থেকে তাকে নিয়ে আমাদের মাঝে খুব রসিকতা হতো। ভাইয়েরা তাকে জিজ্ঞেস করতেন 'আলী ভাই, পানি কতদূর?' তারপর তাকে কৌতুক করে নিজেরাই উত্তর দিতেন 'এই তো আর মাত্র চার ঘন্টা।' যদিও সেদিন আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু সবাই বেশ প্রাণবন্ত ছিল।

আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সেই কঠিন সময়ে মরুভূমির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কীভাবে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন! সুবহানাল্লাহ। সফরের পরে সেই সোমালি ভাই 'আলী আফির সাআহ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করে নিন, আমিন।

রাতের অন্ধকারে পানির পিপাসা নিয়েই আমরা পথ চলছিলাম। রাত নয়টার পরে হঠাৎ করেই আব্দুস সবুর সায়ীদী ভাই অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনার কারণেই সেদিনটিকে আমরা 'আব্দুস সবুর দিবস' বলে স্মরণ করি। তার এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় আমরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এ কারণেই সবাই একটু বিশ্রামেরও সুযোগ পেয়ে যাই। সকলে এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে, নতুন করে উঠে চলার মতো শক্তি ছিল না। উটের পিঠ থেকে জিনিসপত্র না নামিয়েই আমরা বিশ্রাম নিই। আমার এখনো মনে আছে, ডক্টর হামাদী (আবু উবাইদা মিসরী) তিন লিটারের এক গ্যালন পানি জোগাড় করেছিলেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, এই সামান্য পানি আমরা কীভাবে পান করেছিলাম। সবাই প্রথমে দীর্ঘ একটি শ্বাস নিত, তারপর গ্যালনের ঢাকনায় যতটুকু পানি ধরে, ততটুকুই পান করত। তখন বারবার মনে হচ্ছিল, তাবুক যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কত কষ্ট করেছেন, হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন কষ্ট করেছেন। কষ্ট-মুজাহাদা ছাড়া কখনো জিহাদ হয় না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভোর তিনটায় আবার রওনা হই। ফজর পর্যন্ত হাঁটার পর বিশ্রাম আর নামাজের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। এই সময় আমার হালকা তন্দ্রা আসে। এই তন্দ্রার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা আমাকে এক আশ্চর্য সম্মান দান করেন। আমি স্বপ্নে দেখি, নুরানী চেহারার কয়েকজন ব্যক্তি আমার সামনে অনেক পানি এগিয়ে দিচ্ছেন আর প্রাণভরে আমি সে পানি পান করছি। ঘুম ভাঙার পর খেয়াল করে দেখলাম, বাস্তবেই

আমার পিপাসা দূর হয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের কথা শুধু আমীর সাহেবকেই জানিয়েছিলাম। তিনি একে সুসংবাদ মনে করলেন আর আমাকে বললেন, এটা আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক। আমার মাঝেও কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসল। নামাযের পর আমরা আবারও পানির খোঁজে বের হলাম। আলী ভাই তার অভ্যাস মতো বললেন, আর চার ঘন্টা পরেই পানির দেখা পাব আমরা। আমরাও তার কথাকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করে পথ চলতে শুরু করলাম।

সকাল দশটায় নতুন এক উপত্যকায় পৌঁছালাম। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে আল্লাহর রহমতে একটি কূপ পাওয়া গেল। কূপটি শুষ্কপ্রায় বলে এক বোতল পানি পেতেই কয়েক মিনিট সময় লাগছিল। আমরা এতেই খুশি ছিলাম। জিনিসপত্র নামিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করা হলো, কূপ পরিষ্কার করা হলো। খাওয়ার জন্য একটি উটও জবাই করা হলো। সেখানে আমরা এক দিন অবস্থান করেছিলাম। সেদিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উটের গোশত খেতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের সব শিখিয়ে দিচ্ছিল। সোমালিরা অর্ধসিদ্ধ উটের গোশত খেতে ভালোবাসে। কিন্তু আমরা তা খেতে পারতাম না। এই নিয়ে যুবকদের মধ্যে খুব রসিকতা হতো। আমাদের সফরসঙ্গী আব্দুস সালাম রাজী ভাই মিশরি ভাইদের সাথে মজা করতেন। তাদের বলতেন, 'আমাকে এক টুকরো গোশত দিন, দেখি আপনাদের খাওয়ার উপযোগী হয়েছে কি না।' আমরা হেসে লুটিয়ে পড়তাম। কারণ, তিনি গোশত নিয়ে পরীক্ষা করতেন না, নিজেই খেয়ে ফেলতেন।

এই দীর্ঘ পথে আমরা মাত্র দুইটি গ্রামের দেখা পেয়েছিলাম। গ্রামদুটিতেও কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল না। ছন আর খড় দিয়ে বানানো ঘর। প্রথম গ্রামটি 'গুদ আসবু' নামের এক লবণ উপত্যকায় হওয়ায় এর নাম হয়ে গেছে 'করয়াতুল মিলহ বা লবণের গ্রাম'। গ্রামের পাশে প্রবাহিত পানির স্বচ্ছ ধারা দেখে আমরা চুম্বকের গতিতে গ্রামে উপস্থিত হলাম। পানি দেখে আমরা যারপরনাই আনন্দিত ছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম, এই গ্রামের পানি সমুদ্রের পানির থেকেও বেশি লবণাক্ত। গ্রামের অধিবাসীরা এই পানি থেকে লবণ সংগ্রহ করে। আল্লাহর কী অপার মহিমা। ওগাদেন এলাকায় সমুদ্রের কোনো ছিটেফোঁটাও নেই, কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি চান। বালুময় এই মরুভূমির মাঝে নদীর মতো বয়ে চলেছে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর কুদরত।

**إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب**

'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।' [সূরা আলে ইমরান (৩): ১৯০]

গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে সেনাবাহিনীর একটি ল্যান্ড রোভার গাড়ি দেখতে পাই। আমাদের যাওয়ার খবর শোনামাত্রই তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। বেদুইনরা খবর ছড়াতে ওস্তাদ। ইন্টারনেটের চেয়েও দ্রুত গতিতে তারা খবর ছড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় যে গ্রামটিতে আমরা গিয়েছিলাম, তা শাবিল উপত্যকার পাশেই অবস্থিত। শাবিল হলো সোমালিয়ার প্রসিদ্ধ একটি নদী। 'আবাকোরো' নামের এই ছোট গ্রামটি ওগাদেনের রাজধানী গুদি ও ইমি শহরের মাঝখানে অবস্থিত।

নদী পার হওয়ার জন্য ভাটার অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। [এই ফাঁকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে নেওয়া দরকার ছিল।] সোমালিদের সাথে আমার গায়ের রঙের মিল থাকায় কেবল আমিই গ্রামে ঢুকতে পেরেছিলাম। গ্রামের বাজার থেকে চিনি, পাস্তা (এই দুটোই সোমালিদের প্রধান খাবার), টমেটো আর আবু ওয়ালাদ ইয়ামানী বিস্কুট কিনলাম। বাজারে অবশ্য এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদিও পুরো বাজারে কেবল ছনের ঘরই ছিল, তবু আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো অত্যাধুনিক সুপার শপে ঢুকেছি। নদীর তীর থেকে মিঠা পানির কিছু মাছও কিনলাম। নদীতে তখনও জোয়ার থাকায় দড়ির সাঁকো বেয়ে আমরা নদী পার হলাম। গ্রামে টিগ্রে বাহিনীর দেখা মেলেনি। তারা সাধারণত শহরে ঘাঁটি স্থাপন করত আর নির্ধারিত সময়ে টহল দিতে বের হতো। আবাকোরো গ্রাম থেকে কারিশিগোত অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের কাঙ্ক্ষিত ট্রেইনিং ক্যাম্পটি প্রায় ৯০ কিলোমটার দূরে অবস্থিত। এর দুই দিন পরে আমরা ক্যাম্পে পৌঁছাই। রমযানের ২৪ দিনের পথচলা শেষে আমাদের এই দীর্ঘ সফরের সমাপ্তি হয়।'

যেহেতু সোমালিয়ায় আল-কায়েদার আগমনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষণ প্রদান, তাই এ বিষয়ে হারুন ফযলের বই থেকে আমরা একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। দেখার চেষ্টা করব, সেই কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল-কায়েদার ভাইয়েরা কীভাবে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং এমন কিছু লোক তৈরি করেছেন, যারা আজ অবধি ইথিওপিয়ান আগ্রাসন আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়ে যাচ্ছেন। হারুন ফযল রহ. লেখেন—

'ট্রেইনিং ক্যাম্পটি বানানো হয়েছিল কারিশিগোত নামের এক জায়গায়। এই নামটির অর্থ করলে দাঁড়ায়—পাহাড়ি গুহা। মোট প্রশিক্ষণার্থী ছিল তিনশ'র বেশি। তাদের মধ্যে ১৫০ জন প্রশিক্ষণ নিত আর বাকি ১৫০ জন পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়ায় পাহারার দায়িত্ব পালন করত। প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স হিসেবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। পাঁচজন প্রশিক্ষককে এই পাঁচ গ্রুপের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশিক্ষকরা হলেন—ডক্টর হামাদী, আব্দুস সবুর, খালেদ হাবীব, সুলাইমান সা'দুফ ও আব্দুস সালাম ইয়ামানী। জামাতের আমীর ও নায়েবে আমীর নির্দিষ্ট কোনো দলের দায়িত্ব না নিয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকেন। খুলাফায়ে

রাশিদীন ও আশারায়ে মুবাশশারার নামানুসারে দলগুলোর নাম দেওয়া হয়। পাঁচটি গ্রুপের নাম ছিল—আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবি তালিব ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) গ্রুপ।

পুরো প্রশিক্ষণটিকে দুই পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথমে ৪৫ দিনের প্রাথমিক পর্ব। এই পর্বে যুবকদের বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর শুরু হবে ১৫ দিনের বিশেষ পর্ব। দুই মাসের এই প্রশিক্ষণ শেষে যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করে কয়েকটি প্লাটুন তৈরি করা হবে।

যুবকদের জন্য এগুলো ছিল একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। তাই প্রথম দিকে তাদের ভালোই কষ্ট হচ্ছিল। এ ছাড়া ভাষার ভিন্নতার কারণে কথাবার্তার ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছিল। তাই প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একজন করে দোভাষী নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে খাতা ও কলম দেওয়া হয়েছিল। ছনের ঘরে ক্লাস হতো। না ছিল কোনো লেখার বোর্ড, আর না শিক্ষার অন্য কোনো উপকরণ। অবস্থা দেখে যে কেউ এটাকে পাগলামিই মনে করত। এ ছাড়া আরও বড় একটি সমস্যা ছিল। এমন কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী ছিল, যারা একেবারেই লেখাপড়া জানত না। জীবনে হয়তো কখনো কলম পর্যন্ত ধরার সুযোগ হয়নি। তাই একটি বিষয় শিখতে তাদের অনেক সময় লাগত। প্রশিক্ষক ভাইয়েরা সামরিক বিদ্যা শেখানোর পাশাপাশি তাদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সাধারণ শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করতেন। প্রতিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতার মান নির্ধারণের জন্য সবাইকে একটি করে রিপোর্ট বই দেওয়া হয়েছিল। নির্ধারিত বিষয়ে কার অর্জন কতটুকু, তা এতে লিখে রাখতে হতো। নির্ধারিত বিষয়গুলো ছিল—হালকা অস্ত্র, বিস্ফোরক, পিকে ও এইচকে মেশিন গান, আরপিজি, শরীরচর্চা এবং ডিসিপ্লিন (যা প্রাথমিক স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)। এ ছাড়া শরয়ী ও আখলাকী ক্ষেত্রেও প্রত্যেককে মূল্যায়ন করা হতো।

প্রথম পর্ব শেষে দুই দিন বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে প্রত্যেকের রিপোর্ট তৈরি করা হয়। তারপর প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট বইয়ে থাকা উন্নতি-অগ্রগতির রিপোর্ট সামনে রেখে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল—হালকা অস্ত্র, স্নাইপার, আরপিজি, ভারী মেশিনগান, বিস্ফোরক, মর্টার, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্স্ট এইড, টপোগ্রাফি ও রেকি।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় কঠিন শারীরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। সকালের নাস্তার পর সকলে এক জায়গায় জমায়েত হতো, সকলের উপিস্থিতি নিশ্চিত করার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রশিক্ষকের সাথে নির্ধারিত স্থানে চলে যেত। সেখানে প্রশিক্ষকরা নির্ধারিত

বিশেষ অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিতেন, যেন শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।'

ভাইদের এই মুবারক মেহনত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য মুহতারাম হারুন ফযল নিজের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন—

'এই প্রশিক্ষণটিকে সফল বানাতে সকলেই সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে চেষ্টা করছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইথিওপিয়ার ইসলামী আন্দোলনের জন্য এই প্রশিক্ষণটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে উপস্থাপন করা। ১২ জন যুবকের দুটি গ্রুপকে স্নাইপার ও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রাইফেলের (RPG 2 & 7) বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। সকালে ও সন্ধ্যায় আলাদাভাবে আমি তাদের সময় দিতাম। স্নাইপারের জন্য প্রধান ৪টি রাইফেলের প্রশিক্ষণ দিতাম। প্রসিদ্ধ রাশিয়ান ড্রাগনভ স্নাইপার রাইফেল, জার্মান G3 ব্যাটেল রাইফেল, রাশিয়ান লং ব্যারেল SKS ও বেলজিয়ান FN FAL রাইফেল। মূলত আমাদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো রাইফেল ছিল না। তা ছাড়া আমাদের কোনো ফিল্ড গ্লাস (স্নাইপারের সাথে ব্যবহারের জন্য বাইনোকুলার) না থাকায় খালি চোখেই প্রশিক্ষণ করতে হতো।

প্রশিক্ষণের কারিকুলাম ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। আমি প্রথমেই তাদের তাত্ত্বিক দিকগুলো বুঝিয়ে দিতাম। রাইফেল খোলা ও জোড়া লাগানো, ট্রিগারের সংবেদনশীল দিক ইত্যাদি। তারপর সবার চোখ বেঁধে দিয়ে অস্ত্র খুলতে ও জোড়া লাগাতে বলতাম। অস্ত্রের ত্রুটি, তা ঠিক করার পদ্ধতিও শেখাতাম। প্রশিক্ষণ শেষে নিশ্চিত হয়ে নিতাম—অস্ত্র কীভাবে কাজ করে, অস্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা, ঠিক করার পদ্ধতি—সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে কি না। এরপর শুরু হতো প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা, শহর-বন-খোলা জায়গা ও পাহাড়ে উপযোগী স্থান নির্বাচন করা, বাইনোকুলারের ব্যবহার (তাত্ত্বিকভাবে), মিলিটারি র‍্যাংক দেখে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যক্তিদের চেনার পদ্ধতি, আঞ্চলিক পরিবেশের সাথে মিল রেখে ছদ্মবেশ ধারণ, মরুভূমি-বনাঞ্চল-শীতপ্রধান অঞ্চল-সহ যে-কোনো আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়া, ক্যামোফ্লাজের (জরুরি মুহূর্তে আশপাশের গাছপালা বা প্রাকৃতিক রঙের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা) জন্য উপযুক্ত রং বাছাই করা এবং সবশেষে স্নাইপারের রিকোয়েল[১০] নিয়ন্ত্রণ করা শেখানো হতো। তারপর লং টার্গেটে শুটিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বাইনোকুলার ছাড়াই ২০ থেকে ৪০০ মিটার দূরত্বে শুটিং প্র্যাকটিস করানো হতো। স্নাইপারের চোখের ধোঁকা সম্পর্কেও তাদের শিখিয়েছিলাম। কীভাবে বুঝতে পারবে

[১০] বন্দুক থেকে গুলি বের হওয়ার পরে বন্দুকে যে ধাক্কা লাগে তাকে রিকোয়েল বলা হয়।

চোখের ধোঁকা কোনটি এবং কীভাবে তা এড়িয়ে সঠিকভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হবে; দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে টার্গেট ঠিক করা, সর্বাবস্থায় অস্ত্র হাতের নিয়ন্ত্রণে রাখা, টার্গেটের জন্য ওত পেতে থাকা এবং টার্গেট সামনে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা-সহ যাবতীয় বিষয় শেখানো হতো।

এমনইভাবে চলন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা, দূরত্ব পরিমাপ করা, উষ্ণতা ও বাতাসের অবস্থাভেদে উঁচুনিচু টার্গেট নির্ধারণের পদ্ধতি এবং রাতের বেলায় স্নাইপার শুটিংয়ের পদ্ধতি শেখানো হতো। বিভিন্ন দূরত্ব থেকে কার শুটিংয়ের দক্ষতা কেমন, তা সংরক্ষণ করে রাখা হতো। এই ট্রেইনিংয়ের সবচেয়ে ভালো দিকটি ছিল, প্রত্যেকে যে অস্ত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, প্রশিক্ষণ শেষে সেটাই তাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণের অস্ত্রটিই যেন তাদের আজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। কারণ, তারা সেগুলোর খুঁটিনাটি ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিল।

শিকার ছিল স্নাইপার ট্রেইনিংয়ের মজাদার একটি অংশ। শিকারের মাধ্যমে স্নাইপার শুটিংয়ের ব্যবহারিক চর্চাও কিছুটা হয়ে যেত। প্রত্যেক স্নাইপার শুটারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জীবিত প্রাণী টার্গেট করতে হতো। আমি তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র একটি বুলেট ব্যবহার করে হরিণ শিকার করে আনতে বলতাম। কেউ গুলি করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে ব্যর্থ হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। অনেকে খালি হাতে ফিরলেও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারার কারণে শাস্তি থেকে বেঁচে যেত।

প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার একদিন আগে সকলের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, স্নাইপার শুটিং ও ক্যামোফ্লাজের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন, টার্গেটের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অপেক্ষা করা ও ফিল্ড গ্লাস (বাইনোকুলার) ছাড়া ৩০০ মিটার দূর থেকে গুলি করার যোগ্যতা যাচাই করা। প্রথমে আমি তাদের একত্র করে প্রত্যেকের টার্গেট দেখিয়ে দিতাম। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত টার্গেটে নাম লিখে দেওয়া হতো। সাধারণত কাঠের তৈরি ডামি টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা হতো। নিয়ম ছিল, এমন স্থানে গুলি লাগাতে হবে, যেন লাগার সাথে সাথে মৃত্যু হয়। যেমন: মাথা, বুক, হৃদপিণ্ডের স্থান অথবা ঘাড়। অর্থাৎ এক গুলিতেই মেরে ফেলতে হবে। প্রত্যেককে তিনটি করে বুলেট দেওয়া হতো। পরীক্ষা শুরু হওয়ামাত্রই সবাই লুকিয়ে যেত। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে লুকিয়ে অস্ত্র প্রস্তুত করত, ক্যামোফ্লাজ তৈরি করত আর প্রত্যেকের নাম লেখা ডামি টার্গেটগুলো সামনে আসার অপেক্ষায় থাকত। কিছুক্ষণ পর প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ডামিগুলো মাত্র ৫ সেকেন্ডের জন্য সামনে আনা হতো। এর মধ্যেই গুলি করে লক্ষ্যভেদ করতে হতো। এই প্রশিক্ষণ সকালে শুরু হতো আর রাত্রিকালীন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শেষ হতো। তারপর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য হরিণ শিকার করতে

পাঠানো হতো। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হতো এবং অস্ত্রের সাথে পরিচিতি আরও গাঢ় হতো।

আরপিজির প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য তাত্ত্বিক দিকটি অনেক বেশি জরুরি ছিল। এর ফলে ট্রিগার টানা, রিকোয়েল নিয়ন্ত্রণ করা, টার্গেটের দূরত্ব পরিমাপ করা এবং আরপিজির অপটিকাল সাইটের মাধ্যমে দূরত্ব নির্ধারণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারত। সাথে সাথে আমরা ট্যাঙ্কের দুর্বলতাগুলোও তাদের শেখাতাম। আরপিজির তাত্ত্বিক দিকগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তাদের শেখানো হতো। এ ছাড়া লাঞ্চার ও গ্রেনেড খোলা-লাগানোর পদ্ধতি, গ্রেনেডের খুঁটিনাটি যেমন: বুস্টার থেকে শুরু করে গ্রেনেডের ওয়ারহেডে থাকা বিস্ফোরক কীভাবে কাজ করে, আরপিজির বিভিন্ন ধরনের গ্রেনেডের মধ্যে কোনটি কীভাবে কাজ করে, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলে কীভাবে তা বিস্ফোরিত হয় আর আঘাত না হানলে কীভাবে বিস্ফোরিত হয়—এ সব শেখানো হতো। আরপিজির গ্রেনেড বিস্ফোরণ-প্রক্রিয়া তিন ধাপে সম্পন্ন হওয়ায় স্বাভাবিক অস্ত্র থেকে তা একটু জটিল। তাই আরপিজির ব্যাপারে সবকিছু বিস্তারিত শেখানো হতো। তারপর আরপিজির অপটিক্যাল সাইট ব্যবহার করে কীভাবে দূরত্ব নির্ণয় করতে হয়—তা-ও শেখানো হতো।

তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শেষে আমরা ফিল্ড প্রশিক্ষণ শুরু করতাম। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কসরত, অস্ত্র বহন, অস্ত্র নিয়ে হাঁটা ও দৌড়ানো, কভার দিতে থাকা PK ও HK মেশিনগানের সাথে সমন্বয় সাধন, আক্রমণকারী ইউনিটকে কভার দেওয়া, সহযোগীর সাথে যথাযথ বোঝাপড়া-সহ যাবতীয় বিষয় শেখানো হতো। সীমিত সামর্থ্যের কারণে আমরা কাঠ দিয়ে ভবন ও ট্যাংক বানিয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতাম, যেন দূর থেকেও টার্গেট দেখা যায়। দীর্ঘ শারীরিক কসরতের পরে ফায়ারিং প্র্যাকটিস করানো হতো। প্রত্যেককে দুটি করে গ্রেনেড ফায়ার করার সুযোগ দেওয়া হতো।

বিশেষ প্রশিক্ষণের দুই-তিন সপ্তাহ পর যোগ্যতার ভিত্তিতে সাথিদের বাছাই করার জন্য আবারও আমরা একত্র হতাম। সাথিদের যাচাই-বাছাই শেষে প্লাটুন গঠন করা হতো। প্রথম প্রশিক্ষণ শেষে আমরা মোট তিনটি প্লাটুন[১১] তৈরি করেছিলাম। প্রতি প্লাটুনে হালকা অস্ত্রে স্পেশাল ট্রেইনিংপ্রাপ্ত মোট ৩০ জন কমান্ডো রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল—পদাতিক ইউনিট, দু'জন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, দু'জন ফার্স্ট এইড বিশেষজ্ঞ, দু'জন স্নাইপার, রেকি ও টপোগ্রাফিতে অভিজ্ঞ দু'জন ভাই, প্লাটুন লিডার ও ডেপুটি লিডার, কভার দেওয়ার জন্য ভারী মেশিনগান চালাতে সক্ষম দু'জন ভাই, অ্যান্টি

[১১] প্লাটুন একটি মিলিটারি ইউনিট, যা সাধারণত দুই থেকে চারটি সেকশন বা স্কোয়াড্রন নিয়ে গঠিত হয় এবং এতে প্রায় ১৬ থেকে ৫০ জন সৈন্য থাকে।

ট্যাংক আরপিজি চালাতে সক্ষম দু'জন ভাই এবং একজন কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট ভাই। এভাবে ৪৫ জনকে নিয়ে একটি প্লাটুন তৈরি করা হয়েছিল।

প্রতিটি কোর্স শেষে একজন বিশেষজ্ঞ ভাইকে প্রশিক্ষক বানানোর জন্য নির্বাচন করা হতো। যেমন: স্নাইপার ও আরপিজির জন্য আমরা একজনকে বাছাই করে রাখি, যিনি ভবিষ্যতে প্রশিক্ষক হতে পারবেন। এমনইভাবে হালকা অস্ত্র, পিকে মেশিনগান, মর্টার ও বিস্ফোরকের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত ভাইদের আলাদা করা হতো। এভাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও টিম ওয়ার্কের পর সোমালি ভাইদের থেকেই আমরা নতুন ছয়জন প্রশিক্ষক পেয়ে যাই।

আমীর সাইফুল ইসলাম ও তার নায়েব আবু কুতাইবা ভাই সম্মিলিত প্রশিক্ষণগুলো দেখাশোনা করতেন। অ্যাম্বুশ, রেইড, উইথড্রয়াল (কৌশলগত পিছু হটা) ও অনুপ্রবেশের মতো ফিল্ড ট্যাকটিক্সগুলো প্রশিক্ষণের সময় আমরা উপস্থিত থাকতাম। প্রত্যেক প্লাটুন লিডার লিডারশিপের ওপর প্রশিক্ষণ নিত। কমান্ড দেওয়া, ম্যাপ অধ্যয়ন ও রিকনিসেন্স ইউনিট (অনুসন্ধানী দল) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, প্লাটুনের অধীন প্রতিটি সেকশন কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, (প্রতিটি সেকশনে ১০ জন পদাতিক সেনা থাকে), যুদ্ধ চলাবস্থায় বিস্ফোরক, ফার্স্ট এইড, মর্টার বা মেশিনগান কভারের প্রয়োজন পড়লে তা ব্যবহারের পদ্ধতি, স্নাইপার ও আরপিজি কখন ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের প্রশিক্ষণ নিত। এই সামরিক কৌশলগুলোর প্রশিক্ষণ শেষ হতে প্রায় দশদিন লাগত। এরপর যখন আমরা নিশ্চিত হতাম যে, প্লাটুনের সদস্যদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যে-কোনো আদেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে, সব ধরনের কৌশল ও ট্যাকটিক্স বুঝতে পারছে এবং তিন প্লাটুনের মাঝে যথাযথভাবে সমন্বয় হচ্ছে, তখন প্রশিক্ষণ শেষ হতো।

অবশেষে আল্লাহর রহমতে একজন ক্যাপ্টেন[১২], একজন ডেপুটি ও তিনটি প্লাটুন নিয়ে ওগাদেন যুবকদের প্রথম মিলিটারি কম্পানি[১৩] প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বের হয়। সাইফুল ইসলাম ভাই অত্যন্ত হিকমতের সাথে কম্পানি ও প্লাটুন লিডার নিয়োগের ক্ষেত্রে সোমালিয়ার গোত্রীয় দিকটি বিবেচনায় রাখেন। সোমালিয়ায় গোত্রীয় রাজনীতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া গোত্রীয় ভিত্তিতে সেনাবিন্যাসে শরয়ী নিষেধাজ্ঞাও নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গযওয়াগুলোতেও প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা পতাকা নির্ধারণ করা হতো। সার্বিক বিবেচনায় ওগাদেন

[১২] মিলিটারি র‍্যাংক। সাধারণত কম্পানি কমান্ডারকে ক্যাপ্টেন বলা হয়।

[১৩] একটি মিলিটারি ইউনিট। সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি প্লাটুন নিয়ে একটি কম্পানি গঠিত হয়।

গোত্র থেকে কম্পানি লিডার আর মোগাদিশুর আইদিদ গোত্র থেকে প্লাটুন লিডার নির্বাচন করা হয়।

ঈদুল আযহার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওগাদেনের রাজধানী গোদি থেকে ইমি, জিজিকা, দাকহাবুর, দির দাওয়া-সহ চারদিকে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছুদিন পরেই তারা টিগ্রে বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম শুরু করে দেয়। আমরা দূরে থেকে তাদের অপারেশনের হৃদয় প্রশান্তকারী সংবাদ শুনতাম। ময়দানের লড়াই ভালোভাবেই চলছিল। শত্রুবাহিনীকে বিভিন্ন গ্রামে আচমকা আক্রমণ আর অ্যাম্বুশের মাঝে ফেলে ধ্বংস করা হচ্ছিল। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার আর স্নাইপারদের বীরত্ব ছিল উল্লেখ করার মতো। শত্রুদের অস্ত্রবোঝাই ট্রাক আসতে দেখলেই তারা প্রথমে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে বা দূর থেকে বোম্বিংয়ের মাধ্যমে ড্রাইভারকে হত্যা করতেন, তারপর তাদের ওপর একযোগে আক্রমণ করা হতো। আমরা সাথে সাথেই ওয়াকিটকির মাধ্যমে খবর পেয়ে যেতাম। এভাবে কিছুদিন তারা যুদ্ধ করতে থাকে। পরে যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শুরুর সময় হয়, তখন পুরো বাহিনীকে ট্রেইনিং ক্যাম্পে ডেকে পাঠানো হয়।

এভাবে প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। নতুন প্রশিক্ষকরাও প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এই পুরো সময়ে মূল লক্ষ্য ছিল, ওগাদেন মুজাহিদদের নিয়ে পুরো একটি ব্যাটালিয়ন[১৪] তৈরি করা, যারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে নিতে পারবে। এ ছাড়া সোমালিদের মধ্য থেকে ১৮ জন প্রশিক্ষক তৈরি করাও উদ্দেশ্য ছিল। প্রাথমিক ফলাফল দেখে শায়খ আবু হাফস অনেক খুশি হন। মাত্র তিন মাসে এই ফলাফল ছিল অভূতপূর্ব।

অন্যদিকে সোমালিয়ার অভ্যন্তরে ভাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আল-কায়েদার যে দলটি গিয়েছিল, তারা আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর সাথে আলোচনা করে লুক শহরের কাছাকাছি আরমো শহরে একটি ট্রেইনিং ক্যাম্প খোলার ব্যাপারে একমত হন। কিন্তু বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে মুজাহিদদের সাথে ইত্তিহাদ নেতাদের বিরোধ তৈরি হয়। ভাই হামাদ (খালেদ ফাওয়ায) প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চাইলে ইত্তিহাদের নেতারা তাদেরকে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেন। ভাই হামাদের পরিবর্তে শায়খ সাইফ আল-আদল দায়িত্ব গ্রহণ করলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। সোমালিরা ভাবতে শুরু করে, আরব

[১৪] ব্যাটালিয়ন হলো প্রায় ৫০০-১৫০০ সৈন্যের একটি মিলিটারি ইউনিট, যা সাধারণত দুই থেকে ছয়টি কম্পানির সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং একজন লেফট্যানেন্ট কর্নেল এর অধিনায়কত্ব করেন।

মুজাহিদগণ তাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে, যেটা তারা মেনে নিতে পারছিল না। এভাবে দু পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তেই থাকে। অবশেষে শায়খ আবু হাফস হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, সোমালি যুবকদের নিয়ে একটি মিলিটারি কম্পানি এবং ৬ জন নতুন প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ট্রেইনিং শুরু হবে আর ভিনদেশি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না—এ ব্যাপারে আরব মুজাহিদগণ কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবেন না।

সমঝোতার ভিত্তিতে নতুনভাবে পথচলা শুরু হয়। প্রশিক্ষকগণ সবাই ক্যাম্পে উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, আবু উমাইর পাকিস্তানী, আমিরুল ফাতহ, আবু উবাইদা মৌরিতানী, আবুল হাসান সায়ীদী এবং বাহরাইনের এক ভাই। ওগাদেনে থাকা প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকেও অনেকে এখানে এসে শরীক হয়েছিলেন। দুটি প্রশিক্ষণ শেষে তারা ফিরে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন—সাইফুল ইসলাম, ডক্টর হামাদী, হারুন ফযল, সুলাইমান, খালেদ হাবীব ও আবু কুতাইবা। ওগাদেনের ভাইদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, এখানেও একই পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়। ফলে দুই মাসের মধ্যেই একটি কম্পানি ও ৬ জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক তৈরি হয়ে যায়।'[১৫]

প্রশিক্ষণ শেষে আল-ইত্তিহাদুল ইসলামীর মোগাদিশু শাখার সাথে মিলে আমেরিকার ওপর কয়েকটি হামলার পরিকল্পনা করা হয়। এই শাখার নেতৃত্বে ছিলেন শায়খ হাসান তাহের উয়াইস ও শায়খ আব্দুল্লাহ সাহল রহ.। পাশাপাশি দক্ষিণ সোমালিয়ার ওগাদেনি মুজাহিদদের সাথে মিলেও কয়েকটি পরিকল্পনা করা হয়। এ শাখার নেতৃত্বে ছিলেন শায়খ হাসান তুর্কি। মোগাদিশুতে একটি স্লিপার সেলও সক্রিয় ছিল। এর আমীর ছিলেন এক্সপ্লোসিভ স্পেশালিস্ট (বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ) শায়খ আবু আব্দুর রহমান মুহাজির। ভাই আবুল হাসান সায়ীদী-সহ আরও অনেকেই ছিলেন এই সেলে। এরপর শায়খ আবু হাফস, আবু মুহাম্মাদ মিসরীকে মোগাদিশু সেলের জিম্মাদার বানিয়ে পাঠান। এই স্লিপার সেলটিই ছিল সোমালিয়ার প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এর কিছুদিন পর শায়খ আবু হাফসের আদেশে হারুন ফযলও মোগাদিশু সেলে এসে যুক্ত হন।[১৬]

[১৫] আল-হারবু আলাল ইসলাম: হারুন ফযল।

[১৬] প্রাগুক্ত।



শায়খ আব্দুল্লাহ আহমাদ সাহল রহ.



শায়খ হাসান তুর্কি রহ.



শায়খ হাসান তাহের উয়াইস হাফি.

শায়খ আব্দুল্লাহ সাহলের নেতৃত্বে সোমালিদের কয়েকটি স্লিপার সেল মোগাদিশুর ভেতরে বিভিন্ন ফ্রন্টে সক্রিয় ছিল। তারাই রাস্তায় বোমা পুঁতে রাখত। হারুন ফযল দেখতে হুবহু সোমালিদের মতো ছিলেন। তাই তাকে সংবাদ সংগ্রহ করার কাজ দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবেও তিনি অসাধারণ কাজ করেছিলেন। মোগাদিশু বিমানবন্দরে অবস্থিত মার্কিন বাহিনীর ঘাঁটি সম্পর্কে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। মোগাদিশু বন্দরে মার্কিনিদের একটি ব্যারাক ছিল। সেখানে বিশ্রাম ও খাবারের জন্য তারা একত্র হতো। সেখানকার বেশকিছু ছবিও তিনি তুলেছিলেন। এ কাজের জন্য আরেক পক্ষের সাহায্য নিতে হতো তার। তিনি একটি কোম্পানির সহকারী পরিচালকের পরিচয় গ্রহণ করায় সহজেই বন্দরে ঢুকে মার্কিনিদের সাথে মিশতে পারতেন। এ ছাড়াও মোগাদিশুর সাহাফি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে তিনি একটি প্রেস সার্ভে পরিচালনা করেছিলেন। মার্কিন জেনারেল, সিআইএ'র সদস্য ও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আসা সাংবাদিকরা সাধারণত এই হোটেলেই অবস্থান করত।

সোমালিয়ায় সামরিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল আমেরিকার ওপর আঘাত হানা। জাতিসংঘের জোটভুক্ত অন্য কোনো দেশের সাথে যুদ্ধে জড়ানো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ব্যাপারে হারুন ফযল 'আল-হারবু আলাল ইসলাম'-এ লেখেন—

> 'মোগাদিশুর রাস্তা দিয়ে যখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর গাড়িবহর বের হতো, তখন মার্কিন বাহিনীকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সবার আগে থাকত সৌদি বাহিনী আর সবার পেছনে থাকত কুয়েত বা আরব আমিরাতের বাহিনী। আর মাঝখানে মার্কিন বাহিনী লুকিয়ে থাকত। কিন্তু আমাদের হামলায় সব সময় মরত তারাই। আমরা সাধারণত গাড়ি বোমা ব্যবহার করতাম না; বরং দূর থেকে বোমা হামলা করতাম অথবা যে রাস্তা দিয়ে শুধু মার্কিন বাহিনী যাতায়াত করত, সে রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখতাম। সোমালিয়ার সাধারণ

মানুষ এতকিছু বুঝত না। মার্কিনিদের দুর্দশা দেখে তারা বলত—'সব সময় শুধু ওরাই মরে কেন? ওদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহর গযব পড়েছে।'

আল-কায়েদার মুজাহিদদের সাথে মিলে সোমালিয়ার ভাইয়েরা যতগুলো অপারেশন করেছিলেন, তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বড় অপারেশন ছিল 'বন্দর অপারেশন'। এতে ১৮ জন মার্কিন সৈন্য মারা গিয়েছিল। মার্কিন বাহিনী জেনারেল আইদিদকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল। প্রতিউত্তরে জেনারেল আইদিদের বাহিনী দুটি আমেরিকান ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। এতে একজন পাইলট মারা যায়, তাকে মোগাদিশুর রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়। আরেকজন বন্দি হয়।



বন্দি মার্কিন পাইলট


মোগাদিশুর রাস্তায় নিহত মার্কিন পাইলটকে প্রদর্শনীর চিত্র

এই আক্রমণগুলোর কারণে ধীরে ধীরে আমেরিকার টনক নড়তে শুরু করে। তারা বুঝতে পারে, আফগানিস্তানে রাশিয়ার যে অবস্থা হয়েছে, সোমালিয়াতে তাদের একই অবস্থা হবে। আমেরিকা যদিও দাবি করছিল, তাদের যুদ্ধ বিদ্রোহী জেনারেলের বিরুদ্ধে, কিন্তু বাস্তবে এই যুদ্ধ ছিল পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে। এ কারণেই তাদের নিহতের সংখ্যা ৮০তে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সোমালিয়া থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তটি ছিল সোমালিয়ায় আমেরিকার পরাজয়ের ঘোষণা।

আল-কায়েদার ভাইয়েরা যখন সোমালিয়া ছেড়ে আসেন, ততদিনে সোমালিয়ার ভূমিপুত্রদের মধ্য থেকেই এমন একদল মানুষ তৈরি করে ফেলেছিলেন, যারা পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবিলায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শায়খ উসামা রহ. এক বক্তৃতায় সোমালিয়া সম্পর্কে বলেন—

'দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে আমেরিকা তার বাহিনী নিয়ে সোমালিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সোমালিয়ার ১৩ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপরেই আফগানি আরব সিংহরা গর্জে ওঠে। তারা সোমালিয়ার মুজাহিদীনের সাথে মিলে আমেরিকানদের ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্প করেন। তাদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তাদের হত্যা করেন, তাদের বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র গুড়িয়ে দেন এবং তাদের বিমান ভূপাতিত করেন। ফলে আমেরিকা ও তার দোসররা রাতের অন্ধকারে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।'[১৭]

পূর্ব আফ্রিকার সামরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কেনিয়াতে আল-কায়েদার বিশাল বিনিয়োগ ছিল। শহীদ শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী রহ. তা দেখাশোনা করতেন। তিনি কেনিয়া ও তানজানিয়াতেও আল-কায়েদার বিনিয়োগ বিস্তৃত করতে চাচ্ছিলেন। উপসাগরীয় দেশসমূহ থেকে গাড়ি আমদানি করার উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানিও শুরু করেছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি মূল্যবান পাথরের খনি কিনে ব্যবসা করার বিষয়েও তিনি গবেষণা করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। ভিক্টোরিয়া হ্রদে জাহাজডুবির শিকার হয়ে শায়খের মৃত্যু হয়,[18] রহিমাহুল্লাহ। ইথিওপিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা ও তানজানিয়ায় থাকা ইহুদীদের অর্থনৈতিক উৎসগুলোর ওপর আঘাত হানার জন্য এই অঞ্চলে মুজাহিদদের একটি সক্রিয় ইউনিট থাকা দরকার ছিল। শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী রহ. এ লক্ষ্যেও কাজ করছিলেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি একটি ইন্টেলিজেন্স ইউনিটও গঠন করেছিলেন। এই ইউনিটের মেহনতের ফলেই জিবুতিতে থাকা ফরাসি বাহিনী এবং উপসাগরীয় অঞ্চল, ইয়েমেন ও পূর্ব আফ্রিকায় থাকা মার্কিন বাহিনীর ব্যাপারে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

### ২. আলজেরিয়ার কার্যক্রম

আশির দশকের শেষ দিকে আলজেরিয়ায় চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। খাবারের জন্য সাধারণ মানুষ রাজপথে আন্দোলন শুরু করে। সে সময়ের এই আন্দোলনগুলো 'রুটি বিক্ষোভ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১৯] পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, যে-কোনো সময় গণআন্দোলন গণবিপ্লবে পরিণত হতে পারত। তৎকালীন আলজেরিয়ান প্রেসিডেন্ট শাযেলী বিন জাদীদ (শাদলি বেনজাদিদ) পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য একদলীয় গণতন্ত্রের অবসান

[১৭] শায়খ উসামার চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন।

[১৮] ১৯৯৬ সালের ২১শে মে কেনিয়ার ভিক্টোরিয়া হ্রদে ডুবে শায়খ রহ. ইন্তিকাল করেন। বোকোভা মোয়াঞ্জা নামের একটি জাহাজে উঠেছিলেন তিনি। জাহাজের যাত্রী ছিল মোট ৪৮০ জন। ধারণক্ষমতার চেয়েও বেশি যাত্রী ওঠানোয় জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল।

[১৯] বর্তমানে এই বিক্ষোভ 'অক্টোবর রায়ট ১৯৮৮' নামে পরিচিত।

ঘটিয়ে উদারপন্থি রাজনীতির ঘোষণা দেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। সেই সাথে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেন এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

১৯৬৩ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে কঠোরভাবে দমিয়ে রাখা হয়েছিল। শাযেলী সরকারের এই নমনীয়তার সুযোগে শায়খ আব্বাসী মাদানী আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া লিল-ইনকায (Front islamique du salut - FIS) গঠন করেন। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত সকল দলকে একত্র করে গণমানুষের বিশাল অংশগ্রহণের মাধ্যমে এফআইএস-এর যাত্রা শুরু হয়।

দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জাবহাতুল ইনকায (FIS) ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। ১৯৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম ধাপেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপেও বিশাল ব্যবধানে জয় লাভের সম্ভাবনা ছিল তাদের। দ্বিতীয় ধাপে বিজয় লাভ করলেই তারা সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু এরইমধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। ১৯৯২ সালের জানুয়ারির শুরুর দিকে ফ্রান্সের দালাল আলজেরিয়ান সেনাবাহিনীর জেনারেলরা ক্ষমতা দখল করে নির্বাচনের ফলাফলকে বাতিল ঘোষণা করে এবং দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে। সাথে সাথে দেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জাবহাতুল ইনকাযের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে ধরপাকড় শুরু করে। এ তালিকায় শীর্ষে ছিলেন—শায়খ আব্বাসী মাদানী রহ. এবং তার নায়েব আলী বেলহাজ হাফি.।



আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া লিল-ইনকাযের (FIS) নেতৃবৃন্দ

স্বাভাবিকভাবেই জাবহার সমর্থকরা এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে এভাবে স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। ঠিক এই সময়েই

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেওয়া হয়। হাজার হাজার যুবক এই ডাকে সাড়া দিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং অস্ত্রের তালাশ শুরু করে।

এরপর থেকেই সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সশস্ত্র দল তৈরি হয়ে আলাদা আলাদাভাবে জিহাদ শুরু করে। ১৯৯৪ সালের মে মাসে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দল আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ রহ.-এর নেতৃত্বাধীন আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মুসাল্লাহ (Groupe Islamique Armé বা GIA)-এর সাথে একীভূত হয়ে যায়। সে সময়টি ছিল আলজেরিয়ান জিহাদের ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়। দেশের বিশাল অংশের ওপর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। রাজধানী আলজিয়ার্স-সহ দেশের উল্লেখযোগ্য শহরগুলোতে দিনের বেলাতেই ঊর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের টার্গেট করে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করতেন মুজাহিদগণ। এই ধারাবাহিক বিজয়গুলো আসন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের বার্তা দিচ্ছিল।

আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলনের মধ্যে সফলতার সব শর্তই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাদের বিপুল জনসমর্থন ছিল। যারা সরাসরি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মতে ৮০%-৯০% জনগণই মুজাহিদদের পক্ষে ছিল। ভৌগোলিক অবস্থাও ছিল মুজাহিদদের অনুকূলে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পাহাড় ও বন ছিল দেশজুড়ে। ফলে সেখানে টিকে থাকাও ছিল সহজ। কৌশলগত দিক থেকেও আলজেরিয়া অনেক সুবিধাজনক স্থানে ছিল। যদি মুজাহিদগণ এখানে ক্ষমতা লাভ করতে পারতেন, তাহলে পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণের অন্যান্য দেশেও খুব সহজেই জিহাদকে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। এ সব কারণে আলজেরিয়ার ব্যাপারে মুজাহিদদের আশাও ছিল অনেক বেশি।

১৯৯৩ সালে সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আল-কায়েদার পক্ষ থেকে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহ. ও শায়খ আবু ইয়াসির জাযায়েরী হাফি. আলজেরিয়ায় আসেন। কয়েক মাস অবস্থানের পর তারা সুদানে ফিরে যান। ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহ. আবারও আলজেরিয়ায় আসেন এবং ১৯৯৮ পর্যন্ত এখানেই থাকেন। তখন শায়খ উসামা রহ. খার্তুমে থাকা GIA প্রতিনিধির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আমি শুনেছিলাম, GIA-এর বাড়াবাড়ি প্রকাশ পাওয়ার আগে শায়খ উসামা রহ. তাদের সামরিক সহায়তাও করেছিলেন। তাঁর পাঠানো অস্ত্রগুলো সুদান থেকে লিবিয়ার মরুভূমি দিয়ে আলজেরিয়ায় পৌঁছানো হয়েছিল। তবে এ তথ্যের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

কিন্তু পরিস্থিতি বেশিদিন পক্ষে থাকেনি। দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাস পরেই রহস্যজনকভাবে জিআইএ-এর আমীর শায়খ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ রহ.-এর মৃত্যু হয়। তার পরে জামাল যাইতুনী ওরফে আবু আব্দুর রহমান আমীন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দায়িত্বের শেষ দিকেই দলের মধ্যে উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেতে থাকে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে যায় যে,

হকার, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিকদের মত সাধারণ নাগরিক—সরকারের সাথে যাদের কোনো সম্পর্কই নেই—তাদেরকেও তারা তাকফীর করতে শুরু করে এবং হত্যার হুমকি দিতে থাকে। সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বন্দি ও হত্যার বৈধতা প্রমাণের জন্য ফতওয়া দেওয়ার মতো স্পর্ধাও তারা দেখায়। যাইতুনীর পর দায়িত্ব গ্রহণ করে আনতার যুওয়াবিরী। সে ছিল নিকৃষ্ট পূর্বসূরির নিকৃষ্ট উত্তরসূরি। তার নেতৃত্বেই আলজেরিয়াতে কয়েকটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।

জিআইএ-এর গোমরাহি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সে কঠিন সময়টি যারা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের লেখাজোখা পড়া যেতে পারে। যেমন: এ বিষয়ে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহ.-এর একটি সাক্ষাৎকার আছে, যা 'আত-তাহায়া ফাউন্ডেশন' থেকে 'আত-তাজরিবাতুল জাযাইরিয়্যাহ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এমনইভাবে 'মুআসসাসাতু ইফরীকিয়া আল-মুসলিমাহ'-এর তরফ থেকে শায়খ আসেম আবু হাইয়ান ফা.আ. এবং আকরাম আবু হিশাম মুজাহিদের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

আল-হিসবাহ নেটওয়ার্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়খ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহ.-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাদের প্রশ্নের জবাবে শায়খ রহ. আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলন তথা জিআইএ-এর ব্যর্থতার মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো—

১. আলজেরিয়ার জিহাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দুর্বল ও অস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ও পদ্ধতিগত (মানহাজগত) দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। এই বুনিয়াদি দুর্বলতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেত। যেমন: বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমী ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, ত্রুটিপূর্ণ ইলমী নেতৃত্ব, যোগ্য জিহাদী ও ইলমী ব্যক্তিত্বের অভাব, জিহাদ করতে আসা ব্যক্তিদের চিন্তা ও দর্শনের মধ্যে তুমুল বৈপরীত্য ইত্যাদি। এ কারণেই জিহাদী কাফেলায় নানা মাত্রার উগ্র চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির শিকার অনেকে যেমন কাফেলায় ঢুকে পড়েছিল, তেমনই চূড়ান্ত মাত্রার শৈথিল্যবাদীরাও ছিল কাফেলার সদস্য। তবে জিআইএ-এর অধিকাংশ সদস্য ছিল সাধারণ মানুষ। মোটকথা, দলে উগ্র চিন্তার বেশ ভালো প্রভাব ছিল; বরং কিছু কিছু অঞ্চলে দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থারও চর্চা ছিল।

২. আখলাকি সংকট। উল্লিখিত সমস্যাটির সাথে এর অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক রয়েছে। জিআইএ-এর যে অংশটি উগ্র চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, মূলত তারাই ছিল দলের হর্তাকর্তা। তাদের আখলাকি সংকট ছিল মারাত্মক পর্যায়ের। ইসলামের সুমহান আদর্শের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ ছিল। আচার-ব্যবহারে তারা ছিল মারাত্মক কঠোর ও নির্দয়। দয়া, মহানুভবতা ও ক্ষমার ছিটেফোঁটাও ছিল না তাদের মধ্যে। জ্ঞানীগুণিদের প্রতি

ছিল না কোনো সম্মানবোধ। এর সাথে অহংকার, আত্মতুষ্টি আর নিজেকে বড় মনে করার মতো আত্মিক ও আখলাকি রোগ তো ছিলই।

৩. সব সমস্যার মূলে ছিল নেতৃত্বের সংকট। নেতৃত্বই ছিল সব সমস্যার জড়। এই ভ্রান্ত নেতৃত্ব মানুষকে সঠিক পথ না দেখিয়ে ভুল পথে পরিচালনা করেছে। তাদের মধ্যে অজ্ঞতার চাষাবাদ করেছে, পথভ্রষ্টতার ব্যাপক প্রচার করেছে। নেতৃত্ব দ্বারা জামাল যাইতুনী ও আনতার যুওয়াবিরীর নেতৃত্ব বোঝানো হচ্ছে। এই দু'জনই নিজেদের অজ্ঞতাসুলভ উগ্র পথভ্রষ্ট নেতৃত্বের সময় নিজেদের মতো ব্যক্তিদের কাছে টেনেছে। ফলে অহংকারী, মূর্খ, উগ্র, নির্দয় ও দুনিয়ালোভী ব্যক্তিরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আর নেককার ও সৎ ব্যক্তিরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের এমনভাবে দমন করা হয়েছে, যেন তাদের কোনো চিহ্নই বাকি না থাকে। এমনকি অধিকাংশ সৎ ও নেককার ব্যক্তিকেই হাস্যকর সব অভিযোগে হত্যা করে হয়েছে।



শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ লীবী রহ.

**আলজেরিয়ার জিহাদ: কিছু শিক্ষা**

নিঃসন্দেহে আলজেরিয়ায় জিহাদের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ, একইসাথে বেদনাদায়ক। সুদীর্ঘ এই ইতিহাসে রয়েছে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ। এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা জরুরি। এর মধ্যে কিছু বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আলজেরিয়ার জিহাদের আগে ও পরে সংঘটিত অনেক আন্দোলনে এই বিষয়গুলো বারবার আমাদের সামনে এসেছে। সেগুলো হলো—

১. ইসলামের সাথে নূন্যতম সম্পর্ক আছে—এমন কোনো দলকেই মার্কিন নেতৃত্বাধীন জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার বিশ্বব্যবস্থা ক্ষমতায় যেতে দেবে না। স্বৈরাচার তাগুত শাসকগোষ্ঠীকে সহায়তার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে। কোনো ইসলামী

দল যদি আকীদা-বিশ্বাসের পরোয়া না করে চূড়ান্ত মডারেট হিসেবেও নিজেদের হাজির করে, তবু তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেবে না তারা। এর অনেক প্রমাণ আছে। সুদানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৮৯ সালে তার দল সুদানের ক্ষমতায় গিয়েছিল। ১৯৯১ সালে আলজেরিয়ার জাবহাতুল ইনকায এবং ২০১২ সালে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করেছিল। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা।

এ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই শায়খ উসামা রহ. নিজের কর্মপন্থা ঠিক করেছিলেন। মুজাহিদদের বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে সকলের সম্মিলিত শক্তি যুগের হুবাল আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিতেন। যে যুদ্ধের মৌলিক উপাদানগুলো এখনো অর্জিত হয়নি, এমন ব্যর্থ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে বারবার সতর্ক করতেন। আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরব (AQAP)-এর আমীর শায়খ আবু বাসীর (নাসির আব্দুল কারীম উহাইশী) রহ.-কে লেখা এক চিঠিতে জিহাদী কাজের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ উসামা রহ. লিখেছেন—

> ‘বর্তমানে আমাদের সকলের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরুই হবে বৈশ্বিক কুফরি শক্তিকে দুর্বল বানানোর মাধ্যমে।[২০] পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার কথা শুনলে তারা কিছুতেই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। আরববিশ্বের প্রধান চালিকাশক্তি ও ক্ষমতার মৌলিক উৎসগুলোর ওপর এখন বৈশ্বিক কুফরি শক্তির মাথা আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার ক্ষমতা এতটাই বেশি যে, আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারত আর ইরাকের শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। যদিও তার ক্ষমতা অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো এই পরিমাণ শক্তি তার আছে যে, বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে সে তা ধ্বংস করে দিতে পারবে। ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা অনেক পদ্ধতিই ব্যবহার করে দেখেছে। তবে তাদের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হলো—ইসলামী আন্দোলনকে উসকানি দিয়ে এমন যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা, যে যুদ্ধের মৌলিক উপাদানগুলো এখনো অর্জিত হয়নি। তাদের এই চক্রান্ত সফল হতে দেওয়া যাবে না। বরং আমরা আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো উন্মুক্ত ময়দানগুলোতে তাদের আটকে রাখব এবং ধীরে ধীরে তাদের শক্তি ক্ষয় করাতে থাকব। শক্তি হারিয়ে একসময় তারা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়বে যে, আমরা কোনো ইসলামী হুকুমত কায়েম করলে তা ধ্বংস করার ক্ষমতা আর তাদের থাকবে না। এই পরিস্থিতি

[২০] এই বইয়ের ‘মা’রাকাতুল আহরার’ শিরোনামের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যখন তৈরি হবে, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মুসলমানদের চেষ্টা-মেহনতকে একীভূত করে সম্মিলিত রূপ দেওয়া। কারণে-অকারণে যারাই জিহাদ থেকে দূরে ছিল, যথাসম্ভব তাদের সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসা। এরপর সকলে মিলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা। এতে কয়েক বছর সময় লাগলেও সমস্যা নেই।'[২১]

২. খারেজি নেতৃত্বের উত্থান: এতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার খোরাক রয়েছে। বিশেষ করে ইরাকের সাথে আলজেরিয়ার পরিস্থিতির অনেক মিল রয়েছে এ বিষয়ে। উভয় ময়দানেই হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও তালেবে ইলমদের অনুপস্থিতির কারণে ব্যাপকভাবে ইলমের ঘাটতি এবং শরীয়তের আহকাম ও সিয়াসাতে শরইয়্যাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ময়দানের নেতৃত্ব খারেজিরা নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যর্থতা আর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে পড়েছিল জিহাদের মুবারক এই আন্দোলন।

যে-কোনো আন্দোলনের জন্য ইলম ও উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি হলো ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি থেকে বাঁচার জামানত। আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে যদি ইরাক ও আলজেরিয়ার জিহাদকে তুলনা করি, তাহলে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। আফগানিস্তানে দীর্ঘ দুই দশক ধরে জিহাদ হয়েছে। তালেবান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হত্যা করা হয়েছে। কোটি কোটি ডলার, হাজারো বুদ্ধিজীবী, দক্ষ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আর প্রতারণার রাজনীতি ব্যবহার করেও আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো তালেবানকে নিজ আদর্শ থেকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারেনি। কিন্তু কেন? কারণ, তারা নিজ আদর্শ গ্রহণ করেছে কিতাব ও সুন্নত থেকে। তালেবানের সূচনালগ্ন থেকেই উলামায়ে কেরাম দক্ষ হাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন। তালেবান মুজাহিদরা মাদরাসায় বসে ইলম শিখেছেন। ইলম থেকে তাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ইলম ও খোদাভীতি তাদের যে পথে যেতে বলেছে, তারা সে পথেই চলেছেন। এ কারণেই দীর্ঘ এই সময়ে বিপদ-বিপর্যয় আর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখে দাঁড়িয়েও তারা অটল থাকতে পেরেছেন। সফলতা আর বিজয় তাদের পদচুম্বন করেছে।

শায়খ উসামা রহ. তাঁর জিহাদী জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। আফগানিস্তান থেকে সুদান, সুদান থেকে আফগানিস্তান—যখন যেখানেই ছিলেন, জিহাদের ময়দানে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণকে জরুরি মনে করেছেন। কারণ, জিহাদী আন্দোলনকে পরিচালনা করা আর বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে কেরাম হলেন নিরাপত্তা-প্রাচীরের মতো, বিশেষ করে যে-সকল উলামায়ে কেরাম হকের

[২১] অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস।

কালিমা বুলন্দ করার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করে কুরবানীর পথ বেছে নিয়েছেন। এ জন্যই তিনি কখনো ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, কখনো প্রতিনিধি বা চিঠি পাঠিয়েছেন। উম্মতকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে, জিহাদের ময়দানে স্বাধীনভাবে নিজেদের জিম্মাদারি আদায় করতে এবং ইসলামের পবিত্র ভূমি থেকে দখলদারদের প্রতিহত করতে বারবার তিনি উলামায়ে কেরামকে আহ্বান জানিয়েছেন।

### ৩. ফ্যাক্সযুদ্ধ

সুদান থেকে শায়খ উসামা রহ. যে কাজগুলো করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল ফ্যাক্সযুদ্ধ। দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে বশীর সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সাদ্দাম হোসাইনের হামলা থেকে বাঁচতে এবং কুয়েতকে মুক্ত করতে আরব শাসকশ্রেণি আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করেছিল। ওমর আল-বশীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, আরবরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। তার এই অবস্থানের কারণে আরব দেশগুলো তার বিরুদ্ধে চলে যায়। আলে সৌদ ছিল এই তালিকায় শীর্ষে। তারা বশীর সরকারকে দুর্বল করার জন্য দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহী খ্রিষ্টান বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহায়তা দেওয়া শুরু করে। শায়খ উসামা রহ. এই সুযোগকে কাজে লাগান। ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'হাইআতুন নাসীহা ওয়াল ইসলাহ' নামের এই সংস্থার সদর দপ্তর ছিল লন্ডনে।

সংস্থাটির উদ্দেশ্য ছিল, আরববিশ্বে মার্কিন দখলদারিত্বের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং সৌদি সরকার ও সরকারি ধর্মীয় সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে আমেরিকাকে সহায়তার বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরা। পাশাপাশি সৌদি শাসকদের দুর্নীতি, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে গভীর সম্পর্ক, হারামাইনের ভূমিতে ক্রুসেডারদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া-সহ তাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মানুষকে জানানো এবং আলে সৌদের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা।

তাদের এই কুকর্মের মুখোশ উন্মোচনের জন্য বিবৃতির পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই বিবৃতিগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সুদানে তৈরি করা হতো। সৌদি প্রশাসনের ভেতর থেকে শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে বিভিন্ন গোপন দলিলপ্রমাণ পাঠানো হতো। সেগুলো ব্যবহার করে বিবৃতিগুলো লেখা হতো। তারপর শায়খ উসামা রহ.-এর স্বাক্ষরসমেত বিবৃতিগুলো ফ্যাক্সের মাধ্যমে লন্ডনে অবস্থিত সংস্থার অফিসে পাঠানো হতো। সেখান থেকে এই বিবৃতিগুলো ফ্যাক্সযোগে সৌদির অবস্থাসম্পন্ন সৎ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হতো। লন্ডন থেকে বিবৃতি পাঠানোর এই কাজের দায়িত্বশীল ছিলেন ভাই খালেদ ফাওয়ায ফাক্কাল্লাহু আসরাহু।

দারুস সালাম ও নাইরোবি অপারেশনের অনেক আগেই ভাইয়েরা শায়খ খালেদ ফাওয়ায ফা.আ.-কে ব্রিটেন ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। শায়খ দেরি করে ফেলেছিলেন। এরইমধ্যে আমেরিকার নির্দেশে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮-এ ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে। দারুস সালাম ও নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয় তাঁর ওপর। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ কারাগারে বন্দিজীবন কাটানোর পর ২০১২ সালের অক্টোবরে তাঁকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হয়। আল্লাহ তাআলা দ্রুত শায়খের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।



শায়খ খালেদ ফাওয়ায ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

সুদান থেকে শায়খ উসামা রহ. গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রহ.-এর কাছেও পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি দীন ও উম্মাহর প্রতি শায়খের মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বাতিলের বাড়বাড়ন্ত, পথভ্রষ্টকারীদের আস্ফালন, হক ও হক্কানিয়্যাতের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন, দাঈদের গ্রেফতারি আর সংস্কারকামীদের চুপ করিয়ে রাখার এই কঠিন সময়ে তার কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। শায়খ চিঠিতে মনে করিয়ে দেন, এ সবকিছু তাঁর (শায়খ বিন বাযের) জ্ঞাতসারেই হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে শায়খের ফতওয়া ও অনুমতির ফাঁকফোকর ব্যবহার করেই এ সব কাজের বৈধতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অনেক উদাহরণও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, যেমন: বাদশাহ ফাহাদের জন্য ক্রুশ পরিধানের অনুমতি দিয়ে শায়খের ফতওয়া। এমনইভাবে কাফেরদের থেকে সাহায্য গ্রহণের শর্ত ও গ্রহণযোগ্য জরুরতের নীতির তোয়াক্কা না করেই শায়খ বিন বায আরও একটি ফতওয়া দিয়েছিলেন। তার সে ফতওয়ার আলোকেই কুয়েতকে স্বাধীন করার অজুহাতে হারামাইনের মাটিতে ইহুদী-খ্রিষ্টান জোটের দখলদারিত্বের বৈধতা

তৈরি করা হয়েছিল। ইয়েমেনে যখন কমিউনিস্টদের ওপর মৃত্যুর খড়্গ নেমে এসেছিল, তখন সৌদি প্রশাসনের পরামর্শে শায়খ বিন বায রহ. একটি নসীহতমূলক চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি কমিউনিস্টদের মুসলিম ঘোষণা করে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দিকে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের জীবন রক্ষার তাগিদ দিয়েছিলেন। তার এ সিদ্ধান্তের ওপর শায়খ উসামা রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করে চিঠিতে বলেন—'কমিউনিস্টরা কবে থেকে মুসলিম হলো? আপনারাই তো কিছুদিন আগে তাদের মুরতাদ ঘোষণা দিয়ে আফগানিস্তানে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাহলে কি আফগানের কমিউনিস্ট আর ইয়েমেনের কমিউনিস্টদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? আকীদা ও তাওহীদের চেতনা কি এতটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে?'

শায়খ বিন বাযের ফতওয়া ব্যবহার করেই সৌদির উলামা-মাশায়েখ, দাঈ ও উম্মাহর যুবকদের গ্রেফতারি-হয়রানি করার বৈধতা তৈরি করা হয়েছিল। ইহুদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বৈধতা দিয়েও শায়খ বিন বায ফতওয়া দিয়েছিলেন। তার সেই ফতওয়া জায়োনিস্ট প্রেসিডেন্ট ও তার পার্লামেন্ট সদস্যদের এতটাই খুশি করেছিল, তারা হাততালি দিয়ে এই ফতওয়াকে স্বাগত জানিয়েছিল। শায়খ উসামা রহ. এ সব ফতওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন—

> 'আপনারা হারামাইনের মাটিতে জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার বাহিনীর দখলদারিত্বকে শুধু বৈধতা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তৃতীয় হারামকেও (বাইতুল মাকদিস) এর মধ্যে টেনে এনেছেন। ইহুদীদের সাথে আরবের ভীতু ও ধোঁকাবাজ তাগুত শাসকদের আত্মসমর্পণের চুক্তির শরয়ী বৈধতা দিয়ে এর সমর্থন করেছেন। উম্মতের সামনে এ বিষয়টি উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও অসততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি উম্মতের জন্য মহা বিপর্যয় ডেকে আনবে। কারণ, বর্তমানের দখলদার ইহুদীরা এমন শত্রু না, যাদের সাথে সন্ধি করা জায়েয। কারণ, তাদের তো নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই আর তারা বাহির থেকে মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করেনি; বরং তারা দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রু। তাদের ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর এই কথা প্রযোজ্য হয়। তিনি বলেন—'ঈমান আনার পর দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোনো ফরয নেই। এর জন্য কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়। সাধ্যানুযায়ী তাকে প্রতিহত করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের ও অন্য মাযহাবের উলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।'

শায়খ উসামা রহ. চিঠির শেষে শায়খ বিন বায রহ.-এর প্রতি নিজের আন্তরিক নসীহত উল্লেখ করে লেখেন—

'উম্মতে মুসলিমা এবং আপনার মতো বরেণ্য উলামায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আপনাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দুঃসাহস করেছি। আপনাদের নিয়ে শাসকশ্রেণির নোংরা রাজনীতি, নিষ্ঠাবান দাঈ ও মুসলিহদের মুখোমুখি আপনাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া, আপনাদের ফতওয়া ও মতামত ব্যবহার করে হক ও হকের দাওয়াতকে দমিয়ে রাখার মতো নিকৃষ্ট কাজে সম্পৃক্ততা থেকে আপনাদের আমরা পুরোপুরি মুক্ত বলেই বিশ্বাস করি। তাই আপনারাও আল্লাহকে ভয় করুন। এ সকল জালেম ও তাগুত থেকে নিজেদের দূরে রাখুন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'[২২]

শায়খ উসামা রহ.-এর পাঠানো এই চিঠিগুলোর মধ্যে একটি চিঠি সৌদি প্রশাসনকে সবচেয়ে বেশি চাপে ফেলেছিল। চিঠিটির শিরোনাম ছিল—'মন্ত্রীসভায় রদবদল সম্পর্কে বাদশাহ ফাহাদ বরাবর খোলা চিঠি'। এই চিঠি সম্পর্কে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

'আমি মনে করি, এই চিঠিটি রিয়াদে অবস্থানরত মার্কিন দূতের ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই চিঠির কারণেই আমেরিকার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাদের কপটতা, ষড়যন্ত্র আর উম্মতের সম্পদ লুটপাটের বিষয়টিও এই চিঠির কারণেই প্রকাশ্যে এসেছিল। আল-কায়েদার ওপরেও এই চিঠির ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়েছিল। যদিও রিয়াদের গভর্নরের প্রতিবাদের মুখে অবশেষে এই চিঠির কারণেই সুদান থেকে আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।[২৩] কিন্তু এই চিঠির কারণেই নিজেদের অহংকার একপাশে রেখে খার্তুমের সাথে আপস করতেও তারা বাধ্য হয়েছিল। অথচ এর আগে পাঁচ বছর যাবৎ সৌদি শাসকগোষ্ঠী সুদানের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল। সুদান কর্তৃপক্ষ হাজারো চেষ্টা করেও সেই নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে পারেনি। এরইমধ্যে চিঠিটি প্রকাশিত হয়। পরক্ষণেই স্বয়ং রিয়াদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে জরুরি মিটিংয়ের আবেদন করে। সেই সাক্ষাতে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার টেবিলে থাকা এই চিঠিটি দেখিয়ে সুদানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছিল—"আপনারা যদি

[২২] রিসালাতুন ইলা ইবনি বায বি-বুতলানি ফাতাওয়াহু বিস-সুলহি মাআল ইয়াহুদ : শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.

[২৩] আমি বিশ্বাস করি, শায়খ উসামা রহ.-কে বের করে দেওয়ার ফলেই সুদানের দুর্গতির সূচনা হয়েছিল। আর কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকেছিল জামাল ফযল। ১৯৯৫ সালের শেষদিকে সে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে আল-কায়েদা ও শায়খ উসামা রহ. সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তাদের দেয়। এর ভিত্তিতেই আমেরিকা ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে সিআইএ-র বিশেষ ইউনিট বিন লাদেন ইস্যু স্টেশন বা অ্যালেক স্টেশন গঠন করে। প্রতিবেশী দেশসমূহ, বিশেষ করে সৌদির পক্ষ থেকে শায়খ উসামা রহ.-কে হস্তান্তর বা বহিষ্কার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সুদান যখন অনড় ছিল, তখন সরাসরি আমেরিকা সুদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা শুরু করে। সামনে জামাল ফযল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই চিঠিগুলো বন্ধ করতে পারেন, তাহলে ধরে নিন, আমাদের মধ্যকার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে।"[২৪]

আল্লাহ তাআলার রহমতে এই বিবৃতিগুলোর ফলাফল হারামাইনের মাটিতে প্রকাশ পেতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের সামনে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর মুখোশ খসে পড়তে থাকে। সৌদি প্রশাসন পাগলপারা হয়ে যায়। শায়খ উসামা রহ.-কে হস্তান্তরের জন্য সৌদি প্রশাসন সুদানের ওপর সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ভয়-ভীতি আর প্রলোভনের সব কৌশলই তারা ব্যবহার করে। কিন্তু সুদান কর্তৃপক্ষ এ সবে বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি। তারা শুধু শায়খ উসামা রহ.-কে নতুন কোনো বিবৃতি প্রকাশ না করার আবেদন করেছিল। ততদিনে ১৮টি বিবৃতি প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল।

### শায়খ উসামা রহ.-কে ফিরিয়ে নিতে সৌদি শাসকদের চেষ্টা

শায়খ উসামা রহ.-এর বন্ধু-বান্ধব এবং সৌদির প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অনেকেই মাঝে মধ্যে শায়খের সাথে দেখা করতে আসতেন। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন শায়খ রহ.-কে কোনোভাবে রাজি করিয়ে এ সব বিবৃতি প্রচার করা বন্ধ করান। তারা শায়খকে জিহাদ থেকে সরিয়ে সৌদিতে ফিরিয়ে নেওয়া এবং বাদশাহর সাথে সব ধরনের ভুল বোঝাবুঝি দূর করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টাও করেন।

সাংবাদিক জামাল খাশোগি ছিলেন শায়খের পুরোনো বন্ধু। তিনিও সুদানে গিয়ে শায়খের সাথে দেখা করেছিলেন। সৌদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি শায়খের একটি সাক্ষাৎকার নেবেন এবং এই সাক্ষাৎকারে শায়খ যেন চরমপন্থা থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেন—সে জন্য শায়খকে রাজি করাবেন। শায়খ রহ. যদি এতে রাজি হন, তবে সৌদি সরকার ধরে নেবে, শায়খ তাদের সব শর্ত মেনে নিতে রাজি আছেন। [কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হয়নি।]

এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে বাদশাহ ফাহাদ শায়খকে সৌদিতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আরও একবার চেষ্টা করে। বাদশাহর নির্দেশে শায়খের কয়েকজন ভাই—যাদের মধ্যে শায়খের বড় ভাই বকর বিন লাদেনও ছিলেন—এবং শায়খের মুহতারামা মা নিজস্ব বিমানযোগে একদিনেই তিনবার সুদানে আসেন। তারা বাদশাহ ফাহাদের পক্ষ থেকে শায়খের কাছে প্রস্তাব রাখেন, তিনি যদি সৌদি ফিরে যান, তাহলে তার সকল অপরাধ (?) মাফ করে দেওয়া হবে; ১৯৯২ সালে তার যত সম্পদ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল,

[২৪] অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস : চতুর্থ কিস্তি

সব তার মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে; সাথে সাথে তার পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

শায়খকে পারিবারিকভাবে চাপে ফেলার জন্য সৌদি প্রশাসন কৌশলের আশ্রয় নেয়। বিন লাদেন কোম্পানি সৌদি সরকারের কাছে দুই বিলিয়ন রিয়াল পাওনা ছিল। শায়খ উসামা রহ.-এর জিহাদী কার্যক্রমের কারণে সরকার পাওনা অর্থ পরিশোধ না করে আটকে রেখেছিল। বাদশাহ ফাহাদ প্রস্তাব দিয়েছিল, শায়খ যদি সৌদিতে ফিরে আসেন, তাহলে তাদের পাওনা অর্থ পরিশোধ করা হবে। যার কারণে শায়খ রহ. ভাইদের চাপের মুখে পড়েন। কিন্তু ঝড় যত শক্তিশালীই হোক না কেন, পাহাড়কে টলাতে পারে না। দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তিকে দুনিয়ার লোভ দেখালেও কাজ হয় না। শায়খ উসামা রহ. পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে তাদের সকল প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন।

আলে সৌদের তাগুতগোষ্ঠী কী-ইবা করতে পারত। তারা শায়খের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিল এবং বিন লাদেন পরিবারকে দিয়ে একটি মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করাল। তাতে বিন লাদেন পরিবার শায়খ উসামার সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলো। এই বিবৃতিটি যে পুরোটাই বানোয়াট, তারা যেন এ ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিতও না দেয়—এ জন্য তাদের হুমকি দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছিল।

এত কঠিন পরিস্থিতিতেও শায়খের মনোবলে একচুল পরিবর্তন আসেনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, শায়খ অনেক বেশি 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' পড়তেন। তাকে আমরা এমনটাই দেখেছি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি আমাদেরও এই শিক্ষাই দিতেন। তিনি বলতেন—'তোমরা বেশি বেশি হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল পড়ো।' তখনকার সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ উসামা রহ. বলতেন—

> 'আমেরিকা আমাদের চুপ থাকার বিনিময়ে দরকষাকষি করতে চায়। আমেরিকা আর তার আঞ্চলিক গোলামরা অসংখ্যবার আমার নীরবতাকে কিনতে চেয়েছে। তারা লোভ দেখিয়েছে—চুপ থাকো, তাহলে তোমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেব; তোমার সম্পদ ফিরিয়ে দেব; তোমার পরিচয়পত্র ফিরিয়ে দেব। এই সবকিছুর বিনিময়ে তারা শুধু এতটুকু চায়, আমি যেন চুপ থাকি। তারা মনে করেছে, মানুষ শুধু দুনিয়ার জন্যই বেঁচে থাকে। তারা ভুলে গিয়েছে, আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না করি, তবে আমাদের এই অস্তিত্বের কোনো মূল্যই নেই।'

### ৪. ইয়েমেনের কার্যক্রম

পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে, আফগানিস্তানে স্থির হওয়ার পর থেকেই শায়খ উসামা রহ. দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরুর পরিকল্পনা করছিলেন। শায়খের

উদ্দেশ্য ছিল, সৌদি ও উত্তর ইয়েমেন থেকে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সে সময় শায়খ তার প্রতিটি সভা-সেমিনারেই দক্ষিণ ইয়েমেনকে কমিউনিস্ট শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে নিজের দৃঢ় ইচ্ছার কথা আলোচনা করতেন। দক্ষিণ ইয়েমেনে জিহাদ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৮৮ সালে শায়খ সেখানকার কিছু ভাইকে বাছাই করে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে আস-সিদ্দীক ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে শুধু ইয়েমেন, বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনের ভাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এই ক্যাম্পের দায়িত্বশীল ছিলেন সালেহ জারব রহ. ওরফে ইবনে উমর হাযরামী।

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় ঘটে। এরপরেই তারা দক্ষিণ ইয়েমেনকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং উত্তর ইয়েমেনের সাথে একীভূত হওয়ার বিষয়ে তাদের কঠোর অবস্থান থেকে সরে আসে। এ ছাড়াও ভেতর ও বাইরের কিছু কারণে দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে উত্তর ইয়েমেনের সাথে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এ সব কারণে অবশেষে চুক্তিও হয়ে যায় এবং ১৯৯০ সালের মে মাসে ইয়েমেনের দুই অংশকে একীভূত করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।

যদিও একীভূত হওয়ার এই সিদ্ধান্তটি লোকদেখানো অন্তঃসারশূন্য একটি চুক্তি ছিল, তবু এর ফলে যে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছিল, তা দক্ষিণ ইয়েমেনের মুসলিমদের জন্য অনেক বড় একটি প্রশান্তির বার্তা ছিল, বিশেষ করে আফগানফেরত মুজাহিদদের জন্য। তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মসজিদে মসজিদে দরস ও খুতবার মাধ্যমে মানুষকে দীনের দিকে ডাকতে শুরু করেন। আমর বিল মারুফ, নাহী আনিল মুনকার ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকেন।

মানুষকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে শায়খ উসামা রহ. কয়েকজন ভাইকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে শায়খ আবু মাহদী আওলাকী (ইয়াসলাম বারাসীন), শায়খ সালেহ জারব (ইবনে উমর হাযরামী) রহ. এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। শায়খ আবু মাহদী রহ. ইয়াশবুম উপত্যকায় নিজ বাড়ির সামনে একটি তাঁবু টানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মানুষকে জিহাদের দাওয়াত দিতেন এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এ ছাড়াও মানুষকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আরও অনেকের অবদান রয়েছে। তাদের মধ্যে শায়খ আবু ফয়সাল রাযেহী, শায়খ আবুল গাইস হাদীদী, শায়খ আওয বানাজ্জার, শায়খ সাইদ বাতরাফি রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



শায়খ আওয বানাজ্জার রহ.



শায়খ আবু মাহদী আওলাকী (ইয়াসলাম বারাসীন) রহ.

শায়খ আবু মাহদীর জাদুকরি বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে তার ভক্ত-অনুরক্ত যুবকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। দুই ইয়েমেন এক হওয়ার সুবাদে যে স্বাধীনতা তৈরি হয়েছিল, সে কারণে প্রথমদিকে কমিউনিস্টরা যুবকদের এই দাওয়াতী কার্যক্রম মুখ বুজে সহ্য করে নিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তারা চেকপয়েন্ট তৈরি করে রাখছিল। ফলে ভাইদের জন্য স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

শায়খ উসামা রহ. চাচ্ছিলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিধি আরও ছড়িয়ে পড়ুক। এ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং দাওয়াতী সংগঠনের শায়খদের নগদ অর্থ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, গাড়ি ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা শুরু করেন, যেন তারা কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। জেদ্দায় শায়খের একটি ফার্মহাউজ ছিল। জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সেখানে জমা করতেন। ভারী ভারী মেশিন, গাড়ি ও খাদ্যসামগ্রী সব ছিল সেখানে। সেখান থেকে ইয়েমেনের মাশায়েখ ও যুবকদের কাছে পাঠাতেন।

দুই ইয়েমেন এক হওয়ার পর দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন আরও জোরালো হতে থাকে। উত্তর ইয়েমেনের সাধারণ মুসলমান, বড় বড় গোত্র ও হাযরামী ব্যবসায়ীদের বিশাল অংশ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ লালন করত। তারা ইয়েমেনের মাটি থেকে কমিউনিজমকে নির্মূল করার জন্য জিহাদী আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করতে শুরু করে। ঠিক এ সময়েই আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী দক্ষিণ ইয়েমেনের মুজাহিদদের বিরাট অংশ দেশে ফিরে আসায় এই জিহাদী আন্দোলনে এক অভাবনীয় গতি তৈরি হয়।



শায়খ তারেক ফাযালী



দুই ইয়েমেন একীভূত করার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী সালেম বাইযের সাথে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ (৩০শে নভেম্বর ১৯৮৯)

প্রথম দিকে ভাইদের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট নেতাদের হত্যা করা। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতাকে হত্যা করা হয়। শায়খ উসামা রহ. তখন সুদানে অবস্থান করছিলেন। শায়খের নির্দেশে আল-কায়েদার ভাইয়েরাও এই অপারেশনগুলোতে অংশ নেন। মুজাহিদদের পাশাপাশি কমিউনিস্টবিরোধী কিছু গোত্রের সাধারণ মানুষও এতে অংশ নিয়েছিল। দক্ষিণ ইয়েমেনে চালানো এই সিরিজ হামলায় কমিউনিস্টদের প্রথম সারির প্রায় একশ'র[২৫] মতো নেতাকে মুজাহিদগণ হত্যা করতে সক্ষম হন। এই অপারেশনগুলো অত্যন্ত গোপনভাবে কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সম্পন্ন করা হতো। ফলে দক্ষিণ ইয়েমেনের আলী সালেম বাইয-এর নেতৃত্বাধীন প্রশাসন উত্তর ইয়েমেনের প্রশাসনকে এই আক্রমণের জন্য দায়ী করতে থাকে। তারা দাবি করে, উত্তর ইয়েমেনের প্রশাসনই কমিউনিস্ট নেতাদের গুপ্তহত্যা করছে। এ নিয়ে দুই অংশের মধ্যে চরম বিরোধ তৈরি হয় এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের নেতারা উত্তর ইয়েমেন থেকে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই গুপ্তহত্যাগুলো এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা পালন করে। তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণেই ১৯৯৪ সালের ২০শে মে ইয়েমেনের দুই অংশের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়।

মুজাহিদদের পরিচালিত গুপ্তহত্যার কারণে দক্ষিণ ইয়েমেনের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল। ভাইদের পরিকল্পনা ছিল, একইসাথে একাধিক জিহাদী ময়দান চালু করা হবে। সে মতে শাবওয়া জেলার ইয়াশবুম অঞ্চল থেকে শায়খ আবু মাহদী আওলাকীর নেতৃত্বে একটি এবং আবয়ান জেলার পার্বত্য অঞ্চল মারাকেশা থেকে শায়খ তারেক ফাযালীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়

[২৫] পিটার উইলসন তার বই 'সাউদি আরাবিয়া: দ্যা কামিং স্টোর্ম'-এর ১৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন—১৯৯১ থেকে ১৯৯৩-এর মধ্যে দক্ষিণ ইয়েমেনের ১৫৮ জন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

আরেকটি বিদ্রোহ শুরু করা হবে। কিন্তু পরিস্থিতি হঠাৎই পরিবর্তন হয়ে যায়। ভাইদের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার আগেই একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। ইয়াশবুম অঞ্চলে কিছু ভাই অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে কমিউনিস্টদের একটি চেকপোস্টও ছিল। কমিউনিস্টদের সাথে মুজাহিদ ভাইদের আকস্মিক একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পরই সেখানকার মুজাহিদগণ 'কাউর আল-আওয়ালেক' পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তারা সংখ্যায় প্রায় ১০০ জন ছিলেন। কমিউনিস্ট বাহিনী পুরো পর্বতাঞ্চল ঘিরে ফেলে চারপাশে কামান, ট্যাঙ্ক ও রকেট লাঞ্চার স্থাপন করে। অনবরত গোলাবর্ষণে পুরো উপত্যকা পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আল্লাহর রহমত না থাকলে আক্ষরিক অর্থেই তা ভস্ম হয়ে যেত।

ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ আশঙ্কা করছিলেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই তিনি পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা এবং আওলাক গোত্রের গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে একটি মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করেন। কমিটির সাথে আলোচনা শেষে মুজাহিদরা বুঝতে পারেন, তারা একটি ব্যর্থ যুদ্ধ শুরু করেছেন। বিশেষ করে যখন তারা জানতে পারলেন, শায়খ তারেক ফাযালী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন আহমারের কথায় ভরসা করে পাহাড় থেকে নেমে গ্রেফতার হয়েছেন আর তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, তখন তারা বুঝতে পারলেন, কমিউনিস্টদের সামনে তারা একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়েছেন। মুজাহিদদের সাথে কমিটির আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, মুজাহিদগণ পাহাড় থেকে নেমে আসবেন, তাদের ভারী অস্ত্রগুলো মাটিচাপা দেবেন আর ব্যক্তিগত হালকা অস্ত্র নিয়ে সম্মানের সাথে উত্তর ইয়েমেনের মারিবে চলে যাবেন। মুজাহিদগণ নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এটা যে কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ নয়—তা প্রমাণ করার জন্য শর্ত দেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটির সদস্যরা তাদের সাথেই পাহাড় থেকে নামবেন। কমিটি শর্ত মেনে নিলে মুজাহিদগণ এক বিশাল গাড়িবহরে পাহাড় থেকে নেমে মারিবে পৌঁছান। সেখান থেকে তারা নতুনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করেন।

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে যখন উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়, তখন শায়খ উসামা রহ. আফগানফেরত মুজাহিদদের লড়াই করার জন্য দক্ষিণ ইয়েমেনে পাঠিয়ে দেন। শায়খ আব্দুল মাজীদ যিনদানীর নির্দেশনা অনুযায়ী তখন উত্তর ইয়েমেনের সকল ইসলামপন্থিই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ এত দ্রুত ভেঙে পড়ে যে, আন্তর্জাতিক কোনো মহলই এতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়নি। আলে সৌদ বা গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল—কেউই দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্টদের রক্ষা করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, বাদশাহ ফয়সালের শাসনামলে সৌদি সরকার 'জাইশুস সালাম' নামে একটি স্পেশাল ফোর্স গঠন করেছিল। দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট শাসকের অত্যাচার থেকে বাঁচতে যারা দেশ ছেড়েছিলেন, তারাই ছিলেন এই বাহিনীর সদস্য। উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণ ইয়েমেনের কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কিন্তু সাদ্দাম হোসাইন কুয়েত দখল করার পর আলী আব্দুল্লাহ সালেহ যখন সাদ্দামের পক্ষে অবস্থান নেয়, তখন এই বাহিনীই তার বিরুদ্ধে চলে যায়। এরপর যখন উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, তখন আলে সৌদ আলী সালেম বাইযকে একটি শর্তে সামরিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে রাজি হয়। শর্তটি ছিল, যাব্বা পোর্ট দিয়ে সৌদি পেট্রোল সরবরাহকারী পাইপলাইন স্থাপন করার অনুমতি দিতে হবে। চুক্তির ভিত্তিতে আলে সৌদ জাইশুস সালামকে কমিউনিস্টদের সাথে মিলে আলী আব্দুল্লাহ সালেহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইয়েমেন পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ দ্রুতই ভেঙে পড়ে। ফলে আলে সৌদের বিশেষ বাহিনীও কমিউনিস্টদের রক্ষা করতে পারেনি।

আল্লাহর রহমতে এবং মুজাহিদদের চেষ্টায় কমিউনিস্ট বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইয়েমেনের এই কমিউনিস্টরা কমিউনিজম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও এক ধাপ এগিয়ে ছিল। তারা দীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধে স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, উলামায়ে কেরামকে হত্যা করেছিল, পথে-ঘাটে তাদের নির্যাতন করেছিল, মুসলিম যুবক-যুবতীদের মধ্যে নাস্তিকতা ও উশৃংখলা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কতইনা সৌভাগ্যবান সেই যুবকরা, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে। তাদের জিহাদের বদৌলতেই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়েছে, দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে গেছে, মসজিদে ফের ধ্বনিত হয়েছে আযানের সুমধুর ধ্বনি, মসজিদ ভরে উঠেছে রুকু-সেজদাকারীদের সমাগমে, কুরআন হিফয করার নতুন ধারা সূচিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দীনী শিক্ষাকেন্দ্র। তাদের এই জিহাদ ছিল একটি নবজাগরণ। যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কল্যাণের প্রসার হয়েছে। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই।

ইয়েমেনের পবিত্র ভূমিজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই নতুন জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে তখন আল-কায়েদার নীতি ছিল, আলী আব্দুল্লাহ সালেহ সরকারের বিরুদ্ধে যে-কোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা হবে। বিভিন্ন দেশে শাসকদের জুলুমের শিকার মুজাহিদীন ও ইসলামপ্রিয় জনতার জন্য ইয়েমেনকে একটি নিরাপদ স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। শায়খ উসামা রহ.-এর এই সিদ্ধান্তের পেছনে কখনোই জিহাদ বন্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না, যেমনটা অনেকেই ধারণা করে থাকে; বরং এর পেছনে শায়খের অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল। শায়খের ইচ্ছা ছিল, ইয়েমেনের সাধারণ জনগণ ও দাঈদের মধ্যে জিহাদের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন তৈরি করা। জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য থাকবে অথবা

মুজাহিদগণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন—কোনোটিই শায়খ চাননি। শায়খ রহ. এটাও চাননি যে, বন্দিমুক্তি বা এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে ঘনঘন জিহাদে বের হওয়ার কারণে গণমানুষের কাছে জিহাদ শুধুই আবেগ ও জযবার বিষয়ে পরিণত হোক।[২৬]

সংক্ষেপে বললে, শায়খ উসামা রহ. সকলকে, বিশেষ করে মুজাহিদদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস, সুস্পষ্ট আদর্শ আর জিহাদের একটি ব্যাপক ও গভীর লক্ষ্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন। তা হলো, জাযীরাতুল আরবে মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন দখলদার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতি মনোযোগী হওয়া। শায়খ উসামা রহ. ইয়েমেনের শান্ত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ইয়েমেন ও ইয়েমেনের অধিবাসীরাই জাযীরাতুল আরবে ইসলামের প্রধান অস্ত্র। ইয়েমেনই এমন ভূখণ্ড, যেখান থেকে মার্কিনিদের বিরুদ্ধে জিহাদী কার্যক্রম চালানো সম্ভব। তা ছাড়া ইয়েমেনে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র মজুদ আছে, যা খুব সহজেই সৌদিতে নিয়ে যাওয়া যাবে।

এর প্রমাণ হলো, আল-কায়েদা যখন মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানা শুরু করে, তখন প্রথম হামলাটিই হয়েছিল ইয়েমেনে। ১৯৯২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এডেনের গোল্ড মহুর হোটেল ও মোভেনপিক হোটেলে এই হামলা চালানো হয়। এডেন বিমানবন্দরে রকেট হামলার কাছাকাছি সময়েই এই হামলাটি চালানো হয়েছিল। সে সময় সোমালিয়ায় মার্কিন হামলা জোরদার করার উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর বেশকিছু সৈন্য এই হোটেলগুলোতে অবস্থান করছিল।

এডেনের মোভেনপিক হোটেলে হামলাটি পরিচালনা করেন জামাল নাহদী। দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরকভর্তি ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এতে জামাল নাহদীর এক হাত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনাটি আমেরিকানদের জন্য সতর্কবার্তা ছিল। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিনিরা নিজেদের মাল-সামানা গুটিয়ে সমুদ্রে অবস্থানরত মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে গিয়ে ওঠে। জামাল নাহদী বন্দি হন। তার সাথে পাঁচজনের একটি টিমও গ্রেফতার হয়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা সবাই জেল থেকে পালিয়ে সৌদি আরব চলে যান। সেখানে তাদের জন্য ইয়েমেনের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তারা ভিসা নিয়ে সুদান চলে যান। সুদানে বছরখানেক অবস্থানের পর ১৯৯৪ সালে যখন ইয়েমেনের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে জিহাদ শুরু হয়, তখন তারাও ইয়েমেনে ফিরে আসেন এবং কমিউনিস্টবিরোধী জিহাদে অংশ নেন।

---

[২৬] এখানকার কিছু কথা শায়খ আবু মুসাআব সূরী ফা: আ:-এর প্রবন্ধ مسئولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم থেকে নেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আলী আব্দুল্লাহ সালেহ অনেক মুজাহিদ ভাইকে বিভিন্ন সরকারি চাকরির প্রস্তাব দেয়। সে বোঝানোর চেষ্টা করে, মুজাহিদগণ সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগে যুক্ত হলে এই বাহিনীগুলোকে ভেতর থেকে সংশোধনের সুযোগ পাবেন। তার এই প্রস্তাবে অনেক ভাই প্রভাবিত হয়ে উলামায়ে কেরামের কাছে এ ব্যাপারে ফতওয়া চান। কিছু উলামায়ে কেরাম সংশোধনের নিয়তে এই প্রস্তাব গ্রহণের পরামর্শ দেন। অবশেষে আলী আব্দুল্লাহ সালেহ কিছু মুজাহিদকে দলে টানতে সফল হয় এবং তাদেরকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল জেনারেল পিপলস কংগ্রেসের সদস্যপদ দান করে। সম্পদ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে তাদের আনুগত্য কিনে নেয়। তারপর থেকে এই মুজাহিদ ভাইয়েরাই তাগুতের সহকারীর ভূমিকা পালন করে আসছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের আফিয়াতের সাথে এ পথে অটল থাকার তাওফীক দান করুন, আমিন।

### ৫. ইথিওপিয়ায় হোসনি মোবারককে হত্যাচেষ্টা: জুন ১৯৯৫

মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় হত্যার চেষ্টা করা হয়। এই অভিযানে আল-কায়েদার ভাইয়েরা আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যার ভাইদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন ও অস্ত্র সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছিলেন। শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী রহ. এই অভিযানের যাবতীয় পরিকল্পনা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

মিশরের আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহর যে সেলটি এই আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, তারা সকলেই দুই বছর আগে থেকেই ইথিওপিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এই সেলের আমীর ছিলেন শায়খ মুস্তফা হামযা ওরফে আবু হাযেম। দারুস সালাম হামলার ইস্তিশহাদী মুজাহিদ আহমাদ আব্দুল্লাহ-সহ আরও অনেকেই এই সেলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তারা আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠাতব্য OAU (Organization of African Unity)-এর বার্ষিক সম্মেলনে আক্রমণ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। আক্রমণের জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রের ব্যবস্থা না করতে পেরে তারা শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে যোগাযোগ করেন। কালাশনিকভ ও আরপিজি রকেট লাঞ্চারের প্রয়োজন ছিল তাদের। শায়খ রহ.-ও অস্ত্র সরবরাহের ওয়াদা করেন।

শায়খ উসামার নির্দেশে ইথিওপিয়ায় থাকা আল-কায়েদার ভাইয়েরা আরপিজি রকেট লাঞ্চার ও কালাশনিকভের ব্যবস্থা করে ফেলেন। শায়খ উসামা রহ. আবু তালহা সুদানীকে আদ্দিস আবাবায় গিয়ে অস্ত্রগুলো গ্রহণ করে অভিযান পরিচালনাকারী ভাইদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেন। আবু তালহা সুদানীও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে আক্রমণকারী ভাইদের কাছে অস্ত্র পৌঁছানো হয়।

সে সময় এক ভাইয়ের কাছে কিছু অর্থ পাঠানোর জন্য শায়খ রহ. আমাকে আদ্দিস আবাবায় যেতে বলেন। যে ভাইয়ের কাছে অর্থ পৌঁছানোর কথা ছিল, তার একটি ছবি আর একটি টেলিফোন নাম্বারও আমাকে দেন। তখন আমি ভালোভাবে জানতাম না, ভাইয়েরা কী ধরনের আক্রমণ চালাবেন। আমার দায়িত্ব ছিল, যত দ্রুত সম্ভব টাকা পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসা। কথামতো সে ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তার হাতে টাকাগুলো তুলে দিই। সে ভাইয়ের সাথে হামলা পরিচালনাকারী সেলের আমীর শায়খ মুস্তফা হামযাও ছিলেন। হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর দুজনেই গ্রেফতার হন। আল্লাহ তাআলা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে কালাশনিকভ দিয়ে মোবারকের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হবে। যখনই মোবারকের গাড়ি সামনের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, তখন গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাহামলা করা হবে। তারপর রকেট লাঞ্চারের মাধ্যমে গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিমানবন্দরের কাছাকাছি জায়গা থেকে এক ভাই মোবারকের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বিমান থেকে নেমে গাড়িতে ওঠা থেকে শুরু করে গাড়িবহর বিমানবন্দর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি আক্রমণকারী ভাইদের জানাচ্ছিলেন। প্রধান সড়কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইথিওপিয়ান গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়াতে মূল সড়ক থেকে একটু দূরে একটি শাখা সড়কে আক্রমণকারী ভাইয়েরা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। ভাইয়েরা যেখানে অপেক্ষা করছিলেন সে জায়গাটি আক্রমণের মূল জায়গা থেকে সামান্য দূরে ছিল। কিন্তু, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন রকম। কালাশনিকভ নিয়ে যখন মোবারকের গাড়িতে আক্রমণ করার কথা, ঠিক তখনই ভাইদের গাড়িতে সমস্যা দেখা দেয়। কোনোভাবেই গাড়ি চালু করা যাচ্ছিল না, অথচ গাড়িটি ছিল একদম নতুন। এই অপারেশনের জন্য বিশেষভাবে তারা এটি কিনেছিলেন, যেন অপারেশনে কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় এবং হোসনি মোবারকের গাড়ি আসার সাথে সাথেই তারা দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছাতে পারেন। গাড়ি চালু না হওয়ায় অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রধান সড়ক পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। অস্ত্র নিয়ে তারা যখন বের হন, ইথিওপিয়ান বাহিনী তাদের দেখে ফেলে এবং ভাইদের লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে। ভাইয়েরাও মোবারকের দেহরক্ষীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। এতে তাদের কয়েকজন নিহত হয়। কিছু ভাইও শহীদ হন আর কয়েকজন বন্দি হন। মোবারক তার বিশেষ বুলেটপ্রুফ গাড়ি নিয়ে সম্মেলনের দিকে না গিয়ে বিমানবন্দরের দিকে চলে যায়। সম্মেলনের দিকে গেলে আইইডি (IED) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাকে হত্যা করার একটি সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু সেটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় আরপিজি দিয়ে আক্রমণ করার সুযোগটিও কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এভাবে

হোসনি মোবারক প্রাণ নিয়ে নিজ দেশে ফিতে যেতে সক্ষম হয়। নিশ্চয়ই কোনো প্রাণ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে না।

আল্লাহ তাআলা যদিও এই দুঃসাহসিক ইস্তিশহাদী আক্রমণকে বাহ্যিক সফলতা থেকে মাহরুম করেছিলেন, তবে এই আক্রমণ পরিচালনাকারী কয়েকজন ভাই আল্লাহর রহমতে বেঁচে ফিরতে সক্ষম হয়েছিলেন। আক্রমণের পর তারা কয়েকজন স্থলসীমা দিয়ে সুদানে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে অপারেশনের দায়িত্বশীল ভাই ও দারুস সালাম অপারেশন পরিচালনাকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ ভাইও ছিলেন। সুদানে তারা বেশিদিন অবস্থান করেননি। ভিসা ও পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে তারা ইরান হয়ে আফগানিস্তান চলে যান।

মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পেরেছিল, এই ভাইয়েরা সুদানে প্রবেশ করেছেন। তারা সুদান সরকারের ওপর ভাইদের আশ্রয় দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে। সাথে সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে তাদেরকে মিশর সরকারের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানায়। সুদান সরকার জোরালোভাবে এই আক্রমণের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা এবং ভাইদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে। মিশরের মুজাহিদ ভাইদের জন্য সুদানের ভূমি উন্মুক্ত করে দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক আগে থেকেই সুদানের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে সুদানকে একঘরে করে রেখেছিল মিশর। ফলে মিশর ও সুদানের মধ্যে আগে থেকেই অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এর মধ্যে এই ঘটনা ঘটায় দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এই ভাইদের হস্তান্তরের জন্য সুদানকে তিন দিনের সময় দেয়। অন্যথায় নিরাপত্তা পরিষদের চ্যাপ্টার ৭-এর অধীনে সুদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়, যা সুদানকে আরও চাপে ফেলবে। অবশেষে ভাইয়েরা মিডিয়ায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে সুদানে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে কৃত দাবিটি অস্বীকার করেন এবং তারা আফগানিস্তানে আছেন তা প্রকাশ করেন। এতে সুদানকে চাপে ফেলার সুযোগটি নিরাপত্তা পরিষদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

### ৬. চেচনিয়ার কার্যক্রম

১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় ঘটে। এরপরই সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া শুরু করে। এর মধ্যে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, ইউক্রেন, বেলারুশ-সহ আরও অনেক দেশ ছিল। অন্যান্য দেশের মতো চেচনিয়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল জওহার দুদায়েভের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭,৩০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট একটি দেশ চেচনিয়া। কিন্তু রাশিয়ার কাছে কৌশলগত গুরুত্বের কারণে চেচেনদের স্বাধীনতার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। ককেশাসীয় অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে চেচনিয়ার অবস্থান হওয়ায় চেচনিয়ার সাথে রাশিয়ার অনেক স্বার্থ জড়িত ছিল। কাস্পিয়ান সাগর থেকে উত্তোলন করা তেল রফতানির জন্য চেচনিয়ার ভেতর দিয়ে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত একটি পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রক্রিয়াধীন ছিল। এ ছাড়াও চেচনিয়ায় বিমানের জ্বালানি তেলের (জেট ফুয়েল) বিশাল মজুদ ছিল। খোদ রাশিয়ার ৯০% জেট ফুয়েল চেচনিয়া থেকেই আমদানি করা হতো। এর পাশাপাশি, চেচনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে রাশিয়ার ভেতরে থাকা বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিও নিজেদের স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু করতে পারে, এমন একটি আশংকাও রাশিয়া করছিল। যেমন: তাতারিস্তান ইত্যাদি। এ সকল কারণে চেচনিয়ার ওপর পুনরায় রুশ নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার জন্য রাশিয়া ছোট একটি বাহিনী পাঠায়। কিন্তু চেচেনরা সে বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ফলে রাশিয়া কিছুদিনের জন্য নীরব হয়ে যায়। কারণ, তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। আফগানিস্তানে প্রবেশ করার দ্বারা রুশ অর্থনীতি কী ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল—তা বোঝার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া যখন আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, তখন রাশিয়ান রুবলের মান ডলার থেকেও বেশি ছিল। কিন্তু আফগান যুদ্ধের পর ১৯৯৬ সালের জুলাইয়ে রুবলের দরপতন শুরু হয়ে এক ডলারের মূল্য ৫০০০ রুবলে গিয়ে ঠেকে।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া চেচনিয়ার ওপর পুনরায় আক্রমণ করে। এবার এক বিশাল বাহিনী পাঠায়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর[২৭] রাজধানী গ্রোজনি, গুডার্মেস ও আর্গুনের মতো বড় বড় শহর দখল করতে সক্ষম হয়। চেচনিয়ার গ্রামাঞ্চল থেকে পাহাড়ের চূড়া সব জায়গাতেই সৈন্য মোতায়েন করা হয়। প্রতিটি রাস্তা রুশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বন-জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বত ছাড়া মুজাহিদদের আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো জায়গাই তখন বাকি ছিল না।

এরপরেই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে আল্লাহর সিংহরা চেচনিয়ার ময়দানে এসে একত্র হতে থাকেন। এই যুদ্ধ আবারও প্রমাণ করে, এই উম্মাহ এক দেহের ন্যায়; যার একটি অঙ্গ ব্যথিত

[২৭] খাত্তাব ব্রিগেডের এক রাশিয়ান ভাই আমাকে বলেছিলেন, চেচেনদের আক্রমণে প্রথম রাতেই রুশ বাহিনীর মৃত্যুর সংখ্যা চার হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভাই প্রথম চেচেন যুদ্ধে চেচেনদের হাতে বন্দি হয়ে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দীন শেখার জন্য তাকে খাত্তাব ব্রিগেডের আরব ভাইদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি নিজের নাম রেখেছিলেন আব্দুলাহ। পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত নাযিল করুন। রাশিয়ার তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা সচিব আলেকজান্ডার লেবেড এই তথ্যের সত্যায়ন করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, প্রথম চেচেন যুদ্ধে রাশিয়ার ৯০ হাজার সেনা মারা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রথম চেচেন যুদ্ধ ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৯৬ সালের আগস্টে শেষ হয়। এতে রাশিয়া পরাজিত হয়ে চেচনিয়া থেকে বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়।

হলে সর্বাঙ্গেই নিদ্রাহীনতা ও উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। মহান মুজাহিদ কমান্ডার খাত্তাব তার পুরো ব্রিগেড নিয়ে চেচনিয়ায় হাজির হন।[২৮] হাকীম, ইয়াকুব, আবুল ওয়ালীদ গামেদী, আবু বকর আকীদা, আবু জাফর ইয়ামানী-সহ প্রায় ৩০ জনের মতো আরব ভাইও আসেন। এ ছাড়াও চেচনিয়া, দাগেস্তান ও তুর্কিস্তান থেকেও অনেক মুজাহিদ এসে উপস্থিত হন।

চেচেন বংশোদ্ভূত শায়খ আবু সাইয়াফ উরদুনী (ফাতহী মুহাম্মাদ হাবীব) রহ.-ও উপস্থিত হয়েছিলেন চেচনিয়ার ময়দানে। তিনি ছিলেন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। পেশোয়ারের বাবি অঞ্চলে তিনি একটি ইলেকট্রনিক ওয়ার্কশপ চালাতেন। আফগানের প্রবীণ মুজাহিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৯২ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে তিনি প্রথমে সুদান যান। সেখানে শায়খ উসামা রহ.-এর মেহমান হিসেবে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর জর্দানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। কিন্তু জর্দানে ঢুকতে না দেওয়ায় তিনি নিজ মাতৃভূমি চেচনিয়ায় চলে আসেন। চেচনিয়ার ময়দানে তার হাতে মুজাহিদদের বিশাল বিজয় অর্জন হয়। তিনি এখানে আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ নামে একটি জিহাদী জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। রুশবিরোধী জিহাদে এই জামাতের বিশাল অবদান ছিল।

শায়খ ফাতহী রহ. শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন চেচনিয়ার ময়দানে কিছু প্রশিক্ষক ভাইকে পাঠান। শায়খ উসামা রহ.-ও এই আহবানে সাড়া দেন। সোমালিয়া সফর থেকে ফিরে শায়খ উসামা রহ. পাঁচজন দক্ষ প্রশিক্ষক ভাইকে চেচনিয়া পাঠানোর জন্য নির্বাচন করেন। তারা হলেন—আবু ইসলাম মিসরী, ডক্টর হামদী (আবু উবাইদা), আবু সুহাইব সায়ীদী, শায়খ সা'দুফ ও শায়খ মাহমুদ। সকলেই ছিলেন মিশরের। আল্লাহ তাদের সকলের ওপর রহমত নাযিল করুন, আমীন। ১৯৯৫ সালের আগস্টে ভাইয়েরা চেচনিয়ায় প্রবেশ করতে সক্ষম হন।[২৯]

প্রশিক্ষক ভাইয়েরা চেচনিয়ায় পৌঁছে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান শুরু করে দেন। সর্বত্র রুশ বাহিনীর উপস্থিতির কারণে এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে জর্জিয়া সীমান্তের এক পাহাড়ে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা আর তুষারপাতের কারণে সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেননি। চেচেন ভাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার

[২৮] এই মহান মুজাহিদের পুরো নাম সাইফুল ইসলাম ইবনুল খাত্তাব (১৯৬৯-২০০২)। সৌদি আরবের নাগরিক এই মহান মুজাহিদ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। আফগান জিহাদ শুরু হলে সৌদির আরামদায়ক জীবন ছেড়ে আফগানের পাহাড়ি ভূমিতে চলে আসেন। তিনি আফগান, তাজিকিস্তান ও দাগেস্তানের জিহাদের ময়দানে শরীক হয়েছেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে রুশ বাহিনীর কূটচালে শাহাদাতবরণ করেন। [অনুবাদক]

[২৯] বইয়ের প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছিল, ভাইয়েরা ১৯৯৬ সালের আগস্টে চেচনিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। এটি ভুল ছিল। সঠিক হলো, তারা ১৯৯৫-এর আগস্টে চেচনিয়ায় ঢুকেছিলেন।

জন্য সবশেষে একটি পরিত্যক্ত গ্রাম খুঁজে বের করা হয়। রুশ বাহিনীর বোমা হামলায় পুরো গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেখানে ভাইদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।

চেচনিয়া যাওয়ার পর ডক্টর আবু উবাইদা ও আবু সুহাইব বেশিদিন বাঁচতে পারেননি। রুশ বাহিনীর এক চোরাগুপ্তা হামলায় তারা দু'জন শাহাদাতবরণ করেন। শায়খ আবু ইসলামও কিছুদিন পর শহীদ হয়ে যান। এরপর শায়খ মাহমুদও বেশিদিন আর চেচনিয়ায় থাকেননি। ১৯৯৭ সালে তিনি আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। ৯/১১-এর পর এক হামলায় শায়খ কমান্ডার আবু হাফস রহ.-এর সাথে শায়খ আবু ইসলামও শাহাদাতবরণ করেন। চেচনিয়া ছেড়ে আজারবাইজান যাওয়ার পথে দাগেস্তানে শায়খ সা'দুফ গ্রেফতার হন। দাগেস্তানের জেলে ছয় মাস বন্দি থাকার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে তিনি আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। পরবর্তিতে ওয়াজিরিস্তানে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন, আমিন।

## জামাল ফযলের ঘটনা ও শায়খ উসামা রহ.-এর সুদান ত্যাগ

শায়খ উসামা রহ.-এর সুদান ত্যাগের ঘটনা জানার জন্য একজন ব্যক্তির গল্প জানতে হবে। এই লোকটি শয়তানের মাথা আমেরিকার কাছে নিজের জীবন ও দীন বিক্রি করে দিয়েছিল। শায়খের সুদান ত্যাগের পেছনে সরাসরি এই লোকটিই ছিল দায়ী। সুদানি বংশোদ্ভূত লোকটির নাম ছিল জামাল আহমাদ মুহাম্মাদ ফযল, উপনাম ছিল আবু বকর সুদানী। কাজের সুবাদে সে আমেরিকায় থাকত। ১৯৮৮ সালে সে আফগানিস্তানে আসে। আফগান জিহাদ শুরুর পর একদম সূচনালগ্নে যারা হিজরত করেন, সে ছিল তাদেরই একজন। ভাইদের মনে তার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। ১৯৯১ সালে শায়খ উসামা রহ. যখন সুদানে চলে যান, তখন সে অন্য সবার আগেই সুদানে গিয়ে হাজির হয়। শায়খের নৈকট্য লাভের জন্য সে সব সময়ই চেষ্টা করত। শায়খ রহ.-ও বিভিন্ন কাজে তার সাহায্য নিতেন।

১৯৯২ সালের শুরুর দিকে যখন ত্ব-বা ট্রেডিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জামাল ফযলই ছিল কোম্পানির কমার্শিয়াল ম্যানেজার। অধম লেখক ছিলাম এই কোম্পানির হিসাবরক্ষক। যদিও সে সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিল, তবু কোম্পানির পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে ছলচাতুরির আশ্রয় নিত। ক্রেতাদের কম দামে পণ্য দেওয়ার কথা বলে তাদের থেকে অতিরিক্ত কমিশন গ্রহণ করত। যার কারণে অল্প দিনেই বেশ টাকাপয়সা জমাতে পেরেছিল। বাড়ি-গাড়িও করে ফেলেছিল। ছোটখাটো একটি তেলের ফ্যাক্টরিও চালু করেছিল।

১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক ক্রেতার মাধ্যমে তার বিষয়টি কোম্পানি জানতে পারে। তারপরও কোম্পানির পক্ষ থেকে জামাল ফযলকে কোনো ধরনের দোষারোপ করা হয়নি,

তার বিরুদ্ধে থানায় মামলাও দায়ের করা হয়নি। এমনকি এই অভিযোগের ব্যাপারে অভ্যন্তরীণভাবেও তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এভাবে সে তার পদে বহাল থাকে। অবশেষে ১৯৯৩ সালে সে নিজ থেকে পদত্যাগ করে কোম্পানি থেকে আলাদা হয়ে যায়।

পরে কোনো-না-কোনোভাবে এক ব্যাংক ম্যানেজারের সহযোগিতায় ৪০০ মিলিয়ন সুদানি পাউন্ড সুদবিহীন ঋণ নেয়। তৎকালীন সময়ে যার মূল্য ছিল প্রায় ২ লাখ ডলার। এই অর্থ দিয়ে সে বিপুল পরিমাণ চীনা বাদাম ক্রয় করে। তার ইচ্ছা ছিল, নিজ কারখানায় এগুলোর তেল বানিয়ে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করবে। চীনা বাদামের এই বিপুল মজুদ সে খোলা জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না। প্রবল বৃষ্টিতে তার চীনা বাদামের পুরো মজুদ নষ্ট হয়ে যায়। তার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়।

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সিরিয়া, জর্ডান, ইরিত্রিয়া আর সৌদি আরবে ঘুরতে থাকে। কিন্তু কোথাও স্থির হতে পারেনি। এখানে ওখানে ঘুরে হাত খালি হয়ে যাওয়ায় আর কোনো উপায় না পেয়ে মুজাহিদদের তথ্য দিয়ে ব্যবসা করার ইচ্ছা করে। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় না পেয়ে শয়তানের মাথা আমেরিকার কাছে আশ্রয় নেয়, নাউযুবিল্লাহ। মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে সে আত্মসমর্পণ করে। নিজেকে আল-কায়েদার সদস্য এবং শায়খ উসামা রহ.-এর আস্থাভাজন বলে পরিচয় দিয়ে তাদের জানায়, তার কাছে অনেক তথ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রাথমিকভাবে সে এই তথ্যগুলো দেয়—সোমালিয়ায় আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদা ও শায়খ উসামা রহ.-ই লড়াই করছেন, পূর্ব আফ্রিকায় আমেরিকানদের স্বার্থের ওপর তারাই হামলা চালাচ্ছেন, ১৯৯২ সালে ইয়েমেনে থাকা মার্কিনিদের ওপর হামলার জন্য আল-কায়েদা দায়ী। সে আরও জানায়, শায়খ উসামা রহ. রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এ ধরনের অনেক তথ্য সে তাদের সরবরাহ করে।

আমেরিকানরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হয়, আসলেই তার কাছে বিপুল তথ্য আছে। পরক্ষণেই তারা তাকে সরাসরি নিউইয়র্ক নিয়ে যায় এবং Witness Protection Program-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এভাবে এই জামাল ফযল হয়ে ওঠে মার্কিনিদের তথ্যের প্রধান উৎস। মার্কিনিদের হাতে যে মুজাহিদ ভাইয়েরা গ্রেফতার হতেন, সে তাদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর ভূমিকা পালন করা শুরু করে।

জামাল ফযলের আত্মসমর্পণের আগে আমেরিকা শায়খ উসামা রহ. ও আল-কায়েদার কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। তারা নিজেরাই এটি স্বীকার করেছে। এই হতভাগা তাদের সামনে তথ্যের বিপুল ভান্ডার পেশ করে। আফগানিস্তানে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদানে আসা পর্যন্ত এই দুই দেশ-সহ কেনিয়া, সোমালিয়া, চেচনিয়া, ইয়েমেন, আলজেরিয়া,

পূর্ব আফ্রিকা, সৌদি আরব, মিশর, আদ্দিস আবাবা ও বসনিয়াতে আল-কায়েদার যাবতীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে সে আমেরিকাকে তথ্য দেয়। আল-কায়েদা ও এর সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীন ও অন্যান্য মুজাহিদীন সম্পর্কে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই অনেকে গ্রেফতার হন। তাদের মধ্যে শায়খ আবু হাজের ইরাকী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু-ও ছিলেন। এ ছাড়াও সুদানে থাকা অন্যান্য জিহাদী জামাত, বিশেষত 'ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ' এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কেও বিপুল তথ্য দেয়। যেমন: সুদান থেকে অস্ত্র কিনে মরুভূমি দিয়ে মিশরে পাঠানো, মিশর থেকে সুদান হয়ে আফগানিস্তানে তাদের সদস্যদের আসা-যাওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ ও লিবিয়ার আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মুকাতিলাহ (LIFG) সম্পর্কেও তথ্য দেয়।

জামাল ফযলের দেওয়া তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে WPP-এর এক কর্মকর্তা ড্যান কোলম্যান বলেছিল: 'আমেরিকা যখন আল-কায়েদার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক তখন জামাল ফযল তাদের ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সে এমন এমন তথ্য সরবরাহ করেছিল, যা আমেরিকাকে আল-কায়েদার কৌশল ও কর্মপদ্ধতি বুঝতে সহযোগিতা করেছে।'[৩০]

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জেসিকা অস্টিন তার সম্পর্কে বলেছে: 'ম্যানহাটন আদালতে ফযল তার জবানবন্দিতে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে, তা পাবলিক রেকর্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার দেওয়া এই তথ্য আমাদের সামনে শত্রুর প্রকৃতি সম্পর্কে ধোঁয়াশা দূর করেছে। এর আগ পর্যন্ত আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।' সে আরও বলেছে: 'আল-কায়েদা একটি আমলাতান্ত্রিক সংস্থার মতো, যা পরিচালনা করে বিন লাদেন। তার অবস্থান অনেকটা কোম্পানির সিইও-এর মতো। আল-কায়েদার মজলিসে শূরা হলো কোম্পানির ট্রাস্টি বোর্ডের মতো।'[৩১]

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা অফিসাররা—তাদের সকলেই এখন অবসরপ্রাপ্ত—জানিয়েছেন, আমেরিকার ইতিহাসে জামাল ফযলের সবচেয়ে কাছাকাছি দৃষ্টান্ত হলো জোসেফ ভালাচি (Joseph Valachi)। সে এক মাফিয়া গ্রুপের সদস্য ছিল। পরে মাফিয়াদের থেকে পৃথক হয়ে ১৯৬২ সালে নিজের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে এবং

[৩০] সুদানাইল নামক ওয়েবসাইটে 'আস-সীরাতুল খফিয়্যাহ লিস-সুদানী জামাল আল-ফযল' শিরোনামে প্রকাশিত খালেদ মুসা দাফউল্লাহর লেখা প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। লিঙ্ক - https://tinyurl.com/23prhvkc

[৩১] পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

পুলিশকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। তার দেওয়া তথ্যের বদৌলতেই আমেরিকার নাগরিক জীবন ও সামাজিক শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি প্রসিদ্ধ সেই মাফিয়াচক্রের সমাপ্তি ঘটে।[৩২]



জোসেফ ভালাচি (সাবেক মাফিয়া সদস্য)



জামাল ফযল

এই হতভাগা যে তথ্যগুলো দিয়েছিল, তার অনেকগুলোই ছিল মিথ্যা আর বানোয়াট। আমেরিকানরাও পরে তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু আমেরিকানদের কাছে তার দেওয়া তথ্যগুলো অনেক গুরুত্ব বহন করত। বিশেষত ১৯৯৮-এর আগস্টে নাইরোবি ও দারুস সালাম হামলার পরে।

জামাল ফযল থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য পেয়ে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকা বিন লাদেন ইস্যু স্টেশন বা অ্যালেক স্টেশন গঠন করে। ২০০০ সালে নিউইয়র্কে নাইরোবি ও দারুস সালাম হামলার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ভাইদের বিচারকাজ শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধেও জামাল ফযলই ছিল প্রধান সাক্ষী। গ্রেফতার হওয়া ভাইদের মধ্যে ওয়াদী আল-হাজ লুবনানী, শায়খ আবু হাজের ইরাকী-সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। আল্লাহ যেন দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, আমীন। ৯/১১ হামলার পরে আমেরিকা আনুষ্ঠানিক যে বিবৃতিটি দিয়েছিল, সেটাও জামাল ফযলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আমদের সকল ভাইকে নিরাপদে রাখুন, আমীন।

আমেরিকার কাছে জামাল ফযলের আত্মসমর্পণের বছরখানেক পর আবুল ফযল মাক্কী (সায়্যিদী গাযী মাদানী তায়্যিব)-ও সৌদি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আবুল ফযল মাক্কী শায়খ উসামা রহ.-এর অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিল। শায়খ তার সাথে নিজের ভাগনির বিয়ে দিয়েছিলেন। তানজীমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তথ্য সে জানত। সৌদি ফিরতেই গোয়েন্দা সংস্থা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তার থেকে

[৩২] পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

শায়খ রহ. ও তানজীমের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর তথ্য বের করতে সক্ষম হয়। শায়খের জন্য কাজ করে এমন সকল ব্যক্তি, কোম্পানি ও অর্থনৈতিক প্রকল্পের ব্যাপারে সে বিপুল তথ্য প্রদান করে। পরে সৌদি সরকার আবুল ফযল মাক্কী থেকে পাওয়া সকল তথ্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে হস্তান্তর করে। আল-কায়েদা ও শায়খ উসামা রহ. সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের এই ভান্ডার পেয়ে আমেরিকা যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়ে যায়।[৩৩]

জামাল ফযল আর আবুল ফযলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমেরিকা সুদানের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা শুরু করে। আমেরিকা ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর চাপের মুখে বশীর সরকারও নমনীয় হতে বাধ্য হয়। ৯/১১ হামলার পরে মার্কিন কংগ্রেস একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টের ৬৩ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়—'১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা ও আরও কিছু দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সাথে সুদানের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন সুদানের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কী করা হলে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে? তার কিছুদিন পরে সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সুদানের প্রতিনিধিরা গোপন একটি বৈঠক করে। বৈঠকে তারা উসামাকে সৌদির হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং সৌদির কাছে আবেদন জানায়, তারা যেন শায়খকে ক্ষমা করে দেয়। সে বছর মার্চে আমেরিকা এই গোপন বৈঠকের কথা জানতে পারে। কিন্তু সৌদি যেহেতু এর আগেই শায়খের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিল, তাই তারা সুদানের এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তবে তাদের ইচ্ছা ছিল, উসামা বিন লাদেনকে যেন সুদান থেকে বের করে দেওয়া হয়।'

শায়খ রহ.-কে সুদান থেকে বের করার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে বশীর সরকারের পক্ষ থেকে লেবানিজ ভাইদের সুদান ত্যাগ করার আদেশ জারি করা হয়। তারা সকলেই ছিলেন আল-কায়েদা ও আল-জামাআতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মুকাতিলাহ (LIFG)-এর সক্রিয় সদস্য। বিদায়ের পূর্বে শায়খ রহ. তাদের সাথে দেখা করেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে, সামনে আমাদেরও (সুদান ত্যাগের) পালা আসবে।'

অবশেষে শায়খের ধারণাই সত্য হয়। এক রাতে সুদানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলী উসমান মুহাম্মাদ ত্বহা শায়খের সাথে দেখা করতে তার বাড়ি আসেন। শায়খকে তিনি জানান, তারা আমেরিকার পক্ষ থেকে অসহনীয় চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন। আমেরিকা চাচ্ছে, হয়তো উসামাকে তাদের বা সৌদির হাতে তুলে দিতে হবে অথবা সুদান থেকে বের করে দিতে

[৩৩] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)

হবে। সুদান সরকার শায়খকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু বাধ্য হয়ে শায়খকে সুদান থেকে বের করে দিতে রাজি হয়েছে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভাইস প্রেসিডেন্ট শায়খকে পরদিন রাতেই আফগানিস্তানের জালালাবাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। শায়খ রহ. আকস্মিক এই সফরের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। ভাইস প্রেসিডেন্ট জানান, জালালাবাদের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের—তাঁদের মধ্যে শায়খ ইউনুস খালেস রহ. ছিলেন অন্যতম—সাথে আলোচনা করে তারা সেখানে সব ব্যবস্থা ইতোমধ্যে করে ফেলেছেন। শায়খ ভাবতেও পারেননি, সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে। সুদান সরকারের এই পদক্ষেপের ব্যাপারেও শায়খ আগে থেকে কিছুই জানতেন না। তাই তিনি এক সপ্তাহ সময় চান। যেন এই সময়ের মধ্যে সবকিছু গুছিয়ে আনতে পারেন এবং কাশ শহরে চলমান কৃষি প্রকল্পগুলোর একটি বন্দোবস্ত করতে পারেন। কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পরদিন রাতেই সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেন।



আলী উসমান মুহাম্মাদ ত্বহা

সৌদি থেকে ওভারফ্লাইট পারমিশন (আকাশসীমা অতিক্রমের অনুমতি) পেতে দেরি হওয়ায় সফর একদিন বিলম্ব হয়ে যায়। কাকতালীয়ভাবে যে রাতে শায়খ সুদান ত্যাগ করেন, সে রাতটি ছিল হিজরী ১৪১৭ সালের প্রথম রাত, ১৯৯৬ সালের ১৮ই মে। শায়খ রহ. এই কুদরতি মিলকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হয়।

সুদানের প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের আট আসনবিশিষ্ট ছোটো সেই প্লেনে শায়খের সাথে ছিলেন—শায়খ আবু হাফস কমান্ডার, শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ), শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, ভাই হামযা যুবাইর, শায়খ আব্দুর রহীম ইয়ামানী (আবু উমর আনসারী), ভাই খালেদ হাবীব, ভাই আবুল ইয়ুসর তিউনিসী এবং সুদানের দুই সেনাকর্মকর্তা। জ্বালানি

সংগ্রহের জন্য বিমানটি ইরানের শিরায শহরে কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করে।[৩৪] তারপর নানগারহার প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় উড়াল দেয়। শায়খ উসামা রহ. এবং তাঁর সাথিগণ দীর্ঘ পাঁচ বছর সুদানে কাটিয়ে আবারও আফগানিস্তানে ফিরে আসেন।

শায়খ রহ.-এর সফরের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। যারা সাথে যাবেন, তারা আর অল্প কিছু সাথি ছাড়া কাউকেই জানানো হয়নি। কিন্তু শুধু শায়খ রহ.-কেই সুদান থেকে বের করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আল-কায়েদার সাথে যুক্ত সবাইকেই সুদান থেকে বের করার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। এ জন্য শায়খ রহ. সুদান ছাড়ার আগে শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি.-কে বাকি ভাইদের সফরের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন। শায়খ রহ. সুদান ছাড়ার পর বাকিদের জানানো হয় এবং সকলের সফরের ব্যবস্থাও করা হয়। পরে দুটি বিমানে মোট ২৪টি পরিবারকে সুদান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শায়খ উসামা রহ. চলে আসার পরেই সুদানে থাকা জিহাদী জামাতগুলোর ওপর কড়াকড়ি শুরু হয়ে যায়। সকলকে সুদান ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। অন্যান্য দলের সাথে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ এবং এর আমীর শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরীও সুদান ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে শায়খ আবুল ফারাজ মিসরী (আহমাদ সালামাহ মাবরুক) ও শায়খ হিশাম হানাবী রহ.-ও ছিলেন। তারা সুদান থেকে চেচনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে দাগেস্তানে গ্রেফতার হন। সৌভাগ্যবশত কেউ তাদের চিনতে না পারায় আল্লাহ তাআলার দয়া আর কিছু ভাইয়ের চেষ্টায় ছয় মাস পরই মুক্তি পান। তখন তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয়তো সফর অব্যাহত রেখে চেচনিয়ার জিহাদে শরীক হবেন অথবা আফগানিস্তানে ফিরে সেখানকার মুজাহিদ ভাইদের সাথে মিলিত হবেন। শায়খ হিশাম হানাবী চেচনিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরবর্তীতে সেখানেই শহীদ হন। অন্যদিকে শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী ও শায়খ আবুল ফারাজ আফগানিস্তানে ফিরে আসেন এবং শায়খ উসামা, শায়খ আবু হাফস কমান্ডার ও অন্যান্য সাথির সাথে মিলিত হন। কিছুদিনের শলাপরামর্শের পর ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী বুঝতে পারেন, আফগানিস্তান আগেও ইসলামের দূর্গ ছিল, এখনও আছে। এভাবে শায়খ উসামা রহ.-ই তাঁকে আফগানিস্তানে থেকে যেতে রাজি করান।

সুদান সরকার মুজাহিদদের দেশত্যাগে বাধ্য করায় তাঁরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিভিন্ন জায়গায় অনেক মুজাহিদ গ্রেফতার হন। উদাহরণস্বরূপ—জামাল ফযলের দেওয়া তথ্যের

[৩৪] কিছু ডকুমেন্টারিতে বলা হয়েছে, শায়খ উসামা রহ.-কে বহনকারী বিমান জ্বালানি সংগ্রহের জন্য দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক তথ্য হলো, শায়খ রহ.-এর চলে আসার পর সুদান থেকে আরও দুটি বিমান ভাইদের নিয়ে আসে। সে দুটির মধ্যে একটি বিমান দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। শায়খকে বহনকারী বিমান ইরানের শিরায শহর থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করেছিল।

ভিত্তিতে জার্মানিতে আমাদের সম্মানিত শায়খ, সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী, কারী আবু হাজের ইরাকী গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে তাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হয়। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। মুসলিম দেশগুলোই মুসলিমদের জন্য অনিরাপদ হওয়ায় বাধ্য হয়ে অনেক ভাই বিভিন্ন কাফের দেশে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ও পরিবার-পরিজনকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেন। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের মার্চে হাসান তুরাবির নেতৃত্বে পপুলার আরব অ্যান্ড ইসলামিক কংগ্রেস-এর ব্যানারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুদানে। আফগানিস্তান থেকেও কয়েকজন মুজাহিদ নেতা তাতে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ., কমান্ডার সাযনুর, কমান্ডার ফযলুল হক মুজাহিদ, কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন। শায়খ উসামা রহ. তাঁদেরকে নিজ বাড়িতে রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। অনেকে বলে থাকেন, সেই দাওয়াতে আফগান নেতৃবৃন্দ শায়খ রহ.-কে বলেছিলেন, সুদান থেকে যদি শায়খকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা আফগানিস্তানে শায়খকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন।

## জামাল ফযলের আত্মসমর্পণ ও সুদানের সময়কাল: কিছু শিক্ষা, কিছু উপদেশ

জামাল ফযলের আত্মসমর্পণ এবং শায়খ উসামা ও অন্যান্য জিহাদী জামাতের সাথে সুদান সরকারের আচরণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি আমরা নিতে পারি, তা হলো—**ইখলাসের গুরুত্ব, কথা ও কাজে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর দিকেই মনোযোগী হওয়া এবং আমৃত্যু দীনের ওপর অটল থাকার জন্য দৃঢ়তা ও কুরবানীর মানসিকতা।**

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আব্বাদ তাঁর কিতাব 'যিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসানুহূ ওয়া হুকমুল ইসতিসনা ফীহি'-তে বলেন—

> 'বান্দার বাহ্যিক আমলের শুদ্ধতা কলবের শুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। কলব যদি পরিশুদ্ধ হয়, আল্লাহর মুহাব্বত ও আল্লাহর প্রিয় বিষয়গুলোর প্রতি মুহাব্বত থাকে এবং আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে বাহ্যিক আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কলব যদি নষ্ট হয়ে যায়, প্রবৃত্তি ও নফসের দাসত্ব যদি কলবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে বাহ্যিক আমলও নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য বলা হয়—"কলব হলো সকল অঙ্গের বাদশাহ আর অন্যান্য অঙ্গ হলো কলবের সৈনিক।" শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কলবের অনুগত সৈনিক, তার আদেশ পালনে সদাতৎপর। কলবের কোনো আদেশই তারা লঙ্ঘন করে না। তাই, মালিক যদি সৎ হয়, তার সৈনিকরাও সৎ হবে আর মালিক

যদি নষ্ট হয়, তার সৈনিকরাও নষ্ট হবে। আর আল্লাহর দরবারে একমাত্র পরিশুদ্ধ কলবই গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.**

'সেদিন সম্পদ ও সন্তানেরা কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে পরিশুদ্ধ কলব নিয়ে (একমাত্র সে-ই উপকৃত হবে)।' [সূরা শুয়ারা (২৬) : ৮৮-৮৯]'

এ বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা দুটি উদাহরণ তুলে ধরব। একটি হলো জামাল ফযল ও আল-কায়েদার ভাইদের পরিণতির উদাহরণ। আরেকটি হলো, ওমর আল-বশীর ও তালেবান সরকারের পরিণতির উদাহরণ।

**প্রথম উদাহরণ:**

যেমনটা আমরা দেখেছি, পশ্চাদপসরণ, নিয়তের গড়মিল, আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা না রাখা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টির দরুন জামাল ফযল বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে হারামে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলাও তাকে ছাড় দিচ্ছিলেন। কিন্তু, একসময় প্রশস্ত দুনিয়াও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার আর কোনো পথ না পেয়ে শয়তানের কাছে সে নিজের দীন ও ঈমানকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল। এভাবে সে রিদ্দাহর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, নাউযুবিল্লাহ। এরপর তার কী হয়েছিল তা আমরা আলোচনা করেছি। আল্লাহ ও রাসূল তাঁর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত, আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে সে যদি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাহলে ভিন্ন বিষয়।

জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পদে যে ব্যক্তিই অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, আমানতের খেয়ানত করে, তার পরিণতি এমনটাই হয়ে থাকে। প্রথম সারির কত মুজাহিদ ছিলেন, যারা দীনের জন্য কুরবানী পেশ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন; কিন্তু আফসোস, জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পদে যখনই তারা অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিয়েছেন। যে মহান নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেছিলেন, সেই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও দীনের নুসরত থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে তারা ক্রুসেডারদের একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হয়েছে, তাদের পদলেহী দালালে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আফিয়াত ও দৃঢ়তা দান করুন, আমীন।

আরেকটি বিষয় মনে পড়ছে। কিছু কিছু প্রবীণ মুজাহিদ ভাইয়ের জিহাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো—সম্মান ও পদমর্যাদার লোভ। তারা নফসের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেননি। নিজেদেরকে আমীরের

হাতে থাকা সে তিরের মতো বানাতে পারেননি, যাকে আমীর যেদিকে ইচ্ছা ছুঁড়তে পারেন। পাহারার কাজ হোক বা বাহিনীর পেছনে বসিয়ে রাখা হোক, সর্বাবস্থায় যারা আমীরের অনুগত থাকে, তেমন অনুগত তারা হতে পারেননি। তাদের আমীর বানালে সন্তুষ্ট থাকতেন, কিন্তু সাধারণ সৈনিক বানিয়ে দিলে সবকিছুতেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা এটাই যে, এই ভাইয়েরাই একসময় হয়তো জিহাদী কাজ ছেড়ে দেন অথবা তাগুতের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেদের জিহাদী জীবনের সমাপ্তি ঘটান। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাগুতগোষ্ঠী ও তাদের ক্রুসেডার অভিভাবকদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে বদদীনী ও দাসত্বের চোরাবালিতে আটকে যান। যেমনটা ঘটেছে জামাল ফযল ও অন্যান্যদের সাথে। রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন—

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

'ভেড়ার পালের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো দুটি নেকড়ে তাদের জন্য ততটা ভয়ংকর নয়, সম্পদ ও মর্যাদার লোভ মানুষের দীনের জন্য যতটা ভয়ংকর।' [জামে তিরমিযী : ২৩৭৬]

পক্ষান্তরে আল-কায়েদার ভাইদের নিয়ত ছিল একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা, দুনিয়ার বুকে আবারও দীনের বিজয়কেতন ওড়ানো। তাই আল্লাহ তাআলাও পদে পদে তাঁদের সাহায্য করেছেন। যখন পাকিস্তানে তারা সংকটের মুখোমুখি হলেন, আল্লাহ তাআলা সুদানের মাটিকে তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। যেমনটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। যখন সুদানে তারা সংকটের মুখে পড়লেন, আল্লাহ তাআলা আবারও আফগানিস্তানকে তাদের জন্য প্রশস্ত বানিয়ে দিলেন। আফগানিস্তানের মাটিতে তাদের অবাধ চলাফেরার সুযোগ তৈরি হয়ে গেল। এর মধ্য দিয়ে হক-বাতিলের লড়াইয়ের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হলো। যাদের হাত ধরে যুদ্ধের এই নতুন ধারার সূচনা হলো, আমরা বিশ্বাস করি, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছেন—আল্লাহর দীনকে তাঁরা সাহায্য করবেন, নিজেদের সবটুকু দিয়ে দুর্বল মুমিনদের প্রতিরক্ষা করবেন, তাদের আশ্রয় দেবেন। এ জন্য যদি নিজেদের সমস্ত সম্পদের কুরবানী দিতে হয়, সম্মানিত নেতৃবর্গের রক্তের নজরানা পেশ করতে হয়, তবু তারা পিছপা হবেন না।

**দ্বিতীয় উদাহরণ:**

ওমর আল-বশীর সরকারের বিষয়টি বুঝতে হলে তালেবানের সাথে তার পার্থক্যটি বুঝতে হবে। শায়খ উসামা রহ. এবং তার সাথে থাকা দুর্বল মুজাহিদদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বশীর সরকার ও তালেবান সরকারের অবস্থানের তুলনা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব।

বশীর সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল, তখন সারা দুনিয়ায় তুমুল আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছিল। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়েও ওমর আল-বশীর ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অটল ছিল। সেই পরিস্থিতিতেই সে শায়খ উসামা রহ., আল-কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদী জামাতকে সুদানে আসার দাওয়াত দিয়েছিল এবং সকলকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তার ইসলামী মনোভাবের কারণে সবাই ধরে নিয়েছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের তাগিদেই সে মুজাহিদদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাদের আশ্রয় দিয়ে কোনো রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা কিংবা তাদের ব্যবহার করে বিরোধীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। [কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।]

[মুজাহিদদের ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করার] এই সুযোগসন্ধানী নিয়তের কারণে অবশেষে তাকে আসমানী শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বশীর সরকার বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয়ে আমেরিকার চতুর্মুখী চাপের মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ত্যাগ করার পাশাপাশি শায়খ উসামা রহ.-কেও সুদান থেকে বের করে দিতে রাজি হয়। শায়খ উসামাকে বের করে দেওয়ার পর সুদানের এই কাজটিকে আমেরিকা 'সঠিক পথে ফিরে আসার প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে আখ্যায়িত করে। বাস্তবেও এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু সঠিক পথে না; আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলাম প্রশ্নে যত ছাড় দেওয়া সুদানের জন্য আবশ্যক ছিল, সেই দীর্ঘ পথে এটিই ছিল সুদানের প্রথম পদক্ষেপ। এরপর থেকেই বশীর সরকার আমেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে দীনের বিষয়ে ছাড় দেওয়া শুরু করে। যার ফলে তারা দীন-দুনিয়া উভয়টিই হারায় এবং দেশকেও এমন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়, যা আজ আমাদের চোখের সামনে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মার্কিন লেখক লরেন্স রাইট তার বই 'দ্যা লুমিং টাওয়ার: আল-কায়েদা অ্যান্ড দ্যা রোড টু নাইন-ইলেভেন'-এ লিখেছেন—

> '১৯৯৬ সালের মার্চে বশীর সরকারের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেজর জেনারেল ফাতিহ উরওয়া মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাথে একটি গোপন বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি জানান, সুদান সরকার চায়, আমেরিকা যেন সুদানকে সন্ত্রাসবাদে সহায়তাকারী দেশের তালিকা থেকে বাদ দেয়। এ জন্য যা প্রয়োজন, সুদান সব করতে প্রস্তুত। আমেরিকা সুদান থেকে কী চায়, তার একটি তালিকাও তিনি দিতে বলেন। তার এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইএ'র তরফ থেকে একটি নোট দেওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদে সহায়তার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে সুদানের কী কী করতে হবে—এমন কিছু কাজের তালিকা ছিল তাতে। তার মধ্যে একটি দাবি ছিল—উসামা বিন লাদেনের সাথে যত মুজাহিদ সুদানে এসেছে, তাদের সকলের নামের তালিকা, পাসপোর্ট নাম্বার এবং সফরের বিস্তারিত বিবরণ আমেরিকাকে দিতে হবে। সে বৈঠকে সুদানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী এটাও

বলেছিলেন, আমেরিকা যদি উসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার করতে চায়, তাহলে সুদান তাকে হস্তান্তর করতেও প্রস্তুত আছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ৩রা অক্টোবর 'দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট' দুই পৃষ্ঠার এই নোটটি প্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি ৯/১১-এর ব্যাপারে মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টেও সুদান, আমেরিকা ও আরও কিছু দেশের মধ্যকার একটি গোপন বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক চাপ কমানোর জন্য সুদান যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিল।'

এত ছাড় দেওয়ার পরেও আমেরিকা খুশি হয়নি। সুদানকে দেওয়া ওয়াদাও পূরণ করেনি। বশীর সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে যে মুজাহিদরা এতদিন সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছিল, তাদের দূরে ঠেলে দিয়ে সুদান ততদিনে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন—

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

'সে (শয়তান) তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের আশ্বাস দেয়, অথচ শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।' [সূরা নিসা (৪) : ১২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সত্য বলেছেন—

مَنْ أَرْضَى الناسَ بسخَطِ اللهِ وكَلَهُ اللهُ إلى الناسِ ، و مَنْ أسخَطَ الناسَ برضا اللهِ كفاهُ اللهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে হলেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।' [জামে তিরমিযী: ২৪১৪]

যে দক্ষিণ সুদানের জন্য বশীর সরকার জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিল, জাতির নির্বাচিত যুবকদের কুরবানী পেশ করেছিল, দেশের সম্পদ ও অর্থবিত্ত ব্যয় করেছিল, তারও শেষ রক্ষা হয়নি। দক্ষিণ সুদানকে সুদান থেকে আলাদা করে ফেলা হয় [২০১১ সালে]। অন্যদিকে আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করতে একের পর এক শরীয়তের বিধানে ছাড় দিতে থাকলেও সুদানের ললাট থেকে সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতার তকমা সরেনি। অর্থনৈতিক অবরোধ আগের মতোই বহাল আছে। ওমর আল-বশীর ও দেশের প্রধান সারির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে এখনো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) মামলা চলছে। পরিশেষে বশীর সরকার দীন-দুনিয়া উভয়টিই হারিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তার জন্য আফসোস করারও কেউ নেই।

অন্যদিকে তালেবান তাদের ইখলাসের দাবিকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। ফলে ইতিহাসের পাতায় নুরের হরফে চিরকালের জন্য তাঁদের এই বীরত্বগাঁথা লেখা হয়েছে। তাঁদের এই মহান আদর্শ সর্বকালের স্বাধীনতাকামীদের জন্য আলো ছড়িয়ে যাবে এবং

তাওহীদের মেকি দাবিদারদের বিরুদ্ধে দলীল হয়ে থাকবে। তাঁরা প্রমাণ করেছে, দীনের ওপর অবিচলতাই হলো আসল কষ্টিপাথর। এর মাধ্যমেই প্রকৃত বীরত্ব যাচাই করতে হবে, আসল-নকলের পার্থক্য হবে; দুনিয়ায় ইজ্জত ও তামকীন অর্জনের একমাত্র পথ এবং আখিরাতে নাজাত ও কামিয়াবি হাসিলের একমাত্র পথ এটিই। এই সেই তালেবান, দীর্ঘ তিন দশকের যুদ্ধ, স্বজন হারানোর কষ্ট কিংবা বুলেটের আঘাত—কোনোকিছুই তাঁদেরকে দীনের ব্যাপারে একবিন্দু ছাড় দিতে বাধ্য করতে পারেনি। মিসাইলের মুহুর্মুহু গর্জন, বিমানের কলজে কাঁপিয়ে দেওয়া হুংকার, ট্যাংকের জোরালো বিস্ফোরণ, এতীম ও বিধবাদের বুকফাটা কান্না—কোনোকিছুই তাঁদেরকে আমেরিকার সামনে নত করতে পারেনি।

আদর্শ ও নীতির ওপর অবিচলতা, ত্যাগ ও কুরবানী এবং দুর্বল মুমিনদের সহায়তা ও দীনের নুসরতের ক্ষেত্রে তালেবান এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। একজনমাত্র ব্যক্তির জন্য সারা দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সেই একজনের জন্যই তালেবান বাইয়াতে রিযওয়ানের ইতিহাস জীবন্ত করে দেখিয়ে দিয়েছিল। মনে করিয়ে দিয়েছিল গাছের নিচে সাহাবীদের বাইয়াতের সেই দৃশ্যের কথা। চৌদ্দশ সাহাবি, সাথে দোজাহানের সরদার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর শপথ নিচ্ছেন একজনমাত্র মুসলিমের জন্য। যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের কাছে পাঠিয়েছিলেন আর **গুজব রটে গিয়েছিল** কুরাইশ তাকে হত্যা করেছে। সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করে একজনমাত্র মানুষের জন্য তালেবান তাদের হুকুমত বিসর্জন দিয়েছিল। যখন শায়খ উসামা রহ.-কে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে তারা অস্বীকার করেছিল আর মানুষ যখন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-কে ভয় দেখাচ্ছিল যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করবে, তখন তিনি বিখ্যাত সেই কথাটি বলেছিলেন—'আল্লাহর কসম, তারা যদি আফগানিস্তানের প্রতিটি পাথরও পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দেয়, তবু আমি উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেব না।'

আমীরুল মুমিনীনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দীন ও রবের সন্তুষ্টির ওপর অটল থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিজের রাজত্ব হারানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজত্ব কী উপকারে আসবে, যদি কেয়ামতের ময়দানে তা জাহান্নামে নিয়ে যায়? রাজত্ব তো ক্ষণিকের বিষয়। আজ আছে তো কাল নেই। প্রকৃত সফল তো সে-ই, যে রাজত্বের মাধ্যমে নিজের রবকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং তার মাধ্যমে দীনকে শক্তিশালী করতে পারে।[৩৫]

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এই ধরনের সাহসী সিদ্ধান্তের কারণেই তালেবান আজও পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে টিকে আছে। অবশেষে আমেরিকাও বুঝতে পেরেছে, তারা ব্যর্থ যুদ্ধের ঘানি টানছে। এই চোরাবালি থেকে বাঁচার এবং নিজেদের অবশিষ্ট সম্মান রক্ষার একমাত্র পথ

[৩৫] 'বাইনাস সুদান ওয়া আফগানিস্তান : দারসুন ওয়া ইবরাতুন' নামের এক প্রবন্ধ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত।

হলো তালেবানের সামনে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করা। তাদের সাথে সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসা। যেন তাদের সাথে কোনোভাবে একটি সমঝোতা চুক্তি সই করা যায়, যা কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকার পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলীল হবে।

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজ আনুগত্যকে উৎসর্গ করবে, তার নির্দেশের ওপর অবিচল থাকবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই চাইবে এবং আল্লাহর পথে নিজের মূল্যবান সবকিছু কুরবান করার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই কাজের তাওফীক দেবেন, এই পথে চলার নির্দেশনা দেবেন, বিশেষ দয়া-রহমত ও তত্ত্বাবধানের দ্বারা তাকে গড়ে তুলবেন। সে যে-ই হোক না কেন। কোনো একক ব্যক্তি হোক বা কোনো দল হোক বা রাষ্ট্র হোক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিয়তের মধ্যে পরিবর্তন করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য কোনো ইচ্ছা লালন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পরিত্যাগ করবেন, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন এবং তার ভাগ্য তার হাতেই ছেড়ে দেবেন। ফলে সে গর্তের কিনারায় নিজের ভবন নির্মাণ করবে। একসময় তাকে নিয়ে তা জাহান্নামের গভীরে ধসে পড়বে, নাউযুবিল্লাহ। যার সাথে আল্লাহ থাকবেন, সবকিছুই তার পক্ষে থাকবে আর যে আল্লাহকে হারিয়ে ফেলবে, সে সবকিছুই হারিয়ে ফেলবে।

## দক্ষিণ সুদান ও শায়খ উসামার দৃষ্টিভঙ্গি:

দক্ষিণ সুদানের ব্যাপারে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৯২ সালে দক্ষিণ সুদানকে SPLA (Sudan People's Liberation Army)-এর দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে বশীর সরকার জিহাদ শুরু করে। এই জিহাদের শুরুর দিকেই শায়খ উসামা রহ. সুদান সরকারের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, দক্ষিণ সুদানের এই সংকটকে যেন বৈশ্বিক রূপ দেওয়া হয়। এই শরয়ী দায়িত্ব পালন করতে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের যেন জিহাদের আহ্বান জানানো হয় এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে থেকে আগমনকারী মুজাহিদদের জন্য যেন সুদানের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যেমনটা আফগানিস্তান ও বসনিয়াতে হয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সাইকস-পিকো চুক্তির দাসত্ব এতে বাধ সাধে। মুজাহিদদের বাঁধভাঙা যে জোয়ার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা তারা (সুদান সরকার) এই যুক্তিতে নাকচ করে দেয় যে, এতে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হবে, যা মোকাবিলা করার সাধ্য তাদের নেই এবং এই সরকারের শেষ নিঃশ্বাস অবধি যা তাদের পিছু ছাড়বে না।

মূল্যবান এই পরামর্শের পেছনে শুধু দক্ষিণ সুদানকে মুক্ত করাই শায়খ উসামা রহ.-এর ইচ্ছা ছিল না; বরং এর থেকেও বড় ও মহান একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো, মানসিকভাবে পরাজিত মুসলিমদের মধ্যে সাইকস-পিকো চুক্তির যে কাল্পনিক মূর্তি তৈরি হয়েছিল, সে

মূর্তিকে ভেঙে এক উম্মাহর চেতনা জাগ্রত করা, যার এক অঙ্গে ব্যথা হলে সকল অঙ্গই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। এক উম্মাহর এই চেতনা এমন একটি চেতনা, যার ভয়ে সর্বকালের ও সর্বস্থানের দাম্ভিক কাফের নেতারা আগেও প্রকম্পিত হয়েছে, এখনও হয়। মুসলিমদের ভূমি দখল ও সম্পদ লুট করার সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত আর লোভ-লালসার মোকাবিলায় এই একটি আদর্শই যথেষ্ট। এই চেতনা না থাকলে শয়তান নিশ্চিত থাকত, দুনিয়ায় তারই ইবাদত হবে। তাই সে সাইকস ও পিকোর মতো তার কিছু পালিত শয়তানকে পাঠিয়েছে, যারা রাতদিন এক করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের নীলনকশা তৈরি করেছে; যা এই উম্মতের দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ছোট ছোট টুকরো করে ফেলেছে আর সে টুকরোর সীমানা তৈরি হয়েছে মানবরচিত আইনের আবর্জনা দ্বারা। যারাই এই সীমানা লঙ্ঘন করে, তাদের জন্য রয়েছে অকল্পনীয় শাস্তি।

মোটকথা, শায়খ উসামা রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, জিহাদের পরিধি বিস্তৃত করার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের বানানো দেশ ও মানচিত্রের সীমারেখা মুছে ফেলা। যদি আল্লাহ তাওফীক দিতেন আর শায়খ উসামার পরামর্শ মেনে নিয়ে বশীর সরকার দক্ষিণ সুদানের সংকটকে বৈশ্বিক রূপ দিতে রাজি হতো, তাহলে সুদানের ভাগ্য কেমন হতো, তা এখন শুধুই কল্পনার বিষয়। তবে এতটুকু অবশ্যই বলা যায়, মধ্য আফ্রিকা, কেনিয়া, উগান্ডা, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে থাকা মজলুম মুসলিমদের জন্য তা একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারত। এমনও হতে পারত যে, এ সকল মুজাহিদগণ আপন আপন দেশে চেপে বসা ইহুদী-খ্রিষ্টান জোটের স্বার্থরক্ষাকারী কাফেরদের দোসরদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করারও একটা সুযোগ পেতেন।




দক্ষিণ সুদান আলাদা হওয়ার পরের চিত্র

# চতুর্থ অধ্যায়

# আফগানিস্তানের দ্বিতীয় পর্ব
# ১৮ই মে ১৯৯৬ সালে শায়খ উসামা রহ.-এর আফগানিস্তান আগমন থেকে ৯/১১-এর মুবারক হামলা পর্যন্ত সময়কাল

## নিজ দোষে সর্বনাশ

১৪১৭ হিজরীর প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা। শায়খ উসামা রহ. ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীরের প্রাইভেট বিমানটি জালালাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেদিন থেকেই যুগের হুবাল আমেরিকা ও আল-কায়েদার মুখোমুখি লড়াই ও প্রতিরোধের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। হঠাৎ শুরু হওয়া এ যুদ্ধের জন্য দু'পক্ষের কেউ প্রস্তুত ছিল না। এর ফলাফল কী হবে—তা নিয়েও কারো ভাবার সময় ছিল না। আল্লাহ তাআলা শায়খ উসামাকে রহমতের চাদরে আবৃত করুন। তিনি প্রায়ই বলতেন—'আল্লাহ তাআলাই আমাদের এ যুদ্ধে নিয়ে এসেছেন।'

আমেরিকা যখন বুঝতে পারে, সুদান সরকার শায়খ উসামাকে তাদের হাতে তুলে দেবে না, তখন তারা সুদান সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে, যেন শায়খকে সুদান থেকে বের করে দেয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল, কোনো না কোনোভাবে শায়খকে গ্রেফতার করা। এ জন্য তাদের সামনে কয়েকটি অপশন ছিল। যেমন: শায়খ যখন সুদান থেকে বিমানযোগে বের হবেন, তখন বিমানটিকে কোন এক বন্দরে অবতরণে বাধ্য করে গ্রেফতার করা অথবা যে দেশে তিনি আশ্রয় নেবেন, তাদের মাধ্যমে শায়খকে গ্রেফতার করে আমেরিকার হাতে হস্তান্তর করানো কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাকে গ্রেফতার করা। কিন্তু তারাও ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ তাআলাও কৌশল করছিলেন, তিনি তো সর্বোত্তম কৌশলী। আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে তাদের ওপরেই কল্পনাতীত আযাব নাযিল করলেন।

অবশেষে তারা জানতে পারল, শায়খ উসামা হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ঘেরা পাহাড়ের দেশ আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ইতঃপূর্বে গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দানবীয় সাম্রাজ্য ভেঙে খানখান হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থানে ততদিনে আরও একটি কবর খনন করা হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা পূর্বসূরীদের পরিণাম

ভোগ করার জন্য শীঘ্রই সদলবলে হামলে পড়বে আর সেই সাথে তাদেরও কবর রচিত হবে এখানে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯১ সালে কুয়েতের স্বাধীনতার অজুহাতে মার্কিন বাহিনী হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ঘাঁটি স্থাপন করার পরই আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ এবং মজলিসে শূরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যাবে, তা কেউ কল্পনাও করেনি। মনে হচ্ছিল, কুদরতি হাত আল-কায়েদাকে টেনে এনে যুগের হুবাল আমেরিকার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা কার্যকর হয়; যার ধ্বংস হওয়ার, সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয় এবং যার জীবিত থাকার, সে-ও যেন সঠিক প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে সত্যই বলেছেন—

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ

'তোমরা যদি (আগে থেকেই) পারস্পরিক আলোচনাক্রমে (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তবে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতভেদ দেখা দিত।' [সূরা আনফাল (৮) : ৪২]

## শায়খ ইউনুস খালেসের অতিথি

শায়খ উসামা রহ. শায়খ ইউনুস খালেস রহ. এবং আরও কয়েকজন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের অতিথি হিসেবে জালালাবাদে থাকা শুরু করেন। তাঁরা শায়খকে আন্তরিকতা ও উষ্ণ ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করে নেন। জালালাবাদে তখন এমন কিছু মুজাহিদ নেতা ছিলেন, যারা ভ্রাতৃঘাতী লড়াই থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—কমান্ডার সাযনুর, কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ, মুয়াল্লিম আউয়াল গুল[১], কমান্ডার ফজলুল হক মুজাহিদ[২] রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এই মুজাহিদ নেতৃবৃন্দই তখন নানগারহার প্রদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। নানগারহারে তখন হিযবে ইসলামীর[৩] শাসন চলত। শায়খ

[১] আউয়াল গুল রহ. গুয়ান্তানামো বে কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন। কারা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে (এনজিনা পেক্টোরিস) আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।

[২] ১৯৯৭ সালের ৩১শে মে পেশোয়ারে ইশার নামায আদায় করতে যাওয়ার সময় তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হয়। রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

[৩] শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামীর এই অংশটি মূলত গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামীর অংশ ছিল। ১৯৭৯ সালে শায়খ ইউনুস খালেস রহ. তাঁর অনুগত মুজাহিদদের নিয়ে আলাদা হয়ে যান এবং হিযবে ইসলামী খালেস নামে এই দলের সূচনা হয়। ২০০৬ সালে শায়খের ইন্তিকালের পর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়

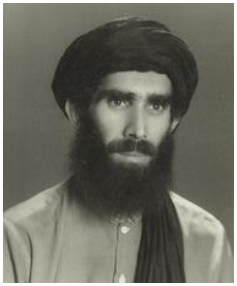
ইউনুস খালেস রহ. ছিলেন হিযবে ইসলামীর আমীর। মুজাহিদ নেতৃবর্গের মধ্যে ইউনুস খালেস রহ. অনেক মর্যাদাসম্পন্ন ও অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তখন প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন সাবেক আফগান মুজাহিদ কমান্ডার হাজী আব্দুল কাদীর। তিনিও শায়খ ইউনুস খালেসের অধীনেই কাজ করতেন। পরে অবশ্য ধোঁকায় পড়ে তালেবানবিরোধী জোট নর্দার্ন অ্যালায়েন্সে যোগ দিয়েছিলেন।



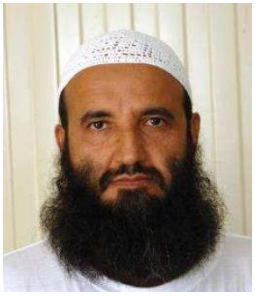
শায়খ ইউনুস খালেস রহ.



কমান্ডার সাযনুর রহ.



কমান্ডার ফযলুল হক মুজাহিদ রহ.



মুয়াল্লিম আউয়াল গুল রহ.

জালালাবাদে অবস্থিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশাহ জহির শাহের রাজপ্রাসাদে শায়খ উসামা রহ. এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কমান্ডার ফজলুল হক মুজাহিদ রহ.-এর সাথে সেখানে তাঁরা এক মাসের কিছু বেশি সময় অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তাঁরা অবশ্য প্রাসাদের ভেতরে অবস্থান করেননি; বরং শায়খের আবেদনের কারণে প্রাসাদের বাগানে তাঁবু টানানো হয়। সেখানেই তাঁরা অবস্থান করতেন। খালেদ হাবীব রহ. এবং আবুল ইয়ুসর তিউনিসী রহ. রান্নাবান্নার কাজ করতেন। ততদিনে সুদান থেকেও

---

এবং শায়খের ছেলে আনওয়ারুল হক খালেস দল থেকে আলাদা হয়ে তোরাবোরা মিলিটারি ফ্রন্ট নামে আলাদা দল গঠন করেন এবং পরে তালেবানের হাতে বাইয়াত হন।

বাকি ভাইয়েরা আসা শুরু করেছেন। সুদানে থাকা ভাইয়েরা দুই ধাপে আফগানিস্তানে আসেন। প্রথম ধাপে একটি রাশিয়ান কার্গো বিমান আসে। তাঁদের মধ্যে শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি.-ও ছিলেন। বিমানটি জ্বালানি নেওয়ার জন্য ইরানের শিরায শহরে থামে। সেখান থেকে জালালাবাদে আসে। ড. আমীন হাফি. তাদের রিসিভ করেন। সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে তিনি জালালাবাদ ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন। শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর অধীনে কাজ করতেন। সুদানের বাকি ভাইয়েরা দ্বিতীয় ধাপে আরিয়ানা আফগান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে আফগানিস্তান এসে পৌঁছান। এই বিমানটি জ্বালানি সংগ্রহের জন্য দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। সুদান থেকে মুজাহিদদের সব পরিবার আফগানিস্তানে এসে পৌঁছালে নারী ও শিশুদেরকে প্রাসাদের ভেতরে আর বাকি ভাইদের প্রাসাদের বাইরে শায়খ উসামার সাথে তাঁবুতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৪]

## ‘নাজমুল জিহাদ’ কলোনি

জালালাবাদের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে কমান্ডার আউয়াল গুল রহ.-কে ভাইদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। জালালাবাদে নাজমুল জিহাদ নামে একটি এলাকা ছিল। সেখানে ভাইদের বসবাসের জন্য কিছু জায়গা বরাদ্দ করা হয়। ড. আমীন হাফি. সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জায়গাটি প্রদান করেন। সেখানে আরব ভাইদের জন্য একটি কলোনি বানানো হয়। জায়গাটি শায়খ ইউনুস খালেস, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ এবং কমন্ডার আওয়াল গুল রহ.-এর বাড়ি থেকে কাছেই ছিল।

কলোনিটি দু’ভাগে বিভক্ত ছিল। কলোনির দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে ছিল বিবাহিত ভাইদের থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেক পরিবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর। আর বাকি অংশে ছিল মেহমানখানা, রান্নাঘর ও অবিবাহিত ভাইদের ঘর। কলোনির ভেতরে সব ঘর বানানো হয়েছিল মাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে। গাছের কাণ্ড এবং খড়ের চাটাইয়ে হালকা মাটির প্রলেপ দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিল। প্রতিটি বাড়িতে—এমনকি শায়খ উসামা রহ.-এর বাড়িতেও—শুধু একটি কামরা, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং ছোট্ট একটি আঙিনা ছিল। সব মিলিয়ে একটি বাড়ির আয়তন ছিল সর্বোচ্চ ৬০ বর্গমিটার।

### কলোনির বিবাহিত ভাইয়েরা

১. শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.

২. শায়খ কমান্ডার আবু হাফস মিসরী (সুবহী আব্দুল আযীয আবু সিত্তা জাওহারী) রহ.

[৪] শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি.-এর বিবরণ।

৩. শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী (আব্দুল্লাহ আহমাদ আব্দুল্লাহ উলফী) রহ.
৪. শায়খ সাইফ আল-আদল মিসরী (মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যাইদান) হাফি.
৫. শায়খ সাইদ মুহাসিব (মুস্তফা আহমদ উসমান আবুল ইয়াযীদ) রহ.
৬. আবু উমর মাগরিবী হাফি.
৭. আবু খলীল মাদানী রহ.
৮. আবু তারেক তিউনিসী রহ.
৯. আবু যিয়াদ ইরাকী (তারেক ফায়েয মাল্লাহ) রহ.
১০. আবু আব্দুর রহমান মুহাজির মিসরী (মুহসিন মুসা মুতাওয়াল্লী) রহ.
১১. খলীফা মিসরী রহ.
১২. শাকের মিসরী রহ.
১৩. আবুল হাসান সায়ীদী রহ.
১৪. আবু হুমাম ফাল্লাহ সায়ীদী রহ.
১৫. খালেদ মাকদিসী মিসরী (সা'দুফ) রহ.
১৬. আব্দুল মুহাইমিন মিসরী হাফি.
১৭. আবু হাফস আরব মিসরী রহ.
১৮. রিযা তিউনিসী হাফি.[৫]
১৯. আমীর আল-ফাতাহ মিসরী (আহমাদ ফারুক) রহ.[৬]
২০. আবু বকর গুল আসওয়ানী রহ.
২১. খালেদ হাবীব মিসরী রহ.
২২. শায়খ ঈসা মৌরিতানী হাফি.
২৩. শায়খ আবু উবায়দাহ মৌরিতানী হাফি.
২৪. আবু আমের সায়ীদী মিসরীর পরিবার। শায়খ তখন বন্দি ছিলেন। পরে মুক্তি লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ।

**অবিবাহিত ভাইয়েরা**

১. হামযা যুবাইর মিসরী রহ.
২. আবু আব্দুল আযীয কিন্দী রহ.। সৌদির নাগরিক।
৩. শায়খ আবু দুজানা পাশা মিসরী রহ.[৭]

---

[৫] তিনি বাগরাম কারাগারে ১৫ বছরেরও বেশি সময় আমেরিকার হাতে বন্দি ছিলেন। আল্লাহর শোকর, পরে তিনি মুক্তি পেয়েছেন এবং এখন তিউনিসিয়ায় আছেন। তবে তার ওপর এখনও বেশ কিছু বিধিনিষেধ আছে।

[৬] তিনি শায়খ আবু উবায়দা পানশীরী রহ.-এর ভাই।

[৭] শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর জামাতা।

৪. আবুল ইয়ুসর তিউনিসী হাফি.

৫. শায়খ আবু উমাইর হাযরামী রহ.[৮]

৬. শায়খ আব্দুর রহীম ইয়ামানী রহ.

৭. আবু আইমান ইয়ামানী রহ.

৮. আবু আহমদ সুদানী রহ.[৯]

৯. আবু মালেক রাসাস ইয়ামানী রহ.

১০. আবু হাম্মাম সায়ীদী হাফি.

১১. আসাদ উমর আব্দুর রহমান মিসরী হাফি. (শায়খ উমর আব্দুর রহমান রহ.-এর ছেলে)

১২. সাইফ উমর আব্দুর রহমান রহ. (শায়খ উমর আব্দুর রহমান রহ.-এর ছেলে)

১৩. আহমাদ আব্দুল্লাহ মিসরী রহ.। তিনি দারুস সালাম অভিযান এবং ১৯৯৫ সালে আদ্দিস আবাবায় মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ওপর হামলায় শরীক হয়েছিলেন।

১৪. খালেদ আতিয়্যা মিসরী রহ.। ১৯৯৫ সালে আদ্দিস আবাবায় মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ওপর হামলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৫. আবু তামীম মিসরী রহ.

১৬. আমাদের সাথে কর্মরত বিভিন্ন পেশার আফগান সাথিবৃন্দ। যেমন: বাবুর্চি, ড্রাইভার, দোভাষী।

১৭. শরীফ মিসরী হাফি.

১৮. আবু তারেক মিসরী হাফি.

১৯. খুবাইব সুদানী হাফি. [বইয়ের লেখক]

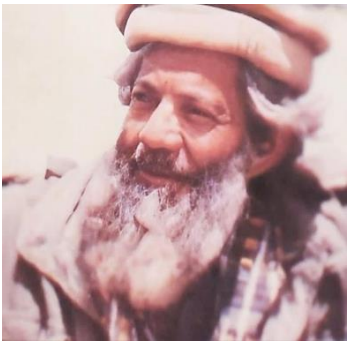
কলোনির মধ্যে ছোট একটি মসজিদ ছিল। জুময়া-সহ সব নামাযই সেখানে হতো। ছোট একটি দোকানও ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই সেখানে পাওয়া যেত। ঘরগুলো একেবারে কাছাকাছি থাকায় কলোনির অধিবাসীদের মধ্যে মিল-মুহাব্বত, ভ্রাতৃত্ব-ভালোবাসা ও পরস্পর সহযোগিতা-সহমর্মিতার বন্ধন ছিল বেশ মজবুত। সবাই নিজেদের একই পরিবারের সদস্য মনে করত, কালের আবর্তে যারা একই পথের পথিক হয়েছেন। পুনরায় আফগানিস্তানে

[৮] প্রথম সংস্করণে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। নিজের নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

[৯] তিনি মূলত মিশরের আসওয়ানের বাসিন্দা। সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ চলাকালে মাযার-ই-শরীফের কিল্লা-ই-জঙ্গিতে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন। যখন তার তল্লাশি নেওয়া হচ্ছিল, তখন গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আব্দুর রশীদ দোস্তমের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন কমান্ডারকে তিনি হত্যা করেছিলেন। সোভিয়েতের পরাজয়ের পর তিনি হেকমতিয়ারের সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। শায়খ উসামা যখন আফগানিস্তানে আসেন, তখন তাঁর দাওয়াতে তিনি হেকমতিয়ারের দল ছেড়ে আল-কায়েদায় যোগ দেন।

ফিরতে পেরে এবং শায়খ ইউনুস খালেস, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ এবং আউয়াল গুল রহ.-এর মতো নেককারদের সোহবতের সুযোগ পেয়ে সকলে খুশিও ছিলেন অনেক।

এই কলোনি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আরেকটি কলোনির কাজ চলছিল। অবশিষ্ট ভাইদের জন্য সেখানেও অনেকগুলো ঘর বানানো হচ্ছিল। এই জমিটুকুও কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর এক অনুসারী কারী মাহমুদ দান করেছিলেন। সেখানকার কাজ শেষ হলে শায়খ আব্দুর রহমান কিন্দী[১০] (আহমদ সাইদ খিযির) রহ. ও শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ) হাফি. সেখানে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু তাকদীরের ফায়সালা ছিল ভিন্ন। এর আগেই সবাই কান্দাহার চলে যান।



শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী হাফি.



শায়খ আবু আব্দুর রহমান কিন্দী রহ.

[১০] মিশরীয় বংশভূত হলেও মুজাহিদদের মধ্যে তিনি আবু আব্দুর রহমান কিন্দী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ, তিনি কানাডায় বাস করতেন এবং সেখানকার নাগরিকত্বও ছিল তার। কম্পিউটার সাইন্সে অনেক দক্ষ ছিলেন। ১৯৮৫ সালে তিনি আফগানিস্তান যান। ত্রাণ বিতরণ, বিধবা ও এতীমদের দেখাশোনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও আফগান মুহাজিরদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনা তৈরিতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। লোগার প্রদেশের আরব ও আফগান মুজাহিদদের একটি ইউনিটের নেতৃত্ব দিতেন তিনি। ১৯৯১ সালে তাঁদের নিয়ে বড়সড় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। পরে লোগার প্রদেশ বিজয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর একটি পায়ে ট্যাংক শেলের আঘাত লাগে। ১৯৯৯ সালে ব্রিটেন তাকে আল-কায়েদার সদস্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৩ সালের ২রা অক্টোবর পাকিস্তানের কাবায়েলি অঞ্চলে তাঁর অবস্থান লক্ষ্য করে পাক-মার্কিন বাহিনী এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এ হামলায় তিনি শহীদ হন। তাঁর ছেলে আব্দুল করীম মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্যারালাইজড হয়ে যায়। তাঁর আরেক ছেলে উমরকে বন্দি করে গুয়ান্তানামোতে নেওয়া হয়। তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। সেখানে সে ছিল সবচেয়ে কমবয়সি বন্দি। গুয়ান্তানামোর খুব কম বন্দির বিচার সামরিক আদালতে করা হয়। সে ছিল তেমন বন্দিদের একজন। তার ওপর অভিযোগ ছিল, মার্কিন বাহিনী যখন তাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিল, তখন সে আত্মরক্ষার্থে সৈনিকদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেছিল আর এতে একজন মার্কিন সৈন্য নিহত আর কয়েকজন আহত হয়েছিল।

জালালাবাদেই আরেকটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিলাল মাক্কী[১১] (আব্দুর রহীম নাশিরী)-এর নেতৃত্বে উত্তর আফগানিস্তান থেকে কয়েকজন অবিবাহিত ভাই এসেছিলেন, তারা সেখানে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—হামযা গামেদী এবং কেনিয়ার নাইরোবিতে অভিযান পরিচালনাকারী ভাই আযযাম মাক্কী (জিহাদ মুহাম্মাদ আলী)। বাড়িটির দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন মুহান্নাদ বিন আতাশ রহ.। তাঁর ভাই খাল্লাদ বিন আতাশ-ও[১২] সেখানে ছিলেন।

## তোরাবোরা পাহাড়ে শায়খ উসামা রহ.

সুদান থেকে মুজাহিদদের সব পরিবার আফগানিস্তানে আসার পর কলোনি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তখন শায়খ উসামা রহ. মেযবানদের কাছে এ আশা ব্যক্ত করেন যে, এই প্রাসাদ থেকে দূরে কোনো পাহাড়ে যেন তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, তখন তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন, যা ভবিষ্যতে ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেবে, বিশ্বরাজনীতির সব হিসেবনিকেশ উলটে দেবে। তাই তাঁর দরকার ছিল শান্ত ও নিরিবিলি একটি জায়গা, যেখানে বসে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবতে পারবেন। মেযবানগণ তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেন এবং শায়খের জন্য তোরাবোরা পাহাড়ে একটি নিরাপদ ও মজবুত জায়গা ঠিক করে দেন। জায়গাটিকে আগে রুশবিরোধী আক্রমণ পরিচালনার জন্য মুজাহিদগণ বেস ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তোরাবোরা একটি সুবিশাল পর্বতমালা, যা পশ্চিমে খোস্ত ও প্রসিদ্ধ জাজি পর্বতমালার সাথে মিলিত হয়েছে। পুরো পর্বতমালা জুড়ে ঘন ও উঁচু গাছপালা। সারি সারি পাইন, সাইপ্রেস আর ওক গাছ। গরমকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে। শীতে এত তুষারপাত হয় যে, গ্রীষ্মেও পর্বতচূড়ায় সাদা সাদা তুষার জমে থাকে। জালালাবাদ শহর থেকে খালি চোখেই সাদায় মোড়ানো সে পর্বতচূড়া দেখা যায়। জালালাবাদ থেকে পিকআপে চড়ে তোরাবোরায় যেতে ঘণ্টা তিনেকের মতো সময় লাগে। তোরাবোরায় যেতে পথে অনেক গ্রাম, উপত্যকা আর ঝরনার দেখা মেলে।

শায়খের সাথে শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ), শায়খ সাইফ আল-আদল, শায়খ আব্দুর রহীম ইয়ামানী এবং নিরাপত্তারক্ষী ভাইয়েরা থাকতেন। বিবাহিত ভাইয়েরা প্রতি সপ্তাহে পালাক্রমে পাহারার কাজ করতেন। শায়খ এবং তাঁর সাথিদের জন্য তোরাবোরায় যে

[১১] এডেন বন্দরে মার্কিন নৌবাহিনীর ইউএসএস কোল ডেসট্রয়ারে হামলার দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি। বর্তমানে গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দি আছেন।

[১২] ৯/১১ হামলার একজন পরিকল্পনাকারী। বর্তমানে গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দি আছেন। আল্লাহ তাআলা দ্রুত তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

জায়গাটি ঠিক করা হয়েছিল, সেখানে তিনটি ঘর ছিল। ঘরগুলোর মধ্যে টানা বারান্দা ছিল একটি, যা ঘরগুলোকে যুক্ত করত। তিনটি ঘরের মধ্যে একটি ব্যবহার হতো পাঠাগার ও বেডরুম হিসেবে। সে ঘরে কমিউনিকেশন ডিভাইস রাখা ছিল। ছোট আরেকটি ঘর শায়খের বিশেষ বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ ঘরগুলোর পেছনে পাহাড় খোদাই করে বানানো কয়েকটি ছোট ছোট গুহা ছিল। আগে সেগুলো বিস্ফোরকদ্রব্যের স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। শায়খ সেগুলো মেরামত করে সেখানে নিজ স্ত্রী ও কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। আর শায়খের ছেলেদের জন্য বাইরে তাঁবু টানানো হয়। তাঁবুর চারপাশে ব্লক ব্যবহার করে দেওয়াল বানিয়ে দেওয়া হয়। শায়খের পাঁচ ছেলে—আব্দুর রহমান, সাদ, উমর, উসমান ও মুহাম্মাদ—সেখানে থাকতেন। এ ছাড়া শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী, শায়খ সাইফ আল-আদল এবং তাঁদের দুজনের পরিবারও আলাদা দুটি তাঁবুতে থাকতেন। সকলের খাবার একত্রে রান্না করে প্রত্যেক পরিবারে ভাগ করে দেওয়া হতো।

## জাযীরাতুল আরবে আমেরিকার উপস্থিতি: লক্ষ্য ও বাস্তবতা[১৩]

শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ. তাঁর বই 'আত-তাওয়াজুদুল আমরীকী ফিল জাযীরাতিল আরাবিয়্যাহ: হাকীকাতুহু ওয়া আহদাফুহু'-তে লিখেছেন—

> 'নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুট করে আমেরিকা এ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে, বিষয়টি মোটেও এমন নয়। ৯/১১ হামলার জবাব বা কোনো স্বৈরাচার দমনের উদ্দেশ্যে তারা এখানে আসেনি; বরং এর পেছনে তাদের দীর্ঘ চিন্তা ও গবেষণা কাজ করেছে। তাদের স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতেই মধ্যপ্রাচ্যে তারা সেনা মোতায়েন করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি না। কারণ, এ অঞ্চল পুরো পৃথিবীর জন্য ধমনির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব যার হাতে থাকবে, পুরো পৃথিবীতে তারই হুকুম চলবে। নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য সারা দুনিয়ার গলা টিপে ধরতেও তারা কুণ্ঠিত হবে না। এ কারণেই আমেরিকার কাছে এ অঞ্চলের গুরুত্ব এত বেশি। যদি কেউ ভাবে, আমেরিকা এখানে সাদ্দামকে দমন করতে এসেছে, তাকে দমনের পর তারা চলে যাবে, তাহলে এটা যেমন নির্বুদ্ধিতা হবে, তেমনই সৌদি সরকার যদি কখনো ঘোষণা দেয়, মার্কিন বাহিনী সৌদি ছেড়ে চলে যাবে, তাহলে তাদের এই দাবিকে বিশ্বাস করাটাও হবে চরম বোকামি।

[১৩] পুরো আলোচনাটি শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ.-এর লেখা 'আত-তাওয়াজুদুল আমরীকী ফিল জাযীরাতিল আরাবিয়্যাহ: হাকীকাতুহু ওয়া আহদাফুহু' নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

মার্কিন বাহিনী একদেশ থেকে আরেক দেশে ছাউনি পরিবর্তন করলেও, তা শুধুই সামরিক কৌশলের প্রয়োগমাত্র। কিন্তু তাদের স্ট্র্যাটেজি সব সময় এবং সব জায়গায় একই থাকে। তা হচ্ছে—পেট্রোল ও তেলের খনি এবং সরবরাহ লাইনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা, ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এতদঅঞ্চলে ইসলামপন্থি যে-কোনো শক্তির ক্ষমতায় যাওয়ার পথ বন্ধ করা এবং ক্ষমতাসীনদের জন্য হুমকি তৈরি করে এমন সকল কর্মকাণ্ডকে রুখে দেওয়া। এগুলোই হলো এ অঞ্চলে আমেরিকার স্থায়ী স্ট্র্যাটেজিকাল পলিসি। এটিই হলো তাদের উপস্থিতির আসল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তারা যা-ই করে, তা মূলত আরবের উদাসীন ও আলাভোলা মানুষদের আকৃষ্ট করে ব্যস্ত রাখার চেষ্টামাত্র।'

উল্লিখিত স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতেই 'র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্স' থিওরির সূচনা হয়। নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুর দিকে এই থিওরির জন্ম হয়। তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারা ম্যাসিভ রিটালিয়েশন[১৪] (Massive retaliation) থিওরির বিপরীতে ফ্লেক্সিবল রেসপন্স (Flexible response) থিওরি গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এই থিওরির মূলকথা হলো—বিদ্রোহী আন্দোলন এবং আঞ্চলিক লড়াইগুলোতে বিরোধীদের দমনের জন্য পারমাণবিক শক্তির দিকে না ঝুঁকে স্বাভাবিক সামরিক শক্তি ও সক্ষমতা অর্জন ও সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগী হওয়া। এ লক্ষ্যে তিনি এমন একটি বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন, যারা বিশ্বের দূরবর্তী দেশগুলোতে মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। অবশ্য তার প্রস্তাবটি তখন মার্কিন কংগ্রেস নাকচ করে।

২. ১৯৭৩ সালে বিশ্বে তীব্র তেল সংকট শুরু হয়। তখন আবারও এই থিওরি নিয়ে আলোচনা ওঠে। কারণ, তখন তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ হারানোর যে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছিল, এই থিওরি বাস্তবায়ন করলে তা অনেকটা সমাধান হতো। ১৯৭৪ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে হেনরি কিসিঞ্জার একটি ইউরো-আমেরিকান যৌথবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন, যারা তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু ন্যাটো তার এ প্রস্তাব নাকচ করে।

৩. ১৯৭৭ সালে জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ক্ষমতালাভের পরপরই তিনি র‍্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের ওপর জোর দেওয়া শুরু করেন। ইরানে শাহের পতন এবং সোভিয়েত-

[১৪] Massive Retaliation বা ব্যাপক প্রতিশোধের নীতি হলো এমন একটি নীতি যেটা কোনো দেশ (বিশেষ করে শত্রুপক্ষ) যদি সামান্য আক্রমণও করে, তাহলে তার জবাবে সেই দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার মতো ব্যাপক প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলে। এ ক্ষেত্রে পারমাণবিক হামলার ভয়ও দেখানো হয়। শত্রুকে ভয় দেখিয়ে আক্রমণ থেকে বিরত রাখার কৌশল হিসেবে এই থিওরিটি ব্যবহৃত হতো।

আফগান যুদ্ধের কারণে এমন একটি ফোর্স তৈরির গুরুত্বও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আঞ্চলিক রাজনীতির পটপরিবর্তনের ফলে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাসপার ওয়েইনবার্গ ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসনাল ডিফেন্স অ্যান্ড ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সামনে এ কথা পর্যন্ত বলেছিলেন, 'তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং সাপ্লাই লাইনের আশেপাশে স্থায়ীভাবে আমেরিকার নিজস্ব বাহিনী মোতায়েন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।'

এমনকি রিচার্ড নিক্সনও তার 'নিক্সন ডকট্রিন'[১৫] ছেড়ে 'কার্টার ডকট্রিন'[১৬]-এর সমর্থক বনে গিয়েছিলেন। 'ভিক্টোরি উইদাউট ওয়ার (যুদ্ধ ছাড়া বিজয়)' বইয়ে তিনি লিখেছেন—

> 'বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যে পারস্য উপসাগরে পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এ কাজ করার মতো পশ্চিমাদের অনুগত শক্তিশালী কোনো দেশ বর্তমানে এ অঞ্চলে নেই। যেমন আমাদের ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যেও এ কাজ করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটিই নেই। আমাদের উচিত, উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী মোতায়েনের জন্য সামরিক খাতকে জোরদার কাজ করা। ইতোমধ্যে আমরা এ ক্ষেত্রে বেশ উন্নতিও করেছি। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার 'র‍্যাপিড ডিপ্লয়মেন্ট ফোর্স' প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান এটিকে আরও উন্নত করে 'সেন্ট্রাল কমান্ড' তৈরি করেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই ফোর্সের জন্য বিলিয়ন ডলার বাজেট রাখা হচ্ছে।'

তিনি আরও লেখেন—

> 'সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে বিমানঘাঁটি না থাকলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব ধরে রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাই, সবার আগে এ অঞ্চলের বিমানঘাঁটিগুলোতে আমাদের এয়ারফোর্স মোতায়েন করতে হবে। পরে যখন আমাদের গ্রাউন্ডফোর্স এ অঞ্চলে প্রবেশ করবে, তখন এয়ারফোর্সের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। এয়ারফোর্স মোতায়েন না করে সরাসরি গ্রাউন্ডফোর্স নামানো হবে মারাত্মক বোকামি। এর পরিণতি ঠিক তেমনই হবে, যেমনটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলিতে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে হয়েছিল।'

---

[১৫] মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের বৈদেশিক নীতি। এর মূলকথা হলো, আমেরিকা তার মিত্রদের সাহায্য করবে, কিন্তু কোথাও সরাসরি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

[১৬] মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বৈদেশিক নীতি। এর মূলকথা হলো, মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ কোনো অঞ্চল যদি কোনো বিদেশি শক্তি দখল করতে চায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তা প্রতিহত করতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে। দরকার হলে সরাসরি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখবে। এই পলিসির ভিত্তিতেই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য US Central Command (CENTCOM) গঠিত হয়।

## ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্ট

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কুয়েত স্বাধীন করার অজুহাতে ১৯৯০ সালের আগস্টে জাযীরাতুল আরবে মার্কিন বাহিনীর আগমন ঘটে। তাদের এই আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের ওপর তীব্র আঘাত হানে। ইরাকের কুয়েত দখলের ঘটনায় মুসলিমবিশ্ব যতটা ব্যথিত হয়েছিল, তারচেয়েও বহুগুণ বেশি ব্যথিত হয়েছিল হারামাইনের মাটিতে ক্রুসেডার বাহিনীর উপস্থিতি এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহণের বৈধতা দানের ঘটনায়।

আঞ্চলিক রাজনীতিতে এই ঘটনা একটি ঐতিহাসিক টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার ফলে আঞ্চলিক শাসকদের মুখোশ খসে পড়তে শুরু করে, শাসকগোষ্ঠীর অনুগত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। আর তাদের ব্যবহার করে এতদঅঞ্চলে সেনাসমাবেশ ঘটানো এবং এর বৈধতাদানের পেছনে থাকা ক্রুসেডীয় ষড়যন্ত্রের গভীরতাও ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে। এ সব ঘটনায় মুজাহিদদের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তাঁদের মধ্যে শায়খ উসামা রহ.-ও ছিলেন।

এই যৌথ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। এর মধ্যে শুধু আমেরিকার সৈন্যই ছিল ৪ লাখের বেশি। শত শত যুদ্ধবিমান, দৈত্যাকার ব্যাটেলশিপ আর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ছিল বাহিনীর সাথে। এত বিশাল রণপ্রস্তুতি দেখে মুজাহিদদের বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি যে, আঞ্চলিক দালালদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় কোনো চক্রান্ত করা হচ্ছে। আর এই চক্রান্তে সাহায্য করছে নামধারী ধর্মীয় সংস্থাসমূহ এবং মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।[১৭]




১৯৯০ সালে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন বাহিনীর আগমন

[১৭] উস্তাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদের প্রবন্ধ সংকলন থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত।

ততদিনে শায়খ রহ. বুঝতে পেরেছিলেন, সৌদি আরবে মার্কিন বাহিনীর এই উপস্থিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য। চাই তারা বাদশাহর আবেদনের কারণে এসে থাকুক, যেমনটা প্রচার করা হয় অথবা বাদশাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হারামাইনের মাটিতে ক্রুসেডারদের এই উপস্থিতি খোদ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার যৌক্তিক কারণই নয় শুধু; বরং আলে সৌদের শাসনব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেকও এর মাধ্যমেই ঠোকা সম্ভব। কারণ, আলে সৌদ ততদিনে দখলদার ক্রুসেডারদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি সহওয়া আন্দোলনের যে-সকল আলেম ও দাঈগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতা করছিলেন, তাদেরও নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছিল।[১৮]

শায়খ রহ. ব্যক্তিগত চিন্তা-গবেষণা, জিহাদী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক ঝোঁক এবং বাস্তবতার নিরিখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, হারামাইনের নীতিভ্রষ্ট শাসকগোষ্ঠী-সহ কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হলে অনিবার্যভাবেই আগে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। অবশেষে তিনি যে সমীকরণে পৌঁছান, তা হলো—

১. একশ্রেণির নামধারী আলেম আলে সৌদের শাসনের বৈধতা তৈরি করছে।
২. অন্যদিকে আলে সৌদ হারামাইনের মাটিতে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিকে বৈধতা দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আলে সৌদের মোকাবিলা করার দুটি উপায় রয়েছে—

ক. সরাসরি আলে সৌদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়া। সে ক্ষেত্রে এমন আলেমদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে, যারা আলে সৌদের বৈধতা তৈরি করেছে। কিন্তু এ কৌশল নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে। কারণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। দীর্ঘ সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনমনে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও ভক্তি তৈরি হয়েছে। [তাই, সরাসরি আলে সৌদ ও এ সকল উলামায়ে কেরামের বিরোধিতা করলে, সাধারণ মানুষ কিছুতেই তা মেনে নিতে পারবে না।]

খ. তুলনামূলক নিরাপদ উপায় হলো সরাসরি মার্কিনিদের ওপর আঘাত হানা। এতে আলে সৌদ তাদের রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। তখন মুসলিমদের দৃষ্টিতে তারা নিজেদের বৈধতা হারাবে। একই সময় যে-সকল নামধারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করবে, তাদের গ্রহণযোগ্যতাও নিজ থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে মানুষের সামনে এ যুদ্ধের বৈধতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।[১৯]

---

[১৮] থমাস হেগহ্যামার রচিত 'জিহাদ ইন সৌদি আরাবিয়া' বই থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত।

[১৯] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ

শায়খ রহ. দ্বিতীয় পথটিই গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন গৃহবন্দি থাকায় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ তাঁর হাতে ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকার ওপর আঘাত হানার প্রথম সুযোগটি আসে ১৯৯২ সালে। শায়খ তখন সুদানে ছিলেন। সে বছরের ডিসেম্বরে আমেরিকা সোমালিয়ার ওপর হামলা করে। আল-কায়েদা এই সুযোগটিকে লুফে নেয়। মুজাহিদগণ সোমালিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রকে মার্কিনিদের জন্য মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলেন। আমেরিকা তীব্র আর্থিক, মানবিক ও মানসিক ক্ষতির মুখে পড়ে। তবে তারা দ্রুতই বুঝতে পারে, আফগানিস্তানে রাশিয়া যেমন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, তারাও সোমালিয়াতে একই পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে। তাই, মাত্র ৮০ জন সৈন্য হারানোর সাথে সাথেই ১৯৯৪ সালের মার্চে সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

## প্রথম বিবৃতি: জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও

সুদান ছেড়ে আসার পর তোরাবোরা পাহাড়ে শায়খ রহ. অবস্থান নিয়েই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। হারামাইনে অনুপ্রবেশকারী আমেরিকার বিরুদ্ধে এটিই ছিল প্রথম প্রকাশ্য জিহাদের ঘোষণা। শায়খ রহ. পাহাড়ে অবস্থানকারী ভাইদের বিবৃতির জন্য উপযুক্ত শিরোনাম পেশ করতে বলেন। অনেকে অনেক শিরোনাম পেশ করলেও শায়খ আবু উবায়দা মৌরিতানী রহ.-এর প্রস্তাবিত শিরোনামটি শায়খের পছন্দ হয়। সে হিসেবে বিবৃতির শিরোনাম দেওয়া হয়—**أخرجوا المشركين من جزيرة العرب** – 'জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও'।[২০]

যুগের হুবাল আমেরিকার কফিনের প্রথম পেরেক ছিল এই বিবৃতি। দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলোকে আবারও খিলাফতের পতাকাতলে একত্র করার পথেও প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই বিবৃতি। শায়খ উসামা রহ. এটিকে ইসলামের হারানো মানচিত্র পুনরুদ্ধারের ভিত্তি হিসেবে দেখতেন। এটি এমন এক যুদ্ধের ঘোষণাপত্র ছিল, যা ভবিষ্যতে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। বার্তাটি প্রকাশের পর পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং তার দোসরদের মুখোশ খুলে পড়তে থাকে; এর মধ্য দিয়ে এমন এক যুদ্ধের সূচনা ঘটে, যা বিশ্বকে দুই শিবিরে ভাগ করে দেয়—ঈমানের শিবির, যেখানে কোনো নিফাক নেই আর কুফরের শিবির, যেখানে কোনো ঈমান নেই।

[২০] এটি মূলত একটি হাদীসের অংশ। হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: আবু দাউদ: ৩০২৯, সহীহ বুখারী: ৪৪৩১, সহীহ মুসলিম: ১৬৩৭

সুদান থেকে আসার মাত্র তিন মাস পর ১৯৯৬ সালের ২৩শে আগস্ট এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে শায়খ বলেন—

> 'আমাদের ওপরেও জুলুম করা হয়েছে, মুসলিম ভাইদের সাথে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তান, সুদান ও আফগানিস্তান থেকে বারবার আমাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। এ কারণেই আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেকদিন দূরে ছিলাম। অবশেষে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে খোরাসানের মাটিতে হিন্দুকুশের সুউচ্চ শৃঙ্গে একটি নিরাপদ ঘাঁটি আমরা পেয়েছি। এই পর্বতের পাদদেশেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খোদাদ্রোহী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। এখানেই মুজাহিদদের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে বিশ্বের বড় বড় সব সাম্রাজ্য খানখান হয়েছে। আমরা আফগানিস্তানের সেই শৃঙ্গ থেকেই উম্মতের ওপর চেপে বসা ইহুদীবাদী-ক্রুসেডার জোটের জুলুমের অবসান ঘটাব। তারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরার পবিত্র ভূমিকে কলঙ্কিত করেছে, হারামাইনের পবিত্র মাটিকে পদদলিত করেছে। আমরা সব জুলুম রুখে দেব। মহান আল্লাহর নুসরতের ব্যাপারে আমরা পূর্ণ আশাবাদী। বিজয় দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তারই হাতে এবং তিনি আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম।'

উল্লেখ্য, হারামাইন থেকে আসা চারজন মুজাহিদ ভাই—রিয়ায হাজেরী, খালেদ সাইদ, আব্দুল আযীয মুআসসাম এবং মুসলিহ শামরানী—খোস্তের আল-ফারুক ট্রেইনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারা শায়খ উসামা রহ.-এর ব্যক্তিত্বে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে শায়খের যুদ্ধ ঘোষণার অনেক আগেই তারা সৌদিতে থাকা মার্কিন বাহিনীর ওপর ধারাবাহিক হামলা শুরু করেছিলেন। তারা প্রথম আক্রমণ করেন ১৯৯৫ সালের ১৩ই নভেম্বর। রিয়াদের 'আল-উলাইয়া' নামক এলাকার একটি ভবন লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়। মার্কিন বাহিনীর অনুগত ভিনেল কোম্পানি ভবনটি ব্যবহার করত। এই হামলায় পাঁচজন মার্কিন ও দুজন ভারতীয় নিহত হয় এবং প্রায় ৬০ জনের মতো আহত হয়।

## শায়খ উসামার দাওয়াতী তৎপরতা

বিবৃতি প্রকাশের পর থেকেই শায়খ রহ. এ ব্যাপারে দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন। এ সময় শায়খ রহ. মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন—যখন একাধিক ফরয দায়িত্ব জমা হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি প্রাধান্য পায়। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আগ্রাসি শত্রু আমেরিকাকে প্রতিহত করা। ক্রুসেডার

বাহিনী মুসলিমদের পবিত্র ভূমিকে পদদলিত করে যাচ্ছে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করছে না।

শায়খ উসামা রহ. আশঙ্কা করতেন, এখন যদি মানুষ এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব না হয়, তাহলে সময়ের ব্যবধানে আর জীবনের নানা ব্যস্ততায় মানুষ একসময় বেমালুম তা ভুলে যাবে, ঠিক যেমনভাবে ভুলে গিয়েছে ফিলিস্তিন আর আল-আকসার কথা। পরবর্তী প্রজন্ম নানা রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি নিয়ে কেউ আর ভেবে দেখার সময় পাবে না। এ সবকিছু চিন্তা করেই শায়খ রহ. কথা বলা শুরু করেন। মার্জিত ভাষায় অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—

**تأهـــب مثل أهبة ذي كفـــاح • فإن الأمـــر جـــلّ عن التلاح**
এবার প্রস্তুত হও যোদ্ধার মতো, কারণ এটি আর বাগাড়ম্বরে সীমাবদ্ধ নেই।

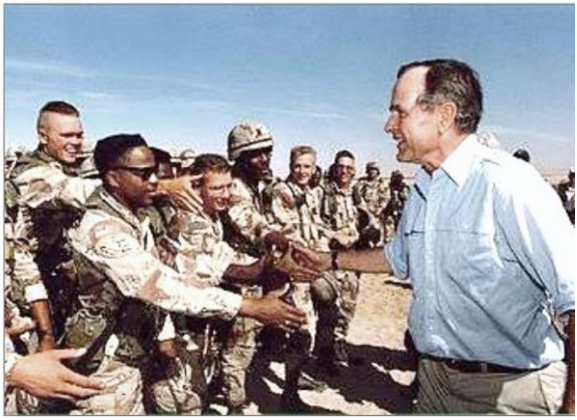
**ســـألبس ثـــوبها وأذود عنهـــا • بأطراف الأسنة والصـــفاح**
আমিও রণসাজে সজ্জিত হচ্ছি, বর্শা ও তরবারি দিয়ে আমিও প্রতিরোধ করব।

**أتتركـــنا وقد كثـــرت علينـــا • ذناب الكفر تأكل من جناحي**
তুমি কি আমাদের ছেড়ে দেবে এমন অবস্থায়, যখন কুফরের নেকড়েগুলো ছিন্নভিন্ন করছে আমার শরীর।

**ذناب الكفر مـــا فتئت تؤلب • بني الأشرار من شتّى البطاح**
কুফরের নেকড়েগুলো অনবরত খেপিয়ে তুলছে নানা প্রান্তের দুষ্কৃতিকারীদের।

**فأين الحـــر من أبناء ديني • يذود عن الحرائر بالسلاح**
কোথায় ইসলামের স্বাধীনচেতা সন্তানেরা, যারা অস্ত্র হাতে নারীদের ইজ্জত রক্ষা করবে?

**فخـــير من حيـــاة الذل موت • وبعض العار لا يمحوه ماحي**
লাঞ্ছনার জীবন থেকে মৃত্যু উত্তম, কিছু লাঞ্ছনার দাগ কেউই মুছতে পারে না।



মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষ্যে সৌদিতে অবস্থানরত সেনাদের সাথে সাক্ষাৎ করছে।



বাদশাহ ফাহাদ মার্কিন বাহিনী পরিদর্শন করছে। সঙ্গে আছে সেনাপ্রধান জেনারেল শোয়ার্জকফ।

## শায়খ উসামা রহ.-এর দাওয়াতের সারকথা

শায়খ রহ.-এর মূল বক্তব্য ছিল—মুজাহিদগণ যেহেতু পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দায়িত্ব পালন করছেন, তাই কোনো পার্শ্বযুদ্ধে জড়ানো কোনোভাবেই উচিত হবে না। স্থানীয় মুরতাদ শাসকদের মোকাবিলা বা মুসলিমদের শাখাগত সমস্যা সমাধানে

ব্যস্ত থাকলে মুজাহিদদের মেহনত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, উল্লেখযোগ্য কোনো ফলাফলও অর্জন হবে না। তারা একটি অন্তহীন চক্রে ঢুকে যাবেন। একটি সমস্যা শেষ হতে না হতেই আরেকটি সমস্যা এসে হাজির হবে। এ সব কাজের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, তবে এই মুহূর্তে এতে মনোযোগ দিলে আমেরিকা, তার মিত্র ক্রুসেডার বাহিনী এবং জায়োনিস্ট ইহুদীরাই লাভবান হবে। তাই এমন একটি স্ট্র্যাটেজিক টার্গেট নির্ধারণ করা জরুরি, যা অর্জনের জন্য মুজাহিদদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা হবে, সকলের মনোযোগ শুধু সেদিকেই নিবদ্ধ থাকবে এবং এর মাধ্যমে পুরো মুসলিম জাতিকে একতাবদ্ধ করে এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে, যারা প্রকাশ্যে-গোপনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাই সাপের মাথা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ওপর সকলের পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা জরুরি। এটাই সব সমস্যার সমাধান। আমেরিকার পতন হলে অন্যসব তাগুতী শক্তিরও পতন ঘটবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। এভাবে আরব ও মুসলিম ভূখণ্ডকে আমেরিকা ও তার দোসরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করার পর ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা সহজ হয়ে যাবে।[২১]

শায়খের এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পড়ে। সাধারণ মানুষ শায়খের সম্মোহনী ব্যক্তিত্বে অসম্ভব প্রভাবিত ছিল। মুগ্ধ হয়ে তারা এই মানুষটিকে দেখত, যিনি দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশ পেছনে ফেলে এসেছেন। ধনীর দুলাল হয়েও যিনি এই সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছেন। মানুষের সাথে তাঁর আচরণে ফুটে ওঠে মহানুভবতা, বদান্যতা, দানশীলতা, বিনয় ও নম্রতা। এই শান্তশিষ্ট মানুষটিই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তাগুতী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মানুষকে এই তাগুত ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের আহ্বান করলেন। তাঁর কথায় কোনো লুকোছাপা নেই, নেই কোনো আড়ম্বর কিংবা মারপ্যাঁচ। এই আহবানের আগেও বারবার তিনি নিজের সততার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি যে কাজেরই আহ্বান করেছেন, সবার আগে তিনিই তাতে লাব্বাইক বলেছেন। স্বার্থপর নেতাদের মতো কর্মীদের ঠেলে দিয়ে তিনি বসে থাকেননি। তিনি মানুষকে দুনিয়াবিমুখতার সবক দিয়েছেন, হিজরত ও জিহাদের কথা বলেছেন। তিনিই সবার আগে দুনিয়াকে লাথি মেরেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি মানুষকে ইসলামী ইমারতের সহযোগিতার আহ্বান করেছেন, তিনি নিজে তালেবানের পতাকাতলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। তিনি আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর হাতে বাইয়াতের আহ্বান করেছেন, তার আগে তিনি নিজে বাইয়াত দিয়েছেন। এমনইভাবে তিনি কুফরের সর্দার আমেরিকার বিরুদ্ধে আগে নিজে লড়াই করেছেন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, তারপর মানুষকে আহ্বান করেছেন।[২২]

---

[২১] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত।

[২২] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

## মিডিয়া ও সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ

উল্লিখিত বিবৃতিটির ব্যাপক প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মুজাহিদ ভাইয়েরা পাকিস্তানে থাকা আঞ্চলিক কিছু মিডিয়া এবং সাংবাদিকের সাথে যোগাযোগ করেন। এ ক্ষেত্রে এমন সাংবাদিকদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, যারা জনপরিসরে কিছুটা হলেও আস্থার জায়গা ধরে রাখতে পেরেছেন, বিবৃতির মূলকথার প্রতি যাদের সামান্য হলেও আন্তরিকতা রয়েছে এবং যাদের মাধ্যমে শায়খের দাওয়াতের পক্ষে বেশি থেকে বেশি জনমত গঠন সম্ভব। যেহেতু দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করে অ্যাকাডেমিক আঙ্গিকে বিবৃতিটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাই সাধারণ মানুষ অনেক কিছু বুঝবে না। তা ছাড়া এত বিস্তারিত লেখা পড়ার আগ্রহও মানুষের থাকে না। এ সবকিছু বিবেচনা করে তারা সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যাতে তারা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি তুলে ধরে পারেন। যেমনটা আশা করা হয়েছিল, ফলাফল ঠিক তেমনই হয়েছিল। বিবৃতিটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া-সহ এশিয়ার মুসলিম জনসাধারণ শায়খের বক্তব্যের সঙ্গে নজিরবিহীন একাত্মতা প্রকাশ করে। এরপর থেকেই শায়খ উসামা রহ. তাদের কাছে ইসলামের প্রতীকে পরিণত হন। রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট, বাজার-বন্দর এবং দেওয়ালে দেওয়ালে শায়খের ছবি শোভা পেতে থাকে। বাড়িতে, গাড়িতে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর ছবি ঝোলানো হয়। এমনকি গেঞ্জি এবং টি-শার্টেও তাঁর ছবি ছাপা হতে থাকে।



জালালাবাদে পাকিস্তানি সাংবাদিক হামীদ মীরের সাথে শায়খ উসামা রহ.

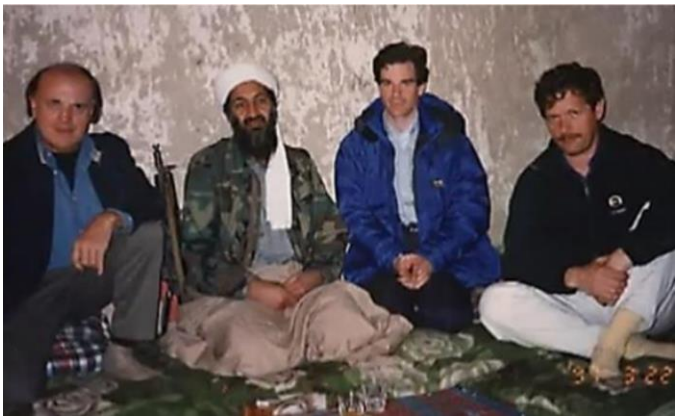


তোরাবোরা পাহাড়ে আব্দুল বারী আতওয়ানের সাথে শায়খ উসামা রহ.

আব্দুল বারী আতওয়ান ছিলেন লন্ডনভিত্তিক আরবী পত্রিকা 'আল-কুদসুল আরাবী'-এর চিফ এডিটর। আরব সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে ভাইয়েরা তাকে বাছাই করেন। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে শীতের মৌসুমে তিনি জালালাবাদে আসেন। তোরাবোরা পাহাড়ে তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা, চারপাশ তুষারে আচ্ছাদিত। এমনই এক শীতের রাতে শায়খের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। শায়খের দিলখোলা ব্যক্তিত্ব, উদার দৃষ্টি আর আচার-ব্যবহারে তিনি যারপরনাই মুগ্ধ হন। অভিভূত হয়ে তিনি শোনেন শায়খের কথা—উম্মত আজ আগ্রাসনের শিকার। এই আগ্রাসন রুখতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এরপর থেকেই আব্দুল বারী আতওয়ানের কলম ও জবান আল-কায়েদার মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতে থাকে। আমেরিকার জুলুম-অত্যাচার, আগ্রাসি পররাষ্ট্রনীতি এবং উম্মতে মুসলিমার সম্পদের ওপর তাদের লুটতরাজের বিরুদ্ধে তিনি জবান ও কলম চালাতে থাকেন। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পথ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তাঁর মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আল-কায়েদার কোনো অভিযান সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি অসাধারণ সব উত্তর দিতেন। অভিযানের পেছনে কোন কোন পরিস্থিতি ও ঘটনা দায়ী—তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরতেন। শায়খের পক্ষ নিয়ে বিরোধীতাকারীদের খণ্ডন করতেন। তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর কথা আলোচনা করতেন। বিলাসী জীবনের পরিবর্তে কেন তিনি পাহাড়ি জীবন বেছে নিয়েছেন—তার বর্ণনা দিতেন। শায়খের লজ্জাশীলতা, বদান্যতা, অতিথিপরায়ণতা এবং মহানুভবতার কথা এমনভাবে আলোচনা করতেন, শুনে মনে হতো তিনি হয়তো আল-কায়েদারই সদস্য। অথচ শায়খের সাথে তার সাক্ষাৎ ছিল খুবই অল্প সময়ের।

শায়খ উসামা রহ. বিশ্বাস করতেন, পশ্চিমা শাসকদের রাজনৈতিক পলিসি পরিবর্তনে পশ্চিমের জনসাধারণ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। যেমনটা ভিয়েতনাম যুদ্ধে ঘটেছিল। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত এ জন্য নেওয়া হয়নি যে, তারা ভিয়েতনামে অত্যন্ত বাজেভাবে মার খাচ্ছিল। এমনকি তাদের নিহত সৈনিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫৭ হাজারে। বরং মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তীব্র জনরোষ। মার্কিন সরকার যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালানোর জন্য (ড্রাফট) আইন করে সাধারণ জনগণকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করে, তখন সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসাধারণ রাজপথে নেমে আসে। পথে পথে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হতে থাকে। আমেরিকার প্রায় সব সাধারণ মানুষই এতে সমর্থন জানায়। ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এ কারণেই শায়খ রহ. পশ্চিমের জনসাধারণের কাছেও বার্তা প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষ করে আমেরিকার জনগণকে লক্ষ্য করে তিনি বার্তা পাঠানোর উদ্যোগ নেন। কারণ, তিনি তো আমেরিকার বিরুদ্ধেই জিহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে মার্কিন সংবাদমাধ্যম CNN ও ABC-এর কয়েকজন সাংবাদিককে শায়খের সাথে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা হয়।



মার্কিন সংবাদমাধ্যম CNN-এর কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে শায়খ রহ.

এমনইভাবে ব্রিটিশ টেলিভিশিন চ্যানেল 4 এবং দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ককেও শায়খ ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। পশ্চিমা সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমা দেশগুলোর সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে আমেরিকার নাগরিকদের সতর্ক করা। শায়খ তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'তাদের দেশের শাসকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক নীতি প্রণয়ন করে, আমাদের পবিত্র ভূমিতে আগ্রাসন চালায়।

শাসকদের এসব জুলুম-অত্যাচারে পশ্চিমা নাগরিকরাও সমানভাবে শরীক। কারণ, তারাই এ শাসকদের নির্বাচন করেছে, তাদের ট্যাক্সের টাকা ব্যবহার করেই তাদের শাসকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ইসরাইলকে সহায়তা দিচ্ছে। তাই, তারাও মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হবে। এই হামলার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী।'

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার খবরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল আসন্ন ঝড়ের সতর্কবার্তা। আলোচক, বিশ্লেষক ও গবেষকরা এই বিবৃতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, এটা কেবল শুরুমাত্র। আমেরিকার বিরুদ্ধে শায়খ উসামা রহ. যে মিডিয়াযুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তাতে তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার শত্রুতার কথা স্পষ্টভাবে আলোচনা করতেন, মার্কিন ও পশ্চিমা দখলদারিত্ব থেকে হারামাইনের মাটিকে মুক্ত করার কথা তুলে ধরতেন। তবে শায়খের আলোচনার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি হারামাইনের মাটিতে মার্কিনিদের আগ্রাসনকে ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর ইসরাইলের আগ্রাসনের সাথে তুলে করে কথা বলতেন। বিশ্বব্যাপী আমেরিকা মুসলিমদের ওপর যে জুলুম-অত্যাচার করে যাচ্ছে, তাকে তিনি তুলনা করতেন ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ওপর জায়নবাদী ইহুদীদের অত্যাচারের সাথে। ফলে তাঁর এই আহবানে নতুন এক মাত্রা যুক্ত হয়। মানুষের মধ্যে এর প্রভাবও ব্যাপক আকারে পড়তে থাকে। আমেরিকার বিরুদ্ধে শায়খের পরিকল্পিত ও কেন্দ্রীভূত এই প্রচারণার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর সরকারবিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া। মার্কিনবিরোধী এই প্রচারণা ধীরে ধীরে আমেরিকার সীমা পেরিয়ে বৈশ্বিক মিডিয়া এবং আরবের মিডিয়াতেও চলে আসে। এ ক্ষেত্রে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম 'আল-জাযীরা' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আল-জাযীরার অসীলায় শায়খের এই বার্তা পৌঁছে যায় লাখো-কোটি মুসলমানের দুয়ারে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের এই জোয়ার আছড়ে পড়ে জিহাদী দলগুলোর ওপরেও। এর মাধ্যমেই জিহাদী আন্দোলনগুলো গ্লোবালাইজেশনের দিকে একধাপ এগিয়ে যায়। যদিও আরবের অধিকাংশ ইসলামী সংগঠন নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থায় তেমন কোনো পরিবর্তন আনেনি এবং শায়খের এই আহ্বানে তেমন কোনো সাড়াও দেয়নি, কিন্তু ২০০১ সালের শেষ দিকে (৯/১১-এর পরে) খোদ আমেরিকা একরকম জোর করেই এ সব সংগঠনকে শায়খের বাতলানো পথেই যেতে বাধ্য করে।[২৩]

শায়খ উসামা রহ. সৌদি আরব, পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের উলামা-মাশায়খের নিকট চিঠি পাঠান। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেন।

[২৩] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ

তাঁদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন এই অবস্থায় নিজেদের ওপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। কারণ প্রয়োজনের সময় চুপ থাকার অবকাশ নেই।

চেচনিয়া থেকে ফিরে আসার পর ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে শায়খ রহ. আমাকে (লেখক) আবারও চেচনিয়া পাঠান। সাথে শায়খের এই বিবৃতি **'أخرجوا المشركين من جزيرة العرب'** এবং কমান্ডার খাত্তাব (সামির সুওয়াইলিম) রহ.-এর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি এবং একটি মৌখিক বার্তা দিয়ে দেন। শায়খ তাঁর কাছে আবেদন জানান, তিনি এবং তাঁর অনুগত সকলে যেন শায়খের কাছে চলে আসেন। চেচনিয়াতে ততদিনে কমান্ডার খাত্তাব রহ. এবং তাঁর দলের দাওয়াতী ও সামরিক কার্যক্রম অনেক ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব না হওয়ায় নিজের নায়েব হাকীম মাদানীকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে দেন। বার্তা পৌঁছানোর একমাসের মধ্যেই হাকীম মাদানী শায়খের সাথে দেখা করতে চলে আসেন। তিনি আমাদের সাথে নাজমুল জিহাদ কলোনিতে বেশ কিছুদিন অবস্থানও করেন।

শায়খ ফাতহী আবু সাইয়াফ রহ.-এর উদ্দেশ্যেও একটি মৌখিক বার্তা পাঠানো হয়েছিল। সে বার্তায় শায়খ তাঁকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে দক্ষ এমন কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে বের করতে বলেছিলেন, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে তাদের সাথে কাজ করেছে।

শায়খ উসামা রহ. আমাকে (লেখক) বিশেষ একটি বার্তা দিয়ে সুদানের প্রথম সারির বড় একজন আলেমের কাছেও পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন আফগানিস্তানে হিজরত করেন। এমনকি তাঁর ও তাঁর পুরো পরিবারের সফরের যাবতীয় খরচ এবং ভরণপোষণের সকল দায়িত্ব শায়খ নিজে বহন করবেন বলেও জানিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি দাওয়াতী মাসলাহাতের কারণে সুদানেই থাকার ইচ্ছাপোষণ করেন।

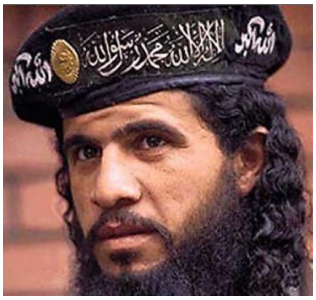
শায়খ উসামা রহ. আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে থাকা বিভিন্ন জিহাদী দলের নেতাদের সাথেও যোগাযোগ করে তাঁদেরও এই মিশনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। শায়খ উপলব্ধি করেতে পেরেছিলেন, আঞ্চলিক সংগঠনের যুগ শেষ; আগামীর বিশ্বে এ সব ক্ষুদ্র দল আর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আনতে পারবে না। বরং এখন কর্তব্য হলো বহিঃশত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে পুরো উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা, জাযীরাতুল আরব থেকে তাদের উৎখাত করা এবং এ লড়াইকে ফিলিস্তিন ও আল-আকসার ওপর চেপে বসা ইহুদীবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো গুরুত্ব দেওয়া। জালালাবাদে এমন অনেক ভাই ছিলেন, যারা বিশেষ কোনো দলের সাথে যুক্ত ছিলেন না। শায়খ রহ. তাদেরও ভোলেননি। তিনি তাঁদেরও দাওয়াত দিতেন, আদর-আপ্যায়ন করতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-দর্শন ও কর্মপন্থা তাদের সামনে তুলে ধরতেন।

হামযা গামেদী (সালেহ সাইদ আলে বাতীহ)-এর মুজাহিদ বাহিনী তখন তাজিকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে এসেছিল। শায়খ রহ. তাদের সাথেও যোগাযোগ করেন। এই বাহিনীতেই মোল্লা বেলাল (আব্দুর রহীম নাশিরী) ছিলেন। আল্লাহ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন। পরে তিনিই এডেন বন্দরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোলে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ বাহিনীতে তাঁর ভাগিনা আযযাম রহ.-ও ছিলেন, যিনি নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানে এমন অনেক আরব মুজাহিদ ছিলেন, যারা হেকমতিয়ারের সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। শায়খ রহ. তাদের সাথেও যোগাযোগ করেন এবং তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। শায়খের চেষ্টায় অনেকে হক বুঝতে পারেন এবং হেকমতিয়ারের দল ছেড়ে তালেবানের কাতারে শামিল হয়ে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করেন।



হামযা গামেদী হাফি.


কমান্ডার শহীদ খাত্তাব রহ.

শায়খের এই সংগ্রাম এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ আসতে থাকে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ককেশাস, ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে শায়খের কথা শুনতে, তাঁর নির্দেশনা গ্রহণ করতে। শায়খ রহ.-ও নিজের সময়, অর্থ-সম্পদ সবকিছু উজাড় করে দিতে থাকেন। আগত মুসলমানদের সামনে তিনি ক্রুসেডার ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্বরূপ তুলে ধরতেন, তাদের ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কথা আলোচনা করতেন, তাদের শক্তিমত্তার প্রতি জন্ম নেওয়া ভয়ভীতি দূর করতেন। তিনি বলতেন, ইহুদী ও ক্রুসেডাররা বাস্তবে একেবারেই দুর্বল, ওরা কাপুরুষ। ওদের না আছে কোনো আদর্শ, আর না আছে নীতি-

নৈতিকতা। সম্পদ ও সাজসরঞ্জাম ছাড়া তাদের কিছুই নেই। ইসলামের সৈনিকদের সাথে সত্যিকার যুদ্ধের মুখোমুখি হলে সবকিছু ছেড়ে তারা প্রাণ নিয়ে পালাবে।[২৪]

শায়খ উসামা রহ. সুযোগ পেলেই নওজোয়ান ও মুজাহিদরদেকে রিবাত ও ইদাদের ভূমিতে এসে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেন। ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলোতে গেলে বক্তৃতা দিতেন; জুমার দিনে অনেক মানুষের খাবারের আয়োজন করতেন; ঈদের দিনে, বিয়ের অনুষ্ঠানে এবং যেখানেই কোনো বড় জমায়েত হতো, সেখানেই ইসলামের কথা বলতেন, জিহাদের দাওয়াত দিতেন। একবার আল-ফারুক ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে ভাইদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

> 'আল্লাহর শপথ, আমি আশা করি, মুজাহিদদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীতেই আল্লাহ তাআলার বরকত দেবেন। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যদি আপনারা ধৈর্য ও তাকওয়ার পথে চলেন, তাহলে আপনাদের নিয়েই আমরা জল-স্থল পাড়ি দেব, আরব-অনারব জয় করব। আজ আমরা ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছি, খিলাফতের পতাকাতলে বিশ্বের সব মুসলিম দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা করছি। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন জুলুমের ঘোর অমানিশা চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে, পূর্ব থেকে পশ্চিম অন্যায়, অবিচার, শিরক ও কুফরের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এমন এক সময়েই ঈমানদারদের সোনালি ইতিহাস রচনার কাজ করছি। সৌভাগ্যবান তো সে-ই, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাওহীদের এই পতাকাতলে দৃঢ়পদ রাখবেন।'

## শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু: আমেরিকার মুখোমুখি আফগান নেতৃবৃন্দ[২৫]

পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে থাকতে থাকতেই আমেরিকা তার পরীক্ষিত বন্ধু ও দাস আলে সৌদের মাধ্যমে শায়খ উসামাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে। কখনো আশা দিয়ে, কখনোবা ভয় দেখিয়ে বারবার তারা চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সৌদি সরকারের উঁচু স্তরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকেও তারা আলোচনার জন্য পাঠায়। তারা এসে জালালাবাদ প্রশাসনের সাথে, বিশেষ করে শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর সাথে শায়খ উসামার হস্তান্তর-প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও করে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে আলে সৌদ আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। বাস্তবে এই স্বীকৃতি ছিল একটি টোপ। আলে সৌদের

---

[২৪] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

[২৫] শায়খ উসামা রহ.-কে হত্যা বা গুম করার জন্য আমেরিকা আরও অনেকভাবে চেষ্টা করেছিল। বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. রচিত 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী' বইটি দেখা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ছিল, স্বীকৃতি দিলে তালেবান হয়তো শায়খ উসামাকে তাদের হাতে তুলে দেবে, নিদেনপক্ষে হস্তান্তরের ব্যাপারে নমনীয় হয়ে তাদের সহযোগিতা করবে। এ আলোচনা সামনে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় একবার সৌদি রাষ্ট্রদূত সালমান উমরী জালালাবাদ এসেছিল। শায়খ ইউনুস খালেসের সাথে দেখা করে কোনো ধরনের রাখঢাক না করেই নির্লজ্জভাবে সে সরাসরি শায়খ উসামাকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। অথচ এর আগেই ১৯৯৪ সালে তারা শায়খ উসামার নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছিল। তখন শায়খ সুদানে ছিলেন। সৌদি রাষ্ট্রদূতের এমন অহংকারী আচরণে শায়খ ইউনুস খালেস বিচলিত তো হলেনই না; বরং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে এমন কিছু কথা বললেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লেখা থাকবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার এই কথাগুলো স্বরণ রাখবে। তিনি বললেন—

> ‘সালমান, আমরা আফগান জাতি। হারামাইনের গরু-ছাগলও যদি এসে আমাদের কাছে আশ্রয় চায়, আমরা তো তাদেরও আশ্রয় দেব, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব, কারো হাতে তুলে দেব না। আর তুমি কি-না এমন এক ব্যক্তিকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে বলছ, যাঁর মধ্যে আমরা শুধু জিহাদ, নুসরত আর ইয়ানাতই দেখেছি। আফগানের এই মাটিতে যিনি নিজ হাতে নিজের অসংখ্য সাথি ও শহীদদের কবর দিয়েছেন। এমন ব্যক্তিকে তো কোনো অবস্থাতেই আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেব না।’

প্রত্যুত্তরে সালমান বলেছিল—‘মনে রাখবেন, সৌদিতে যত সন্ত্রাসী (জিহাদী) কর্মকাণ্ড হবে, এর জন্য সৌদি সরকার আপনাকেই দায়ী মনে করবে।’ শায়খ ইউনুস খালেস রহ. জবাবে বলেছিলেন—‘ভালো তো, তাদের বলে দেবেন সৌদিতে যা হবে, এর জন্য ইউনুস খালেসই দায়ী।’[২৬]

পরবর্তীতে এক ঈদ উপলক্ষ্যে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর দেখা হয়। দেখামাত্রই শায়খ ইউনুস খালেস শায়খ উসামাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। উৎসাহে টগবগ করতে থাকা, কিন্তু বয়সের ভারে ভেঙে ভেঙে যাওয়া গলায় অগাধ মুহাব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে বলেন—

> ‘আমার বাহ্যিক অবস্থা দেখে ভাববেন না যে, বুড়ো হয়ে গেছি বা আমার বয়স ৯০ হয়ে গেছে। এই তো গতকালই আমার এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শহরের মুহাব্বতে তার নাম রেখেছি ‘মাদীনা’। আমি

[২৬] আত-তালিবান বাইনা আমালিল মুসতাকবিল ওয়া মাখাতিরিল মুআমারাহ : আল-মুজাহিদুন ম্যাগাজিন

এখনো শক্তিশালী। যে-কোনো আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইস্পাতের ঢাল হয়ে আমি সব সময়ই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাব।'

একবার তিনি শায়খ উসামা রহ.-কে বলেছিলেন—

'আমার কাছে শুধু আমার জানটাই আছে। এই জান আমার কাছে যদিও অনেক প্রিয়, কিন্তু আপনার জীবনের জন্য আমার এই জানটাও আমি দিতে প্রস্তুত। আপনাকে রক্ষা করতে আমার বুক পেতে দিতেও দ্বিধা করব না। যতদিন আপনি আমাদের মেহমান, ততদিন কেউ আপনাকে স্পর্শও করতে পারবে না। এমনকি তালেবানের পক্ষ থেকেও যদি আপনার ওপর আঘাত আসে, তবু আমাকে জানাবেন। যদিও আমার সামর্থ্য খুবই কম, তবু সাধ্যানুযায়ী আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।'[২৭]

আল্লাহ তাআলা শায়খ ইউনুস খালেসের ওপর রহম করুন। তাঁর মতো বীরপুরুষ দুনিয়াতে খুব কমই এসেছে।

এই অবস্থান শুধু শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর একার ছিল না; অন্যান্য অনেক মুজাহিদ নেতৃবৃন্দও এমন অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন; অথচ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল একেবারেই শূন্যের কোটায়। এই মর্দে মুজাহিদদের বুক টান করে দাঁড়ানোর এমন ঘটনা শুনে যে-কারো গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে, কলমের কালিতে তাঁদের এই বীরত্ব ও সাহসিকতার তরজুমানি করা প্রায় অসম্ভব। সামনে এর কিঞ্চিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

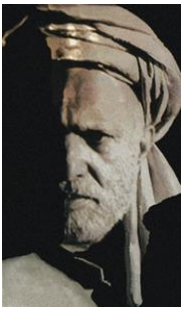
শায়খ উসামা রহ.-এর হস্তান্তরের ব্যাপারে সমঝোতার পথে চেষ্টা করেও যখন সৌদি সরকারের কোনো লাভ হলো না, তখন তারা বলপ্রয়োগের পথ বেছে নিল। এ জন্য তারা নিজেদের মুনাফিক দাসদের ব্যবহার করা শুরু করল, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে দীন-ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে নানগারহার প্রদেশের তৎকালীন গভর্নর হাজী কাদির। আল্লাহ তায়ালা তার উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিন। একবার হাজী কাদির তোরাবোরা পাহাড়ে শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে লিখেছিল, জালালাবাদের গভর্নর ভবনে যত দ্রুত সম্ভব সে শায়খের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করছে। তার পরিকল্পনা ছিল, শায়খ উসামা রহ. এবং তাঁর সঙ্গীদের বন্দি করে কাবুল নিয়ে যাবে। কাবুল তখন বুরহানুদ্দিন রব্বানী[২৮] ও আহমদ শাহ মাসউদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শায়খ উসামা রহ. হাজী কাদিরের পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, সুদান থেকে আফগানিস্তানে আসার

[২৭] শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি. থেকে বর্ণিত।

[২৮] প্রসিদ্ধ একজন মুজাহিদ নেতা। সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে তিনি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ক্রুসেডারদের সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

কিছুদিন পরেই রব্বানী ঘোষণা করেছিল, সুযোগ পেলেই সে শায়খ উসামাকে আটক করে সৌদি সরকারের হাতে তুলে দেবে।


বুরহানুদ্দিন রব্বানী


হাজী কাদির

হাজী কাদির বুঝতে পেরেছিল, আজ না হোক কাল জালালাবাদ তালেবানের দখলে যাবেই। তাই তালেবানের হাতে জালালাবাদের পতনের আগেই যে-কোনোভাবে শায়খ উসামাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনিই তার এই বান্দাকে হেফাযত করলেন।

শায়খ উসামা রহ. তোরাবোরা পাহাড়ে অবস্থানরত সকলের সাথে পরামর্শ করেন—হাজী কাদিরের সাথে দেখা করতে যাবেন কি না। পরামর্শসাপেক্ষে অবশেষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তবে কঠোর নিরাপত্তা নিয়ে। ঘটনাক্রমে শায়খ উসামা রহ. যেদিন সকালে হাজী কাদিরের সাথে দেখা করার জন্য বের হন, সেদিনই খবর আসে, জালালাবাদের গভর্নর হাজী কাদির পালিয়ে কাবুলে চলে গেছে। কারণ, তালেবানযোদ্ধারা জালালাবাদ দখলের জন্য তোরখাম শহর অবরোধ করে ফেলেছে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য কিছু ভাই বাইরে বের হন। রাস্তায় গিয়ে দেখেন, অস্ত্রধারী যোদ্ধারা গাড়ি নিয়ে জালালাবাদের দিকে ছুটে চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে তারা জালালাবাদ যাচ্ছে। ভাইয়েরা খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন যে, আল্লাহ জালেমদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে শায়খ উসামা রহ.-কে সুস্থ ও নিরাপদ রেখেছেন।

## নেতৃবৃন্দের শাহাদাত এবং জালালাবাদে তালেবানের প্রবেশ

জালালাবাদ প্রশাসনের মজলিসে শূরার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি—কমান্ডার সাযনুর ও ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—তালেবান মুজাহিদদের স্বাগত জানাতে

এবং তাদের হাতে জালালাবাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে একটি গাড়িবহর নিয়ে তোরখাম ক্রসিংয়ের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু তাকদীরে ভিন্ন কিছু লেখা ছিল। জালালাবাদ ও তোরখামের মধ্যবর্তী এক অঞ্চলে কিছু জায়গা জুড়ে এক মুনাফিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল। 'শিমালী' নামের এক ব্যক্তির ভাই ছিল সে।

রুশবিরোধী জিহাদের সময় জালালাবাদ ফ্রন্টে যে-সব মুনাফিক ও দুষ্কৃতিকারী সক্রিয় ছিল, এই শিমালী ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা আর ফিতনা-ফাসাদের গোড়া ছিল সে। সে সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ মিলে তাকে হত্যা করেছিলেন। কমান্ডার সাযনুর এবং ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদও ছিলেন তাদের মধ্যে। শিমালীর ভাই মানজি জালালাবাদ আর তোরখামের মধ্যখানের এই জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে তার ভাইয়ের হত্যার বদলা নেবে। সে আগে থেকেই ওত পেতে ছিল। ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ ও কমন্ডার সাযনুরের গাড়ি যখন তার এলাকায় পৌঁছায়, সে গাড়ি আটকে তাঁদের নামতে বলে। তাঁরা বুঝতে পারেন, লোকটির অসৎ উদ্দেশ্য আছে। বিলম্ব দেখে মানজি ভাইদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করার আদেশ দেয়। ফলে সেখানে বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় কাফেলার অনেক ভাই শহীদ হন। ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ এবং কমন্ডার সাযনুরও এতে শাহাদাতবরণ করেন। আরপিজি শেলের আঘাতে তাঁদের গাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। তালেবান মুজাহিদগণ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই শিমালীর ভাই মানজি পাকিস্তান পালিয়ে যায়।

জালালাবাদে তালেবানের প্রবেশে সবাই আনন্দিত হলেও এই ঘটনায় সবাই মর্মাহত হন। বিশেষ করে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. খুবই শোকাহত হন। কারণ, নিজেদের ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে তাঁরা সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। জিহাদ শুরুর পর থেকেই আল্লাহর দীন এবং দুর্বল মুমিনদের নুসরতের জন্য তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা এ পথে অটল ছিলেন, অথচ অনেকে তখন আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়ে পিছুটান দিচ্ছিল। তাঁরা কোনো ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বেও জড়াননি। নিজেদের এই পবিত্রতা নিয়েই অবশেষে তাঁরা আপন রবের কাছে হাজির হয়েছেন। তাঁদের ব্যাপারে এমনটাই আশা করি, আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী।

১৯৯৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তালেবান জালালাবাদে প্রবেশ করে। তালেবানের শাসনে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির জোয়ার বইতে থাকে। চারিদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার এক আবহ তৈরি হয়। অন্যদিকে তালেবানের উপস্থিতিতে শত্রুদের মধ্যেও ব্যাপক ভীতি সঞ্চার হয়। চোর, ডাকাত আর ছিনতাইকারীরা সব পালিয়ে যেতে থাকে।

তালেবানের সাথে আল-কায়েদার ভাইদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। শায়খ যখন সুদানে ছিলেন, তখন খোস্তে আল-কায়েদার ট্রেইনিং ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন আবু আতা তিউনিসী রহ. ও আবুল ফারাজ লীবী ফা.আ.। তাঁরা তালেবানের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। শায়খের

কাছে তারাই তালেবানের ব্যাপারে সন্তোষজনক রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তালেবানের ব্যাপারে তখন নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হতো। এমনই একটি গুজব তখন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তালেবান মূলত আমেরিকা ও আইএসআই-এর তৈরি। এই প্রোপাগান্ডার কারণে কিছু ভাই তালেবানের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা রাখতেন। আবু আতা তিউনিসী ও আবুল ফারাজ লীবীর রিপোর্টের ফলে তালেবানের ব্যাপারে ভাইয়েরা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন।

আন্দোলনের শুরুর দিকেই তালেবান খোস্ত জয় করেছিল। খোস্তে আল-কায়েদার বেশকিছু ট্রেইনিং ক্যাম্প ছিল তখন। খোস্ত জয় করার পরেই তারা আল-কায়েদার ক্যাম্পে এসে সেখানে থাকা ভাইদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তাঁদের এই আন্দোলন আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আফগানিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এবং বিশৃঙ্খলা দূর করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। মুজাহিদদের ট্রেইনিং ক্যাম্প বন্ধ করা বা তাঁদের কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। অথচ তখনও কিছু আরব মুজাহিদ হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামীর সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

তালেবান যখন জালালাবাদ জয় করে, তখনও ভাইদের মনে তালেবানের সেই উদারতার ছবিই বিরাজ করছিল। জালালাবাদে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিনদুয়েকের মধ্যেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। তালেবানের পক্ষ থেকে কয়েকজন দূত তোরাবোরা পাহাড়ে গিয়ে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, তালেবানের কাছে তিনি ও আরব মুজাহিদগণ সম্মানিত মেহমান হিসেবে থাকবেন। তালেবানের পক্ষ থেকে তাদের ভয়ের কিছুই নেই। তিনি যেন আফগানিস্তানকে নিজের দ্বিতীয় মাতৃভূমি মনে করে স্বাধীনভাবে বাস করেন।

জালালাবাদে তালেবানের শাসনক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর তাঁদের আরেকটি প্রতিনিধিদল শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন এবং আবারও নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তালেবানের এই প্রতিনিধিদলের আন্তরিকতা, সৌজন্যবোধ ও সহমর্মিতা দেখে আনন্দে আল-কায়েদার ভাইদের চোখ থেকে পানি ঝরছিল। সেদিন শায়খ উসামা রহ.-কে এক তালেবান নেতা বলেছিলেন—'শায়খ, আমাদের এই দেশ আফগানদের জমিন না, এটা আল্লাহর জমিন। আমাদের জিহাদও শুধু আফগানদের জিহাদ নয়, সমস্ত মুসলমানের জিহাদ। আফগানিস্তানের প্রতিটি শহরেই আপনাদের (আরব) শহীদদের কবর আছে। আপনারা কোনো বিদেশ-বিভুঁইয়ে না, নিজের দেশেই আছেন, আপনজনদের সাথেই আছেন। আমরা তো সে মাটিকেও পবিত্র মনে করি, যে মাটিতে আপনাদের কদম পড়ে।'[২৯]

[২৯] আত-তালিবান বাইনা আমালিল মুসতাকবিল ওয়া মাখাতিরিল মুআমারাহ : আল-মুজাহিদুন ম্যাগাজিন

## আমীরুল মুমিনীনের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ[৩০]

জালালাবাদে থাকাকালে শায়খ উসামা রহ. আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য দুইবার কান্দাহারে যান। প্রথমবার যান ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ যাত্রায় শায়খের সাথে ছিলেন শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী, শায়খ সাইফ আল-আদল, আবু তারেক তিউনিসী, আবু যিয়াদ মাওসিলী, মুহাম্মাদ রহীম আফগানী, ফযলুর রহমান পাকিস্তানী এবং মুফতী আব্দুর রহীম পাকিস্তানী। মোল্লা আখতার মানসুর রহ. শায়খকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কান্দাহার থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছিলেন। মোল্লা উমর রহ.-এর ইন্তেকালের পর তিনি আমীরুল মুমিনীন নিযুক্ত হন। রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। শায়খ উসামা রহ. শায়খ সাইফ আল-আদল রহ.-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন—'আমীরুল মুমিনীনকে দেখে কোনোভাবেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারব না। দেখামাত্রই তাঁর বরকতময় কপালে চুম্বন করব।'

মোল্লা উমর রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই মোল্লা আখতার মানসুর রহ. আমীরুল মুমিনীনের সাথে শায়খকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমীরুল মুমিনীন শায়খ উসামা রহ.-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁকে মেহমান হিসেবে পেয়ে এবং [আন্তর্জাতিক সব চাপ উপেক্ষা করে] তাঁকে রক্ষা করতে পেরে নিজের ও তালেবানের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একে তো তিনি আরবের মেহমান, অন্যদিকে আফগানযুদ্ধে তাঁদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইকারী মুজাহিদ। মোল্লা উমর রহ.-কে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি অসুস্থ। পুরোনো আমলে হাসপাতালে যে-সব খাট ব্যবহার করা হতো, তেমন একটি লোহার খাটে বসে ছিলেন তিনি। খাটে সাদা তোশকের ওপর সস্তা দামের কালো একটি কম্বল বিছানো ছিল। ছিপছিপে শরীরে গাঢ় রঙের খুবই অল্প মূল্যের ঐতিহ্যবাহী আফগানি পোশাক জড়িয়ে ছিলেন। মাথায় শোভা পাচ্ছিল কান্দাহারি আদলে পেচিয়ে রাখা কালো পাগড়ি।

আমীরুল মুমিনীন খাট থেকে উঠে পড়েন এবং সাদামাটা একটি কামরায় সকলের সাথে গিয়ে বসেন। শায়খ উসামা রহ. কথা বলতে লাগলেন আর তিনি নীরবে গুরুত্বের সাথে শুনতে লাগলেন। এই সাক্ষাতে মোল্লা উমর রহ.-ও তালেবানের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেন। কাবুল জয় করার পর তালেবান কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা করেন। বিশেষ করে আব্দুর রশীদ দোস্তমের বাহিনীর সাথে তালেবানের লড়াই নিয়ে কথা বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি শায়খকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি শায়খের মিডিয়া প্রচারণা কিছুটা কমিয়ে আনা যায়, তাহলে ভালো হবে। এটাও বলে দেন যে, এটি একটি আবেদনমাত্র; কোনো আদেশ না। শায়খ রহ. জবাবে বলেন, আমীরুল

[৩০] এই সাক্ষাতের পুরো বিবরণ শায়খ সাইফ আল-আদল থেকে বর্ণিত।

মুমিনীনের বলার আরও অনেক আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মিডিয়া-তৎপরতা হয়তো কমিয়ে আনা হবে অথবা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হবে। শায়খের কথা শুনে মোল্লা উমর রহ. খুব খুশি হন।

এটি ছিল আমীরুল মুমিনীন রহ. এবং শায়খ উসামা রহ.-এর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ। এর কিছুদিন পরেই কান্দাহার বিমানবন্দরের এক রানওয়েতে পুরোনো একটি রাশিয়ান বিমানের পাখার নিচে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়।[৩১] আমীরুল মুমিনীনের দেহরক্ষীরা নিজেদের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বসার ব্যবস্থা করেন। সেখানে বসেই দুজন কথা বলেন। উভয় সাক্ষাতেই মুহাম্মাদ রহীম আফগানী[৩২] দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সাংবাদিকদের শায়খ উসামা রহ. যে সাক্ষাৎকারগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোর অধিকাংশই আমীরুল মুমিনীনের সাথে শায়খের প্রথম সাক্ষাতের আগের ঘটনা।





আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.

---

[৩১] মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন ছিলেন মোল্লা উমর রহ.-এর মুখপাত্র। তার স্মৃতিচারণমূলক বই 'মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ওয়া তালিবান ওয়া আফগানিস্তান'-এ তিনি লেখেন, জালালাবাদ থেকে কান্দাহার যাওয়ার আগে শায়খ উসামা রহ.-এর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিল ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ১৯৯৭ সালের ২২শে মার্চে পুরো সাক্ষাৎকারটি তারা সবিস্তারে ছাপে। এ সাক্ষাৎকারেই শায়খ রহ. সৌদি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হওয়ার পর মোল্লা উমর রহ. ২৫শে মার্চ শায়খ উসামাকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। এ সাক্ষাতেই তিনি সৌদিকে হুমকি দেওয়া বন্ধের আবেদন করেন। কেননা সৌদির সাথে বিরোধে জড়ানো তালেবানের পক্ষে সম্ভব না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর ব্যাপারে কিছু বলেননি।

৩২ মুহাম্মাদ রহীম আফগানী ছিলেন প্রবীণ একজন মুজাহিদ। শায়খ উসামা রহ. অনুবাদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেসকল ভাইদের ওপর আস্থা রাখতেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ২০০৮ সাল থেকে গুয়ান্তানামো কারাগারের ক্যাম্প ৮-এ বন্দি আছেন। আমেরিকা যেসকল বন্দিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, শুধু তাদেরকেই ক্যাম্প ৮-এ রাখে। আল্লাহর কাছে তাঁদের সকলের দ্রুত মুক্তি কামনা করছি।

জালালাবাদে শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে তালেবানের ঊর্ধ্বতন অনেক নেতৃবৃন্দ দেখা করতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে নানগারহার প্রদেশের গভর্নর মৌলবী কবীর হাফি.-ও ছিলেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মৌলবী ইহসানুল্লাহ ইহসান-ও একবার শায়খের সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি আফগান রীতিতে শায়খের সাথে মুয়ানাকা করে পকেট থেকে নিজের গাড়ির চাবি এবং অস্ত্র (বেল্ট-সহ রাশিয়ান ম্যাকারভ পিস্তল) বের করে শায়খের সামনে রেখে বলেন—'আমার সাথে এখন এগুলোই আছে, আমি চাই এগুলো আপনি গ্রহণ করুন।' শায়খ উসামা কৃতজ্ঞচিত্তে হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। অনেক পীড়াপীড়ি করার পরে শেষমেশ গাড়িটি তিনি ফেরত নেন, কিন্তু পিস্তল শায়খ উসামা রেখে দিতে বাধ্য হন।

মৌলবী ইহসানুল্লাহ ইহসানের আরেকটি ঘটনা মনে রাখার মতো। শায়খ উসামাকে হস্তান্তরের ব্যাপারে সৌদি রাষ্ট্রদূত উমরীর সাথে কথোপকথন চলাকালে এক পর্যায়ে উমরী বলে বসে—'আপনারা উসামাকে আশ্রয় দিয়ে আমেরিকার সাথে টক্কর নিচ্ছেন? আপনারা কি জানেন না, আমেরিকার বিরোধিতা করে কেউ বাঁচতে পারে না?' উত্তরে মৌলবী ইহসানুল্লাহ বলেছিলেন—'আমার দীন আমাকে শিখিয়েছে, কিছু বিষয় শুধু আল্লাহর জন্যই করতে হয়। আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা যায় না। একমাত্র আল্লাহই ইজ্জত দেন, তিনিই জিল্লতি দেন। আমরা কোনো মুসলিমকে কাফেরের হাতে তুলে দেব না। আমেরিকার যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে করে দেখাক।'

জালালাবাদ থাকাকালে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-সহ তালেবানের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে শায়খ উসামা রহ.-এর ধারাবাহিক এই দেখাসাক্ষাতের ফলে আল-কায়েদার ভাইদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়। তাঁরা একে সুন্দর আগামীর শুভ সূচনা হিসেবে গ্রহণ করেন। তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা মোকাবিলা করার জন্যও তাঁদের এমন কিছু মানুষের প্রয়োজন ছিল, যাঁরা নিজ আদর্শে পাহাড়ের মতো অটল, বিপদের তীব্র ঘূর্ণির সামনে অবিচল, দুনিয়ার সকল স্বার্থ যাদের কাছে তুচ্ছ ও নগণ্য। যাঁরা সামান্য দুনিয়ার জন্য দীন ও ঈমান বিক্রি করবে না, যাঁরা হবে নববী যুগের সে সব আনসারদের প্রতিচ্ছবি, যে আনসারগণ নবীজীর হাতে হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন তাঁকে রক্ষা করার, আল্লাহর দীনকে সাহায্য করার; এ জন্য তাঁরা স্বজাতির অভিজাত ব্যক্তিদের কুরবানী বা সম্পদের নজরানা—কোনো কিছুরই পরোয়া করেননি।

বাস্তবেও তাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। মুমিনদের সাথে মিত্রতা এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ জন্য তাঁদের রাষ্ট্র-রাজত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর এই দাস্তান ইতিহাসের পাতায় নুরের হরফে লেখা থাকবে চিরকাল। যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দিয়ে যাবে, মুসলমানরা যদি দীনকে

আঁকড়ে ধরে আর রবের শরীয়তের নুসরতে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তাদের পরাজিত করা দুনিয়ার কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব না।

## তালেবানের কাবুল জয়

জালালাবাদে তালেবানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই তাঁরা কাবুলের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালেবানের হাতে কাবুলের পতন হয়। এটি ছিল তালেবান মুজাহিদদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট এক সাহায্য এবং মহাবিজয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল বিশাল এক জোট বাহিনী। আফগান মুজাহিদদের প্রায় সবগুলো দল তাঁদের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল। অথচ একদিন আগেও তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল, গোটা কাবুল শহর তাদের জুলুম-নির্যাতন আর অত্যাচারে ছিল অতিষ্ঠ। একদিন আগেও নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকা দলগুলো এভাবে হুট করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পেছনে একমাত্র কারণ ছিল যেভাবেই হোক তালেবানকে ঠেকানো। আব্দুর রশীদ দোস্তম ও আহমাদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বে শিয়া ও কমিউনিস্ট দলগুলো তাদের চিরশত্রু হেকমতিয়ারের সাথে জোটবদ্ধ হয়। অন্যদিকে হাজারা শিয়াদের শত্রু আব্দে রাব্বির রসুল সাইয়াফও তাদের সাথে মিলিত হয়ে নিজের আহলুস সুন্নাহর ভাইদের দিকে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দেয়। এভাবে বিরাট এক জোট তৈরি হয় তালেবানের বিরুদ্ধে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল কাবুলকে ফিতনাবাজদের নাপাকি থেকে পাক করা। তাই, তালেবানের আগমনে ভীত হয়ে তারা উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ পাঞ্জশীর উপত্যকার দিকে পালিয়ে যায়।

যে-রাতে তালেবান কাবুলে প্রবেশ করে, সে রাতেই তালেবানের একটি ইউনিট কাবুলে অবস্থিত জাতিসংঘের দপ্তরে হামলা চালিয়ে রাশিয়ার এজেন্ট নজিবুল্লাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। সে ছিল আফগানিস্তানের সর্বশেষ কমিউনিস্ট শাসক। তালেবানের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে জাতিসংঘের দপ্তরে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল, জাতিসংঘের কাছে আশ্রয় নিলে হয়তোবা আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু সে আশা ততক্ষণে নিরাশায় পরিণত হয়েছিল। তাকে এবং তার ভাইকে হত্যা করে কাবুলের রাস্তায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যেন গোটা বিশ্ব জালেমের পরিণতি দেখে এবং তাদের এই পরিণতি মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।[৩৩]

[৩৩] মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন তার স্মৃতিচারণমূলক বই 'মোল্লা উমর, তালেবান ও আফগানিস্তান'-এ লিখেছেন, 'ফিল্ড কমান্ডারগণ কাবুলে প্রবেশের আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নজিবুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কেননা নজিব বেঁচে থাকলে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চাপের কারণে তাকে রক্ষার চেষ্টা করা হবে। নজিবের মতো এমন একজন গণহত্যাকারী জাতীয় শত্রুকে কোনোভাবেই সে সুযোগ দেওয়া যায় না। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় জাতীয় গোয়েন্দা



কাবুলের কসাই, রাশিয়ার দালাল সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ ও তার ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড

## জালালাবাদ ছেড়ে কান্দাহারের পথে

জালালাবাদে থাকাকালে শায়খ উসামা রহ.-কে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হয়। এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল আহমদ শাহ মাসউদ। শায়খকে গ্রেফতার বা হত্যা করার উদ্দেশ্যে সে একটি মিলিটারি অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। কাবুল পতনের আগে বুরহানুদ্দীন রব্বানীও ঘোষণা করেছিল, সে শায়খ রহ.-কে গ্রেফতার করে সৌদি সরকারের হাতে তুলে দেবে।

১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে হামলার ঘটনাটি ঘটে। একদিন জালালাবাদের একটি গিরিপথে টহল দেওয়ার সময় তালেবানযোদ্ধারা একটি সশস্ত্র কাফেলাকে গ্রেফতার করে। সেদিন আবু আতা তিউনিসীর বিয়ে উপলক্ষ্যে নাজমুল জিহাদ কলোনিতে উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল। গ্রেফতারকৃতদের থেকে জানা যায়, কলোনিকে টার্গেট করে একটি হামলার পরিকল্পনা করা

---

সংস্থা 'KhAD'(খাদামাতে ইত্তিলাআতে দাওলাতি)-এর প্রধান থাকাকালে সে পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছিল। এ ছাড়া তালেবান অন্য কোনো যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করেনি। আফগান কমান্ডার ইসমাইল খান হাজারের অধিক তালেবান-সদস্যকে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিল, তিন বছর সে তালেবানের হাতে বন্দিও ছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়নি। কারণ সে ছিল তালেবানের প্রতিপক্ষ, গণহত্যাকারী ছিল না।

হয়েছে। শায়খ উসামা রহ. সাথে সাথে নির্দেশনা জারি করেন, সকলেই যেন সতর্ক থাকেন এবং অস্ত্র নিয়ে যে-কোনো হামলার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহর রহমতে সে রাত ভালোভাবেই কেটে যায়। কিন্তু এ সংবাদের কারণে পরবর্তী পরিস্থিতিও পালটে যায়।

পরদিন সকালে ফজরের পর সকলকে উদ্দেশ্য করে শায়খ উসামা রহ. বলেন, আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে, যত দ্রুত সম্ভব আমরা যেন এই এলাকা ছেড়ে কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। সফরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শায়খ রহ. দুই ঘণ্টা সময় দেন। ভাইয়েরাও কোনো প্রশ্ন না করে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছোট ছোট বাসের একটি কাফেলা নিয়ে জালালাবাদ ছেড়ে সবাই কাবুলের পথে রওনা হন।

দৃশ্যটি একইসাথে ছিল আনন্দ ও বেদনার। জালালাবাদ এবং সেখানকার নেকদিল বাসিন্দাদের বিচ্ছেদে সবাই ছিলেন অশ্রুসিক্ত। বিশেষ করে শায়খ ইউনুস খালেস রহ., উস্তাদ আওয়াল গুল রহ., ডক্টর আমীন হাফি. এবং অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে সবার এক অপার্থিব হৃদ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদিও তোরাবোরা পাহাড় আর নাজমুল জিহাদ নামের ছোট্ট সে কলোনিতে মাত্র কয়েক মাস ছিলেন তারা, কিন্তু এই দিনগুলোই ভাইদের স্মৃতিতে জায়গা করে নিয়েছিল।

অন্যদিকে সবার মধ্যে চাপা একটি আনন্দও কাজ করছিল। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সফর শেষ হবে, কান্দাহারের মাটিতে তারা আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের নৈকট্য লাভ করবেন, যারা দীনের হারানো শান-শওকত ফিরিয়ে এনেছেন, উম্মতের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া শরীয়তের কত বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। 'আমীরুল মুমিনীন, ইমারাতে ইসলামিয়াহ'-এর মতো মুছে যাওয়া শব্দগুলোতে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

কাফেলা যখন কাবুলে এসে পৌঁছায়, তখন কাবুলের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। আকাশের মেঘ কেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাবুলে অবস্থানের সিদ্ধান্ত হয়। শায়খ উসামা রহ. কান্দাহারের উদ্দেশ্যে সফরের পূর্বে কাবুলে অবস্থানকালে সাথিদের উপদেশ দেন, তাঁরা যেন কান্দাহারে পৌঁছে মাযহাবী ও ফিকহী ইখতিলাফ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি না করেন। যেহেতু তারা তালেবানের সূতিকাগার কান্দাহারে যাচ্ছেন আর তালেবান হানাফী মাযহাব অনুসরণ করে, তাই নামাযে ইমামের পেছনে উচ্চস্বরে আমীন বলা, নামাযে হাত বাঁধার ধরন, রফয়ে ইয়াদাইন ইত্যাদি ইখতিলাফী মাসায়েল নিয়ে যেন তারা তর্কে না জড়ান।[৩৪]

[৩৪] নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া এবং এ জাতীয় মুস্তাহাব কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, 'ভিন্ন মতের (যারা উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে না) অনুসারীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও ঐক্য ধরে রাখার জন্য এ মতের (যারা উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে) অনুসারীদের জন্য এ ধরনের মুস্তাহাব আমলগুলো ছেড়ে দেওয়াটাই মুস্তাহাব। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের মুস্তাহাব আমলের চেয়ে পারস্পরিক ঐক্য অটুট রাখার গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি।' [মাজমুউল ফাতাওয়া : খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৪০৮]

## ফুরুয়ী ইখতিলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি: শায়খ উসামার নসীহত ও আমাদের শিক্ষা

ফুরুয়ী ইখতিলাফ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার ব্যাপারে শায়খ উসামা রহ. ভাইদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটি নিতে পারি, তা হলো—'সব সত্য সব জায়গায় সবাইকে বলা উচিত না।' ভালো নিয়তে হোক বা খারাপ নিয়তে, এই মূলনীতির ওপর আমল না করার কারণে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে জিহাদী অঙ্গনে নানান ফিতনা তৈরি হয়েছে। এ জন্য শায়খ বারবার ভাইদের মনে করিয়ে দিতেন, এ ধরনের (সর্বসম্মত নয় এমন) আমল নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি নিজেদের মধ্যেও ফাটল তৈরি হতে পারে। নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য দীনকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের আমলের চেয়ে মুসলিমদের ঐক্য ধরে রাখা এবং নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা বহাল রাখার গুরুত্ব অনেক বেশি।

শায়খ রহ. এই কথাগুলো এমনি এমনি বলেননি; বরং পূর্বের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই কথাগুলো বলেছিলেন। ফিকহ ও অগ্রাধিকারের নীতি (فقه الأولويات) সম্পর্কে না জানার কারণে অতীতে অনেক আরব ভাই গোঁড়ামির শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের সে গোঁড়ামির কারণে মুজাহিদদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয়েছিল। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছিল বেশি এবং মুজাহিদরাও অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ . قَالُوا بَلَى . قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَوَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ**

'আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা, সদকা, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার থেকেও বেশি ফযীলতপূর্ণ আমলের কথা বলব না? তাঁরা বললেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা, মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা কর্তনকারীর ন্যায়। আমি চুল কর্তনকারীর কথা বলছি না, বলছি দীন কর্তনকারীর কথা।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪৯১৯; জামে তিরমিযী : ২৫০৯]

হযরত জাবের রাযি. থেকে অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

**سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ**

‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আরব ভূখণ্ডে মুসল্লীগণ শয়তানের উপাসনা করবে—এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তবে তাদের একজনকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে (নিরাশ হয়নি)।’ [সহীহ মুসলিম : ২৮১২]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন—

> ‘আপনারা জানেন, মুসলিমদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা দীনের মৌলিক একটি স্তম্ভ এবং অন্যতম দাবি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক বহাল রাখো’ [সূরা আনফাল (৮) : ১]—এ ধরনের আরও অনেক নস আছে, যেখানে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রাখার আদেশ করা হয়েছে, সাথে সাথে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এই নীতি যারা মানবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো ‘আহলুল জামাআহ’ আর এই নীতি যারা মানবে না, তারাই হলো আহলুল ফুরকাহ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া : খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৫০]

উল্লেখ্য, বাজারে গিয়ে দোকানিদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে—শায়খ রহ. সেটাও ভাইদের শিখিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, ‘বাজারে গিয়ে বেশি দামাদামি করবেন না, পণ্যের দাম পছন্দ হলে কিনবেন, পছন্দ না হলে কিনবেন না; দাম কমানোর জন্য বিক্রেতার সাথে শুধু শুধু ঝগড়ায় জড়াবেন না।’ তিনি ভাইদের আরও বলতেন, ‘আপনারা আরব, আরবদের উদারতা প্রসিদ্ধ একটি বিষয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে আফগানদের দৃষ্টিতে নিজেদের খাটো করবেন না।’

## কান্দাহার অভিমুখে

কাবুল পৌঁছানোর পর পরিকল্পনা ছিল, যাদের পরিবার আছে, তারা পরিবারের সাথে বিমানযোগে আর শায়খ উসামা রহ. ও তাঁর দেহরক্ষীরা সড়কপথে কান্দাহার যাবেন। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় সফর দু’দিন বিলম্ব হয়ে যায়। সে সময় কাবুল থেকে কান্দাহারে যাওয়ার জন্য পুরোনো রুশ সামরিক বিমান ব্যবহার করা হতো এবং বিমানগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় পাইলটের নিজস্ব দৃষ্টিশক্তির (ভিজ্যুয়াল ফ্লাইট রুলস-VFR) ওপর নির্ভর করতে হতো। মুজাহিদদের পরিবার নিয়ে যে বিমানটি রওনা হয়, তা উড্ডয়নের মুহূর্তে এক দুর্ঘটনা ঘটে। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ না থাকলে যাত্রী-সহ বিমানটি ধ্বংস হয়ে যেত। ঘটনা হচ্ছে, শায়খ উসামা রহ.-এর ছেলে আব্দুর রহমানের গায়ে অ্যামুনিশন পাউচ (গুলি ও বোমা রাখার ছোট ব্যাগ) ঝোলানো ছিল। পাউচে হ্যান্ড গ্রেনেডও ছিল। বিমানে উঠে বসার সময়

কোনো কিছুর সাথে লেগে পাউচের পকেটে থাকা একটি হ্যান্ড গ্রেনেডের সেফটি পিন খুলে যায়। কিন্তু পকেট ছোট হওয়ায় পিন খুলে গেলেও সেফটি লিভার আপন জায়গাতেই ছিল।

আব্দুর রহমান বলেন, 'বসার পর মনে হচ্ছিল, বোমার সেফটি পিন নেই। পরে পকেট খুলে দেখি সত্যিই তাই। সাথে সাথে সেফটি লিভারে চাপ দিয়ে ধরি এবং শায়খ আবু হাফস কামান্ডারকে ডেকে বিষয়টি জানাই।' শায়খ আবু হাফস কমান্ডার সাবধানে তার পকেট থেকে বোমাটি বের করেন এবং কোনো তারকাঁটা বা এ জাতীয় কিছুর খোঁজে ককপিটে চলে যান। শায়খ আবু হাফস কামান্ডার রহ.-এর হাতে বোমা দেখে পাইলটরা আঁতকে ওঠে। তারা মনে করে, শায়খ তাদের হুমকি দিচ্ছেন। শায়খের উদ্দেশ্যে তারা ফারসিতে বলতে থাকে, 'কোনো সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে। আমরা কাবুল-কান্দাহার সড়কপথের ওপর দিয়েই যাচ্ছি।' শায়খ তাদের ফারসি কথার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় তখনকার পুরাতন রুশ বিমানগুলো কাবুল-কান্দাহার সড়কপথের ওপর দিয়েই যাওয়া-আসা করত। শায়খ বুঝতে পারেন, তারা ভয় পাচ্ছে। তাই তিনি ইশারায় তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি হুমকি দিচ্ছেন না; বরং বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য কিছু চাচ্ছেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে এক পাইলট ককপিটের ছোট একটি জানালামতো ঢাকনা খুলে বোমাটি বাইরে ফেলে দিতে বলেন। কিন্তু, শায়খ আশঙ্কা করছিলেন, বোমাটি এভাবে বাইরে ফেললে বিমানের কোনো ক্ষতি হতে পারে। তাই তিনি বাইরে ফেলতে নিষেধ করেন। অবশেষে তারা ককপিটে খোঁজাখুঁজি করে বোমার সেফটি পিন পেয়ে যান এবং বোমটি নিষ্ক্রিয় করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

অন্যদিকে শায়খ উসামা রহ. চারটি পিকআপ নিয়ে রওনা করেছিলেন। কাবুল থেকে কান্দাহার ৫০০ কিলোমিটারের সুদীর্ঘ পথ। কাফেলা ২৪ ঘণ্টা বিরামহীন চলছিল। রাস্তায় নামায আদায়, জ্বালানি ও খাবার সংগ্রহ করা ছাড়া কোথাও থামছিল না। কান্দাহারের রাস্তাটি ছিল চলাচলের অনুপযুক্ত, রাস্তা তো নয়, যেন ইট-পাথরের ঢেউ। ভাঙাচোরা রাস্তায় তাই গাড়িগুলোও চলছিল ধীরগতিতে। পথিমধ্যে কোথাও কোথাও লাল সিগন্যাল দেখা যাচ্ছিল, অর্থাৎ রাস্তার দুপাশে মাইন আছে। তাই দূরত্ব বজায় রেখে চলুন।

## তালেবান প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

তালেবানের অফিসিয়াল রেডিও 'সওতুশ শরীয়াহ'-তে একবার আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর একটি অডিও রেকর্ড সম্প্রচার করা হয়। রেকর্ডে তিনি তালেবান প্রতিষ্ঠার বিবরণ তুলে ধরেন। রেকর্ডের বিবরণটি ছিল নিম্নরূপ—

‘কান্দাহারের সাঙ্গ-ই-হিসার এলাকার এক মাদরাসায় তখন পড়াশোনা করতাম আমি। ক্লাসে প্রায় ২০ জন তালিবে ইলম সহপাঠী ছিল। দেশজুড়ে তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ এবং খুনখারাবি ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। দেশের কর্তৃত্বও ছিল নষ্টভ্রষ্ট নেতাদের হাতে। সবাই ভাবছিল, এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব না। অন্যদের মতো আমিও হয়তো এমন ভাবতে পারতাম। **لا يكلف الله نفسا إلا وسعها** (আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না)— এই আয়াত মনে করে নিজেকে সান্ত্বনাও দিতে পারতাম। আমার সাধ্য নেই মনে করে আমিও চুপচাপ বসে থাকতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (করে কিছু করার নিয়ত) করলাম। আর যে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে পারে, সে কখনো ব্যর্থ হয় না।

অনেকে জানতে চায়, কখন এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে? এর পেছনে কারা? কারা এর অর্থায়ন করে? কারা-ই বা পরিচালনা করে? তাদের বলছি—এর সূচনা হয়েছিল একেবারেই সাদামাটাভাবে। সাঙ্গ-ই-হিসারের সেই মাদরাসায় থাকাকালেই একদিন ঠিক করলাম, অনেক হয়েছে। এবার কিছু করা দরকার। বইপত্র বন্ধ করে একজনকে সাথে নিয়ে হেঁটে জাঙ্গাবাদ এলাকায় যাই। সেখানে সরোয়ার নামের এক ব্যক্তি থেকে একটি মোটরসাইকেল ভাড়া করে তালুকান যাই। এটাই ছিল এই আন্দোলনের সূচনা। এ ছাড়া আন্দোলন সম্পর্কে অন্যসব কল্পনার কোন ভিত্তি নেই।

সেদিন সকাল থেকে আমরা বিভিন্ন মাদরাসায় গিয়ে ছাত্রদের সাথে দেখা করা শুরু করি। একটি শ্রেণিতে গিয়ে প্রায় ১৪ জন ছাত্র পাই। তাদেরকে আমার পাশে জড়ো করে বলি— ‘আল্লাহ তায়ালার দীন পদদলিত হচ্ছে, মানুষ প্রকাশ্যে পাপাচার করছে, দীনদার লোকেরা নিজেদের দীন গোপন করছেন, নষ্টভ্রষ্ট নেতারা নেতৃত্বের আসনে বসে মানুষের ধনসম্পদ লুট করছে, রাহাজানি করছে, মানুষ খুন করে পথে ফেলে রাখছে, লাশের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, রাস্তায় পতিত লাশ দেখেও কেউ দাফন করার সাহস পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পড়ালেখা করা সম্ভব না। কেবল স্লোগান দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা ছাত্ররাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। যদি আমরা সত্যিকারার্থে আল্লাহর দীনের জন্য কিছু করতে চাই, তাহলে এখন পড়াশোনা ছেড়ে ময়দানে নামতে হবে। তবে আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আমাকে কেউ এক পায়সাও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তাই, আমি আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করব—এই ধারণা করবেন না; বরং আমরা জনগণের কাছে খাবার ও সহযোগিতা চাইব। আরও বলে দিচ্ছি, এটা একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বছরের কাজ নয়; বরং এতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। আপনারা কি পারবেন? সাহস দেওয়ার জন্য তাদের বলছিলাম, ক্ষমতার মসনদে

বসে থাকা লোকটি স্থানুর মতো বসে আছে আর প্রকাশ্যে আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের দীনদার দাবি করি, অথচ দীনের সাহায্যের জন্য কিছু করতে রাজি না।

তাদের আরও বলি, আমরা কোনো এলাকা জয় করলে সেই এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বও নেব। [স্বাভাবিকভাবেই তখন পড়াশোনা করার সুযোগ থাকবে না, আবার টাকাপয়সাও বেশি থাকবে না।] তাই তখন এ নিয়ে অভিযোগ করা যাবে না। এখন বলুন, আপনারা এই কাজের জন্য প্রস্তুত কি না? আমার কথা শুনে সেই ১৪ জনের কেউই রাজি হলো না। তারা বলল, আমরা শুক্রবারে কিছু কাজ করতে পারব। তখন বললাম, তাহলে অন্যদিন কে কাজ করবে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই আন্দোলনের বাস্তব ঘটনা এটাই। হাশরের ময়দানে আমি আল্লাহর সামনে এমনই সাক্ষ্য দেব। এই আন্দোলন কেবলই তাওয়াক্কুলের ফসল। সেদিন সে মাদরাসায় ছাত্রদের মধ্যে কোনো সাড়া না পেয়ে যদি আমি হতাশ হয়ে যেতাম অথবা ধরে নিতাম, অন্য মাদরাসাতেও একই অবস্থা হবে, তাহলে অবশ্যই নিজ মাদরাসায় ফিরে আসতাম। কিন্তু, আল্লাহর সাথে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম, তা পূরণ করেছিলাম। এরপরে আল্লাহ আমার সাথে কী আচরণ করেছেন, তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

এরপর আরেকটি দরসগাহে যাই। সেখানে প্রায় ৭ জন ছাত্র ছিল। তাদের সামনেও বিষয়টি সেভাবে পেশ করি, যেভাবে প্রথম দরসগাহের ছাত্রদের সামনে করেছিলাম। এবার তাঁরা সকলেই কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই ৭ জনই ছিল একটি জাতির সমান। তাঁদের মধ্যে শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ বা নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য ছিল না। এই কাজের ভিত্তি ছিল আল্লাহ তায়ালার হিকমতের ওপর। তাই কাজের শুরুতেই তিনি আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন। সেই মোটরসাইকেলটি নিয়ে আসর পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন মাদরাসা ও তালীমের হালকায় ঘুরতে থাকি। এভাবে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসাকারী ৫৩ জন ব্যক্তি তৈরি হয়ে যায়। পরদিন সকালে সবাইকে সাঙ্গ-ই-হিসারে আসার কথা বলে আমরা মাদরাসায় ফিরে আসি। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দারা সকালের অপেক্ষা না করে রাত একটার সময়ই সাঙ্গ-ই-হিসারে এসে হাজির হয়। এভাবেই তালেবানের সূচনা হয়।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই কাজ শুরু হয়ে যায়। আমার এক বন্ধু মসজিদে ইমামতি করতেন। ফজরের নামাযের পর এক মুসল্লী তাকে বলেন, আমি গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি, ফেরেশতারা সাঙ্গ-ই-হিসারে ঢুকছেন। তাঁদের হাত অত্যন্ত কোমল। আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের একজনকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম।

পরদিন সকাল দশটায় সে এলাকার এক ব্যবসায়ী হাজী বাশারের কাছে দুটি গাড়ি চাইলে তিনি আমাদের দুটি গাড়ি দেন। এরমধ্যে একটি গাড়ি ছোট, আরেকটি মালবাহী বড় ট্রাক। আমরা ছাত্রদের 'কাশ্‌ক নাখোদ' এলাকায় নিয়ে আসি। আমাদের সাথে আরো কিছু লোক এসে মিলিত হয়। আমাদের লোকবল যখন মোটামুটি বৃদ্ধি পায়, তখন কিছু অস্ত্র ধার নিই। এভাবে তালেবানের সূচনা হয়, যা এখনও চলমান আছে।'[৩৫]

## আমীরুল মুমিনীনের ঘটনা থেকে শিক্ষা

তালেবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. যে বর্ণনা দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এতে ঈমান ও তাওহীদের বাস্তবমুখী অনেক শিক্ষা রয়েছে। যারা শুধু মুখে মুখেই তাওহীদের বুলি আওড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে যেমন এই ইতিহাস প্রমাণ হিসেবে রয়ে যাবে; তেমনই যারা দিন বদলের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের জন্যও আলোর মিনার হয়ে থাকবে। কয়েক খণ্ডের বইয়েও এই ইতিহাসের সবগুলো শিক্ষা একত্র করা সম্ভব না, আর এই কয়েক লাইনে তা তুলে ধরার চেষ্টা তো বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তবু চিন্তাভাবনা করার জন্য এই ঘটনার কিছু দিক তুলে ধরা হচ্ছে।

### ১. আল্লাহ তায়ালার ওপর আমীরুল মুমিনীনের তাওয়াক্কুল

আল্লাহর প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুল ও বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গভীর। এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল, তিনি বিশ্বাস করতেন— আল্লাহর ওপর কেউ যদি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করে, তাহলে সে কখনোই ব্যর্থ হবে না। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কোনো অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যদি একজনমাত্র ব্যক্তিও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তবে অবশ্যই সে সফল হবে। আমীরুল মুমিনীন সে অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—'আফগানিস্তানের এই করুণ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব—এটাই কেউ ভাবতে পারছিল না।'

তিনি অন্যদের মতো এ কথা বলেননি, ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 'আল্লাহ কারো ওপর সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না'; বরং তিনি জানতেন, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব। তিনি এটাও জানতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলাই তাকে সাহায্য করেন এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।

[৩৫] আল-বাত্তার আর্কাইভ : মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ

## ২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ

এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে অনেক উলামায়ে কেরাম পর্যন্ত বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ আলেম ও তালেবে ইলম সময়ের ফরয দাবিকে উপেক্ষা করে কেবল 'জানতে হবে তাই' ইলম অর্জনের পেছনে ব্যস্ত হয়ে আছেন। অথচ তাঁরা চাইলেই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ফরয দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের পবিত্র ভূমি থেকে আগ্রাসি শত্রুদের প্রতিহত করতে তাঁরা মানুষকে উৎসাহিত করতে পারতেন। বিষয়টি যদি এখানেই সীমাবদ্ধ থাকত, তবু মানা যেত। কিন্তু না, তাঁদের কেউ কেউ তো একধাপ এগিয়ে গেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তারা তাঁদেরকেই নিজেদের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন। রীতিমতো তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গেছেন, নিজেদের কথার আঘাতে তাঁদের জর্জরিত করছেন, তাঁদেরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করছেন। আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি বলেছিলেন—'আল্লাহর দীন যদি পদদলিত হতে থাকে, তাহলে ইলম শেখার আর কী মূল্য থাকে!'

তালেবে ইলমদের সামনে তিনি শুধু রোগ নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হননি, পাশাপাশি এর চিকিৎসাও বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন—'কেবল স্লোগান দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা ছাত্ররাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। যদি আমরা সত্যিকারার্থেই আল্লাহর দীনের জন্য কিছু করতে চাই, তাহলে এখন পড়াশোনা ছেড়ে ময়দানে নামতে হবে।'

আল্লাহ তাআলা শায়খ উসামার ওপরেও রহমত নাযিল করুন। উম্মতের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক তাহরীদী বার্তায় তিনি বলেছিলেন—'শুধু দরস ও তাদরীসের দ্বারাই দীনের নুসরত হয় না। আমরা একটু সময় দেব, একটু অর্থ ব্যয় করব আর আশা করব দীন কায়েম হয়ে যাবে—এটা সম্ভব না। আল্লাহর এই পণ্য অনেক দামি। বসে বসে দরস দেওয়া আর আল্লাহর দীনের জন্য মাথা ও জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে।'

এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

'সবকিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম, এর খুঁটি হলো নামায আর চূড়া হলো জিহাদ।' [জামে তিরমিযী : ২৬১৬]

এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

> 'এই হাদীসে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাদীসটি সাধারণ মানুষ ও মুমিনদের সামনে অগ্রাধিকারের গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলছে। সবকিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম। ঈমান ও

ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর সাক্ষ্যদান। তাই, যদি কখনো ঈমানের প্রধান শাখাটিই অনুপস্থিত থাকে, তখন কোনো অবস্থাতেই এরচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ শাখা নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ নেই। এই কালিমাই দীনের মূল ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের চোখের সামনেই আছে। যে দাবি ও বাস্তবতা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নাযিল হয়েছে, তা আজ অনুপস্থিত। মানবজীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কালিমার দাবির বাস্তবায়ন নেই। কিন্তু, মানুষ সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে কম গুরুত্বপূর্ণ নানান কাজে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে। এই বাস্তবতা বুঝেও ইচ্ছা করেই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এটি ছোটখাটো কোনো দায়িত্ব না; বরং প্রত্যেক মুমিনের জন্য কালিমার দাবি বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

জিহাদ ফরযে আইন হলে কেউ যদি জিহাদ না করে ঈমানের অন্য কোনো শাখা—যেমন: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো—নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তাকে বাহবা দেওয়া যাবে না; বরং আমাদের দীন তো এমন ব্যক্তিকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেছে, সে তো কালিমা ও রাসূলের নুসরত না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।[৩৬] সুতরাং অগ্রাধিকারের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। দুঃখজনক হলেও সত্য, অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়টি বর্তমানে মুসলিম দেশগুলো থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মুসলিম ভাইদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস মনে করিয়ে দিচ্ছি। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

**إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ**

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন—"যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করি। বান্দা আমার নৈকট্যলাভের জন্য যে-সব ইবাদত করে, তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো, বান্দার ওপর অর্পিত ফরযের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা।" [সহীহ বুখারি : ৬৫০২]

[৩৬] শায়খের এই কথার উদ্দেশ্য হলো, কেউ যদি জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পরেও বুঝেশুনেই জিহাদ থেকে দূরে থাকার জন্য অন্য কোনো দ্বীনী কাজে ব্যস্ত থাকে, এই দ্বীনী কাজকে জিহাদের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করায় বা জিহাদে কোনোভাবেই নিজের অংশগ্রহণ না করাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে, অন্যদেরও এই কাজের দোহাই দিয়ে জিহাদ থেকে বিমুখ রাখার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে সে ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে। [সম্পাদক]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে-সব কাজকে ফরয, ইতায়াত বা ইবাদত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, একমাত্র সেগুলোই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে আর এগুলোর মধ্যে যে তারতীব ও অগ্রাধিকার আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিয়েছেন, সেই তারতীব ও অগ্রাধিকারই গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা বা দুনিয়াপ্রীতির সাথে মিল রেখে ইবাদতের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে না। তাই, যখন কালিমার দাবি বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, তখন আল্লাহর জমিনে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ না করে অন্য কাজে লিপ্ত থাকা ঠিক হবে না।'

### ৩. সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিরোধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾

'তোমরা শত্রুর মুকাবিলার জন্য শক্তি অর্জন ও যুদ্ধের ঘোড়া সংগ্রহের মতো যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।' [সূরা আনফাল (৮): ৬০]

আমীরুল মুমিনীন রহ. তালেবে ইলমদের অস্ত্র এবং রসদ দেওয়ার ওয়াদা করেননি। সবাই যেন জেনেবুঝেই তার সাথে এই লড়াইয়ে শরীক হয়। যেন পরে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র না পেয়ে কেউ ঘাবড়ে না যায়। আমীরুল মুমিনীন রহ. তাই ছাত্রদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—'আমাকে কেউ এক পায়সাও সাহায্য করার ওয়াদা করেনি। তাই আমি আপনাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব—এমন ধারণা আপনারা রাখবেন না। আমরা জনগণের কাছে খাবার ও সহযোগিতা চাইব।'

উল্লেখ্য, বর্তমানে তালেবানের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মোল্লা খাইরুল্লাহ খায়রখাহ ছিলেন তালেবান আন্দোলনের প্রথম সারির একজন সদস্য। গুয়ান্তানামো কারাগারে থাকাকালে তালেবানের শুরুর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তালেবানযোদ্ধারা যখন যুদ্ধে বের হতেন, তখন তাঁদের অনেকের হাতেই কোনো অস্ত্র থাকত না। তাঁরা অপেক্ষায় থাকতেন, কখন একজন অস্ত্রধারী তালেবান শহীদ হবেন বা শত্রুবাহিনীর অস্ত্র গনীমত হিসেবে লাভ করবেন, তারপর সেই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবেন।

### ৪. আমীরুল মুমিনীনের আত্মবিশ্বাস

আমীরুল মুমিনীন রহ. দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, জনগণ তাঁকে সাহায্য করবে। অভাব-অনটনের মধ্যে থাকলেও আফগান জনগণ তার এই আন্দোলনে পূর্ণ সহায়তা করবে—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। যে-কোনো জাতির ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। কেউ যখন জাতির জীবনমরণের লড়াইয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়, তারাও তাকে পূর্ণ সমর্থন দেয়। জনগণের জন্য সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খাদ্য ও নিরাপত্তা। এ ছাড়া বাকি বিষয়গুলো যে-কোনোভাবেই হোক চালিয়ে নেওয়া যায়। এ জন্য আল্লাহ তাআলাও বিশেষভাবে এ দুটি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন, **الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف** 'যিনি তাদের ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়ের সময় নিরাপত্তা দিয়েছেন।' আয়াতে এ দুটি বিষয়ের গুরুত্বের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

### ৫. আল্লাহর সাহায্য

আমীরুল মুমিনীনের ঘটনায় সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়টি হলো, যখন তিনি সমাজে ছড়িয়ে পড়া ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁর পরিকল্পনায় বেশির থেকে বেশি এতটুকু ছিল যে, তিনি নিজ অঞ্চলের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। সর্বোচ্চ নিজ প্রদেশ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা থাকতে পারে। এতটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সে সময় পুরো আফগানিস্তানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা বা ইচ্ছা কোনোটিই তাঁর ছিল না। কিন্তু তার এই আন্দোলন নিজ এলাকা, প্রদেশ ছাড়িয়ে পুরো আফগানিস্তানেই ছড়িয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর ওপর আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ।

মোল্লা হাফিযুল্লাহ হক্কানী তার বইয়ে তালেবান আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের এই বিবরণ উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকেও এই ধারণা আরও পোক্ত হয়। মোল্লা হাফিযুল্লাহ হক্কানী লিখেছেন—

> 'আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন (মোল্লা উমর রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল কান্দাহার ও আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা দমন করা এবং চাঁদা ওঠানোর জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠা চাঁদাবাজদের আড্ডাগুলো বন্ধ করা। তাঁর দৃষ্টিতে কাজটি ছিল একেবারেই সাধারণ আঞ্চলিক একটি কাজ। তাই দিনক্ষণ সংরক্ষণের ব্যাপারেও খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। [যেহেতু এটি বিস্তৃত কোনো লক্ষ-উদ্দেশ্য সামনে রেখে শুরু হয়নি], তাই শুরুর দিকে অনেক ব্যবসায়ী, এমনকি আঞ্চলিক কমান্ডারদেরও অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্র দিয়ে আন্দোলনে সহায়তা করতে দেখা গেছে। তাঁদের প্রথম জমায়েত হয়েছিল মাইওয়ান্দ জেলার সাঙ্গ-ই-হিসার এলাকায় আর অপারেশন শুরু হয়েছিল 'কাশ্‌কে নাখোদ' এলাকা থেকে। তারপর তাঁরা আরগিস্তান জেলার দিকে অগ্রসর হন, সেখান থেকে পাক-আফগান সীমান্তের 'স্পিন বোল্ডাক' জেলার দিকে যান। সেখানে হেকমতিয়ারের দল হিযবে ইসলামীর সবচেয়ে বড় বারুদের মজুদ তাদের হাতে আসে। কমান্ডার সার কাতেব ছিল এর দায়িত্বে। এরপর তালেবান মুজাহিদগণ যেদিকেই যাচ্ছিলেন, সব দল-উপদলকে নিরস্ত্র করে তাদের অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছিলেন,

রাস্তায় বসানো চাঁদাবাজদের সব আড্ডা বন্ধ করছিলেন এবং সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলেন।'[৩৭]

কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের ইখলাস, লিল্লাহিয়াত, তাওয়াক্কুল, দীনী গাইরত ও ইস্তিকামাতের ফলে দিশেহারা জাতির অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁকেই নির্বাচন করেন। তাঁর হাত ধরে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং শায়খ উসামাকে হস্তান্তরের ব্যাপারে তার ঈমানদীপ্ত অবস্থান যুগের হুবাল আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক কুফরি শক্তিকে পরাজিত করার অন্যতম একটি কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। যে কারণে পরে আমেরিকার জায়গাও হয়েছিল সামাজ্যবাদের গোরস্থানে। বিগত ২০ বছর যাবৎ আফগানের মাটি যে অভাবনীয় দৃশ্য দেখে এসেছে, তা এর সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল। এই বইয়েও সে ইতিহাসের টুকরো টুকরো অনেক কথা উল্লেখ করেছি।

আমীরুল মুমিনীনের ভাষায়—তিনি যখন 'আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা' পূরণ করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা তার সাথে কেমন আচরণ করেছেন—তা আজ আমাদের সামনেই রয়েছে। জাতি ও সমাজের পরিবর্তনে এটাই আল্লাহর অপরিবর্তনীয় রীতি। নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহর এই নীতি কার্যকর ছিল, নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর। হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর কাছে আপনি কতইনা উঁচু মর্তবা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছেন!

আল-জাযীরার সাংবাদিক জামাল ইসমাইলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তালেবানের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

'আফগান মুজাহিদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় আমরা সবাই চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তালেবানের উত্থান ঘটিয়ে উম্মতের ওপর অনুগ্রহ করলেন। তালেবান এসেই মোবারক এই জিহাদকে আমেরিকার পুতুল নজীবের হাত থেকে রক্ষা করল। এই নজীব আফগানিস্তানে ধর্মনিরেপক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার প্রস্তাবিত সরকারের ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জনই ছিল কমিউনিস্ট, কিছু ছিল পশ্চিম থেকে লেখাপড়া করে আসা আগাগোড়া পশ্চিমা আদর্শবাদী আর বাকিরা ছিলেন আফগানিস্তানের সাতটি জিহাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মানুষের ভোগান্তি তখন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, চারিদিকে চোর-ডাকাতদের রাজত্ব ছিল, মানুষ এই জুলুমের বেড়াজাল থেকে বের হতে হাঁসফাঁস করছিল। অবস্থা এতটাই বেগতিক ছিল, ছোট্ট এই দেশের মধ্যেই আলাদা ৫টি দেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ডাকাতরাও নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোকে স্বতন্ত্র দেশ মনে করত। এমনই এক সময়ে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর রহম করেন।'

[৩৭] আল-বাত্তার আর্কাইভ : মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ

## একনজরে তালেবান

যেহেতু আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তালেবানের সূতিকাগার কান্দাহারে প্রবেশ করছি, তাই অল্প কথায় তাঁদের উত্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলে সকলের জন্যই ভালো হবে। তাই নিচে পয়েন্ট আকারে কিছু তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।[৩৮]

১. তালেবান অর্থ ছাত্র। দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসাগুলোতে যারা ইলমে দীন হাসিল করে, তাদের তালেবান বলা হয়। তালেবান আন্দোলনের এই ছাত্ররা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদেও শরীক ছিল। তবে তখন তাঁদের স্বতন্ত্র কোনো দল বা সংগঠন ছিল না। মুজাহিদদের বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সাথে মিলেমিশে তারা কাজ করতেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে আফগান মুজাহিদগণ কাবুল দখল করেন এবং এর সাথেই রাশিয়ার অনুগত নজিবুল্লাহর কমিউনিস্ট সরকারের পতন হয়। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মুজাহিদদের মধ্যে কিছু দল শিয়া ও পতিত কমিউনিস্টদের সাথে আঁতাঁত করতে থাকে। শুরু হয় এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার জন্য মুজাহিদদের মধ্যেই দেখা দেয় মতানৈক্য, হানাহানি, খুনোখুনি ও ভ্রাতৃঘাতী লড়াই। তখন এই ছাত্ররা ক্ষমতার লড়াইয়ে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং অস্ত্র রেখে আবারও আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদরাসায় ইলম হাসিলের জন্য ফিরে যান। তাদের অনুপস্থিতিতে ফিতনা-ফাসাদ চরম আকার ধারণ করে, জিহাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে, আফগানিস্তান ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর এগুলোর কর্তৃত্ব চলে যায় যুদ্ধবাজ জেনারেল ও চোর-ডাকাতদের হাতে। গোটা আফগানিস্তানে জুলুম-অত্যাচার, খুন-রাহাজানি আর নিরাপত্তাহীনতার এক অন্ধকার সময় শুরু হয়।

২. ১৯৯৪ সালের বসন্ত। যুদ্ধরত আফগান দলগুলোর মধ্য থেকে একটি দল আধিপত্য বিস্তারের জন্য কান্দাহার শহরের কাছের একটি গ্রাম সাঙ্গ-ই-হিসারে চেকপোস্ট বসিয়েছে। চেকপোস্টে থাকা সে দলের কয়েকজন সদস্য প্রধান সড়ক ধরে ছুটে আসা একটি গাড়িকে থামতে ইশারা করে। গাড়িতে এক আফগান পরিবার ছিল। প্রহরীরা দুজন তরুণীকে জোর করে গাড়ি থেকে নামায় এবং ন্যাক্কারজনকভাবে তাদের শ্লীলতাহানী করে হত্যা করে। মুহূর্তেই খবরটি কান্দাহারে ছড়িয়ে পড়ে। মোল্লা উমর রহ.-ও খবরটি শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ তিনি আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা করেন। ১৪১৫ হিজরীর ১৫ই মুহাররম, ১৯৯৪ সালের ২৩শে জুন ৫৩ জন সঙ্গীকে সংঘবদ্ধ করেন। তাঁদের হাত

[৩৮] পয়েন্টগুলো আরবী উইকিপিডিয়া ও শায়খ ইউসুফ উয়াইরীর লেখা 'আল-মীযান লি হারাকাতি তালিবান' নামের প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধরেই তালেবান আন্দোলনের সূচনা হয়। তাঁরা সেই চেকপোস্টে আক্রমণ করে অপরাধীদের হত্যা করেন, তাদের নেতাকে গ্রেফতার করে তার ওপর শরয়ী হদ কায়েম করেন এবং জনসম্মুখে ঝুলিয়ে রাখেন, যেন অন্য অপরাধীরা সাবধান হয়ে যায়। এরপর তাঁরা 'কাশ্‌কে নাখোদ' অঞ্চলের দিকে রওনা করেন। সেখানে থাকা মুজাহিদদের বিভিন্ন দলকে নিরস্ত্র করেন এবং চাঁদাবাজদের সব আড্ডাখানা গুড়িয়ে দেন। এরপর তাঁরা আরগিস্তান জেলার নিয়ন্ত্রণ নেন।

৩. ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাস নাগাদ মোল্লা উমর রহ.-এর সাফল্যের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন দীনী মাদরাসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তালেবে ইলমগণ মোল্লা উমর রহ.-এর দলে যোগ দিতে ছুটে আসতে থাকেন। অস্ত্র সংগ্রহ করা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং অবৈধ চেকপোস্ট ও চাঁদাবাজির আড্ডাগুলো ধ্বংস করার দিকে তাঁরা মনোযোগ দেন। ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিতেও হামলা করা শুরু করেন। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে সীমান্তবর্তী জেলা 'স্পিন বোল্ডাক'-ও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অন্যদিকে হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামীর অনুগত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলোর কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার ও বারুদের মজুদও তাঁরা দখল করেন, পুরো আফগানিস্তানে তখন এটিকেই সর্ববৃহৎ অস্ত্রভান্ডার মনে করা হতো।

৪. ১৯৯৪ সালের ৫ই নভেম্বর তালেবান কান্দাহার শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

৫. তালেবান কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আশপাশের প্রদেশগুলোতে কান্দাহারের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ খবর শুনে কান্দাহারের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ উরুযগানের অধিবাসীরা তালেবান নেতৃবৃন্দের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। এমনইভাবে হেলমান্দ ও যাবুল প্রদেশের বাসিন্দারাও তালেবানকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তারা আবেদন করে, তালেবান যেন তাদের প্রদেশের শাসনভারও নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে। তালেবান তাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই এই প্রদেশগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যেই এই ঘটনাগুলো ঘটে। যেখানেই তালেবানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতো, সেখানেই তাঁরা সাদা পতাকা উত্তোলন করতেন, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতেন, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন, অস্ত্র সংগ্রহ করতেন এবং চোর-ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন।

৬. এরপর গযনীর বাসিন্দারা তালেবানের কাছে বার্তা পাঠায়, যেন তাঁরা গযনীর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য নিজেদের একটি দল প্রেরণ করেন। এ খবর শুনে হেকমতিয়ার তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কারণ, গযনী তখন তার বাহিনীর অধীনে ছিল। সে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ

দেয়, তালেবান যদি গযনীতে প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহলে তাদের যেন প্রতিরোধ করা হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী রহ. সমঝোতার চেষ্টা করেন। তিনি হেকমতিয়ারকে অনুরোধ করে বলেন, এই মুবারক মাসে যেন লড়াই না করা হয়। তখন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাস ছিল, ১৪১৫ হিজরীর রমযানুল মুবারক শুরু হয়ে গিয়েছিল। শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী মধ্যস্থতার জন্য প্রতিনিধিদল নিয়ে নিজেই বের হন। কিছুদূর যাওয়ার পর হেকমতিয়ারের বাহিনীর একটি অংশের সাথে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। তালেবানের সাথে লড়াই করে পরাজিত হয়ে ফিরছিল তারা। অবশেষে ১৯৯৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি গযনীও তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

৭. ১৯৯৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি অতর্কিত হামলা চালিয়ে ওয়ারদাক প্রদেশের রাজধানী মাইদানশার দখল করে নেয় তালেবান। এটি ছিল হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামীর সবচেয়ে মজবুত আঞ্চলিক ঘাঁটি।

৮. ওয়ারদাক পতনের মাত্র চারদিনের মাথায় ১৯৯৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি হিযবে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণে থাকা কাবুলের আশপাশের পুরো এলাকা তালেবান দখল করে নেয়। হেকমতিয়ারও নিজের ঘাঁটি শারসিয়াব থেকে পালিয়ে সারোবি চলে যায়। তালেবান ক্ষমতা দখলের পরেই জাতিসংঘ ও বেশকিছু দাতব্য সংস্থার প্রতিনিধিদের মুক্ত করে দেয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে বন্দি ছিল। হেকমতিয়ার তাদেরকে জিম্মি করে রেখে কাবুলের জনগণ, রব্বানী ও আহমদ শাহ মাসউদকে নিজের কথামতো চলতে বাধ্য করত।

৯. ১৯৯৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের দুই প্রদেশ পাকতিয়া এবং পাকতিকার ওপরেও তালেবান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাকতিয়া প্রদেশটি শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানীর অধীনে ছিল। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তালেবানের সঙ্গে মিলে যান।

১০. ১৯৯৫ সালের ৯ই মে হেরাতের গভর্নর ইসমাইল খানের নেতৃত্বে সরকারি বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে তালেবানের ওপর আক্রমণ করে। তারা তালেবানের হাত থেকে ফারাহ, নিমরোয এবং হেলমান্দ প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নেয়। এতে তালেবানের প্রধান কেন্দ্র এবং সবচেয়ে মজবুত ঘাঁটি কান্দাহার ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

১১. ১৯৯৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তালেবান ফারাহ, হেলমান্দ এবং নিমরোয অঞ্চল ইসমাইল খানের বাহিনী থেকে দখলমুক্ত করে, সেই সাথে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমানঘাঁটি 'শীনদান্দ'-ও নিজেদের দখলে নিয়ে আসে।

১২. ১৯৯৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ইসমাইল খানের বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়ে হেরাত শহরও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে তালেবান।

১৩. ১৯৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর তালেবান কাবুলের দিকে অগ্রসর হয়। ততদিনে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সিংহভাগ এলাকা, শারসিয়াব এবং কাবুলের দক্ষিণ দিকে ঘিরে থাকা খায়রাবাদের পাহাড়ি এলাকা দ্বিতীয়বারের মতো তালেবানের দখলে চলে এসেছে। এতে রাজধানী কাবুল চারপাশ থেকে কঠোরভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রব্বানী, সাইয়াফ, আহমদ শাহ মাসউদ, হেকমতিয়ার-সহ বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে তালেবান বার্তা পাঠিয়ে বলেছিল, তারা যেন নিজেদের মধ্যে সব ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে নেয়, শরয়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়, কমিউনিস্টদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বহিষ্কার করে এবং অনৈসলামিক সব কার্যকলাপ থেকে দেশকে মুক্ত করে। কিন্তু তালেবানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৪. ১৯৯৬ সালের ৩রা এপ্রিল আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১৫০০ আলেম মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাবে ভূষিত করেন।

১৫. ১৯৯৬ সালের ২৪শে আগস্ট তালেবান 'সাবিনা শাজাহ' ঘাঁটি দখল করে, যা পাকতিয়া প্রদেশে হেকমতিয়ারের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এর ফলে তাঁরা বিশাল অস্ত্রভান্ডারের অধিকারী হয়।

১৬. ১৯৯৬ সালের ২৭শে আগস্ট তালেবান লোগার প্রদেশের আযরা জেলার নিয়ন্ত্রণ নেয়। একে কাবুলের অপ্রতিরোধ্য ডিফেন্স লাইন মনে করা হতো।

১৭. ১৯৯৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তালেবান হিসারাক জেলার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এটি ছিল জালালাবাদের প্রবেশপথ। জালালাবাদ দখল করে রাখা হাজী কাদিরের অনুগত বাহিনী কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই পরাজিত হয়। তারা অসংখ্য ট্যাংক আর রকেট লাঞ্চার রেখে পালিয়ে যায়।

১৮. ১৯৯৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মোল্লা বুরজানের নেতৃত্বে তোরখাম ক্রসিং দিয়ে তালেবানের একটি বাহিনী জালালাবাদ শহরে প্রবেশ করে। কয়েকটি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজলিসে শূরা তখন জালালাবাদ শাসন করত। জালালাবাদ শূরার বড় একটি অংশ ছিল মৌলবী শায়খ ইউনুস খালেস রহ.-এর অনুগত নেতৃবৃন্দ। তাঁরা নিয়মিত তালেবানের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তালেবানের সাথে তাঁরা

একাত্মতা ঘোষণা করে তাঁদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এমনইভাবে সাইয়াফের অনুগত নেতারাও তালেবানের হাতে শহরের শাসনভার তুলে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হন এবং নেতৃবৃন্দের আদেশ অমান্য করে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেন। তাঁদের মধ্যে কমান্ডার সাযনুর রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি দলত্যাগ করে সাইয়াফের কাছে লিখে পাঠান—'যে তালিবে ইলমরা দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনছে, শরীয়ত কায়েম করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

১৯. ১৯৯৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তালেবান লাগমান প্রদেশ জয় করে।

২০. ১৪ই সেপ্টেম্বর কুনার প্রদেশ জয় করে।

২১. ২৫শে সেপ্টেম্বর মোল্লা বুরজান ও মোল্লা আব্দুর রাযযাকের নেতৃত্বে সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে তালেবান সারোবি জেলায় প্রবেশ করে।

২২. ২৬শে সেপ্টেম্বর তালেবান বাহিনী পুল-ই-চারখির দিকে অগ্রসর হয়। এই লড়াইয়ে মোল্লা বুরজান রহ. শহীদ হন। তিনি তালেবানের উচ্চপদস্থ সামরিক কমান্ডার ছিলেন।

২৩. ২৭শে সেপ্টেম্বর রাতে তালেবান কাবুল আক্রমণ করে। কাবুলের প্রতিরক্ষায় থাকা আহমদ শাহ মাসউদ, রব্বানি ও সাইয়াফের যৌথবাহিনী নামকাওয়াস্তে প্রতিরোধ করলেও টিকতে না পেরে উত্তরাঞ্চলের দিকে পালিয়ে যায়, এর সাথেই তালেবানের হাতে কাবুলের পতন হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর তালেবানযোদ্ধারা প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করতে করতে জাবাল-ই-সিরাজ শহর ও সালাং পাসের কাছে পৌঁছে যান এবং এখানে এসে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ২৭ তারিখ রাতেই আফগানিস্তানের সাবেক কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দেয় তালেবান। মোল্লা উমর রহ. তাঁর ডেপুটি মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। সে রাতেই তালেবানের হাতে বাগরাম এয়ারবেইজেরও পতন হয়।

তালেবান আন্দোলন শুরু হওয়ার মাত্র দুই বছর হলেও এরইমধ্যে তাঁরা আফগানিস্তানের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের প্রায় সব প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিমে হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো এলাকার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। তবে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশে তখনও তালেবানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি, যা পুরো আফগানিস্তানের প্রায় ১৫%-এর সমান। এর মধ্যে বাদাখশান, তাখার, সামাংগান, বলখ, বলখের রাজধানী মাযার-ই-শরীফ, ফারিয়াব ও বাদগিস ছিল উল্লেখযোগ্য। কুন্দুয প্রদেশ উত্তরাঞ্চলে হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তালেবানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ কুন্দুযের সংখ্যালঘু পশতুনরা তালেবানের পক্ষে ছিল।

অন্যদিকে বামিয়ান প্রদেশ ইরান-সমর্থিত শিয়া দল হিযবে ওয়াহদাতের অধীনে থেকে যায় এবং তালেবানবিরোধী শিবিরে যোগ দেয়।




আফগানিস্তানের প্রাদেশিক মানচিত্রে সবুজ রঙে চিহ্নিত প্রদেশগুলোতে তালেবান প্রথম দু'বছরেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, লাল রঙে চিহ্নিত প্রদেশগুলোতে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭-২০০১-এর মধ্যে আর নীল রঙে চিহ্নিত প্রদেশগুলোতে তালেবান নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, তার আগেই আমেরিকার নেতৃত্বে ক্রুসেড শুরু হয়ে যায়।

২৪. ১৯৯৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তালেবান উত্তরাঞ্চলের দিকে রওনা করে এবং ঝটিকা অভিযানে উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশ (ম্যাপে লাল রঙে চিহ্নিত) নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। প্রতিপক্ষের রাজধানী মাযার-ই-শরীফেরও পতন ঘটে এই অভিযানে। কিন্তু কমিউনিস্ট উজবেক মিলিশিয়া (ন্যাশনাল ইসলামিক মুভমেন্ট অফ আফগানিস্তান বা NIMA) ও তাদের মিত্র শিয়া দলগুলো গাদ্দারির আশ্রয় নেয় এবং পরিকল্পিতভাবে মর্মান্তিক এক গণহত্যা চালায়। তখন উজবেক মিলিশিয়া গ্রুপগুলোর নেতৃত্বে ছিল আব্দুর রশিদ দোস্তমের প্রতিদ্বন্দ্বী কমান্ডার আব্দুল মালিক। সে তালেবানের আনুগত্য মেনে নেওয়ার মিথ্যা অভিনয় করে তাঁদের সাথে সন্ধি করে এবং তাঁদের শহরে ঢুকতে দেয়। এমনকি রাজধানী মাযার-ই-শরীফের শাসনভার

তালেবানের হাতে তুলে দিয়ে দোস্তমকে শহর থেকে বের করে দেয়। তালেবান সৈনিকরা যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে পড়েন, ঠিক তখনই তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা শুরু করে আব্দুল মালিকের সৈন্যরা। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই হত্যাকাণ্ডে প্রায় দশ হাজার তালেবানযোদ্ধা শহীদ হন। এই বর্বর উজবেক মিলিশিয়া এবং তাদের মিত্র শিয়াগোষ্ঠী অনেক জীবিত ব্যক্তিকেও গণকবরে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে দেয়। হাজার হাজার মৃতদেহ খালি ময়দানে কাফন-দাফন ছাড়াই পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁদের শরীরে অমানবিক নির্যাতন ও অঙ্গ-বিকৃতির চিহ্ন ছিল। এই হত্যাকাণ্ডে তালেবানের অনেক উচ্চপদস্থ নেতা, মন্ত্রী ও উলামায়ে কেরাম নিহত হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তালেবানের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মৌলবী ইহসানুল্লাহ ইহসান। আল্লাহ তাআলা এই মজলুম শহীদদের কবুল করে রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন, আমীন।

২৫. এ ঘটনার পর উত্তরাঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তালেবান আরও সতর্ক হয়ে যায়। তাঁদের ধারাবাহিক আক্রমণে একের পর এক এলাকার পতন হতে থাকে। এভাবে বাদগিস, ফারিয়াব ও বলখের রাজধানী মাযার-ই-শরীফে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মাযার-ই-শরীফের গণহত্যায় অংশগ্রহণকারী তিন হাজারেরও অধিক মিলিশিয়াকে তাঁরা মৃত্যুদণ্ড দেন। এরপর আরও অগ্রসর হয়ে সামাংগান দখল করে দক্ষিণ দিকে বামিয়ানমুখী প্রবেশপথগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। বাদাখশানের অনেকগুলো এলাকাও তাঁদের অধীনে চলে আসে। দোস্তমের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সে-ও উজবেকিস্তান পালিয়ে যায়। তালেবানের সামনে তখন উল্লেখযোগ্য বাহিনী হিসেবে শুধু আহমাদ শাহ মাসউদের দলই টিকে ছিল। পাঞ্জশীর থেকে জাবাল-ই-সিরাজ, চার-ই-কার হয়ে কাবুলের উত্তরদিকের প্রবেশপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ একটি এলাকাজুড়ে সে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। তার সাথে সাইয়াফের অনুগত বাহিনী এবং বামিয়ানের শিয়া দল হিযবে ওয়াহদাতও ছিল।

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে বামিয়ানের পতন হয়। এর কিছুদিন আগেই আগাখানি ইসমাইলী সম্প্রদায়ের প্রধান ঘাঁটি কায়ান উপত্যকাও তালেবানের অধীনে চলে এসেছিল। আফগানিস্তানে আগাখানিদের সংখ্যা একেবারেই কম। এ অভিযানে তালেবান এত বিপুল পরিমাণে অস্ত্র গনীমত লাভ করে, যা গণনা করাই কঠিন ছিল। গাদ্দারি ও অন্যায় হত্যার শাস্তি হিসেবে তালেবান এখানে শরয়ী দণ্ডবিধি (হদ) বাস্তবায়ন করে। মাযার-ই-শরীফ গণহত্যায় অংশ নেওয়া চার হাজার শিয়াকেও এ সময় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিগত ৮০০ বছরে ইসমাইলীদের ঘাঁটি এই অঞ্চলে আহলুস সুন্নাহর কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। এরপর তালেবানযোদ্ধারা গোরবন্দের পথ ধরে আহমাদ শাহ মাসউদের বাহিনীর পেছন দিক থেকে অভিযান চালিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এ অভিযান চলাকালেই নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ৯/১১-এর বরকতময় হামলা হয় এবং ৭ই অক্টোবর ২০০১-এ আমেরিকার নেতৃত্বে নব্য

ক্রুসেড শুরু হয়। ফলে তালেবানের অগ্রযাত্রাও বাধাগ্রস্ত হয়। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের অধীনে তখন বাদাখশান ও পাঞ্জশীর উপত্যকা (ম্যাপে নীল রঙে চিহ্নিত) ছাড়া অন্য কোনো এলাকা ছিল না।

## আফগানিস্তানে তালেবানের কর্তৃত্ব: আমাদের শিক্ষা

তালেবানের প্রথম পাঁচ বছরের শাসনামল অনেকটা অভিজ্ঞতা অর্জন ও ট্রেইনিং পিরিয়ডের মতো ছিল। পুরো দেশের কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে চলে আসবে—এ ধারণাই তাঁদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তাঁদের এই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসেন, যেন রাষ্ট্র পরিচালনা ও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করতে পারেন। সাথে সাথে তাঁদের যাচাই করে দেখেন, যেন কঠোর পরীক্ষার মুহূর্তেও তাঁরা টিকে থাকা শিখে যান, ত্যাগ ও কুরবানীর মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠেন। কারণ, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ত্যাগ ও কুরবানীর যে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে, সে জন্য তাঁদের পূর্ণ প্রস্তুতি দরকার ছিল।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলমানদের যে-সব ভূখণ্ড ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ দেশের মুসলিমরাই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নামে কখনো না কখনো স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই আজ অবধি শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর সম্ভাব্য একটি কারণ হলো, যে আদর্শের জায়গা থেকে এ স্বাধীনতাযুদ্ধগুলো করা হয়েছে, সেগুলো খালেস আল্লাহর জন্য ছিল না; বরং এ সব যুদ্ধে ইসলামের সাথে জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজমের মতো নানান মতবাদ ও আদর্শ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের ইসলামী ও জিহাদী আকীদা—যেমন: ওয়ালা-বারা—এবং এর বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত সৃষ্টি হয়েছিল। ফিলিস্তিন ইস্যু এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৩৯] অনেক দেশের মুসলিমরা আগ্রাসি শত্রুর ধোঁকাবাজি ও চক্রান্তও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তারা ধরতে পারেননি যে, শত্রুরা এখন নিজেদের কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। সামরিক আগ্রাসনের পরিবর্তে এখন তারা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পথ ধরেছে। আর এ জন্য ব্যবহার করছে নিজেদের হাতেগড়া পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও আদর্শ লালনকারী ব্যক্তিদের, যারা পশ্চিমাদের রেখে যাওয়া শূন্যস্থানে বসে দেশের ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।

সংক্ষেপে বললে, অন্যান্য ভূখণ্ডের মুসলিমরা যে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি, তালেবান তা মজবুতভাবে আত্মস্থ করে ফেলেছিল। তা হলো—**'নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ ও কুরবানীর মাধ্যমেই**

[৩৯] শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী রচিত 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী' থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত।

**কেবল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এ জন্য যত ত্যাগ স্বীকার করতে হোক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।'** বিশুদ্ধ ও শরীয়তসিদ্ধ এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারার ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্ব তো আল্লাহ তাআলার, তিনিই তালেবানকে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তালেবানের পরিবেশ-প্রকৃতিও এতে বড় ভূমিকা রেখেছিল। তালেবান আন্দোলন গড়েই উঠেছে এমনভাবে যে, তাঁরা আল্লাহর কিতাব ও নবীজীর সুন্নাহ থেকেই সব নির্দেশনা গ্রহণ করে। মাদরাসাগুলোতে তাঁরা যে ইলমের চর্চা করে, সে ইলমকে তাঁরা বাস্তব জীবনেও মেনে চলে। তাই তো আফগানিস্তানের যেখানেই তাঁরা ক্ষমতা লাভ করেছে, সেখানেই শরীয়ত কায়েম করেছে, জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, চোর-ডাকাতদের নির্মূল করেছে এবং সাধারণ মানুষকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তালেবানের জন্ম হয়েছে, তার ওপর আমেরিকা ক্ষুব্ধ থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এ জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, তার প্রশাসন ও মার্কিন সংস্থাগুলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। বিশেষত, যে দীনী মাদরাসাগুলো থেকে তালেবানের সূচনা হয়েছে, সেগুলোকে তারা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। মার্কিনিদের বিদ্বেষ এতটাই চরম আকার ধারণ করেছিল যে, অনেক হাফেযী মাদরাসা টার্গেট করে তারা বোমা হামলা করেছে এবং অসংখ্য কুরআনের হাফেয শিশুকে হত্যা করেছে। কুন্দুয-সহ আফগানিস্তানের আরও কিছু শহরে এমন হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুধু আফগানিস্তানেই এই হামলা সীমাবদ্ধ থাকেনি। সৌদি, ইয়েমেন, পাকিস্তান-সহ অনেক মুসলিম দেশে দীনী মাদরাসাগুলো বন্ধ করার জন্য একের পর এক তারা হামলা করেছে। কেবল সে সকল মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানগুলোই তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, যেগুলোর কর্ণধার আলেমরা ঈমান-কুফর, ওয়ালা-বারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে (শাসকদের রাজকীয় আকীদা) ইরজা-কে লালন করে, যারা মুজাহিদদের বিরোধিতাকেই নিজেদের ধর্ম মনে করে, জিহাদী নেতৃবৃন্দের ফতওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে; যাদের দৃষ্টিতে মুজাহিদরা হলো খারেজী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যাদেরকে যুদ্ধ করে হলেও হকের (!) পথে ফিরিয়ে আনা জরুরি।

এর পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতায় বসে থাকা পশ্চিমাদের দালাল শাসকদের সাথে মিলে তারা দীনী শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যও চেষ্টা চালিয়েছে। দীনী শিক্ষাকারিকুলাম থেকে জিহাদ ও ওয়ালা-বারার মতো বিষয়গুলো মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে শত্রুতা সম্পর্কিত সবকিছু বাদ দিয়েছে। এর বিপরীতে মাদরাসাগুলোর জন্য এমন কারিকুলাম দেওয়া হয়েছে, যা গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তাদের প্রভু আমেরিকার ইচ্ছেমতো তৈরি করেছে। ২০০৩ সালের শেষের দিকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার প্রশাসন ইসলামকে বিকৃত করার লক্ষ্যে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা শুরু করে। মার্কিন সরকারের অধীনে

'United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)' নামে একটি কমিশন আগে থেকেই পরিচালিত হচ্ছিল। বুশ প্রশাসন এই কমিশনের রিপোর্টের আলোকে আরব দেশগুলোকে 'ধর্ম প্রচার ও ইসলামী দাওয়াত-সংক্রান্ত নীতিমালা' প্রদান করে। এরচেয়ে হাস্যকর বিষয় আর কী হতে পারে![৪০]




সৌদি আরবের শিক্ষাকারিকুলাম পরিবর্তনে সাবেক মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট রেক্স টিলারসনের সাফল্য সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসে জিজ্ঞাসাবাদ অধিবেশনের একটি স্থিরচিত্র।

## কান্দাহার: নতুন ঠিকানায়

কান্দাহার পৌঁছানোর পর সাময়িকভাবে বিমানবন্দরেরই একটি ভবনে মুজাহিদ পরিবারদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আরব মুজাহিদদের থাকার জন্য তালেবানের পক্ষ থেকে শায়খ উসামার কাছে দুটি এলাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একটি হেলমান্দ প্রদেশে, সেখানকার ভবনগুলো আগে থেকেই বসবাস উপযোগী ছিল। আরেকটি কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে, এখানকার ভবনগুলো বসবাসের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শায়খ উসামা রহ. কান্দাহারের এলাকাটিকেই গ্রহণ করেন। কান্দাহার শহর থেকে এলাকাটি প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ছিল। তালেবানের সাথে আরব ভাইদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রধান সহকারী মোল্লা জলীলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই কলোনিতে প্রায় ৮০টি ঘর ছিল। কলোনিটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ভেতরের অংশে ঘর ছিল ৬০টি। প্রতিটি ঘরে দুটি কামরা, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং রান্নাঘর ও

[৪০] আল-বাত্তার আর্কাইভের 'منتهى الجنون : خطة أمريكية لتشويه الخطاب الديني لدى المسلمين' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত।

টয়লেটের মধ্যে ছোট একটি করিডোর ছিল। এই অংশটি বিবাহিত ভাইদের পরিবারের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাহিরের অংশে ঘর ছিল ২০টি। প্রত্যেকটি ঘরে তিনটি কামরা, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি ছোট উঠান ছিল। এই অংশের কিছু ঘর অবিবাহিত ভাইদের জন্য রাখা হয়, কিছু ঘর মেহমানখানা ও নতুন আগত ভাইদের জন্য রাখা হয় আর কিছু ঘর অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কলোনির ঘরগুলো পাকা করা হলেও সবগুলোরই মেরামত ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন ছিল। কারণ, সেখানকার অধিকাংশ ঘরই বেদুইনরা ছাগলের খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহার করত, তা ছাড়া কোনো ঘরের পাশেই প্রাচীর বা দেওয়াল ছিল না, এমনকি ঘরগুলোতে দরজা-জানালার জায়গাগুলোও ছিল ফাঁকা। দেওয়ালে এমন এক বিঘত জায়গাও ছিল না, যেখানে বুলেটের আঘাতে ছিদ্র হয়নি বা ফাটল ধরেনি।

ঘর বণ্টনের পর ভাইয়েরা মেরামত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। শায়খ উসামা রহ. কান্দাহারে পৌঁছামাত্রই বিমানবন্দরের ভবনে না গিয়ে সরাসরি সেই কলোনিতে চলে যান। কলোনির মধ্যখানে চারটি ঘর বাছাই করে সেখানে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আসেন। তিনিই ছিলেন এই কলোনির প্রথম বাসিন্দা। নতুন দরজা-জানালা লাগানোর আগ পর্যন্ত তিনি পশমের তৈরি মোটা আফগানী শাল (বাত্তু) দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করেন।

খরচ কমানোর জন্য ভাইয়েরা ঠিক করেন, নিজ নিজ ঘরের দেওয়াল নিজেরাই মাটি দিয়ে বানিয়ে নেবেন। দেওয়াল বানানোর কাজে সবাই একে অপরকে সাহায্য করা শুরু করেন। শায়খ উসামা রহ. তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান, সাদ, উমর, উসমান ও মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে নিজেদের ঘরের দেওয়াল নির্মাণ করা শুরু করেন। তাঁরা কখনো হাত দিয়ে, কখনো পা দিয়ে মাটির খামিরা তৈরি করে দিতেন। শায়খ আবু বাসীর রহ, আবু উমাইর হাযরামী রহ., শায়খ খাল্লাদ বিন আতাশ ফা.আ.-সহ আরও অনেকেই তাঁদের সাহায্য করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাঁরা ইয়েমেনি কবিতা ও স্লোগান আবৃত্তি করতেন। যেমন: ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ একটি স্লোগান—أربعة شلو أم جمل وأم جمل ما شلهم (অর্থাৎ চারজন মিলে একটি উটকে বহন করা সম্ভব, কিন্তু একটি উট চারজনকে বহন করতে পারে না। দলবদ্ধতার শক্তি বোঝানোর জন্য এই স্লোগানটি ব্যবহার হয়।)

ভাইদের বানানো এই দেওয়ালটি অবশ্য টেকসই হয়নি। বানানোর সময়ই কেমন একদিকে ঝুঁকে ছিল। এরপর প্রথম যেদিন বৃষ্টি নামে, সে বৃষ্টিতেই দেওয়াল লুটিয়ে পড়ে। রাতজেগে পাহারা দেওয়ার কারণে ভাইয়েরাও ক্লান্ত হয়ে যেতেন, তাই দেওয়াল বানানোর কাজ আর আগায়নি। অবশেষে সবাই মিলে ঠিক করেন, দেওয়াল বানানোর জন্য শ্রমিক নেওয়া হবে। আবু হাফস আরব ভাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তিনি নির্মাণকাজ ও শ্রমিকদের তদারকি

করবেন। তাঁর পর সা'দুফ রহ. এ কাজের দায়িত্ব নেন। শায়খ উসামা রহ.-এর ঘরের পাশে ভাইয়েরা একটি ঘর নির্বাচন করে সেটাকে মসজিদ বানান। মসজিদের সাথে আরও দুটি ঘর বানানো হয়, একটি শায়খের বৈঠকখানা, অন্যটি শায়খের অবিবাহিত দেহরক্ষী ভাইদের থাকার জন্য নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, কান্দাহার বিমানবন্দরের পাশের এই কলোনিতে পরিবার-সহ বসবাসকারী ভাইদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছিল। নবাগত ভাইদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী, শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী, শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফিযাহুমুল্লাহ, শায়খ আহমদ হাসান আবুল খাইর রহ. ও শায়খ খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ফা.আ.।

## নতুন ভাইদের আগমন

সে সময় আফগানিস্তানে নতুন ভাইদের আগমন ছিল খুবই সীমিত। এর বড় একটি কারণ ছিল চেচনিয়ার জিহাদ। বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত এবং মুজাহিদদের ক্যামেরায় ধারণকৃত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচেন মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও বিজয়ের ভিডিওগুলো তখনও জিহাদপ্রেমী যুবকদের মনে গেঁথে ছিল। যদিও তখন রাশিয়া ও মুজাহিদদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলছিল, তবু জিহাদপ্রেমী যুবকরা চেচনিয়ার দিকেই ছুটতেন বেশি। অল্পসংখ্যক যারা আফগানিস্তানে আসতেন, তারাও আসতেন প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। প্রশিক্ষণ শেষ হলেই চেচনিয়া চলে যেতেন।

তা ছাড়া তালেবান সম্পর্কে জিহাদপ্রেমী যুবকদের মধ্যে—বিশেষ করে পাকিস্তানে থাকা মুজাহিদদের মধ্যে—নেতিবাচক ধারণা ছিল। এই নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল মিডিয়ার অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডার কারণে। সাইয়াফ, রব্বানী ও হেকমতিয়ারের মতো তালেবানবিরোধী নেতারাও তালেবান সম্পর্কে কুৎসা রটাতে ছিল তৎপর। হেকমতিয়ারের দলে আরব মুজাহিদদের সংখ্যাও ছিল অনেক। চতুর্মুখী অপপ্রচারে তালেবান সম্পর্কে আরবদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, 'তালেবান হলো আমেরিকার এজেন্ট, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে এদের নিয়ন্ত্রণ।' কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ ফযল ও করমে এই প্রোপাগান্ডা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শরীয়ত প্রতিষ্ঠা ও ফিতনার মূলোৎপাটনে তালেবানের সত্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং শায়খ উসামা রহ.-এর আগমনের ফলে আরবদের চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। বিশেষ করে শায়খ উসামা রহ. এমন সময় তালেবানের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যার কিছুদিন আগেই তিনি হারামাইনে অনুপ্রবেশকারী দখলদার আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফলে আফগানিস্তান অভিমুখে নতুন করে যুবকদের ঢল নামে, দলে দলে আরব যুবকরা আসতে থাকে আফগানিস্তানে। পাকিস্তানের

করাচিতে নবাগতদের রিসিভ করা হতো, তারপর ভাইয়েরা তাদের নিয়ে কান্দাহারের কাছাকাছি স্পিন বোল্ডাক ক্রসিং দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিতেন।

নতুন কোনো ভাই আসলে শায়খ উসামা রহ. খুব খুশি হতেন। খোস্তের আল-ফারুক ক্যাম্পে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শায়খ রহ. আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে তাঁদের মেহমানদারি করতেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে বসে তালেবান ও উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাঁর 'একমুখী প্রচেষ্টা'র ধারণাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন।

## তালেবান ও আল-কায়েদা: রণাঙ্গণের অংশীদারি

শায়খ উসামা রহ. আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ই যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আমীরুল মুমিনীন তাঁর এই ইচ্ছাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তবে এতটুকু বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আপনাদের সাহায্য চাইব। কাবুল পতনের পর তালেবানবিরোধী দলগুলো নর্দার্ন অ্যালায়েন্স নামে ঐক্যবদ্ধ হয়। তালেবান তাদেরকে কাবুলের উত্তরে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আহমাদ শাহ মাসউদের বাহিনীর কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে নেয়। কাবুল থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার উত্তরে জাবাল-ই-সিরাজ শহরে ছিল ঘাঁটিগুলো। সেখান থেকে সালাং পাস ও আহমদ শাহ মাসউদের প্রধান ঘাঁটি পাঞ্জশীর উপত্যকা ছিল খুব কাছে। একবার তালেবানযোদ্ধারা পাঞ্জশীর উপত্যকার ভেতরে ঢুকে পড়ে, কিন্তু মাসউদের বাহিনী একযোগে হামলা করে অনেক যোদ্ধাকে হত্যা করে। ফলে তালেবানযোদ্ধারাও বাধ্য হয়ে পিছু হটে এবং জাবাল-ই-সিরাজে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘটনার পর আমীরুল মুমিনীন রহ. নফীরে আমের ঘোষণা দেন। সময়টি ছিল ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি।

আমীরুল মুমিনীন রহ.-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তালেবানের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের জন্য প্রথমবারের মতো আল-কায়েদা নিজ সন্তানদের পাঠায়। শায়খ কমান্ডার আবু হাফসের নেতৃত্বে আরবের নির্বাচিত ব্যক্তিরা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। শায়খ উসামা রহ.-ও সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের পেছনে রওনা হন। অল্পকিছু ভাই কান্দাহারে নারী-শিশুদের দেখাশোনার জন্য থেকে যান। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে তালেবানের এই যুদ্ধটি হয়েছিল জাবাল-ই-সিরাজ অঞ্চলে। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী, শায়খ সাইফ আল-আদল, শায়খ আব্দুল হাদী ইরাকী, শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, আবু যিয়াদ ইরাকী, আবু আতা তিউনিসী, মুহান্নাদ, খাল্লাদ ও উমাইর

বিন আতাশ, তালহা সুদানী, হামযা যুবাইর মিসরী, ফাহাদ কীনী, খালেদ হাবীব-সহ আরও অনেকে।

ফ্রন্টে আল-কায়েদার ভাইদের প্রথম পজিশন ছিল চার-ই-কার গ্রামের উত্তরে পুল-ই-মাতাক নামক অঞ্চলে। এখানে ভাইয়েরা চারটি ১২০ এম.এম. মর্টার নিয়ে পজিশন নেন। শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী রহ. সেখানকার আমীর ছিলেন। মর্টার ফায়ার করার জন্য ফরওয়ার্ড অবজার্ভেশন (FO)-এর দায়িত্ব ছিল আবু যিয়াদ ইরাকী রহ.-এর ওপর। তিনি উঁচু একটি পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন, যেখান থেকে পুরো জাবাল-ই-সিরাজ এলাকাটি দেখা যায়। ফরওয়ার্ড অবজার্ভেশনে ভাইয়ের দক্ষতা ও পড়াশোনা থাকার সুবাদে মর্টার হামলাগুলো খুব নিখুঁত হতো। মাসউদ বাহিনীর উপস্থিতি ধরতে পারার সাথে সাথে প্রথম চেষ্টাতেই ভাইয়েরা সঠিক স্থানে মর্টারশেল নিক্ষেপ করতে পারতেন।

মাসউদ বাহিনীর ফ্রন্টলাইনের ফার্স্ট পজিশন থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আল-কায়েদার ভাইদের আরও একটি পজিশন ছিল। এই পজিশনটি বেশ উত্তপ্ত ছিল। এখানেই শায়খ আবু দুজানা পাশার[৪১] পায়ে শেলের আঘাত লাগে, যার কারণে তার একপায়ের রান থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটা কেটে ফেলতে হয়েছিল। 'দেহ সব্য' মরুভূমির মধ্য দিয়ে কাবুল থেকে বাগরাম এয়ারবেইজ পর্যন্ত যে সড়কটি চলে গেছে, তার পাশেই উঁচু একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ে আল-কায়েদার ভাইদের তৃতীয় পজিশন ছিল। এখানে ভাইয়েরা পালাক্রমে পাহারা দিতেন। এ দিক দিয়ে শত্রুবাহিনী যেন কাবুলের ওপর হামলা করতে না পারে, সে জন্য একটি ট্যাংক নিয়ে সতর্ক অবস্থানে ছিলেন তাঁরা।

## কাবুলের ডিফেন্স লাইন (প্রতিরক্ষাব্যূহ) তৈরির গল্প

শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি. কাবুলের ডিফেন্স লাইন তৈরির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

> 'শায়খ আবু হাফস রহ.-এর নেতৃত্বে আল-কায়েদার প্রথম ইউনিটটি কাবুলের উত্তর দিকে পৌঁছায়। এই দলে শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী ও শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরীও ছিলেন। মাসউদ বাহিনীর সাথে টানা কয়েকটি লড়াইয়ের পর ভাইয়েরা বুঝতে পারেন, তালেবানযোদ্ধারা ঝটিকা আক্রমণের (হিট অ্যান্ড রান) কৌশল ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা 'হঠাৎ আক্রমণ (সারপ্রাইজ অ্যাটাক)' এবং নিজেদের মানসিক শক্তি ও মনোবলকে কাজে লাগান। কোনো আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্রেই তাঁরা সামরিক শৃঙ্খলাকে খুব একটা বিবেচনায় নেন না। বিশেষত যখন শত্রুপক্ষ পালটা হামলা করে, তখন প্রতিরোধের জন্য

[৪১] শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর জামাতা।

তাঁদের সুবিন্যস্ত কোনো পরিকল্পনা থাকে না। তালেবান যেহেতু হিট অ্যান্ড রান কৌশলই ব্যবহার করত বেশি, এ কারণেই কান্দাহার পৌঁছানোর পর প্রথম দিকে আমরা যখন আমীরুল মুমিনীন রহ.-এর কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আবেদন করেছিলাম, তখন তিনি রাজি হননি।[৪২] [কারণ, হিট অ্যান্ড রানে ঝুঁকি থাকে অনেক বেশি। আরবদের তিনি ঝুঁকিতে ফেলতে চাননি।] আল-কায়েদার ভাইয়েরা কাবুল ফ্রন্টে গিয়ে আরেকটি বিষয় দেখতে পান যে, কাবুলের প্রতিরক্ষার জন্য কোনো ডিফেন্স লাইন নেই।

আল-কায়েদার ভাইদের প্রথম ইউনিট কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর থেকেই শায়খ উসামা রহ. কান্দাহারে স্বস্তিতে থাকতে পারছিলেন না। তিনি যে-কোনোভাবে কাবুল যেতে চাচ্ছিলেন। অন্যদিকে শায়খ আবু হাফস রহ. তাঁকে নিরস্ত করার জন্য বারবার বলছিলেন, 'কাবুলের পরিস্থিতি ভালো না, যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছুই হতে পারে।' এ নিয়ে আমি ও শায়খ রহ. দীর্ঘ শলাপরামর্শ করি। অবশেষে শায়খ রহ. কাবুল যাওয়ার একটি কৌশল বের করেন।[৪৩] শায়খ আমাকে বলেন, আমি যেন শায়খ আবু হাফস রহ.-কে বলি, আমরা খোস্ত যাওয়ার পথে[৪৪]কাবুলে গিয়ে শুধু তাঁর সাথে দেখা করেই চলে যাব।

শায়খ আবু হাফস রহ. অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। শায়খ উসামার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, কাবুলে এসে যদি শুধু দেখা করারই নিয়ত থাকে, তাহলে আসতে পারেন। অবশেষে আমরা কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। কিন্তু, এই সফর শুধু দেখা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, কাবুলে গিয়ে আমরা জিহাদে শরীক হয়েছিলাম।

কাবুলে পৌঁছামাত্রই সেখানে থাকা তিনজন শায়খ সেখানকার গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন এবং কাবুলের প্রতিরক্ষার জন্য ডিফেন্স লাইন তৈরির

---

[৪২] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, শায়খ উসামা রহ. যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য বারবার আবেদন করলেও মোল্লা উমর রহ. উল্লিখিত কারণ দেখিয়ে প্রতিবারই তাঁর আবেদন নাকচ করে দেন। সে সময় কান্দাহারের একটি ঘরে কিছু যুবককে আমি আন্ডারকভার অপারেশনের প্রশিক্ষণ দিতাম। একদিন ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে খুলে দেখি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অ্যাসিস্টান্ট দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জানান, মোল্লা উমর রহ. নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমি তড়িঘড়ি করে শায়খ উসামাকে এই সংবাদ জানাতে যাই। শায়খ সংবাদ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হন।

[৪৩] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, এই ঘটনা থেকেই মানুষ বুঝতে পারবে, শায়খ রহ. জিহাদের জন্য কতটা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। সাথিদের ময়দানে পাঠিয়ে নিজে ঘরে বসে থাকার লোক ছিলেন না তিনি।

[৪৪] কাবুলের নিরাপত্তা-পরিস্থিতির অবনতির কারণে তখন সিদ্ধান্ত ছিল, শায়খ উসামা কাবুলে না গিয়ে শায়খ সাইফ আল-আদলের সাথে খোস্ত যাবেন। [কিন্তু শায়খ কাবুলের যুদ্ধে শরীক হতে আগ্রহী ছিলেন।]

প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শায়খ উসামা, শায়খ আবুল ওয়ালীদ, শায়খ আবু হাফস ও আমি (শায়খ সাইফ আল-আদল) পরিদর্শনের জন্য বের হই। বাগরাম এয়ারবেইজ থেকে 'দো সারকি'[৪৫] হয়ে 'মুরাদ বেগ'[৪৬] পর্যন্ত ঘুরে দেখে শায়খ আবু হাফস ও শায়খ আবুল ওয়ালীদের কথার সত্যতা বুঝতে পারি যে, কাবুলের প্রতিরক্ষার জন্য ডিফেন্স লাইন তৈরি করা আবশ্যক। পরিদর্শনের সময়ই আমরা দুটি জায়গা ঠিক করে রাখি। একটি হলো বাগরাম এয়ারবেইজ-[কাবুল রোডে][৪৭], শায়খ আব্দুল হাদী ইরাকী ও হামযা যুবায়ের ভাইকে এই জায়গার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় স্থানটি হলো [কুন্দুয-কাবুল রোডের] 'মুরাদ বেগ' এলাকার পাশে, আমাকে এ জায়গার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পরদিন আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা উবায়দুল্লাহ রহ.-এর কাছে যাই। বাগরামের উপকণ্ঠে তাঁর সাথে দেখা হয়। কাবুলের প্রতিরক্ষার জন্য ডিফেন্স লাইন তৈরি এবং ট্যাংক ও কিছু অস্ত্রের প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলি। তিনি আমাকে বলেন, 'শত্রু তো এখন অনেক দুর্বল। আপনারা কীসের ভয় করছেন এত?' আমি বললাম, 'আমরা ভয় করছি না, তবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, মাসউদ তার বাহিনী নিয়ে আপনাদের ওপর পালটা আক্রমণ করবে। তা ছাড়া আমরা যে ডিফেন্স লাইন তৈরি করব, তাতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং লাভ হবে। যাই হোক, আলোচনার পর তিনি আমাদের দুটি ট্যাংক দিতে রাজি হন। একটি রাখা হবে বাগরামে, আরেকটি মুরাদ বেগে। আমি আবু আবেদ ইরাকী ভাইকে ট্যাংকদুটি আনতে পাঠাই; কিন্তু ট্যাংকের দায়িত্বে থাকা লোকটি গড়িমসি করতে থাকেন।

তখন আমাদের আরেকটি সমস্যা ছিল আরব ভাইদের স্বল্পতা। এ জন্য পাকিস্তানি ভাইদের সাথে কথা বলে তাঁদের থেকে ১০ জন ভাইকে আমাদের সাথে নিয়ে নিই। আমি, আবু হুমাম সায়ীদী ও পাকিস্তানি ভাইদের আমীর আদিল ভাইকে সঙ্গে নিই। আমাদের সাথে কিছু যুদ্ধসরঞ্জাম ও প্রশাসনিক নথিপত্রও ছিল। আবু হুমাম ভাই নথিপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে মুরাদ বেগ পাহাড়ে অবস্থান নেন আর আমি আদিল ভাইকে সাথে নিয়ে ফ্রন্টলাইন থেকে বাকি যুবকদের আনার জন্য রওনা দিই। ভাইদের নিয়ে

---

[৪৫] কাবুল থেকে ৫০ কি.মি. উত্তরে বাগরাম এয়ারবেইজের বিপরীতে প্রধান সড়কের একটি মোড়ের নাম 'দো সারকি'।

[৪৬] কাবুল থেকে ১৬ কি.মি. উত্তরে ছোট একটি গ্রামের নাম 'মুরাদ বেগ'।

[৪৭] 'দেহ সব্য' এলাকার মধ্য দিয়ে বাগরাম এয়ারবেইজ থেকে কাবুল পর্যন্ত যে সড়ক চলে গিয়েছে, সে সড়কের এক জায়গায় বিশাল একটি পাহাড় আছে। জায়গাটি সেখানেই।

ফেরার পথে আমার গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়, এতে চারজন ভাই নিহত হন। আহমদ শাহ মাসউদের পক্ষ থেকে ততক্ষণে [বাগরামের ওপর] তীব্র আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই আক্রমণে একপর্যায়ে তালেবানের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং সবাই এলোমেলোভাবে পিছু হটতে থাকে। সেদিন যোহর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত একটানা এভাবেই চলতে থাকে। আব্দুল হাদী ইরাকী ভাইয়ের সাথে দেখা করে তাঁর থেকে দুজন ভাই—খাল্লাদ বিন আতাশ ও সালেম শরীফ—কে সাথে নিয়ে হেঁটে মুরাদ বেগ পাহাড় পর্যন্ত যাই, যেখানে আবু হুমাম ভাই একাই অবস্থান করছিলেন।

কাবুলে যোগাযোগ করলে তাঁরা আরেকটি গাড়ি পাঠান। সে গাড়িতে আবু আবেদ ইরাকী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাংক আনার জন্য বের হই। ট্যাংকের দায়িত্বশীল এবার আর গড়িমসি করলেন না। আবু আবেদ ভাই ট্যাংক নিয়ে মুরাদ বেগ চলে যান। আল্লাহর রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে ট্যাংক রাখার জন্য উপযুক্ত একটি জায়গাও আমরা পেয়ে যাই। জায়গাটি প্রাকৃতিকভাবেই এমন ছিল যে, সামনের দিক [যে-দিক থেকে হামলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল] থেকে তা দেখা যেত না, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে উন্মুক্ত ছিল এবং রাস্তার পাশে জায়গাটি এমনভাবে ছিল, রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও সেখান থেকে খুব সহজেই রাস্তার ওপর নজর রাখা যেত।

আসরের পর আবুল ফারাজ লীবী এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তাঁর সাথে একদল যুবকও ছিল, এ ছাড়াও একটি DShK হেভি মেশিনগান, ৮২ এম.এম. ব্যারেলের গান ও গোলাবারুদও ছিল। সেই ময়দানে যারা ছিলেন, তাঁদের অনেকের নাম এখনো মনে আছে—আমি, আবু হুমাম সায়ীদী, আবুল ফারাজ লীবী, আবু আবেদ ইরাকী, খাল্লাদ বিন আতাশ, সালেম শরীফ, আবু মিহজান তায়েফী, আবু জানদাল ইয়ামানী, আবু মুহাম্মাদ আওহালী[৪৮], আব্দুয যাহের আফগানী, দাউদ আফগানী, আব্দুস সবুর আফগানী, যুবাইর পাকিস্তানী, তাঁর সাথে আরও তিনজন ভাই ছিলেন, তাঁদের নাম এখন মনে নেই। আজ থেকে ২৩ বছর আগের কথা এ সব। যাই হোক, তখন আমাদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন।

আমি দ্রুত পুরো পজিশন ভাগ করে ভাইদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিই। আবুল ফারাজ লীবী, যুবাইর পাকিস্তানী, আবু জান্দাল এবং আরও তিন ভাইকে DShK মেশিনগান দিয়ে পাহাড়ের একদম ওপরে পাঠিয়ে দিই। পাহাড়ের এক কোণে ট্যাংক থেকে প্রায় ৩০০

[৪৮] নাইরোবিতে মার্কিন দূতাবাসে হামলাকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন; অথচ তাঁর গাড়িতে তিন টন বিস্ফোরক ছিল। বর্তমানে আমেরিকার কলোরাডো রাজ্যের ADX Florence কারাগারে বন্দি আছেন। আল্লাহর কাছে তাঁর দ্রুত মুক্তি কামনা করছি।

মিটার সামনে সালেম শরীফ ও আবু মিহজানকে ৮২ এম.এম. ব্যারেলের RCL (রিকোয়েললেস) গান নিয়ে অবস্থান নিতে বলি। জায়গাটি রাস্তা থেকে ওপরে হওয়ায় আক্রমণের সময় দরকার হলে তাঁরা রাস্তার দিকেও ছুটে যেতে পারবে। আবু হুমাম সায়ীদী আর খাল্লাদ বিন আতাশকে ট্যাংকের দায়িত্ব দিই। বাকিদের নিয়ে আমি ট্যাংকের পাশে অবস্থান নিই। সে রাতটি এভাবে খোলা ময়দানেই কাটিয়ে দিই আমরা। অন্য কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময়ও আমাদের হাতে ছিল না। পরদিন সকালেই আচমকা নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের আক্রমণ শুরু হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে যান। আবুল ফারাজ লীবী শত্রুবাহিনীর ওপর তুমুল বেগে গুলিবর্ষণ করা শুরু করেন।

ট্যাংকের ব্যারেল তাক করা এবং শেল নিক্ষেপ করা নিয়ে মজাদার কিছু ঘটনা আছে। ট্যাংকে শেল লোড করে কয়েকবার ফায়ার করার পরেও ফায়ার হচ্ছিল না। অবশেষে চতুর্থবার চেষ্টার পর ফায়ার হয়েছিল। কিন্তু এর পরে তো ট্র্যাংকটিই অকেজো হয়ে পড়েছিল।[৪৯] ট্যাংক থেকে মাত্র একটি শেল নিক্ষেপ করা গেলেও সৌভাগ্যক্রমে সেটি সোজা গিয়ে পড়েছিল প্রতিপক্ষের ওপর, এতে তাদের অনেকে হতাহত হয়েছিল। আবুল ফারাজের DShK মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে দেখে তো শত্রুরা রীতিমতো ভিরমি খেয়েছিল। মোটকথা, পাহাড় থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শত্রুপক্ষ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। তারা ভাবছিল, পাহাড়ে অনেক সৈন্য আছে। তাই তাদের আক্রমণ স্থগিত করে।

---

[৪৯] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, 'আবু হুমাম ও খাল্লাদ ট্যাংকের (টারেটের) ভেতরে নামার পর ব্যারেলটিকে ডানদিকে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। আমি বাইরে থেকে তাদের তাড়া দিচ্ছিলাম। তখন আবু হুমাম ভেতর থেকেই আমাকে বলল, ব্যারেল নড়ছে না। এ কথা শুনে বাইরে থেকে আমরা কয়েকজন মিলে ব্যারেলে ধাক্কা দিয়ে টার্গেটমুখী করে দিই। এরপর আবু হুমামকে জিজ্ঞেস করি, এখন টার্গেট দেখা যাচ্ছে কি না? সে বলে, পেরিস্কোপ দিয়ে দেখতে কষ্ট হচ্ছে, ব্যারেলের ভেতর দিয়ে দেখা যায় কি না দেখি। কিন্তু ব্যারেল দিয়েও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তখন আমি ব্যারেলের নিচে মাথা দিয়ে চাপ দিয়ে বাকিদেরও নিচ থেকে ব্যারেলে ধাক্কা দিতে বলি। এতে ব্যারেল যখন টার্গেটমুখী হয়ে যায়, তখন আমি আবু হুমামকে বলি, ব্যারেল এখন যেদিকে আছে, ঠিক এ দিকেই দেড় কিলোমিটার দূরত্বে ফায়ার করুন। দূরত্ব ঠিক করার পর আবু হুমাম জোশের সাথে আল্লাহু আকবার বলে ফায়ার করলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুই হলো না। এভাবে দুইবার, তিনবার চেষ্টা করেও কাজ হলো না। হঠাৎ খাল্লাদ ভাই চিৎকার করে বলে ওঠেন 'সেফটি ডিসেবল করা হয়নি'। আমি মিশরীয় ভাষায় বলি فك ابن الذين ده (আরে সেফটিটা আগে ডিসেবল করে পরে ফায়ার করো)। এরপর আবু হিশাম সেফটি ডিসেবল করে ফায়ার করে এবং এবার ফায়ার হয়। শেলটি একেবারে শত্রুর ওপর গিয়ে আঘাত হানে, এতে তাদের রাস্তা অবরোধ করার স্বপ্ন ভেস্তে যায়। কিন্তু শেলের খোসাটা নলে আটকে যায়, ফলে কামান অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ট্যাংকের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এর দুয়েকদিন পর আবু আবেদ ইরাকী রহ. কামানের ত্রুটিগুলো ঠিক করেন এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এটি ঠিকঠাক কাজ করেছিল।

দুপুর নাগাদ তালেবানের কয়েকটি দল এসে আমাদের ডানপাশের একটি পাহাড়চূড়ায় অবস্থান নেয়। তাঁরা আসলেই তালেবান কি না—তা নিশ্চিত হতে গিয়েও বেশ মজাদার একটি ঘটনা ঘটেছিল, এখানে তা বলার সুযোগ নেই। তালেবানযোদ্ধারা মুরাদ বেগ থেকে বামপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন এবং সেদিকে থাকা পাহাড় পর্যন্ত চলে যান। পরদিন সকাল হওয়ার আগেই মুরাদ বেগ পাহাড় থেকে শুরু করে রাস্তার বামপাশ পুরোটাজুড়ে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরি হয়ে যায়,[৫০] আল্লাহর রহমতে যা আমেরিকা হামলা করার আগ পর্যন্ত টিকে ছিল। এই হলো কাবুলের ডিফেন্স লাইন তথা 'মুরাদ বেগের সেকেন্ড লাইন' তৈরির গল্প। ফার্স্ট লাইন অর্থাৎ 'দো সারকি'-তে ফ্রন্ট লাইন তৈরির আলাদা গল্প আছে।'[৫১]

তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে মাসউদ বাহিনী বুঝতে পারে, মুরাদ বেগ পাহাড় দখল না করে কাবুলের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে না। তাই তারা ট্যাংক, কামান, মর্টার ও মেশিনগান থেকে একযোগে পাহাড়ের ওপর হামলা শুরু করে। এতে অনেক মুজাহিদ ভাই শহীদ হন। তাঁদের একজন ছিলেন সাবের ভাই, পরে তাঁর নামেই পাহাড়টির নাম রাখা হয় 'জাবাল-ই-সাবের'। মাসউদ বাহিনী একাধিকবার পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু মুজাহিদরা প্রতিবারই তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। কোনোভাবে একবার তারা পাহাড়ে উঠে দখল করতে সফল হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ দখল ধরে রাখতে পারেনি। চতুর্দিক থেকে তালেবানের অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলে বাধ্য হয়েই পাহাড় থেকে নিচে নেমে যায় তারা। কঠিন এই দিনগুলোতে পাহাড়ের অদূরেই মুহতারাম আবু আতা তিউনিসী তিন সঙ্গী-সহ শাহাদাতবরণ করেন। রহমাতুল্লাহি আলাইহিম জামিআন।

---

[৫০] শায়খ সাইফ আল-আদল বলেন, যখন মুরাদ বেগ পাহাড়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন শায়খ উসামা রহ. একভাইকে ওয়াকিটকি দিয়ে আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠান। ওয়াকিটকির মাধ্যমে শায়খের সাথে আমি কথা বলে আমার নিরাপদ থাকার কথা জানাই, এতে তিনি আশ্বস্ত হন। তখন শায়খকে আমি খোস্ত যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিই। কারণ, কাবুল আসার আগে শায়খ আবু হাফসকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল যে, শায়খ উসামা কাবুল থেকে খোস্ত চলে যাবেন। শায়খ তখন তাঁর চিরাচরিত বিনয়মাখা কণ্ঠে বলেন, এত কঠিন পরিস্থিতিতে কি আমার খোস্ত যাওয়ার প্রয়োজন আছে? আমাকেও তো আপনাদের দরকার হতে পারে। মূলত শায়খ কাবুলের ময়দান ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। তখন আমি শায়খকে খোস্ত যাওয়ার জন্য বলি। তিনি কয়েকবার কাবুলে থেকে যাওয়ার কথা বলেন। তখন আমি শায়খকে বলি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা বেঁচে থাকতে মাসউদ কিছুতেই কাবুলে ঢুকতে পারবে না। অবশেষে আমাদের পীড়াপীড়িতে শায়খ খোস্ত যেতে রাজি হন।

[৫১] শায়খ সাইফ আল-আদল হাফি.-এর বর্ণনা।

## তালেবানের অভিযান

এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তালেবান নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে মাসউদ বাহিনীর ওপর হামলা করে। যুদ্ধের এই অংশটি বুঝতে হলে সে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা জানতে হবে। এলাকাটি মূলত পাহাড়ি উপত্যকা, যা 'ওয়াদী শিমালী' বা উত্তর উপত্যকা নামে পরিচিত। কাবুল থেকে বের হওয়ার পর এর প্রস্থ প্রায় ২২ কিলোমিটারের মতো। এরপর উত্তরে ৭০ কিলোমিটার ধরে সরু হতে হতে জাবাল-ই-সিরাজের কাছে গিয়ে তা ৮ কিলোমিটার হয়ে গিয়েছে। উপত্যকার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। এর ডানে-বামে ছোট-বড় অনেক গ্রাম, আবাদি জমি, আঙুর বাগান আর বন-জঙ্গল।

তালেবানযোদ্ধারা সাধারণত পিকআপ নিয়ে হাইওয়ে ব্যবহার করে আক্রমণ চালাত। উত্তরদিকে ১০ কিলোমিটারের মতো তেমন কোনো বাধা আসত না। কিন্তু এরপরেই আশপাশের গ্রাম, গলিঘুপচি ও আঙুর বাগান থেকে মাসউদ বাহিনীর সদস্যরা বের হয়ে পালটা আক্রমণ করত। এতে অনেক তালেবানযোদ্ধা হতাহত হয়ে ফিরে আসত। এরকম ঘটনা দুইবার ঘটেছিল। তৃতীয়বার আক্রমণের আগে তালেবান গোটা অঞ্চলকে 'রেড জোন' ঘোষণা করে স্থানীয় সবাইকে গ্রাম খালি করতে বলে। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার-হাজার বাসিন্দা ঘরবাড়ি ছেড়ে কাবুলের পথে রওয়ানা দেয়।

তালেবান এবার পুরো উপত্যকা ঘিরে ফেলে এবং এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি কাতার বানিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও রাস্তা না থাকলে, নতুন রাস্তা তৈরি করে নিতে থাকে; আক্রমণ হলে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে থাকে। তালেবানের এই সাঁড়াশি অভিযানের ফলে মাসউদ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে তালেবানও পেছনের অংশে শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে সামনে অগ্রসর হতো না। তাই তাঁদের গতি বেশ মন্থর ছিল। অবশেষে কয়েকদিন পর তারা 'দো সারকি' এলাকায় পৌঁছায়। জায়গাটি বাগরাম এয়ারবেইজের বিপরীত দিকে কাবুল থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এখানে এসে তালেবানযোদ্ধারা অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দেয়। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল মাযার-ই-শরীফ ও আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে চলমান যুদ্ধে মনোযোগ দেওয়া। প্রায় চার বছর পর্যন্ত 'দো সারকি'-এর এই লাইনটি টিকে ছিল।

একবার তালেবানের একটি ইউনিট আরও সামনে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের সাথে আরব ভাইদের একটি দলও ছিল। সেই পজিশনের আমীর উমর সাইফ ফিলিস্তিনীও ছিলেন তাদের মধ্যে। কিন্তু একটু এগুনোর পরেই তাঁরা মাসউদ বাহিনীর ফাঁদে পড়ে যান। মাসউদের লোকেরা তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। ওয়ারলেসের মাধ্যমে

অন্য ভাইদের সাথে তখনও অবরুদ্ধ ভাইদের যোগাযোগ হচ্ছিল। তারা ভাইদের কাছে দোয়া চান, আল্লাহ যেন তাদের অবিচল রাখেন। এরপর তাঁরা যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তাঁদের মধ্যে নাইজেরিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ এক ভাই ছিলেন। তিনি নিজের উপনাম দিয়েছিলেন মুসান্না লুবনানী। তাঁর দেহ হস্তান্তরের জন্য মাসউদের সাথিরা তালেবানের কাছে বিশাল অঙ্কের অর্থ দাবি করে। ভাইয়েরা তাঁদের এই দাবি মানতে রাজি না হওয়ায় তারা তাঁর দেহ খোলা জায়গায় ফেলে রাখে। তখন তীব্র গরমকাল ছিল। একমাস পর তালেবানযোদ্ধারা সেখানে দ্বিতীয়বার হামলা করে দেখতে পান, সেই নাইজেরিয়ান ভাইয়ের মরদেহে তখনও কিছুই হয়নি, সামান্য পচনও ধরেনি, আল্লাহ আকবার। নাইজেরিয়ান ভাইটি জীবিত থাকাকালে মাঝে মধ্যেই বলতেন, 'আল্লাহর কাছে দোয়া করি, শাহাদাতের পর আল্লাহ যেন আমার চেহারা উজ্জ্বল বানিয়ে দেন। তাহলে সাইয়াফ তার সাথিদের কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে—"আল্লাহ যেন এই আরবদের চেহারা কালো বানিয়ে দেয়।"'

এই ঘটনার পর তালেবান আর সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেনি। এরইমধ্যে ৯/১১-এর ঘটনা ঘটে এবং যুদ্ধের নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়।

## সিআইএ'র তদবীর: টার্গেট শায়খ উসামা রহ.

শায়খ উসামা রহ.-কে হত্যা বা গ্রেফতার করার জন্য আমেরিকার দোসররা কতভাবে চেষ্টা করেছিল—তার কিছু নমুনা আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। কোনোভাবেই কূলকিনারা করতে না পেরে অবশেষে আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) মাঠে নামে। কান্দাহারের পশতুন আফগানদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা এজেন্টদের এবার তারা সক্রিয় করে এবং শায়খ উসামাকে হত্যা বা গ্রেফতার করার জন্য লেলিয়ে দেয়।

কান্দাহার বিমানবন্দরের পাশের সেই কলোনিতে থিতু হওয়ার পর ভাইয়েরা কলোনির চারপাশে নির্বাচিত কিছু পয়েন্টে সিকিউরিটি চেকপোস্ট তৈরি করেন। দক্ষিণ দিকের চেকপোস্টে পাহারা দেওয়ার জন্য তাঁরা তালেবানের কাছে কয়েকজন প্রহরী চান। তালেবানের এই ইউনিটের প্রধানকে সিআইএ নিজেদের দলে টানতে সক্ষম হয়। শায়খ উসামা রহ.-কে গ্রেফতার বা হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে। কলোনিতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাই তাকে কেউ সন্দেহের চোখে দেখত না। কিন্তু, আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব। তার ইউনিটেরই এক সদস্য তার দুরভিসন্ধির কথা তালেবান কমান্ডকে জানিয়ে দেয়। সাথে সাথে ঘটনার সাথে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করা হয়।

৯/১১ সম্পর্কে কংগ্রেসের গঠিত কমিশনের রিপোর্টেও তারা এ ধরনের তৎপরতার কথা স্বীকার করেছে। রিপোর্টের ১১০-১১৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—

> '১৯৯৭ সালের গ্রীষ্ম থেকেই উসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে CIA তৎপরতা শুরু করে। ১৯৯৭ সালের শরৎ থেকে ১৯৯৮-এর জুন পর্যন্ত CIA নিজেদের পশতুন এজেন্টদের মাধ্যমে উসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার করার দুটি পরিকল্পনা সাজায়। প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল, কান্দাহার শহর থেকে বের হয়ে তাঁর বাড়ি—যা কান্দাহার শহরের বাইরে ছিল—যাওয়ার পথে ওত পেতে থাকা হবে এবং সুযোগমতো তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু স্থানীয় এজেন্টদের দাবি, তারা এভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল, স্থানীয় এজেন্টরা রাতের বেলা উসামা বিন লাদেনের ঘরে হামলা চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করবে এবং আমেরিকা বা আমেরিকার অনুগত কোনো আরব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে কয়েকবার ট্রেইনিংও প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন আক্রমণের তারিখও ঠিক করা হয়। কিন্তু মে মাসের শেষদিকে এই পরিকল্পনাটিও বাতিল করে দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে স্থানীয় এজেন্টদের বক্তব্য ছিল, এতে বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা ছিল এবং উসামা বিন লাদেনকে জীবিত ধরাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'[৫২]

## 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ (গ্লোবাল ইসলামিক ফ্রন্ট) গঠন: ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

মাসউদ বাহিনীকে 'দো সারকি' পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়ার পর কাবুলে অনেকটাই স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। শায়খ উসামা রহ.-ও কান্দাহারে ফিরে আসেন। 'মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দাও' শিরোনামে যে বিবৃতি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তখন চিন্তা করা শুরু করেন। শায়খের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের প্রায় চল্লিশজন বিজ্ঞ আলেমের স্বাক্ষরিত একটি ফতওয়া প্রকাশ করা হয়। মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে শায়খ যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, ফতওয়াটি শায়খের সে অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ব্যাপক পরিসরে ফতওয়াটি প্রচার করা হয়। সাংবাদিকদের কাছেও তা পৌঁছানো হয়। 'আল-কুদসুল আরাবী' পত্রিকায় ফতওয়ার নির্বাচিত অংশ প্রকাশও করা হয়। এই ফতওয়া প্রচারের পেছনে শায়খের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—

---

[৫২] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী

১. জাযীরাতুল আরবে আমেরিকার উপস্থিতির বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ করা। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

২. এই বিবৃতির পক্ষে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে শরয়ী ও নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করা। কেননা শায়খ রহ. নতুন করে মিডিয়া প্রচারণা শুরু করতে চাচ্ছিলেন। আমীরুল মুমিনীনকে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে বসে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি।[৫৩]

এই ফতওয়ার প্রভাবে এবং শায়খ উসামা রহ.-এর ধারাবাহিক দাওয়াতের ফলে ১৯৯৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি 'আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ লি জিহাদিল ইয়াহুদ ওয়াস সালীবিয়্যীন (Global Islamic Front For Jihad Against Jews And Crusaders)'-এর সূচনা হয়। এর লক্ষ্য ছিল মুজাহিদদের প্রচেষ্টাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে একীভূত করা। নবগঠিত এই ফ্রন্টের সাথে তখন শুধু ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ (EIJ) এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কিছু দল যুক্ত হয়েছিল। এই ফ্রন্টের প্রথম বিবৃতিটি ফতওয়ারূপে প্রকাশিত হয়। ফতওয়াতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করা, আমেরিকার সামরিক-বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা এবং পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই হোক তাদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক—সব ধরনের স্বার্থে অনবরত আঘাত করার আহ্বান করা হয়, যতক্ষণ না তারা মুসলিমদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করে। মূল ফতওয়াটি নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

## ফতওয়া

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, যিনি মেঘমালা পরিচালনা করেন এবং শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেন। দরূদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾

'অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদের (যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদের গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদের ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থাকবে।' [সূরা তাওবা (৯) : ৫]

[৫৩] উসামা বিন লাদেন : মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকান : আবু জান্দাল আযদী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**بُعِثْتُ بين يدي الساعةِ بالسَّيفِ ، حتى يُعبَدَ اللهُ تعالى وحده لا شريكَ له ، و جُعِلَ رِزْقي تحت ظِلِّ رُمْحي ، وجُعِلَ الذُّلُّ و الصَّغارُ على من خالفَ أمري**

'কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে পাঠানো হয়েছে তরবারি দিয়ে, যেন লা-শারীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে আর যে আমার আদেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে।' [মুসনাদে আহমাদ : ৪৮৬৯]

হামদ ও সালাতের পর,

ক্রুসেডার বাহিনী বর্তমানে জাযীরাতুল আরবের কোনায় কোনায় পৌঁছে গিয়েছে, অথচ সৃষ্টির পর থেকে আজ অবধি এমন কঠিন দুর্যোগ এ অঞ্চলে তৈরি হয়নি। তারা পবিত্র এই ভূমিকে কলুষিত করছে, এই ভূমির সম্পদ লুণ্ঠন করছে, উদ্যান ও আবাদিগুলোকে বিরান করে ফেলছে। এমন একটি সময়ে এ সব ঘটছে, যখন সকল জাতি একে অপরকে মুসলমানদের ওপর হামলে পড়ার দাওয়াত দিচ্ছে, যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা একে অপরকে খাবারের দিকে ডাকে। ইসলাম ও ক্রুসেডার জোটের মধ্যে চলমান সর্বব্যাপী এই যুদ্ধের মতো কোনো যুদ্ধের নজির ইতিহাসে নেই। তীব্র এই সংকটকালে—যখন সহযোগী কেউ নেই বললেই চলে—চলমান পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে জানা এবং একটি সিদ্ধান্তে একমত হওয়া আমাদের সকলের জন্যই জরুরি।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ,

বর্তমানে তিনটি বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিরপেক্ষ সকলেই এগুলো স্বীকার করেছেন। এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি। যাদের উপদেশ গ্রহণ করার, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করে; যাদের ধ্বংস হবার, তারা যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ধ্বংস হয় এবং যাদের সফল হবার, তারা যেন দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই সফল হয়।

১. সাত বছরের বেশি হলো আমেরিকা ইসলামের পবিত্র ভূমি জাযীরাতুল আরব দখল করে এর সম্পদ লুণ্ঠন করে আসছে। শাসকদেরকে নিজেদের পুতুল বানিয়ে রেখেছে। এখানকার অধিবাসীদের লাঞ্ছিত করছে, প্রতিবেশীদের ভয় দেখাচ্ছে এবং জাযীরাতুল আরবের ভূমিকে ঘাঁটি বানিয়ে আশপাশের মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মার্কিন দখলদারিত্বের বিষয়টিকে আগে কিছু মানুষ অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও বর্তমানে সকলেই তা মেনে

নিয়েছে। জাযীরাতুল আরবের মাটি ব্যবহার করে ইরাকের জনসাধারণের ওপর আমেরিকা যে অত্যাচার চালিয়েছে, এটাই তাদের দখলদারিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যদিও জাযীরাতুল আরবের শাসকরা এই সত্যকে অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু তাদের অস্বীকারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, কারণ তারা তো পরাধীন।

২. ক্রুসেডার জোট ইরাকের জনগণের ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছে। তারপরেও আমেরিকার রক্তপিপাসা যেন মেটেনি। এতকিছুর পরেও তারা নতুন করে এই ভয়ানক গণহত্যার পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করেও আমেরিকার খায়েশ পূরণ হয়নি। ধ্বংস্তূপের মধ্যে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষগুলোকেও তারা ইজ্জতের সাথে বাঁচতে দিতে চায় না। তাই তো আবারও ইরাকে ফিরে আসছে।

৩. এ যুদ্ধে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আমেরিকার বড় একটি লক্ষ্য হলো ইসরাইলকে নিরাপত্তা দেওয়া এবং বায়তুল মাকদিসের ওপর ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও গণহত্যাকে বিশ্ববাসীর নজর থেকে আড়াল করা। এর প্রমাণ হলো, ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ইরাক ধ্বংস করার জন্য আমেরিকার আগ্রাসি মনোভাব। সঙ্গে সঙ্গে তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো এ অঞ্চলের সবগুলো দেশে—যেমন: ইরাক, সৌদি, মিশর, সুদান—অস্থিরতা সৃষ্টি করে এগুলোকে নিজেদের করদরাজ্যে পরিণত করা। যাতে তাদের বিভক্তি ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইসরাইলের স্থায়ীত্ব এবং জাযীরাতুল আরবে মার্কিন দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ,

আমেরিকার এ সমস্ত অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন মূলত প্রকাশ্যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। ইসলামের সকল যুগের সালাফ ও খালাফ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, শত্রু যখন মুসলিম ভূখন্ডে আগ্রাসন চালায়, তখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ইমাম ইবনে কুদামা রহ. তাঁর 'আল-মুগনী' গ্রন্থে, ইমাম কাসানী রহ. 'আল-বাদায়ে' গ্রন্থে, ইমাম কুরতুবী রহ. তাঁর তাফসীরে এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর 'আল-ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

> 'দীন ও ইজ্জত ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করা হলো দিফায়ী জিহাদের সবচেয়ে কঠিন প্রকার। এই যুদ্ধ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। কারণ, দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোনো ফরয বিধান ঈমান আনার পরে দ্বিতীয়টি নেই।'

উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনার্থে মুসলমানদের জন্য আমরা নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করছি:

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সুযোগ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে যে-কোনো জায়গাতে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর সামরিক-বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরযে আইন। যতদিন পর্যন্ত মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা মুক্ত না হবে, তাদের বাহিনী পরাজিত হয়ে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের না হবে এবং তারা মুসলমানদেরকে হুমকি দেওয়া থেকে বিরত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই ফরয বলবৎ থাকবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾

'তোমরা সর্বতোভাবে মুশরিকদের সাথে লড়াই করো, যেমন তারা সর্বতোভাবে তোমাদের সাথে লড়াই করে।' [সূরা তাওবা (৯) : ৩৬]

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

'তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৯]

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

'তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে সে সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করছ না, যারা দোয়া করছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে বের করে নাও, আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও'? [সূরা নিসা (৪) : ৭৫]

হে মুসলিম উম্মাহ,

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর সওয়াবের আশা রাখে, এমন সকল মুসলমানকে আমরা আল্লাহর এই আদেশ পালনের প্রতি আহ্বান করছি। যেখানেই মার্কিনিদের পাওয়া যাবে, সেখানেই যেন তাদের হত্যা করা হয় এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। উম্মতের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, মুখলিস নেতৃবৃন্দ, ঈমানদার যুবক ও সৈনিকদের আহ্বান করছি—আপনারা ইবলিসের বাহিনী আমেরিকা, তাদের সকল মিত্র ও

শয়তানের সহযোগীদের ওপর আক্রমণ করুন এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিন। যেন তারা শিক্ষা পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। আর তোমাদের সকলকে তারই কাছে একত্র করা হবে।' [সূরা আনফাল (৮) : ২৪]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হও, তখন তোমরা মাটিকে আঁকড়ে ধরো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখ), আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।' [সূরা তাওবা (৯) : ৩৮-৩৯]

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

'তোমরা মনোবল হারিয়ো না এবং চিন্তিত হোয়ো না। প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৯]

**وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين**

স্বাক্ষর:

১. শায়খ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন
২. ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী (আমীর, জামাআতুল জিহাদ মিশর)
৩. শায়খ আবু ইয়াসির রিফায়ী ত্বহা (প্রতিনিধি, আল-জামাআতুল ইসলামিয়া মিসরিয়্যাহ)
৪. মাওলানা মীর হামযা (সেক্রেটারি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম)
৫. শায়খ ফজলুর রহমান খলীল (আমীর, হরকতুল আনসার পাকিস্তান)
৬. শায়খ আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ (আমীর, হরকতুল জিহাদ বাংলাদেশ)

## জাবহার বিবৃতি ও আল-জামায়াতুল ইসলামিয়া মিশরের অবস্থান

জাবহার বিবৃতি প্রকাশের পর মিশরের আল-জামায়াতুল ইসলামিয়া তাদের ওয়েবসাইটে শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ.-এর নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে জাবহার ফতওয়ায় শায়খের স্বাক্ষর দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। এখন কেউ বলতে পারেন, শায়খ রিফায়ী রহ. বাস্তবে স্বাক্ষর না করে থাকলে আল-কায়েদা তাঁর নাম উল্লেখ করেছে কেন? আল-জামাআতুল ইসলামিয়ার কেউই এই সত্যটি প্রকাশ করার সাহস করতে পারেননি। মূল ঘটনা হলো—ফতওয়ায় স্বাক্ষর গ্রহণের দায়িত্ব ছিল শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ.-এর ওপর। তখন শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ. ছিলেন আল-জামায়াতুল ইসলামিয়ার মজলিসে শূরার প্রধান। কান্দাহারে তখন আল-জামাআতুল ইসলামিয়ার প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল ছিলেন আবু ইবরাহীম (ইসলাম গুমরী)। শায়খ আবু হাফস রহ. ফতওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাকে বলেন, শায়খ রিফায়ী ত্বহার সাথে যোগাযোগ করে তিনি যেন ফতওয়ার বিষয়বস্তু শায়খকে জানান এবং শায়খের স্বাক্ষর যুক্ত করার অনুমতি নেন। কিন্তু আবু ইবরাহীম ভাই এতটাই উৎসাহিত ছিলেন যে, তিনি শায়খ আবু হাফসকে বলেন, 'আপনি শায়খ রিফায়ীর নাম যুক্ত করে দিন আর শায়খের অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি শায়খের সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি নিয়ে নেব। এ কারণে বিবৃতি প্রকাশ করতে দেরি করবেন না।' তিনি শায়খ আবু হাফসকে অনেক পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অবশেষে শায়খও তার জোরাজুরিতে রাজি হয়ে যান এবং শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ.-এর নাম দাখিল করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর থেকেই তার (আবু ইবরাহীম) মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। তিনি বারবার আফগানিস্তান থেকে ইয়েমেন চলে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। ভাইয়েরা তার ভিসার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি ইয়েমেন চলে যান। সেখানে তিনি মিশরের দূতাবাসে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পরে তাকে মিশর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তিনিও আল-জামায়াতুল ইসলামিয়ার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি বা আল-জামাআতুল ইসলামিয়া—কেউই আর এই সত্য প্রকাশ করার সাহস করেননি।[৫৪]

[৫৪] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী



উম্মাহর পরিস্থিতি নিয়ে শায়খদের সেমিনার। (ডান থেকে) শায়খ কমান্ডার আবু হাফস, শায়খ উসামা বিন লাদেন, শায়খ রিফায়ী ত্বহা ও শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী।

উল্লেখ্য, শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ. ২০০০ সালে কান্দাহার সফরে আসেন। তখন তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। জাবহার ফতওয়ার প্রতি তাঁর সমর্থনের বিষয়টিকে সে সাক্ষাৎকারেও তিনি নাকচ করেননি। জাবহার ফতওয়া সমর্থন করলে মিশর ও মিশরের বাইরে আমেরিকার রোষানলে পড়তে হবে—এই যুক্তিতে আল-জামাআতুল ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে শায়খের ওপর অনেক চাপপ্রয়োগ করা হয়েছিল, যেন তিনি জাবহার ফতওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শায়খ নিজ সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ. তাঁর '**إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام**' নামক বইয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করা এবং এ প্রসঙ্গে আল-জামায়াতুল ইসলামিয়ার কিছু নেতার অবস্থান সম্পর্কে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে শায়খ লেখেন—

> 'আমেরিকান ও ইহুদীরা আমাদের ভূমি দখল করছে, আমাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। তাই পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে, যে-কোনোভাবে তাদের হত্যা করা বিশ্বের সকল সক্ষম মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের আগ্রাসনকে প্রতিহত করা ফরযে আইন। উক্ত ফরয পালনে যারাই সক্ষম, তারা কোনোভাবেই এই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাবে না। এটাই উম্মতের পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল উলামায়ে কেরামের মত।'

জাবহার আত্মপ্রকাশের ঘোষণার পর এর পরিচিতি এবং উম্মতকে ইহুদী-খ্রিষ্টান জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্‌বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শায়খ উসামা রহ. ব্যাপকভাবে প্রচারণা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান ও চীনের অনেক সাংবাদিক তাতে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯৮ সালের মে মাসে শায়খ রহ. মার্কিন সংবাদ সংস্থা এবিসি নিউজের সাংবাদিক জন মিলারকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। কথা ছিল, জন মিলার শুধু এমন প্রশ্নই করবেন, যে প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে শায়খ আগে থেকে সম্মতি দিয়ে রেখেছেন এবং প্রশ্নগুলো লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় মিলার অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। তাই শায়খ সেগুলোর উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।

এমনই একটি প্রশ্ন ছিল রামযি ইউসুফের ব্যাপারে। মিলার শায়খকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রামযি ইউসুফের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে? আপনার মালিকানাধীন একটি গেস্ট হাউজ থেকেই তো তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে?' শায়খ বুঝতে পারেন, সে তথ্য বের করতে চাচ্ছে। তাই তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। তা ছাড়া রামযি ইউসুফকে শায়খের মালিকানাধীন কোনো গেস্ট হাউজ থেকেও গ্রেফতার করা হয়নি।[৫৫]

সেদিন সকালে খাবারের সময় জন মিলারকে শায়খ উসামা রহ. বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘুম হারাম করে দেব। এমন পরিস্থিতি তৈরি করব, মার্কিনিরা নিজেদের নাগরিকত্ব নিয়েই শঙ্কায় পড়ে যাবে।' আফগানিস্তান ত্যাগ করেই জন মিলার ঘোষণা করেন, শায়খ উসামা বিন লাদেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকার ওপর হামলা করবে। বাস্তবেই এই ঘোষণার মাত্র তিন মাস পরেই নাইরোবি ও দারুস সালাম হামলার ঘটনা ঘটে।[৫৬]

উল্লেখ্য, সে সময় শায়খ উসামা রহ. সাংবাদিকদের যে সাক্ষাৎকারগুলো দিতেন অথবা মুজাহিদদের সাথে যেসব মজলিসে শরীক হতেন, প্রায় সব জায়গাতেই স্পষ্ট করেই বলতেন যে, অচিরেই বড় কিছু হবে, মর্দে মুজাহিদ কিছু যুবক বড় কিছু করার জন্য বের হয়ে গেছে ইত্যাদি। শায়খের এমন স্পষ্ট কথা শুনে অনেকে অবাক হতেন। তারা শায়খকে বলতেন, আপনার এমন কথা শুনে তো শত্রুরা সতর্ক হয়ে যাবে। শায়খ তখন বলতেন, তিনি তো সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলছেন না যে, কখন, কোথায়, কীভাবে আক্রমণ হবে। এটা ছিল মূলত

[৫৫] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

[৫৬] ৯/১১-এর না বলা গল্প : শায়খ নাসির উহাইশী রহ.

শায়খের একটি কৌশল। মার্কিনিদের মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য শায়খ এভাবে কথাগুলো বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমরা যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তেও আল-কায়েদার নাম লেখা কোনো কাগজ উঁচিয়ে ধরি, তাহলে সুদূর পশ্চিম থেকেও শত্রুরা তা ধ্বংস করার জন্য ছুটে আসবে।'




খোস্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের একটি স্থিরচিত্র




মার্কিন সংবাদ সংস্থা এবিসি নিউজের প্রতিনিধি জন মিলারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের স্থিরচিত্র

## অসম যুদ্ধের সূচনা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ডেস্কে ততদিনে নতুন কিছু রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীতে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও হুমকি হবে গ্লোবাল জিহাদ বা আমেরিকার ভাষায় ইসলামী চরমপন্থা। কারণ, এই সংঘাত যদি বাস্তবে রূপ নেয়, তাহলে তা আমেরিকাকে এক অসম যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে। আর এই অসম যুদ্ধ মার্কিন সেনাবাহিনীর সামরিক সক্ষমতাকে সমূলে ধ্বংস করে দেবে। আমেরিকার যতই নিউক্লিয়ার ওয়েপন, স্টেলথ এয়ারক্রাফট, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার বা স্যাটেলাইটের মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকুক না কেন, এই যুদ্ধে তা কোনো উপকারেই আসবে না। কারণ, যে শত্রুর সাথে আমেরিকার যুদ্ধ হবে, তারা এ ধরনের কোনো অস্ত্র ব্যবহার করবে না; বরং তারা আমেরিকার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে সশরীরে ঢুকে নিজেদের মানববোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে। আর এই মানববোমার বিস্ফোরণ প্রতিহত করা মার্কিন বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব না।

এ কারণেই এর নাম অসম যুদ্ধ। কারণ, আমেরিকা যে ধরনের শক্তির ওপর নির্ভর করে, আল-কায়েদা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শক্তির ওপর নির্ভর করে। আমেরিকা যে পেশীশক্তি ও সামরিক সক্ষমতার মালিক, যা ব্যবহার করে পুরো দুনিয়ায় নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে, আল-কায়েদাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তাদের এই শক্তি কোনো কাজেই আসবে না। কারণ, পৃথিবীতে আল-কায়েদার দৃশ্যমান কোনো অবকাঠামো নেই, যার ওপর আমেরিকা সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালাতে পারবে। অন্যদিকে আল-কায়েদা খুব সহজেই হামলার টার্গেট নির্ধারণ করতে পারে এবং ইস্তিশহাদী হামলার মাধ্যমে সেই টার্গেটকে তারা ধ্বংসস্তূপেও পরিণত করতে পারে। আমেরিকার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও উন্নত প্রযুক্তির মোকাবিলায় আল-কায়েদা নিজেদের ব্যাপারে আমেরিকার অজ্ঞতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে যখন চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করেন, তখন মূলত আমেরিকার সব আড়িপাতার যন্ত্র, পর্যবেক্ষণ ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকেই তারা অকেজো বানিয়ে দেন। কারণ, এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকলেও সেই চিঠির মর্মোদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব না।

বিষয়টি আমেরিকার নেতাদের জন্য ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। তবে তাদের কাছে এগুলো তখন নিছক ধারণাই মনে হচ্ছিল। ভবিষ্যৎ যুদ্ধ কীভাবে হতে পারে—সে সম্পর্কে এক ধরনের অনুমানমাত্র। ঠিক এরইমধ্যে আল-কায়েদা নতুন এই যুদ্ধের সূচনা করে। ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দারুস সালামে দুটি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে শুরু হয় নতুন এই যুদ্ধ।[৫৭]

[৫৭] উস্তায আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদের প্রবন্ধ সংকলন।

## নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশন[৫৮]

আল-জাবহাতুল ইসলামিয়াহ গঠনের পর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে এত বড় পরিসরে এটাই ছিল প্রথম হামলা। ১৯৯৭ সালে শায়খ উসামা ও শায়খ আবু হাফস মিসরী মিলে আবু মুহাম্মাদ মিসরী রহ.-কে এই অভিযানের জন্য ডেকে পাঠান এবং হারুন ফযল কুমুরীকে তাঁর সহযোগী নির্বাচন করেন। অভিযানের প্রস্তুতির জন্য তালহা সুদানী ভাই থেকে অর্থ সংগ্রহ করা এবং হারুন ফযল কুমুরীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি সুদানের উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

সুদানে হারুন ফযলের সাথে সাক্ষাৎ শেষে দু'জনে কেনিয়ার উদ্দেশ্যে বের হন এবং সেখানে পৌঁছেই অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁরা মোম্বাসা শহরে যান এবং অভিযান পরিচালনার জন্য দুটি সেল গঠন করা হয়। একটি সেলকে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, অন্যটিকে মাঠপর্যায়ে হামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আবু মুহাম্মাদ মিসরী ও হারুন ফযল তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব নেন আর ফাহাদ ও সালেম সুওয়াইদান[৫৯] ভাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে হামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেন।

প্রথমে ঠিক করা হয়, মোম্বাসাতেই আমেরিকানদের ওপর হামলা করা হবে। তারা তখন বছরে একবার ইরাক থেকে এখানে ঘুরতে আসত। আবু মুহাম্মাদ ও হারুন ফযল মার্কিন টার্গেটগুলো সম্পর্কে বেশি থেকে বেশি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহরজুড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অনেকগুলো টার্গেট পর্যালোচনা করে আবু মুহাম্মাদ ভাই সিদ্ধান্ত নেন, আমেরিকান সৈন্যরা যখন বন্দরে পৌঁছাবে, তখন হামলা করা হবে। একেই প্রধান টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। আর যে-সকল নাইটক্লাবে মার্কিন সৈন্যদের যাতায়াত ছিল, এমন কয়েকটি নাইটক্লাবও হামলার টার্গেট হিসেবে ঠিক করা হয়। কিন্তু পরে এটিকে বাতিল করা হয়। কারণ, নাইটক্লাবগুলোর কাছেই বড় বড় কয়েকটি মসজিদ ছিল। নাইটক্লাবে আক্রমণ করা হলে সাধারণ মুসলমান হতাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আবু মুহাম্মাদ ভাই সোয়াহিলি ভাষা শেখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলেন। হামলার জন্য নির্বাচিত স্থানগুলো প্রতিষ্ঠানটির কাছেই হওয়ায় একইসঙ্গে ভাষাও শিখতেন, আবার সে স্থানগুলোও পর্যবেক্ষণ করতেন।

---

[৫৮] আল-হারবু আলাল ইসলাম : হারুন ফযল রহ.

[৫৯] ফাহাদ কীনী ও সালেম সুওয়াইদান রহ. ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত দুজন মুজাহিদ। তাঁদের ওপর অন্যান্য ভাইদের অগাধ আস্থা ছিল। ৯০ এর দশকে তারা জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। আফগানিস্তানে ট্রেইনিং সম্পন্ন করে সোমালিয়ার জিহাদেও শরীক হয়েছিলেন।

ঘটনাক্রমে সে বছর আমেরিকান সৈন্যরা মোম্বাসায় আসেনি। তাদের পরিবর্তে ফরাসি সৈন্যরা এসেছিল। কিন্তু তাদের ওপর হামলার পরিকল্পনা না থাকায় ভাইয়েরা টার্গেট পরিবর্তন করেন এবং নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস—যা সিআইএ'র হেডকোয়ার্টার ছিল—এর ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেন। হারুন ফযল ভাই তৎক্ষণাৎ মার্কিন দূতাবাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বের হয়ে পড়েন।

উল্লেখ্য, গত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুর দিকে ভাইয়েরা যখন কেনিয়ায় ছিলেন এবং কেনিয়া থেকে সোমালিয়ায় যেতেন, সে সময়ই নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলো ভাইদের হাতে এসেছিল। শহীদ আনাস লীবী রহ.-ও সে তথ্য সংগ্রহকারীদের একজন ছিলেন। পরে তিনি আমেরিকার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

নতুন টার্গেটের কথা এতটাই গোপন রাখা হয় যে, যে সেলকে প্রস্তুতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। হারুন ফযল ভাই দূতাবাসের কাছে গিয়ে চারদিক থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ভবনের দুর্বল পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করেন। তিনি বুঝতে পারেন, ১৯৮৩ সালে লেবানন হামলার পর এখানকার দূতাবাসটিও সংস্কার করা হয়েছে, নিরাপত্তাও অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভবনের ছাদে মার্কিন মেরিন সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি দূতাবাসের ভেতরে ঢুকে ভিসা প্রসেসিং বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হন এবং সামনের দিকে ভবন থেকে মেইনরোড পর্যন্ত পায়ে হেঁটে দূরত্ব মেপে দেখেন, যা প্রায় দশ মিটারের মতো ছিল। এভাবে পিছন দিকেও মেইনরোড ও ভবনের মাঝে ১০ মিটার দূরত্ব ছিল। ভবনের প্রবেশপথ এবং বের হওয়ার পথগুলো খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। যাতে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যায়। দূতাবাসটি অনেক বড় ছিল। সামনে মার্কিন দূতাবাসের নম্বরপ্লেটযুক্ত শতশত গাড়ি থাকত। ভবনের অবস্থানও ছিল জনবহুল স্থানে। ভবনের আশপাশে তিনটিরও বেশি বড় বড় বাসস্ট্যান্ড ছিল। তা ছাড়া দূতাবাসের কাছেই ছিল একটি রেল স্টেশন, সে এলাকাটিও ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।

তানজানিয়ায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসেও ভাইয়েরা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। দূতাবাসটি লোকালয় থেকে দূরে হওয়ায় সেখানে অপারেশন পরিচালনা করা সহজ ছিল। মার্কিন দূতাবাসের পাশে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও জার্মানির দূতাবাসও ছিল। আবু মুহাম্মাদ ভাই আব্দুল ওয়াকীল মিসরীকে (আবু জিহাদ নুবী) দারুস সালাম অভিযানের প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হন। আব্দুল ওয়াকীল ভাই নাইরোবি অভিযান সম্পর্কে তখনও কিছুই জানতেন না। আবু মুহাম্মাদ ভাই তাঁকে এতটুকুই জানিয়েছিলেন যে, দারুস সালামেও একটি হামলা হবে। নাইরোবি অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি আফগানিস্তানে ফিরে এসে এ ব্যাপারে জানতে পারেন। এমনইভাবে আবু মুহাম্মাদ ভাই তানজানিয়া অভিযানে খালফান খুমাইস ও আহমাদ জীলানীকেও যুক্ত করেন।

এক ভাইকে বিস্ফোরক সরঞ্জামাদি কিনে প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তানজানিয়ার একটি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে বোঝান যে, মাছ শিকার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজে তার বেশ আগ্রহ আছে। এই অজুহাতে তিনি তাদের থেকে TNT বিস্ফোরক দ্রব্য কিনতেন, এরপর ফাহাদ কীনী সেগুলো মোম্বাসায় পৌঁছে দিতেন। বিস্ফোরকের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায়, ফাহাদ ভাইয়ের জন্য একা তা স্থানান্তর করা কষ্ট হয়ে যায়। তাই আবু মুহাম্মাদ ভাই শায়খ সুওয়াইদান (আবু ইয়াহয়া কীনী)-কেও ফাহাদ ভাইয়ের সাথে কাজে লাগিয়ে দেন। তাঁর একটি পিকআপ ছিল। সেটা দিয়ে তাঁরা বিস্ফোরকগুলো মোম্বাসাতে এনে জমা করতে থাকেন। কেনিয়ায় তখন আরও অনেক আরব ভাই অবস্থান করছিলেন—শুয়াইব সা'দী, মুস্তফা আব্দুল ওয়াকীল ও মুহাম্মাদ আওদাহ প্রমুখ। অপারেশনের প্রস্তুতি এতটা গোপনীয়তার সাথে হচ্ছিল যে, তারা কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না।

বিস্ফোরক স্থানান্তর করা শেষ হওয়ার পর ১৯৯৮ সালের মার্চে আফগানিস্তান থেকে আবু আব্দুর রহমান মুহাজির মিসরী এসে ভাইদের সাথে যোগ দেন। বিস্ফোরকের ব্যাপারে তাঁর ব্যাপক জানাশোনা ছিল। এরপর আবু মুহাম্মাদ মিসরী, হারুন ফযল ও আব্দুর রহমান ভাই মিলে পরামর্শ করেন এবং নাইরোবিতে পাঠানোর জন্য একটি বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি অভিজাত এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়, যেন তাঁদের ব্যাপারে কারো সন্দেহ না হয় এবং কোনো ধরনের ঝামেলায় পড়তে না হয়। এ জন্য নাইরোবি শহরের মধ্যভাগ থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে একটি বাড়ি ঠিক করা হয়। বাড়ির আশপাশে যারা থাকত, তারা সবাই ছিল বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক। বামে ছিল এক ইহুদীর বাড়ি, ডানে কেনিয়ার এক মন্ত্রীর বাড়ি, পেছনে এক পাকিস্তানি কুটনীতিক আর সামনে এক জার্মান কুটনীতিক। সবাই সপরিবারেই থাকত। তাই হারুন ফযল ভাইও সুদান থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। এরপর ফাহাদ ভাই ও শায়খ সুওয়াইদান প্রতিদিন মোম্বাসা থেকে নাইরোবিতে বিস্ফোরক নেওয়া শুরু করেন। শায়খ সুওয়াইদান বিস্ফোরক বহনের জন্য কিছু কাঠের বাক্স বানান এবং সেগুলো ধীরে ধীরে বাড়িতে এনে ওঠানো হয়।

ইতোমধ্যে আফগানিস্তান থেকে অভিযান পরিচালনাকারী ভাইয়েরা চলে আসেন। তাঁরা হলেন—আযযাম মাক্কী (জিহাদ মুহাম্মাদ আলী), তাকে নাইরোবি অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আহমাদ আব্দুল্লাহ আলমানী (মিসরী), তাকে দারুস সালাম অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আবু আব্দুর রহমান মুহাজির ভাই অ্যামোনিয়ামের সাথে টিএনটি মিশিয়ে বিস্ফোরক প্রস্তুত করে কাঠের বাক্সগুলো ভর্তি করা শুরু করেন। আযযাম মাক্কী ও আহমাদ আব্দুল্লাহ আলমানীও তাকে সাহায্য করতেন। হারুন ফযল তখন আযযাম মাক্কীকে নাইরোবির পথঘাট এবং সেখানে চলাফেরার নিয়মকানুন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আক্রমণের সময় প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করে দূতাবাসের পেছনদিকে যাওয়ার জন্য স্বাভাবিক রাস্তা পরিহার করে ভিন্ন

রাস্তা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তাই তারা বারবার টার্গেট স্থানে যেতেন। অবশেষে আযযাম ভাই খুব সূক্ষ্মভাবে ভেতরে ঢোকা ও বের হওয়ার পথগুলো আয়ত্ত করে ফেলেন।

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল, অভিযানটি আযযাম ভাই একাই পরিচালনা করবেন। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ডদের পক্ষ থেকে বাধা আসার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় আরও একজনকে অপারেশনে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যিনি আযযাম ভাইকে কভার দেবেন, যেন তিনি গাড়ি নিয়ে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। সবদিক বিবেচনা করে ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নেন অপারেশন দুজন মিলে করতে হবে। সে হিসেবে ১৯৯৮ সালের ৩০শে জুলাই মুহাম্মাদ রাশেদ দাউদ আওহালীকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি সৌদি আরবের নাগরিক ছিলেন, তার উপাধি ছিল বালুশী। এভাবে নাইরোবি অপারেশনের জন্য দুজনের এই টিম প্রস্তুত হয়ে যায়। অন্যদিকে দারুস সালাম অপারেশন তুলনামূলক সহজ হওয়ায় সেখানে একজনকেই রাখা হয়, তিনি হলেন আহমাদ আব্দুল্লাহ আলমানী।

টানা ২০ দিন কাজ করার পর জুন মাসের শেষে নাইরোবি অপারেশনের জন্য বোমা বোঝাই ট্রাকটি প্রস্তুত হয়। নাইরোবি অপারেশনের গাড়িটি প্রস্তুত করার পর দারুস সালাম অপারেশনের জন্য দ্বিতীয় আরেকটি ট্রাক তৈরি করার জন্য আবু আব্দুর রহমান মুহাজির ও আহমাদ আব্দুল্লাহ ভাই তানজানিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। আহমাদ জিলানী ভাইও তাদের সাথে ছিলেন। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ এ গাড়িটিও তৈরি হয়ে যায়। এখানে বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম অনেক বেশি ছিল। তাই ভাইয়েরা আমেরিকার সাথে সাথে ইসরাইলি দূতাবাসেও হামলা করার চিন্তা করেন। সে মতে হারুন ভাই নাইরোবিতে ফিরে এসে ইসরাইলি দূতাবাসের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। ইসরাইলি দূতাবাসে হামলা করা একদম সহজ ছিল, সবদিক দিয়েই সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ ছিল। দূতাবাসের দেওয়ালের ঠিক সামনেই গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও ছিল। কিন্তু এখানে একটিই অসুবিধা ছিল। তা হলো, দূতাবাসের পাশেই কেনিয়ান শিশুদের একটি স্কুল ছিল। এখানে হামলা হলে শিশুদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় ভাইয়েরা এই হামলার চিন্তা বাদ দেন।

হামলায় স্থানীয় কেনিয়ান জনগণের জানমালের ক্ষতি যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য ভাইয়েরা কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন: হামলার সময় ঠিক করা হয় জুময়ার দিন সকাল ১০টা। এ সময় কেনিয়ার সাধারণ মুসলমানরা মসজিদে যাওয়া শুরু করেন। তা ছাড়া এ সময়টাতে দূতাবাস এলাকায় সাধারণ মুসলিমরা থাকে না। অন্যদিকে অমুসলিমরাও এ সময় নিজ নিজ অফিসেই থাকে। রাস্তাতেও তখন খুব একটা ভিড় থাকে না। অন্যদিকে ১২:০০ টায় সবাই দুপুরের খাবারের জন্য বের হয়। আক্রমণের জন্য ভাইয়েরা শুক্রবার দিন নির্বাচন করেন। কারণ, সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস হওয়ায় দূতাবাসের সবাই সেদিন উপস্থিত থাকে।

এমনইভাবে ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নেন, হামলাটি দূতাবাসের পেছন থেকে করা হবে, যাতে বিস্ফোরণের প্রভাব শুধু দূতাবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দূতাবাসের প্রধান ফটকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি গার্ডদের ওপর আক্রমণ করে ফটক খোলার ব্যবস্থা করাই ছিল আওহালীর প্রধান দায়িত্ব। যেন আযযাম ভাই কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই ট্রাক নিয়ে দূতাবাসের ভেতরে ঢুকতে পারেন। আওহালীর আরেকটা দায়িত্ব ছিল, সাউন্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনসাধারণকে দূতাবাস থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই সাউন্ড গ্রেনেডগুলো শুধু বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি। তাতে কোনো স্প্লিন্টার না থাকায় কারো কোনো ক্ষতি হয় না। ভাইদের পক্ষ থেকে আযযাম ভাইকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন গাড়ির ভেতর থেকেই রিভলবারের মাধ্যমে দূতাবাসের ছাদে থাকা মেরিন সৈন্যদের ওপর গুলি করে এক মিনিটের মতো তাদের ব্যস্ত রাখেন। যেন এই সময়ের মধ্যে আওহালী ভাই সাধারণ মানুষকে বিস্ফোরণের সীমা থেকে সরিয়ে নিতে পারেন। যখন আযযামের মনে হবে, মেরিন সৈন্যদের আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না, তখন যেন তিনি ট্রাকের বিস্ফোরণ ঘটান।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর 'অপারেশন ইস্ট আফ্রিকার' জন্য অপেক্ষার পালা শুরু হয়। এর মধ্যে শায়খ আবু মুহাম্মাদ[৬০], আব্দুর রহমান মুহাজির, ফাহাদ ভাই, শায়খ সুওয়াইদান ও তাঁর পরিবার, আহমাদ জিলানী, মোস্তফা ও তাঁর পরিবার-সহ যারা-ই এই অপারেশনের

---

[৬০] শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী আফগানিস্তানে ফেরার আগে খার্তুমে যাবেন—এমনটাই ঠিক করা ছিল। কিন্তু তিনি খার্তুমে না গিয়ে সরাসরি পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে খার্তুমে তালহা সুদানী ভাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আফগানিস্তানে পৌঁছানোর পর শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী সুদানে অবস্থানরত তালহা সুদানীর সাথে ফোনে কথা বলেন। ফোনে তালহা ভাই শায়খকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি খার্তুমে আসলেন না কেন? শায়খ উত্তরে বলেছিলেন, আপনার নিরাপত্তার ভয়ে যাইনি। এই ফোনকলটি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ট্র্যাক করেছিল। ফোনকল বিশ্লেষণ করে তারা ধারণা করে, সুদানের কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তি এই হামলার সাথে জড়িত। এই ধারণার ভিত্তিতে তারা বশীর সরকারকে চাপ দেয়, যেন তারা এই হামলার সাথে জড়িত দুই সুদানি ব্যক্তিকে তাদের কাছে হস্তান্তর করে। স্বভাবতই সুদান সরকার জানায়, এ ধরনের কারো ব্যাপারে তারা কিছু জানে না। পরে তদন্তের ভিত্তিতে সুদানের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তালহা সুদানী ভাই, আবু মুহাম্মাদ সুদানী (সালাহ কারুরী) আর আমাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে ঘুরেফিরে আমাদের শুধু একটি বিষয়ই জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে, এই হামলার সাথে শায়খ উসামার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না? আমরা সবাই প্রতিবারই বলেছি যে, এ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সুদান সরকার যদিও আমেরিকার কথামতো শায়খ উসামাকে বের করে দিয়েছিল, কিন্তু শায়খের কোম্পানিগুলো তখনও সুদানে সক্রিয় ছিল। যার কারণে সুদান সরকার ভয় পাচ্ছিল যে, এই হামলার সাথে যদি শায়খ উসামার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সুদানের ওপর আমেরিকা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং এ কারণে সুদানের বিপদ আরও বাড়বে। যাই হোক, এই পুরো সমস্যাটির বড় একটি কারণ ছিল সেই ফোনকলটি। ফোনকলের কারণেই আমেরিকা এই ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, হামলার সাথে সুদানেরও কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। শুধু এই সন্দেহের ভিত্তিতে সুদানের আশ-শিফা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরির ওপর আমেরিকা ক্রুজ মিসাইল অ্যাটাক করেছিল। আমেরিকার দাবি ছিল, এই ফ্যাক্টরি শায়খ উসামা বিন লাদেনের আর এখানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হয়। অথচ এ সবগুলো দাবিই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সাথে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন অথবা সম্পৃক্ত ছিলেন না, তবে আল-কায়েদার সদস্য ছিলেন—যেমন: মুহাম্মাদ আওদা, শুআইব ভাই ও তাঁর পরিবার—সকলেই আফগানিস্তানে ফিরতে শুরু করেন। শুধু খলফান খুমাইস তানজানী ভাই রয়ে যান। তিনি শেষ পর্যন্ত আহমদ আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথেই ছিলেন। পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ৫ই অক্টোবর গ্রেফতার হন এবং পরদিনই তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মার্কিন দূতাবাসে হামলার অভিযোগে ২০০০ সালে তাঁকে এবং অন্য আরও তিন ভাইকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন—ওয়াদী আল-হাজ লুবনানী, মুহাম্মাদ রাশেদ দাউদ আওহালী এবং মুহাম্মাদ আওদা উরদুনী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন, আমীন।

ফাহাদ কীনী রহ. ও মুহাম্মাদ আওদা ফা.আ. সবার শেষে কেনিয়া ছেড়ে বের হন। অপারেশনের সামান্য সময় আগে তাঁরা করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছান। ফাহাদ ভাই বিমানবন্দর থেকে বের হতে পারলেও মুহাম্মাদ আওদাকে এয়ারপোর্টেই পুলিশ আটকে দেয়। কারণ, পাসপোর্টে থাকা ছবি দেখে তাঁর ভিসার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ হয় আর ঠিক তখনই মার্কিন দূতাবাসে হামলার ঘটনা ঘটে। এই হামলার সাথে মুহাম্মাদ আওদা ভাইয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে এই হামলায় জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ এনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে আটক করে। নির্যাতনের ফলে তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হন যে, এই হামলার সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে এবং হামলার সাথে জড়িত সবাইকে তিনি চেনেন। তিনি এটাও স্বীকার করে নেন যে, পূর্বে তিনি সোমালিয়াতে জিহাদী কাজ করেছেন এবং তিনি আল-কায়েদার একজন সদস্য। পরে তাঁকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০০০ সালে ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তিনি-সহ সকল কারাবন্দি মুজাহিদ ভাইদের মুক্তি তরান্বিত করুন, আমীন।

অপারেশনের অনেক আগেই হারুন ফযল মুহাম্মাদ আওদা ভাইকে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে বলেছিলেন। সেখানে তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ আওদা ভাই নির্দেশ পালনে অনেক বিলম্ব করে ফেলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি পাসপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। তার আশা ছিল, কেনিয়া থেকে বৈধ পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু এতে অনেক দেরি হয়ে যায়। অবশেষে ভাই নতুন একটি ইয়েমেনি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। কিন্তু পাসপোর্টে দেওয়া ছবির সাথে ভাইয়ের চেহারার মিল ছিল না। তাই এই পাসপোর্টের ব্যাপারে হারুন ফযল ও আবু মুহাম্মাদ মিসরীর আপত্তি ছিল। অফিসিয়াল কাগজপত্রের ব্যাপারে তাঁরা দুজন ছিলেন পুরো তানজীমের মধ্যে সবচেয়ে পারদর্শী। তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও মুহাম্মাদ আওদা ভাই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে, পাসপোর্টের ছবির সাথে তার চেহারার মিল আছে, তাই ছবি পরিবর্তনের কোনো দরকার নেই। সরকারি কাগজপত্রে রদবদল করে মুহাম্মাদ আওদা ভাই কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছিলেন না, পাছে পাসপোর্টটাই না বাতিল হয়ে যায়।

কারণ, এর আগে ১৯৯৬ সালে ইসলামাবাদ থেকে বানানো তার জর্দানি পাসপোর্টটা এভাবেই নষ্ট হয়েছিল। পাসপোর্টে থাকা দাড়িযুক্ত ছবি পালটিয়ে তিনি দাড়িছাড়া একটি ছবি লাগিয়েছিলেন, এতে পাসপোর্টটাই বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

অপারেশনের সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, হারুন ফযল ভাই অপারেশন পরিচালনাকারী আযযাম ও আওহালী ভাইয়ের সাথে হামলার দিন পর্যন্ত নাইরোবিতে থাকবেন এবং হামলার দিন তাদের সাথে দূতাবাস পর্যন্ত যাবেন। তারপর তিনি নাইরোবি ত্যাগ করবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। হারুন ফযল ভাই হামলার পরেও নাইরোবিতে ৭ দিন ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর দেশ কমোরোসে চলে যান। সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। তিনি জানতেন না, হামলার সাথে তার জড়িত থাকার বেশকিছু তথ্য-প্রমাণ ততদিনে গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে। তার গ্রেফতার হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল তখন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে গোয়েন্দারা তাঁর কাছে পৌঁছানোর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর আমেরিকার অত্যাচার বন্ধ করা এবং হারামাইনের মাটি থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে বারবার বলার পরেও যখন কোনো কাজ হচ্ছিল না, তখন আল-জাবহাতুল ইসলামিয়ার ঐতিহাসিক সে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পর এবিসি চ্যানেলের প্রতিনিধিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শায়খ উসামা রহ. সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকার ওপর আঘাত হানবেন। এতে আমেরিকা নড়েচড়ে বসে। তাদের ধারণা ছিল, হামলাটি হয়তো আরবের কোনো এলাকায় হবে। তাই এ অঞ্চলে তারা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও মজবুত করতে শুরু করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সব অনুমানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন আর তাদের ওপর এমন জায়গা থেকে হামলা হলো, যার কল্পনাও তারা করেনি।

১৯৯৮ সালের ৭ই আগস্ট, শুক্রবার। (৮ বছর আগে ঠিক একই দিনে মার্কিন সেনাবাহিনীর নাপাক কদম পড়েছিল হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে।) বেলা ১০:৩০ থেকে ১০:৪০-এর মধ্যে তিন মিনিটের ব্যবধানে ভয়াবহ দুটি বিস্ফোরণে দুটি মার্কিন দূতাবাস কেঁপে ওঠে। একটি ছিল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে, আরেকটি তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালামে।

স্বভাবতই হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে নানান কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু সত্য সেটাই, যা শত্রু স্বীকার করে। কেনিয়ার সংবাদমাধ্যম ডেইলি নেশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেনিয়ায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রুডেন্স ব্রুশনাল স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে বলেছিল—

> ‘ঘটনার দিন আমি অ্যাম্বাসির পাশের ভবনের ২১ তলায় অবস্থিত ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অফিসে ছিলাম। কেনিয়ার শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আমার একটি মিটিং ছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ পাই। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি, ‘এটা কীসের শব্দ?’ তিনি বললেন, ‘এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ

হওয়ায় সব সময়ই এ ধরনের শব্দ হয়। তা ছাড়া রেললাইন নির্মাণের কাজ হচ্ছে। সেটারই শব্দ হবে।' কিন্তু শব্দটি থামছিল না। ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। আচমকা তীব্র ঝাঁকুনিতে আমরা টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দও কানে আসে। নিচে নামার জন্য লিফটের কাছে গিয়ে দেখি লিফট বন্ধ হয়ে আছে। বাধ্য হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচতলায় নেমে আসি। আমি তখন হাঁফাচ্ছিলাম। বিধ্বস্ত দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলছিলাম, সত্যিই আমার সৌভাগ্য যে, রক্ষা পেয়েছি। যদি অফিসে থাকতাম, তাহলে আমিও সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে যেতাম। আমি বলছি, এই ঘটনায় আমার ১৫০ জন সদস্যকে হারিয়েছি।'[৬১]



কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের ধ্বংসস্তূপ



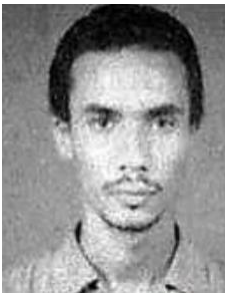
তানজানিয়ার দারুস সালামে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের ধ্বংসস্তূপ

[৬১] আল-হারবু আলাল ইসলাম : হারুন ফযল

## নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশনের নায়কগণ



আবু আব্দুর রহমান
মুহাজির
(মুহসিন মুসা মুতাওয়াল্লি)



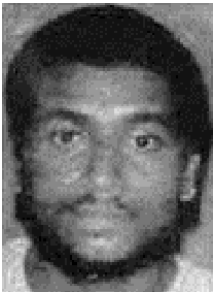
আব্দুল ওয়াকীল মিসরী
(মুস্তফা মুহাম্মাদ
ফাযেল)



হারুন ফযল কুমুরী
(আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ফাযেল)



শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী
(আব্দুল্লাহ আহমাদ আব্দুল্লাহ)



খলফান খুমাইস
তানজানী



হাইসাম তানজানী
(আহমাদ জিলানী)



আবু ইয়াহয়া কীনী
(শায়খ আহমাদ সুওয়াইদান)



আবু উসামা কীনী
(ফাহাদ মুহাম্মাদ)



মুহাম্মাদ রাশেদ দাউদ আওহালী (বালুশী)[৬২]

দারুস সালামে অপারেশন পরিচালনাকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ রহ. আল-জামাআতুল ইসলামিয়ার সদস্য ছিলেন। আল-জামাআতুল ইসলামিয়াহ যেহেতু আল-জাবহাতুল ইসলামিয়াহ জোট থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আল-জামাআতুল ইসলামিয়াহকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। এ জন্য অসীয়তনামায় তিনি লিখেছিলেন, 'আমি এই অভিযানে শরীক হয়েছি 'আল-জাইশুল ইসলামী লি-তাহরীরিল মুকাদ্দাসাত'-এর একজন সৈনিক হিসেবে।'[৬৩]

ভাইদের পক্ষ থেকে শায়খ আবুল ফারাজ মিসরী (আহমদ সালামা মাবরুক) রহ.-কে আজারবাইজানে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল, নাইরোবি ও দারুস সালামের এই অপারেশনকে 'আল-জাইশুল ইসলামী লি-তাহরীরিল মুকাদ্দাসাত'-এর নামে প্রচার করা। সেখানে শায়খকে গ্রেফতার করে মিশর পাঠানো হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময় তিনি মুক্তি পান এবং শামে হিজরত করেন। সেখানে অবস্থানকালে ২০১৬ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহিনীর বোমা হামলায় তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন।

---

[৬২] তিন টন বিস্ফোরক ভর্তি ট্রাক থেকে তিনি মাত্র কয়েক মিটার দূরে ছিলেন। কিন্তু 'আল্লাহর নির্ধারিত সময় ছাড়া কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে না'। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য হায়াত লিখে রেখেছিলেন। তিনি হামলার স্থান থেকে সরে যেতে সক্ষম হন এবং কিছু অর্থ ও পাসপোর্ট পাঠানোর জন্য ভাইদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর পাসপোর্ট হারুন ফযল ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকদীরের লিখন ছিল ভিন্ন। তিনদিন পর তিনি কেনিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। তারপর তাঁকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ তাআলা কাপুরুষদের ঘুম হারাম করে দিন।

[৬৩] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী



শায়খ আবুল ফারাজ মিসরী (আহমাদ সালামা মাবরুক) রহ.

আমেরিকার পক্ষ থেকে এই হামলার জবাব আসতে দেরি হয়নি। ১৯৯৮ সালের ২০শে আগস্ট 'অপারেশন ইনফিনিট রিচ' নামে তারা একটি অভিযান পরিচালনা করে। এতে সুদান ও আফগানিস্তানের ওপর টমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে অবস্থিত কয়েকটি ট্রেইনিং ক্যাম্প লক্ষ্য করে ৮৫টি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। এতে কয়েকজন আরব ও পাকিস্তানি ভাই শহীদ হন। আর সুদানের আশ-শিফা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি লক্ষ্য করে ১৩টি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। না এই ফ্যাক্টরির সাথে শায়খ উসামা রহ.-এর কোনো সম্পর্ক ছিল আর না তাতে কোনো রাসায়নিক অস্ত্র বানানো হতো। অথচ আমেরিকা এই মিথ্যা দাবি করেই পুরো ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে দিয়েছিল।

মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-এর সাবেক মুখপাত্র মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন তাঁর 'মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ওয়া তালিবান ওয়া আফগানিস্তান' বইয়ে লিখেছেন—

> 'কেনিয়া ও তানজানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে হামলার ঘটনা তালেবানের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ছিল না। আর এতে উসামা বিন লাদেনের হাত আছে—এই ধারণাও তাদের ছিল না। তালেবান নেতৃবৃন্দ তখন উত্তরাঞ্চলে বলখের রাজধানীতে দোস্তমের শেষ ঘাঁটি দখলের জন্য যুদ্ধ করছিলেন। মার্কিন দূতাবাসে হামলার একদিন পরেই তাঁরা সেটা দখল করতে সক্ষম হন। তা ছাড়া তখনও পর্যন্ত আমেরিকার পক্ষ থেকে হামলার সাথে শায়খ উসামার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কোনো কিছুই বলা হয়নি।'

মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন রহ. আরও লিখেছেন—

> 'মিসাইল হামলার জবাবে তালেবানের পক্ষ থেকে শক্ত প্রতিবাদ জানানো হয়। এই হামলার কারণে তালেবানের মধ্যে আমেরিকার প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়ে যায়। হামলাটি

তালেবানকে এই বার্তা দিচ্ছিল যে, আমেরিকা তাঁদের প্রকাশ্য শত্রু। ফলে তাঁদের মনমগজে আমেরিকা একটি আগ্রাসি শত্রু হিসেবে চিত্রিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তালেবান ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিল, আমেরিকার শত্রুরা তাদের মিত্র। মার্কিন হামলা ও আগ্রাসনের কারণে মোল্লা উমর রহ.-ও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং কঠোর ভাষায় এর নিন্দা জানান। সে বছরের সেপ্টেম্বরে মোল্লা উমর ও তুর্কি ফয়সালের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এই হামলার সরাসরি প্রভাব সে বৈঠকের ওপরেও পড়েছিল।'

তিনি আরও লিখেছেন—

'আল-কায়েদা শুরু থেকেই প্রচার করে আসছিল, "আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের আন্তর্জাতিক শত্রু। তার থেকে কিছুতেই ভালো আচরণ আশা করা উচিত না।" আমেরিকার হামলা ও আগ্রাসি আচরণের ফলে তালেবানের মধ্যে আল-কায়েদার এই বক্তব্য আরও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আমি একবার তালেবানের বড় একটি সভায় বসে ছিলাম। তখন শুনতে পেলাম, তালেবানের বড় এক দায়িত্বশীল আরেকজন দায়িত্বশীলকে বলছেন—"বুঝেছেন ভাই, আল্লাহর কসম করে বলছি, এই আমেরিকা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওদের পক্ষ নিয়ে শায়খ উসামার বিরুদ্ধে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। শুধু শুধু কেন আমরা নিজেদের দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করব? সবচেয়ে ভালো হবে, আমরা সবাই মিলে (তালেবান ও আল-কায়েদা) আমেরিকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই।"'

পূর্ব আফ্রিকার এই অপারেশনের প্রতি তালেবান সরাসরি সমর্থন ব্যক্ত করেনি ঠিক, কিন্তু এ কারণে শায়খ উসামাকে তিরস্কার করা তো দূরের কথা সামান্য জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। এর মাধ্যমে তালেবান আমেরিকাকে বোঝাতে চাচ্ছিল যে, তারা আমেরিকার প্রতি ক্ষিপ্ত। এ ব্যাপারে হারুন ফযল রহ. তার বই 'আল-হারবু আলাল ইসলাম'-এ বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন—

'[অপারেশন-পরবর্তী সময়ে] অপারেশন সম্পর্কিত যে-কোনো সংবাদ তালেবানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই আমাদের কাছে পাঠাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁরা শায়খ উসামাকে আমাদের সম্পর্কে বা হামলা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করেনি। উলটো তাঁরা শায়খকে বলেছিল, তিনি যেন হামলার দায় স্বীকার না করেন এবং তাঁর মতো করে তিনি যেন কাজ করতে থাকেন। ইসলামী ইমারতের এই অবস্থান মূলত শায়খ উসামার প্রতি তাঁদের সমর্থনেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু ওপরে ওপরে তারা প্রকাশ করতেন যে, শায়খ উসামাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে, নজরদারিতে রাখা হয়েছে ইত্যাদি। বাস্তবে এসব ছিল রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।'

আল-জাযীরার সাংবাদিক জামাল ইসমাইলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশন সম্পর্কে শায়খ উসামা রহ. বলেছিলেন—

'আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, এই হামলাটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ১৯৮৩ সালের বৈরুত ব্যারাক বোম্বিংয়ের পর না-কি এত শক্তিশালী কোনো হামলা আমেরিকার ওপর হয়নি। নাইরোবিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস বাস্তবে একাই ছয়টি দূতাবাসের কাজ করত। এখান থেকেই সোমালিয়ার ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। জাতিসংঘের নেতৃত্বে চালানো সে হামলায় আমাদের ১৩ হাজার ভাইবোন ও শিশুদের তারা হত্যা করেছিল। পত্রপত্রিকায় এমন ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে দেখা যাচ্ছিল, মার্কিন সৈন্যরা আমাদের সোমালি ভাইদেরকে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রেখে শাস্তি দিচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কিন্তু তখন কেউ মার্কিনিদের এই বর্বরতা নিয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আর যখনই মুসলিমরা আত্মরক্ষার জন্য কিছু করল, তখনই এ সব মিডিয়া নির্লজ্জের মতো চিৎকার শুরু করে দিলো। অথচ নাইরোবিতে অবস্থিত এই মার্কিন দূতাবাস থেকেই কয়েক দশক ধরে সুদানকে ভাগ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর পেছনে যে আমেরিকা আছে, সেটা সবাই জানে। পুরো পূর্ব আফ্রিকাতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে বড় ঘাঁটিও ছিল নাইরোবির এই দূতাবাস। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের এই দূতাবাস ধ্বংস হওয়া মুসলিমদের ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত বলে মনে করি। আমেরিকানরা এরই উপযুক্ত ছিল। সাবরা-শাতিলা, দেইর ইয়াসিন, ক্বানা, আল-খলীল-সহ বিভিন্ন স্থানে আমাদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, তাদেরও এমন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করার প্রয়োজন ছিল।'




একজন সোমালি মুসলিমকে মার্কিন ক্রুসেডার সৈন্যরা
আগুনের ওপর ঝুলিয়ে শাস্তি দিচ্ছে।

## শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু: সৌদির মুখোমুখি আমীরুল মুমিনীন

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-কে হস্তান্তর করতে তালেবানের ওপর সৌদি সরকারের চাপ তখনও অব্যাহত ছিল। পূর্বের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবার সৌদি সরকার তূণীরের শেষ তিরটিই নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মতে আফগানিস্তান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল সৌদি প্রিন্স এবং সৌদি সরকারের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান তুর্কি ফয়সালকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়।

১৯৯৮ সালের জুন মাসে শায়খ উসামার হস্তান্তরপ্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে তুর্কি ফয়সাল প্রথমবারের মতো কান্দাহারে আসে। তখন তালেবানের পক্ষ থেকে তাকে বলা হয়, ইসলামী শরীয়তের আলোকে বিষয়টির সুরাহা করার জন্য উলামায়ে কেরামের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে শায়খ উসামার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে সেবার তুর্কি ফয়সাল খালি হাতেই ফিরতে বাধ্য হয়।

সে বছরেরই ১৯শে সেপ্টেম্বর তুর্কি ফয়সাল আবারও কান্দাহার আসে। এবার তার সাথে সৌদির ধর্মমন্ত্রী আব্দুল্লাহ তুর্কি এবং কাবুলে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত সালমান উমরীও ছিল। এবার তুর্কি ফয়সালের লক্ষ্য শুধু শায়খ উসামাকে নিয়ে যাওয়াই ছিল না; বরং শায়খের সাথে থাকা সকল আরব মুজাহিদদের ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। এ ব্যাপারে সে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, ছোটখাটো কোনো বিমানে না এসে সরাসরি জাম্বো জেট (বোয়িং ৭৪৭) নিয়ে হাজির হয়েছিল।



আব্দুল্লাহ তুর্কি
আলে সৌদের সাবেক ধর্মমন্ত্রী



তুর্কি ফয়সাল
আলে সৌদের সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান

তুর্কি ফয়সাল কান্দাহারে মোল্লা উমর রহ.-এর সাথে দেখা করে এবং তাদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এর মধ্যে তুর্কি ফয়সাল দাবি করে বসে, মোল্লা উমর রহ. না-কি শায়খ উসামা ও তার সাথিদেরকে তার হাতে তুলে দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। সে ওয়াদার কারণেই সে আজ এসেছে। বাস্তবে তার সাথে এ ধরনের কোনো ওয়াদাই ছিল না; বরং ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, শায়খ উসামার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। ইসলামী শরীয়তের আলোকে তাঁরা করণীয় নির্ধারণ করে দেবেন।[৬৪]

আমীরুল মুমিনীন রহ. ওয়াদার কথা অস্বীকার করেন এবং এমন মিথ্যা দাবি করার কারণে আপত্তি জানান। তাঁর সাথে বাস্তবে কতটুকু কথা হয়েছিল, তা তিনি সৌদি প্রিন্সকে পুনরায় মনে করিয়ে দেন। কিন্তু সৌদি রাষ্ট্রদূত (সালমান উমরী) আমীরুল মুমিনীনের কথার মধ্যে বারবার বাধা দিতে থাকে এবং মনিবের মন জোগানোর জন্য বারবার সেই মিথ্যা ওয়াদার কথা বলতে থাকে। এতে মোল্লা উমর রহ. ক্ষিপ্ত হয়ে তুর্কি ফয়সালকে লক্ষ্য করে শীতল কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমি আপনাকে বলেছিলাম না, এই খবিস যেন আফগানিস্তানে না আসে?' দোভাষী কথাটি অনুবাদ করতে দ্বিধা করছিল দেখে মোল্লা উমর রহ. তাকে ধমক দেন এবং শব্দে শব্দে অনুবাদ করতে বলেন।[৬৫]

সালমান উমরী নামের এই রাষ্ট্রদূতের নির্লজ্জ কূটনীতির কারণে অনেকদিন আগেই আমীরুল মুমিনীন রহ. তাকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কারের আদেশ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তুর্কি ফয়সালকেও বলেছিলেন, তাকে যেন সাথে না আনা হয়। যাই হোক, এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। তুর্কি ফয়সাল বারবার চিৎকার করে বলতে থাকে, এত কথা বলার সময় তার হাতে নেই, দ্রুত যেন শায়খ উসামাকে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমীরুল মুমিনীন রহ. তখন প্রতিনিধিদলকে বলেন, 'আপনারা যেহেতু আমেরিকার হয়ে কথা বলছেন, তাই আমাকেও উসামা বিন লাদেনের হয়ে কথা বলতে দিন।' সৌদি প্রতিনিধিদল যেহেতু শায়খ উসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চাইছিল, তাই তাদেরকে তিরস্কার করে তিনি কথাটি বলেছিলেন।[৬৬]

---

[৬৪] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী। বৈঠক চলাকালে তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

[৬৫] প্রাগুক্ত।

[৬৬] প্রাগুক্ত।

তুর্কি ফয়সাল ধৈর্য হারিয়ে রেগেমেগে তার সামনে থাকা খাবারের টেবিলে মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করে এবং আমীরুল মুমিনীন রহ.-কে মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ ইত্যাদি নানান অপবাদ দিতে থাকে আর বলতে থাকে—বিন লাদেনকে এক্ষুনি আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। মুহূর্তেই যেন সেখানে বজ্রপাত হয়, আঘাতের চোটে টেবিলে থাকা খাবার চারিদিকে ছিটকে যায়। আফগান নিরাপত্তারক্ষীরা তার উদ্ধত আচরণ দেখে কান্দাহারি তরিকায় কিছু উত্তম-মাধ্যম দিতে চাইলে আমীরুল মুমিনীন রহ. চোখের ইশারায় তাদের শান্ত থাকার নির্দেশ দেন। তিনিও সেখান থেকে উঠে রাগ কমানোর জন্য অযু করতে যান। কিছুটা স্থির হওয়ার পর তিনি পুনরায় বৈঠকখানায় এসে বসেন এবং খুব শান্তভাবে নিজের অবস্থান পুনরায় উল্লেখ করে তুর্কি ফয়সালকে জিজ্ঞেস করেন—

- তোমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আমাদের কাছে ইসলাম নিয়ে এসেছেন। তোমরা কীভাবে তাদের থেকে এত ভিন্ন হলে?
- বিন লাদেনকে তুমি আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চাও কেন? তুমি কি সৌদির মন্ত্রী না আমেরিকার মন্ত্রী?
- একজন মুসলিমকে তুমি কাফেরের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে গেছ? এতটা বে-গায়রত কীভাবে হলে?[৬৭]

তুর্কি ফয়সাল তখন আমীরুল মুমিনীনকে হুমকি দিয়ে বলে, তালেবানকে সৌদি সরকার যে স্বীকৃতি দিয়েছে, তা কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এ কথা বলে সে চলে যেতে থাকে। তখন মোল্লা উমর রহ. তাকে থামিয়ে বলেন, তার সাথে সৌদি রাষ্ট্রদূতকেও যেন নিয়ে যায়। রিয়াদে ফিরে তুর্কি ফয়সাল আমীরুল মুমিনীনের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠায়। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন রহ. তাকে ক্ষমা করতে নারাজ হন এবং সেই সৌদি রাষ্ট্রদূতকেও আফগানিস্তানে পুনর্বহাল করার দাবি নাকচ করে দেন। অবশেষে সৌদি সরকার বাধ্য হয়ে তাকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে রিয়াদে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৬৮]

মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন তাঁর 'মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ওয়া তালিবান ওয়া আফগানিস্তান' বইয়ে এই বৈঠকের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> 'বৈঠকের শুরুতেই মোল্লা উমর রহ. অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু আলচনা শুরু হলে তুর্কি ফয়সাল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মোল্লা উমরকে বলতে শুরু করে, "আমরা এসেছি, এখন আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করুন। আসামিকে আমাদের হাতে তুলে

[৬৭] প্রাগুক্ত।

[৬৮] উসামা বিন লাদেন : মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকান : শায়খ আবু জান্দাল আযদী

দিন। তাকে আমাদের সাথেই নিয়ে যাব।" উদ্ধত আচরণের পাশাপাশি সে দুটি বড় ভুল করে। এক. [আফগানিস্তানে আমেরিকার হামলার কারণে] তালেবানযোদ্ধাদের শাহাদাতে কোনো ধরনের সান্ত্বনা বা সহমর্মিতা কিছুই সে জানায়নি। দুই. সে একটি ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কথা বলেছে। মোল্লা উমর তাকে এমন কোনো ওয়াদাই দেননি। মিথ্যা ও ওয়াদাখেলাফিকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। তুর্কি ফয়সালের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অপবাদমূলক কথার উত্তরে তাই তিনিও কড়া ভাষায় জবাব দেন। মোল্লা উমর তুর্কি ফয়সালকে বলেন, 'প্রথমত, আপনি আমার ওপর মিথ্যার অভিযোগ দেবেন না। কারণ, আমি এমন কোনো ওয়াদা করিনি। আমার কোনো প্রতিনিধিকেও এমন ওয়াদা করার অনুমতি আমি দিইনি। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সাথে আমার ওয়াদা ছিল, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উলামায়ে কেরামের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এতটুকুই কথা ছিল। শায়খ উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের কোনো ওয়াদা আমরা করিনি। আপনারা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরবের শাসক। নির্যাতিত মুসলিমরা আপনাদের সহযোগিতা ও সান্ত্বনার আশায় তাকিয়ে আছে আর আপনারা এ দিকে মুসলমানদেরকেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাদের আদেশে এখানেও চলে এসেছেন। হামলা হয়েছে সুদূর আফ্রিকায়। আমেরিকা দাবি করেছে, এতে উসামার হাত আছে আর এতেই আপনারা ছুটে এসেছেন তাকে নিয়ে যেতে? কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এমন দাবি করতে পারেন?'

শায়খ উসামা রহ. আমাদের একবার একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি তিনি আমীরুল মুমিনীনের নায়েব এবং তালেবানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানী রহ. থেকে শুনেছিলেন। মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানী একবার তালেবান সরকারের একটি কাফেলা নিয়ে হজে গিয়েছিলেন। তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স আব্দুল্লাহ মোল্লা রব্বানী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের দুইবার মেহমানদারি করেছিল। হজের আগে একবার, হজ চলাকালে একবার। দুইবারই সে মোল্লা রব্বানীর কাছে শায়খ উসামাকে হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে মোল্লা রব্বানী অত্যন্ত কোমল ভাষায় ওজর পেশ করে বলেছিলেন, 'শায়খ উসামা রহ. আমাদের একজন সম্মানিত মেহমান। সবার কাছেই তিনি অনেক সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। আর আফগানরা নিজেদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। মেহমানকে অসম্মান করা আফগানদের সংস্কৃতির খেলাফ। যত যা-ই হোক, তারা মেহমানকে অসম্মান করবেন না।'

হজ শেষে ক্রাউন প্রিন্স আব্দুল্লাহ মোল্লা রব্বানী ও তাঁর সঙ্গীদের একটি রাজকীয় বিয়ের ওলীমায় দাওয়াত করে। সেখানে তৃতীয়বারের মতো তাঁদের কাছে শায়খ উসামাকে হস্তান্তরের দাবি জানায়। এবার মোল্লা রব্বানী রহ. বেশ কঠোর ভাষায় জবাব দেন—'আমাদের আফগানিস্তানে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একব্যক্তি এক আফগানিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার

বয়স কত? সে বলল, ৩০ বছর। এরপর ৩০ বছর কেটে গেল। ৩০ বছর পর আবারও সেই আফগানির সাথে লোকটির দেখা। লোকটি তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, এখন তোমার বয়স কত? আফগানি লোকটি বলল, ৩০ বছর। লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, এটা কীভাবে সম্ভব! ৩০ বছর আগেও বলেছিল, তোমার বয়স ৩০ বছর আর আজ ৩০ বছর পরেও বলছ তোমার বয়স ৩০ বছর? এবার আফগানি লোকটি বলল, শোনো, আমি আফগানি। আমার কথা সব সময় এক থাকে, কথা কখনো বদলায় না। ৩০ বছর আগে যে কথা বলেছি, ৩০ বছর পরে তা বদলে ফেলার মানুষ আমি না। তো আমরাও সেই ব্যক্তির মতো। আমাদের কথাও একটাই। হজের আগে হোক, মাঝখানে হোক বা পরে হোক, আমাদের কথায় কখনো গরমিল হবে না।'



মোল্লা মুহাম্মাদ রব্বানী রহ.

মোল্লা রব্বানী রহ.-এর এই ঘটনার মতো একটি ঘটনা মোল্লা উমর রহ.-এর সাথেও ঘটেছিল। আমীরুল মুমিনীনের ঘটনাটি ঘটেছিল পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সাথে। পাকিস্তানে নিয়োজিত আফগানিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মোল্লা আব্দুস সালাম যইফ হাফি. তাঁর 'তালেবানের সঙ্গে আমার জীবন' বইয়ে লিখেছেন, 'পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ মোল্লা উমরকে পাকিস্তান সফরের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু মোল্লা উমর রহ. তার দাওয়াত কবুল করেননি। পরে মোশাররফ নিজ থেকে আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাতের জন্য কান্দাহারে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্য ছিল, শায়খ উসামাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা করা। কিন্তু মোল্লা উমর তার এই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেন। সাথে সাথে একটি চিঠি পাঠান। তাতে লিখেছিলেন, ' আপনি (মোশাররফ) যদি প্রতিবেশী দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দু'দেশের নিরাপত্তা, অর্থনীতি বা এ জাতীয় কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চান, তাহলে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু উসামা বিন লাদেনের বিষয়টি একান্তই আফগানিস্তান ও আমেরিকার নিজস্ব বিষয়। পাকিস্তান যদি এ বিষয়ে কথা বলতে চায়, তাহলে এতে প্রতিবেশী

দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' আমীরুল মুমিনীনের এমন কঠিন জবাবে পারভেজ মোশাররফের আফগান সফরের ইচ্ছা মাঠে মারা যায়।'

কূটনৈতিকভাবে এত চেষ্টা করেও যখন কোনো লাভ হলো না, তখন আলে সৌদ শায়খ উসামা রহ.-কে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করার সিদ্ধান্ত নিল। এ জন্য তারা শায়খের সম্মানিতা মা-কে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল। শায়খের মায়ের জন্য দেশের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। শায়খ যখন সুদানে ছিলেন, তখন থেকেই শায়খের সাথে তাঁর মায়ের দেখা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সৌদি সরকার জানত, শায়খ উসামা রহ. মায়ের সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। এটাকেই তারা কাজে লাগাল। শায়খ উসামার সাথে দেখা করানোর জন্য তাঁর মাকে প্রাইভেট বিমানে করে কান্দাহারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর মাধ্যমে শায়খকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা। শায়খের মা তাঁর স্বামীকে সাথে নিয়ে কান্দাহারে পৌঁছান। তাঁর স্বামী ছিলেন আতাস খান্দানের মানুষ। শায়খ উসামা রহ. দীর্ঘ কয়েক বছর পর মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বলাই বাহুল্য, কতটা আবেগঘন সাক্ষাৎ ছিল সেটি। কিন্তু ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করা হলেও শায়খকে কোনোভাবেই সৌদি ফেরার ব্যাপারে রাজি করানো যায়নি। যা হোক, শায়খের মা বেদনাহত হৃদয়েই সৌদি ফিরে যান। যদিও কলিজার টুকরো সন্তানকে দেখে তাঁর চোখ ঠান্ডা হয়েছিল।[৬৯]

আলে সৌদ একদিকে শায়খ উসামাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল; এ জন্য কখনো কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছিল, কখনো ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করছিল; অন্যদিকে শায়খকে হত্যার জন্য গোয়েন্দা অপারেশনও অব্যাহত রেখেছিল। শুধু আলে সৌদ না, জর্ডান, আরব আমিরাত-সহ আরও কিছু দেশ শায়খকে হত্যার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। আলে সৌদ যখন দেখল, শায়খের মা-কে পাঠিয়ে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করেও কোনো লাভ হলো না, তখন শায়খকে হত্যার জন্য নতুন পরিকল্পনা করল। তবে এবার যে এজেন্টদের মাধ্যমে ঘৃণ্য এই কাজ করানো হয়েছিল, তাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছিল নিকৃষ্ট উপায়ে। নানাভাবে ব্ল্যাকমেইল করে তাদেরকে এ অপারেশনের জন্য রাজি করানো হয়েছিল। দুঃখজনক বিষয় হলো, এই এজেন্টদের মধ্যে অনেকে একসময় আল্লাহর পথের মুজাহিদও ছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে তাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং সকলকে গ্রেফতার করে তালেবানের হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমেরিকা যখন কান্দাহার দখল করে, এই এজেন্টদের মধ্যে অনেকে তখনও কান্দাহার জেলে বন্দি ছিল। আমেরিকার জন্য ইসলামের সাথে গাদ্দারি করেও তাদের

[৬৯] উসামা বিন লাদেন মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকান : শায়খ আবু জান্দাল আযদী

শেষরক্ষা হয়নি। তারা ভেবেছিল, এবার তাদের সাথে ভালো আচরণ করা হবে, কিন্তু মার্কিনিরা তাদেরকেও আফগানিস্তান থেকে গুয়ান্তানামো কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। কারাগারের মধ্যে মুজাহিদ ভাইদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য তাদেরকে গোয়েন্দা কয়েদি হিসেবে পাঠানো হয়।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, গুয়ান্তানামো কারাগারে আমাদের সাথে যেমন কঠোর আচরণ করা হতো, তাদের সাথেও একই আচরণ করা হতো। সেদিন স্বচক্ষে দেখেছিলাম, যে আল্লাহকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। আর যে গাইরুল্লাহকে পেয়ে গর্ববোধ করে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন। ফায়েয কিন্দী কুয়েতী ও ওয়ালীদ আলহাজ সুদানী হাফি. গুয়ান্তানামো কারাগারের স্মৃতিচারণ করে যে বই লিখেছেন, তাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাই এখানে আর সেগুলো উল্লেখ করছি না।

উল্লেখ্য, কান্দাহার কারাগারে যে-সব বিদেশি বন্দি ছিল, তাদের মধ্যে এক ব্রিটিশ মুসলিম ভাইও ছিলেন। তার নাম ছিল জামালুদ্দীন হারিস। গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বাস্তবে তিনি গুপ্তচর ছিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে গিয়েছিল যে, তালেবান মুজাহিদগণ তার ব্যাপারে যথাযথভাবে খোঁজখবর করতে পারেননি। তাকেও গুয়ান্তানামোতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তিনি দুই বছরের মতো অবস্থানও করেছিলেন। আপাদমস্তক একজন ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। মুক্তি পেয়ে ব্রিটেনে ফিরে যান। সেখান থেকে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং দাওলার সাথে মিলিত হন। ২০১৭ সালে মসুলে ইরাকি বাহিনীর ওপর বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে ইস্তিশহাদী হামলা করেন। আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন।

## শায়খ উসামা ও আমীরুল মুমিনীনের মতভিন্নতা

জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশের পর এবং সামরিক কার্যক্রম শুরুর আগে শায়খ রহ. আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমরের সাথে দেখা করেন। সে সাক্ষাতে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব নিয়ে নিজের মতামত ও শরয়ী দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁর আবেগঘন বক্তৃতা ও যুক্তি-প্রমাণে আমীরুল মুমিনীন-সহ তালেবানের সকল দায়িত্বশীলই প্রভাবিত হন। আমেরিকার ওপর আঘাত হানার ব্যাপারে নীতিগতভাবে আমীরুল মুমিনীন শায়খ উসামার সাথে একমত ছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল সময় নিয়ে। আমীরুল মুমিনীনের মত ছিল, এখন ইমারতে ইসলামিয়াকে শক্তিশালী করা বেশি জরুরি। এ ব্যাপারে তিনি শায়খ উসামাকে বলেছিলেন—

‘আমরা জানি, জাযীরাতুল আরব থেকে মার্কিনিদের এবং ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদের অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে। আমরাও আপনাদের মতো মুসলিম ও মুজাহিদ। ইসলামের ব্যাপারে আপনাদের চেয়ে আমাদের গায়রত কোনো অংশেই কম না। আমরা কাপুরুষও নই। আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। অসংখ্য আহত ও শহীদের নজরানা পেশ করে অবশেষে তাদের পরাজিতও করেছি। আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলে ইসলামের পবিত্র ভূমিগুলো স্বাধীন করার জন্য লড়াই করব। এটা তো আমাদের দীনী দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো ঠিক এ রকম (এ কথা বলে মোল্লা উমর রহ. তাঁর শীর্ণ শরীর নিয়ে বসা থেকে হাঁটু ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে দেখান আর বলেন যে,) আমরা পুরোপুরি বসতেও পারিনি, আবার ভালোভাবে দাঁড়াতেও পারিনি। তাই, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আফগানিস্তানে আমাদের কর্তৃত্ব মজবুত হোক আর এই যুদ্ধটাও শেষ হোক। এরপরে ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষার জিহাদে আমাদেরকেই আপনারা সবার আগে দেখবেন।’[৭০]

এই সাক্ষাতেই আমীরুল মুমিনীন শায়খ উসামাকে বলেছিলেন, মিডিয়া প্রচারণা যদি একটু শিথিল করা হয়, তাহলে ভালো হবে। সাথে এটাও বলেছিলেন, এটা কেবল অনুরোধ; কোনো নির্দেশ না।

এটি ছিল আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি। শায়খ উসামার মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যেও অনেকে আমীরুল মুমিনীনের সাথে একমত ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, এই মুহূর্তে আমেরিকার ওপর হামলা করা হলে ইমারতে ইসলামিয়ার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীনের সাথে শায়খ উসামা দ্বিমত করেন। শায়খের মত ছিল—আফগানে চলমান যুদ্ধে তালেবানের বিজয় হোক বা না হোক, তালেবান আফগানিস্তানে মজবুতভাবে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারুক বা না পারুক, দুনিয়ার কোথাও কোনো শক্তিকেই আমেরিকা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে দেবে না। আমেরিকার ব্যাপারে শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস বলতেন, ‘আমেরিকা হলো কুফরি বিশ্বব্যবস্থার (ওয়ার্ল্ড অর্ডার) মহাজন। আর এই বিশ্বব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে সেক্যুলারিজম ও ডেমোক্রেসির ওপর। যার বাস্তবায়ন হয় মানবরচিত শরীয়াবিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। কোনো রাষ্ট্র যদি এই কুফরি বিশ্বব্যবস্থা না মানে, তাহলে তাকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয়। আর এ কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া, অবরোধ করা বা ধ্বংস করাও বৈধ হয়ে যায়।’ এর পক্ষে অনেক বাস্তব

[৭০] শায়খ সাইফ আল-আদল থেকে বর্ণিত। আমীরুল মুমিনীনের সাথে শায়খ উসামা যখন প্রথমবার দেখা করেন, তখন এই পুরো কথোপকথন হয়েছিল।

উদাহরণও রয়েছে। সুদান ও আলজেরিয়া এর জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এ সব কারণে শায়খ উসামা বিশ্বাস করতেন, তালেবানের পতন ঘটানোর জন্য আমেরিকা সর্বশক্তি ব্যয় করবে। তাই, আমেরিকার ওপর আঘাত করলে যে পরিণতি হবে, না করলেও পরিণতি একই হবে। সুতরাং আঘাত করা শুধু উত্তমই নয়, জরুরিও বটে।'

তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও পত্রপত্রিকায় শায়খ উসামা রহ. ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এতে আন্তর্জাতিক মহলে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। ইতোমধ্যেই নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসে হামলার ঘটনা ঘটে। ফলে আমেরিকা ও তার মিত্রদের পক্ষ থেকে তালেবানের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে। আমেরিকা তালেবানের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এমনকি তাঁদেরকে যুদ্ধের হুমকিও দেওয়া শুরু করে। এতে তালেবানের মধ্যেও কিছুটা অস্থিরতা দেখা দেয়।

নাইরোবি ও দারুস সালাম হামলার জবাবে আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার চাপপ্রয়োগ এবং মিসাইল হামলার পর তালেবানের সকল মন্ত্রী শায়খ উসামা রহ.-এর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর সাথে দেখা করেন। তিন দিনব্যাপী আলোচনা হয়। সবার ধারণা ছিল, আমীরুল মুমিনীন শায়খ উসামা ও আরব মুজাহিদদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেবেন এবং তাঁদের সব ট্রেইনিং ক্যাম্পও সিলগালা করে দেওয়া হবে। সবার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে উলটো তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ও ভয়কাতর কয়েকজন মন্ত্রীকে তিরস্কার করেন এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে বলেন। তাঁদের তিনি মনে করিয়ে দেন, আমেরিকার চেয়ে শক্তিশালী ও নিকটবর্তী শত্রু রাশিয়াকে আল্লাহ তাদের হাতে পরাজিত করেছেন, তাদের সাম্রাজ্য খানখান করে দিয়েছেন। তাই আমেরিকাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। আমীরুল মুমিনীন রহ. স্পষ্টভাবে বলেন, 'আফগানিস্তানের সবাই যদি মারা যায় আর আমি একা বেঁচে থাকি, তবু আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি উসামা বিন লাদেন ও আরব মুজাহিদদের রক্ষা করব, তাদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দেব না।'

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. অভ্যাস অনুযায়ী মাঝে মধ্যেই আরব ভাইদের খোঁজ নিতেন। তাঁদের কোনো প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করার চেষ্টা করতেন। তাদের সাথে খুবই কোমল আচরণ করতেন। একবার তিনি শায়খ উসামার সাথে দেখা করতে আসেন। সাথে তালেবানের শূরা সদস্যদের একটি দল, আমীরুল মুমিনীনের কয়েকজন নিকটাত্মীয় এবং দেহরক্ষীরাও ছিলেন। মজলিস যথারীতি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশেই শুরু হয়। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল, শায়খ উসামাকে মিডিয়া প্রচারণা ও সামরিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে রাজি করানো। আমীরুল মুমিনীনের প্রস্তাবে শায়খ উসামা রহ. আবেগপ্রবণ হয়ে বলে ওঠেন,

'আমাদের রক্ষা করা যদি আপনাদের জন্য কঠিন হয়, তাহলে আমাদের নারী ও শিশুদেরকে আপনাদের জিম্মায় রেখে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই এবং সেখান থেকে জিহাদ শুরু করি।' মোল্লা উমর রহ. আফগানিদের শান্তভাব আর আহলে ইলমের গাম্ভীর্য নিয়ে শায়খ উসামাকে বলেন, 'আপনি চলে যাবেন কেন? আমাদের শরয়ী আদালত আছে, হক্কানী উলামায়ে কেরাম আছেন। বিষয়টি তাঁদের কাছেই পেশ করি।'[৭১]

আলোচনা এখানেই শেষ হয়। পরিবেশ বেশ থমথমে হয়ে উঠেছিল। তাই আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. অনুমতি নিয়ে মজলিস থেকে বের হয়ে যান। এতে অবশ্য মহান এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি এবং শায়খ উসামার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্তেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। কারণ, আমীরুল মুমিনীনের অন্তরে শায়খের প্রতি অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। একে তো তিনি আরব থেকে আসা সম্মানিত একজন মেহমান। দ্বিতীয়ত আফগানিস্তানের জন্য তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীও অপরিসীম। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ছুঁড়ে ফেলে তিনি আফগানিস্তানের মরুভূমি ও পাহাড়ি জীবন বেছে নিয়েছেন। আফগানিস্তানের জন্য নিজের জানমাল উৎসর্গ করে জিহাদ করেছেন। তাই শায়খের বিপদে আমীরুল মুমিনীন সব সময়ই তাঁর পাশে ছিলেন। আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে শায়খের পক্ষে ফতওয়া জারির আগ পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. তাঁর বিরোধীদের সামনে উঁচু পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের সব দাবি-দাওয়া তিনি ক্রমাগত উপেক্ষা করে গেছেন।[৭২]

অবশেষে আফগানিস্তানের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং তাঁদের কাছে শায়খ উসামা বিন লাদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। শায়খ উসামাকে কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করা হবে না—এ ব্যাপারে সবাই একমত হন। মতভিন্নতা হয় এ বিষয়ে যে, তিনি আফগানিস্তানে থাকবেন না-কি তাঁকে আফগানিস্তান থেকে চলে যেতে বলা হবে। সারা পৃথিবীর মুসলিমরাই তখন আতংকে ছিল, শায়খের ব্যাপারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত যেন না নেওয়া হয়, যা মুমিনদের জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর হবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। উলামায়ে কেরাম মোল্লা উমরের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি; বরং বিষয়টিকে তাঁর ওপর ছেড়ে দেন। তাই মোল্লা উমর রহ.-ও শায়খ উসামার আফগানিস্তানে অবস্থানের পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেন।[৭৩]

---

[৭১] শায়খ সাইফ আল-আদলের বর্ণনা

[৭২] শায়খ সাইফ আল-আদলের বর্ণনা

[৭৩] উসামা বিন লাদেন মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকান: ফারিস আয-যাহরানী

## ‘ইত্তিহাদে উলামায়ে আফগানিস্তান’-এর প্রধান মৌলবী আব্দুল্লাহ যাকিরীর ফতওয়া:[৭৪]

বিসমল্লাহির রাহমানির রাহীম

**وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ • يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ • وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ • وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ**

### ইত্তিহাদে উলামায়ে আফগানিস্তান

তারিখ: ৩/৮/১৪২০ হিজরী, ১১/১১/১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

মুহতারাম আমীরুল মুমিনীন,

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

১৪২০ হিজরীর ৩০শে রজব বিশেষ আদালতের প্রধান শায়খ আহমাদী আমার বাড়িতে এসে দেখা করেন। তিনি বলেন, দেশের চলমান সংকট নিরসনে আফগান উলামায়ে কেরামের এগিয়ে আসা উচিত। এর কিছুদিন পর ১৪২০ হিজরীর ১লা শাবান শায়খ আব্দুল আলী সাহেব কোয়েটায় অনুষ্ঠিত উলামা সম্মেলনে শরীক হয়ে বলেন, আমাকে কান্দাহারে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে আলেমদের কান্দাহারে গিয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সরকারি-বেসরকারি সব দারুল ইফতার দায়িত্বশীল আলেমদের সাথে দেখা করা উচিত এবং সেখানকার উলামায়ে কেরামের সাথে সমন্বয় করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমীরুল মুমিনীনের সামনে তা পেশ করা উচিত।

১৪২০ হিজরীর ৩রা শাবান শায়খ যাকিরী ও শায়খ আব্দুল আলীর সাথে আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল কান্দাহারে যান। তাঁরা কান্দাহারে পৌঁছানোর আগেই ইমারতে ইসলামিয়ার দারুল ইফতার দায়িত্বশীল উলামায়ে কেরাম উসামা বিন লাদেনকে চীন বা ইরানের দূতাবাসে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁদের এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপনার কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

[৭৪] আল-মীযান লি-হারাকাতি তালিবান: শায়খ শহীদ ইউসুফ উয়াইরী রহ.

কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখলাম, আমেরিকার কথা মেনে তাদের খুশি করার জন্য যদি উসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে তারা নারীদের পর্দা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করবে, হুদুদ-কিসাস বাতিল করা এবং শরয়ী শাসন বাদ দেওয়ার দাবি জানানোর মতো সাহস পেয়ে যাবে। এভাবে তারা নিরেট কুফরি শাসন প্রতিষ্ঠা করে মানবরচিত আইন চালু করার কথা বলবে এবং এমন হুকুমত কায়েম করার চেষ্টা করবে, যারা তাদের গোলামি করবে। আফগানিস্তান যখন চিন্তা-চেতনায়, আকীদা ও বিশ্বাসে, সুরত ও সীরাতে পুরোপুরি তাদের চাহিদামাফিক হয়ে যাবে, কেবল তখনই তারা আফগানদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। গোটা মুসলিম জাতি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এত শহীদের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাবে আর তারাও কুফরি শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে যাবে। এমন হলে আফগান জনগণ ও বিশ্বের মুসলিমরা আলেম ও তালেবে ইলমদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে, আর কখনো তারা তাঁদের ডাকে সাড়া দেবে না। এভাবে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। উলামা-তলাবা এবং বিশেষ করে তালেবানকে তারা আমেরিকার গোলাম মনে করবে। যদি এ রকম কিছু ঘটে, তাহলে আল্লাহ ও জনগণের সামনে এর জবাবদিহির দায়ভার একমাত্র আপনাদের ওপরই বর্তাবে।

তাই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, উসামা বিন লাদেনকে কাফেরদের কাছে হস্তান্তর করা শরীয়ত ও সিয়াসাত—উভয় দিক থেকেই অবৈধ ও নাজায়েয হবে। দয়া করে এমনটা করবেন না। কারণ, এটি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। আমরা আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

বি.দ্র. আল্লাহর পবিত্র এই দীনে সব সমস্যারই সমাধান আছে। গবেষণা করে তা বের করার দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিন আর বাস্তবায়ন করার জিম্মাদারি আপনারা পালন করুন। ওয়াস সালাম।

**স্বাক্ষর:**

'ইত্তিহাদে উলামায়ে আফগানিস্তান'-এর সদস্যবৃন্দ:

মৌলবী আব্দুল্লাহ, মৌলবী মুহাম্মাদ হানাফী, মৌলবী মুহাম্মাদ সাদিক, মৌলবী মুহাম্মাদ নুর, মৌলবী আবুল ফযল, মৌলবী হাফেয নুর মুহাম্মাদ, মৌলবী জানান আহমাদী, মৌলবী মুহাম্মাদ হক, মৌলবী আব্দুল হক হক্কানী, মৌলবী মুহাম্মাদ রইস, মৌলবী নযর, মৌলবী আগা জান, মৌলবী আব্দুল আলী, মৌলবী সায়্যিদ বার, আলহাজ মৌলবী হাফেয শাকেরুল্লাহ, মৌলবী মুহাম্মাদ রাসূল, মৌলবী উমর, মৌলবী আব্দুল ওয়াদুদ।



শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর বিষয়ে আলোচনার জন্য
আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরামের কনফারেন্স

## আমীরুল মুমিনীনের জবাব

**ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান**
**আমীরুল মুমিনীন হাফিযাহুল্লাহ'র ব্যক্তিগত অফিস**

স্মারক নং:
তারিখ: ৩রা শাবান ১৩২০ হি., ১১ই নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, আমরা ও আপনারা মিলেই পৃথিবীতে ইসলামের নাম যথাসাধ্য পুনরুজ্জীবিত করেছি। অন্যদিকে উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা ছাড়া কোনো কথাই আমেরিকা মানবে না। কিন্তু তাঁকে হস্তান্তর করা হলে মুসলমানদের হৃদয় ভেঙে যাবে এবং ইসলামের সক্ষমতা ও রাজনীতির ওপরেও বিশাল আঘাত আসবে। তা ছাড়া এখন যদি আমরা আমেরিকার প্রতি নম্রতা দেখিয়ে পরে তার কোনো কথা মানতে রাজি না হই, তখন তাদের অহমিকা আরও বেড়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য তো ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করা, বাকিটা আল্লাহর ওপর। সামনে যা হবে, তা উসামা বিন লাদেনের ইস্যু নয়; বরং ইসলাম ও কুফরের ইস্যু। তাঁকে হস্তান্তর করলে কুফরের পতাকা সমুন্নত হবে আর না করলে ইসলামের

পতাকা সমুন্নত হবে। ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার জন্য যে-কোনো বিপদকে মুসলমানদের হাসিমুখে মেনে নেওয়া উচিত। আমরা আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, সেটাই সত্য—'ইহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।'

বিনীত
খাদেমুল ইসলাম আমীরুল মুমিনীন
মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ

আফগানিস্তান থেকে শায়খ উসামাকে বহিষ্কারের বিষয়ে অন্য এক বক্তব্যে মোল্লা উমর রহ. বলেছিলেন—

> 'আমেরিকার কথামতো উসামা বিন লাদেনকে বহিষ্কার করার কোনো মানে হয় না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আমাদের ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। তাদের দাবি, আমরা যেন আরব মুজাহিদদের আফগানিস্তান থেকে বের করে দিই। তাদের কথামতো আমরা যদি আরব মুজাহিদদের আফগানিস্তান থেকে বের করেও দিই, তবু তাদের সাথে আমাদের লড়াই শেষ হবে না। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য না, যেমনটা তারা বলে; বরং আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতকে ধ্বংস করাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য। এখন যদি তাদের দাবি মেনে নিয়ে তারা যাদের চায় তাঁদেরকে বহিষ্কার করি, তবু তাদের দাবি শেষ হবে না। এরপর তারা দাবি করবে, নারীদের ব্যাপারে যেন আমাদের শরয়ী আইন পরিবর্তন করি, বিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত বিধান বাতিল করি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করি এবং শেষমেশ শরয়ী শাসনব্যবস্থাই যেন বাতিল করি। এর বাস্তব প্রমাণ হলো সুদান। তারা আমেরিকার কথামতো মুজাহিদদের বহিষ্কার করেছিল। তখন থেকে তাদের যে বিপর্যয় শুরু হয়েছে, এখনো পর্যন্ত তার সমাপ্তি হয়নি।'[৭৫]

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ শায়খ উসামার ইস্যুকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, শায়খ উসামাকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তাহলে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। আফগান জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীন মার্কিনিরা ভেবেছিল, এ কারণে শায়খ উসামা ও মোল্লা উমরের সম্পর্কে ফাটল ধরবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মহান এই দুই ইমামের সম্পর্কে ফাটল ধরা তো দূরের কথা সামান্য দুর্বলও হয়নি; বরং মোল্লা উমরের কাছে শায়খ উসামার মর্যাদা আরও

[৭৫] হাকীকতুল হারবিস সালীবিয়্যাতিল জাদীদা: ইউসুফ উয়াইরী

বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে বন্ধন ধ্বংস করার জন্য তারা চেষ্টা করছিল, তাদের সিদ্ধান্তগুলো সেই বন্ধনকেই আরও মজবুত করছিল। যে ইতিহাস তারা মুছে দিতে চাইছিল, তাদের কর্মকাণ্ড সে ইতিহাসকেই আরও গভীরভাবে গড়ে তুলছিল।

## শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যু ও আমাদের শিক্ষা

শায়খ উসামা রহ.-এর হস্তান্তর ইস্যুতে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. যে অবিস্মরণীয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। শুধু এর শিক্ষণীয় দিকগুলো নিয়েই কয়েক খণ্ডের বই লেখা যাবে। এত বিস্তৃত একটি বিষয়কে কয়েক লাইনে তুলে আনা অসম্ভব। তবু সংক্ষেপে এর কিছু শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরছি—

এক. শায়খ উসামা রহ. যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্রস্তাব করেছিলেন, এর পরিণতি কী হতে পারে তা আমীরুল মুমিনীন রহ. ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি চাইলেই শায়খের ওপর জোর খাটিয়ে তাঁর সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু ইলমে ওহীর তলাবা ও ছাত্রদের আমীরের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। তিনি বরং পুরো বিষয়টি উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দিলেন। যাতে তাঁরাই এর সমাধান করেন। আল্লাহ তাআলার আদেশও এমনই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

'অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে মতভিন্নতা তৈরি হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে উত্থাপন করো।' [সূরা নিসা (৪): ৫৯]

দুই. শায়খ উসামার হস্তান্তর ইস্যুতে তালেবান আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দিয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে ঘোষণা করেছেন—﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾। 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরে ভাই ভাই।' এই ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়িত হবে সহযোগিতা ও পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। এটি কথা ও কাজ বিবর্জিত স্লোগানসর্বস্ব কোনো বিষয় নয়; বরং সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার দাবি করে; হক প্রতিষ্ঠা, বাতিলের ধ্বংস, জালেমের প্রতিরোধ ও মজলুমকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন ও সাহায্য করতে বলে। কোনো মুসলিম অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে একাকী মোকাবিলা করবে আর অন্য মুসলিম নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে বসে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে—শরীয়ত ও যুক্তি—কোনোটির আলোকেই তা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং সর্বাবস্থায় মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা জরুরি। সে যদি বিপথে চলে যায়, তাহলে তাকে

সুপথ দেখাতে হবে; জুলুম করতে দেখলে, থামানোর চেষ্টা করতে হবে; আক্রান্ত হলে, প্রতিরোধ করতে হবে; মজলুম হতে দেখলে, তার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। এটাই হলো মুসলিমদের পারস্পরিক নুসরত ও সহযোগিতার অর্থ। আল্লাহ তাআলা এই নুসরতকেই ফরয করেছেন এবং তিনি বান্দাদের থেকে এটাই চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অনিদ্রা ও জ্বর অনুভব করে।' [সহীহ বুখারী: ৬০১১]

তিন. ফিকহের কিতাবাদিতে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, একজন মুসলিম যদি কাফেরদের হাতে বন্দি হয়, তাহলে তাকে মুক্ত করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয হয়ে যায়। তাকে যদি মুক্ত না করা হয়, তবে সকলেই গুনাহগার হয়। ফুকাহায়ে কেরামের এই বক্তব্য তালেবান মুজাহিদগণ যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। একজন মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করার ব্যাপারে যদি এত কঠোর বিধান থাকে, তাহলে মুসলিম সমাজে নিরাপদে ও সসম্মানে বসবাসকারী কোনো আশ্রয়প্রার্থী দুর্বল মুসলিমকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়া কতটা ভয়াবহ অপরাধ হবে?

চার. তালেবান উলামায়ে কেরাম ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর বক্তব্য বিষয়টিকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিয়েছিল। শুরু থেকেই তাঁরা এই যুদ্ধের প্রকৃতি ধরতে পেরেছিলেন। অথচ অধিকাংশ মানুষই বিষয়টি বুঝতে পারেনি অথবা গুরুত্ব দেয়নি। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি আমেরিকার টার্গেট না, তাদের টার্গেট হলো আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনব্যবস্থা। তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, আমেরিকার কথামতো যদি তাঁরা একবারের জন্যও নিজেদের আদর্শের প্রশ্নে সামান্য ছাড় দেন এবং শায়খ উসামাকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বলেন, তবু এই ইহুদী-নাসারারা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, তাদের দাবিদাওয়াও শেষ হবে না। ওমর আল-বশীরকে তারা যে কথাটি বলেছিল, ঠিক একই কথা তাদেরকেও বলবে যে—'এর মাধ্যমে সঠিক পথে পা ফেললেন মাত্র, সামনে আরও পথ চলতে হবে।'

উল্লেখ্য, শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াসির রহ. আস-সাহাব মিডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমীরুল মুমিনীনের খুব ঘনিষ্ঠ একজন শূরা সদস্যকে তিনি একবার বলতে শুনেছিলেন—

> 'আমেরিকা শুধু উসামাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়নি। তারা প্রায় ৩০টির মতো দাবি জানিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—শরয়ী শাসন বাতিল করা, শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন করা, সহশিক্ষা চালু করা, সেক্যুলার ব্যক্তিদের সরকারে শামিল করা, হুদুদ বাতিল করা, ভিনদেশি সকল মুজাহিদদের হস্তান্তর করা।'

আমীরুল মুমিনীন ইস্যুটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বাস্তবে তেমনই ছিল। তিনি বলেছিলেন—

> 'এটি শুধু শায়খ উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা বা না করার বিষয় নয়, এটি ইসলাম ও কুফরের বিষয়। তাই তাদের কথামতো উসামা বিন লাদেনকে বহিষ্কার করার কোনো মানে হয় না। কারণ, এতে তাদের সাথে আমাদের লড়াই কখনোই শেষ হবে না।'

পাঁচ. আমীরুল মুমিনীন ভালোভাবেই জানতেন, শায়খ উসামাকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করায় বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। এর কারণে কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তা সত্ত্বেও তিনি মাথা নোয়াতে রাজি হননি, পাহাড়সম দৃঢ়তা আর আল্লাহর ওপর নিখাদ তাওয়াক্কুল নিয়ে আমেরিকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর ওপর ভরসাকারী দীনদার মুসলিমের গায়রত কেমন হওয়া উচিত—তার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ঠিক যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন তিনি। হাজার বছর আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের নিচে চৌদ্দশ সাহাবী থেকে মৃত্যুর বাইয়াত নিয়েছিলেন শুধু একজন মুসলিমের জন্য, যাকে তিনি কুরাইশের কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন আর **গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল** যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই আদর্শই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আমীরুল মুমিনীনের মাধ্যমে। তিনিও একজনমাত্র মুসলিমের জন্য পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। শায়খ উসামাকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে তালেবানও মাত্র একজন মুসলিমের জন্য তাঁদের গোটা হুকুমতকে বিসর্জন দিয়েছিল। লোকেরা যখন আমীরুল মুমিনীনকে ভয় দেখাতে লাগল যে, তালেবানকে উৎখাত করার জন্য আমেরিকা হামলা করবে, তখন মোল্লা উমর রহ. তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—**'আল্লাহর কসম, আফগানিস্তানের প্রতিটি পাথরও যদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তবু আমি উসামাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেব না।'**

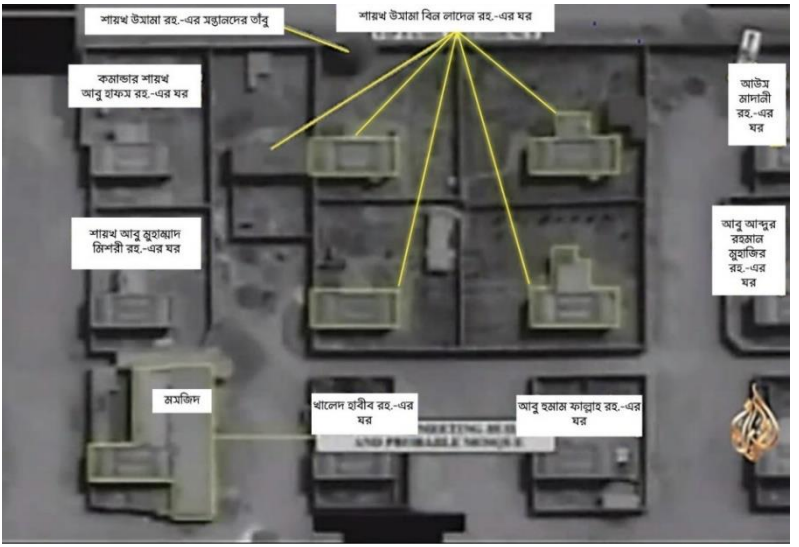
## মার্কিন ড্রোনের আনাগোনা

ইউএসএস কোলে হামলার দুই সপ্তাহ বা তারও কিছুদিন আগে[৭৬] ভাইয়েরা লক্ষ করেন, কান্দাহারে মুজাহিদদের কলোনির ওপরে একটি স্পাই ড্রোন চক্কর দিচ্ছে। শায়খ উসামা রহ. সাথে সাথে পুরো এলাকা খালি করার আদেশ করেন। সকল পরিবারকে তৎক্ষণাৎ কান্দাহার শহরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত সবাইকে একটি বড় বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ভাইয়েরা এই বাড়িটিকে 'বাইতুর রুম্মান' নামে ডাকতেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে সিআইএ'র বেশ কয়েকজন এজেন্টের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এগুলোতে দেখা যায় তারা আফসোস করে বলছে, দুইবার শায়খ উসামাকে নাগালে পেয়েও তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। কেন হত্যা করতে পারেনি—এ প্রশ্নের উত্তরে একেকজন একেক কথা বলেছে। কেউ বলেছে, তখন ড্রোনে মিসাইল ছিল না। কেউ বা এর দায়ভার হোয়াইট হাউজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। হোয়াইট হাউজ না-কি তখন শায়খ উসামার ওপর হামলা করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিল। কারণ, তার বাসস্থানের পাশেই মসজিদ ছিল। কেউ বা আবার এমন ভিত্তিহীন দাবিও করেছে যে, শায়খের সাথে তখন কয়েকজন কাতারি মেহমান ছিল। এই নির্বোধরা ভুলে যায় যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁর ওলীদের হেফাযতের সব ব্যবস্থা করে দেন।

উল্লেখ্য, ৯/১১ কমিশন রিপোর্টের ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের আকাশে প্রথমবারের মতো মার্কিন ড্রোন ওড়ানো হয়েছিল। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আফগান আইস (Afghan eyes)'। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল, শায়খ উসামা, আল-কায়েদার কোনো নেতা অথবা আল-কায়েদার ক্যামিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল অস্ত্রের গুদামের অবস্থান শনাক্ত করার চেষ্টা করা, যেন পরে সে তথ্যের ভিত্তিতে বিমান বা ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করে তার ওপর হামলা করা যায়। ড্রোনটি ১৫ বার আকাশে উড়েছিল, যার মধ্যে ১০ বারই সফল হয়েছিল।

[৭৬] বইয়ের প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল, নাইরোবি-দারুস সালাম অভিযানের দুই সপ্তাহ আগে কান্দাহারে মুজাহিদদের কলোনির ওপর স্পাই ড্রোন দেখা গিয়েছিল। মূলত নাইরোবি-দারুস সালাম অভিযানের আগে না, ইউএসএস কোলে হামলার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল।


শায়খ উসামা রহ.-এর সন্তানদের তাঁবু
শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর ঘর
কমান্ডার শায়খ আবু হাফস রহ.-এর ঘর
আউস মাদানী রহ.-এর ঘর
শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিশরী রহ.-এর ঘর
আবু আব্দুর রহমান মুহাজির রহ.-এর ঘর
মসজিদ
খালেদ হাবীব রহ.-এর ঘর
আবু হুমাম ফাল্লাহ রহ.-এর ঘর

মার্কিন ড্রোন থেকে তোলা কান্দাহার এয়ারপোর্টে আরব কলোনির ছবি



ড্রোন থেকে তোলা কান্দাহারের আরব কলোনির আরেকটি ছবি। এতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শায়খ উসামা সাদা পোশাক পরে আছেন আর তাঁর চারপাশে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী অবস্থান করছে।

## মার্কিন ডেসট্রয়ার ইউএসএস কোল-এর ওপর হামলা

আমেরিকান ক্রুসেডারদের যুদ্ধজাহাজগুলো জাযীরাতুল আরবের বন্দর থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলে যাবে, তারপর সেই জ্বালানি ব্যবহার করে ইরাকের মুসলিম ভাইদের ওপর বোমাবর্ষণ করবে—সাদ, মুসান্না ও সালাহুদ্দীনের বংশধরদের জন্য এরচেয়ে লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না। এ জন্য মার্কিন দখলদারদের এ মর্মে একটি শক্ত বার্তা দেওয়া জরুরি ছিল যে, তোমরা আমাদের হত্যা করলে আমরাও তোমাদের হত্যা করব, তোমরা আমাদের ওপর বোমা ফেললে আমরাও তোমাদের ওপর বোমা ফেলব, তোমরা আমাদের শান্তিতে থাকতে না দিলে আমরাও তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেব না। শায়েখ উসামা রহ. এই কাজের জন্য একজন অকুতোভয় বীরকে দায়িত্ব দেন—মোল্লা বিলাল (আব্দুর রহীম নাশিরী) ফাক্কাল্লাহু আসরাহু।

আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার আমীর শায়খ আবু আলী হারিসী রহ.-এর সাথে সমন্বয় করে হামলার বিস্তারিত পরিকল্পনা সাজানো হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা, নৌকা কেনা এবং বিস্ফোরক দিয়ে এটিকে প্রস্তুত করা-সহ সব কাজই তাঁর তত্ত্বাবধানে করা হয়। এডেন বন্দরে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলোর আগমন ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের পর 'ইউএসএস দ্যা সুলিভানস' নামের মার্কিন ডেসট্রয়ারের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০০ সালের জানুয়ারিতে রমযান মাসে হামলাটি করার কথা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত বিস্ফোরকের ভারে নৌকাটি ডুবে যায়। এতে অপারেশন বিলম্বিত হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদগণ ডুবে যাওয়া নৌকা থেকে বিস্ফোরকগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং সেগুলো মেরামত করে পুনরায় নৌকা প্রস্তুত করেন। কিন্তু ততদিনে 'ইউএসএস দ্যা সুলিভানস' এডেন বন্দর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এ কারণে অপারেশন আরও দেরি হয়ে যায়।

### মার্কিন ডেসট্রয়ার ইউএসএস কোল হামলার বীরগণ


জামাল আহমাদ মুহাম্মাদ বাদাবী


শায়খ ফাহাদ কাসা'


শায়খ আবু আলী হারিসী


আব্দুর রহীম নাশিরী

আল-কায়েদার বোমা বিশেষজ্ঞ আবু আব্দুর রহমান মুহাজির ভাইদেরকে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দেন। নাইরোবি ও দারুস সালাম হামলায় যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, এ অপারেশনেও একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। খাল্লাদ বিন আতাশ অপারেশনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং অগ্রগতির খবরাখবর শায়খ উসামার কাছে পৌঁছে দিতেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে অপারেশনের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। হামলার আগেই ইয়েমেনের নিরাপত্তা বাহিনী খাল্লাদ ভাইকে গ্রেফতার করে ফেলে। এতে অপারেশনের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাই শায়খ উসামা রহ. ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহকে খুব সংক্ষিপ্ত একটি চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দেন এবং খাল্লাদকে ছেড়ে দিতে বলেন। চিঠিতে শায়খ রহ. লিখেছিলেন, 'আল-কায়েদার যুদ্ধ ইয়েমেন সরকারের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু আল-কায়েদা চাইলে ইয়েমেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ শুরু করতে পারে।' শায়খের আদেশ অমান্য করার সাহস এই তাগুতের ছিল না। বাধ্য হয়েই তৎক্ষণাৎ খাল্লাদকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ সে জানত, শায়েখ উসামার হুমকি কী জিনিস।

প্রায় এক বছরের অপেক্ষা ও নজরদারির পর আল্লাহর ইচ্ছায় মার্কিন ডেসট্রয়ার 'ইউএসএস কোল'-কে হামলার নতুন টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে আল-কায়েদা অসম যুদ্ধ (অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারফেয়ার)-এর নতুন একটি পর্বের সূচনা করে। আল-কায়েদার জন্য এটাই ছিল প্রথম কোনো নৌ-অভিযান। আল্লাহর তাওফীকে মুজাহিদগণ মার্কিন রণতরী 'ইউএসএস কোল'-এ আঘাত হানতে সক্ষম হন। মার্কিন সেনাবাহিনী ও মিডিয়া এই যুদ্ধজাহাজকে একাই একটি বাহিনীর সমান ও অপরাজেয় হিসেবে তুলে ধরত। এর ধারণক্ষমতা ছিল ৮৬০০ টন, সেই সাথে ৩৫০ জন মানুষও বহন করতে পারত। এক বিলিয়ন ডলার থেকেও বেশি ছিল এর মূল্য।[৭৭]

২০০০ সালের ১২ই অক্টোবর। মার্কিন ডেসট্রয়ার 'ইউএসএস কোল' জ্বালানি সংগ্রহের জন্য এডেন উপকূলে নোঙর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় বিস্ফোরক ভর্তি একটি নৌকাকে তার দিকে ছুটে যেতে দেখা যায়। নৌকাটি দেখতে বেশ সাধারণ, স্থানীয় কৃষকদের ব্যবহৃত ট্রাক্টরের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে নৌকাতে। হাসসান তায়েফী ও নিবরাস সানআনী নামের দু'জন মুজাহিদ নৌকাটি চালাচ্ছিলেন। জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে বিকট শব্দে নৌকাটি বিস্ফোরিত হয়। ফলে জাহাজের মধ্যে ১২ মিটার ব্যাসের একটি ফাটল তৈরি হয় এবং

[৭৭] আল্লাহু আকবার, খারিবাত আমরিকা : ফারিস যাহরানী

জাহাজের মধ্যেও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৮ জন মার্কিন নাবিক নিহত হয়, আহত হয় ৩০-এর অধিক।[৭৮]

বন্দরের কাছের একটি হোটেল থেকে পুরো অপারেশন ভিডিও করার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। ফাহাদ কাসা ভাইকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। তাই ভিডিও ধারণ করতে পারেননি। বিস্ফোরণের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে।

শায়েখ উসামা রহ. অপারেশনের সংবাদ শোনার সাথে সাথে তাঁর কালাশনিকভ রাইফেল বের করে আকাশে কয়েক রাউন্ড ফায়ার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন—'মিহদার, এটি আপনার রক্তের বদলা। মিহদার, এটি আপনার রক্তের বদলা।' আমেরিকানদের থেকে শায়খ আবুল হাসান মিহদার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পেরে তিনি আনন্দিত ছিলেন। শায়খ আবুল হাসান মিহদারকে মার্কিনিদের নির্দেশে তাদের এজেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ হত্যা করেছিল।

শায়খ উসামা রহ.-এর দূরদর্শিতা লক্ষ করার মতো। তিনি ইয়েমেনকে দুর্বল মুজাহিদদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। মুজাহিদরা যেন ইয়েমেনকে ব্যবহার করে আশপাশের দেশগুলোতে সহজে যাতায়াত করতে পারেন, সে জন্য ইয়েমেনের মুজাহিদদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইয়েমেনকে যেন শান্ত রাখা হয় এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রম যেন এখানে না চালানো হয়। ইয়েমেনের ব্যাপারে তাঁর এই নীতি সত্ত্বেও শায়খ আবুল হাসান মিহদারের প্রতিশোধ নিতে তিনি ভোলেননি।

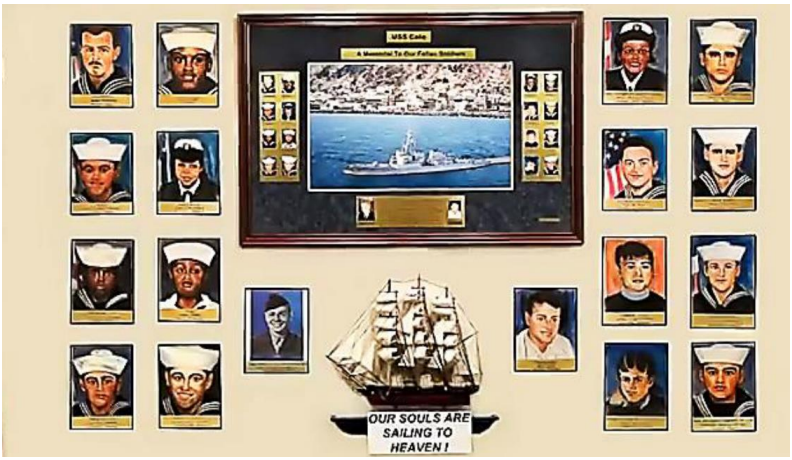



শায়খ আবুল হাসান মিহদার রহ.

[৭৮] শায়খ রিফায়ী ত্বহা লিখিত প্রবন্ধ 'যরবুল মুদাম্মিরাহ কোল: দুরুস ওয়া ইবার' থেকে সংগৃহীত ও ঈষৎ পরিমার্জিত




বিস্ফোরণের পর ইউএসএস কোলের চিত্র



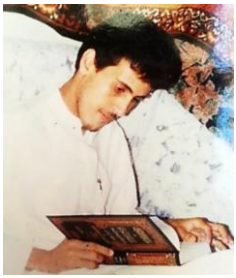

হামলায় নিহত মার্কিনিদের তালিকা

আমরা পূর্বেও বলেছি, ইয়েমেনের পরিস্থিতি শান্ত রাখার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, কাল্পনিক মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে এখানে জিহাদ বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেমনটা অনেকে মনে করে থাকে। এর পেছনে শায়েখের অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো—জিহাদের দ্ব্যর্থহীন ও সর্বসম্মত একটি রূপরেখা তৈরি করে ইয়েমেনের সাধারণ মুসলমান ও দাঈদের মধ্যে তার পক্ষে জনমত গঠন করা। শায়খের ইচ্ছা ছিল, ইয়েমেনের জনসাধারণ, বিশেষ করে

মুজাহিদদেরকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জিহাদের স্বচ্ছ, গভীর ও বিস্তৃত একটি দর্শন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই দর্শনটি ছিল—আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করা, যারা ফিলিস্তিন ও হারামাইনের পবিত্র ভূমি দখল করে রেখেছে।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শায়খ যে স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছিলেন, তা হলো—আরব সাগর দিয়ে যাতায়াতকারী মার্কিন ও ইউরোপীয় জাহাজ বা তেলবাহী ট্যাংকারের ওপর হামলা করে তাদের অর্থনীতিতে আঘাত করা। এর পেছনে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক. মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন বন্ধ করা। দুই. আমেরিকাকে এমন সংকটে ঠেলে দেওয়া, যেন সে বাধ্য হয়ে আরবের ক্ষমতাসীন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে এ সব সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবে। এভাবে এ সব দেশের ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে চলে আসবে। এই স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতেই আল-কায়েদা মার্কিন রণতরী 'ইউএসএস কোল' এবং ফ্রান্সের তেলবাহী জাহাজ 'এমভি লিমবার্গ'-এর ওপর হামলা করেছিল। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী আরও অনেক হামলা করা হয়েছে, যেগুলো আজ অবধি প্রকাশ করা হয়নি।

পরিকল্পনা মোতাবেক এই অভিযানে শায়খ আবু বাসীর (নাসের আব্দুল করীম উহাইশী) রহ.-এরও শরীক হওয়ার কথা ছিল। হামলার প্রস্তুতি শেষে অপারেশনের দায়িত্বশীল ভাই যখন কেন্দ্রে যোগাযোগ করে অভিযান পরিচালনাকারীদের পাঠাতে বলেন, তখন শায়েখ আবু বাসীর রহ.-ও ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য করাচি এসে পৌঁছান। তিনি যখন করাচিতে ভিসা-পাসপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন কেন্দ্র থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে কান্দাহার ফিরে যেতে বলা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, ইয়েমেন থেকে ভাইয়েরা জানিয়েছেন, অপারেশন পরিচালনার জন্য কাউকে পাঠাতে হবে না। কারণ, হাসসান তায়েফী (মুয়াজ খামিরী) ও নিবরাস সানআনী (ইবরাহীম সাওর) নামের দু'জন ভাই অপারেশনের নৌকা তৈরি করেছেন এবং তাঁরা অনুরোধ করেছেন, অন্য কাউকে যেন এই অপারেশনের দায়িত্ব না দেওয়া হয়। তাঁরাই অপারেশন পরিচালনা করতে চান। তাই ভাইয়েরা তাঁদেরকেই অপারেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন। এ কারণে শায়খ আবু বাসীর রহ. এ অভিযানে শরীক হতে পারেননি।



নিবরাস সানআনী
(ইবরাহীম সাওর)



শায়খ আবু বাসীর (নাসির আব্দুল করীম উহাইশী)

'ইউএসএস কোল' ধ্বংস করতে মুজাহিদদের ১০ হাজার ডলারের বেশি খরচ হয়নি। কিন্তু হামলার পর এটি মেরামতের জন্য নিয়ে যাওয়া, মেরামত করে এর কার্যকারিতা পুনর্বহাল করা-সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকা শত শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। তা ছাড়া এ হামলার কারণে মার্কিন সেনাবাহিনী, তাদের সামরিক সরঞ্জাম ও প্রবাদপ্রতিম ডেসট্রয়ারের সুনাম-সুখ্যাতিও ধুলোয় মিশে গেছে। এই অভিযানের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি আমেরিকা বাধ্য হয়ে তার ডেসট্রয়ারের চলাচলের রুট গোপন রাখা শুরু করেছে। আগে যেখানে বুক ফুলিয়ে ডেসট্রয়ার নিয়ে গর্ব করত, এখন রাতের আঁধারে চুপিচুপি তা চালিয়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই হামলার পর উপসাগরীয় অঞ্চলে নিয়োজিত মার্কিন নেভাল ফোর্সের সক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বাড়ানো হয়েছে এবং মার্কিন জাহাজগুলোকে সুয়েজ খাল দিয়ে পারাপারের ব্যাপারে কঠোর নিরাপত্তা মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছে।[৭৯]

মার্কিন প্রশাসন যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, অসম যুদ্ধ (Asymmetric warfare) ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তাই এই ঘটনার তদন্তে লম্বা সময় ব্যয় করছিল। এমনকি তাৎক্ষণিকভাবে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল কোনো অভিযোগও তারা করেনি। এভাবে বিষয়টি বিলম্বিত হতে হতে ক্লিনটনের সময় ফুরিয়ে আসে এবং তার আমলে নতুন এই অসম যুদ্ধে জড়ানো থেকে সে নিজেকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখে।

ইউএসএস কোলের এই হামলা নিয়ে শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফি. একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। শায়খ উসামা রহ. বিভিন্ন প্রোগ্রামে কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। পাঠকদের জন্য কবিতাটি তুলে ধরা হলো—

[৭৯] শায়খ রিফায়ী ত্বহা লিখিত প্রবন্ধ 'যরবুল মুদাম্মিরাহ কোল: দুরুস ওয়া ইবার' থেকে সংগৃহীত ও ঈষৎ পরিমার্জিত

**أيا فتية الإسلام يا عطر أمتي ... إليكم تحياتي من المجد أعطر**

উম্মাহর সৌরভ হে মুসলিম তরুণেরা, তোমাদের জানাই গৌরবময় খুশবুমাখা সালাম

**أحيي فيكم عزمكم وجهادكم ... وإعلاء دين الله والظهر أحمر**

তোমাদের জযবা ও জিহাদকে, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য তোমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে জানাই লাল সালাম।

**وثبتم إلى الأقص وقد غدروا به ... أخذتم بثأر القدس والشرق ينظر**

তোমরা আকসার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছ, যখন সবাই আকসার সাথে গাদ্দারি করেছে; তোমরা কুদসের হয়ে বদলা নিয়েছ, যখন পুরো প্রাচ্য নির্বিকার চেয়ে আছে।

**فأيقظتم التاريخ بعد رقاده ... فعاد إلى أُمجاده يتذكر**

তোমরা মৃত ইতিহাসে প্রাণসঞ্চার করেছ, তাই তো আজ সে পুরোনো দিনের কথা গর্বভরে স্মরণ করছে।

**فهذا صلاح الدين يحمل سيفه ... تسيل دماء الكفر منه وتقطر**

এ যেন জলজ্যান্ত সালাহুদ্দিনের তরবারি, কুফরের রক্ত ঝরে পড়ছে তা থেকে।

**فعادت لنا حطين بعد غيابها ... وعادت إلى الأذهان بدروخيبر**

বহুদিন পর হিত্তীন যেন ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে, ফিরে এসেছে বদর ও খায়বারও যেন।

**وذي أمة الإسلام جاش ضميرها ... قد انتفضت تسعى تثوروتثأر**

উম্মত যেন ফের জেগে উঠেছে, প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে তার মাঝে।

**وإخو انكم في الشرق شدوا سروجهم ... وكابل شدت والنجائب ضمر**

প্রাচ্যেও তোমাদের ভাইয়েরা ঘোড়ার জিন বাঁধছে, কাবুলেও তৈরি হচ্ছে বীরদের দল।

**ونجد بها هب الشباب مجاهدا ... وفي عدن هبوا وشدوا ودمروا**

নজদের জোয়ানরাও পিছিয়ে নেই, এডেনেও তারা আঘাত হেনেছে

**مدمرة يخشى أولوا البأس بأسها ... تزيدك رعبا حين ترسو وتبحر**

এমন রণতরীর ওপর শক্তিমানরাও যাকে দেখে ভয় পায়, যখন তা থেমে থাকে বা চলতে শুরু করে।

**تشق عباب البحر يحدوا مسيرها ... غرور وزهو و اقتدار مزور**

সাগরের উত্তাল ঢেউ চিরে যখন তা এগিয়ে চলে, গর্ব, দম্ভ আর ক্ষমতার বড়াই তাকে ছেয়ে রাখে। কিন্তু সবই মিথ্যা।

**إلى حتفها تسعى حثيثا بظلفها ... بوهم كبير كاذب تتدثر**

এমনই অহমিকা নিয়ে সেদিনও ছুটে চলছিল সে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে,

**إلى زورق يلهو به الموج يختفي ... مع الموج حينا ثم يبدو ويظهر**

যা দৃশ্যমান হয়েছিল ক্ষুদ্র একটি নৌকারূপে। ঢেউয়ের মাঝে যা কখনো হারিয়ে যায়, কখনোবা জেগে ওঠে।

**تداعبه الأمواج في كل خفة ... ورب خفيف منه يخشى ويحذر**

উত্তাল ঢেউয়ের কাছে তা যেন হালকা কিছু, অনেক হালকা জিনিসকেও ভয় করে চলতে হয় বটে।

**فلما التقى الجمعان جمع محمد ... شهيدان باسم الله هبوا وكبروا**

দুই বাহিনী যখন মুখোমুখি, একদিকে মুহাম্মদের বাহিনী, যাতে আছে দুজন শহীদ, যারা আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়েছে,

**وجمع من الكفار جيش يقودهم ... بحقد صليبي المنابع قيصر**

আর অন্যদিকে কুফফার বাহিনী, যারা কায়সারী দম্ভ আর ক্রুসেডের হিংসা নিয়ে পানিতে নেমেছে।

**ودارت رحى الحرب التي لم تكن سوى ... ثوان رعب بل أقل و أقصر**

ঠিক তখন যুদ্ধ শুরু হলো, ভয় ও ধ্বংসের কয়েক সেকেন্ডমাত্র বা আরও কম যেন।

**وكان مع النصر المحقق موعد ... فلم يتقدم لا ولم يتأخر**

নিশ্চিত বিজয়ের ওয়াদা ছিল, যার ব্যত্যয় ঘটেনি।

**فطارت رؤوس الكفر في كل وجهة ... وأشلاءها من حولها تتبعثر**

যখন সে ক্ষণ এলো, কাফেরদের ছিন্ন মস্তক আর লাশের টুকরোগুলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

**فلو شهدت عيناك من ذاك منظرا ... تقر به أو أسعد القلب منظر**

সে দৃশ্য যদি দেখতে, তোমার মন জুড়িয়ে যেত আর হৃদয়ও প্রশান্ত হতো।

**فهل سمع التاريخ عن مثل صحبنا ... وهل أبصرت عيناه أو سيف تبصر**

ইতিহাস কি কখনো দেখেছে আমাদের বীরদের মতো কাউকে অথবা কোনোদিন দেখবে? অথবা শুনেছে কি এমনকিছু?

**وقفتم وما في الموت شك لو اقف ... وحطمتم الأوهام والوهم يكسر**

হে বীর শহীদেরা, তোমরা এমন ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলে, যেখানে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি। তোমরা ছিন্ন করেছ কল্পনার সব মিথ্যা জাল আর কল্পনা তো ছিন্ন হবেই।

**شفيتم صدور المؤمنين وأمة ... على عتبات الكفر تسبى وتنحر**

যখন এই উম্মত কাফেরদের হাতে প্রতিনিয়ত বন্দি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, সেই কঠিন মুহূর্তে তোমরা মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত করেছ।

## ওয়েপন অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন বা WMD (গণবিধ্বংসী অস্ত্র)

আমেরিকা যতগুলো যুদ্ধ করেছে, প্রতিটি যুদ্ধেই তার কাছে থাকা সব ধরনের অস্ত্রই সে ব্যবহার করেছে। সাধারণ বুলেট থেকে শুরু করে ক্রুজ মিসাইল, GBU-43/B বা মাদার অফ অল বোম্ব, ডিইউ (ডিপ্লিটিড ইউরেনিয়াম) শেল, এমনকি পারমাণবিক বোমা পর্যন্ত সে ব্যবহার করেছে। শায়খ উসামা রহ. যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, তাদের সাথে তাদের মতোই আচরণ করা হবে। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—

**وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ**

'তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত করো, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে।' [সূরা আনফাল (৮) : ৬০]

সবকিছু বিবেচনা করে আল-কায়েদার জন্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করা ছাড়া উপায় ছিল না। যেন ইস্তিশহাদী হামলার হাতিয়ারের পাশাপাশি আল-কায়েদার হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রও থাকে। কখনো প্রয়োজন হলে যেন তা ব্যবহার করা যায়। আল-কায়েদা অনেক আগে থেকেই এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে আসছিল। সেটা কেনার মাধ্যমেই হোক বা নিজেরা তৈরির মাধ্যমে হোক। আমেরিকার আগে-পরের সব প্রশাসনের জন্যই এই ব্যাপারটা ছিল সবচেয়ে আতংকের।

আল-কায়েদা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই আবু আব্দুল আযীয মিসরী (আলী সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুস্তফা বাকরী) রহ.-কে এ বিষয়ে গবেষণার দায়িত্ব দিয়েছিল। কেমিস্ট্রি ছিল তাঁর

গবেষণাক্ষেত্র। আল-কায়েদার অস্ত্র গবেষণা নিয়ে অনেক বানোয়াট গল্প প্রচলিত আছে। যেমন: অনেকে বলে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের নির্দেশে একদল ইরাকি গবেষক আল-কায়েদার জন্য গবেষণা করত, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কান্দাহারে মুজাহিদদের কলোনির মধ্যেই আবু আব্দুল আযীয ভাইয়ের সমৃদ্ধ একটি কেমিস্ট্রি ল্যাব ছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড ও নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ছিল। একদিকে ৯/১১-এর জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি চলছিল, অন্যদিকে আবু আব্দুল আযীয লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গবেষণার মধ্যে একটি ছিল—সায়ানাইড গ্যাসকে ম্যাস ডিস্ট্রাকশন ওয়েপনে রূপান্তর করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা। প্রাথমিকভাবে একটি কুকুরের ওপর এটি পরীক্ষা করা হলে কুকুরটি দ্রুত মারা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই গবেষণা ফলপ্রসূ হবে। ফিল্ড অপারেশনে এক ধরনের বিশেষ বিস্ফোরক গ্যাস ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়েও তিনি একটি গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু ৯/১১-এর পর পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার কারণে এ নিয়ে আর গবেষণা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুল কাদির খানের সঙ্গেও আবু আব্দুল আযীয ভাইয়ের গোপন যোগাযোগ ছিল।

আবু আব্দুল আযীয ভাইয়ের মনোবল ছিল আকাশচুম্বী। এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি বিদেশে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শায়খ উসামা রহ. গ্রেফতারির আশঙ্কায় তাঁকে অনুমতি দেননি। কারণ তিনি জানতেন, ৯/১১-এর পর বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যাবে।



আবু আব্দুল আযীয মিসরী রহ.

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, শায়খ উসামা রহ.-এর অনুসন্ধানের জন্য গঠিত সিআইএ'র বিশেষ ইউনিট অ্যালেক স্টেশনের সাবেক প্রধান মাইকেল শইয়ার তার বই 'Imperial Hubris'-এ একাধিকবার এ সম্ভাবনার কথা লিখেছেন যে, আল-কায়েদা

আমেরিকার বিরুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

> 'বইটি লেখার সময় এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, আল-কায়েদা আবারও আমেরিকার ওপর হামলা করবে। আর সামনের এই হামলাটি ৯/১১-এর তুলনায় অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক হবে। সে হামলায় গণবিধ্বংসী অস্ত্রও ব্যবহার করা হতে পারে।'

## একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন

গুয়ান্তানামো কারাগার চালু হওয়ার পর শুরুর দিনগুলো আমাদের জন্য অনেক দুর্বিষহ ছিল। ৯/১১-এর রেশ তখনও কাটেনি। টুইন টাওয়ার আর পেন্টাগনের বিধ্বস্ত ভবন থেকে পাক দিয়ে ওঠা ধোঁয়ার দৃশ্য তখনও মার্কিন সৈন্যদের স্মৃতিতে জীবন্ত। তাই আমাদের প্রতি তখন তাদের আচরণ ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। তাদের দৃষ্টি, কথা আর গালি থেকেই আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ত। কিন্তু আল্লাহর রহমত আমাদের সাথে ছিল। আর ছিল বিভিন্ন টেলিভিশন ও মিডিয়ার সাংবাদিকরা, যারা কারাগারের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত নিউজ করত। এই সাংবাদিকরা না থাকলে, তারা আমাদের চিবিয়েই খেয়ে ফেলত।

সেই ভয়ংকর ও অনিশ্চিত সময়েও আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুলে যাননি। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন ইশারা-ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দিয়ে আমাদের মনোবল চাঙ্গা করার খোদায়ী ইন্তিজাম হতো। তেমনই একবার আমরা দেখলাম, আকাশে মেঘ জমছে। মেঘগুলো পরস্পরে মিলে একটি দৃশ্যপটের রূপধারণ করল। পরক্ষণেই তাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারাগারে থাকা সবাই এই অপার্থিব দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল। এমনকি যে-সব মার্কিন-আরব দোভাষী আমাদের সাথে ছিল, তারাও দেখেছিল। এই দৃশ্য আমাদের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে। আমাদের মনোবল ও ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, আল্লাহর ইচ্ছায় অচিরেই আমরা মুক্ত হব।

তখন অনেক মুজাহিদ ভাই সুন্দর সুন্দর স্বপ্নও দেখতেন। ঈমানদারদের সে স্বপ্নগুলো শুনে আমরা এ পথে অবিচল থাকার প্রেরণা পেতাম। একবার এক ভাই এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন স্বপ্নটি বাস্তব হয়। উম্মতে মুসলিমার জন্য সুসংবাদস্বরূপ স্বপ্নটি আমি এখানে উল্লেখ করছি। আমেরিকানদের জন্য এতে আগাম সতর্কবার্তা রয়েছে। যে ভাই স্বপ্নটি দেখেছিলেন, তিনি হারামাইনের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বলেন—আমি একবার স্বপ্নে দেখি, শায়খ উসামা রহ. একটি উঁচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বড় একটি পাথর ঠেলে চূড়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। শায়খ রহ. অনেক কষ্টে খুবই ধীরগতিতে

পাথরটিকে ঠেলে ওপরে তুলছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাথরটিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হন। পাহাড়ের নিচে অপর পাশে ছিল আমেরিকা। শায়খ রহ. [পাথরটিকে গড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে] পাশে থাকা একজন মুজাহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তাদের ওপর এমন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি, যার ভয়াবহতা তাদেরকে ৯/১১-এর স্মৃতিও ভুলিয়ে দেবে।"'

## শত্রুর প্রতি সতর্কবার্তা

হে আমেরিকা, তোমাদের পূর্বসূরী কায়সার ও কিসরা নিজেরা যখন কোনো স্বপ্ন দেখত বা তাদের নিয়ে কেউ কোনো স্বপ্ন দেখত, সে স্বপ্ন নিয়ে তারা হাজারবার চিন্তা করত, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যাখ্যাকারদের কাছে ধরনা দিত। বিশ্বাস না হলে মিশরের ফেরাউন, বাবেলের সম্রাট নেবুচাদ নেজার বা ইয়েমেনের রাজা রবীআ বিন নাসরের স্বপ্নের ইতিহাস পড়ে দেখো।

কেউ বলতে পারে, আপনি যে স্বপ্নের কথা বলছেন, সে স্বপ্ন দেখার পর তো ২০ বছর কেটে গেছে, কিন্তু ৯/১১-এর মতো কিছুই তো ঘটেনি। তাদের বলছি, স্বপ্ন যে সত্য হবেই এ কথা আমি বলছি না। বরং নেকফালি ও আল্লাহর প্রতি সুধারণা থেকে আমরা বিশ্বাস করি, এটি একটি ভালো স্বপ্ন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দেরিতে হলেও তা সত্য হবে। স্বপ্ন প্রতিফলিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ আ.-এর [সূর্য, চাঁদ ও ১১টি তারকাকে সিজদাবনত দেখার] স্বপ্ন অনেক মুফাসসিরের মতে ৪০ বছর পর বাস্তবায়ন হয়েছিল।

এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহর কসম, ইতিহাসের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া কোনো ঘটনা ঘটবে। এ স্বপ্ন বলে, পর্দার আড়ালে বড় কিছুর পরিকল্পনা চলছে। এমন কোনো কিছু, যা বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু কল্পনার চেয়েও ধীরে আর সব বাধা ডিঙিয়ে তা এগিয়ে চলছে। তোমাদের হাজার স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থাও তা ঠেকাতে পারবে না। কারণ, দিনশেষে তা বাস্তবায়ন হবেই। হে আমেরিকা, তোমাদের ভালোর জন্য বলছি, এই স্বপ্নের কথাগুলো আরও একবার পড়ে দেখো। পড়ে দেখো তোমাদের উদ্দেশ্যে লেখা শায়খ উসামার তৃতীয় চিঠি; ২০০৬ সালের ২০শে জানুয়ারি যা 'আস-সাবীল লি-ইনহাইল হারব (যুদ্ধ থামানোর উপায়)' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সে চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—

> 'আমেরিকাতে অনেকদিন ধরেই ৯/১১-এর মতো আর কোনো হামলা হচ্ছে না। এমনটা মনে কোরো না যে, তোমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থার সফলতার কারণে নতুন কোনো হামলা হচ্ছে না; বরং বেশকিছু অপারেশন প্রস্তুতিপর্বে রয়েছে। প্রস্তুতি শেষ হলে সেগুলোর

প্রতিক্রিয়া তোমরা নিজ দেশেই দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ। দিন-রাতের পরিবর্তন ততদিন বন্ধ হবে না, যতদিন না আমরা ৯/১১-এর মতো আরও প্রতিশোধ গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।'

হে আমেরিকা, তোমাদের ভূমিতে ভবিষ্যতে যে অপারেশনগুলো হবে, সে সম্পর্কে আমার কাছে আগাম কোনো সংবাদ আছে, বিষয়টি তা নয়। আল্লাহর কসম, এ ব্যাপারে কোনো তথ্যই আমার কাছে নেই আর থাকার সম্ভাবনাও নেই। কারণ, তোমরা জানো, ১০ বছরেরও বেশি সময় আমি তোমাদের জেলেই বন্দি ছিলাম। বরং এই কথা আমি বলছি আল্লাহর প্রতি সুধারণা থেকে। আমরা মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আর এমনই একটি সহীহ হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানিতে বলেন—'আমার প্রতি বান্দার সুধারণা আমি পূর্ণ করি। এখন বান্দার ইচ্ছা, সে আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা ধারণা করতে পারে।'

আল্লাহর প্রতি সুধারণা যে বাস্তব হয়, তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাদের বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন আর আমেরিকা আমাদের পরাজয়ের ভয় দেখাচ্ছে; আমরা দেখব, কার কথা সত্য হয়।' কথাগুলো যখন তিনি বলেছিলেন, তখন তাঁরা ইতিহাসের কঠিনতম আর নিজেদের দুর্বলতম সময় পার করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাঁর সুধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরিশেষে মুত্তাকীরাই বিজয়ী হবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর সুধারণার মর্যাদা রেখেছেন। মোল্লা উমরের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে, আমেরিকা পরাজিত হয়েছে। আজ ২০ বছর পর তোমাদের সেনাবাহিনী নাকে খত দিয়ে আফগানিস্তান থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছে।

যেভাবে মোল্লা উমরের ধারণা আল্লাহ বাস্তবায়ন করেছেন, শায়েখ উসামার স্বপ্নও আল্লাহ বিফলে যেতে দেবেন না। দু'দিন আগে হোক বা পরে হোক, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে প্রতিফলিত হবেই ইনশাআল্লাহ। এর কারণ তোমরা নিজেরাই। তোমাদের স্বভাব-চরিত্র এখনো আগের মতোই আছে। তোমরা এখনো ডুবে আছো নিজেদের রঙিন জগতে। তোমাদের দম্ভ-অহংকার এখনো কমেনি। কাউকে সমীহ করার মানসিকতা এখনো অর্জন করতে পারনি। তোমরা এখনো সেই পুরোনো শোষণের রাজনীতি অব্যাহত রেখেছ। অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রকে এখনো তোমরা মদদ দিয়ে যাচ্ছ। যে-সব কারণে শায়খ উসামা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন, নিজের প্রতিটি সাক্ষাৎকার আর বিবৃতিতে তোমাদের যে অপরাধগুলোর কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, আমেরিকা ও আমেরিকার বাইরের অসংখ্য লেখক-গবেষক যা নিয়ে কলম ধরেছেন, সে সব অপরাধ এখনো তোমাদের মধ্যে বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য অশনিসংকেত। স্বজাতির অসংখ্য জওয়ানদের রক্ত ঝরিয়ে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস করে আর সম্মান হারিয়েও তোমাদের শিক্ষা হয়নি।

ইংরেজি প্রবাদ আছে—'Wise men learn by other men's mistakes; fools by their own.' যার অর্থ: জ্ঞানীরা শেখে অন্যের ভুল থেকে আর বোকারা শেখে নিজে ভুল করে। হে আমেরিকার জনগণ, তোমরা তাহলে কোন দলে? তোমরা কি বুদ্ধিমান, যারা অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়? না-কি তোমরা বোকা, যারা শিখবে নিজেরা ভুল করে। না-কি এরচেয়েও অধম, যে কি না অন্যের ভুল থেকে তো শেখেই না, নিজের ভুল থেকেও শেখে না?

ব্রিটিশ ও রুশরাও আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছিল। তাদের পরিণতি দেখেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি। নিজেরা ভুল করার আগ পর্যন্ত তোমরা শিক্ষা নিতে চাওনি। আফগানিস্তান যে সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান—এই কথাটুকু বুঝতে তোমাদের ২০ বছর লেগেছে। কিন্তু এখনো তোমরা যে বিষয়টি বুঝতে পারনি, তা হলো আফগানিস্তানে আসাটা ছিল তোমাদের জন্য শায়েখ উসামার পয়লা সবক। আর কত বছর, কত দশক গেলে সেই ক্ষণ আসবে, যখন তোমাদের প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সামনে এসে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলবে, আজ এত বছর পর আমরা উসামার দেওয়া ওয়াদার যথার্থতা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, 'ততদিন পর্যন্ত আমরা শান্তি পাব না, যতদিন না ফিলিস্তিনে থাকা উসামার ভাইয়েরা শান্তিতে থাকবে এবং মুহাম্মাদের ﷺ ভূমি থেকে আমাদের সব সৈন্য বের হয়ে আসবে।'

## আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের গল্প

শায়খ উসামা রহ. নিয়মিত ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলোর পরিদর্শনে যেতেন এবং নবাগত ভাইদের সাথে মুলাকাত করতেন, উম্মতের অবস্থা নিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। উম্মতের ওপর চেপে বসা জালেম শাসক, যারা মানবরচিত আইনে শাসন করছে; মুসলিমদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্ব, হারামাইনের মাটিতে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন, ফিলিস্তিন ও আল-আকসায় কয়েক দশকের ইহুদী দখলদারিত্ব ও দমন-পীড়ন-সহ নানা বিষয় নিয়ে শায়খ কথা বলতেন। যে বিষয়গুলো নিয়ে শায়খ রহ. অনেক বেশি কথা বলতেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল আসহাবে উখদুদের বালকের ঘটনা। শায়খ রহ. এ-সংক্রান্ত হাদীসের আলোকে বিভিন্ন নসীহত ও শিক্ষার কথা বলতেন। যেমন: কালিমার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, বিজয় শুধুই পার্থিব কর্তৃত্বলাভের নাম নয়, যেমনটা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস; বরং প্রকৃত বিজয় হলো আদর্শের ওপর অটল থাকা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে শায়খ বলতেন—

> 'আল্লাহ তাআলা আসহাবে উখদুদের শহীদদের প্রশংসা করেছেন, কুরআনুল কারীমে তাদের কথা উল্লেখ করে তাঁদের ইতিহাসকে অমর বানিয়ে দিয়েছেন। কেন? কারণ,

তাঁরা ঈমানের ওপর অবিচল ছিল। কোনো মুসলিম কিন্তু কখনো বলবে না যে, এভাবে জীবন দিয়ে তাঁদের কী লাভ হলো? নিরেট মূর্খ ছাড়া এমন প্রশ্ন কেউ করবে না। কারণ, তাঁরা আসলেই সফল। আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জান্নাত পেয়ে তাঁরা কামিয়াব। সুতরাং শুধু পার্থিব সফলতার নাম বিজয় নয়। আসল বিজয় হলো ঈমান ও আদর্শের ওপর টিকে থাকা। আমাদের দীনে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো ঈমান, যেমনটা রাসূলের হাদীসে এসেছে। তাই, কেবল ইলম অর্জনই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়; বরং ইলমের সাথে আমল থাকা জরুরি। কারণ, ইলম ও আমল মিলেই হলো ঈমান। ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক যে কতটা গভীর, তা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—'যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে, সে মুমিন; যে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে, সে-ও মুমিন আর যে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে, সে-ও মুমিন। এর নিচে সরষেদানা পরিমাণ ঈমানও আর নেই।' [সহীহ মুসলিম : ৫০]

শায়খ রহ.-এর উদ্দেশ্য ছিল, যুবকদের হৃদয়-গভীরে জিহাদ ও জিহাদের পথে অবিচল থাকার মর্ম গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া এবং বর্তমান সময়ের ফরযে আইন এই জিহাদের বিষয়ে উদাসীন থাকার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা। এ জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা শোনাতেন।

একবার হেলমান্দের আল-ফারুক ক্যাম্পে শায়খ রহ. একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতায় কাব বিন মালেক রাযি.-এর তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার হাদীসটি আলোচনা করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ, সেই বক্তৃতায় শায়খ রহ. হাদীসের বেনজির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পরেও জিহাদ না করে বসে থাকার ব্যাপারে সুগভীর আলোচনা করেছিলেন। শায়খের সেই বক্তৃতাটি রেকর্ড করা হয়েছিল। পরে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সৌদি আরবের তালেবে ইলমদের মধ্যেও দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়। শায়খের কথা তাদের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে যে—'জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন যে ব্যক্তিই ওজর ছাড়া জিহাদ না করে বসে থাকবে, সে গুনাহগার হবে। সে যে-ই হোক না কেন।'

ঐতিহাসিক এই বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে আরবের অনেক তালেবে ইলম, যারা বড় বড় শায়খদের থেকে ইলম অর্জন করছিলেন, তাঁরা আফগানিস্তানে চলে আসেন। তাঁরা যখন শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে মুলাকাত করতেন, তাঁর কথা শুনতেন, জিহাদ ও মুজাহিদদের ব্যাপারে তাঁদের এতদিনের লালিত চিন্তাভাবনা আমূল পালটে যেত। জিহাদবিমুখ উলামা-মাশায়েখ জিহাদের ব্যাপারে যে সন্দেহ-সংশয় তাদের মধ্যে তৈরি করেছিলেন, সেগুলো

মুহূর্তেই দূর হয়ে যেত। ফলস্বরূপ তাঁরা দেশে ফিরে যাওয়ার চাইতে আফগানিস্তানে থেকে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিতেন। মুসলিম দেশগুলো দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা শায়েখ উসামার হাতে বাইয়াত হতেন। একটি বিষয় না বললেই নয়, ৯/১১ হামলায় যারা শরীক হয়েছিলেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ছিলেন এই সকল তালিবুল ইলম ভাইয়েরা। তারা এমন সব বিখ্যাত শায়েখদের ছাত্র ছিলেন, যাদেরকে সারা দুনিয়ার মানুষ একনামে চেনে।

যুবকদের চিন্তাধারায় এমন পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করে উল্লিখিত শায়খগণ এক মুজাহিদ ভাইয়ের মাধ্যমে শায়খ উসামার কাছে একটা চিঠি পাঠান। রুশবিরোধী জিহাদের সময় থেকেই এই ভাই জিহাদে শরীক ছিলেন এবং বেশ প্রসিদ্ধও ছিলেন। সে চিঠিতে উল্লিখিত আলেমদের পক্ষ থেকে শায়খ উসামা রহ.-কে আবেদন করা হয়, ফরযে আইন জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকার কারণে শায়খ যেন তাদেরকে গুনাহগার বলে প্রচার না করেন। কেননা, এতে তাঁদের যে-সকল ছাত্ররা শায়খ উসামাকে হক মনে করে, তাঁদের সামনে তাঁরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। যদিও শায়খ উসামা রহ. কখনো নির্দিষ্ট করে কারো নামে কিছুই বলেননি; বরং তিনি সব সময়ই ব্যাপকভাবে কথা বলতেন।

তাঁদের এই আবেদনের জবাবে শায়খ লিখেছিলেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে একটি কথাও বলি না। জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে যারা বিনা ওজরে জিহাদ না করে বসে থাকবে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে গুনাহগার ও ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

‘(হে নবী, মুসলিমদের) বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ ফাসেকদের হেদায়েত দেন না।’ [সূরা তাওবা (৯) : ২৪]

এর কিছুদিন পর তাঁরা আগের সেই মুজাহিদ ভাইকে একটি প্রকল্প দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠান, যা বাইরে থেকে ভালো মনে হলেও ভেতরে ছিল ভিন্ন মতলব। এই ভাই আফগানদের

সহায়তার জন্য 'আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশন' নামে একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। এর অধীনে জনসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। যেমন: কূপ খনন করা, ঈদের সময় কুরবানী করা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো উল্লিখিত শায়খদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তায়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সেই মুজাহিদ ভাই শায়খ উসামার হাতে বাইয়াত দেওয়া অনেক যুবককেও নিজের দলে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর একদিন খবর পাওয়া গেল, আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে একটি নতুন ট্রেইনিং ক্যাম্প খোলা হয়েছে। স্বভাবতই কান্দাহারে অবস্থানরত আরব মুজাহিদদের কাছে বিষয়টি অদ্ভূত ঠেকেছিল, একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ট্রেইনিং ক্যাম্পের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তারপর থেকেই ধীরে ধীরে আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে শুরু করে।

জনকল্যাণমূলক কাজ আর নতুন ট্রেইনিং ক্যাম্পের আড়ালে আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশন মুজাহিদদের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে—এ বিষয়টি সবাই বুঝতে পারলেও সুধারণাবশত কেউ প্রকাশ করেননি। ততদিনে অনেক নতুন ভাইকে তারা নিজেদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছে। এতকিছুর পরও আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের পরিচালক সেই মুজাহিদ ভাই ও আল-কায়েদার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকই ছিল। শায়খ উসামাও তার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেছিলেন।

আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের পেছনে যে-সব শায়খ ছিলেন, তারা মনে করতেন, শায়খ উসামা সুন্দর সুন্দর কথা আর যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের অবস্থান নষ্ট করতে চান। তাঁর আলোচনা ও বক্তৃতা শুনে তাঁদের হাতেগড়া ছাত্ররা পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, তারাও বলা শুরু করছে, জিহাদ তাদের জন্য ফরযে আইন হয়ে গেছে। ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে শায়খগণ তাদের আফগানিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দিতেন, সাথে সাথে তাদের থেকে এই ওয়াদাও নিতেন যে, তারা আফগানিস্তান থেকে ফিরে আবারও ইলমচর্চা শুরু করবেন। কিন্তু তারা যখন শায়খ উসামার সংস্পর্শে আসতেন, তখন তাদের মাথা থেকে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মুহূর্তেই উধাও হয়ে যেত। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, শায়খ উসামার ব্যাপারে এই শায়খগণ যা ভেবেছিলেন, শায়খ রহ. এ ব্যাপারে কখনো কল্পনাও করেননি। কিন্তু সত্যের সুবাস কারো হৃদয়ে একবার ঢুকলে সে অন্য কিছুতেই আর সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং সত্যের সঙ্গও ত্যাগ করতে পারে না।

(তাঁদের দৃষ্টিতে) শায়খ উসামার এ সব ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা থেকে ছাত্রদের রক্ষা করা এবং তাদের আদর্শ বাদ দিয়ে নতুন যে আদর্শ তারা গ্রহণ করছে, সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে

সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে তাদেরকে কীভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়—তা নিয়ে তারা অনেক চিন্তাভাবনা করেন। অবশেষে নিজেদের তত্ত্বাবধানেই আফগানিস্তানে একটি স্বতন্ত্র ট্রেইনিং ক্যাম্প খোলার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তাঁদের ছাত্ররা তাঁদের তত্ত্বাবধানেই থাকে। এতে সাঁপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সেই সুবাদে আল-ওয়াফা ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এই ট্রেইনিং ক্যাম্পটি খোলা হয়।

ইমাম মালিক রহ.-এর একটি কথা আছে, '**ما كان لله دام و اتصل وما كان لغير الله انقطع و انفصل** - যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয়, তা স্থায়ী হয় আর যে কাজ গাইরুল্লাহর জন্য করা হয়, তা ধ্বংস হয়ে যায়।' এখানেও সেই নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সময় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে তালেবানের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল। জাতিসংঘ চাচ্ছিল, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে থাকা ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানতে আন্তর্জাতিক তদন্ত কর্মকর্তাদেরকে আফগানিস্তানে ঢুকতে দেওয়া হোক। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. হেলমান্দ প্রদেশে আল-কায়েদার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আল-ফারুক ক্যাম্প বাদে বাকি সব ক্যাম্প বন্ধ করার জন্য নির্বাহী আদেশ জারি করেন। এতে আল-ওয়াফার অধীনে পরিচালিত ক্যাম্পটিও বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আমীরুল মুমিনীনের এই সিদ্ধান্তের ফলে তথাকথিত সেই শায়খদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং মুজাহিদদের মধ্যকার ঐক্যও অটুট থাকে। মুজাহিদরাও আগের মতো একটি ক্যাম্পেই প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন।

## আস-সাহাব মিডিয়া

উম্মতকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা, শত্রুবাহিনীর প্রোপাগান্ডা রুখে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল-কায়েদার নিজস্ব একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রতিনিয়তই অনুভূত হচ্ছিল। সেই লক্ষ্যে ২০০০ সালের শেষদিকে আস-সাহাব মিডিয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কন্টেন্ট প্রকাশ করা শুরু করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রকাশনা ছিল ইউএসএস কোল ধ্বংস নিয়ে বানানো ভিডিও ডকুমেন্টারি। এতে উম্মতের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে জিহাদের প্রতি তাহরীদ করা হয়। ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী তাঁর কিতাব 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী'-তে এই ডকুমেন্টারির প্রশংসা করে লিখেছেন—

> 'ভিডিওটি প্রকাশ হওয়ার পরপরই তুমুল সাড়া পড়ে যায়। একদিকে এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রতি দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট

আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদী পুনর্জাগরণে শরীক হওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান। ভিডিওতে আল-কায়েদার বিভিন্ন ট্রেইনিং ক্যাম্পে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ ও শারীরিক কসরতের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যও যুক্ত করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে এই জিহাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কার্যকরী উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়। এমনকি ৯/১১ কমিশন রিপোর্টে তারা অকপটে স্বীকার করেছে যে, এই ভিডিওটি মুসলিমদের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে এবং জনপরিসরে তা ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে।'

উল্লেখ্য, আল-জাযীরা এই ভিডিওটির প্রশংসা করে এটিকে 'জিহাদী মিডিয়ার যুগান্তকারী অগ্রগতি' বলে মন্তব্য করেছিল। খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ভাই আস-সাহাবের সার্বিক দেখাশোন করতেন। তাঁর সাথে আবু আনাস মাক্কী (আলী হামযা বাহলুল)[৮০] ফা.আ., হামযা গামেদী, আবু আব্দুর রহমান মাগরিবী, মুহান্নাদ তাআয্যী (আকরাম রজা)-সহ আরও অনেকে কাজ করতেন। এই মুহান্নাদ তাআয্যী হলেন সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যিনি মার্কিন আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর কিল্লা-ই-জঙ্গিতে আফগানিস্তানের মাটিতে প্রথম মার্কিন সৈনিককে হত্যা করেছিলেন।

## আস-সাহাব মিডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ



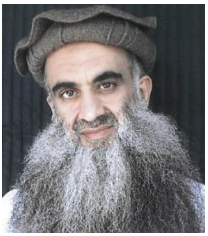
আলী হামযা বাহলুল ফা.আ.



আবু আব্দুর রহমান মাগরিবী হাফি.



হামযা গামেদী ফা.আ.



খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ফা.আ.

[৮০] পাকিস্তান সীমান্তে যখন আমাদের গ্রেফতার করা হয়, তখন আমি আর আলী হামযা ভাই একসাথেই ছিলাম। প্রথমে আমাদের কান্দাহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আলী হামযা ভাই শুরু থেকেই আযীমতের ওপর অটল ছিলেন। তিনি মার্কিনিদের কাছে স্বীকার করেন, তিনি আল-কায়েদার সদস্য এবং মার্কিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। মার্কিনিদের সাথে তিনি যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন। তাঁর যুক্তির সামনে মার্কিনিরা অসহায় হয়ে পড়ত আর রাগে-ক্ষোভে ভেতরে ভেতরে জ্বলত। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গুয়ান্তানামো বে কারাগারের বন্দিদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমাদের দুজনকে মার্কিন মিলিটারি কোর্টে হাজির করা হয়। আমাদের ওপর একগাদা অভিযোগ আরোপ করা হয়। সেই ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে আজ অবধি আলী হামযা ভাই গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দি আছেন। দয়াময় আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল ফরিয়াদ, আলী হামযা ভাই-সহ আমাদের সকল বন্দি ভাইদের যেন তিনি দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, আমীন।

সত্য তো সেটাই, যা শত্রুও স্বীকার করে নেয়। আস-সাহাবের অচিন্তনীয় সাফল্য সম্পর্কে মাইকেল শইয়ার পর্যন্ত লিখেছেন—

> 'আন্তর্জাতিক মানের এই মিডিয়া গড়ে তোলার জন্য উসামা বিন লাদেন ও তার সহযোগীদের প্রচুর অর্থ, সময় ও চিন্তা ব্যয় করতে হয়েছে। আজ এই মিডিয়া পূর্ণ শক্তি নিয়ে কাজ করছে। বিন লাদেন ও যাওয়াহিরীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই মিডিয়ার বদৌলতে তাঁরা যখনই চাচ্ছেন আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছেন। তা ছাড়া ইন্টারনেটে আল-কায়েদার পরিচালিত একাধিক ওয়েবসাইট রয়েছে। এই ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে তাঁরা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচার করছে। মুসলিম বিশ্বের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তাদের কাছে খুব সহজেই তা পৌঁছে যাচ্ছে।'

মাইকেল শইয়ার আরও লিখেছেন—

> 'বর্তমানে আল-কায়েদার মিডিয়া শাখা মুসলমানদের জন্য বিস্তারিত ধর্মীয় দিকনির্দেশনা প্রচার করে থাকে। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে জিহাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। এ ক্ষেত্রে তারা নির্বাচিত আয়াত-হাদীস ব্যবহার করে। এর মধ্য দিয়ে তাদের আলেমগণ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের একটি গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তিও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা কোটি কোটি মুসলমানের, বিশেষ করে তরুণদের সমর্থন লাভ করছে। বর্তমানে তাদের যোদ্ধাদের কাছেও পর্যাপ্ত শরয়ী দলীল-প্রমাণ রয়েছে। তাঁদের বিশেষ চিন্তাপ্রক্রিয়া আর এই সব দলীল ব্যবহার করে তারা পশ্চিমাদের কাছে মডারেট মুসলিম হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের জিহাদবিরোধী যুক্তিতর্কের খণ্ডন করছে।'[৮১]

## বামিয়ান প্রদেশের বুদ্ধমূর্তি অপসারণ: মার্চ ২০০১

বামিয়ানে গৌতম বুদ্ধের দুটি মূর্তি ছিল। বড় মূর্তিটি ছিল ৫৫ মিটার লম্বা ও ২০ মিটার পুরু আর ছোট মূর্তিটি ছিল ৩৮ মিটার লম্বা। মূর্তিদুটি ষষ্ঠ শতকে শক্ত পাললিক শিলা দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল।

বামিয়ানে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. মূর্তির ব্যাপারে আফগানিস্তানের নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা এই মূর্তি ধ্বংস করা আবশ্যক বলে ফতওয়া দেন। ফতওয়া প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে

[৮১] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

তালেবান বুদ্ধমূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করে। শুরুতে মূর্তি লক্ষ্য করে ট্যাঙ্ক থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়। মাইন ও বিমানবিধ্বংসী কামানও ব্যবহার করা হয়। এতে মূর্তিদুটির মারাত্মক ক্ষতি হলেও পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। মূর্তি ধ্বংসের খবরে বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায় যে, এ মূর্তিগুলো মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন। তাই এগুলোর কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা অন্যায়। বড় দুঃখের সাথে বলতে হয়, আপত্তিকারীদের মধ্যে একদল আলেমও শামিল ছিলেন। তারা তালেবানকে এই কাজ থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বেশ কয়েকটি ফতওয়া পর্যন্ত জারি করেন। তাদের যুক্তি ছিল, এগুলো ধ্বংস করা হিকমত ও মাসলাহাত পরিপন্থি কাজ। এ কাজ করা হলে হিন্দু ও বৌদ্ধরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দেশে থাকা মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের সুযোগ পেয়ে যাবে।

চীন, জাপান, শ্রীলংকা-সহ কয়েকটি দেশ মূর্তিগুলো কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। বিনিময়ে তারা বিরাট অংকের মূল্যও পরিশোধ করতে রাজি ছিল। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন রহ. সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রসিদ্ধ আফগান বীর মাহমুদ বিন সুবক্তগীন—যিনি মাহমুদ গযনবী নামে বেশি প্রসিদ্ধ এবং মূর্তিসংহারী হিসেবে ইতিহাসবিখ্যাত ছিলেন—তাঁকেও মূর্তি ধ্বংস না করে সোনা-রূপার বিনিময়ে বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি যে কথাটি বলেছিলেন, মোল্লা উমর রহ.-ও সেই কথাটিই বলেছিলেন—'কেয়ামতের দিন আমাকে 'মূর্তিবিক্রেতা উমর' বলে ডাকার পরিবর্তে 'মূর্তিসংহারী উমর' বলে ডাকা হোক—এটাই আমি বেশি পছন্দ করি।'

তিনি আরও বলেছিলেন—'মূর্তি ভাঙা আমাদের কাছে ইবাদত আর এই ইবাদতের কারণে তোমাদের মধ্যে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে, তা আমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত সম্পদের চেয়েও বেশি প্রিয়।'



ছোট বুদ্ধমূর্তি (ধ্বংসের আগে ও পরে)



বড় বুদ্ধমূর্তি (ধ্বংসের আগে ও পরে)

প্রতিমা ধ্বংসের এই ঐতিহাসিক কাজে অংশ নিতে চারদিক থেকে সাধারণ আফগানরা বামিয়ানে আসছিলেন। উলামায়ে কেরামও সফরের কষ্ট উপেক্ষা করে উপস্থিত হচ্ছিলেন। সাধারণ মানুষের সাথে মিলে দাড়িপাকা বয়োবৃদ্ধ উলামায়ে কেরামও পাহাড় বেয়ে বিস্ফোরক, মাইন আর গোলাবারুদ বহন করে মূর্তির কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শায়খ উসামা রহ.-ও এই মহান কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি বুলডোজার দিয়ে পুরো পাহাড়টিকেই গুড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, যাতে এর কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট না থাকে। তিনি এই আয়াতে কারীমা দ্বারা দলীল দিচ্ছিলেন—**ثم لننسفنه في اليم نسفا** - তারপর একে গুঁড়ো করে সাগরে ছড়িয়ে দেব। [সূরা তহা (২০) : ৯৭]

এই অঞ্চলটি ছিল হাজারা শিয়াদের শক্ত ঘাঁটি। তবু নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়েই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ড. আয়মান আয-যাওয়াহিরী, শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী (মুস্তফা হামেদ)-সহ আরও অনেকে। আল-কায়েদার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ আবু আব্দুর রহমান মুহাজির ভাইকেও তিনি সাথে নিতে ভোলেননি।

প্রথমে শায়খ উসামা কাবুলে যান। সেখানে পৌঁছামাত্রই জানতে পারেন, শায়খ কারযাবী কাতার, বাহরাইন-সহ বিভিন্ন দেশের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে কান্দাহারে পৌঁছেছেন। শায়খ কারযাবীর সাথে দেখা করার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি সাথিদের নিয়ে কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। শায়খ কারযাবীর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারস-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আলী মুহিউদ্দিন কারাদাগী, মুহাম্মাদ ইমারা, সায়্যিদ তানতাবী, নাসর ফরিদ ওয়াসেল, কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ আরও অনেকে ছিলেন।

তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, মূর্তি ধ্বংস করা থেকে তালেবানকে বিরত রাখা এবং এটা বোঝানো যে, এ কাজ করলে তারা এমন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়বে, যা মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা তালেবানের নেই। তাই, ভালো হবে, মূর্তি ধ্বংসের চিন্তা বাদ দিয়ে সমাজ সংস্কারের দিকে মনোযোগী হওয়া। কাতারের মন্ত্রী তালেবানের কাছে এ প্রস্তাবও দেন, তাঁরা যদি মূর্তি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে, তাহলে তিনি আফগানিস্তানকে 'ওআইসি'-র সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. তাদের সাথে আলোচনার জন্য তালেবানের সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্বশীল সিনিয়র আলেমেদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। সে মজলিসে শায়খ কমান্ডার আবু হাফস, শায়খ আহমদ হাসান আবুল খায়র, শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরী ও শায়খ আবু

হাফস মৌরিতানীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই আলোচনাটি ভিডিও রেকর্ড করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তালেবান ভাইয়েরা শুধু অডিও রেকর্ড করতে বলেন।

অধিবেশনে তালেবান আলেমগণ বলেন, 'আমরা এ কাজটির জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এ কাজটি আমরা করি বা না করি, আমাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পলিসি বদলাবে না। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষেই যাবে। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকলে কোনো উপকার হবে বলে আমরা মনে করি না। এ জন্য শরীয়তের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করাই উত্তম হবে। আমাদের কাছে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণও রয়েছে।'[৮২] তারপর আল-কায়েদার ভাইয়েরা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তৃতার সারমর্ম ছিল, 'মূর্তি ভাঙা ইবরাহীম আ.-এর আদর্শ, তাই মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে কারো দ্বিমত করা উচিত নয়, কারণ এটি স্পষ্ট একটি বিষয়।'

এরপর প্রতিনিধিদলের আলেমগণ বক্তৃতায় বলেন, 'মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নেই; আমাদের আপত্তি হলো এই সময় ভাঙার ব্যাপারে।' শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী তাঁদের কথার জবাবে বলেন, 'তালেবানের উলামা, মুজাহিদীন ও সাধারণ আফগানরা যেহেতু বলছে, মূর্তি ভাঙার কারণে যে-কোনো পরিণতি তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা সবকিছু বরণ করে নেবেন, তাহলে আমরা কেন তাদের বাধা দিচ্ছি? আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করবেন।'[৮৩]



শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী
(মাহফুয বিলদুল ওয়ালিদ) হাফি.

[৮২] মোল্লা উমর ওয়া তালিবান ওয়া আফগানিস্তান : মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন

[৮৩] ৯/১১-এর না বলা গল্প : শায়খ নাসির উহাইশী রহ.

শায়খ উসামা রহ. এই সুযোগে শায়খ ইউসুফ কারযাবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু শায়খ কারযাবী অপারগতা প্রকাশ করেন এবং শায়খ কারাদাগীকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে দেন। শায়খ উসামা কান্দাহারের 'আস-সিত্তা কলোনিতে'[৮৪] তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। শরীয়তবিরোধী এমন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আসার কারণে শায়খ তাঁদের অনেক তিরস্কার করেন। শায়খ কারাদাগী শায়খ উসামার দলীল-প্রমাণে আস্বস্ত হন এবং শায়খের কথাগুলো শায়খ কারযাবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওয়াদা করেন।

শায়খ উসামা তখনও শায়খ কারযাবীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন। প্রতিনিধিদল কান্দাহার ছাড়ার আগে বিমানবন্দরেই শায়খ কারযাবীর সাথে সামান্য সময়ের জন্য শুধু দেখা করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। শায়খ আবুল খাইর মিসরী শায়খের সাথে যোগাযোগ করে জানান যে, প্রতিনিধিদল বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে। শায়খ উসামাও তখনই বিমানবন্দর অভিমুখে রওয়ানা দেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। শায়খ উসামা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সামান্য কয়েক মিনিট আগেই প্রতিনিধিদলের বিমানটি আকাশে উড়াল দেয়। ফলে শায়খ কারযাবীর সাথে শায়খ উসামা সাক্ষাৎ করতে পারেননি।

তালেবানের উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদলটি সম্পূর্ণ খালিহাতেই ফিরে যান। আর এ দিকে মুজাহিদ ভাইয়েরা মূর্তি ভাঙার উদ্দেশ্যে সমভিব্যাহারে বামিয়ানের দিকে যাত্রা শুরু করেন। মুজাহিদ ভাইয়েরা এই যাত্রার নাম দিয়েছিলেন 'মার্চ ফর তাওহীদ'। মূর্তি ভাঙার জন্য সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো। মুজাহিদদের কাফেলা যখন বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ভাঙার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, ঠিক তখনই আমেরিকার মূর্তি ভাঙার উদ্দেশ্যে ৯/১১ হামলার বীর যোদ্ধাগণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন।

## আল-কায়েদা ও জামাআতুল জিহাদ (EIJ): একদেহ একপ্রাণ

বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের পর অনেক বড় একটি ঘটনা ঘটে। জামাআতুল জিহাদ আল-মিসরী বা ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ আল-কায়েদার সাথে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই জোটই পরে একত্রে 'কায়েদাতুল জিহাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ড. আইমান আয-

[৮৪] আস-সিত্তা হলো কান্দাহারে অবস্থিত শায়খ উসামার জন্য নির্ধারিত একটি কলোনি। এখানে শায়খের সাথে তাঁর দেহরক্ষীরা এবং কয়েকজন বিবাহিত ভাই তাদের পরিবার নিয়ে থাকতেন। তাঁরা হলেন—শায়খ সাইফ আল-আদল, আব্দুল হাই মুহাইমিন মিসরী, শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, আবু খালেদ হাবীব, আবু খলীল মাদানী, আবুল হাসান সায়ীদী, শাকের মিসরী, খলীফা মিসরী এবং আব্দুল হামীদ শারকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। জালালাবাদের নাজমুল জিহাদ কলোনির মতো এখানকার সব ঘর মাটি দিয়ে বানানো ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে একটি কামরা, রান্নাঘর, গোসলখানা আর ছোট একটি উঠান ছিল।

যাওয়াহিরী ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে শায়খ উসামা বিন লাদেনের প্রতি আনুগত্যের বাইআত দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদকে আল-কায়েদার সাথে একীভূত করেন। ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী' বইয়ে এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন—

> 'আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার বড় একটি অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদেরকে আল-কায়েদার সাথে একীভূত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, যা 'কায়েদাতুল জিহাদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আল্লাহ যেন আমাকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দেন। এখানে আমি সেই মহান ব্যক্তির অবদানের কথা উল্লেখ করতে চাই, যার চেষ্টা-মেহনতের বদৌলতে এই বরকতময় কাজটি সফলতার মুখ দেখেছে। তিনি হলেন শহীদ কমান্ডার আবু হাফস রহ.। এ ক্ষেত্রে তিনি ছাড়াও আরও অনেক কাবেলে ইহতিরাম দাঈ ও মুজাহিদের অবদান ছিল, যাঁদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অবদানের কথা জানেন। আল্লাহ যেন তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।'

যেদিন মহতি এই ঐক্যের ঘোষণা করা হয়, সেদিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন ড. আইমান শায়খ উসামা বিন লাদেনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> 'আপনাকে বাইয়াত দেওয়ার জন্য আমরা হাত প্রসারিত করেছি। আমাদের সাথে রয়েছে এমন অনেক মৃত ব্যক্তির হাত, যাদের কবর কোথায় কেউ জানে না; আছে এমন বন্দিদের হাত, যাদের কোন কারাগারে রাখা হয়েছে, কেউ বলতে পারে না; আরও আছে এমন সন্তানহারা মায়ের হাত, যারা বলতে পারে না, তাদের কলিজার টুকরো সন্তানেরা কোথায়; আছে এমন স্বামীহারা নারীদের হাত, যারা জানে না, কোথায় আছে তাদের প্রাণের স্বামী; আর আছে এমন বাবাহারা এতীম সন্তানদের হাত, যারা জানে না, কোথায় আছে তাদের বাবা। তারাও আজ আমাদের সাথে এসেছে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে। তারা আপনার কাছে সম্পদ চায় না, কোনো গনীমত চায় না, তারা আপনার কাছে শুধু এতটুকু চায় যে, আপনি তাদের হয়ে তাদের ওপর যারা জুলুম করেছে, সেই জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আমরা আপনার কাছে এসেছি কেবল দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে, এর বেশি আমাদের আর কিছুই নেই। আমরা আপনার কাছে কোনো পদ চাই না, গনীমতের কোনো হিস্যাও চাই না। আমাদের একটাই চাওয়া—আল্লাহর পথে জিহাদ করা, যতক্ষণ না বিজয় কিংবা শাহাদাতের দেখা পাই।'[৮৫]

[৮৫] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

শায়খ উসামা রহ. তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> ‘তাগুতের কারাগারে বন্দি আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের আমরা কখনোই ভুলব না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের চেয়ে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের ভাইয়েরাই অধিক নমনীয় ছিলেন।’

শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফাক্কাল্লাহু আসরাহু বক্তৃতায় বলেছিলেন—‘ব্যবসা অনেক লাভজনক হয়েছে, ডাক্তার সাহেব, ব্যবসা অনেক লাভজনক হয়েছে।’

ঐক্য ঘোষণার পরের দিন শায়খগণ হেলমান্দের আল-ফারুক ট্রেইনিং ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যান। সেখানে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। এর মধ্যে প্রিয় ভাই কমান্ডার শহীদ আবু হাফসের কথাগুলো ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলেছিলেন—

> ‘আমরা এই ভূমিতে এসে ইসলামী শরীয়তের ছায়াতলে জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছি। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে এই ভূমিতে এসে আমরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। এই ভূমিতেই ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ভূমিতেই কেন? কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই ভূমি থেকে কিছু চান। হে আল্লাহর বান্দারা, আপনারা অটল থাকুন আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ফিলিস্তিনের মুক্তি এই ভূমি থেকেই শুরু হবে, আরব উপদ্বীপের স্বাধীনতাও এখান থেকেই আসবে, মুসলমানদের হারানো ভূমিগুলোকে পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনও এই মাটি থেকেই শুরু হবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, আপনারা অবিচল থাকুন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন আর ঐক্যবদ্ধ থেকে চেষ্টা চালিয়ে যান। বরকতময় এই কাফেলার সাথে যুক্ত হোন, যাতে আল্লাহর পথে সৈনিক হয়ে জিহাদ করতে পারেন এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামকে পুনরায় ছড়িয়ে দিতে পারেন। মানবজাতির নেতৃত্ব অচিরেই আমাদের হাতে আসবে। এখনই আমাদের সময়। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, এই শতাব্দী আমাদের। আমরা আল্লাহর দেওয়া নেজামের মাধ্যমেই আবারও মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে আসীন হব। আল্লাহর প্রশংসা করছি এমন বরকতময় সিদ্ধান্ত নিতে পারার জন্য। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নেয়ামত।’[৮৬]

[৮৬] প্রাগুক্ত




আল-ফারুক ক্যাম্প পরিদর্শনে শায়খগণ।
সর্ববামে শায়খ মুহাম্মাদ সালাহ (নাসর ফাহমী নাসর) রহ.।

## ‘এটাই আমাদের বিজয়ের শতাব্দী’

কমান্ডার শায়খ আবু হাফস রহ.-এর এই কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বারবার এ কথাটি বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আফগানিস্তান থেকে কিছু একটা চান। শায়খের কথার মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠছিল, যেন তিনি অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দিগন্তে সে আগুনের ঝলকানি দেখতে পেয়েছিলেন, যে আগুনের লেলিহান শিখায় ক্রুসেডার জোটের কুফরি বিশ্বব্যবস্থা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে; যে কুফরি বিশ্বব্যবস্থা উম্মতে মুসলিমার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক—সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

শায়খ আবু হাফস উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কুফরি বিশ্বব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, আল্লাহর বিধানের আলোকে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ইসলামের ভূখণ্ডগুলোকে ইসলামের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনা সহজ কোনো বিষয় নয়। কারণ, শাসকরা এটি চায় না। এটা এমন এক বিপদসীমা, আমেরিকা যার কাছেও কাউকে যেতে দেবে না। এটি অর্জন করতে হলে কয়েক সাগর রক্ত প্রবাহিত করতে হবে, লাশের পাহাড় জমে যাবে। এত বড় কুরবানী কেবল তাদের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, যারা যুদ্ধের প্রকৃতি যথাযথভাবে বুঝে আল্লাহর সাথে নিজেদের সওদা করেছেন। শায়খ বোঝাতে চাচ্ছিলেন, এই মহান কাজ কেবল তাঁদের দ্বারাই হবে, বিশ্বের কয়েকটি পরাশক্তিকে পরাজিত করার বাস্তব অভিজ্ঞতা যাদের আছে। তিনি যেন আমেরিকাকে বলতে চাচ্ছিলেন, জরাজীর্ণ পোশাক আর আলুথালু বেশের এই

সাধারণ মানুষগুলো, যাদেরকে কেউ পরোয়াই করে না, তারাই তোমাদের লাঞ্ছিত করবে, তোমাদের অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, তাঁরাই তোমাদের মান-সম্মানকে পদদলিত করবে। অচিরেই এই মাটির পাহাড়-পর্বত আর জলে-স্থলে তোমাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার আনন্দে জুলুস বের হবে।'

## ঐক্য নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি: শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর মন্তব্য[৮৭]

উল্লেখ্য, অনেক লেখক তাদের বইতে লিখেছেন, আল-কায়েদার সাথে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল, কেউ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছিলেন আর কেউ বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিভ্রান্তির ব্যাপারে ডা. আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন—

'আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। [ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের মধ্য থেকে] মাত্র তিনজন আল-কায়েদায় যোগদান করেননি। তবে তারা তাদের বিরোধিতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও দেননি। তাদের মধ্যে একজন তো এই দুই দলের একীভূত হওয়ার বিষয়টি মনেপ্রাণে কামনা করতেন এবং এ জন্য চেষ্টাও করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু কারণে তিনি সংগঠনের বাইরে থেকেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। একীভূত হওয়ার পর শায়খ উসামা রহ. তাঁকে একটি দায়িত্বও দিয়েছিলেন আর তিনিও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কাজটি করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। চলমান ক্রুসেড [আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন] শুরু হওয়ার পর দশ বছরেরও বেশি সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবার এ সময় অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উপেক্ষা করেই তাঁর দেশে ফিরে গেছেন। তিনি সব সময় সাহায্য ও সমর্থনই করেছেন। দুই সংগঠন একীভূত হওয়ার পর কায়েদাতুল জিহাদের প্রতি তিনি কখনো কোনো আপত্তি করেননি।

আর অন্য দুজন সাধারণ কিছু ইন্তিজামি বিষয়ে অসন্তোষ থাকার কারণে সংগঠন থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল-কায়েদার সাথে একীভূত হওয়ার পর তাঁরা এ সিদ্ধান্তের সাথে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তারা দুজনেই তাদের ভুল আচরণের জন্য ক্ষমাও চেয়েছিলেন। তাঁদের একজন ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে নিশ্চিত করেছিলেন এবং কায়েদাতুল জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। পরে তিনি

[৮৭] আমাদের এই বইয়ের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল। শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর দৃষ্টিগোচর হলে তা সংশোধনের জন্য তিনি আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠিতে শায়খ এ কথাগুলো লিখেছিলেন। এই ঘটনা তালেবান ও আমেরিকার মধ্যে দোহা চুক্তি হওয়ার আগের।

মার্কিনবিরোধী জিহাদে শহীদ হন, আল্লাহ তাঁর ওপর অবারিত রহমত বর্ষণ করুন। আর দ্বিতীয়জন এখন কাফেরদের কারাগারে বন্দি আছেন। আল্লাহ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন। মোটকথা, শায়খ উসামা রহ.-এর হাতে বাইআত দেওয়ার সময় যারা ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কেউই একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি এবং এ কারণে দলত্যাগও করেননি। ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের সাংগঠনিক নীতিমালা পরিপূর্ণরূপে মেনেই আল-কায়েদার সাথে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল। আমার এই কথার শক্তিশালী একটি প্রমাণ হলো, ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের যে-সকল কর্মীরা মিশরে বন্দি ছিলেন এবং 'জানুয়ারি বিপ্লবে' ছাড়া পেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আল-কায়েদা ও শায়খ উসামার প্রতি তাঁদের সমর্থন ও আনুগত্যের কথা ঘোষণা করতেন এবং নিজেদেরকে আল-কায়েদার সহযোগী মনে করতেন।'

## ড. আব্দুল্লাহ নাফীসীর কান্দাহার সফর

উল্লেখ্য, ৯/১১-এর কিছুদিন আগে এক ঝটিকা সফরে তালেবান নেতৃবৃন্দ ও শায়খ উসামার সাথে দেখা করার জন্য ড. আবুদল্লাহ নাফীসী কান্দাহারে আসেন। তাঁর সাথে শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস, বিখ্যাত স্নাইপার ভাই আবু ইউসুফ এবং আরেকজন ষাটোর্ধ্ব শায়খ ছিলেন, তাঁর নাম আমার মনে নেই। শায়খ উসামা স্বভাবসুলভ উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের স্বাগত জানান এবং তাদের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

কান্দাহার এয়ারপোর্টের কলোনিতে আয়োজিত এক সেমিনারে শায়খ উসামা ড. আব্দুল্লাহ নাফীসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের লক্ষ করে বলেন, 'জাযীরাতুল আরব তার কলিজার টুকরোদের আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে।' ড. নাফীসী বক্তব্যের শুরুতেই তাঁর আগমনের কারণ উল্লেখ করেন। তিনি কুয়েতের আঞ্চলিক ভাষায় বলেন—'আমি একজন সুখী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু মার্কিন আধিপত্যবাদের কারণে আমাদের মুসলিম জাতি যে লাঞ্ছনার জীবনযাপন করছে, এটাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। এ কারণেই আমি বলতে চাই, উম্মাহকে এই লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ সেটাই, যেটার কথা শায়খ উসামা বলেন।'

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, নিরাপত্তাগত ও সাংস্কৃতিক—মোটকথা সকল ক্ষেত্রে আমেরিকা কীভাবে আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে—সে বিষয়টিও তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সারাংশ হলো, বর্তমান দুনিয়া এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার (ওয়ার্ল্ড অর্ডার) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, যার কেন্দ্রবিন্দু (Core Countries)

হলো আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাকি পৃথিবী প্রান্তিক দেশসমূহ (Periphery countries) নিয়ে গঠিত। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য তিনি একটি বৃত্ত এঁকে তাকে চার ভাগে ভাগ করেন এবং বলেন, কোর দেশগুলো পেরিফেরি দেশসমূহের ওপর চারটি উপায়ে আধিপত্য বজায় রাখে।

১. সামরিক প্রযুক্তির ওপর একচেটিয়া আধিপত্য।
২. পেট্রোল ও গমের মতো কাঁচামালের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য।
৩. জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
৪. সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন।

তিনি আরও বলেন, আমেরিকার সব সরকারই চারটি বিষয়কে নিজেদের জন্য গুরুতর হুমকি মনে করে থাকে। তিনি যে চারটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন, এর মধ্যে তিনটি আমার মনে আছে, সেগুলো হলো—

১. সামরিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চীনের উত্থান।
২. কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র চলে যাওয়া।
৩. আমেরিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সশস্ত্র ডানপন্থি বর্ণবাদী গোষ্ঠী, যাদের সংখ্যা এখন প্রায় ৩০০ ছাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ড. নাফীসী তাঁর বক্তৃতায় যখনই মার্কিন আধিপত্যবাদ নিয়ে কথা বলতেন, তখন কৌশলে শায়খ উসামার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রচার করতেন। তিনি বলতেন—

> ‘[মার্কিন আধিপত্যবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে] আল-কায়েদা নতুন তত্ত্ব পেশ করেছে। তা হলো, মুসলিমবিশ্বের মুক্তির জন্য আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার কোর দেশগুলো অর্থাৎ আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে লড়াই ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আল-কায়েদার তত্ত্ব অনুযায়ী, এদের মোকাবিলা করার একটিই উপায়, আর তা হলো, পেরিফেরি তথা অনুন্নত দেশগুলো থেকে যুদ্ধকে সরিয়ে কোর দেশগুলোতে নিয়ে যাওয়া। এতে যুদ্ধের কারণে যত ধ্বংসযজ্ঞ হবে এবং এর যত ক্ষয়ক্ষতি হবে, তার পুরোটাই পড়বে কোর দেশগুলোর ওপর। অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে, তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না, বিভিন্ন মিডিয়া ও গণমাধ্যম যেভাবে উপস্থাপন করে থাকে; বরং এইসব ঘটনার পেছনে সুনির্দিষ্ট একটি মতাদর্শ আছে, তা হলো—যুদ্ধকে পেরিফেরি দেশ থেকে কোর দেশগুলোতে স্থানান্তর করা, যাতে কোর দেশগুলোর ওপর যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়ে। এতদিন তারা আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের বহন করতে হয়েছে, কিন্তু এখন আর শুধু আমরাই এই ক্ষয়ক্ষতি বহন করব না। বরং

তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেব। যখন যুদ্ধ তাদের ভূমিতে হবে, কেবল তখনই কোর দেশগুলো পেরিফেরি দেশগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে, সবকিছু বাস্তবতার নিরিখে ঠান্ডা মাথায় নতুনভাবে চিন্তা করবে এবং বাধ্য হয়েই পেরিফেরি দেশগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা আর বোঝাপড়ার দিকে ঝুঁকবে।

পক্ষান্তরে উম্মতে মুসলিমা যদি নিজেদেরকে আমেরিকা-ইউরোপের এই অ্যাংলো-স্যাক্সনদের হাতে ছেড়ে দেয়, তাহলে ইসলামী বিশ্ব সব সময় তাদের দাস হয়েই থাকবে। জাযীরাতুল আরবের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটি বাস্তবায়ন করতে হবে। মুসলমিদের কাছে জাযীরাতুল আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়েই জাযীরাতুল আরবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, এখানে পবিত্র দুই ভূমি আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা এখানে, আমাদের কিবলা কাবাও এখানে। নিজেদের বাড়িঘরের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা ততটা শঙ্কিত না, যতটা শঙ্কিত হারামাইনের পবিত্র ভূমি নিয়ে। কেন? কারণ, এটাই আমাদের শেকড়। হারামাইনের পবিত্র ভূমির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যেন মুসলিমদের হাতে থাকে, কোনো কাফের রাষ্ট্রের হাতে যেন না যায়—এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর এর প্রতিফলন কেবল তখনই সম্ভব, যখন রাসূলের অসীয়ত—'মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দাও—বাস্তবায়ন করা হবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শুয়ে পাশে থাকা সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দাও, তাহলেই শান্তিতে থাকতে পারবে।' অর্থাৎ এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে, মুশরিকদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়ার ওপর। কিন্তু আপনারা দেখুন জাযীরাতুল আরবে আজ কী চলছে! যতই দিন যাচ্ছে, মুশরিকরা জাযীরাতুল আরবে আরও জেঁকে বসছে। এমনকি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আসা এ সব লাতিন আর অ্যাংলো-স্যাক্সনদের বসবাসের জন্য নতুন নতুন শহর পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে। অচিরেই এমন দিন আসবে, যখন আমাদের আফসোস করতে হবে যে, আমরা নিজেরাই জাযীরাতুল আরবকে তাদের জন্য খুলে দিয়েছি, আমরাই তাদের জন্য বাড়িঘর বানিয়ে দিয়েছি, সমুদ্র উপকূলে আমরাই তাদের জন্য আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করে দিয়েছি।'[৮৮]

আব্দুল্লাহ নাফীসী তাঁর এই সফরে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর-সহ তালেবানের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন নেতার সাথে দেখা করেন এবং শায়খ উসামার সাথে হেলমান্দের আল-ফারুক ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তারপর দেশে ফিরে যান।

[৮৮] শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর বক্তৃতা ও চিঠি সংকলন।



ড. আব্দুল্লাহ নাফীসী

## আহমদ শাহ মাসউদকে হত্যা

কাবুল দখলের আগে তালেবানের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, শায়খ উসামাকে বন্দি করার জন্য আহমদ শাহ মাসউদ ষড়যন্ত্র করছে। এ সংবাদ শোনামাত্রই আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. শায়খ উসামাকে জালালাবাদ থেকে কান্দাহারে চলে আসতে বলেছিলেন। শায়খ উসামা রহ.-ও কালবিলম্ব না করে কান্দাহার চলে এসেছিলেন। আমেরিকাকে শায়খ উসামার কার্যক্রম ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য মাসউদ ছিল বদ্ধপরিকর। সুযোগ পেলে তাঁকে ধরিয়ে দিতেও রাজি ছিল সে। ৯/১১ হামলার তদন্তের জন্য গঠিত মার্কিন কংগ্রেসের বিশেষ কমিটির কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে সিআইএ'র সাবেক ডাইরেক্টর জর্জ টেনেটও আমেরিকার সাথে আহমদ শাহ মাসউদের এই সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল, ৯/১১-এর আগে মার্কিন গোয়েন্দারা আল-কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেনের ব্যাপারে তথ্য বের করার জন্য আহমদ শাহ মাসউদের সাথে মিলে কাজ করেছে। কিন্তু ৯/১১-এর আগেই আহমদ শাহ মাসউদের নিহত হওয়ায় সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

৯/১১ কমিশন রিপোর্টেও আহমদ শাহ মাসউদ ও আমেরিকার পারস্পরিক সহযোগিতার এই বিষয়টি উঠে এসেছে। রিপোর্টের কয়েক জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে—

> 'আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাসউদের বাহিনী নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের কর্তৃত্ব ছিল। 'সিআইএ'র সামনে এটাই ছিল সেরা বিকল্প। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের কয়েকজন অফিসার মাসউদের সাথে দেখা করার জন্য পাঞ্জশির উপত্যকায় যান। এ সফরে জরাজীর্ণ একটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়ছিল।

পরেও বহুবার এমন সফর হয়েছিল। বিন লাদেনের কার্যকলাপ ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য মাসউদকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেই মনে হয়েছিল। সুযোগ পেলে তাঁকে ধরিয়ে দিতেও সম্মত ছিল সে।'

পশ্চিমা ক্রুসেডার ও তাদের মিত্রদের সাথে আহমদ শাহ মাসউদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক গোপন কিছু ছিল না। ২০০১ সালের এপ্রিলে সে ব্রাসেলস গিয়েছিল। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোল ফন্টেইন তাকে পার্লামেন্ট ভবনের সদর দরজায় একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মতো সম্মান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে সে যখন বক্তৃতা দিয়েছিল, উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে করতালি দিয়েছিল। বক্তৃতায় সে বলেছিল, 'ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি প্রথম সারিতে থাকব।' ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভেতরে একটি সংবাদ সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিল সে এবং তাতে তালেবান শাসন ও উসামা বিন লাদেনের মতো বহিরাগত শক্তিগুলোকে উৎখাত করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা চেয়েছিল। সে বলেছিল—

'আমি নিশ্চিত, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, উসামা বিন লাদেন এবং পাকিস্তানি তালেবানের মতো বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ না থাকলে তালেবানকে দমনের জন্য আমাদের বাহিনীর কোনো সাহায্য দরকার হতো না। আমার বিশ্বাস, আফগান জাতি, কান্দাহারের সাধারণ মানুষ এবং পশতুন উপজাতি নিজেরাই তালেবান শাসনকে উৎখাত করতে সক্ষম।'

সে আমেরিকা ও তার মিত্রদের স্বার্থরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে মার্কিন হস্তক্ষেপেরও আহ্বান জানিয়েছিল। তার সব প্রোপাগান্ডার বৈধতা উৎপাদনের জন্য সে বলত, আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানি আধিপত্য দূর করার জন্য সে লড়াই করছে। তার দৃষ্টিতে তালেবান ছিল পাকিস্তানের এজেন্ট। দুনিয়াবি ভোগ-বিলাস আর ক্ষমতার লোভে সে এতটাই নিচে নেমে গিয়েছিল যে, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপ চাওয়ায় সে এতটুকুও লজ্জিত ছিল না; এমনকি তার কথামতো ব্যবস্থা না নিলে ইমারতে ইসলামিয়া ও আল-কায়েদার পক্ষ থেকে আমেরিকা কেমন হুমকির সম্মুখীন হবে, তার ফিরিস্তিও সে তুলে ধরত। সেই কনফারেন্সে সে আরও বলেছিল—

'প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতি আমার বার্তা হলো, তিনি যদি আফগানিস্তানে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে মনোযোগ না দেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে আফগানিস্তানের জনগণকে সাহায্য না করেন, তাহলে যে সংকট সৃষ্টি হবে, তা শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলিকেও প্রভাবিত করবে।'[৮৯]

[৮৯] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী



ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভবনে আহমাদ শাহ মাসউদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘ গোপনীয়তার পর অবশেষে মাসউদ নিজের ক্রুসেডারদের দাস হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আনে। তা-ও যেনতেনভাবে নয়, একেবারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ভবনের ডায়াস থেকে ঘোষণা করেই সে ক্ষান্ত হয়। যেন পশ্চিমা প্রভুদের মনে তার দাসত্বের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে। ইসলামের বিরুদ্ধে, মার্কিনিদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডে এভাবেই সে ঘটা করে যোগদান করে। এত ভয়ংকর ও প্রকাশ্য অপরাধ করে নিজের বেঁচে থাকার আর কোনো সুযোগই সে বাকি রাখেনি, নিজের মৃত্যুর পরোয়ানায় নিজেই স্বাক্ষর করে বসে।[৯০]

শায়খ উসামা রহ. শায়খ আবু হাফস কমান্ডারের মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, 'আমাদের প্রতি আপনার আদেশ কী? আমরা আপনার সৈনিক, দীনের খেদমতের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত। আপনি শুধু আদেশ করুন।' উত্তরে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. শায়খ আবু হাফস কমান্ডারকে বলেছিলেন, 'আপনারা আহমাদ শাহ মাসউদকে হত্যা করুন।' শায়খ আবু হাফস রহ. তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, ধরে নিন, আহমাদ শাহ মাসউদ খতম হয়ে গেছে।' আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমরের কাছে তিনি এ আবেদনও করেছিলেন, তিনি যেন উত্তরাঞ্চলে মুজাহিদদের পাঠিয়ে দেন। যাতে মাসউদকে হত্যার সাথে সাথেই তার বাহিনীর ওপর হামলা করা যায়। এতে তারা পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে না এবং তালেবানও নিশ্চিত বিজয় লাভ করতে পারবে।[৯১]

---

[৯০] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

[৯১] ৯/১১-এর না বলা গল্প : শায়খ নাসির উহাইশী রহ.

মাসউদ ছিল প্রচারমুখী মানুষ। সব সময় আলোচনায় থাকতে পছন্দ করত। সে জন্য টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিও বেশ দুর্বল ছিল সে। তাই তাকে হত্যা করাও ছিল খুবই সহজ। সে হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়, দু'জন ইস্তিশহাদী মুজাহিদ সাংবাদিক পরিচয়ে বিস্ফোরক ভর্তি ক্যামেরা নিয়ে তার একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার নিতে যাবেন। সাক্ষাৎকার চলাকালেই ক্যামেরাটি ডেটোনেট করা হবে। পরিকল্পনামতো একটি ক্যামেরা কেনা হয়, যা সাধারণত এ ধরনের সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ আবু আব্দুর রহমান মুহাজির ভাই ক্যামেরার ব্যাটারিতে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে পুরো ক্যামেরাকে বোমায় রূপান্তর করে দেন।

সাক্ষাৎকারের বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কয়েকজন মুজাহিদ ভাই সম্মিলিতভাবে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আবু হাফস মিসরীও ছিলেন। তাঁরা ঠিক করেন, আহমদ শাহ মাসউদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে আরও কয়েকটি ভিডিও সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। যাতে কারো কোনো সন্দেহ না হয়। সে হিসেবে প্রথম সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় তালেবানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াক্কিলের। তারপর আব্দে রাব্বির রাসূল সাইয়াফ ও বুরহানুদ্দিন রাব্বানীরও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং সবশেষে আহমদ শাহ মাসউদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

মরক্কান বংশোদ্ভূত দুজন বেলজিয়ান যুবককে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা হলেন আবু উবাইদাহ তিউনিসী আব্দুস সাত্তার দাহমান (২৮) ও করীম সুযানী (৩৪)। তাঁরাও সাথে সাথে রাজি হয়ে যান। পরিকল্পনামাফিক তাঁরা দুজন প্রথমে সাইয়াফ ও রব্বানীর ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যাতে তাঁদের ব্যাপারে মাসউদের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। ভিডিও সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সাইয়াফ নিজেও আহমাদ শাহ মাসউদের কাছে আবেদন করে। কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য মাসউদের অনেক খ্যাতি ছিল। তাঁরা দু'জন যখন সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিতে যান, তখন লম্বা সময় ধরে তাদের তল্লাশি নেওয়া হয়, তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয় এবং ক্যামেরা-সহ সাথে থাকা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু, আল্লাহ যখন কোনো কিছু চান, তখন সেটাকে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা আছে কার। অবশেষে তাঁদেরকে মাসউদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তাজিক সীমান্তের কাছে তাখার প্রদেশের 'খাজা বাহাউদ্দিন' শহরে আহমদ শাহ মাসউদের বাসভবনে সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করা হবে বলে ঠিক করা হয়।



আবু উবাইদা তিউনিসী রহ.



করীম সুযানী রহ.

২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৪২২ হিজরীর ১৮ই জুমাদাল আখীরাহ, ৯/১১-এর বরকতময় হামলার দু'দিন আগে সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য করা হয়। যথাসময়ে সাক্ষাৎকার শুরু হয়। দু'জনের একজন বিস্ফোরক ভর্তি ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতে শুরু করেন, অন্যজন সাক্ষাৎকার নিতে থাকেন। সাক্ষাৎকার চলাকালেই ক্যামেরা বোমাটি ডেটোনেট করা হয়। বিস্ফোরণে মাসউদ নিহত হয়, তার বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কয়েকজন নেতা গুরুতর আহত হয়। সাংবাদিক বেশধারী দুই ভাইও ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। আল্লাহ তাআলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করে নিন, আমীন।

আহমাদ শাহ মাসউদের হত্যা প্রসঙ্গে তার ভাই ওয়ালী মাসউদ বলেছিল—

> 'তার ইউরোপ সফর করে বিশ্বকে সতর্ক করার কাজটি ছিল বিপজ্জনক একটি কাজ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সফরটি করেছিলেন। অন্যদের সতর্ক করার মূল্য অবশেষে নিজের জীবন দিয়ে চুকিয়েছেন। মনে রাখবেন, তার জন্য যদি আপনারা কিছু না করেন, তবে আপনারাও নিরাপদে থাকতে পারবেন না। তিনি শুধু আফগানদের জন্য নয়, পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে গৃহীত অন্তঃসারশূন্য কর্মসূচির কারণে পশ্চিমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তখনকার সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসূচি ছিল শুধুই ফাঁকা বুলি, এতে বাস্তব ও কার্যকরী কোনো কিছুই ছিল না।'[৯২]

[৯২] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

## বৈশ্বিক জিহাদী জমায়েত ও উম্মাহর বৈশ্বিক সংকট: সফলতা ও ব্যর্থতার সমীকরণ

[আফগানিস্তানে তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদগণ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা একটি বৈশ্বিক জমায়েতের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু তারপরেও] উম্মাহর বৈশ্বিক সংকট নিরসনে এই বৈশ্বিক জমায়েত যথাযথভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। উম্মাহর বৈশ্বিক সংকট নিরসনে এই বৈশ্বিক জমায়েতের ব্যর্থতার বিষয়ে শায়খ আবু মুসআব সূরী তাঁর বিখ্যাত বই 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ'-তে আলোচনা করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে শায়খের আলোচনাটি উল্লেখ করা হচ্ছে। শায়খ লিখেছেন—

> '২০০০ সালে আফগানিস্তানের প্রায় ৯৪% ভূমি যখন তালেবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তখন আফগানিস্তানে অবস্থানরত তালেবান সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও সংগঠনের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪টি। নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তালেবানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের সমান অংশগ্রহণ থাকলেও এই সংগঠনগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আল-কায়েদার পাশাপাশি আফগানিস্তানে তখন আরও যত মুজাহিদ ছিলেন, তাদেরকে মোটাদাগে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
>
> ১. প্রশিক্ষণার্থী: যারা সাধারণত প্রশিক্ষণ নিতে আসতেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে চলে যেতেন। প্রশিক্ষণের সময়টুকুই তারা আফগানিস্তানে থাকতেন। তারা সর্বোচ্চ এক বছর আফগানিস্তানে অবস্থান করতেন।
>
> ২. মুহাজির: যারা একাকী বা সপরিবারে হিজরত করে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দারুল ইসলামে বসবাস করার জন্য আসতেন। পাশাপাশি তাঁরা এর পুনর্নির্মাণেও অংশ নিতেন এবং তালেবানের সাথে মিলে জিহাদও করতেন। আফগানিস্তানের বাইরে নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না।
>
> ৩. জিহাদী সংগঠনসমূহ: এ ধরনের সংগঠনগুলোর পূর্বনির্ধারিত জিহাদী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছিল। তাঁরা আফগানিস্তানে এসে তাঁদের পুরোনো সাংগঠনিক কাঠামো বহাল রাখত এবং পূর্বনির্ধারিত গতানুগতিক (আঞ্চলিক, গোপনীয় বা হায়ারার্কিকাল) কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার চেষ্টা করত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মিশরের আল-জামায়াতুল ইসলামিয়া ও লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ (LIFG)। এ ছাড়াও ছোটখাটো আরও কিছু সংগঠন ছিল।

৪. মধ্যএশীয় সংগঠনসমূহ: তাদের লক্ষ্য ছিল বহুমাত্রিক। যেমন: দারুল ইসলামে হিজরত করা, দারুল ইসলামকে সাহায্য করা, এর পক্ষে জিহাদ করা এবং নিজ দেশে জিহাদের জন্য আফগানিস্তান থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই সংগঠনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সংগঠন ছিল উজবেক মুজাহিদদের সংগঠন ইসলামিক মুভমেন্ট অফ উজবেকিস্তান (IMU) এবং চীনের দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদদের সংগঠন ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (ETIP)। এ ছাড়াও আরও কিছু সংগঠন ছিল।

৫. পাকিস্তানের মুজাহিদীন: তারা ছিলেন পাকিস্তানের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও উলামায়ে কেরামের ছাত্র। চিন্তা ও আদর্শে তাঁরা পুরোপুরি আফগান তালেবানের অনুগামী ছিলেন। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে এবং আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের নানাবিধ ইস্যু জড়িত থাকার কারণে পাকিস্তানি মুজাহিদদের উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এমনকি তাঁদের সংখ্যা উল্লিখিত সবগুলো দলের সামষ্টিক সংখ্যা থেকেও বেশি ছিল।'

আফগান রণাঙ্গনে এ সব জিহাদী সংগঠনের বহু অর্জন ছিল। কিন্তু তাদের ব্যর্থতা ছিল অন্য জায়গায়। শায়খ আবু মুসআব লেখেন—

'উম্মাহর বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে নিজেদেরকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারাটাই ছিল এই বৈশ্বিক জমায়েতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। অথচ তখন আফগানিস্তানের ময়দানে এমন অভূতপূর্ব এক সুযোগ তৈরি হয়েছিল, যে সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না। প্রথমত: এই জমায়েত একটি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কত তরুণ-যুবক, বীরপুরুষ ও নেতা, দাঈ ও প্রবীণ মুজাহিদ যে একত্র হয়েছিলেন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয়ত: আফগানিস্তানের ময়দানে অর্থ-সম্পদ আর প্রয়োজনীয় রসদপত্রের এমন জোগান তৈরি হয়েছিল, যা দিয়ে আন্তর্জাতিক মানের সুশৃঙ্খল একটি জিহাদী তানজীম অনায়াসেই তৈরি করা যেত, যারা বৈশ্বিক পরিসরে উম্মাহর নানা সংকট নিরসনে এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ তৈরিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারত। অথবা বিদ্যমান বিভিন্ন দল ও সংগঠনের মত-পথ, মানহাজ ও কর্মপন্থা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নতুন বাস্তবতার আলোকে যাচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে [সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও বাস্তববাদী মানহাজ নিরূপণ করার] উদ্যোগ গ্রহণ করা যেত। এতে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর প্রতি সকলের নিঃশর্ত আনুগত্য এবং শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর আইকনিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে খুব সহজেই ব্যবহার করা যেত। কিন্তু, আফসোসের বিষয় হলো, এগুলোর কোনোটিই হয়নি।

এরচেয়েও বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, গতানুগতিক সাংগঠনিক পদ্ধতিতে নিজ নিজ দেশের মুরতাদ সরকারকে হটিয়ে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার যে 'আঞ্চলিক জিহাদের

ধারণা' আফগান জিহাদের আগে বিভিন্ন সংগঠন লালন করত, আফগান জিহাদের পর তা নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে অধিকাংশ সংগঠন সেটাকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এই যুগে আঞ্চলিক জিহাদের এই ধারণা বারবার ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্যই শায়খ উসামা রহ. এবং আল-কায়েদা বিগত পাঁচ বছর ধরে আমেরিকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও একমুখী জিহাদ পরিচালনার কথা বলে আসছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে একমুখী জিহাদ পরিচালনার জন্য সবার সামনে দুটি পদ্ধতি তখন উন্মুক্ত ছিল। এক. আল-কায়েদার সাথে একীভূত হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা অথবা দুই. আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া (গ্লোবাল ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ অ্যাগেইন্সট জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডারস) জোটে শরীক হয়ে জিহাদ করা। ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কিছু জিহাদী সংগঠন ছাড়া শায়খ উসামার আহ্বানে তেমন কেউ সাড়া দেয়নি। এরইমধ্যে ৯/১১-এর ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে এবং ইসলামী ইমারাতের ওপর আমেরিকা আক্রমণ করে বসে। এতদিন যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে একমুখী জিহাদের দাওয়াতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিল না, খোদ আমেরিকাই এবার তাদেরকে নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে আনে। অবশেষে সব দল নিজেদের স্বতন্ত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে গ্লোবাল জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।'[৯৩]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কিছু কিছু জিহাদী জামাত এরপরেও অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আঞ্চলিক জিহাদের চিন্তা লালনকারী দলগুলো ইরাক ও সিরিয়ায় নতুন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে থাকে। বারবার এই একই ভুল করার কারণে শায়খ আবু মুসআব সূরীও সীমাহীন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এরচেয়েও তিক্ত বাস্তবতা হলো, এমন কিছু দলও এই ভুলটি করে বসে, যারা শায়খ উসামার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আল-কায়েদার সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছিল অথবা আল-কায়েদার লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ক্রুসেডারবিরোধী জোট আল-জাবহাতুল ইসলামিয়াতে (গ্লোবাল ইসলামিক ফ্রন্ট) শরীক হয়েছিল। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, তারাও একসময় পিছুটান দেয় এবং সেই আঞ্চলিক জিহাদের চিন্তা পুনরায় গ্রহণ করে নেয়। এ ব্যাপারে শায়খ আবু মুসআব সূরী বলেছেন, 'আঞ্চলিক জিহাদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার হটিয়ে শরয়ী শাসন কায়েম করার যে কর্মপন্থা তারা গ্রহণ করেছে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এই যুগে এই কর্মপন্থা ইতঃপূর্বে বারবার ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।'

[৯৩] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ

খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের দ্বারা যেন একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অন্যের ভুল থেকে যেন আমরা শিক্ষা নিতে পারি। এ জন্য দীন কায়েমের আন্দোলনের সকল কর্মী, বিশেষ করে আঞ্চলিক জিহাদী জামাতগুলোর প্রতি আমার আন্তরিক অসীয়ত থাকবে, তারা যেন তালেবান আন্দোলন নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে। কোন পদ্ধতিতে তারা আজকের এই অবস্থানে গিয়েছে, তা নিয়ে যেন চিন্তাভাবনা করে। ক্রুসেডার থিংক ট্যাংক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন আমাদের আগে এ কাজে হাত দিতে না পারে। অবশ্য শত্রুরা ইতোমধ্যেই তালেবান আন্দোলন নিয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম গবেষণার কাজ শুরু করে দিয়েছে আর এই গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল আমাদের বিরুদ্ধেই তারা প্রয়োগ করবে। তাদের অবস্থার যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস রাযি.। তিনি বলেছেন—'পুরো মানবজাতির মধ্যে রোমানরাই বিপদের পর সবচেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় এবং পলায়নের পর সবচেয়ে দ্রুত পালটা আঘাত হানে।'[৯৪] এ ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও তড়িৎকর্মা হতে হবে আমাদের, যাতে আমরাও তালেবানের অবস্থানে পৌঁছাতে পারি।

[৯৪] সহীহ মুসলিম : ২৮৯৮

# পঞ্চম অধ্যায়

# ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ৯/১১-এর বরকতময় হামলা

## ঝড়ের পূর্বাভাস

১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়েই আমেরিকা ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলো আফগানিস্তানের তালেবান শাসনের পতন ঘটানোর জন্য তাদের রাজনৈতিক পলিসি ঘোষণা করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট (মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) এক প্রেস ব্রিফিংয়ে[১] বলে, উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলেও আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাদের নীতি কখনো বদলাবে না। এ বিবৃতি তালেবানের জন্য নতুন এক ইঙ্গিত ছিল যে, আমেরিকা কখনোই আফগানিস্তানের পিছু ছাড়বে না, যদিও উসামা বিন লাদেন চলে যান। এর ফলে তালেবান নিশ্চিত হয়ে যায়, তাদের ইসলামী শাসনব্যবস্থাই মূলত আমেরিকার টার্গেট। মার্কিন সরকারের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এর দ্বারা তালেবানের সে সব নেতারা চুপ হয়ে যান, যারা শায়খ উসামাকে ওয়াশিংটন ও তালেবানের মধ্যকার দ্বন্দের মূল কারণ মনে করতেন। এভাবে তালেবানের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে ওঠে যে, আমেরিকাই হলো ইসলামী হুকুমতের আসল শত্রু।[২]

৯/১১-এর দুই মাস আগেই ইমারতে ইসলামিয়া নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে জানতে পারে, আমেরিকা আফগানিস্তানে নজিরবিহীন বিমানহামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তালেবান সরকারকে উৎখাত করে নির্বাসনে থাকা জহির শাহকে ফিরিয়ে এনে নতুন সরকার গঠনের পরিকল্পনা করছে। পাকিস্তানের ইসলামী ধারার পত্রিকা 'যরবে মুমিন' এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল, পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব নিয়াজ নায়েক তালেবান সরকারকে জানিয়েছিলেন, মার্কিন সরকারের সিনিয়র কর্মকর্তারা তাকে ২০০১ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে বলেছিল, যদি বিন লাদেনকে অবিলম্বে হস্তান্তর না করা হয়, তাহলে ২০০১ সালের অক্টোবরের মধ্যভাগে আমেরিকা তাঁকে এবং তালেবানের নেতা মোল্লা উমরকে গ্রেফতার বা হত্যা করার জন্য সামরিক পদক্ষেপ নেবে। নিয়াজ নায়েক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই অভিযানের বৃহত্তর লক্ষ্য হবে তালেবান সরকারকে উৎখাত করে মধ্যপন্থি আফগানদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন

[১] লিঙ্ক: https://irp.fas.org/news/1999/02/990217db2.htm

[২] মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ওয়া তালিবান ওয়া আফগানিস্তান : মোল্লা আব্দুল হাই মুতমাইন

সরকার গঠন করা, যার প্রধান হবে আফগানিস্তানের সাবেক রাজা জহির শাহ। তিনি আরও বলেছিলেন, এই অভিযান চালানো হবে তাজিকিস্তানের সামরিক ঘাঁটি থেকে, উজবেকিস্তানও এ অভিযানে অংশ নেবে এবং ১৭ হাজার রাশিয়ান সৈন্যও অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইসলামী ইমারত যদি অবিলম্বে উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করে, তাহলে আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে কি না—এ ব্যাপারে নিয়াজ নায়েক সংশয় প্রকাশ করেন।[৩]

মার্কিন আগ্রাসন শুরুর মাসখানেক আগে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আইএসআই প্রধান জেনারেল মাহমুদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আফগান সফরে আসে। সাথে কয়েকজন আলেমও ছিলেন। তারা মোল্লা উমরকে বলেন, আপনি যদি শায়খ উসামা ও তার সাথে থাকা আরব মুজাহিদদের আমেরিকার হাতে তুলে দেন, তাহলে আপনি নিজেও আমেরিকার হামলা থেকে বেঁচে যাবেন, আপনার রাষ্ট্র ও অনেক কষ্টে অর্জিত ইসলামী শাসনও টিকে থাকবে। তারা শরয়ী দিক থেকেও নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তখন মোল্লা উমর জবাবে বলেছিলেন, 'আপনাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর এমন কোনো নস আছে, যার আলোকে একজন মুসলিম মুজাহিদকে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়া জায়েয বলা যায়? হাশরের ময়দানে আমার রব যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি একজন মুসলিম মুজাহিদকে কীভাবে কাফেরদের হাতে তুলে দিলে, তখন আমি কী জবাব দেব? আমি চাই না, ইতিহাস আমাকে এ কারণে মনে রাখুক যে, আমি একজন মুসলিমকে কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছি আর আমার বংশধর আজীবন এই লাঞ্ছনার গ্লানি বয়ে বেড়াক।'

আমীরুল মুমিনীন এবং তালেবানের ঊর্ধ্বতন একাধিক নেতা বিভিন্ন সময় স্পষ্টভাবেই এ কথা বলেছেন যে, কেবল উসামা বিন লাদেনের উপস্থিতি নয়, তালেবানের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের মূল কারণ ইসলামের অনুসরণ। একবার আমীরুল মুমিনীন বলেছিলেন, 'ব্রিটিশরা যখন আফগানিস্তানে হামলা করেছিল, তখন কিন্তু উসামা বিন লাদেন ছিলেন না। এরপর রুশরাও হামলা চালিয়েছে, তখনও উসামা ছিলেন না।'

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের একবছর পর মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে পাঠানো এক বার্তায় আমীরুল মুমিনীন রহ. বলেছিলেন—

> 'আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই একটি অংশ। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা, শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন রুখে দেওয়া এবং ইসলামের

[৩] আল্লাহু আকবার, খারিবাত আমরিকা : ফারিস যাহরানী রহ.

পুনরুত্থান ঠেকানো। কারণ, ইসলামের এই পুনর্জাগরণ তাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে হামলা আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য আমেরিকা যদিও ৯/১১-এর হামলাকে দায়ী করে থাকে, কিন্তু আমরা জানি, এটাই একমাত্র কারণ না। আমরা জানি, ৯/১১-এর ঘটনা ঘটার অনেক আগেই আমেরিকা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে ইসলামী ইমারাতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে রেখেছিল। তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে ৯/১১-এর ঘটনাকে ব্যবহার করে নিজেদের অন্যায় আগ্রাসনের বৈধতা তৈরি করে নিয়েছে। ৯/১১-এর ঘটনা যদি না ঘটত, তারা ঠিকই অন্য কোনো অজুহাত বের করে নিত। ৯/১১-এর আগে থেকেই যদি তাদের হামলার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা না থাকত, তাহলে এমন একটি ঘটনার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করত না, যে ঘটনা কারা ঘটিয়েছে, সেটাই এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।'[৪]

তা ছাড়া যেমনটা আমরা আগেও বলেছি, শায়খ উসামা আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলেন, তালেবান বা অন্য কোনো সরকার আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থা থেকে বের হয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে—আমেরিকা এটা কিছুতেই মেনে নেবে না। যে বা যারাই এই বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাবে, তাদের ওপরেই আমেরিকা নানামুখী অবরোধ আর শাস্তি চাপিয়ে দেবে, তাদের ধ্বংস করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে। এ ছাড়াও উম্মতে মুসলিমা, বিশেষ করে ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি আমেরিকার আগ্রাসি নীতি আগে থেকেই বহাল ছিল। এ সব নানামুখী কারণে শায়খ উসামা নিশ্চিত ছিলেন, আমেরিকাকে আঘাত করলে যে পরিণতি হবে, না করলেও একই পরিণতি হবে। তাই, তাঁর মতে আঘাত করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল এবং এ ক্ষেত্রে আগ বেড়ে তাদের ভূমিতেই তাদের ওপর আঘাত করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল। অন্যথায় আমাদের ভূমিতেই তাদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

শায়খ উসামা বিশ্বাস করতেন, জাযীরাতুল আরব থেকে ক্রুসেডারদের বহিষ্কার করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়ত বাস্তবায়নের জন্য যে-কোনো ধরনের কুরবানী পেশ করা অপরিহার্য। কারণ, মুসলিমদের পবিত্র ভূমির মর্যাদা যদি কাফেরদের পদতলে পিষ্ঠ হয় আর তাদের ভূমিতে যদি কাফেরদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মুসলিমদের বেঁচে থাকার কোনো মূল্যই থাকে না। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, আমেরিকাকে আঘাত করা বা না-করা নিয়ে আসলে ভয়ের কিছুই নেই। কারণ [আমেরিকার ওপর আঘাত

[৪] ফুরসানুল ফারিযাতিল গায়িবাহ : সালেহ হামী

করলে যে পরিণতির আশঙ্কা করা হচ্ছে,] তারা তো এখন সেই পরিণতিই ভোগ করছেন। যে ব্যক্তি সাগরে সাঁতার কাটে, সে কি আর বৃষ্টিকে ভয় পায়?[৫]

শায়খ উসামা রহ. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর একটি ফতওয়াকে দলীল হিসেবে পেশ করতেন—'ঈমান আনার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো দীন-দুনিয়া ধ্বংসকারী আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করা।' এই ফতওয়ার আলোকে শায়খ উসামা বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের পবিত্র ভূমি দখল করে রাখা মার্কিনিদের বিতাড়িত করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। তারা শুধু ভূমিতেই তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করেনি; মুসলিম উম্মাহর জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তারা আধিপত্য কায়েম করে রেখেছে। আর এ জিহাদ হলো ফরযে আইন, যা বিলম্বিত করা যায় না এবং এ থেকে পিছু হটাও বৈধ নয়। এ জিহাদ বন্ধ করার অধিকার কোনো বৈধ শাসকেরও নেই। কারণ, এটা হলো উম্মাহর মৌলিক স্বার্থ। আর উম্মাহর স্বার্থ সব সময় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য পাবে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সব সময় দলীয় স্বার্থের ওপর প্রাধান্য পাবে আর দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাবে ব্যক্তিস্বার্থের ওপর ।

শায়খের আশঙ্কা ছিল, এখন যদি এ বিষয়ে মানুষ নীরব থাকে এবং হারামাইনের পবিত্র ভূমি থেকে কাফেরদের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য তারা সোচ্চার না হয়, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিমরা বিষয়টি ভুলে যাবে এবং ধীরে ধীরে তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। এরপর যত প্রজন্মই আসবে, তারা বিদ্যমান বাস্তবতাকে মেনে নেবে অথবা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। এভাবেই বিষয়টি সময়ের সাথে সাথে ব্যস্ততার ভিড়ে হারিয়ে যাবে, ঠিক যেমন ফিলিস্তিন ইস্যু হারিয়ে গেছে এবং তারও আগে হারিয়ে গেছে আন্দালুস।

শায়খ উসামা এটাও জানতেন যে, আমেরিকার ওপর এবার যে আক্রমণ করা হবে, তা পূর্বের যে-কোনো আক্রমণ থেকে বড় ও ভয়াবহ হবে। ফলে আমেরিকার প্রতিক্রিয়াও হবে অত্যন্ত কঠোর। আফগানিস্তানে কয়েকটি ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেই তারা ক্ষান্ত হবে না, যেমনটা নাইরোবি ও দারুস সালামের দূতাবাসে হামলার জবাবে করেছিল। বরং এই হামলার কারণে এমন একটি বিরতিহীন যুদ্ধ শুরু হতে পারে, যাতে তালেবান ও আফগান জনগণ অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু শায়খ উসামার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিশ্বের মধ্যে একমাত্র আফগান জাতির পক্ষেই দীর্ঘমেয়াদি এই যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও সাহস আছে। আর আল্লাহ চাইলে পরিশেষে বিজয়ও তাদেরই হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইতঃপূর্বে তাঁদের হাতেই গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তিকে পরাজিত করেছেন।

[৫] প্রাগুক্ত

## আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি[৬]

একবার কয়েকজন তালেবান নেতা শায়খ উসামার সাথে দেখা করার জন্য এয়ারপোর্ট কলোনিতে আসেন। তাঁদের মধ্যে কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রহমানী, আমীরুল মুমিনীনের অফিস প্রধান তৈয়্যব আগা-সহ আরও অনেকেই ছিলেন। শায়খ উসামা স্বভাবজাত অতিথিপরায়ণতা নিয়ে তাদের স্বাগত জানান এবং বেশ খাতির-যত্ন করেন। সে বৈঠকে শায়খ আবু হাফস, শায়খ আহমাদ হাসান আবুল খায়ের, শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযীদ ও শায়খ ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী উপস্থিত ছিলেন। কথাবার্তার একপর্যায়ে শায়খ উসামা বলেন, 'ইতিহাস আপনাদের দুটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখবে। একটি আপনাদের পক্ষে, আরেকটি বিপক্ষে। আপনাদের পক্ষের বিষয়টি হলো, আপনারা মার্কিনিদের থেকে আরবদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর আপনাদের বিপক্ষের বিষয়টি হলো, আপনারা আরবদের হাত থেকে মার্কিনিদের বাঁচিয়েছেন।' শায়খের এ কথা শুনে মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান—যিনি তখন তালেবান সরকারের প্রধান ছিলেন—বললেন, 'না, না, শায়খ, এটা ঠিক নয়।'

শায়খ উসামা তৈয়্যব আগাকে তখন একটি ফাইল দেন। তাতে আল-আকসার সাথে ইহুদীদের বেহুরমতি, মুসলিম নারীদের ওপর অত্যাচার এবং মুসলিমদের বসতবাড়ি ধ্বংস করার বিভিন্ন ভিডিও ও ছবি ছিল। শায়খ উসামা তৈয়্যব আগাকে বলে দেন, 'আমি চাই, আপনি এই ছবি ও ভিডিওগুলো আমীরুল মুমিনীনকে দেখাবেন।' তৈয়্যব আগা অবাক হয়ে বলেন, 'অসম্ভব! মোল্লা উমর কোনো ছবিই দেখেন না। তাকে কীভাবে দেখাব।' তখন শায়খ উসামা তাঁকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীনের জন্য এগুলো দেখা জরুরি। কখনো কখনো চিকিৎসার জন্য মানুষের সতর দেখাও তো ডাক্তারের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে আর মোল্লা উমর তো মুসলিম উম্মাহর ডাক্তার। তাই তাঁকে অবশ্যই এগুলো দেখতে হবে।'

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. ভিডিওতে ইহুদীদের জুলুম-অত্যাচার দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তৈয়্যব আগাকে বলেন, 'এক্ষুনি উসামাকে ডেকে পাঠান।' শায়খ উসামা উপস্থিত হলে আমীরুল মুমিনীন রহ. তাঁকে বলেন, 'আমি চাই, আপনি ইহুদীদের ওপর আঘাত করুন। সেটা যেখানেই হোক না কেন।' শায়খ উসামা তাঁকে বলেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমীরুল মুমিনীন। ইনশাআল্লাহ আজ থেকেই আমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করছি।' শায়খ উসামা রহ. আমীরুল মুমিনীনের মজলিস থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর সঙ্গী শায়খ আবু বাসীর [নাসের উহাইশী]-কে বলেন, 'আমীরুল মুমিনীন অনুমতি দিয়েছেন।'

---

[৬] ৯/১১-এর না বলা গল্প : শায়খ নাসির উহাইশী রহ.

ঠিক সে সময়েই তালেবানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরাসরি আমেরিকার পক্ষ থেকে একটি চিঠি এসে পৌঁছায়। সেই চিঠি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, তালেবানকে আমেরিকা কতটা ঘৃণা করে। নূন্যতম সৌজন্যতাবোধটুকুও ত্যাগ করে সম্পূর্ণ সাদা একটি পৃষ্ঠায় শুধু একটি বাক্য লেখা ছিল—'কথা একটাই, হয় তোমরা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করবে, না-হয় আমরা আফগানিস্তানে হামলা চালাব।'

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে অবস্থানরত অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ভাইদেরকে শায়খ উসামা বারবার বলছিলেন, হামলা যেন আরও কিছুদিন পরে হয়। শায়খ রহ. চাচ্ছিলেন, আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালানোর যে পরিকল্পনা করছে, সে অনুযায়ী তারা আগে হামলা চালাক। এরপরে যদি আমেরিকায় হামলা চালানো হয়, তাহলে একে আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে জবাবি হামলা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে এবং এই হামলার পেছনেও যৌক্তিক একটি কারণ দাঁড় করানো যাবে। কিন্তু আমেরিকায় অবস্থানকারী ভাইয়েরা বলছিলেন, অপারেশনে বেশি দেরি করা যাবে না। কেননা পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নেই, সামান্য সন্দেহে তাঁরা গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন।'

অপারেশনের অল্প কিছুদিন আগে শায়খ রহ. কান্দাহারের সিত্তা কলোনিতে ভাইদের সাথে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি বলেন, 'অতি শীঘ্রই আমেরিকার ওপর শক্তিশালী একটি হামলা হবে। তাই প্রত্যেকেই যেন যে-কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন।' অপারেশনের যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। সরাসরি অপারেশনের সাথে যুক্ত ভাইয়েরা বাদে কেউই হামলার ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতেন না। তাই তাঁরা ভাবছিলেন, এটিও হয়তো আগের মতোই সাধারণ কোনো গাড়ি বোমাহামলা হবে। এ কারণেই অনেকে এই মুহূর্তে কোনো হামলা চালানোর বিরোধিতা করছিলেন। তাদের মধ্যে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযীদ রহ. এবং শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফি. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মত ছিল, এটি যেহেতু একটি ইজতেহাদী বিষয়, তাই আমীরুল মুমিনীনের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। আর এর পরিণতিও আফগানদের জন্য শুভ হবে না, তাই বুঝেশুনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

শায়খ উসামা রহ. ভাইদের মতামত শোনার পর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি বক্তৃতা দেন। প্রথমেই তিনি আবু বকর রাযি.-এর বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করেন—'**أينقص الدين و أنا حي**' - আমি বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি হবে!' তারপর তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে বলতে থাকেন—

> 'পুরো উম্মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এই উম্মতের জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে। আর আমীরুল মুমিনীন তো ইহুদীদের ওপর আঘাত করার অনুমতি আমাদের আগেই দিয়েছেন। আমেরিকান ও ইহুদীরা যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ—তা কে না জানে। উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো—মুসলিম ভূখণ্ডে কাফের বাহিনী

প্রবেশের আগেই কোনো মুসলিম যদি কাফেরদের ওপর আঘাত হানার এমন কোনো সুযোগ পায়, যা হয়তো পরে আর পাওয়া যাবে না, এমতাবস্থায় আমীরের অনুমতি নিতে গেলে যদি সে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার কর্তব্য হলো, আমীরের অনুমতি ছাড়াই কাফেরদের ওপর হামলা করা।'

'আমেরিকান ও ইহুদীরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ'—এ ব্যাপারে শায়খ উসামা পরিপূর্ণ আস্বস্ত ছিলেন। কিন্তু তারপরেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে, শায়খ সরাসরি ইহুদীদের ওপর ইসরাইলে কেন হামলা করলেন না? তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই যে, শায়খ উসামা যদি আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে ইসরাইলের রাজধানী তেল আবিবের ওপর হামলা করতেন এবং সেখানে নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনের সমপরিমাণ বা এরচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করতেন, তাহলে কি আফগানিস্তান ও তালেবানের সাথে যা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম কিছু হতো? অন্যভাবে বললে, হামলা যদি আমেরিকায় না হয়ে তেল আবিবে হতো, তাহলে ইসরাইল, তার মিত্র আমেরিকা, ইউরোপ ও ন্যাটোর প্রতিক্রিয়া কি একই থাকত না-কি ভিন্ন হতো? আমি মনে করি না, কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, তেল আবিবে হামলা হলে তাদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতো। আমাদের প্রবল ধারণা বা দৃঢ় বিশ্বাসই বলা যায় যে, তখনও হামলার প্রতিক্রিয়া খুব কঠিন না হলেও কোনো অংশেই এরচেয়ে কম হতো না। কারণ, অবৈধ ইসরাইলের সাথে আমেরিকা, ন্যাটো ও ইউরোপীয় দেশগুলোর কৌশলগত মজবুত সম্পর্ক থাকার পাশাপাশি অসংখ্য গোপন ও প্রকাশ্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা রয়েছে। ১৯৪৮ সালে এই অবৈধ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত আরবদের সাথে তাদের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলো যুদ্ধেই পশ্চিমারা, বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স, ইসরাইলকে সীমাহীন রাজনৈতিক, সামরিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে তাদের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্ককে আরও জোরদার করে এসেছে। ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা আমাদের এটাই বলে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইল যতগুলো যুদ্ধ করেছে, এর প্রত্যেকটিতেই ইসরাইলের প্রতিপক্ষ ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈধ আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং তারা নিজেদের দখলকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। ইসরাইলের স্পষ্ট অন্যায় দেখেও যদি পশ্চিমারা এ সব যুদ্ধে ইসরাইলকে এত সহায়তা দিতে পারে, তাহলে আল-কায়েদার মতো একটি জিহাদী তানজীমের সাথে তারা কী করতে পারে, যাদের আন্তর্জাতিক কোনো বৈধতা নেই; উলটো যারা ঘোষণা দিয়ে মুসলমিদের পবিত্র ভূমি দখল করে রাখা ক্রুসেডার ও জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নিজেদের ওয়াকফ করে দিয়েছেন? এ সব কারণেই আমি মনে করি, কোনো বিবেকবান ব্যক্তি শায়খ উসামার এ কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না যে, 'আমেরিকা ও ইহুদীরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ'।

শায়খ উসামার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমেরিকা এই হামলার জবাবে এমন এক যুদ্ধ শুরু করবে, যা এক বা দুই দশক পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে আমেরিকার ভাঙন শুরু হবে। ধীরে ধীরে তার সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির প্রভাব হারাতে থাকবে এবং একসময় সংকুচিত হতে হতে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

## কেন তারা আমাদের ঘৃণা করে?

পশ্চিমা অ্যাকাডেমিশিয়ান ও নীতি নির্ধারকদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসে—তারা (মুসলিম মুজাহিদগণ) কেন আমাদের ঘৃণা করে? আমেরিকানদের ধারণা হলো, সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের মতো যে-সব নেয়ামত (তাদের দাবি অনুযায়ী) আল্লাহ তাদের দিয়েছেন, সে জন্য আমরা তাদের হিংসা করি। তাদের এই দাবি কি সত্য?

মার্কিন লেখক উইলিয়াম ব্লুম তার বই 'Rogue State'-এ লিখেছেন—

> '[৯/১১-এর মতো ঘটনার] পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে জরুরি ছিল অথবা জরুরি মনে করা উচিত ছিল, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি হলো এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যে, 'কেন এমনটা ঘটল?'

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. মার্কিন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর দ্বিতীয় খোলা চিঠিতে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ২৯শে অক্টোবর ২০০৪-এ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> 'হে মার্কিনিরা, এই চিঠিতে আমি আরেকটি ৯/১১ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব। তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল নিয়ে কথা বলব। এ সব হামলার নেপথ্য কারণগুলো তোমাদের জানাব। যে সময় এ হামলাগুলোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা তোমাদের সামনে তুলে ধরব। যেন তোমরা চিন্তা করতে পার। আল্লাহ তাআলা জানেন, টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার কোনো চিন্তাই আমার মধ্যে ছিল না। কিন্তু যখন জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, ফিলিস্তিন ও লেবাননে চোখের সামনে যখন আমাদের ভাইবোনদের ওপর ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোটের নৃশংসতা দেখলাম, তখন তোমাদের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের চিন্তা আমার মাথায় এলো। কিন্তু যে ঘটনাগুলো আমার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে, তা ১৯৮২ সাল ও তার পরে ঘটেছে। আমেরিকা তখন ইসরাইলকে লেবানন ধ্বংসের অনুমতি দিয়েছিল এবং এই ধ্বংসযজ্ঞে মার্কিন নৌবাহিনীর থার্ড ফ্লিট সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের বোমা হামলায় অগণিত মানুষ নিহত হলো, অসংখ্য মানুষ আহত হলো। আতংকিত মানুষগুলো ভিটেমাটিছাড়া হলো।

সেই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ, এখানে সেখানে পড়ে থাকা নারী ও শিশুদের লাশ। ঘরভর্তি মানুষের ওপর তারা বোমা বর্ষণ করেছিল, উঁচু উঁচু ভবনগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছিল শহরজুড়ে। মনে হচ্ছিল, দুর্বল কোনো শিশুকে হিংস্র কুমির কামড়ে ধরেছে, চিৎকার করা ছাড়া শিশুটির আর কিছুই করার নেই। কিন্তু কুমির কি অস্ত্র ছাড়া সংলাপের ভাষা বুঝবে?

সমগ্র বিশ্ব তখন নির্বিকার ভঙ্গিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। সেই কঠিন মুহূর্তে আমার মনে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা বর্ণনা করা সম্ভব না। কিন্তু তখনই আমার মধ্যে জুলুমকে রুখে দেওয়ার এক দুর্দমনীয় চেতনা জাগ্রত হয়, জালেমকে শাস্তি দেওয়ার এক অদম্য ইচ্ছা জন্ম নেয়। লেবাননের উঁচু উঁচু ভবনগুলো যখন ধসে পড়তে দেখেছিলাম, তখনই ঠিক করেছিলাম, জালেমদেরকেও আমি এই একই শাস্তি দেব, আমেরিকার উঁচু উঁচু টাওয়ারগুলো ধ্বংস করে দেব, যাতে ধ্বংসের স্বাদ তারাও কিছুটা অনুভব করে এবং আমাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করা থেকে কিছুটা হলেও পিছু হটে।

এমন অসংখ্য নারকীয় নির্যাতন আর বর্বর জুলুমের প্রতিশোধ নিতেই মূলত ৯/১১-এর হামলাটি হয়েছে। নিজের বাড়িঘর রক্ষার জন্য কেউ যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাহলে তাকে কি তিরস্কার করা যায়? আত্মরক্ষা করা ও জালেমকে তার জুলুমের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া কি সন্ত্রাসবাদী কাজ? এটা যদি অপরাধ হয়, তাহলে এই অপরাধ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।'[৭]



১৯৮২ সালে দক্ষিণ লেবাননের সাবরা ও শাতিলা রিফিউজি ক্যাম্পে
ফিলিস্তিনীদের ওপর চালানো গণহত্যার চিত্র

[৭] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

কথায় আছে 'সত্য সেটাই, যা শত্রুও স্বীকার করে নেয়'। আমেরিকার প্রতি আমাদের শত্রুতার কারণ যে তাদেরই জুলুম-অত্যাচার, সেটা তারাও স্বীকার করে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার অবসরগ্রহণের কয়েক বছর পর তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণগুলো স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করে বলেছিল—

> 'আমরা লেবাননে মেরিন সেনা পাঠিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে মানুষের মনে কী পরিমাণ ঘৃণা লুকিয়ে আছে, তা জানার জন্য আপনাদের বেশি কিছু করতে হবে না, কেবল লেবানন, সিরিয়া বা জর্ডানে গেলেই হবে। কারণ, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষগুলোকে গুলি করে, বোমাবর্ষণ করে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছি। বৈরুতের আশেপাশের গ্রামগুলোতে থাকা নিরীহ নারী, শিশু, কৃষক ও গৃহিণীদের হত্যা করেছি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বিক্ষুব্ধ এই মানুষগুলোর কাছে আমরা শয়তান হিসেবে চিত্রিত হয়েছি। এ সব কারণেই ইরানে আমাদের নাগরিকদের জিম্মি করা হয়েছিল। এই সব সন্ত্রাসী হামলার পেছনেও এই ঘটনাগুলোই দায়ী।'

মাইকেল শইয়ার ২২ বছর সিআইএ-তে চাকরি করেছেন। ২০০৪ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সিআইএ পরিচালিত বিন লাদেন ইস্যু স্টেশন (অ্যালেক স্টেশন)-এর প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার বই Imperial Hubris-এ লিখেছেন—

> 'বিন লাদেন খুব সচেতনভাবেই আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছেন, কী কী কারণে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তার উল্লিখিত কারণগুলোর সাথে আমাদের স্বাধীনতা, সাম্য কিংবা গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্কই নেই; বরং এর সম্পর্ক হলো আমেরিকার ফরেন পলিসি ও ইসলামী বিশ্বে আমেরিকার কৃত অপরাধের সাথে।'

এই বইয়ে মাইকেল শইয়ার সে কারণগুলোও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলো শায়খ উসামাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আরবের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের সহযোগিতা। এ ছাড়াও জাযীরাতুল আরব, ইরাক, আফগানিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি এবং আরবের খনিজ তেলের ওপর আধিপত্য বিস্তার-সহ আরও অনেক কারণ রয়েছে। মাইকেল শইয়ার যদিও অ্যালেক স্টেশনের প্রধান হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু তিনি মার্কিন নীতি নির্ধারকদের এটাও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তারা যেন এ সব সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হন। তাহলেই তারা আমেরিকাকে ভবিষ্যতের হুমকি থেকে বাঁচাতে পারবেন, যার মধ্যে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হুমকিও অন্তর্ভুক্ত। অবাক করা বিষয় হলো, শইয়ার তার এই বইয়ে অত্যন্ত শক্তভাবে শায়খ

উসামার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। শায়খ ও তাঁর জামাত (আল-কায়েদার) ব্যাপারে তিনি বলেছেন, তারা নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরেছে। এতটুকুই নয়, তিনি শায়খ উসামাকে একজন ধার্মিক ঈমানদার, কোমল, উদার, সাহসী মুসলিম ও প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

একইভাবে মার্কিন লেখক উইলিয়াম ব্লুম তার বই 'Rogue State'-এ লিখেছেন—

> 'আমেরিকার বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, একে দমন করার জন্য আমেরিকা কী করতে পারে? এর উত্তর হলো, যে-সব কারণে সন্ত্রাসীরা আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে, সে কারণগুলো নির্মূল করতে হবে। আর এটি বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে আমূলে বদলে ফেলতে হবে। পুরো বইজুড়ে এই বিষয়টিই আলোচনা করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, শায়খ উসামা ২০০৬-এর জানুয়ারিতে মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠিতে তাদেরকে উইলিয়াম ব্লুমের বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২০০৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত অন্য আরেকটি চিঠিতে তাদের এই বলে নসীহত করেছিলেন যে, 'আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছ, এর পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা জানতে চাইলে মাইকেল শইয়ারের বইটি পড়ে দেখো।'

## ৯/১১ হামলা: কুমিরের সাথে কথা হবে অস্ত্রের ভাষায়

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ তাঁর বই 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী'-তে লিখেছেন—

> 'আমেরিকা মনে করত, দুই মহাসাগরের মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ায় তারা বেশ সুরক্ষিত। দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক অবস্থান ও অনন্য সামরিক শক্তির কারণে তারা নিজেদেরকে সবধরনের বহিরাগত হামলা থেকে নিরাপদ মনে করত। তারা ভাবত, কেউ তাদের ভূখণ্ডে এসে আঘাত করতে পারবে না; বরং তারাই সব সময় অন্যের ভূখণ্ডে গিয়ে আঘাত হানবে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের এই ধারণাকে আরও শক্তিশালী করেছিল। পার্ল হারবারের আক্রমণ ছাড়া বড় বড় সব যুদ্ধই আমেরিকার ভূখণ্ড থেকে দূরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ৯/১১-এর বরকতময় হামলা তাদের এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। এই হামলার কারণে তারা বুঝতে পেরেছে, অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো আমেরিকাও এখন বিপজ্জনক ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তারাও এখন হামলার আশঙ্কায় ভয় পেতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই যেমন কর্ম, তেমন ফল।'

শায়খ রিফায়ী ত্বহা রহ. 'যরবুল মুদাম্মিরাহ কোল, দুরুস ওয়া ইবার' শিরোনামে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> 'প্রত্যেক শক্তিশালীর কিছু দুর্বল পয়েন্ট থাকে এবং প্রত্যেক দুর্বলের কিছু শক্তিশালী দিক থাকে। দুর্বলরা যদি তাদের শক্তিশালী দিকগুলো ভালোভাবে ব্যবহার করে শক্তিশালীদের দুর্বল জায়গায় আঘাত হানতে পারে, তাহলে তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে। এতদসত্ত্বেও ৯/১১ হামলা পরিচালনাকারী[৮] কেউ যদি হামলার আগে কোনো তাত্ত্বিক, স্ট্র্যাটেজিস্ট বা আমেরিকাকে অপরাজেয় শক্তি মনে করে—এমন কাউকে এই হামলার কথা বলত, তাহলে তারা ওই ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করত, হাসাহাসি করত। এমনকি তাকে পাগল বলতেও দ্বিধা করত না।'

খালেদ শেখ মুহাম্মাদ তাঁর ভাগ্নে রামযী ইউসুফ এবং আরও কয়েকজনের সাথে মিলে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল—টুইন টাওয়ারের মধ্য থেকে একটি টাওয়ারে এমনভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, যাতে সেটি অন্য টাওয়ারের ওপর পড়ে যায়। এতে কম করে হলেও দুই ভবনে থাকা আড়াই লক্ষ মানুষ মারা যাবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়ন হয়নি। এরপর রামযী ইউসুফ ও খালেদ শেখ মুহাম্মাদ অন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা এর কোড নাম দিয়েছিলেন 'বোজিংকা প্লট'।[৯]

বোজিংকা প্লটের পরিকল্পনায় পাঁচজন শরীক ছিলেন। ঠিক করা হয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে থাকাকালে টাইম বোমা ব্যবহার করে ১১টি মার্কিন বিমানকে ধ্বংস করা হবে। এতে প্রায় চার হাজার মানুষ নিহত হবে এবং আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এ পরিকল্পনার আরেকটি অংশ ছিল, সেসনা এয়ারক্রাফট কোম্পানির একটি যাত্রীবাহী বিমান ভাড়া করে সিআইএ হেডকোয়ার্টারে তা ক্র্যাশ করা হবে। কিন্তু এ পরিকল্পনাটিও আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে একটি মারাত্মক ভুলের কারণে রামযী ইউসুফের গবেষণাগারে আগুন লেগে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যান। সে অ্যাপার্টমেন্টে অপারেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ছিল।[১০]

---

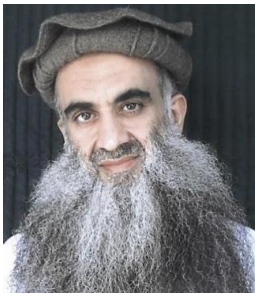
[৮] শায়খ রিফায়ী ত্বহার মূল প্রবন্ধে ইউএসএস কোল হামলার কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু শায়খ যে ভাষায় ইউএসএস কোল হামলার প্রশংসা করেছেন, ৯/১১ হামলার ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত। এ জন্য শায়খের সে লেখাটিকে ৯/১১ হামলার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো।

[৯] বোজিংকা ক্রোয়েশিয়ান শব্দ। এর অর্থ বিস্ফোরণ।

[১০] রামযী ইউসুফ আবকারিয়্যুল জিহাদ : আব্দুল্লাহ যুল বাজাদাইন

নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রেফতার হওয়ার পর মুজাহিদ রামযী ইউসুফকে বহনকারী হেলিকপ্টার যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন রামযীর সাথে থাকা এফবিআই এজেন্ট বলেছিল, 'রামযী, তুমি কি এই ভবনগুলো ধ্বংস করতে চেয়েছিলে?' জবাবে রামযী বলছিলেন, হ্যাঁ। তখন মার্কিন গোয়েন্দা বলেছিল, 'তোমার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। ভবনগুলো তো এখনো তোমার সামনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আর চিরকাল এভাবে মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে থাকবে।' রামযী তখন তাকে বলেছিলেন, 'আমরা যদি অর্থের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে এভাবে বেশিদিন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এগুলোর পতন হবে।'[১১]

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা রামযী ইউসুফের এই কথাকে বাস্তব করে দেখিয়েছেন। এর মাত্র পাঁচ বছর পরেই ৯/১১ হামলায় আমেরিকার টুইন টাওয়ারকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই হামলার পরিকল্পনাকারী ছিলেন রামযী ইউসুফের মামা বীর মুজাহিদ খালেদ শেখ মুহাম্মাদ। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।



বীর মুজাহিদ খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ফা.আ.



বীর মুজাহিদ রামযী ইউসুফ ফা.আ.

## ৯/১১ হামলা : পরিকল্পনার ক্রমবিকাশ

৯/১১ হামলার ধারণা ধাপে ধাপে কীভাবে তৈরি হয়েছে, সে সম্পর্কে শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী রহ. আলোচনা করেছেন। তাঁর বই '**عمليات ١١ سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك** (১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা : সংশয় ও বাস্তবতা)'-এ তিনি লিখেছেন—

[১১] আল-হারবু আলাল ইসলাম : হারুন ফযল

‘একদিন পেশোয়ারে মুজাহিদদের মেহমানখানায় একজন মিশরী পাইলটের আগমন ঘটে। পেশাদার পাইলট হিসেবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল তার। আবু উবায়দা পানশীরী রহ.-এর সাথে এক সাক্ষাতে তিনি মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে যে-কোনো অপারেশনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার কথা বলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, কয়েক হাজার গ্যালন পেট্রোল ভর্তি বেসামরিক বিমান চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আইকনিক কোনো মার্কিন ভবনে আঘাত হানা। শায়খ আবু উবায়দা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চুপচাপ তাঁর চিন্তা ও পরিকল্পনা শোনেন। কিন্তু পরে এই প্রস্তাব নিয়ে আর কোনো কাজ হয়নি। কারণ তখন মাত্রই তানজীমের সূচনা হয়েছিল। তানজীম তখন আফগানিস্তানের ট্রেইনিং ক্যাম্প ও যুদ্ধফ্রন্টসমূহের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে চাচ্ছিল, সেই সাথে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে চলমান ইসলামী আন্দোলনকে সহযোগিতা প্রদানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিল। তবে ধারণাটিকে ভাইয়েরা একেবারে খারিজও করে দেননি; বরং উপযুক্ত সময়ের জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

নব্বই দশকের শুরুতে যখন তানজীম সুদানে চলে যায়, তখন এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়। একে আরও পরিণত করার লক্ষ্যে শায়খ উসামা রহ. সেসনা কোম্পানির একটি জেট বিমান ক্রয় করেন। এই বিমানটি চালানোর জন্য এবং বিমান হামলার এই ধারণাকে বাস্তবায়নযোগ্য বানানোর জন্য তানজীমের অনুগত এক বা একাধিক পাইলটের প্রয়োজন ছিল। সেই সুবাদে বিমানচালনা শেখার জন্য আবু তালাল মাগরিবী (হুসাইন খারাস্তু)[১২] ও ইহাব আলী (নববী)-কে বাছাই করা হয়। আবু তালাল কেনিয়ায় আর নববী আমেরিকার পাইলট ট্রেইনিং সেন্টারে ভর্তি হন। তাদের দুজনের কেউই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তারা শুধু এতটুকুই জানতেন যে, শায়খ উসামার ব্যক্তিগত বিমান চালানোর জন্য কয়েকজন পাইলট প্রয়োজন।

এরইমধ্যে একবার খালেদ শেখ মুহাম্মাদ শায়খ উসামার সাথে সুদানে সাক্ষাৎ করেন এবং শায়খের সামনে একটি পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল, আমেরিকা যদি

[১২] ৯০ দশকের শেষদিকে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে থাকাকালে সে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করা শুরু করে এবং একসময় আমেরিকায় গিয়ে মার্কিন আদালতে আত্মসমর্পণ করে। তাকে উইটনেস প্রটেকশনের আওতায় নিয়ে নেওয়া হয়। নাইরোবি ও দারুস সালাম দূতাবাসে হামলার অভিযোগে ২০০০ সালে যখন অভিযুক্ত ভাইদের আদালতে তোলা হয়, তখন সে রাজসাক্ষী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাঁদের মধ্যে ভাই ওয়াদীউল হাজ, শায়খ আবু হাজের ইরাকী-সহ আরও অনেকে ছিলেন। যে উৎসগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ৯/১১ কমিশন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল, সেখানেও আবু তালাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আফিয়াত ও ইস্তিকামাত দান করুন, আমীন।

শায়খ উমর আব্দুর রহমান-সহ বন্দি মুজাহিদদের মুক্তি দিতে রাজি না হয়, তাহলে কয়েকটি মার্কিন বিমান ছিনতাই করে সেগুলোকে আকাশেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তানজীম চিন্তা করে দেখল, সুদানের পরিবেশ-পরিস্থিতি এ ধরনের অপারেশনের উপযোগী না। তা ছাড়া এ হামলার ফলে যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হবে, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতাও সুদানের নেই। ফলে আরও একবার পরিকল্পনাটি খাতাকলমেই আবদ্ধ রয়ে গেল। ভাইয়েরাও উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষায় রইলেন।

শায়খ উসামা সুদান থেকে বের হয়ে যখন আফগানিস্তানে এসে স্থির হন, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। 'জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও' শিরোনামে বিবৃতি প্রকাশ করে শায়খ মূলত আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই তোরাবোরা পাহাড়ে তানজীমের মজলিসে শূরার নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই বৈঠকগুলোতে আমেরিকার ওপর হামলা করা হলে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু কী কী হতে পারে, কোথায় আঘাত করা হলে সরাসরি আমেরিকার ওপর প্রভাব পড়বে এবং আমেরিকার ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে—তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে সে সব টার্গেটের ওপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যেগুলোর উল্লেখযোগ্য মর্যাদা রয়েছে এবং যেখানে আঘাত হানলে আমেরিকার প্রভাব-প্রতিপত্তি আর বৈশ্বিক ভাবমূর্তি চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘ যাচাই-বাছাই শেষে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি টার্গেট স্থির করা হয়। সেগুলো হলো—ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার, শিকাগো মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জ ভবন, হোয়াইট হাউজ, ক্যাপিটল বিল্ডিং (কংগ্রেস ভবন) ও পেন্টাগন। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লিতে হামলার কথাও উঠেছিল, কিন্তু শুরুতেই একে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। কারণ, সেখানে হামলা করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কয়েক দফা আলোচনার পর মজলিসে শূরার অনেক সদস্যের কাছেই পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। শূরার সম্মতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য যে কাজগুলো করা জরুরি ছিল, তাতেই কয়েক মাস লেগে যায়।

তখন খালেদ শেখ মুহাম্মাদ নতুন করে শায়খ উসামার কাছে যাতায়াত শুরু করেন এবং তাঁর পুরোনো পরিকল্পনার ব্যাপারে শায়খকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল আগের মতোই, ১০টি মার্কিন বিমান ছিনতাই করে আকাশেই সেগুলোর বিস্ফোরণ ঘটানো। আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ খালেদ শেখ মুহাম্মাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না

করে এটাকে আরও বড় আকার দিতে চাচ্ছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, বিমানগুলো ব্যবহার করে আমেরিকার আইকনিক কিছু ভবন ধসিয়ে দেওয়া হবে। আর এর জন্য তানজীমের অনুগত একদল পাইলট দরকার ছিল।

সেদিন থেকেই এমন কিছু মুজাহিদের খোঁজ আরম্ভ হয়, যারা ইস্তিশহাদী হামলার জন্য আগ্রহী। যাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে বিমান চালানো শেখানো হবে। তারপর প্রশিক্ষিত সেই যুবকদের মাধ্যমে মার্কিন বিমান ছিনতাই করে খোদ আমেরিকার ভূখণ্ডেই নির্ধারিত লক্ষ্যে সেগুলোকে ক্র্যাশ করানো হবে। এটি ছিল ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। শায়খ উসামা রহ. তখনই খালেদ শেখ মুহাম্মাদকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করতে বলেন।

অপারেশন বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে এমন যুবকদের খোঁজ শুরু করা হয়, যাদের আমেরিকার নাগরিকত্ব আছে অথবা ইউরোপীয় নাগরিকত্ব আছে, কারণ এতে সহজে আমেরিকার ভিসা পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া কঠিন হয়ে যাওয়ায় অনুসন্ধানের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয় এবং সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে এমন যুবকদের খোঁজ করা হয়, যারা সহজেই আমেরিকার ভিসা নিতে পারবেন।'

এবার সৌদি আরবের দুজন ইস্তিশহাদী মুজাহিদকে নির্বাচন করা হয়। তারা হলেন, নাওয়াফ হাযেমী (রবীয়া) ও খালেদ মিহদার (সিনান)। তাঁদেরকে আমেরিকার কোনো পাইলট ট্রেইনিং স্কুলে ভর্তি হয়ে বিমানচালনা শিখতে বলা হয়। তাঁরা কী ধরনের অপারেশন চালাবেন—সে সম্পর্কে শায়খ উসামা তাদের কিছু বলেননি। ১৯৯৯ সালে তাঁরা আমেরিকার টুরিস্ট ভিসা অর্জন করতে সক্ষম হন। আমেরিকায় কয়েক মাস অবস্থান করে বিমানচালনা শেখার অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। একে তো ইংরেজি ভাষা শিখতে বেগ পেতে হচ্ছিল, তার ওপর সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। সে সময় তাদের পাশাপাশি আরও কিছু ভাইকেও অপারেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা মার্কিন ভিসা জোগাড় করতে পারেননি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খাল্লাদ বিন আতাশ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে জালালাবাদে অবস্থানকালে ভাই আবুল হাসান সায়ীদী রহ. একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। শায়খ উসামার কাছে স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'শায়খ,

আমি স্বপ্ন দেখি, আমরা আমেরিকার বিপক্ষে ফুটবল খেলছি। কয়েকটি গোলও আমরা দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের দলের সবাই ছিল পাইলট।'[১৩]

শায়খ উসামা এ স্বপ্নকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্যে এই পরিকল্পনা সফল হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করার মতো। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে একটি মিশরীয় বিমান আমেরিকার এক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। আমেরিকার পক্ষ থেকে বিমানের পাইলট জামাল বাতুতীকে অভিযুক্ত করে বলা হয়, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার পর শায়খ উসামা বলেছিলেন, 'সে যদি আমেরিকার কোনো ভবনের ভেতর বিমানটি ঢুকিয়ে দিত, তাহলে আমেরিকানদের বেশ ভালো রকম ক্ষতি হতো।'

## আল্লাহ যখন কিছু চান, তিনিই তার পথ তৈরি করে দেন

উলামায়ে কেরাম বলেন, 'আল্লাহ যখন কিছু চান, তিনিই তার পথ তৈরি করে দেন।' এখানেও ঠিক তাই হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানিতে আসা বিভিন্ন দেশের কিছু যুবক হামবুর্গের এক ফ্ল্যাটে থাকত। যুবকগুলো বেশ ধার্মিক, শহরের ইসলামিক সেন্টারগুলোতেও যাতায়াত ছিল তাঁদের। উম্মাহর সমস্যা নিয়ে সব সময়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। তাঁরা আর কেউ না, ৯/১১ হামলার মহানায়কগণ—মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী, যিয়াদ জাররাহ, রামযী বিন শাইবা, যাকারিয়া সাব্বার ও সাইদ বা-হাজী।

তাকদীরের কী এক অদ্ভূত লিখন, হামবুর্গের এক ট্রেনে মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহের সাথে আমাদের এক দাঈ ভাইয়ের পরিচয় হয়। তিনি তাদেরকে চেচনিয়ার জিহাদ বিষয়ক একটি সিডি হাদিয়া দেন। তাঁদের হয়তো ধারণাও ছিল না, এই মুহূর্তটি শুধু তাদের জীবনের মোড়ই নয়; বরং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথই বদলে দেবে। ভিডিওটি দেখার পর তারা ওই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর কাছে চেচনিয়ায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কীভাবে যেতে হবে এবং কীভাবে ট্রেইনিং ক্যাম্পে ভর্তি হতে হবে ইত্যাদি বিস্তারিত তিনি তাদের জানিয়ে দেন। এর কিছুদিন পরেই মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহ আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। সময়টা তখন ১৯৯৯ সালের শেষদিক।

[১৩] উল্লেখ্য, আবুল হাসান সায়ীদী রহ. তানজীমের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন না। মজলিসে শূরায় আমেরিকার ওপর বিমানহামলা নিয়ে যে আলাপ-আলোচনা চলছিল, সে সম্পর্কেও তিনি কিছুই জানতেন না।

তাঁরা কান্দাহারে পৌঁছালে সেখানকার মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদেরকে মুহাব্বতের সাথে গ্রহণ করেন। নির্ভরযোগ্য ভাইদের সুপারিশের ভিত্তিতে কান্দাহারের ভাইয়েরা আগেই তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাষাগত দক্ষতা, পশ্চিমা লাইফস্টাইল ও কালচার সম্পর্কে তাদের জানাশোনা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে তাদের যাতায়াতের সহজতা ইত্যাদি নানা তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। আল-কায়েদার পরিকল্পিত অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য যে-সকল যোগ্যতার দরকার ছিল, তার সবই তাঁদের মধ্যে ছিল। কান্দাহারে পৌঁছানোর পরপরই তাদের আলাদা করে ফেলা হয় এবং তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ. তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেন, আল-কায়েদা কী কী কারণে মার্কিন স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে এবং ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সহায়তা বন্ধ করতে আমেরিকাকে কীভাবে বাধ্য করা হবে—তা বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেন। শায়খ তাঁদের সাথে এ বিষয়টিও আলোচনা করেন যে, আমেরিকা হলো যুগের হুবাল ও সাপের মাথা। আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য মুজাহিদদের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাগুলোকে একমুখী করে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে দারুস সালাম ও নাইরোবির অপারেশন ছিল সূচনামাত্র, সামনে এর চেয়েও ভয়াবহ অপারেশন শুরু হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এগুলোই আমেরিকার পতন ডেকে আনবে। শায়খ আবু হাফস তাদের কথাও মনযোগ দিয়ে শোনেন এবং ভাইদের পক্ষ থেকেও বেশ ইতিবাচক সাড়া পান।

শায়খ উসামা রহ.-ও ভাইদের সাথে বৈঠক করেন এবং তাদেরকে আল-কায়েদার কর্মসূচিতে শরীক হয়ে মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান। শায়খের কথায় তাঁরা বেশ উদ্দীপ্ত হন, শায়খ রহ.-ও তাদের মধ্যে কাজের উৎসাহ দেখতে পান। তাই দেরি না করে তাঁরা শায়খ উসামার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তানজীমের সদস্য হয়ে যান।

শায়খ উসামা রহ. ভাইদেরকে গোপনীয়তা বজায় রাখার ওয়াদা করান। তারপর আমেরিকার মাটিতে বিশেষ অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে তাদেরকে পুনরায় ইউরোপে ফিরে গিয়ে বিমানচালনা শেখার জন্য পাইলট ট্রেইনিং স্কুলে ভর্তি হতে বলেন। সবাই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শায়খের প্রস্তাবে রাজি হন এবং কাজ শুরু করার জন্য যথাসম্ভব দ্রুত ইউরোপে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করে দেন। ইউরোপ থেকে জিহাদের ময়দানে ছুটে আসার পর মাত্র দিনদশেক অতিবাহিত হয়েছিল তাঁদের। এই সামান্য কয়েকটি দিনেই তাঁদের প্রতি তানজীমের নেতৃবৃন্দের কতটা গভীর আস্থা তৈরি হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহ—এই তিনজন কান্দাহারে আসার দু'সপ্তাহ পর রামযী বিন শাইবাও কান্দাহারে এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। তিন বন্ধুর দাওয়াতে তিনিও শায়খ উসামার হাতে বাইয়াত দিয়ে তানজীমের সদস্য হয়ে যান। এভাবে তিনিও অপারেশনের নেতৃত্বদানকারী পাইলটদের কাতারে শামিল হন।

রামযী বিন শাইবা একবার বেশ অবাক হয়েই শায়খ উসামাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শায়খ, আমাদের প্রতি আপনাদের এত আস্থা কীভাবে তৈরি হলো যে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আমাদের দিয়ে দিচ্ছেন? অথচ আমরা আফগানিস্তানে এসেছি মাত্র কয়েকদিন হয়েছে?' শায়খ উসামা রহ. তখন বলেছিলেন, 'আমার অন্তরে এই ইয়াকীন সৃষ্টি হয়েছে যে, আপনাদের হাতেই পশ্চিমা সভ্যতার ধ্বংসের সূচনা হবে। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।'

সম্মানিত পাঠক, রামযী বিন শাইবার মনে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, আপনার মনেও হয়তো একই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, আপনিও হয়তো খুব অবাক হচ্ছেন। মনে মনে আপনি হয়তো বলছেন, 'মাত্র ১০ দিনের পরিচয়ে এই যুবকদের প্রতি শায়খদের এত অগাধ আস্থা কীভাবে তৈরি হয়ে গেল যে, ইতিহাসের অন্যতম বড় একটি অপারেশনের দায়িত্ব তাদের দিয়ে দিলেন? এটা কি আদৌ সম্ভব?' সম্মানিত পাঠক, আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, এটাই সত্য। আর এই পুরো কৃতিত্ব প্রথমত ও কেবলই আল্লাহ তাআলার। দ্বিতীয়ত শায়খ উসামা ও আবু হাফস কমান্ডারের। তারা আল্লাহ তাআলার তাওফীকেই এই কাজ করতে পেরেছিলেন। ভাইদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই দু'জন মানুষের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ চেনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দু'জনকে বিশেষ ফিরাসাত ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। আল্লাহপ্রদত্ত সেই ফিরাসাতের বদৌলতেই ভাইদের ব্যাপারে তাঁরা উভয়েই একমত ছিলেন যে, এ কাজের জন্য তারা শুধু যোগ্যই নন; বরং আল্লাহ তাআলাই তাঁদের নির্বাচন করেছেন এবং সুদূর ইউরোপ থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

এর কিছুদিন পর জার্মানি থেকে যাকারিয়া সাব্বার ও আব্দুর রহমান মাগরিবী কান্দাহারে আসেন। ৯/১১-এর অল্প কিছুদিন আগে সাইদ বা-হাজীও কান্দাহার এসে পৌঁছান। জার্মানি থেকে সবাই একসাথে গায়েব হয়ে গেলে কারো সন্দেহ হতে পারে ভেবে ভাইদের পক্ষ থেকে তাকে সেখানে থাকতে বলা হয়েছিল, যেন তাদের অনুপস্থিতি কারো চোখে না পড়ে। যাকারিয়া সাব্বারকেও আমেরিকার ভিসা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তার ভিসার আবেদন বাতিল হয়ে যায়। অন্য ভাইদের মতো তিনিও হামলার বিস্তারিত তথ্য জানতেন কি-না—সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। তবে অপারেশনের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান ছিল। আব্দুর রহমান মাগরিবী ছিলেন কম্পিউটার সাইন্সের ছাত্র। তাই তাকে মিডিয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি জিহাদী মিডিয়াকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। মিডিয়াতে তাঁর প্রথম কাজটি ছিল ইউএসএস কোল ধ্বংসের ওপর বানানো একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি, তাতে তিনি উম্মাহর পরিস্থিতি তুলে ধরে সকলকে জিহাদের দিকে আহ্বান করেন।

ভাইয়েরা জার্মানিতে ফিরে আসার পর বিমানচালনা শেখার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানের খোঁজ শুরু করেন। কম খরচ ও ভর্তির সহজলভ্যতা-সহ সব দিক বিবেচনা করে আমেরিকার প্রতিষ্ঠানগুলোই বেশি সুবিধাজনক ছিল। সে হিসেবে মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহ মার্কিন ভিসার জন্য আবেদন করেন এবং ভিসা পেয়েও যান। কিন্তু রামযী বিন শাইবা ও যাকারিয়া সাব্বার ভিসা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন। ভিসা পাওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহকে আমেরিকায় গিয়ে পাইলট ট্রেইনিং স্কুলে ভর্তি হতে বলা হয়। রামযী বিন শাইবাকে খালেদ শেখ মুহাম্মাদের সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যোগাযোগ, সমন্বয় ও অপারেশনের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মুহাম্মাদ আতা, মারওয়ান শিহহী ও যিয়াদ জাররাহ প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় আমেরিকাতে অবস্থান করে বিমান চালানো শিখতে থাকেন এবং টার্গেটগুলো রেকি করতে থাকেন। অপারেশন পরিচালনার জন্য যে-ক'জন পাইলটের প্রয়োজন ছিল, সে সংখ্যা পূরণ না হওয়ায় তানজীমের নেতৃবৃন্দ তখনও যোগ্য লোক খুঁজছিলেন। ইতোমধ্যে ২০০০ সালে এক সৌদি যুবক আফগানিস্তানে এসে ট্রেইনিং ক্যাম্পে ভর্তি হন। ক্যাম্পের পরিচালকগণ খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, তিনি একজন পেশাদার মিলিটারি পাইলট, বিমানচালনায় তিনি বিশেষ কিছু কোর্সও করেছেন। শায়খগণ তাঁর সামনে অভিযানের বিষয়টি পেশ করলে তিনিও বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে যান। তিনি হলেন হানী হানজুর। আমেরিকায় গিয়ে পাইলটদের দলে তিনিই সর্বশেষ যুক্ত হন। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন। হানজুর অনেক দক্ষ পাইলট ছিলেন। এ কারণেই তাঁকে পেন্টাগনে হামলার জন্য নির্বাচন করা হয়। কারণ, পেন্টাগনের ভবনগুলো পাঁচতলা হওয়ায় তুলনামূলক নিচু ছিল।

শায়খ উসামা রহ. ট্রেইনিং ক্যাম্পে যখন ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন অথবা কোনো সভায় বক্তৃতা দিতেন, তখনই ইস্তিশহাদী হামলা নিয়ে কথা বলতেন, সবাইকে ইস্তিশহাদী হামলার জন্য উৎসাহ দিতেন। মাঝে মধ্যে জানতে চাইতেন, ইস্তিশহাদী হামলার ব্যাপারে কার কার আগ্রহ রয়েছে। কেউ কেউ দ্বিধা করতেন, তখন শায়খ উসামা এ বলে উৎসাহ দিতেন যে, সামনে বড় ধরনের একটি অপারেশন হতে যাচ্ছে।

[অপারেশনের নেতৃত্বদানকারী পাইলটদের নির্বাচনের পর সহযোগী হিসেবে কয়েকজন সৈনিক দরকার ছিল। সৈনিক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে] কাবুলের কাছে আইনাক ক্যাম্পে একবার ভাইয়েরা একটি কঠোর কমান্ডো প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল, ৯/১১ অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ভাইদের প্রস্তুত করা, তাঁদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ শেষে শায়খদের নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে

অপারেশনের জন্য সৈনিক বাছাই করা। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে দেখা হচ্ছিল, যেমন: ধৈর্য ও সহ্যক্ষমতা, ত্যাগ ও কুরবানী, উত্তম আখলাক ইত্যাদি। শায়খ উসামা নিজে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধান করতেন এবং যাদেরকে নির্বাচন করা হতো, তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন।

অপারেশনকে কেন্দ্র করে কিছু ভাই একের পর এক স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। কিছু ভাই তো স্বপ্নের মধ্যে কোথায় হামলা হবে, কারা হামলা করবেন—সেগুলোও বিস্তারিত দেখে ফেলেন। একরাতে আইনাক ক্যাম্পে খাবারের দস্তরখানে শায়খ উসামার একজন দেহরক্ষী শায়খকে বলেন, 'শায়খ, গতকাল আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।' শায়খ রহ. এ ধরনের স্বপ্ন শুনতে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, 'স্বপ্নের সুসংবাদ আমাদেরও শোনাও।' সে ভাই বলেন, 'শায়খ, স্বপ্নে দেখি, আমেরিকার উঁচু দুটি ভবন। এক ভবনেরর ছাদে মুখতার ভাই (খালিদ শেখ মুহাম্মাদ) আর আরেকটির ছাদে গামিদী গোত্রের কয়েকজন ভাই দাঁড়িয়ে আছেন। মুখতার ভাই তাদের কারাতে শেখাচ্ছেন।' [এই স্বপ্নটি যখন তিনি দেখেন, তখনও প্রশিক্ষণ শেষ হয়নি এবং কাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছিল, সেটাও শুধুই শায়খরাই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না।]

বাস্তবেও সেই প্রশিক্ষণ শেষে ৯/১১ হামলার জন্য যে ভাইদের নির্বাচন করা হয়, তাদের অধিকাংশই ছিলেন গামিদী গোত্রের। অন্যদের সাথে তাঁরাও বিশেষ সেই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন। শায়খ স্বপ্নটি শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে শায়খ আবু হাফসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর কাছে এ স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা আছে কি-না? শায়খ আবু হাফস ওই ভাইকে বলেন, 'মনে হচ্ছে, গতকাল রাতে আপনি শিম বেশি খেয়েছেন, তাই এমন আজগুবি সব স্বপ্ন দেখেছেন।' [আরবের মানুষ মনে করে, রাতের খাবারে শিম বেশি খেলে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে।]

শায়খ আবু হাফস রহ. এ কথা বলে মূলত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন। কারণ, স্বপ্নটিতে অপারেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উঠে এসেছিল। কেউ যদি শায়খ উসামা রহ.-এর কাছে এসে এরকম সূক্ষ্ম কোনো স্বপ্ন বলতেন, তখন শায়খ তাকে কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করে দিতেন। সে সময় শায়খ প্রায়ই বলতেন, 'স্বপ্নের কারণে তো পুরো পরিকল্পনাটাই ফাঁস হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

প্রশিক্ষণ শেষে অপারেশনের জন্য উপযুক্ত ভাইদের নির্বাচন করা হয়। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সৌদি আরবের বাছাইকৃত সেরা যুবক। বাছাইপ্রক্রিয়া শেষ হলে আমেরিকার ভিসা সংগ্রহের জন্য তাদেরকে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার ভিসা নেওয়ার আগে ভাইদের জরুরি একটি কাজ ছিল নিজেদের পুরোনো পাসপোর্ট পরিবর্তন করে নতুন পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা। কারণ, পুরোনো পাসপোর্টে পাকিস্তানের ভিসা ছিল, এতে সন্দেহ

সৃষ্টি হতো। তা ছাড়া নতুন পরিচয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে আমেরিকার পাশাপাশি অন্য কোনো দেশের ভিসা নেওয়াও জরুরি ছিল। আল্লাহর রহমতে তাঁদের অধিকাংশই এ কাজে সফল হন। প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁরা আল্লাহর নুসরতের দেখা পাচ্ছিলেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষে তাঁরা যখন আফগানিস্তানে ফিরে আসেন, তখন আমেরিকায় পাড়ি জমানোর অল্প কয়েক মাস আগে শায়খ উসামার আদেশে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন একটি ঘরে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে তাঁদেরকে সম্মুখযুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল শেখানোর পাশাপাশি কোল্ড ওয়েপন (ছুরি ও চাকুজাতীয় ধারালো অস্ত্র)-এর ব্যবহারও শেখানো হয়। ভাই আবু তুরাব উরদুনী রহ.[১৪] ভাইদের প্রশিক্ষণ দেন। এ ছাড়াও অপারেশনের প্রস্তুতিস্বরূপ এবং যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে তাঁদেরকে আরও কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন: পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি, রিভলবারের খুঁটিনাটি, সিমুলেটরের মাধ্যমে বিমানচালনা ও বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি।

সফর শুরু করার কিছুক্ষণ আগে অভিযানে অংশগ্রহণকারী ভাইয়েরা মিডিয়া শাখার দায়িত্বশীল খালেদ শেখ মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধানে আর পাইলটগণ নিরাপত্তা শাখার ভাইদের তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ অসীয়ত রেকর্ড করেন। খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ও রামযী বিন শাইবা দু'জনে মিলে ভাইদের যাবতীয় প্রস্তুতির দেখাশোনা করছিলেন। সব প্রস্তুতি শেষ করে সবাই যখন সফরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখনও তাঁরা অপারেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। গোপনীয়তার স্বার্থে তাঁদের শুধু এতটুকু জানানো হয়েছিল যে, তারা আমেরিকার অভ্যন্তরে একটি বড় ইস্তিশহাদী অপারেশন করতে যাচ্ছেন।

তানজীমের নেতৃবৃন্দ বিমানের টেকনিক্যাল দিক বিবেচনা করে এবং যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে আঘাত করতে পারার বিষয়টি আমলে নিয়ে মোট তিনটি টার্গেট ঠিক করেছিলেন। এই তিনটি টার্গেট ছিল আমেরিকার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিমত্তার প্রতীক ও আইকন। তা ছাড়া এগুলোর সাথে ইহুদীদের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল। যেমন: ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, এটি হলো সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে ইহুদীরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্ব অর্থনীতির বড় বড় মাথাগুলো এখান থেকেই বৈশ্বিক অর্থনীতির নেতৃত্ব দেয়। শুধু মার্কিন অর্থনীতি নয়, পুরো বিশ্বের অর্থনীতির গর্বের প্রতীক বলা যায় এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে। পেন্টাগন হলো মার্কিনিদের শক্তির প্রতীক ও সুরক্ষিত দুর্গ। তাদের এই সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকেই দিনরাত ইহুদীদের সমর্থন দেওয়া হয় এবং আরবের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর ইসরাইলের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি রইল কংগ্রেস, মার্কিনিদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটি

[১৪] শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর জামাতা।

টার্গেট ছিল এটি। ইহুদীদের সমর্থনে মার্কিন কংগ্রেসের ভূমিকাও কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। সেই ১৯২২ সালে বেলফোর ডিক্লারেশনকে সমর্থন জানিয়ে রেজুলেশন পাশ করা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিটি সিদ্ধান্তেই ইহুদীস্বার্থ সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই কংগ্রেস থেকেই নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে মুসলিম উম্মাহকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার বন্দোবস্ত করা হয়।[১৫] এ সবকিছু বিবেচনা করে এই তিনটি টার্গেট চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ আতাকে পুরো অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হামলার উপযুক্ত সময় নির্ধারণের বিষয়টিও তাঁর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পনা ছিল, মুহাম্মাদ আতা ও মারওয়ান শিহহী ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে এবং যিয়াদ জাররাহ ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে আঘাত হানবেন। হানী হানজুর যেহেতু অভিজ্ঞ পাইলট ছিলেন, তাই তাকে তুলনামূলক কঠিন টার্গেট পেন্টাগনে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, হানজুর রহ. সাধারণ সেই যাত্রীবাহী বিমানটি এমন কৌশলে চালিয়েছিলেন এবং তা নিয়ে এমন ঝুঁকিপূর্ণ মহড়া দেখিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল, তিনি কোনো যুদ্ধবিমান চালাচ্ছেন। অভিজ্ঞ অনেক পাইলটও স্বীকার করেছেন, পেন্টাগনে যে বিমানটি হামলা করেছে, সে বিমানের পাইলট নজিরবিহীন দক্ষতার সাথে তা চালিয়েছেন। মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক [অত্যন্ত দক্ষ একজন পাইলট ছিল এবং মিশরীয় বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিল।] হামলার দৃশ্য দেখে পেন্টাগনের ওপর আছড়ে পড়া বিমান সম্পর্কে মজাদার একটি মন্তব্য করেছিল। সে বলেছিল—"ده أنا طيار, ده ولد حريف" [আরে আমিও তো পাইলট, কিন্তু এই ছেলে তো আমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।]

বিমানবন্দর ও বিমানের ভেতরের নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা বের করার জন্য মূল অপারেশনের আগে পাইলট ভাইয়েরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানে পুরো আমেরিকা চষে বেড়িয়েছিলেন। এই অনুসন্ধানী সফরের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন, মার্কিন এয়ারলাইন্সগুলোতে বিমানের ভেতরে চার ইঞ্চির চেয়ে ছোট সাইজের ছুরি বহনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। ইতঃপূর্বে আবু তুরাব উরদুনীর কাছে তাঁরা এ ধরনের ছোট ছুরির প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। এগুলো দিয়ে উট ও ভেড়া জবাই করাও তাদের শেখানো হয়েছিল।

এই অনুসন্ধানী সফরের পর ভাইয়েরা সকলে মিলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। যেমন: ককপিটে প্রবেশের সবচেয়ে উত্তম সময় হলো, টেক অফের ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে। এ সময় সাধারণত সব বিমান আকাশে পুরোপুরি উঠে স্থিতিশীল হয়ে যায়। তখন প্রথমবারের মতো

[১৫] আল্লাহু আকবার, খারিবাত আমরিকা : ফারিস যাহরানী রহ.

ককপিটের দরজা খোলা হয়। সবদিক বিবেচনা করে ভাইয়েরা বিমানের ফার্স্ট ক্লাসের সিট বুক করেন, যাতে ককপিটের কাছাকাছি থাকতে পারেন। পাইলট ভাইয়েরা হামলার জন্য বোয়িং ৭৬৭ বিমান বেছে নেন, যেগুলো আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে, ফলে এগুলোতে জ্বালানিও থাকে অনেক, ক্র্যাশ করলে ক্ষয়ক্ষতিও হয় বেশি; অন্যদিকে এয়ারবাস বিমানগুলোতে অটো পাইলট সিস্টেম থাকায় তা প্লেনকে ক্র্যাশ করা থেকে রক্ষা করে।

ভাইদের পরিকল্পনা ছিল, হামলার জন্য এমন বিমানগুলোই নির্বাচন করা হবে, যেগুলো একই সময়ে বা যথাসম্ভব কাছাকাছি সময়ে টেক-অফ করবে। এতে কোনো বিমান হাইজ্যাকের খবর শুনে যেন এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ অন্যগুলোকে সতর্ক করার সুযোগ না পায়। ভাইদের এই আশঙ্কা পরে সত্য হয়েছিল। টুইন টাওয়ারে দুটো বিমান আছড়ে পড়ার পরেই সকাল ৯.২৪-এ ভাইদের চতুর্থ গ্রুপ যে বিমানে ছিলেন, সেখানে বার্তা পাঠানো হয়, যেন ককপিটে কারো অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তারা সতর্ক থাকে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। ককপিটে যখন সতর্কবার্তা এসে পৌঁছায়, তখন ককপিটের নিয়ন্ত্রণ যিয়াদ জাররাহ ভাইয়ের হাতে।[১৬]

ধীরে ধীরে সব প্রস্তুতি শেষ হয়। পাইলট ভাইয়েরাও জিরো আওয়ারের [নির্ধারিত ক্ষণ] জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সহযোগী ইস্তিশহাদী ভাইদেরও একজন-দুজন করে আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। মোট ১৪ জনের মধ্যে আল্লাহর রহমতে ১৩ জন আমেরিকায় ঢুকতে পারেন, একজনকে মার্কিন ইমিগ্রেশন থেকে ফেরত পাঠানো হয়। ফলে তিনি যে বিমানে গিয়েছিলেন, সে বিমানেই ফিরে আসেন। পাইলট ভাইয়েরা আগে থেকেই আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন। তাঁরা নতুন ভাইদের রিসিভ করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন। নিউজার্সির প্যাটারসনে আরব মহল্লায় কয়েকজনকে থাকতে দেওয়া হয়। বাকিদেরকে ফ্লোরিডা রাজ্যের পূর্ব উপকূলীয় শহর উত্তর মায়ামি, হলিউড ও ডেলরে বিচের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আমেরিকায় পৌঁছানোর পর থেকেই ভাইয়েরা বেশ খুশি ছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা নশ্বর এই দুনিয়া ছেড়ে সুখশান্তির জান্নাতে চলে যাবেন। হামলার আগে তাঁদের সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখার পরিমাণও বেড়ে গিয়েছিল। অনেকেই স্বপ্নে নিজেকে আকাশে উড়তে দেখতেন। সবুজ রঙের পাখি তাঁদের ফ্ল্যাটে ঢুকছে, বেরুচ্ছে, ওড়াউড়ি করছে—এ দৃশ্য তো জাগ্রত অবস্থাতেই প্রায় সকলে দেখতে পেয়েছিলেন। এই ধরনের

[১৬] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী

আসমানী ইশারাগুলো দেখে তাঁরা যেমন খুশি ছিলেন, তেমনই তাঁদের অবিচলতা আরও দৃঢ় হচ্ছিল। তাঁদের ইয়াকীন আরও মজবুত হচ্ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদের উদ্দেশ্যকে সফল করবেন। যে-কয়টা দিন হাতে ছিল, ইবাদত-বন্দেগি, নামায-রোযা, যিকির-আযকার, কিয়ামুল লাইল ও কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কাটাতে থাকেন এবং আল্লাহর কাছে নিজেদের অবিচলতা, সফলতা ও মাকবুল শাহাদাতের জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকেন।

হামলার মাত্র দু'দিন আগে অপারেশনের বিস্তারিত তথ্য ভাইদের জানানো হয় এবং ফ্লাইট অনুযায়ী সবাইকে ভাগ করা হয়। এভাবেই ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বরকতময় এই হামলার কাউন্টডাউন শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে হামলার অল্প কিছুদিন আগে শায়খ উসামা রহ. আল-ফারুক ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ভাইদের বলেছিলেন, 'কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আপনাদের সুসংবাদ দিয়ে আসছি যে, আপনাদের কিছু ভাই মৃত্যুর সন্ধানে জীবনবাজি রেখে ময়দানে বের হয়েছেন। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার তাওফীক দেবেন। আর তিনিই এর উপযুক্ত ও ক্ষমতাবান।'

আগস্ট মাস শেষ হতেই আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ অত্যাসন্ন হামলার খবর শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা শুরু করেন। পাশাপাশি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যথাযথ প্রস্তুতিও নিতে থাকেন। কারণ, অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সমন্বয়ক ভাইয়েরা তখন এক এক করে আফগানিস্তানে ফিরে আসছিলেন, যা অপারেশনের সময় ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছিল।।

## ফ্লাইট অনুসারে দায়িত্ব বস্টন ও ৯/১১-এর বীরেরা

প্রথম ফ্লাইট: বোস্টন শহরের লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে এই বিমানটি টেক-অফ করে। এই ফ্লাইটে থাকা ভাইদের টার্গেট ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে আঘাত করা। এ ফ্লাইটে পাইলট হিসেবে ছিলেন মুহাম্মাদ আতা মিসরী। তাঁর দলে ছিলেন—আব্দুল আযীয উমারী, সাত্তাম সুকামী, ওয়ায়েল শিহরী ও তাঁর ভাই ওয়ালীদ শিহরী।


মুহাম্মাদ আতা


ওয়ায়েল শিহরী


সাত্তাম সুকামী


আব্দুল আযীয উমারী


ওয়ালীদ শিহরী

দ্বিতীয় ফ্লাইট: এটিও বোস্টনের লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে টেক-অফ করে। এই ফ্লাইটে থাকা ভাইদের টার্গেট ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সাউথ টাওয়ারে আঘাত করা। এই ফ্লাইটের দায়িত্বশীল পাইলট ছিলেন মারওয়ান শিহহী (সংযুক্ত আরব আমিরাত)। তাঁর দলে ছিলেন—হামযা গামিদী, মুহান্নাদ শিহরী, আহমাদ গামিদী ও ফায়েয রাশেদ আহমাদ ইমারতী।


মারওয়ান শিহহী


আহমাদ গামিদী


মুহান্নাদ শিহরী


হামযা গামিদী


ফায়েয ইমারতী

তৃতীয় ফ্লাইট: এটিও বোস্টন থেকে লস অ্যাঞ্জেলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিল। এই ফ্লাইটে থাকা ভাইদের টার্গেট ছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর পেন্টাগনে হামলা চালানো। এ ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন হানী হানজুর (সৌদি আরব)। তাঁর সাথে ছিলেন—খালেদ মিহদার (সিনান), নাওয়াফ হাযিমী (রবীয়া), তাঁর ভাই সালিম হাযিমী ও মাজিদ মাশআন মুকিদ হারবী।


হানী হানজুর


খালেদ মিহদার


নাওয়াফ হাযিমী


সালিম হাযিমী


মাজিদ মুকিদ

চতুর্থ ফ্লাইট: এটি সান ফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে নিউজার্সি থেকে টেক-অফ করে। এর টার্গেট ছিল ক্যাপিটল বিল্ডিং (কংগ্রেস ভবন)। এর পাইলট ছিলেন যিয়াদ জাররাহ (লেবানন)। তাঁর দলে ছিলেন আহমদ হাযনাবী গামিদী, সাইদ গামিদী ও আহমাদ আব্দুল্লাহ না'মী।


যিয়াদ জাররাহ


আহমাদ হাযনাবী


সাইদ গামিদী


আহমাদ আব্দুল্লাহ না'মী

كـأن المنايـا إذ تغير وتنتقي ... لديـها دليل بيننا ولـها وتر

মৃত্যু যখন হামলা করে শিকার বেছে নেয়, মনে হয় যেন সে প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত আর আমাদের মাঝেই যেন তার কোনো গুপ্তচর লুকিয়ে আছে, যে তাকে পথ দেখায়।

فسبحـان من أغرى المنايـا بأهلها ... كأن لـها ثأرا وليس لـها ثأر

পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি মৃত্যুকে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে এমনভাবে পাঠান, মনে হয় সে বদলা নেবে। কিন্তু মৃত্যু কখনো বদলা নেয় না।

ليختـار من يختار منهم ويصطفي ... له الحكمة العليـا له النهـي والأمر

মৃত্যুকে আল্লাহ পাঠান নির্বাচিত ব্যক্তির কাছেই, যাকে তিনি নির্বাচন করে দেন। তিনিই সকল প্রজ্ঞার মালিক আর আদেশ-নিষেধও কেবল তারই।

توخى الردى فاختارفي الناس و انتقى ... خيارا كراما مثلما ينتقى التبر

মৃত্যু চিন্তাভাবনা করে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানুষগুলোকেই বেছে নেয়, ঠিক যেমন সোনার খনি থেকে সোনা বাছাই করা হয়।

عصائب نزاع من الأرض كلها ... يوحدهم دين ويجمعهم فكر

সেই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো, যারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা পৃথিবী থেকে একত্র হয়েছে। এক দীন ও এক ফিকিরই যাদের সংঘবদ্ধ করেছে।

توحدهم في الله أقوى عقيدة ... ولا نسب غير العقيدة أو صهر

যাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া যেখানে নেই কোনো বংশ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন।

فما جمعتهم في الأصول قبيلة ... وما ضمهم حي ولم يحوهم قطر

তারা না একই গোত্রের সন্তান, না একই এলাকার মানুষ আর না একই দেশের নাগরিক।

دعتهم ثغور العز من كل موطن ... فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر

বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে যখন ইজ্জতের ভূমি থেকে আহ্বান করা হয়েছে, তারা কালবিলম্ব না করে এখানে সমবেত হয়েছে।

**ثبات ووحدانا من الأرض كلها ... يوحدهم هم وأوطانهم كثر**

তাঁরা এসেছে দলে দলে, কেউ বা একাকী। পৃথিবীর একেক প্রান্ত থেকে। তাঁদের দেশ ভিন্ন, কিন্তু তাদের চিন্তা এক।

**نفى عنهم هم التنعم همهم ... فأبدانهم شعث و أثوابهم غبر**

তাঁদের এই চিন্তাই তাদের আরাম-আয়েশের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই তো তাঁদের চুল উশকোখুশকো আর কাপড় ধুলোমলিন।

**نحافا وسمرا كالرماح تراهم ... وتحمد عند الطعن شعث القنى السمر**

তাঁরা দেখতে বর্শার মতো চিকন ও বাদামি বর্ণের। হামলার সময় বাদামি বর্ণের তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট বর্শাই কিন্তু প্রশংসার দাবিদার।

**ويحمد في العضب البلى وهو قاطع ... ويحسن في الخيل المسومة الضمر**

যেমন পুরোনো তরবারি ধারালো হয় বেশি আর সুসজ্জিত ঘোড়ার মধ্যে প্রশিক্ষিত হালকাপাতলা ঘোড়াই বেশি প্রশংসিত হয়।

**مضوا يشربون الموت كأسا شهية ... ولو أن طعم الموت مستثقل مر**

মৃত্যুর স্বাদ যদিও তিক্ত, কিন্তু তারা মৃত্যুর পানপাত্র থেকেই আগ্রহভরে পান করার জন্য ছুটে চলেছে।

**ولكن في ذات الإله ودينه ... لمن أشرب الإيمان يستعذب الصبر**

কারণ, যাদের অন্তরে আল্লাহ ও তার দীনের প্রতি ঈমান আছে, তাদের কাছে তিক্ত ফলও সুস্বাদু হয়ে যায়।

**أبوا أن يعيشوا كالعبيد بعالم ... تحكم فيه الظلم واستحكم الكفر**

এমন পৃথিবীতে গোলামের মতো বেঁচে থাকতে তাঁরা অস্বীকার করেছে, যেখানে জুলুম আর কুফর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

**فليست تطيق الضيم نفس أبية ... ولا يقبل الإذلال في دينه حر**

কোনো স্বাধীনচেতা আত্মা জুলুমকে মেনে নিতে পারে না আর কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের দীনের অপমান সইতে পারে না।

**ففي الأرض منأى للكريم عن الأذى ... وفي الموت منأى عنه إن لزم الأمر**

সম্মানিত মানুষেরা দুনিয়ায় লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে যেমন জিহাদের পথ বেছে নেয়, তেমনই দরকার পড়লে তাঁরা মৃত্যুকেও বেছে নেয়।[১৭]

## দুটি লাঠি, একটি হাইফেন ও কেক থেকে ঝুলন্ত একটি লাঠি[১৮]

এটিই ছিল সেই ধাঁধা, যা ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। এই কোডটি মুহাম্মাদ আতা জার্মানিতে থাকা রামযী বিন শাইবাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি বরকতময় হামলার জিরো আওয়ার (নির্ধারিত ক্ষণ) বলে দিয়েছিলেন। দুটি লাঠির অর্থ হলো ১১, মাঝখানে হাইফেন এবং একটি কেক থেকে ঝুলন্ত লাঠি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ৯। এর সম্মিলিত রূপটি হলো '১১/৯' বা সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ। শায়খ উসামা নিজেও সুনির্দিষ্টভাবে সেই তারিখটি জানতেন না। অপারেশনের মাত্র পাঁচদিন আগে তিনি জানতে পারেন। ৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রামযী বিন শাইবা পাকিস্তানে ফিরে এসে করাচিতে খালেদ শেখ মুহাম্মদের সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে হামলার সময় সম্পর্কে অবগত করেন। উদ্ভূত যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দুজনে পরামর্শ করে পাকিস্তানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। আর যাকারিয়া সাব্বার ও আরেকজন ভাইকে (আমার ধারণা তিনি সাঈদ বা-হাজী) দ্রুত আফগানিস্তানে গিয়ে শায়খ উসামাকে হামলার সময় সম্পর্কে জানানোর দায়িত্ব দেন।[১৯]

৭ই সেপ্টেম্বর ছিল শুক্রবার। সেদিন শায়খ উসামা হেলমান্দের আল-ফারুক ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। খাল্লাদ বিন আতাশ, যাকারিয়া সাব্বার ও সাইদ বা-হাজী এসে শায়খের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে জানান, আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হামলার দিন ধার্য করা হয়েছে। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথেই শায়খ উসামা কান্দাহারে ফিরে যান। সেখানে একরাত অবস্থান করে পরদিন কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে তখন শায়খ

---

[১৭] এই পঙ্‌ক্তিগুলো শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী রচিত 'দুমুউন ফি মাআযিকিয যামান' নামক কাসীদা থেকে সংগৃহীত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে হকের পথে অবিচল রাখেন আর তাঁকেও হকের পথে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন, আমীন।

[১৮] সাংকেতিক এই কথা দিয়ে মূলত হামলার তারিখ বলা উদ্দেশ্য ছিল। আরবী ভাষায় ১ সংখ্যা দেখতে একটি লাঠির মতো (١), তাই দুটি লাঠি মানে হলো দুটি এক (١١) অর্থাৎ এগারো, যা হামলার তারিখ নির্দেশ করছে। আর ৯ সংখ্যাটি দেখতে মনে হবে, ছোট গোল একটি কেকের সাথে একটি লাঠি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে (٩)। কেকের সাথে ঝুলন্ত একটি লাঠি মানে হলো ৯, যা সেপ্টেম্বর মাসকে নির্দেশ করছে। তারিখ ও মাসের মধ্যে একটি হাইফেন ব্যবহার করে সেটিকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুটি লাঠি, একটি হাইফেন ও কেকের সাথে ঝুলন্ত একটি লাঠি, যা দেখতে ঠিক এমন হবে (١١-٩) অর্থাৎ ১১/৯। [সম্পাদক]

[১৯] শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী লিখিত عمليات ١١ سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك- বইয়ে এই অংশের বিবরণ যেভাবে এসেছে, তার সাথে মিল রাখার জন্য প্রথম সংস্করণের এই অংশে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আবু হাফস কমান্ডার, শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী, শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস এবং শায়খ ইউসুফ হামদান[২০] ছিলেন। কাবুলে মাত্র একদিন অবস্থান করেই জালালাবাদ সংলগ্ন তোরগার পাহাড়ী উপত্যকায় চলে যান।

বরকতময় সে দিনের বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার আগে তার একবছর আগের আরেকটি ঘটনা বলে নেওয়া দরকার। ৯/১১-এরও বছরখানেক আগে ইউএসএস কোল হামলার পরের কথা। তখন শায়খ উসামা সেই তোরগার উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন আসরের পর আমরা শায়খ উসামার সাথে সেখানে বসে চা পান করছিলাম আর তাঁর ঈমানদীপ্ত আলোচনা শুনছিলাম। শায়খের কথার মাধুর্যে আমাদের মন ও মনন বিমোহিত হয়ে ছিল। আলোচনা শেষে শায়খ আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'সামনের আক্রমণগুলো ইউএসএস কোলের চেয়েও হাজারগুণ বড় হবে ইনশাআল্লাহ।'

শায়খের এই কথা শুনে আমরা সবাই আকাশ থেকে পড়লাম। অবাক-বিস্ময়ে কেউ কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। কারণ, আমরা কেউ ধারণাই করতে পারিনি যে, এত বড় কোনো হামলা চালানোর সক্ষমতা আল-কায়েদার আছে। সবাই যার যার মতো ভবিষ্যতের সেই হামলার ছবি কল্পনা করার চেষ্টা করছিল আর নিজেকেই হয়তো প্রশ্ন করছিল, ইউএসএস কোলে হামলা করতে যদি দুই টন বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আগামীর হামলাগুলোতে কি ২০০০ টন বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে? আমি তো মনে মনে ভাবছিলাম, এটা অসম্ভব! তবে হামলাগুলোতে যদি গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মতো অস্বাভাবিক কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহলে হতেও পারে। কিন্তু সেটাইবা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বাস্তবেও নতুন সেই হামলা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে। সাধারণ কোনো মানুষ তো দূরের কথা, হলিউডের কোনো ফিকশনাল মুভির স্ক্রিপ্ট রাইটারও হয়তো তা কল্পনা করতে পারেনি।

সেই বরকতময় দিনে শায়খ উসামা রহ. কানের কাছে রেডিও ধরে বসে ছিলেন, সামান্য সময়ের জন্যও রেডিও থেকে দূরে যাচ্ছিলেন না। শায়খের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন শায়খ আবু বাসীর রহ. শায়খ উসামার পক্ষ থেকে তাঁর দেহরক্ষীদের সবাইকে সেদিনের খবর শোনার জন্য বলে রেখেছিলেন। ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সবার আগে শায়খকে যে সুসংবাদ দিতে পারবে, তাকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারটি আসলেই আকর্ষণীয় ছিল।

---

[২০] রুশবিরোধী জিহাদের সময় তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশনের পেশোয়ারস্থ অফিসের পরিচালক ছিলেন। জিহাদ ও মুজাহিদদের খেদমতে তার বেশ বড় অবদান রয়েছে। ৯/১১-এর অল্প কিছুদিন আগে তিনি আফগানিস্তানে যান এবং শায়খ উসামার হাতে বাইয়াত হন। শায়খ রহ. তাঁকে আল-কায়েদার অফিসিয়াল মুখপাত্র নির্বাচন করেছিলেন। আলে সৌদের কারাগারে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাই কিছু ভাই শায়খকে সুসংবাদ দিয়ে পুরস্কার জেতার আশায় সারাদিন ধরেই রেডিওতে প্রচারিত বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদ শুনছিলেন।

## জিরো আওয়ার

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার। ঐতিহাসিক সে দিনটির তখন বিকেল গড়িয়েছে[২১]। আমি দুপুরের খাবারের থালাবাসন ধোয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় কাছাকাছি কোথাও ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার দৃষ্টি চলে গেল যেখানে শায়খগণ বসা ছিলেন সেখানে। দেখলাম শায়খ উসামা বন্দুক হাতে নিয়ে খোলা আকাশে ফায়ার করছেন। হাতের কাজ ফেলে তাঁদের কাছে ছুটে গেলাম। বাকিরাও ততক্ষণে জড়ো হয়ে গেছেন। রেডিওর খবরপাঠকের গলা শোনা যাচ্ছিল—'একটি যাত্রীবাহী বিমান আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে আছড়ে পড়েছে।' খবর শোনামাত্র তাকবীরধ্বনিতে গোটা উপত্যকা কেঁপে উঠল। ভাইয়েরা আনন্দে ফাঁকাগুলি ছুঁড়তে লাগলেন। পরক্ষণেই কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল—'সমস্ত হামদ সেই আল্লাহর, যিনি ভাইদেরকে এই মহান কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। ইয়া আল্লাহ, তাঁদের এই আমলকে আপনি কবুল করে নিন।'

শায়খ উসামা পুরো খবর শোনার জন্য সকলকে নীরব থাকতে বললেন এবং তাঁদের কামিয়াবির জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে বললেন। কারণ, তখনও আরও তিনটি বিমান বাকি ছিল। হয়তো আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেগুলোও টার্গেটে আঘাত হানবে। আল্লাহ আকবর! আরও তিনটি বিমান!! শায়খের কথা শুনে সবাই ফিসফিস করতে লাগলেন। সবার চোখেমুখে বিস্ময়, যেন বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে। আসলেই কি আমাদের ভাইয়েরা আমেরিকার এয়ারপোর্টে ঢুকে একই সময়ে চারটি প্লেন হাইজ্যাক করেছেন? অবিশ্বাস্য এই সংবাদে আমাদের সবার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু শায়খের জন্য বিষয়টি মোটেও এমন ছিল না।

শায়খ উসামা ও শায়খ আবু হাফস শুধু এতটুকু জানতেন যে, আজকের এই বরকতময় দিনেই হামলাটি হবে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ৭ই সেপ্টেম্বর যাকারিয়া সাব্বার এসে শায়খকে তারিখটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরের কোনো কিছুই তাঁরা জানতেন না। অপারেশনের দিন ভাইদের সাথে কী কী ঘটেছে? সবকিছু ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়েছে, না-কি কোনো সমস্যা হয়েছে? ফ্লাইটের সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় কোনো ভাইয়ের সাথে

[২১] ওয়াশিংটন ও কাবুলের সময়ের মধ্যে ৯ ঘণ্টার মতো পার্থক্য হয়ে থাকে। ওয়াশিংটন সময় সকাল ৮.৪৬ থেকে হামলা শুরু হয়েছিল। আফগানিস্তানের সময় অনুযায়ী তখন বিকাল প্রায় ৫.৪৬ বাজছিল। [সম্পাদক]

বিমানবন্দরে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটেছে কি না? সবাই তাঁদের নির্ধারিত বিমানে উঠতে পেরেছেন কি না? বিমানগুলো নির্ধারিত সময়ে টেক-অফ করেছে কি না? ভাইয়েরা সময়মতো বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে পেরেছেন কি না? বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে কোনো ঝামেলা হয়েছে কি না? পাইলটরা বিমান চালিয়ে সফলভাবে টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন কি না? নিঃসন্দেহে এ ধরনের হাজারো প্রশ্ন তাঁদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এগুলোর কোনো উত্তরও তাঁদের কাছে ছিল না। কারণ, ফিল্ড অপারেটিভ ও শায়খদের মাঝে যারা সমন্বয় করছিলেন, হামলার কিছুদিন আগেই তাঁরা আফগানিস্তানে ফিরে এসেছিলেন। ফলে ভাইদের সাথে শায়খদের সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর সামনের কয়েক মিনিটেই সে প্রশ্নগুলোর উত্তর অপেক্ষা করছিল।

এত চিন্তা-পেরেশানি থাকা সত্ত্বেও শায়খকে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হচ্ছিল না; বরং অপারেশন সফল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি শুধু বাকি বিমানগুলোর অবস্থা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

সময় যেন থেমে গিয়েছিল। কয়েকটি মিনিটকেও কয়েক যুগের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। সবাই শায়খ উসামাকে ঘিরে মনোযোগ সহকারে রেডিওতে 'ভয়েস অফ আমেরিকা'-র লাইভ ব্রডকাস্ট শুনছিল। পরিস্থিতির ভয়াবহতা সংবাদপাঠকের থেমে থেমে নেওয়া দীর্ঘশ্বাস আর মাঝে মধ্যে থমকে যাওয়া থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল। তার বর্ণনায় ফুটে উঠছিল ভয়াবহ সব দৃশ্য—আগুন ও ধোঁয়ার ছড়াছড়ি। মানুষের চোখেমুখে ভয় ও আতঙ্কের নিকষ কালো ছায়া। ভবনের জানালায় ঝুলে পড়া মানুষের হাত নেড়ে, জামা নাড়িয়ে বাঁচার আকুতি অথবা জীবন বাঁচাতে ভবন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে নিরূপায় মানুষগুলোর নির্বাক চাহনি, যারা আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়াকেই মৃত্যুর উত্তম বিকল্প মনে করে জীবনের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হঠাৎ সব নীরবতা ভেঙে সংবাদপাঠক চিৎকার দিয়ে উঠল—'ও মাই গড, আরও একটি বিমান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সাউথ টাওয়ারে আছড়ে পড়েছে।'

আরও একবার তাকবীর ও গুলির শব্দে পুরো উপত্যকা কেঁপে উঠল এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় নীরব হয়ে গেল চারপাশ। শুধু সংবাদপাঠকের কাঁপা কণ্ঠের আওয়াজ আর ফিসফিস শব্দ। ভাইয়েরা বিড়বিড় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন, যেন বাকি ভাইয়েরাও সফলভাবে তাঁদের টার্গেটে হামলা করতে পারেন। আচমকা সংবাদপাঠক আরও একবার চিৎকার করে উঠল, কিন্তু এইবার তার চিৎকার শুনে মনে হলো, হাতে আসা নতুন খবরটি সে কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অবিশ্বাস মেশানো গলায় সে ঘোষণা করল, রাজধানী ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে তৃতীয় বিমানটি আঘাত করেছে। এর আধা ঘণ্টারও কম

সময় পরে সংবাদপাঠকের কণ্ঠে শোনা গেল, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে আঘাত হানার লক্ষ্যে উড়তে থাকা চতুর্থ আরেকটি বিমানকে পেনসিলভেনিয়ায় ভূপাতিত করা হয়েছে[২২]।

শায়খ উসামা এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে আল্লাহ তাআলার হামদ ও শুকর করলেন। আল্লাহর সাহায্যে ভাইয়েরা তাঁদের মিশনটি সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সংবাদপাঠক চিৎকার করে বলে উঠল—'ও মাই গড! আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সাউথ টাওয়ার পুরোটা ধসে যাচ্ছে।' এর আধা ঘন্টা পর নর্থ টাওয়ারও মাটিতে মিশে যায়। এ দুটি ধসে পড়ায় তার আশপাশের আরও চারটি ভবনও ধসে পড়ে। এর মধ্যে একটি হলো ২২তলা বিশিষ্ট হোটেল ম্যারিয়ট, আরেকটি ৪৭তলা বিশিষ্ট টাওয়ার সেভেন। সেই সাথে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারের চারপাশে থাকা আরও দশটির মতো ভবন মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার দিন নিউজ এজেন্সিগুলো প্রাথমিক জরিপে নিহতের সংখ্যা ১০ হাজারের কথা জানিয়েছিল।

ভাইদের মধ্যে খুশির জোয়ার বইছিল। সবাই সিজদায়ে শুকর আদায় করছিলেন, একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, শায়খ উসামা-সহ অন্যান্য শায়খদের সাথে কোলাকুলি করছিলেন, তাঁদের কপালে চুমু খাচ্ছিলেন। ইতিহাসে এই প্রথম আমেরিকার ওপর এত বড় একটি হামলা হয়েছে, যা তার গর্ব-অহংকারকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের কথা অনুযায়ী আঘাতটি জাপানিদের পার্ল হারবার আক্রমণ থেকেও ধ্বংসাত্মক ছিল। ইসলামের ১৯ জন বীর মুজাহিদ আমেরিকার ভূখণ্ডে ঢুকে একই সময়ে তাদের চারটি বিমান হাইজ্যাক করে তা দিয়ে তাদেরই গৌরব ও অহংকারের প্রতীক সামরিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র ধসিয়ে দিয়েছে—এই পুরো চিত্রই ছিল অকল্পনীয়। শায়খ উসামা যখন তাঁদের কথা আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, ১৯ জন কলেজছাত্র এমন একটি ঘটনা ঘটিয়েছে, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। সেই ১৯ জন যুবক যেন আমেরিকাকে লক্ষ্য করে বলছে—

> তোমাদের প্রতি এটাই আমাদের বার্তা। এই বার্তা আমরা আমাদের রক্ত আর লাশ দিয়ে লিখছি। আমাদের যে পবিত্র ভূমিগুলোর পবিত্রতা তোমরা নষ্ট করেছ, আমাদের যে

---

[২২] উল্লেখ্য, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার বই *ডিসিশন পয়েন্টস*-এর ১৩৬-১৩৭ নং পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছে, সে-ই চতুর্থ বিমানটিকে ভূপাতিত করার আদেশ দিয়েছিল। বিভিন্ন ডকুমেন্টারিতে যেমনটা দেখানো হয় যে, প্লেনের যাত্রীরা হাইজ্যাকার ভাইদের সাথে মারামারি করে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে প্লেন বিধ্বস্ত হয়—তা পুরোপুরি সত্য নয়।

[বইয়ের লিংক: https://dokumen.pub/qdownload/decision-points-9780753539668-0753539667-9780753539965-0753539969.html (, ১৩৬-১৩৭ নং পৃষ্ঠার ছবি https://ibb.co.com/LXGm039W দেখুন।]

ভাইদের রক্ত তোমরা ঝরিয়েছ, আমাদের জাতির যত সম্পদ তোমরা লুট করেছ—এই হামলার মাধ্যমে তোমাদের সব অপরাধের বদলা নিচ্ছি। মুসলিম জাতির ব্যাপারে তোমরা যে অন্যায় নীতি গ্রহণ করেছ আর সে নীতি বাস্তবায়ন করেছ কখনো স্বাধীনতার নামে, কখনো 'রিস্টোরিং হোপ'-এর নামে, আবার কখনোবা কাউন্টার টেররিজমের নামে—এই হামলা তোমাদের সে অন্যায় নীতির ফসল। যে ইহুদীরা আমাদের প্রথম কিবলা ও পবিত্র ভূমি দখল করে রেখেছে, যারা আমাদের প্রধান শত্রু, সেই ইহুদীদের তোমরা অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে সব সময়ই সহায়তা দিয়েছ, এখনো দিয়ে যাচ্ছ। এই সহায়তার মূল্য তোমরা আজ শোধ করছ অশ্রু, রক্ত, ভীতি ও ধ্বংসের মাধ্যমে।



হামলার খবর শোনার পর প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতিক্রিয়া

সেদিন সন্ধ্যায় খালেদ শেখ মুহাম্মাদ, রামযী বিন শাইবা ও খাল্লাদ বিন আতাশ ভাইদের সাথে এসে মিলিত হন। ভাইয়েরা তাঁদেরকে উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানান। অপারেশনের সাফল্যের জন্য তাঁদের অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানান এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। তাঁরা পাকিস্তান থেকে আসার সময় সাথে একটি টেলিভিশন সেট, একটি ছোট জেনারেটর এবং বিভিন্ন চ্যানেল থেকে সংগৃহীত অপারেশনের পুরো ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলেন।

টিভি সেটটি চালু করার সামান্য সে সময়টুকুও আমাদের কাছে এক একটি যুগসমান মনে হচ্ছিল। আমেরিকার ধ্বংসের চিত্রগুলো দেখার জন্য ভাইয়েরা উতলা হয়ে ছিলেন। অবশেষে সে দৃশ্য দেখার সুযোগ তাঁদের হলো, যে দৃশ্য বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত করে, মনের মধ্যে জমানো ক্ষোভ দূর করে। তাঁরাও সে ঘটনার সাক্ষী হলেন, যে ঘটনাকে অনেক শত্রুও ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনকারী বলে আখ্যায়িত করেছে।

সম্ভবত সে সময়ও শায়খ উসামার চোখের সামনে ফিলিস্তিন ও লেবাননের মুসলমানদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের হৃদয়বিদারক সে দৃশ্যগুলো ভেসে উঠেছিল। যে দৃশ্যগুলো তাঁকে

ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। যার কারণে তিনি ৯/১১-সহ অন্যান্য হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে নির্যাতনের কথা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> ‘সেই ভয়াবহ দৃশ্যগুলো এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ, এখানে সেখানে পড়ে থাকা নারী ও শিশুদের লাশ। ঘরভর্তি মানুষের ওপর তারা বোমাবর্ষণ করেছিল, উঁচু উঁচু ভবনগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছিল শহরজুড়ে। মনে হচ্ছিল, দুর্বল কোনো শিশুকে হিংস্র কুমির কামড়ে ধরেছে, চিৎকার করা ছাড়া শিশুটির আর কিছুই করার নেই। কিন্তু কুমির কি অস্ত্র ছাড়া সংলাপের ভাষা বুঝবে?’

তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমেরিকাকে বলছেন, ‘আজ তোমরা যতটুকু শাস্তি পেয়েছ, তা তোমাদেরই অন্যায় নীতির অতি সামান্য ফল। আমাদের কওম কয়েক দশক ধরে তোমাদের এই অন্যায় নীতি সহ্য করে আসছে। মনে রেখো, ‘কাঁটার গাছ লাগিয়ে কখনো আঙুর আশা করা যায় না’, ‘সমতার আচরণই প্রকৃত ন্যায্যতা’ এবং ‘সূচনাকারীই বড় জালেম’।’

অপারেশনের পরের দিন সকালে সে জায়গা ত্যাগ করার আগে শায়খ উসামা রহ. আমেরিকার উদ্দেশ্যে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী ও কঠোর বক্তব্যটি রেকর্ড করেন। তাঁর সেই বিখ্যাত শপথবাক্য উচ্চারণ করে তিনি বলেন—

**"وأما أمريكا فأقول لها ولشعبها كلمات معدودة: أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا، بالأمن قبل أن نعيشه و اقعًا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلي الله عليه وسلم، والله أكبروالعزة للإسلام."**

‘আমেরিকা ও তার জনগণের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথাই বলতে চাই—মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি খুঁটি ছাড়াই আকাশকে উঁচু করেছেন, আমেরিকা ও আমেরিকার বাসিন্দারা ততদিন পর্যন্ত শান্তির দেখা পাবে না, যতদিন আমরা ফিলিস্তিনে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন না করব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ভূমি থেকে কুফফার বাহিনীর প্রতিটি সদস্য বের না হবে। আল্লাহু আকবার, নিশ্চয়ই সম্মান কেবলই ইসলামের।’

একই বক্তব্যে শায়খ উসামা মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। তাতে তিনি উম্মতে মুসলিমাকে দীনের নুসরতের জন্য উৎসাহ দেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ

বুশ যে কথাটি বলেছিল—'প্রতিটি রাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, হয়তো তারা আমাদের সাথে থাকবে, নয়তো সন্ত্রাসীদের সাথে'—তার সে কথার প্রেক্ষিতে শায়খ উসামা বলেন—

> 'এই ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছে। একটি ঈমানের শিবির, যেখানে কোনো নেফাক নেই, আরেকটি হলো নেফাক ও কুফরের শিবির। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। প্রতিটি মুসলিমের উচিত দীনের নুসরতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূখণ্ড থেকে বাতিলকে সমূলে উৎখাত করতে ঈমান ও বিপ্লবের নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে।'

উম্মতের প্রকৃত বীরপুরুষ যারা এবং যাদের অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও আত্মসম্মানবোধ বাকি আছে, তাঁদের হৃদয়রাজ্যে শায়খের এই কথাগুলো চিরকালই প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। ক্ষণে ক্ষণে তারা ডেকে বলবে, হে মার্কিনিরা, তোমাদের জুলুমের প্রতিদান সেটা নয়, যা তোমরা শোনো; তোমাদের জুলুমের প্রতিদান তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। শায়খের এই শপথবাক্য অনাগত প্রজন্মের জন্য সব সময়ই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ততদিন শান্ত হবে না, ততদিন তারা স্থির হতে পারবে না, যতদিন না তাদের জিহাদী হামলাগুলো আমেরিকাকে আমাদের উম্মতের প্রতি তার অন্যায় নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে এবং যতদিন না সর্বশেষ মার্কিন সৈন্যটি মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের হবে।

শায়খ উসামা তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা শেষ করার পর সবাই কাবুলের দিকে রওনা হন। সেখানে মেহমানখানাগুলোতে থাকা যুবকরা দলে দলে শায়খকে বিজয়ী সংবর্ধনা দিতে বের হয় এবং কল্পনাকে হার মানানো এই অভিযানের জন্য অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাতে থাকে। এমন অসংখ্য ভাইয়েরাও এসে শায়খের হাতে বাইয়াত হন, যারা আগে বাইয়াত হননি। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, সবাইকে এখন সংঘাতের এমন একটি পর্যায়ের মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। সবাই এখন একই নৌকার যাত্রী। যুগের হুবাল আমেরিকার সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে সবাইকে। এর জন্য দরকার এক দক্ষ নেতৃত্ব, যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে যার রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

শায়খ আবু মুসআব সূরী তাঁর বই 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ'-তে লিখেছেন—

> 'বলা যায়, শায়খ উসামা রহ.-এর সঠিক সিদ্ধান্তের ফলেই এই যুদ্ধ সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। তাঁর চেষ্টার বদৌলতেই আমাদের আসল শত্রু আমাদের সামনে আসতে বাধ্য

হয়েছে, যে এতদিন পর্দার আড়াল থেকে আমাদের অন্য সকল শত্রুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। আমেরিকা ও তার মিত্রদের মদদপুষ্ট ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদীদের থেকে শুরু করে মুসলিম দেশগুলোর মুরতাদ শাসক—যাদের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াই করছি, সব ফ্রন্টেই তিনি আমাদের আসল শত্রুকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আর পার্শ্বযুদ্ধ এড়িয়ে এই প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। শায়খ উসামা যুদ্ধের প্রকৃতি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং শত্রুকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তিনি সফল হয়েছিলেন। আমার মতে, সংঘাত ও সংগ্রামের চাবিকাঠি বাছাই করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। ঠিক যেমন সেপ্টেম্বরের হামলা পরিচালনাকারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সফল এই হামলার মাধ্যমে লড়াইয়ের সূচনালগ্নেই তাঁরা শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পেরেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে মুসলিমরাও আগ বেড়ে হামলা করার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করতে পেরেছিল।'

## ৯/১১ হামলার তত্ত্বাবধানে থাকা ভাইয়েরা



মুস্তফা হাওসাবী
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু



ওয়ালীদ বিন আত্তাশ (খাল্লাদ)
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু



রামযী বিন শাইবা
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু



খালেদ শেইখ মুহাম্মাদ
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু



যাকারিয়া সাব্বার
তাকাব্বালাহুল্লাহ



সাইদ বা-হাজী
তাকাব্বালাহুল্লাহ



আম্মার বেলুচি
(আলী আব্দুল আযীয আলী)
তাকাব্বালাহুল্লাহ

# ৯/১১ ফটোগ্যালারি

কুমির কি অস্ত্র ছাড়া সংলাপের ভাষা বোঝে?



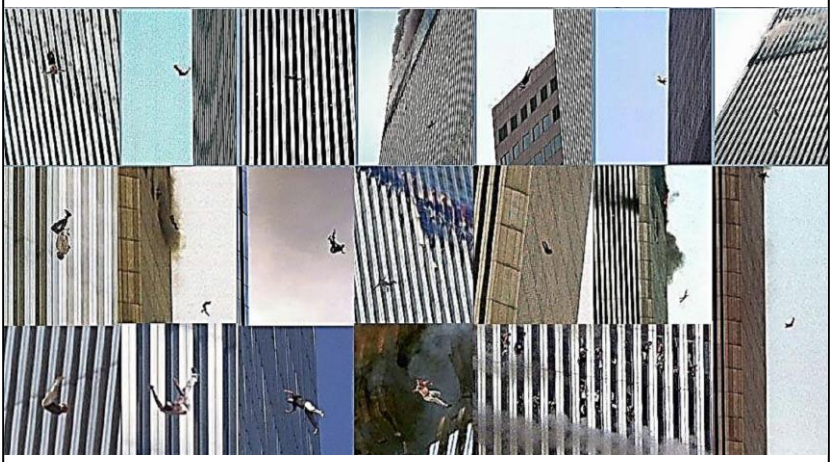
ধ্বংসের আগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার

আমাদের কথাগুলো যদি তোমাদের সতর্ক করতে পারত, তাহলে বিমান পাঠিয়ে সতর্ক করার দরকার হতো না



নর্থ টাওয়ার জ্বলছে, সাউথ টাওয়ারে বিমান আছড়ে পড়ার আগমুহূর্তের ছবি

জীবনের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্ত নেওয়া মানুষগুলোর মৃত্যুর আগমুহূর্ত



বিধ্বস্ত ভবন থেকে বিহ্বল মানুষের লাফিয়ে পড়ার দৃশ্য

সমতার আচরণ করাই হলো প্রকৃত ইনসাফ



টুইন টাওয়ারের ধসে পড়ার দৃশ্য

বিষবৃক্ষ লাগিয়ে আঙুরের আশা করা বোকামি

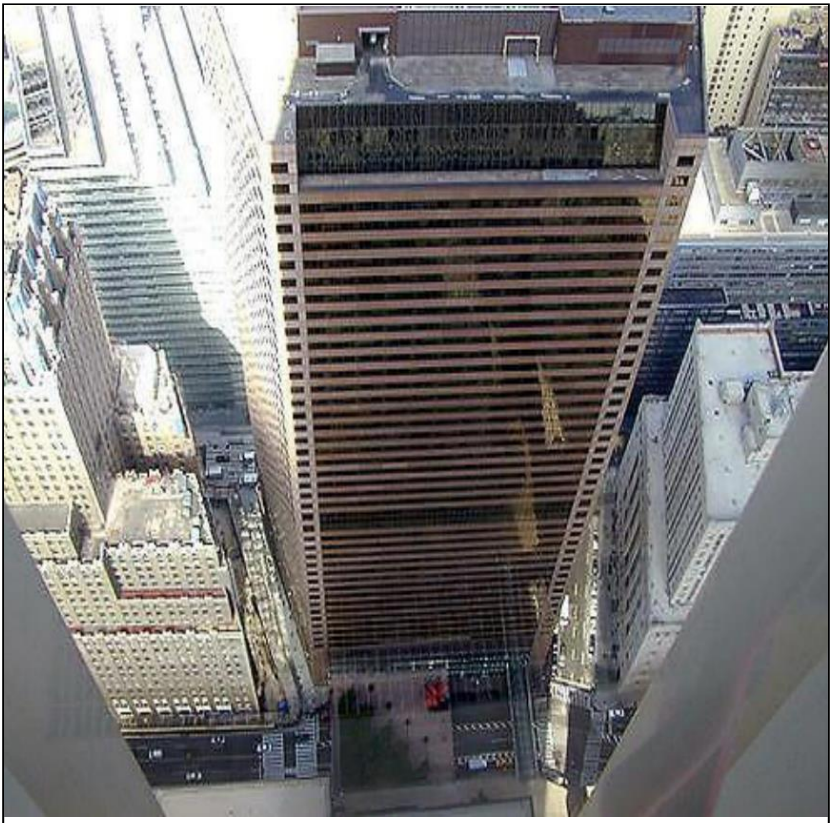


টুইন টাওয়ারের ধসে পড়ার দৃশ্য

শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম কাজই হলো অন্যায়ের প্রতিরোধ করা



টুইন টাওয়ারের ধ্বংস্তূপ

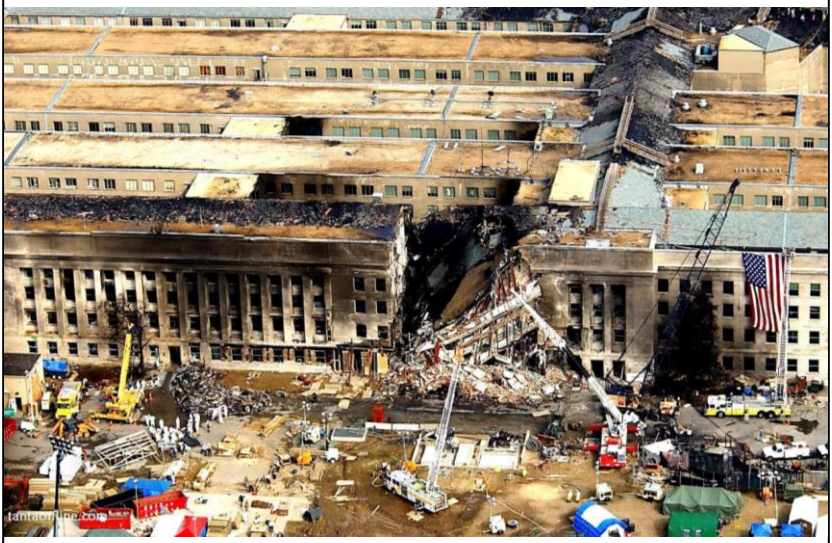


ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের অন্তর্গত ৪৭তলা বিশিষ্ট টাওয়ার সেভেন



২২তলা বিশিষ্ট ম্যারিয়ট হোটেলের ধ্বংস্তূপ

পেন্টাগনের প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা নিয়ে মার্কিন সরকারের এত লুকোছাপা কেন?



মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস বিল্ডিং পেন্টাগনের ধ্বংসচিত্র

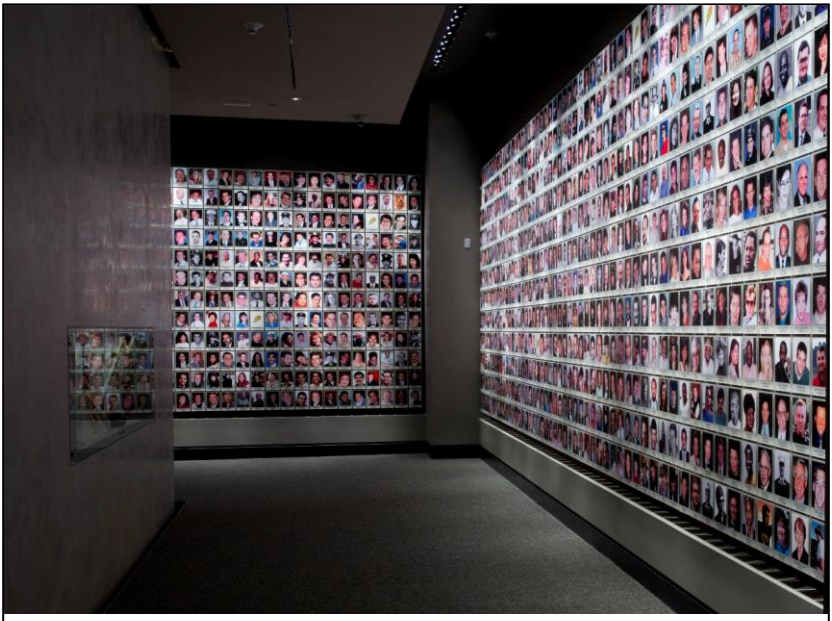
পেন্টাগনের ভবনগুলোতে নিহত কাফেরদের সঠিক সংখ্যা আজও প্রকাশ করা হয়নি



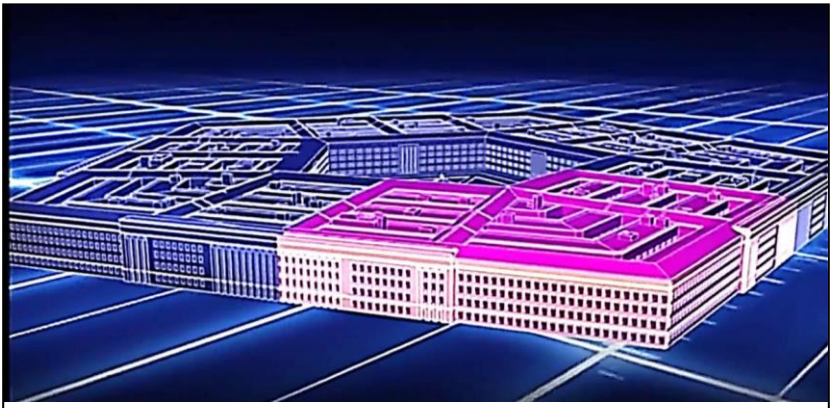
পেছনের দিক থেকে তোলা ধ্বংস হয়ে যাওয়া পেন্টাগনের আরেকটি ছবি



তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নির্দেশে ভূপাতিত করা চতুর্থ বিমানটির ধ্বংসাবশেষ



৯/১১ হামলায় নিহতদের স্মরণে নির্মিত মেমোরিয়াম ওয়াল



গোলাপি রং পেন্টাগন ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে নির্দেশ করছে।
(একটি ডকুমেন্টারি থেকে সংগৃহীত)

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ক্ষয়ক্ষতির ডায়াগ্রাম




ধূসর : পরিপূর্ণ ধ্বংস হয়েছে; লাল : ধসে পড়ার হুমকিতে আছে; নীল : ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; হলুদ : ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে মূল অবকাঠামো ঠিক আছে; বাদামী : ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তবে নোংরা হয়েছে।

আগেও বলা হয়েছে, ৯/১১-এর আগেই অনেক ভাই শায়খ উসামা রহ.-এর আমেরিকার বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ ঘোষণার সাথে দ্বিমত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তানজীমের শরয়ী বোর্ডের জিম্মাদার শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী হাফি.-ও ছিলেন। শায়খ যদিও আল-কায়েদা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ৯/১১-এর ফলে শত্রুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা জানতে পেরে তিনিও এই হামলার প্রশংসা করেছিলেন। এমনকি এ প্রসঙ্গে একটি কাসীদাও রচনা করেছিলেন। কাসীদার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

**ففتككم في الكفر لم ير مثله ... وما فاق حتى الآن من هولها الكفر**

বিশ্ব কুফরি শক্তির ওপর তোমরা যে নজিরবিহীন আঘাত করেছ, কুফরি বিশ্ব এখনো তার ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

**ولا زال مصعوقًا بها مترنحًا ... كأن به سكرًا وليس به سكر**

সে আঘাতে এখনও তারা বেহুঁশ ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আছে। দেখে মনে হয় তারা মাতাল, কিন্তু তারা মাতাল নয়।

**من السكر ما تأتي به الخمر غالبًا ... ومنه الذي يأتي به الذعر لا الخمر**

কিছু মাতলামো তো সৃষ্টি হয় মদের কারণে, কিন্তু কিছু কিছু মাতলামো আসে আতঙ্ক থেকে।

**فلله عزم من أولى العزم صادق ... ولله صبر ما رأى مثله الصبر**

আল্লাহর কসম! এটি দৃঢ় প্রত্যয়ীর সত্য সংকল্প এবং এমন সুউচ্চ ধৈর্য, যার কোনো দৃষ্টান্ত হয় না।

**ولله ضرب لم تر البيض مثله ... ولا سمعت عنه الردينية السمر**

খোদার কসম, এটি এমন এক আঘাত, শেতাঙ্গরা যা কখনো দেখেনি আর পিঙ্গলবর্ণের লোকেরা কখনো শোনেওনি।

**ولا فعلة في الكفر كانت كفعله ... ولا فتكة فيه عوان ولا بكر**

কাফেরদের ইতিহাসেও এমন কোনো আঘাতের নজির নেই, আর না এর কাছাকাছি বা সমান কোনো হামলার উদাহরণ আছে।

**نطحتم بعزمٍ هامة الكفر نطحة ... تهشم منها الرأس و انقصم الظهر**

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তোমরা কুফরের মাথায় এমন আঘাত করেছ, যাতে তাদের মাথার সাথে পিঠও ভেঙে গিয়েছে।

**فخرت قلاع الكفر للأرض بعدما ... تبخر منه الشطر واشتعل الشطر**

কুফরের দুর্গগুলোর অর্ধেক জ্বলে গিয়েছে আর অর্ধেক হাওয়ায় মিশে গিয়েছে, তারপর ধসে পড়েছে এবং মাটির সাথে মিশে গিয়েছে।

**فقامت من الهول الرهيب قيامة ... تحيّر في أوصافها الفكر والشعر**

ভয়াবহ সে দৃশ্য যেন কিয়ামতের অবতারণা ঘটিয়েছিল, কল্পনা ও কবিতাও যার যথাযথ বিবরণ তুলে ধরতে অক্ষম।

**وأضحى حمى الأعداء للنار مرتعًا ... وكان حمى حظرًا وما نفع الحظر**

শত্রুর ঘাঁটি আগুনের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল, যদিও সেটা ছিল অনেক সুরক্ষিত, কিন্তু কোনো সুরক্ষাই কাজে আসেনি।

**ففروا فرارًا يجمحون كأنهم ... من الذعر فئر انًا تملكها الذعر**

ভয়ে-আতঙ্কে তারা ভীত ইঁদুরের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছিল।

**فأدركتم ثأرًا من الكفر ضائعًا ... بثأركهذا الثأر فليدرك الثأر**

তোমরা এর মাধ্যমে কাফেরদের থেকে বিস্মৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছ। কাফেরদের থেকে তো এভাবেই প্রতিশোধ নেওয়া উচিত।

**فأنهلتم منه الردى ثم فارتوى ... وعل ولم يعجله من عله الصدر**

তোমরা তাদের রক্ত দিয়ে মৃত্যুকে পান করিয়েছ এবং তৃপ্ত করেছ, কিন্তু তবু অন্তরের ক্ষোভ যেন প্রশমিত হচ্ছিল না।

**شفيتم صدورًا ملؤها الغيظ قبلكم ... ألا بعد طول الغيظ قد شفي الصدر**

অবশেষে তোমরা ক্ষোভে ভরা হৃদয়গুলোকে শান্ত করলে, দীর্ঘ ক্রোধের পর হৃদয় যেন শান্তি খুঁজে পেল।

**و أيقظتم التاريخ بعد سباته ... فقد نهضت حطين واستيقظت بدر**

মূর্ছা যাওয়া ইতিহাসকে তোমরা জাগিয়ে তুললে, বদর আর হিত্তিন যেন নতুন করে জীবন্ত হলো।

**كتبتم نشيدا خالدا بصنيعكم ... تغني به الدنيا وينشده الدهر**

তোমরা আপন কর্মে লিখে গেলে শাশ্বত গান, যে গান গোটা দুনিয়া যুগ যুগ ধরে গাইবে।

**سنبقى كما كنا على العهد بيننا ... غزاة بنا يشقى وقد شقي الكفر**

ওয়াদামতো আমরা যুদ্ধ করে যাব, অতীতের মতো কাফেরদের জন্য আমরা দুর্ভাগ্য হয়ে দেখা দেব।

**نذلل سبل المجد بالبذل والعطا ... وبالصبر للأعداء إذا جزع الصبر**

ধৈর্যের সব বাঁধ যখন ভেঙে যাবে, তখনও আমরা দয়া, অনুগ্রহ আর শত্রুর সামনে প্রাচীরের মতো অবিচল থেকে সম্মানের পথ তৈরি করতে থাকব।

**عن الدرب ما حدنا على العهد لم نزل ... إلى أن يحين الحين أو يسعف النصر**

আমরা পথচ্যুত হইনি, বিজয় কিংবা কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত পর্যন্ত আমরা আমাদের ওয়াদার ওপর অটল থাকব।

**إذا ما نزلنا ساحة الكفر في الوغى ... تفشى هناك الموت و انتشر الذعر**

কুফরের বিরুদ্ধে এখনও যখন আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, তখন সেখানে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু আর আতঙ্ক।

**فإن نحن نلنا ما نريد ونبتغي ... فذاك وإلا كان في موتنا عذر**

আমরা যদি আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি, তাহলে তো ভালো; নয়তো আমাদের মৃত্যুতেও রয়েছে প্রাপ্তি।

**يذكرنيكم كل حزن يصيبني ... وكل سرور لي بكم عنده ذكر**

প্রতিটি বেদনা আমাকে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেবে, আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তেও তোমাদের স্মরণ করব।

**ولا عجب إن الشجى يبعث الشجى ... وكل سرور منه في جنسه ذكر**

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ একটি বেদনা আরেকটি বেদনার কথা মনে করিয়ে দেয় আর আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তই অতীতের আনন্দের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

**إذا طلعت شمس النهار ذكرتكم ... وأذكركم ذكرا إذا طلع البدر**

যখন দিনের সূর্য উঠবে, তোমাদের কথা আমি স্মরণ করব। রাতে যখন চতুর্দশী চাঁদ উঁকি দেবে, তখনও তোমাদের কথা মনে পড়বে।

**وإن جن جنح الليل جدد ذكركم ... وجدده فجري إذا طلع الفجر**

যখন নিকষ আঁধার ছেয়ে যাবে, তখনও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে। সে আঁধার কেটে যখন ভোরের আলো ফুটবে, তখনও তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে।

**ففيكم ولو سطرت كل قصائدي ... لما بلغت في القدر ما أوجب القبر**

তোমাদের শানে যদি আমার সব কবিতাও নিবেদন করি, তবু সেগুলো তোমাদের মর্যাদার উপযোগী হবে না।

## ৯/১১ হামলা ও মার্কিন সংস্থাসমূহের তদন্ত

হামলার পর মার্কিন প্রশাসন গোটা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। সম্ভাব্য সবকিছু তদন্তের আওতায় নিয়ে আসে। আফগানিস্তানের গুহা থেকে শুরু করে ১৯ জনের ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড—কোনো কিছুই বাদ রাখেনি। তাদের আশা ছিল, এর মাধ্যমে ১৯ জন হাইজ্যাকার কীভাবে ৯/১১-এর হামলার পরিকল্পনা সাজিয়েছিল—সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। দীর্ঘ ৭ মাস তদন্তের পরেও কীভাবে হামলা চালানো হলো—তার বাস্তবসম্মত কোনো ফলাফল বা অকাট্য প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায়নি। মার্কিন কর্মকর্তারা এ কথা স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছে যে, হামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তারা হয়তো কখনোই জানতে পারবে না।

সেই সময় ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এফবিআই-এর পরিচালক রবার্ট মুলার এক বক্তৃতায় বলেছিল—

> ‘হাইজ্যাকাররা কোনো লিখিত প্রমাণ রেখে যায়নি। আমাদের কোনো তদন্তেই—সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোক বা আফগানিস্তানে হোক—৯/১১ হামলার সাথে সম্পর্কিত একটি কাগজের টুকরোও খুঁজে পাইনি।’

সে আরও বলেছিল—

> '১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার প্রস্তুতি সম্ভবত পাঁচ বছর ধরে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নির্ভেজাল বৈধ ভিসা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। তারপর পরিপূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হামলার বিস্তারিত প্ল্যান তৈরি করেছে। মার্কিন প্রশাসন কীভাবে কাজ করে—সে ব্যাপারে তাদের বিস্তর ধারণা ছিল বলেই মনে হচ্ছে। তাই তদন্তকারীরা এমন কোনো কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা সিডি খুঁজে পায়নি, যা হাইজ্যাকাররা হামলার পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করেছিল। পরস্পর যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তারা চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। তাদের ফোনকল যেন ট্র্যাক না করা যায়, সে জন্য তারা পাবলিক ফোন ব্যবহার করেছে এবং মোবাইলও ঘন ঘন বদলিয়েছে। মোবাইল রিচার্জের জন্যও তারা সবচেয়ে নিরাপদ উপায় স্ক্র্যাচ কার্ড ব্যবহার করেছে। হামলার অর্থায়নের জন্য আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও তারা বড় লেনদেন এড়িয়ে অল্প অল্প করে লেনদেন করেছে। কারণ, সরকারি রিপোর্টে বড় লেনদেনগুলোর রেকর্ড রাখা হয়। মোটকথা, আমাদের হাত থেকে বাঁচতে যা যা করা সম্ভব ছিল, তারা সবই করেছে।'

৯/১১ হামলার তদন্তের ব্যাপারে মুলারের এই মন্তব্যটিকেই সবচেয়ে বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত মূল্যায়ন হিসেবে ধরা হয়। তা ছাড়া তার এই স্বীকারোক্তিই সাক্ষ্য দেয়, আল-কায়েদা কতটা নৈপুণ্যের সাথে এই হামলা পরিচালনা করেছে এবং এ ধরনের হামলার ক্ষেত্রে কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করার সক্ষমতা আল-কায়েদার আছে। এ জন্য মার্কিন দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলেছিল, ভবিষ্যতে নতুন কোনো হামলার হুমকি আছে কি না—তা খুঁজে বের করা এবং প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও [৯/১১-এর মতো] একই সংকট দেখা দিতে পারে।[২৩]

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রশাসন ১১ই সেপ্টেম্বরের পর উসামা বিন লাদেন ও ডা. আইমান আয-যাওয়াহিরীকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারলে ২৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে। মার্কিন বিমান থেকে আফগানিস্তানজুড়ে বিভিন্ন সময় মিলিয়ন মিলিয়ন লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতে শায়খ উসামা ও আইমান আয-যাওয়াহিরীর ছবি এবং পুরস্কারের পরিমাণ লেখা থাকত। ২০০৭ সালের ১৩ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে [বাইপার্টিজান সাপোর্ট তথা ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলের সমর্থনের ভিত্তিতে] শায়খ উসামা রহ.-এর ব্যাপারে তথ্য দিলে পুরস্কারের পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ মিলিয়ন বানিয়ে বিল পাশ করা হয় [এবং প্রেসিডেন্ট বরাবর তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা

---

[২৩] '১১ই সেপ্টেম্বর হামলা পরিচালনাকারীদের প্রস্তুতি গোপন রাখার সক্ষমতা উদ্বেগ ছড়াচ্ছে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। আল-বাত্তার আর্কাইভ। প্রবন্ধের আরবী ভার্সন এখানে (https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8555&article=100985) পাওয়া যাবে।

করার অনুরোধ জানানো হয়।] আমেরিকার ইতিহাসে এটিকেই সর্ববৃহৎ পুরস্কার মনে করা হয়।[২৪]




আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান থেকে ফেলা শায়খ উসামা ও শায়খ আইমানের ছবিসম্বলিত পুরস্কারের পরিমাণ লেখা লিফলেট। আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়া মিলিয়েও আপনাদের একটি নখের সমপরিমাণও হবে না।

## ১১ই সেপ্টেম্বরের বার্তা

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা কী বার্তা দেয়—সে সম্পর্কে সাইফুদ্দীন আনসারী তার 'গাযওয়াতু নিউইয়র্ক ওয়া ওয়াশিংটন, কিরাআতুন তা'সীলিয়্যাহ' শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন—

> 'সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি ছিল অভিনব ও যুগান্তকারী একটি ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে এর কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। গবেষকদের মতে, হামলাকারীরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মূলত বিশ্বকে কিছু বার্তা দিতে চেয়েছে। আর সেই বার্তা তারা লিখেছে নিজেদের রক্ত দিয়ে, যেন ইতিহাসের পাতা থেকে চাইলেই কেউ মুছে ফেলতে না পারে। এই হামলার মাধ্যমে তারা বিশ্বকে যে বার্তা দিতে চেয়েছে, তা হলো—

[২৪] ১৩ই জুলাই ২০০৭-এ ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ থেকে সংগৃহীত।

১. অভিনব এই হামলাটি বিশ্বকে বলতে চায়—জিহাদী আন্দোলন অনেক কিছুই করতে পারে। সে চাইলে এমন ঘটনার জন্ম দিতে পারে, যা প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নাড়িয়ে দেবে এবং বিশ্ববাসীকে নতুন করে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকতে বাধ্য করবে। এই ঘটনা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে বলে, মুজাহিদরা আপন যোগ্যতা ও আমানতদারির বদৌলতে এমন শক্তিশালী অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের ভেতর ও বাহিরের শত্রুদের সাথে চলমান সংঘাত থেকে কেউ চাইলেই তাদের সমীকরণের বাইরে ঠেলে দিতে পারবে না।

২. এ হামলাটি সকলকে আহ্বান জানায়, মুজাহিদদের যে বিকৃত চিত্র শত্রুরা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে, তারা যেন সে চিত্রটি মুছে ফেলে। শত্রুপক্ষের মিডিয়া মুজাহিদদেরকে হতদরিদ্র আর ভাগ্যবিড়ম্বিত একদল লোক হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু এই হামলার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, শত্রুদের ছড়ানো এই চিত্র সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা মুজাহিদদের এই কল্পিত চিত্রের প্রচার করেছে। তাদের এমনই একটি উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুসলিমা এবং উম্মতের অগ্রগামী বীর মুজাহিদদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে উম্মতের মধ্যে পরাজিত মানসিকতা ও দাসত্বের মনোভাব জিইয়ে রাখা। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শক্তিধর সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে জিহাদী আন্দোলনের সক্ষমতা তো আগেই প্রমাণিত হয়েছিল। ৯/১১-এর হামলা এই বাস্তবতাকে আরও মজবুত করেছে। এতে এখন আর সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই হামলা আবারও প্রমাণ করেছে, উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তি ও সামর্থ্য মুজাহিদরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. যতটা নৈপুণ্যের সাথে হামলাটি চালানো হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়, মুজাহিদদের মধ্যে নতুন এক প্রজন্মের উত্থান হয়েছে। নতুন এই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হলো, পূর্ববর্তীদের আদর্শের ওপর অটল থাকার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হতে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। অতীতের নানান পরিস্থিতি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি ক্রমবিকাশমান শরীয়তসম্মত বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা অবহেলা করে না। এর ফলে তাদের সামনে লড়াই ও সংঘাতের এক বিস্তৃত দিগন্ত খুলে গেছে এবং নতুন নতুন উপায়ে শত্রুর ওপর আঘাত করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। আমরা নিশ্চিত, ৯/১১-এর গৌরবময় হামলা নতুন এই যুদ্ধের ভূমিকামাত্র। বইয়ের আসল অংশ এখনো বাকিই রয়েছে।

৪. নজিরবিহীন এই হামলাটি শত্রুদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে যে, মুজাহিদরা ইটের জবাব পাটকেলে দিতে সক্ষম, তা-ও অকল্পনীয় উপায়ে। নতুন এই জিহাদী প্রজন্মের পক্ষ

থেকে ভবিষ্যতে যে হামলাগুলো হবে, ৯/১১ হলো সে হামলারই একটি নমুনামাত্র। আধুনিক ক্রুসেড শুরুর পর বিশ্ব বুঝতে পেরেছে, জিহাদী আন্দোলন জীবন্ত একটি আন্দোলন। হাজার গুণ প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথেও খুব সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভূত ক্ষমতা আছে এই আন্দোলনের। পর্দার আড়াল থেকে দেওয়া কাপুরুষোচিত হুমকি-ধমকি এই আন্দোলনকে কিছুতেই দমাতে পারবে না।'

## আমেরিকার ওপর ৯/১১-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

১৪২৩ হিজরীর ঈদুল আযহার খুতবায় শায়খ উসামা রহ. আমেরিকার ওপর ৯/১১ হামলার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

'১৪২২ হিজরীর ২৩শে জুমাদাস সানী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর বরকতময় মঙ্গলবার। মার্কিন-জায়োনিস্ট জোট যখন আল-আকসার বরকতময় ভূমিতে মার্কিন প্লেন, ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে ইহুদীদের নাপাক হাতে আমাদের সন্তানদের হত্যা করছিল আর আমাদের পরিবারগুলোকে উজাড় করে দিচ্ছিল, আমেরিকা ও তার দালালদের অন্যায় অবরোধের ফলে ইরাকে যখন আমাদের সন্তানরা না খেয়ে মারা যাচ্ছিল; অন্যদিকে মুসলিমবিশ্ব সত্যিকার অর্থে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে দূরে লাঞ্ছনার জীবন কাটাচ্ছিল, মুসলিমরা যখন নিরাশা ও হতাশার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন আঙ্কেল স্যামের দেশ (আমেরিকা) আরও হঠকারী, উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠছিল। কাউকে পরোয়া না করে দম্ভভরে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল আর ভাবছিল তাকে ঠেকানোর সাহস আছে কার? ঠিক সে সময়েই তাদের ওপর এক মহা বিপর্যয় নেমে আসে। কী সেই মহা বিপর্যয়? উশকোখুশকো চুল, ধুলোমলিন পা আর জরাজীর্ণ পোশাকের কিছু তরুণ তাদের ওপর বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই তরুণরা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল আর আল্লাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন, তাদের বিশ্বাসকে মজবুত করেছিলেন এবং ঈমানকে তাদের হৃদয়গভীরে খোদাই করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর ব্যাপারে তাঁরা কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করেনি, সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই তাদের প্রতিদান কামনা করেছিল। এত জুলুম দেখে তাঁরা আর চোখ বুজে থাকতে পারেনি; তারা জীবন দিতে রাজি, কিন্তু সম্মান বিসর্জন দিতে কিছুতেই রাজি ছিল না। তারা এই জুলুমের শেষ দেখতে চাচ্ছিল। তাই শত্রুদেশের বিমান ব্যবহার করে তাদের ওপরেই একটি দুঃসাহসী ও অসাধারণ অপারেশন পরিচালনা করে, মানবেতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আর মার্কিন অর্থনীতির ওপর এক অকল্পনীয় আঘাত হানে। এতে আমেরিকার কল্পিত মূর্তি ভেঙে খানখান হয়ে যায়, তার সব সম্মান ধুলোয় মিশে যায়, তার সেই বেপরোয়া অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

সেদিন শুধু নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ভেঙে পড়েনি; বরং এর সাথে আরও বড়, আরও বিশাল অনেক কিছুর পতন ঘটেছে। সেদিন 'গ্রেট আমেরিকান মিথ'-এর পতন ঘটেছে, পতন ঘটেছে গণতন্ত্র নামক কল্পকাহিনির। সেদিন মানুষ বুঝতে পেরেছে, আমেরিকার নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কতটা নিচুমানের। 'অবাধ স্বাধীনতার ভূমি'র কল্পকথা সেদিন ভেঙে চুরমার হয়েছে, আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটির মিথ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সিআইএ'র কল্পিত ক্ষমতার মিথও কর্পুরের মতো উবে গেছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

৯/১১ হামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ফলাফল হলো, এটি ক্রুসেডার ও মুসলমানদের মধ্যে চলমান সংঘাতের বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়েছে। এই হামলার কারণেই মুখোশধারী আমেরিকা মুখোশ ছেড়ে তার আসল কুৎসিত চেহারা প্রকাশ করেছে, মুসলিমদের প্রতি কতটা ঘৃণা সে লালন করে, তা স্পষ্ট হয়েছে। [৯/১১ পরবর্তী] আমেরিকার হিংস্রতা দেখে পুরো বিশ্বের ঘুম ভেঙেছে, মুসলিমদের মধ্যে ওয়ালা-বারার চেতনা জাগ্রত হয়েছে, ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত হয়েছে; খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কালেমার পতাকাতলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে এই অর্জনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৯/১১ হামলার কারণেই মানুষ দেখতে পেরেছে, আমেরিকার মতো আগ্রাসি শক্তিকেও আঘাত করা সম্ভব। একে অপমানিত, অপদস্থ ও পরাজিত করাও সম্ভব। এমনইভাবে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মার্কিন জনগণের বড় একটা অংশ ফিলিস্তিন সংকটের বাস্তবতা নিজেরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের সরকারের অন্যায় নীতির কারণেই ম্যানহাটনে তাদের ওপর এই মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে।

মোটকথা, আমেরিকা শক্তিধর একটি দেশ, তার দানবীয় সামরিক শক্তি আছে, বিস্তৃত অর্থনীতি আছে। সবই ঠিক, কিন্তু এটাও সত্য যে, তার সবকিছুই দাঁড়িয়ে আছে ভঙ্গুর ভিতের ওপর। আর এই ভঙ্গুর ভিতকে লক্ষ্যবস্তু বানানো সম্ভব, এর সবচেয়ে দুর্বল জায়গাগুলোতে আঘাত করা সম্ভব। তার এই দুর্বল পয়েন্টের শতভাগের এক ভাগেও যদি আঘাত করা যায়, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ছিটকে পড়বে, তার সব অহংকার আর গর্ব ছাইয়ের মতো বাতাসে উড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক জোটের শত বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ গুটিকয়েক তরুণ প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, তথাকথিত পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তার আগ্রাসনকে রুখে দেওয়ার মতো শক্তি এখনো দুনিয়াতে আছে। এই বরকতময় হামলার মাধ্যমে তারা নিজেদের দীনের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চাশোর্ধ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ মিলে উম্মাহর যতটুকু উপকার করেছে, এই ১৯ তরুণ

তারচেয়েও ঢের বেশি উপকার করেছে। কারণ, দীনের নুসরতের জন্য তারা জিহাদের পথ বেছে নিয়েছে। আবু হিলালা বলেছেন—

**وللنصر أسباب وللخسر مثلها ... وكل فريق يورث الخلد رابح**

বিজয়ের বেশকিছু কারণ আছে, পরাজয়েরও আছে নানা কারণ। তবে প্রকৃত বিজয়ী তো তারাই, যারা ইতিহাসে নিজেদের অমর বানাতে পারে (বিজয়ী হয়ে হোক কিংবা পরাজিত হয়ে)।

**دروب العلا شتى و أقصرها التي ... تريق الدما في جانبيها الزحاز**

উঁচু মর্যাদা অর্জনের নানা পথ আছে। তবে সংক্ষিপ্ততম পথ হলো সেটা, যার উভয় পাশে যুদ্ধের কারণে রক্ত ঝরে।'

## মুসলিম উম্মাহর ওপর ৯/১১-এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর ওপর ৯/১১-এর সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব পড়েছে। এগুলো প্রায় সবাই জানে। তাই তা নিয়ে আমরা এখানে কোনো আলোচনা করব না। তবে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা এর প্রভাবগুলোকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেছে। তাদের আচরণ অনেকটা বনী ইসরাইলের মতো। বনী ইসরাইল আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালামের ওপর রাগ ঝেরেছিল এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল, **أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا** 'হে মুসা, তুমি আসার আগেও আমরা নিপীড়িত হয়েছি, আসার পরেও নিপীড়িত হচ্ছি।' সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তারা মুসা আ.-এর নবুওয়তের মধ্যে কোনো কল্যাণ তো দেখতই না। উলটো নবুওয়ত-পরবর্তী সময়ে তারা যত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তার জন্যও মুসা আ.-কে দায়ী করত।' এই লোকদের যুক্তিগুলো শায়খ আবু মুসআব সূরী 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়া'-তে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করেছেন—

১. ৯/১১-এর হামলা মুসলমানদের ওপর বিপদ ডেকে এনেছে এবং তাদেরকে এমন এক অসম যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, যে যুদ্ধে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

২. ৯/১১-এর হামলা-ই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে আক্রমণ করার বৈধতা দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বে মার্কিন দখলদারিত্ব আর মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পেছনেও এই হামলাই দায়ী।

৩. এ হামলার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তৎক্ষণাৎ আঞ্চলিক ও দেশভিত্তিক অসংখ্য জিহাদী জামাতের কার্যক্রম আক্ষরিক অর্থেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

৪. ৯/১১ হামলার কারণেই আফগানিস্তানের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারাত ধ্বংস হয়েছে। অথচ অসংখ্য জিহাদী কার্যক্রম, জিহাদী তানজীম ও মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের জন্য এই আফগানিস্তানই ছিল একমাত্র নিরাপদ ঘাঁটি, একমাত্র আশ্রয়।

আবার এমন কিছু লোকও আছে, যারা স্বীকার করে, যদিও অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছে, তবু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচারে তা যুক্তিযুক্ত। মোটকথা, ৯/১১-এর হামলাকে ঘিরে নানা মুনির নানা মত আছে। এ ব্যাপারে আমাদের সামনে স্বচ্ছ একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। এ জন্য হক্কানী রব্বানী উলামায়ে কেরাম ৯/১১-এর হামলাকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন—সে বিষয়টি এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি। সাথে সাথে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যত সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর উত্তরও দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যারা এই হামলার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তালেবানের সেই ঈমানদীপ্ত কাফেলা ৯/১১-এর ব্যাপারে কী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের এমন কিছু ঈমানজাগানিয়া বক্তব্য ও ঘটনাও উল্লেখ করা হবে। বিশেষ করে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এবং তালেবানের মহান নেতৃবৃন্দ ৯/১১-কে কীভাবে দেখেছেন, তা আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

## ৯/১১ হামলা: সংশয় নিরসন

শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ. তাঁর বই 'হাকীকাতুল হারবিস সালীবিয়্যাতিল জাদীদা (নব্য ক্রুসেডের বাস্তবতা)'-তে লিখেছেন—

> 'আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর তালেবান যখন পিছু হটছিল এবং একের পর এক শহর হাতছাড়া হচ্ছিল, তখন অনেক মুসলমান হতাশ হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ ভাবছিল, হয়তো মুজাহিদদের পরাজয় ও পতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এরইমধ্যে এমন কথাও শুরু হয়ে গেল যে, মুজাহিদরা সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছে।
>
> হ্যাঁ, মুজাহিদদের কিছু ভুল তো হয়েছেই। মুজাহিদদের মধ্যে থাকা কিছু লোক খিয়ানতও করেছে। [কিন্তু অল্পকিছু মানুষের ভুল ও খিয়ানতের কারণে মুজাহিদদের সামগ্রিক সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করা কিংবা মুজাহিদদের সম্মিলিত অবস্থানকে বিপদাপদের জন্য দায়ী করা কোনোভাবেই উচিত না।] কারণ, সদস্যরা যতই পূতপবিত্র হোক না কেন, কোনো দলই খিয়ানত থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না। স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনীতেও তো মুনাফিক ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—
>
> ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

‘তোমাদের আশেপাশে যে-সব বেদুইন আছে, তাদের মধ্যেও মুনাফিক আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও মুনাফিক আছে। তারা মুনাফিকিতে (অত্যন্ত) কঠোর, (তবু) তুমি তাদেরকে চেনো না, আমি তাদেরকে চিনি। আমি তাদেরকে দু’বার শাস্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে এক মহা শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।’ [সূরা তাওবা (৯) : ১০১]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন, তখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মদীনায় ফিরে এসেছিল। [মুনাফিকদের খিয়ানতের কারণে কি] এই বাহিনীর নেতৃত্বকে দোষারোপ করা যাবে? [উহুদের সাময়িক পরাজয়ের কারণে কি] এ কথা বলা যাবে যে, নবীজী যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করেছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে এমন কথা কল্পনা করাও তো অন্যায়। তবে তিনিও মানুষ ছিলেন, তাঁর বেলায়ও এমন কিছু ঘটে যেত, যা তিনি আগে থেকে জানতেন না।

এ জন্যই যে-সব ভুল ও খেয়ানতের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর কারণে মুজাহিদদের সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করা যায় না। এমনইভাবে কেউ যদি নিজেকে বিক্রি করে দেয়, সেটার দায়ও মুজাহিদদের দেওয়া যাবে না। তাঁদের কাজ হলো এ ধরনের ঘটনা থেকে যথাসম্ভব বাঁচার চেষ্টা করা। আর তারা তা করবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বলেছেন—

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ

‘তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো দুনিয়া কামনা করছিল আর কিছু লোক আখিরাত চাচ্ছিল।’ [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫২]

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে যদি আল্লাহ তাআলা এই কথা বলতে পারেন, তাহলে এই যুগে এসে সেই সোনালি যুগের মানুষদের চেয়েও মুত্তাকী, পরহেযগার ও খাঁটি মুজাহিদ ও জিহাদ আমরা কীভাবে চাইতে পারি?

এ ধরনের সন্দেহ সংশয় অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। অনেক আহলে ইলম ব্যক্তিরাও এমন প্রশ্ন করে বসেন। তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। আশা করি এতে চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তার খোরাক থাকবে।’

## অভিযোগ ও জবাব[২৫]

মুজাহিদরা কি উম্মতকে অসম যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রথমেই আমরা নিম্নলিখিত কিছু প্রশ্ন এবং সেগুলোর উত্তর দেখে নেব।

১. মুজাহিদদের এই হামলার কারণেই কি পশ্চিমারা উম্মাহর বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে? এই হামলা কি পশ্চিমা আগ্রাসনের বৈধতা তৈরি করেছে?

২. ৯/১১-এর আগে থেকেই কি পশ্চিমারা আফগানিস্তান, ইরাক-সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল?

৩. কোন কারণে মুজাহিদরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে উত্তেজিত করতে বাধ্য হলেন?

৪. জিহাদ করার জন্য কি মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকা শর্ত?

৫. দুর্বল মুসলিম জাতিকে শক্তিশালী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে আনা কি বুদ্ধিমানের কাজ ছিল?

৬. শত্রুর পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকলে কি আমরা জিহাদ বন্ধ রাখব?

৭. এখানে সেখানে ছোটখাটো বোমা হামলা করে কি শক্তিশালী পশ্চিমাদের পরাজিত করা সম্ভব?

৮. হালকা অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করে কি বিশাল কোনো সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব?

শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ. তাঁর 'তাসাউলাত হাওলাল হারবিস সালীবিয়্যাতিল জাদীদা (নব্য ক্রুসেড : কিছু জিজ্ঞাসা)' বইয়ে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। নিচে তার সারমর্ম তুলে ধরা হলো—

'মুজাহিদরা নিজেদেরকে একটি অসম যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে অথবা ধাপে ধাপে নিজেদের অজান্তেই তারা একটি অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—এ ধরনের দাবিগুলো যথাযথভাবে বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

### ১. মুজাহিদগণ যে হামলাটি করেছেন, এই হামলার কারণেই কি আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছে?

[২৫] এখানে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলো শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ. রচিত 'মাজমুউদ দিরাসাতিশ শারইয়্যাহ' নামক বই থেকে সংগৃহীত।

অবশ্যই না। আমেরিকা তো অনেক আগে থেকেই তালেবান ও জিহাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এ বিষয়ে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব নিয়াজ নায়েক বলেছিলেন, মার্কিন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ২০০১ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়েই তাকে জানিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝিতে আফগানিস্তানে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। যদি বিন লাদেনকে অবিলম্বে হস্তান্তর না করা হয়, তাহলে আমেরিকা তাঁকে এবং তালেবান নেতা মোল্লা উমরকে গ্রেফতার বা হত্যা করার জন্য সামরিক পদক্ষেপ নেবে। নিয়াজ নায়েক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই অভিযানের বৃহত্তর লক্ষ্য হবে তালেবান সরকারকে উৎখাত করে মডারেট আফগানদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা, যার প্রধান হবে আফগানিস্তানের সাবেক রাজা জহির শাহ। ইসলামী ইমারত যদি অবিলম্বে উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরও করে, তবু আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে কি না—এ ব্যাপারে নিয়াজ নায়েক সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।

হ্যাঁ, ৯/১১ না ঘটলে আমেরিকা হয়তো এত তাড়াতাড়ি জোট তৈরি করতে পারত না, এত সমর্থনও সে জোগাড় করতে পারত না। তাই বলে এর অর্থ এটা নয় যে, ৯/১১-এর ঘটনাই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনেছে, যার ফলে একটি অসম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে। বিশেষ করে এই অঞ্চল ঘিরে আমেরিকার যে স্বার্থ রয়েছে, তা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে এতে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। সুতরাং যা ঘটেছে, এটি শত্রুর অবশ্যম্ভাবী আগমনকে এগিয়ে আনা ছাড়া আর কিছুই করেনি, যদি বাস্তবেই একে এগিয়ে আনা বলা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ৯/১১ হামলা কি তাড়াহুড়ো করে সময়ের আগেই করা হয়েছিল, যার ফলে মুজাহিদদের একটি অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল? কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য কি কাফেরদের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকা জরুরি? দুর্বল মুসলিম জাতিকে শক্তিশালী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ?

এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, ক্ষমতার ভারসাম্য দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এর অর্থ কি শক্তি-সামর্থ্য, যুদ্ধসরঞ্জাম ও লোকবলের ক্ষেত্রে সমান হওয়া ?

একটি ভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করা আর যুদ্ধ না করা—দুটো একই বিষয়। কারণ ভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধের অপেক্ষা কোনোদিনই শেষ হবে না। এতে বরং শত্রু সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী হবে আর আমরা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকব। ইতিহাস সাক্ষী, এমন কোনো যুদ্ধ নেই, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্যের কারণে জয়লাভ করেছে; বরং এর উলটোটা আছে। বিশেষ করে বিখ্যাত যুদ্ধগুলোতেই এমন নজির বেশি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল যুদ্ধ, কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের মতো সাহাবীদের বিখ্যাত যুদ্ধগুলো। এমন আরও বহু ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। হুনাইনের

যুদ্ধে তো মুসলিমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্বিত হওয়ায় শুরুতেই তারা হেরে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

'(আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে) হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনো কাজে লাগেনি এবং জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করেছিলে।' [সূরা তাওবা (৯) : ২৫]

দ্বিতীয় কথা হলো, মুতার যুদ্ধে এই ভারসাম্য কোথায়? এ যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার আর শত্রুসংখ্যা দুই লাখ। এখানে ভারসাম্য তো ছিলই না; বরং একটি অকল্পনীয় অনুপাত দাঁড়িয়েছিল (১০০ : ১.৫)। আরও সহজ করে বললে, একজন মুসলিম মুজাহিদ একাই ৬৬ জনেরও বেশি কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। দু'পক্ষের এত তফাত সত্ত্বেও মুসলিমরা যুদ্ধ করেছিল এবং সাহসিকতার সাথেই করেছিল। এমনকি যুদ্ধের সকল সেনাপতি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন—যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। যুদ্ধ শুরুর আগে শত্রুবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কথা শুনে তাঁরা প্রথমে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. তাদেরকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন। তারা যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি অসম যুদ্ধে নামার জন্য তাদের নিন্দা তো একদমই করেননি, উলটো মদীনার মুসলিমরা যখন এই বলে তাঁদের অপমান করতে লাগল—'হে পলায়নকারীরা, তোমরা কি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছ?', তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন—'তাঁরা পলায়নকারী নয়, তাঁরা তো (যুদ্ধে) প্রত্যাবর্তনকারী ইনশাআল্লাহ'।

এ ধরনের যুদ্ধের একটি ফায়দা হলো, চূড়ান্ত কোনো বিজয় অর্জন না হলেও এর মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বপর্ণ একটি উদ্দেশ্য হাসিল হয়। জিহাদের অন্যতম এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, ইসলামের শান-শওকত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি প্রদর্শন করা এবং এটা তুলে ধরা যে, মুসলিমরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। যেমনটি মুতার যুদ্ধে ঘটেছে। তাই, প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে অবহেলা করে চেষ্টা-তদবীর ছেড়ে দেওয়াই হলো আসল ভারসাম্যহীনতা। মুসলিমরা যদি আল্লাহ তাআলার ইদাদের নির্দেশ **وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة** [আর তোমরা তাদের

বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করো।] যথাযথভাবে পালন করে, তাহলেই তাঁদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কারণ, এর বেশি দায়িত্ব আল্লাহ তাদের ওপর চাপাননি।

## ২. জিহাদের কারণে যদি শত্রুর পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কি আমরা জিহাদ বন্ধ রাখব?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য হলো—
প্রথমত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে কুরাইশের ব্যবসায়িক কাফেলার খোঁজে বের হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর লক্ষ্য ছিল শত্রুকে **সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে আঘাত করা**। এই পয়েন্টটি মাথায় রেখে এখন আসুন আমরা এই অভিযানটি বিশ্লেষণ করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করলে এর প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত কঠোর ও তীব্র হবে, তার শুধু সম্ভাবনা না, অনেকটা নিশ্চয়তাই ছিল। কারণ, কুরাইশ তাদের বাণিজ্য ও অর্থনীতির ওপর বিন্দুমাত্র আঘাতও সহ্য করবে না। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। ব্যবসায়িক কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য কুরাইশ তৎক্ষণাৎ নিজেদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য আর লোকবল নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা করে। কুরাইশের কাফেলার দিকে যে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করেছে, তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার নিয়তেই তারা বের হয়েছিল। তাই তো গর্ব-অহংকারের সাথে বেশ আয়োজন করে ঢাকঢোল পিটিয়েই তারা বের হয়েছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলে কি 'কাফেরদের পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা'-কে অভিযান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় মনে করেছেন?

উহুদের যুদ্ধ তো প্রকৃতপক্ষে বদরের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সংঘটিত হয়েছিল। তারা সরাসরি মদীনাকেই ধ্বংস করতে চাচ্ছিল। এই যুদ্ধে মুসলিমরাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে কি আসমান থেকে কোনো নিন্দার আয়াত নাযিল হয়েছে? কেন মুসলিমরা তাড়াহুড়ো করে বদরের যুদ্ধে জড়াল এবং শত্রুকে নিজেদের দিকে টেনে আনল—এ ধরনের কোনো তিরস্কার কি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে? না-কি মুসলিমদের তিরস্কার করা হয়েছে আমীরের অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং গনীমত লাভের জন্য তাড়াহুড়ো করার কারণে?

বদরে মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু তারা যে বিজয়ী হবে—এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল না। ঘটনাক্রমে বদরে মুসলিমরা জয়ী না হয়ে যদি পরাজিত হতো, তাহলে কি কাফেলার ওপর হামলার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার হুকুমে কোনো পরিবর্তন আসত? অর্থাৎ তখন কি বলা

হতো, মুসলিমরা কুরাইশের মতো শক্তিধর প্রতিপক্ষকে নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে এনে এক অসম যুদ্ধ শুরু করেছে? মুসলিমরা কুরাইশকে নিজেদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে এবং সময়ের আগেই তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধ শুরু করে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছে? একই কথা হুনাইন, তাবুক ও মুতার যুদ্ধের ব্যাপারেও বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: জিহাদী কাজের কারণে শত্রুর পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসার যে ভয়, একে আমলে নিলে তো শেষমেশ সব ধরনের জিহাদী কার্যক্রমই বন্ধ করে দিতে হবে। এমনকি জবানের জিহাদ, কলমের জিহাদ, ওয়াজ-নসীহতের জিহাদ, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের জিহাদও করা যাবে না।

কারণ, কাফের, জাহেল আর দীনবিদ্বেষী লোকেরা যে-কাজগুলো অপছন্দ করে, সেগুলো করা হলে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া আসবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিক্রিয়া কখনো শক্ত হবে, কখনোবা দুর্বল হবে; তবে প্রতিক্রিয়া আসবেই। তারা যদি এটা বুঝতে পারে যে, আমরা প্রতিক্রিয়ার ভয়ে কাবু হয়ে আছি, তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের মনমস্তিষ্কে এই ভয়কে আরও বদ্ধমূল করার জন্য উঠেপড়ে লাগবে, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালিয়ে আমাদের মধ্যে আরও বেশি ভয় তৈরি করবে। এভাবে তারা নিজেদের জন্য একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করে নেবে। আর এই প্রাচীরকে টিকিয়ে রাখতে উল্লেখযোগ্য কিছুই তাদের করতে হবে না, শুধু মিডিয়া প্রচারণা আর সাথে মাঝে মধ্যে শাস্তির কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু করলে তারা কঠোরভাবে এর জবাব দেয়।

এই যুক্তির আলোকে তো ফিলিস্তিনে কোনো ধরনের প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডই করা ঠিক হবে না। কারণ, সামান্য থেকে সামান্য কাজের বিরুদ্ধেও ইহুদীরা কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে থাকে। এমন ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে। ফিলিস্তিনে যদি ছোট কোনো হামলাও মুজাহিদরা করে আর তাতে যদি একজন ইহুদীও আহত বা নিহত হয়, এর জবাবে ইহুদীরা ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে, অনেক সময় শত শত মুসলিম এতে প্রাণ হারায়, স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের অভিযানের জবাবে কখনো কখনো ফিলিস্তিনী চাকরিজীবী ও শ্রমিকদের ওপরেও শাস্তি নেমে আসে। এ ধরনের নানা সমস্যার সৃষ্টি করা হয়।

মোটকথা, এ ধরনের প্রতিটি কাজের প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। ফিলিস্তিনের এই উদাহরণ যদিও ইসলামপন্থিদের জন্য দেওয়া হলো, একই উদাহরণ জাতীয়তাবাদীদের জন্যও প্রযোজ্য। কারণ, তারা যেটাকে বৈধ প্রতিরোধযুদ্ধ বলে থাকে, সে প্রতিরোধযুদ্ধ আর ৯/১১ একই ধরনের জিনিস; বরং অর্জনের বিচারে তাদের এই প্রতিরোধযুদ্ধ কিছুতেই ৯/১১-এর সমান হতে পারবে না।

সুতরাং এ হিসেবে আফগানিস্তানে মুজাহিদরা কুফরি শক্তি ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করছে, তার ক্ষেত্রেও তো একই কথা প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সব আইনের বিচারেই এটি একটি বৈধ লড়াই, আইনসিদ্ধ প্রতিরোধযুদ্ধ হওয়া উচিত। ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে সব দেশের সরকারই তো সরব ভূমিকা পালন করে, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলে আর এমন দেশের সংখ্যাও অনেক। তাহলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে কাজগুলো করা বৈধ হয়, একে সমর্থন করা যায়, সহায়তা করা যায়, সেই একই কাজ যদি বৈশ্বিক ইহুদীবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাপের মাথা আমেরিকার বিরুদ্ধে করা হয়, তাহলে সেটাও তো বৈধ, আইনসংগত ও সমর্থনযোগ্য হওয়া উচিত।

তৃতীয়ত: আমরা কেন প্রতিটি বিষয়কে বাহ্যিক ফলাফল দিয়ে পরিমাপ করব? বরং পরিমাপ তো হবে ইনসাফের ভিত্তিতে। ইনসাফের ভিত্তিতে পরিমাপের অর্থ হলো মূল কাজের মূল্যায়ন করা এবং এটা দেখা যে, কাজের সব শর্ত যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে কি না। কাজ যদি যথাযথভাবে করা হয়ে থাকে, তাহলে উদ্দেশ্য হাসিল না হলেও কোনো সমস্যা নেই।

শুধু বাহ্যিক ফলাফল দিয়ে কোনোকিছুকে বিচার করা মুমিনদের শান নয়, কারণ তারা তো বিশ্বাস করে, ফলাফল আল্লাহর হাতে। বান্দার কাজ তো কেবল যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এই চেষ্টারই একটি অংশ হলো পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া এবং অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

'আর (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন কোনো বিষয়ে মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯]

যখন মুমিন এ কাজটুকু করবে, তখন ধরা হবে সে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করার পর এখন কাজটি যদি সঠিক হয়, তাহলে দুটি সওয়াব পাবে আর ভুল হলে একটি পাবে। এতকিছুর পরেও যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না আসে বা উলটো কোনো বিপদ তৈরি হয় আর কেউ যদি এ কথা বলে যে, সে ভুল কাজ করেছে অথবা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে তার অপরাধ, তার মানদণ্ডের ত্রুটি। [অন্যের কাজের মূল্যায়ন করার নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে] আল্লাহ তাআলা তো বলছেন—

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾

'যখন (কোনো কথা) বলবে, তখন ইনসাফের সাথে বলবে।' [সূরা আনআম (৬) : ১৫২]

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾

'ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।' [সূরা শুয়ারা (২৬) : ১৮২]

﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

'মানুষকে তাদের পণ্য কম দিয়ো না।' [সূরা আরাফ (৭) : ৮৫]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তো ওহী নাযিল হতো। তারপরেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে [ফলাফলের কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে] বলেছেন—

﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ﴾

'তোমার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা।' [সূরা শূরা (৪২) : ৪৮]

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾

'তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।' [সূরা ফাতির (৩৫) : ২৩]

﴿وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

'আর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিচ্ছি, যদি তার কিছু তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই, (তাতে কিছুই যায় আসে না)। তবে তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া।' [সূরা রাদ (১৩) : ৪০]

ইমাম তবারী রহ. লিখেছেন—'আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, হে মুহাম্মাদ, এই মুশরিকদেরকে তাদের কুফর ও শিরকের কারণে যে-সকল শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, হয়তো আপনার জীবদ্দশাতেই কিছু শাস্তি তাদের দেখাব অথবা তা দেখানোর আগেই আপনাকে আমি মৃত্যু দেব। (সেটা পুরোপুরি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল)। আপনার কাজ হলো, রিসালাতের যে দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আপনার রবের আনুগত্য করা।' [তাফসীরে তবারী : ১৬/৪৯৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন—

﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

'আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনতে পারেন।' [সূরা কাসাস (২৮) : ৫৬]

বান্দার একমাত্র কাজ আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা, ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা তার দায়িত্ব না—এ মর্মে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

فَرَ أَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

'স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হয়, তখন কোনো কোনো নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সঙ্গে ছোট্ট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দুজন লোক; আবার কেউ এমনও ছিলেন, তাঁর সাথে কেউ নেই।' [বুখারী : ৫৭০৫; মুসলিম : ২২০]

তাহলে এই নবীদের সম্পর্কে কোনো মুসলিম কি এ কথা চিন্তাও করতে পারে যে, তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেননি কিংবা কোনো ত্রুটি করেছেন? আল্লাহর কসম, তাঁরা এ অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জিহাদের ময়দানে এসে মুসলিমরা যদি পরাজিত হয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, আহত-নিহত হয় বা বন্দি হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জিহাদ তো এমনই হয়ে থাকে। জিহাদ যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বুনিয়াদের ওপর পরিচালিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরাজয়ের কারণে এমন মনে করা উচিত না যে, তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই এই পরাজয় হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَ أَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ * إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

'আর তোমরা দুর্বল হোয়ো না, ভেঙে পোড়ো না। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমরাই বিজয়ী। যদি তোমাদের কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে, তাহলে মনে রেখো অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি। যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদের গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালেমদের ভালোবাসেন না।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৯-১৪০]

এসবই হলো জিহাদের তাৎপর্য এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। তাহলে আমরা কেন গোটা জিহাদকে পার্থিব বিজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলব?

সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতগুলো নিয়ে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কারণ, এতে বহু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিহিত আছে, যেগুলোর ব্যাপারে অনেক সময় আমরা গাফেল থাকি। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে সহীহ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ**

'কোনো বাহিনী যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর গনীমত লাভ করে নিরাপদে ফিরে আসে, তাহলে তারা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময়ই নগদ পেয়ে গেল। আর যারা খালি হাতে বা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তাদের পুরো বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেল।'
[সহীহ মুসলিম : ১৯০৬]

যখন কোনো মুজাহিদের নিহত বা গ্রেফতার হওয়ার খবর আসে কিংবা এমন কোনো সংবাদ আসে যে, অমুক পরিবারের ওপর বোমা হামলা হয়েছে বা তাঁদের ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তখন সবাই ব্যথিত হয়। কিন্তু কেউ কেউ এ কারণে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের শিক্ষাগুলোই ভুলে যান, কখনো কখনো তারা এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য এমন কাউকে দোষারোপ করেন, যাদের কোনো দোষই নেই। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, একজন মুসলমানের কাছে যখন তার কোনো ভাই বা বোনের বিপদের খবর আসে—সেটা যত ছোট বিপদই হোক—তখন দুঃখে কষ্টে তার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তবে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে যে মহান গুণগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে আর আমাদের তা ধারণ করতে বলা হয়েছে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলো ভুলে যাওয়া উচিত না। আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁরা যে বিপদে পড়েছেন, সেটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হয়েছে। এ ধরনের বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মধ্যে থেকে শহীদদের বাছাই করেন, কখনো বান্দাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেন, কখনো তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তাঁদের নিয়ে স্বয়ং ইসলামও গর্ব করে। বন্দি ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নারী সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। সহীহ মুসলিমে[২৬] ইমরান বিন হুসাইন রাযি.-এর সূত্রে একজন মুসলিম নারীর বন্দি হওয়ার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে।

তাই, যারা জিহাদে বের হবে, তাদের কর্তব্য হলো সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা, সব ধরনের পরিণতির কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করা। যথেষ্ট পরিমাণ ঈমান ও তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি এতটুকু ইলমও অর্জন করা, যা তাকে বিপদাপদে

[২৬] সহীহ মুসলিম, অধায় : মান্নত, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর নাফরমানীর মান্নত পূর্ণ করা যাবে না, হাদীস নং ১৬০৪

অবিচল থাকতে সাহায্য করবে। এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। কান্দাহারে এক আরব বোন ছিলেন। তিনি তার স্বামী থেকে কসম নিয়েছিলেন, তিনি যদি কোনো ইস্তিশহাদী হামলায় শরীক হন, তাহলে তাঁকেও সাথে নিয়ে যাবেন। এতে তিনি তাকে সাহায্যও করতে পারবেন এবং স্বামীর সাথে শাহাদাতও লাভ করতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের তাকদীরও এভাবেই লিখে রেখেছিলেন। তথাকথিত শান্তির ঠিকাদার ও মানবাধিকারের রক্ষক আমেরিকার ফেলা একটি বোমা তাদের ওপর গিয়ে পড়ে এবং এতে তারা দুজনেই শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন।

এটা হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। তারা ফলাফল দিয়ে কাজকে বিচার করে না। আর অন্যদের অবস্থা হচ্ছে, তারা (বাহ্যিক) ফলাফল দেখেই সবকিছু বিচার করে। ফলাফল যদি খারাপ হয়, তাহলে এর জন্য তারা সেই কাজের সমালোচনা তো করেই; যারা কাজটি করেছে, তাদেরও নিন্দা করে বেড়ায়। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন—

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ كَانُواْ غُزّٗى لَّوۡ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجۡعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسۡرَةٗ فِي قُلُوبِهِمۡۗ وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ**

‘হে মুমিনগণ, তোমরা সেই সব লোকের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা কুফরি করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন কোনো দেশে সফর করে কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা যেত না এবং নিহতও হতো না। (তাদের এ কথার) পরিণাম তো (কেবল) এই যে, এরূপ কথাকে আল্লাহ তাদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন। (অন্যথায়) জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহই দেন। আর তোমরা যে কাজই কর, আল্লাহ তা দেখেন [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৬]

**ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ قُلۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ**

‘তারা সেই লোক, যারা নিজেদের (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বসে বসে মন্তব্য করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে খোদ নিজেদের থেকেই মৃত্যুকে হটিয়ে দাও তো দেখি।’ [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৮]

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে। তারপর (জিহাদে) তোমাদের কোনো মুসীবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে ছিলাম না। [সূরা নিসা (৪) : ৭২]

## এ যুদ্ধে সফল কে?

১. উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৯/১১ হামলার প্রাপ্তি হলো আকস্মিক আক্রমণ করার সুযোগ পাওয়া। সমরবিদদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক। তাদের দৃষ্টিতে কখনো কখনো এটাকেই বিজয় ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষেই এটি এমন এক আকস্মিক হামলা ছিল, যা আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, জনগণের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, ভালোভাবে প্রস্তুতি না নিয়েই তড়িঘড়ি করে প্রতিআক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। জাতিগতভাবে বা রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি যেমন ছিল না, তেমনই এ যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে—সেটা নিয়েও তারা চিন্তাভাবনা করেনি। এটি হলো ৯/১১ হামলার উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন।

২. এই হামলাকে 'যুদ্ধ শুরুর আগেই বিজয় লাভ করা'র একটি আদর্শ নমুনা বলা যেতে পারে। কারণ, আমেরিকা সর্বোচ্চ যা করবে, তা হলো আফগানিস্তানে থাকা তালেবান ও আরবদের নির্মূল করে ফেলবে। অথচ ৯/১১-এর কারণে আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত যে পরাজয় ও বিপর্যয় ঘটেছে, তার তুলনায় মুসলিমদের এই ক্ষতি কিছুই না। তা ছাড়া আফগানিস্তানের সকলকে শেষ করে দিলেও মুসলমানদের মনে যে গভীর ও তীব্র আমেরিকাবিদ্বেষ আছে, তা তো কিছুতেই তারা নির্মূল করতে পারবে না। এই মুসলিমদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তাই আমেরিকা যতবেশি সামরিক আগ্রাসন চালাবে, গোয়েন্দা অপারেশন চালাবে কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবে, মুসলিমদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি ততবেশি ঘৃণা সৃষ্টি হবে, আমেরিকাবিদ্বেষী মুসলিমদের সংখ্যাও তত বাড়বে। মুজাহিদগণ মনে করেন, মুসলিমদের অন্তরে আমেরিকার প্রতি ঘৃণা তৈরি করা, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া এবং আমেরিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ একটি কাজ। এ জন্য দরকার হলে কুরবানীও দিতে হবে। কেননা দেরিতে হলেও এর মাধ্যমেই আমেরিকার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী জিহাদের সূচনা হবে।

৩. ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা আমেরিকাকে যুদ্ধের জন্য মুজাহিদদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিতে টেনে আনতে সফল হয়েছে, যে ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি মুজাহিদদের নখদর্পণে, অন্যদিকে আমেরিকানরা ভূমি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। যুদ্ধের উপযুক্ত যে ভূমিগুলো মুজাহিদদের সামনে ছিল, তার মধ্যে আফগানিস্তানের চেয়ে অধিক উপযুক্ত ভূমি আর একটিও ছিল না। এই হামলাটি যুদ্ধের সঠিক সময় নির্ধারণেও সফল হয়েছে। ৯/১১-এর আরেকটি সফলতা হলো, এটি আমেরিকাকে পর্দার আড়াল থেকে টেনে এনে সম্মুখযুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ৯/১১-এর আগে আমেরিকা পর্দার পেছন থেকে একে ওকে পৃষ্ঠপোষকতা করত, কিন্তু নিজে সরাসরি যুদ্ধে নামত না, এখন নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে। তার কদর্য চেহারা মুসলমান, কাফের সবার সামনে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। এ বিষয়টিরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। এটিই মুসলমানদের অন্তরে আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা তৈরি করেছে, তাদের মধ্যে জিহাদের জযবা জাগিয়ে তুলেছে। আমেরিকা যদি সরাসরি সামনে না আসত, তাহলে হয়তো মুসলিমদের মধ্যে এই জযবা তৈরি হতো না। আমেরিকার মতো দাম্ভিক-অহংকারী একটি পরাশক্তি যখন সামান্য কিছু মানুষের পেছনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরেও তাদের ধরতে পারছে না, তাদের কাছেই নাকানিচুবানি খেয়ে পরাজিত হচ্ছে; পুরো যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও নিজের এই পরাজয়কে সে ঠেকাতে তো পারছেই না, বিশ্ব থেকে লুকোতেও পারছে না। [সে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে বলেই বিশ্ব আজ তার এই লাঞ্ছনাকর পরাজয় দেখতে পারছে। যদি সে পর্দার আড়ালেই থেকে যেত, তাহলে এই সুযোগ কিছুতেই হতো না।]

আমরা মনে করি, আমেরিকার ব্যাপারে সূরা তাওবার এই আয়াতগুলো যথাযথভাবে মিলে যায়। এই আয়াতগুলোতে মুমিনদের জন্য অন্তরপ্রশান্তকারী সুসংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের বিজয়ের ওয়াদাও করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

**كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ * كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ * ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ * لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ * فَإِن تَابُوا۟ وَ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ * أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ**

مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةًۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *

'মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোনো চুক্তি কীভাবে বলবৎ থাকতে পারে? তবে মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি করেছ, তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে কৃত চুক্তির ওপর অবিচল থাকবে, তোমরাও তাদের সাথে কৃত চুক্তির ওপর অটল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (কিন্তু অন্য মুশরিকদের সাথে) কেমন করে (চুক্তি বলবৎ থাকবে), যখন (তাদের অবস্থা হলো এমন যে), তারা কখনো তোমাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোনোরূপ আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখতে চায়, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে (দুনিয়ার) তুচ্ছ মূল্য গ্রহণকেই পছন্দ করেছে এবং তার ফলে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। বস্তুত তারা যা কিছু করে, তা অতি নিকৃষ্ট। তারা কোনো মুমিনের ক্ষেত্রেই কোনো আত্মীয়তা বা অঙ্গীকারের ধার ধারে না এবং তারাই সীমালংঘনকারী। সুতরাং যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই হয়ে যাবে। যারা জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য আমি এভাবেই বিশদভাবে বিধানাবলি বর্ণনা করি। তারা যদি চুক্তি করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের এ সকল নেতৃবর্গের সঙ্গে এই আশায় যুদ্ধ করো যে, তারা হয়তো নিরস্ত হবে। বস্তুত এরা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। তোমরা কি সেই সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে (দেশ থেকে) বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছে এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (উসকানি ও উত্যক্ত করার কাজটি) প্রথম করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? (যদি তাই হয়) তবে তো আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করেন। আল্লাহ যার ইচ্ছা, তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে করেছ, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় না? তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তা পরিপূর্ণরূপে জানেন।' [সূরা তাওবা (৯) : ৭-১৬]

কিছু লোক ওপরের সব কথা মেনে নেওয়ার পরও বলবে, 'এটি ব্যর্থ একটি যুদ্ধ। বিশাল অস্ত্রভান্ডার আর দানবীয় শক্তি সমৃদ্ধ আমেরিকা ও তার দোসরদের মোকাবিলায় পাহাড়ে পাহাড়ে পালিয়ে বেড়ানো হাতেগোনা কয়েকজন লোক কী-ইবা করতে পারবে?'

এর উত্তর নিম্নরূপ—

১. মুজাহিদদের সামনে আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অন্যথায় তারা হয়তো ধ্বংস হবে, নয়তো বন্দি হবে। এমতাবস্থায় কোনো মুসলিম কি তাঁদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে পারে?

আর এটাও বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে না যে, মুজাহিদরা লড়াই না করে শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকবে। শত্রু যখন তাদের ওপর হামলা করবে, তখন আত্মরক্ষা করবে। অথচ তাঁরা ভালো করেই জানে, শত্রুপক্ষ তাঁদের ধ্বংস করার জন্য নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি আগ্রহী। আর এটা জানা কথা যে, মানবজাতির মধ্যে জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশি লালায়িত তারাই। তাই আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হলো আক্রমণ করা এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো [মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে] শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পারলেও কমপক্ষে মুজাহিদদের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, 'যদি কোনো মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দি হয়, তাহলে সকল মুসলমানের ওপর তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি তারা তাকে মুক্ত না করে কাফেরদের হাতেই ফেলে রাখে, তবে সবাই গুনাহগার হয়।' [একজন বন্দির ব্যাপারে যদি ফুকাহায়ে কেরাম এত শক্ত কথা বলেন,] তাহলে কাফেররা যে স্বাধীন মুসলমানকে [বন্দি করার জন্য] তাঁর নিজ দেশে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে হুকুম কতটা গুরুতর হবে?

২. কোনো কাজ শুরুর পর সফলতার আলামত প্রকাশ পেতে দেরি হলেই যদি একে 'ব্যর্থ চেষ্টা' বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে এই মূলনীতির প্রবক্তারা সমর্থন করেন—এমন অনেক মেহনত ও আন্দোলনকেও এই মূলনীতির আলোকে 'ব্যর্থ চেষ্টা' বলতে হবে। যেমন—

ক. ফিলিস্তিন সংকট: তাদের এই মূলনীতির আলোকে ফিলিস্তিনের জিহাদও একটি ব্যর্থ জিহাদ। তাই, সেখানে জান-মাল ব্যয় করে জিহাদ করার কোনো মানে হয় না। আফগানিস্তানের জিহাদ যদি ব্যর্থ জিহাদ হয়, তাহলে ফিলিস্তিনের জিহাদ তো আরও আগেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, ভৌগোলিক উপাদান, সংখ্যা ও প্রস্তুতির বিচারে ফিলিস্তিনের মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের মুজাহিদদের চেয়েও অনেক বেশি দুর্বল। [কিন্তু, তারপরেও এই মূলনীতির প্রবক্তারা ফিলিস্তিনের জিহাদকে সমর্থন করেন আর আফগান জিহাদকে ভুল বলেন।]

খ. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ সব বিষয়ে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু এর উত্তর আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন—

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا۟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তাদেরই একটি দল (অন্য দলকে) বলেছিল, তোমরা এমন সব লোককে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন? তারা বলল, (আমরা এটা করছি) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য এবং (এ উপদেশ দ্বারা) হতে পারে, তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে।' [সূরা আরাফ (৭) : ১৬৪]

তাহলে সাধারণ মুসলিমদের কোনো কথা বা কাজের দ্বারা যদি মুজাহিদদের উপকৃত হওয়ার নূন্যতম সম্ভাবনাও থাকে অথবা কোনো সম্ভাবনা নাই-বা থাকল, কমপক্ষে আল্লাহর কাছে যদি তারা নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করতে পারে, তাহলে সেই কাজ কি তারা করবে না? এমনইভাবে মুজাহিদদের কোনো কথা বা কাজের দ্বারা যদি সাধারণ মুসলিমদের উপকৃত হওয়ার নূন্যতম সম্ভাবনাও থাকে অথবা কোনো সম্ভাবনা নাই-বা থাকল, কমপক্ষে আল্লাহর কাছে যদি তারা নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করতে পারে, তাহলে সেই কাজ কি তারা করবে না?

গ. কিছু দাওয়াতী বিষয়েও একই প্রশ্ন আসবে। কারণ, অনেক সময় দাওয়াতের শুরুর দিকে কোনো ফলাফল দেখা যায় না। ফলাফল দেখা যাচ্ছে না বলেই কি দাঈ দাওয়াত ছেড়ে দেবে?

৩. শুধু আলেম না, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য যদি সামান্য কিছুও করার সুযোগ থাকে, তাহলে তা না করে তাকে মৃত্যুর জন্য ফেলে রাখা অন্যায়। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয়, অথচ তাদের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত ১০% এর বেশি থাকে না। কিন্তু তাই বলে কি কেউ তাদের চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ করার ব্যাপারে আপত্তি করে? এবার মুজাহিদদেরকে আমরা ক্যান্সারের রোগীর সাথে তুলনা করে দেখি। একজন ক্যান্সারের রোগীকে আমরা যতটুকু সহযোগিতা করি, মুজাহিদরা কি ততটুকু সহযোগিতা পাওয়ারও যোগ্য না? তাদের এই মেহনতকে 'ব্যর্থ চেষ্টা' বলে এড়িয়ে না গিয়ে আমরা কি তাদের সামান্য সহযোগিতাও করতে পারি না?

৪. ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, একজন মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করার জন্য যদি বিপুল পরিমাণ অর্থও ব্যয় করতে হয়, তবু তাকে মুক্ত করা ওয়াজিব। তাহলে যাদের অবস্থা এর চেয়েও গুরুতর, তাদের জন্য আমাদের কী করা উচিত? [বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা যদি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে বন্দি হওয়া থেকে কোনো মুসলিমকে বাঁচানো কত গুরুত্বপূর্ণ হবে?]

৫. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুজাহিদদের এই যুদ্ধ কোনো 'ব্যর্থ যুদ্ধ' না। কারণ, মুজাহিদগণ তাঁদের সাধ্যের ভেতরে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে যেটুকু চেষ্টা করা আবশ্যক, সেটুকু চেষ্টাও তারা করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এ ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো ত্রুটি করেননি। আর এতটুকুই তাদের সামর্থ্য। যেহেতু তারা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী পুরো চেষ্টা করেছেন, তাই তাদের এই যুদ্ধ কোনো 'ব্যর্থ যুদ্ধ' না। অন্যথায়, বদর যুদ্ধে কুরাইশের প্রস্তুতির সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের শক্তি ও প্রস্তুতির কি কোনো তুলনা হতে পারে?

আর মুতার যুদ্ধ সম্পর্কেই বা কী বলার সুযোগ আছে? সর্বাধুনিক অস্ত্র, রসদ ও সরঞ্জামে সজ্জিত দুই লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলায় মুসলিমদের মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ? এরপরেও মুসলিমরা একে 'ব্যর্থ যুদ্ধ' বলে পিছু হটেনি। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদেরকে এমন অসম একটি যুদ্ধে জড়ানোর কারণে তিরস্কার করেননি। শুধু তাই না, যুদ্ধ শুরুর আগে মুসলিমরা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে চাইলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. তাদেরকে যুদ্ধ শুরু করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি.-এর এই সিদ্ধান্তকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল বলেছেন অথবা এ কারণে তাঁর ব্যাপারে প্রচ্ছন্নভাবেও তিরস্কারমূলক কোনো কথা বলেছেন—এমন কোনো বর্ণনা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না। যদি তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল হতো, তাহলে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতেন। কারণ, তিনি তো উম্মতকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যই সব সময় ব্যাকুল থাকতেন এবং মুমিনদের জন্য ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ালু। তাঁর জন্য আমাদের মা-বাবা কুরবান হোক।

একবার ফাযারা গোত্রের কিছু লোক চারণভূমিতে থাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উটের ওপর হামলা করেছিল, সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি. একাই তাদের ধাওয়া করেছিলেন। ইতিহাসে এটি যু-কারাদ যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম মুসলিম রহ. সবিস্তারে এবং বুখারী রহ. সংক্ষিপ্তভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি.-এর এই কাজের ব্যাপারে কী বলা হবে? তিনি যেহেতু একা ছিলেন আর শত্রু ছিল অনেক, সে হিসেবে একেও কি 'ব্যর্থ চেষ্টা' বলা হবে?

আসেম বিন সাবেত রাযি.-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের ১০ জনের যে দলটি রাজী' নামক কূপের কাছে কাফেরদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে তাঁরা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং শাহাদাতবরণ করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে তাহলে কী বলা হবে? তাঁরাও কি 'ব্যর্থ যুদ্ধে' জড়িয়েছিলেন? ঘটনার গুরুত্ব এবং উপকারিতার কথা বিবেচনা করে সহীহ বুখারীর হাদীসটি নিচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

'আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০ জন ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠান এবং আসেম বিন সাবেত আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি আসেম বিন উমর বিন খাত্তাবের মামা ছিলেন। তাঁরা যখন উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌঁছান, তখন হুযায়েল গোত্রের শাখাগোত্র লিহয়ানের লোকজন তাঁদের ব্যাপারে জানতে পারে। তারা প্রায় দু'শত তিরন্দাজ ব্যক্তিকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পাঠায়। এরা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহাবীগণ যেখানে বসে মদীনা থেকে নিয়ে আসা খেজুর খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে জায়গার সন্ধান পেয়ে যায়। সেখানে পড়ে থাকা খেজুরের বিচি দেখে এরা বলে ওঠে, এ তো ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর এরা পুনরায় তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। যখন আসেম ও তার সাথিগণ তাদের দেখতে পান, তখন তাঁরা একটি উচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাফেররা তাঁদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বলতে থাকে, তোমরা যদি নিচে নেমে এসে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করে নাও, তাহলে আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসেম বিন সাবেত রাযি. বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কাফেরদের নিরাপত্তা নিয়ে নিচে নামব না। হে আল্লাহ, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবী ﷺ–কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফেররা তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং আসেম রাযি.-সহ সাতজনকে শহীদ করে ফেলে। এরপর অবশিষ্ট তিনজন খুবাইব আনসারী, যায়েদ ইবনে দাসিনা রাযি. ও অপর একজন [আব্দুল্লাহ বিন তারেক] তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে নিচে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করেন। কাফেররা যখন তাদেরকে পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়, তখন ধনুকের রশি খুলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেধে ফেলে। এ অবস্থা দেখে সেই তৃতীয়জন [আব্দুল্লাহ বিন তারেক] বলে ওঠেন, 'শুরুতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না, আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যারা শাহাদাতবরণ করেছেন।' কাফেররা তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং খুবাইব ও ইবনে দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাদের উভয়কে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা।' [সহীহ বুখারী : ৩০৪৫]

এই ঘটনায় ১০ জন সাহাবী আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা আত্মসমর্পণ করেননি। এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. এই হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে—**هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر** অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা ও না করার আলোচনা।

এ ঘটনা থেকে (অধিক সংখ্যক শত্রুর সাথে) যুদ্ধ করা এবং আত্মসমর্পণ করা উভয়টির বৈধতাই বুঝে আসে। কারণ, এই ঘটনায় সাহাবীরা দুটোই করেছেন। তবে তাঁদের আমীর আসেম এবং তাঁর সাথে থাকা অধিকাংশ সদস্যই আত্মসমর্পণ করেননি। আর যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁদের বন্দি করার পর হত্যা করা হয়েছিল। তাঁরা নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিলেন। মহান এই সাহাবীদের অনুসরণ করে আমরাও কোনো অবস্থাতেই শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা হলো আযীমত [মৌলিক বিধান] আর আত্মসমর্পণ করাটা রুখসত [ছাড়]। ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীর ৭ম খণ্ডের ৪৮১ নম্বর পৃষ্ঠায়[২৭] গযওয়াতুর রাজী' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, সুফিয়ান সাওরী রহ. আত্মসমর্পণ করাকে মাকরুহ মনে করতেন। আমার (লেখক) মত হলো, মূলনীতি অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও অনুসরণীয় মানুষদের জন্য আত্মসমর্পণ করা হারাম হওয়ার কথা।

কেননা একজন মুজাহিদের আত্মসমর্পণের মধ্যে পরাজয়ের পাশাপাশি অপমানও রয়েছে। এর ফলে মুসলিমদের মনোবল ভেঙে যায়, মুজাহিদদের দৃঢ়তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, শত্রু আনন্দিত হয়, তারা মুজাহিদ ও মুসলিমদের নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ পেয়ে যায় এবং তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আত্মসমর্পণের মধ্যে এই নেতিবাচক দিকগুলো তো আছেই, আরও বড় বিষয় হলো, যে মৃত্যুর ভয়ে আত্মসমর্পণ করা হয়, আত্মসমর্পণ করে সেই মৃত্যু থেকেই বাঁচা যায় না। বরং আত্মসমর্পণ না করলে যে ধরনের মৃত্যুর ভয় থাকে, আত্মসমর্পণ করার কারণে তার চেয়েও ভয়ংকর ও অপমানজনক মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। আর মৃত্যুর আগে যদি নির্যাতন করা হয়, শাস্তি দিয়ে এমন তথ্য বের করা হয়, যাতে অন্যের ক্ষতি হবে, তাহলে আত্মসমর্পণ যে কতটা ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য।

এবার আমরা এই ঘটনার সাথে আমাদের দাবির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি দেখি। এই ১০ জন সাহাবী কিন্তু তাঁদের প্রতিরোধকে 'ব্যর্থ চেষ্টা' মনে করে হাল ছেড়ে দেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁদের এই অবস্থার কথা জানতে পারতেন আর তাঁদের সাহায্য করার সামান্য সুযোগও থাকত, তাহলে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। এমনকি তিনি যদি বুঝতে পারতেন, কোনোভাবেই তাদের বাঁচানো সম্ভব না, তবু সাহায্য না করে বসে থাকতেন না। হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে খুঁজলে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কোথাও এমনটা পাওয়া যাবে না যে, চেষ্টা করে লাভ হবে না ভেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

[২৭] রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশনীর নুসখা।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো বিপদে পড়া জিহাদী দল বা কোনো নির্যাতিত নিরাপরাধ ব্যক্তিকে সাহায্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।

৬. অবশেষে জিজ্ঞেস করতে হয়, ভবিষ্যতে কী ঘটবে এটা আমাদের কে জানাল? এই গায়েবি বিষয়টি আমরা কীভাবে জানতে পারলাম যে, এই যুদ্ধটি ব্যর্থ হবে, তাই এ যুদ্ধে জান-মাল-সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ?

৭. যারা এ যুদ্ধকে ব্যর্থ যুদ্ধ মনে করেন, তাদের উচিত, অন্যদের নিরুৎসাহিত না করা। কেউ একে ব্যর্থ যুদ্ধ মনে করলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন। যারা তার সাথে একমত না, তাদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দেবেন। তাঁরা নিজেদের চেষ্টা-মেহনতের মাধ্যম আল্লাহর কাছে নিজের দায়মুক্তি পেশ করতে চাইলে করুক। এতে তো কোনো অসুবিধা নেই। কাউকে তো তাদের পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

ইনশাআল্লাহ, এ যুদ্ধ ব্যর্থ কোনো যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধে হয়তো বিজয় আসবে অথবা শাহাদাতের দেখা মিলবে। আর এ দুটোর কোনোটিকেই কোনো মুসলিম ব্যর্থতা মনে করতে পারে না। এই দুটিকেই আল্লাহ তাআলা হুসনায়াইন (কল্যাণ) বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿قُلۡ هَلۡ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحۡدَى ٱلۡحُسۡنَيَيۡنِ﴾

‘বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য কি দুটি মঙ্গলের যে-কোনো একটির অপেক্ষা করছ?’
[সূরা তাওবা (৯) : ৫২]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা প্রথম কল্যাণ অর্থাৎ শাহাদাতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন—

﴿ وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۞ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

‘আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কোরো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযিক দেওয়া হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনো যারা (শাহাদতের মাধ্যমে) তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, (তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন) তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।’ [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৯-১৭১]

শাহাদাত লাভ করা এবং সব জায়গায় শাহাদাতের অন্বেষণ করা একজন মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়ার মতো উপযুক্ত একটি বিষয়। উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ছাড়াও শুধু কিতাব ও সুন্নাহতেই এর পক্ষে ৩০টিরও বেশি দলীল পাওয়া যায়। এখানে সেগুলো উল্লেখ করার অবকাশ নেই। অন্য কোথাও এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। দ্বিতীয় কল্যাণ (বিজয়)-এর বিষয়টি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এভাবে আলোচনা করেছেন—

﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

'এবং তোমাদের দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস, (আর তা হলো) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (হে রাসূল,) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।' [সূরা সফ (৬১) : ১৩]

সেই সত্তার কসম, যিনি ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব কুরআন) নাযিল করেছেন এবং 'ইয়াওমুল ফুরকানে' (পার্থক্যকারী দিন তথা বদরের দিন) ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, আমরা আশা করি আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে থেকে আমরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব, যাদের কথা সূরা হজের এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لايُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ* أُذِنَ لِلَّذِين يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রাখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো খানকাহ, গির্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ, যে জায়গাগুলোতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি পরিমাণে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।'

[সূরা হজ (২২) : ৩৮-৪০]

**গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কি প্রশিক্ষিত নিয়মিত কোনো বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব?**

**এখানে সেখানে ছোটখাটো বোমা হামলা করে কি শক্তিশালী পশ্চিমাদের পরাজিত করা যাবে?**

এই প্রশ্নদুটির উত্তরে কয়েকটি বই থেকে সাহায্য নিচ্ছি। বইগুলো হলো—শায়খ ইউসুফ উয়াইরীর ধারাবাহিক আলোচনা সংকলন **الحرب الصليبية على العراق** (ইরাকের বিরুদ্ধে ক্রুসেড), হানী আহমাদ দারদীরীর বই **المدخل للثقافة العسكرية** (সামরিক সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি) এবং হাযিম মাদানীর বই **هكذا نرى الجهاد وهكذا نريده** (জিহাদ : আমাদের দর্শন ও চাওয়া)।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, হালকা অস্ত্র নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করে বিশাল কোনো বাহিনীকে কি পরাজিত করা সম্ভব? আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই উত্তর দেব—হ্যাঁ, সম্ভব। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত মুমিনদের একটি দল প্রশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনীকেও পরাস্ত করতে সক্ষম।

প্রথমত: আমাদের অবশ্যই ইয়াকীন রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন, সাথে সাথে যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি সাধ্যের বাইরে কোনো কিছুই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও অশ্বছাউনি প্রস্তুত করো।' [সূরা আনফাল (৮) : ৬০]

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ ওয়াদাও দিয়েছেন, আমরা যদি সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তাহলে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। তাঁর এই সাহায্য সাজ-সরঞ্জামের কারণে আসবে না; বরং আমরা চেষ্টা করেছি কি না—তার ভিত্তিতে আসবে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তলাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলোর ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, অধিকাংশ যুদ্ধেই মুসলিমরা সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকে দুর্বল ছিল। এরপরও আল্লাহ তায়ালা শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের বিজয় দান করেছেন। সুতরাং প্রস্তুতি, সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যা বিজয়ের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই না। আর আল্লাহ তাআলা বিজয় তখনই দেন, যখন বান্দা বিজয়ের শর্ত পূরণ করে।

উম্মতে মুসলিমা অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে বেশি দুর্বল। কারণ, তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে আর তাদের ওপর শত্রু আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। এই আধিপত্যবাদী শত্রু মুসলিমদের অস্ত্র সংগ্রহের অনুমতিও দেয় না, সামরিক শক্তি সঞ্চয় করারও অনুমতি দেয় না। তাই শত্রুর বিরুদ্ধে বর্তমানে মুসলিমদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র হলো—উম্মাহর সন্তানদের হৃদয়ে বিদ্যমান ঈমান এবং গেরিলা যুদ্ধ। কারণ, গেরিলা যুদ্ধের জন্য দৈত্যাকার বোমারু বিমান, নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা স্মার্ট বোম্ব—কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই; বরং প্রয়োজন এমন কিছু গেরিলা যোদ্ধার, যাদের অন্তরে মজবুত ঈমান ও বিশুদ্ধ আকীদা থাকবে, যারা বন্দুক থেকে শুরু করে বোমা ও বিস্ফোরকের মতো সব ধরনের হালকা-ভারী অস্ত্রের ব্যবহার করে শত্রুকে দুর্বল করার পদ্ধতি জানবে।

দ্বিতীয়ত: ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছোট ও বিক্ষিপ্ত হামলার মাধ্যমে ক্রমাগত শত্রুকে আঘাত করতে থাকার নামই হলো গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধ হলো দুর্বলদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। যাদের না আছে বিশাল কোনো সেনাবাহিনী আর না আছে কোনো বিমান বা নৌবাহিনী, তাদের জন্যই হলো গেরিলা যুদ্ধ।

গেরিলা যুদ্ধের কার্যকারিতা বোঝার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সফল কিছু গেরিলা যুদ্ধের উদাহরণ দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—জাপানিজদের বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলা যুদ্ধ, জার্মানদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর পার্টিজান গেরিলা যুদ্ধ, ফরাসিদের বিরুদ্ধে (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে) আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি ও মার্কিনিদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ (ভিয়েত মিনের নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইন্দোচীন যুদ্ধ ও ভিয়েত কংয়ের নেতৃত্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম যুদ্ধ) এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর স্বাধীনতাযুদ্ধ। নিকট অতীতেও এর অনেক উদাহরণ আছে। যেমন: বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শক্তিধর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গুটিকয়েক মুজাহিদ হালকা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছেন। এ ছাড়াও এই গেরিলা যুদ্ধের কারণেই প্রথম চেচেন যুদ্ধে রুশ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল।

গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য এরচেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো বড় বড় দেশ এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীতে গেরিলা যোদ্ধাদের আদলে স্পেশাল ফোর্স গড়ে তুলেছে। অথচ এই দেশগুলোর পর্যাপ্ত পরিমাণ নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনী আছে।

ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তান ও ইরাকে যেহেতু গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে, তাই সেখানে তারা নিজেদের যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে সুবিধা করতে পারছে না, অথচ এ

ক্ষেত্রে তারাই সর্বেসর্বা। গেরিলা যুদ্ধের একটি সুবিধা হলো, এ যুদ্ধে শত্রুবাহিনী এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে অক্ষম হয়ে যায়। আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার বা শহরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধে স্ট্র্যাটিজিক বোম্বার, টমাহক মিসাইল, এমনকি প্রচলিত বিভিন্ন ওজনের বোমা ব্যবহারের কথা আমরা কখনো শুনিনি। এমনকি ফিল্ড আর্টিলারিও খুব কম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ, আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারে যেহেতু ক্রুসেডার সৈন্যরা শহরে অবস্থান করে, তাই তারা এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে না, যার কারণে তাদের সৈন্যদেরই ক্ষতি হবে। ফলে তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই বোমা আর মিসাইল কোনো কাজেই আসে না।

শত্রুরা এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো, তারা গেরিলা যোদ্ধাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে না। যেমনটা এখন ইরাক এবং আফগানিস্তানের অবস্থা। মুজাহিদদের অবস্থান শনাক্ত করতে না পারায় তোরাবোরা যুদ্ধের পর আফগানিস্তানে স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার, স্যাটেলাইট-গাইডেড মিসাইল বা ভারী বোমাবর্ষণের কথা তেমন শোনা যায়নি। কারণ, গেরিলা যোদ্ধারা নির্দিষ্ট কোনো শৃঙ্খলার ধার ধারে না। তারা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে পছন্দমতো পদ্ধতিতে আঘাত করে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে শত্রু তাদের মুখোমুখি তো হতেই পারে না, উলটো তাদের খুঁজতে খুঁজতেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এগুলো হলো গেরিলা যুদ্ধের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য।

ভিয়েতনামিরা দীর্ঘ ১২ বছর যুদ্ধের পর আমেরিকাকে পরাজিত করেছে[২৮]। এই পুরো সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৭ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। শেষমেশ উপায়ান্তর না পেয়ে আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের পরাজয় মেনে নিয়েছে। ভিয়েতনামি নেতারা এ নিয়ে গর্ব করত। তারা রসিকতা করে বলত, তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আমেরিকা তাদের

[২৮] ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে ভিয়েতনামের গেরিলাদের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মতো শক্তিধর দুটি রাষ্ট্রের বিপুল সমর্থন ছিল। তা ছাড়া উত্তর ভিয়েতনামও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করত। সবার সহযোগিতা নিয়েই ভিয়েতনাম অবশেষে আমেরিকাকে পরাজিত করতে পেরেছিল। কিন্তু তালেবানের বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। ৯/১১-এর পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দিয়েছিল, প্রত্যেক রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই যুদ্ধে তারা হয়তো আমাদের পক্ষে থাকবে, নয়তো সন্ত্রাসীদের পক্ষে থাকবে। তার সে ঘোষণার কারণে যুদ্ধের শুরু থেকেই তালেবান ছিল একা। তালেবানকে সমর্থন করে আমেরিকাকে শত্রু বানানোর সাহস কোনো দেশেরই হয়নি। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে তালেবানের একমাত্র সহযোগী ছিল অল্পকিছু আরব ও পাকিস্তানি মুজাহিদ। তাই, তালেবানের যুদ্ধ শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধেই ছিল না, পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে ছিল। রুশবিরোধী জিহাদে তো মৌখিকভাবে হলেও কিছু সহযোগী ছিল, যারা আফগান মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধের জন্য মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করত, কিন্তু আমেরিকাবিরোধী জিহাদে তালেবান আক্ষরিক অর্থেই নিঃসঙ্গ ছিল। বিশ্বের সব মুসলিম দেশই ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোটের পক্ষ বেছে নিয়েছিল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তাই, আফগানিস্তানের জিহাদ ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে কয়েকগুণ কঠিন ও সুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তারপরেও আল্লাহ তাআলার গায়েবী নুসরতে তালেবান বিজয়ী হয়েছে, আমেরিকা পরাজিত হয়েছে।

একটি ট্যাংকও ধ্বংস করতে পারেনি। এ কথা বলে তারা বোঝাত, ভিয়েতনামিদের কাছে ভারী অস্ত্র আসার আগেই অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের প্রথম ধাপেই মার্কিনিরা পরাজয় মেনে নিয়েছিল। বাস্তবেই ভিয়েতনামিদের একটি ট্যাংকও ধ্বংস হয়নি। কারণ, তখন তাদের কাছে ট্যাংক তো দূরের কথা কোনো ভারী অস্ত্রই ছিল না। তা ছাড়া তখনও তারা (ট্যাংকের মতো) ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করার পর্যায়েও পৌঁছায়নি। ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধের প্রথম ধাপেই আমেরিকার এত ক্ষতি হয়েছে, তারা যদি পরাজয় স্বীকার না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেত, তাহলে যুদ্ধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে তাদের কী দশা হতো?

আফগানরাও এই একই পদ্ধতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করেছে। ১০ বছর ধরে তারা গেরিলা যুদ্ধ করেছে। এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে। তৎকালীন সুপার পাওয়ার গেরিলা যুদ্ধের প্রথম ধাপেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। জালালাবাদ, খোস্ত ও কান্দাহারের মতো কিছু প্রদেশে গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হলেও সার্বিকভাবে আফগানিস্তানজুড়ে তখনও প্রথম ধাপই চলছিল। যুদ্ধ দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশের আগেই রেড আর্মি আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় এবং নিজেদের পরাজয়ের ঘোষণা দিয়ে দেয়। রুশ বাহিনী প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানের গেরিলা যুদ্ধ নতুন মোড় নেয় এবং পরিপূর্ণরূপে গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়। নজিবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে মোটামুটি আড়াই বছর গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ চলে। এরপর মাত্র দুই মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে।

ইরাক যুদ্ধেও এখন একই অবস্থা চলছে। ইরাকি গেরিলাদের কাছে মার খেয়ে আমেরিকানরা এখন চিৎকার করে পুরো বিশ্বকে তাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে বলছে, পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে সৈন্য ভাড়া করে ইরাকে আমদানি করছে। এটি মহান আল্লাহ তাআলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া আর কিছুই নয়। গেরিলা যোদ্ধাদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে তাদের ক্ষমতা ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদদের ছোট ছোট হামলাগুলোই তাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করছে। অথচ যুদ্ধের ইতিহাস ও সামরিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকেই তাঁদের এই হামলাগুলোকে তুচ্ছ মনে করে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় সন্নিকটে, স্বস্তির দিন আসন্ন। সেদিন মুমিনরা আনন্দ উদযাপন করবে।

শায়খ ইউসুফ উয়াইরী রহ.-এর পক্ষ থেকে এ সব প্রশ্নের এতগুলো জবাবের পরও কেউ কেউ বলতে পারেন, 'সব ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে এত চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, ৯/১১ হামলার কারণে কত চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে?'

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বই '**تبرئة أمة القلم والسيف من منقصة تهمة الخوروالضعف**'-এ তিনি লিখেছেন—

'আমার উত্তর হলো, হ্যাঁ, এটা অনেক চড়া মূল্য। গুরুত্বপূর্ণ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমন চড়া মূল্যই পরিশোধ করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ﴾

'তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট, তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।' [সূরা বাকারা (২) : ২১৪]

মোহর নিয়ে চিন্তা করলে কি আর সুন্দরী নারীকে বিয়ে করা সম্ভব? তা ছাড়া এটাই হলো একমাত্র পথ। এ জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ইসলামের ঐতিহাসিক বিজয় ও উত্থানের ফলে মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা আন্দালুস থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের মানুষকে তাওহীদ ও উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছিল। একবার চিন্তা করে দেখুন, ঐতিহাসিক এই পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য কেমন মূল্য দিতে হয়েছে? এই পরিবর্তনের জন্য হাজার হাজার সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবে তাবিয়ীর শাহাদাত আর রক্তের নজরানা দিতে হয়েছে। তাঁরা আমার-আপনার মতো সাধারণ কোনো মানুষ ছিলেন না, মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছিলেন তাঁরা। [যদি এ ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকত, তাহলে তারা অবশ্যই এত চড়া মূল্য না দিয়ে সে পথই গ্রহণ করতেন।]'

এ ব্যাপারে শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফি. বলেন—

'ধরুন, আমাদের আফগানিস্তানের ভাইয়েরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেলেন আর কিছু মানুষ লাঞ্ছনা ও অপমান নিয়ে অন্যের গোলামি করে বেঁচে থাকল। তাহলে শুধু বেঁচে থাকার কারণেই কি তাদের সুখী বলা যাবে? [অবশ্যই না। তাই লাঞ্ছনা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে,] আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি বিজয়ের ওয়াদা থাকে, আল্লাহর কসম, সে বিজয় অর্জনের জন্য এ ধরনের নয়, এরচেয়েও বেশি ত্যাগ ও কুরবানী দিতে হলেও দেওয়া উচিত।

এই উম্মতের ওপর আল্লাহর রহমত যে, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিরা এখনো বেঁচে আছেন। যিনি সালাফের ইতিহাসকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং পূর্ববর্তীদের ঈমান ও জিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এ দৃশ্য অনাগত প্রজন্মের জন্য স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকবে; যারা ঈমানের কদর বুঝবে, প্রকৃত বীরের দৃঢ়তাকে চিনবে, তারা এই স্বপ্নের দিকে ছুটে আসবে।

আল্লাহর কসম, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি অনুগ্রহ। আর পরীক্ষা ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। এটাই ক্ষমতা অর্জনের পথ আর পরীক্ষা ছাড়া কখনো ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। মুসলিমরা কি এই কথাগুলো ভুলে গিয়েছে, যেগুলো তারা প্রতিনিয়ত খতীবদের খুতবায়, শিক্ষকদের বক্তৃতায় শুনে থাকে? কিতাবের পাতায় পড়ে থাকে?

আমি দুর্বলচিত্তের লোকদের একটি প্রশ্ন করতে চাই, জিহাদের ব্যাপারে আপনাদের ধারণা কী? কীভাবে আপনারা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চান? জিহাদ ও বিপদাপদের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি কীভাবে সম্মানিত ও প্রভাবশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে?'[২৯]

আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমরের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বিষয়টিকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন—

'যারা মনে করে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসলামী শাসন কায়েম হবে, তারা অজ্ঞ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই।'

এ ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা না যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এবং রহমানের অনুসারী ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যকার এই সংঘাত নতুন নয়, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এই সংঘাত চলে আসছে। আর এই সংঘাত আবর্তিত হয় মানুষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করতে পারাই হলো চূড়ান্ত স্বাধীনতা।

[২৯] শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনীর লেখা প্রবন্ধ 'আর-রু'য়াতুশ শরইয়্যাহ লি আহদাসি আমরিকা' থেকে সংগৃহীত।

ঔপনিবেশিকতার দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুসলিম জাতি আজ পর্যন্ত অসংখ্য যুদ্ধ করেছে। এ সব যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছে, লাখ লাখ শিশু এতীম হয়েছে, অসংখ্য নারী বিধবা হয়েছে। আহত আর পঙ্গুদের তো কোনো হিসেব-ই নেই। এত যুদ্ধ-সংগ্রাম, রক্ত আর লাশের বিনিময়ে তারা কী অর্জন করেছে? একটি সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধান রচিত হয়েছে মানুষের দুর্বল মস্তিষ্কের চাহিদা অনুযায়ী। একটি সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এত এত কুরবানীও যদি আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়, তাহলে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার গোলামি থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যদি মুজাহিদরা সমপরিমাণ কুরবানী দিতে চান, সেটাকে কেন 'চড়া মূল্য' মনে হবে? অথচ এই আমেরিকাই মানুষকে মানুষের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, মানুষের দাসত্ব ছুড়ে ফেলে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকৃত ও চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের পথে এই আমেরিকাই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

## তাওহীদে আমালীর শিক্ষা

নিঃসন্দেহে ৯/১১-এর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তালেবান। তা সত্ত্বেও তালেবান কখনো এই হামলার নিন্দা করে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। এ ব্যাপারে তাঁরা কখনো কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করেনি। এমনকি এ কারণে শায়খ উসামা বিন লাদেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা বিচারের আওতায় আনা তো দূরের কথা, শায়খের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা ক্ষোভও তাঁরা প্রকাশ করেনি। আফগানিস্তানের এই পরিণতির জন্য শায়খকে কখনো দোষারোপও করেনি। অথচ শায়খ উসামার কারণেই তালেবানকে এত বেদনাদায়ক পরিণতি মেনে নিতে হয়েছিল।

বরং অবাক করা বিষয় হলো, ৯/১১-এর পর শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হন এবং এই আফগানরাই নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে হলেও শায়খকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এবং তাঁর মহান সঙ্গীরা তখন যে সাহসী অবস্থান নিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার নজির নেই বললেই চলে। তাঁদের সেই প্রবাদতুল্য অবস্থান কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ, ঈমান ও দীনী গাইরতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়, ঝঞ্ঝাবায়ুর সামনেও কীভাবে আদর্শের ওপর অটল অবিচল থাকতে হয়, তাঁরা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে তা মানবজাতিকে দেখিয়ে গেছেন। তাঁদের এই আদর্শিক দৃঢ়তা নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

## ৯/১১-এর পর আমীরুল মুমিনীনের প্রথম ভাষণ[৩০]

৯/১১ হামলার কিছুদিন পর প্রথমবারের মতো আমীরুল মুমিনীন রহ. জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি আফগান জাতিকে তাওয়াক্কুল, সবর ও ইস্তিকামাতের সাথে আগ্রাসি শক্তির মোকাবিলা করতে বলেন। তিনি ভাষণে বলেছিলেন—

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾**

উম্মতে মুসলিমা ও আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনগণের প্রতি,

তৃতীয় একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আপনারা জানেন, এর আগে ব্রিটিশরাও আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছিল, কোন যুক্তিতে তারা আক্রমণ করেছিল? তখন কি উসামা ছিল? একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তখন কি উসামা ছিল? এখন আরেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের ওপর আক্রমণ করছে। আপনারা জানেন, তাদের এই আক্রমণ উসামার কারণে না, তাদের আক্রমণ ইসলামের কারণে। কারণ, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

জেনে রাখুন, এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হলো আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল, সবর ও ইস্তিকামাত। এটিই একমাত্র পথ। তাই আমেরিকা যদি ক্রুজ মিসাইল অথবা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে আমাদের শহরগুলোর ওপর হামলা চালায়, তখন দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করতে হবে।

এটা যেহেতু আল্লাহরই ফয়সালা, তাই এটা ঘটবেই। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তাই মুসলিমদের দৃষ্টি কেবল ইসলামের দিকেই থাকা উচিত, দীনী গায়রতই মুসলমানদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের ভয় পেলে চলবে না, সাহস হারানো যাবে না। মুসলিমদের জীবনে এ ধরনের সমস্যা আসবেই। দীন ও ইসলামের জন্য জীবন দেওয়া দুনিয়ার সব স্বাদ ও সৌভাগ্য থেকেও শ্রেষ্ঠ। মৃত্যু তো একদিন আসবেই, তাই মৃত্যু যদি হয় ইসলামের জন্য,

[৩০] ৯/১১ হামলার ৫ দিন পর ২০০১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর আমীরুল মুমিনীন রহ.-এর এই ভাষণটি প্রচারিত হয়েছিল। ৯/১১-এর পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। এর কিছুদিন পরেই ৭ই অক্টোবর ২০০১-এ আমেরিকা আফগানিস্তানে 'অপারেশন এন্ডিউরিং ফ্রিডম' নামে আক্রমণ শুরু করে। [সম্পাদক]

তবে সেটাই মহাসাফল্য। তাই, আমাদের অটল থাকতে হবে, সবর করতে হবে এবং আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾.

'এবং তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৯]

তাহলে আমরা কি আল্লাহ তাআলার কথা বিশ্বাস করব, না-কি আমেরিকার কথা বিশ্বাস করব?

বিপদ যেহেতু আসবেই, তাহলে আসুক। বিপদ তো সবার জীবনেই আসে। ব্রিটিশ ও রাশিয়ানরা আমাদের কওমের লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল, কিন্তু আমাদের সেই আত্মত্যাগের বদৌলতে আল্লাহ তাদেরই ধ্বংস করে দিয়েছেন। দীনের জন্য যদি আপনারা কুরবানী না দেন, দীনের অপমানে যদি আপনাদের ঈমানী গায়রত জাগ্রত না হয়, তাহলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। ঈমান ও গায়রত ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সবকিছুই লুট করা হয়েছে। আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? আমাদের হাতেই তো ব্রিটিশ ও রুশ সাম্রাজ্য পরাজিত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান তো সেই আগের আফগানিস্তানই আছে, আফগানদের সেই ঈমানী গায়রতই এখনো আমাদের মধ্যে আছে, সেই দীন, সেই ঈমানই তো আমরা আমাদের সিনায় ধারণ করছি। তাহলে ভয়ের কী আছে?

মরতে তো একদিন হবেই, তাই মৃত্যুটা যেন ঈমান ও ইসলামের জন্য হয়। এতে আফসোসের কিছু নেই; বরং আফসোস তো হওয়া উচিত ঈমান ও ইসলাম হারিয়ে বেইমান অবস্থায় মারা গেলে। সুতরাং কেউ ভয় পাবেন না। প্রত্যেকেই জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। প্রয়োজনের সময় যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সকলেই সে দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি থাকুন। দীন ও ঈমানের জন্য, তাওহীদ ও কালিমার জন্য যে-কোনো কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। সকলেই দৃঢ় সংকল্প করে নিন। তাহলেই আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন আর সকল বালা-মুসীবত দূর করে দেবেন।

যদি আপনারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করেন, দীনের অপমানেও আপনাদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে না ওঠে, তাহলে আপনাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের দিকে তাকান। রুশবিরোধী জিহাদে হাত-পা হারানো এই মুজাহিদদের দেখুন। তাঁদের ঈমানী গায়রত কেমন ছিল একবার ভাবুন। কীভাবে তাঁরা রুশ সাম্রাজ্যকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন চিন্তা করুন। সেই মুজাহিদরা আজও জীবিত আছেন।

সামনে যা-ই ঘটবে, তা আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা ও ইচ্ছাতেই ঘটবে। তাই আপনারা ভয় পাবেন না, বিচলিত হবেন না এবং তালেবান বা উসামাকে এ জন্য দোষারোপ করবেন না। আমি এক আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি আমরা উসামাকে তাদের হাতে তুলেও দিতাম, তবু সমস্যা শেষ হতো না। তখন তারা খবরদারি করা শুরু করত। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হতো। প্রতিটি সিদ্ধান্তেই তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। এভাবে তাদের দাসত্ব মেনে নিলে আমাদের দীন-ঈমানের কী অবস্থা হতো একবার ভেবে দেখুন।

অতীতেও যেমন দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে, এটাও তেমনই একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানমাত্র। এ ছাড়া আর কিছুই না। আগেরগুলোর মতো এরাও বিশ্বব্যাপী নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আর দুর্বল ঈমানের অধিকারী কিছু মানুষ তাদের এই অন্যায়ে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি যাদেরকে এতদিন তাদের শত্রু মনে করা হতো, তারাও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা পুরো বিশ্বই আজ আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে।

এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মুসলিমেরই দীন ও ঈমান আঁকড়ে ধরা উচিত এবং সর্বাবস্থায় অবিচল থাকা উচিত। অন্যথায় দুশ্চিন্তা ও অশান্তি জীবনকে তিক্ত বানিয়ে দেবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা তো মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ মৃত্যু তো অনিবার্য। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অবশ্যক, নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করা, দীন-ঈমান-ইসলাম ও ঈমানের এই ভূখণ্ড আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা। বিশ্ব যদি আমাদের এই আহবানে সাড়া না দেয়, তবে আফগানিস্তানের জনগণকেই তাদের ঈমান, আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতার ওপর অবিচল থেকে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে।

যখন ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছিল, যখন রাশিয়ানরা আক্রমণ করেছিল, তখন আমি বা উসামা বিন লাদেন ছিলাম না। কিন্তু আফগান জনগণ সাহসিকতার সাথে তাদের মোকাবিলা করেছিল, নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য তারা কুরবানী করেছিল। সেই লড়াই এখনো শেষ হয়নি। তার সিলসিলা এখনো জারি আছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমকে অবিচল থাকতে হবে। নিজের জান দিয়ে হলেও এ লড়াই লড়তে হবে। কারণ, এটাই কামিয়াবির রাস্তা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপর, আমাদের বিশ্বাসও থাকবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াদার ওপর। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করে বলেছেন—

﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾.

'এবং তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৯]

ঈমানের দাবিতে আন্তরিক ও সত্যবাদী না হয়ে শুধু মৌখিকভাবে নিজেকে ঈমানদার দাবি করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমানদার হওয়ার জন্য বাস্তব ঈমান থাকতে হয়। বাস্তব ঈমান থাকলেই কেবল বিজয় আপনার পদচুম্বন করবে। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহ কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের আমি ভয় করি না, তাদের তোষামোদও করি না। যদিও আমার ক্ষমতা ও শাসন, দেশ ও জাতি, এমনকি আমার জীবনও হুমকির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ। যদি আমি ঈমান ও ইসলামের পরোয়া না করে কাফেরদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম, তাদের তোষামোদ করতাম, তবে তারা আমার ক্ষমতা ও রাজত্বের নিরাপত্তা দিত, অঢেল ধনসম্পদও দিত, যা দিয়ে আরাম-আয়েশেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম, যেমনটা অন্যান্য দেশের সরকারপ্রধানদের সাথে তারা করে আসছে। কিন্তু সে পথ আমি বেছে নিইনি। আমার দীন ও ঈমানের জন্য, এই পবিত্র ভূমির জন্য আমি বরং নিজেকে কুরবান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতকিছুর পরেও যদি আমি নিজেকে কুরবান করার জন্য রাজি হতে পারি, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ, যার তেমন কিছু হারানোর ভয় নেই, তিনি কেন নিজের দীন ও দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করবেন না? কেন তিনি ভয় পেয়ে জিহাদ ছেড়ে ভিনদেশে গিয়ে আশ্রয় নেবেন?

আমার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এমনকি আমার জীবনটাও হুমকিতে আছে, তারপরও আমি আমার দীনের সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। তাহলে আপনারা কেন নিজের দীন রক্ষার জন্য লড়াই করতে ভয় পাচ্ছেন? সত্যিই যদি আপনারা ভয় পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনাদের ঈমানে দুর্বলতা আছে। আপনারা যদি প্রকৃত মুমিন হন, তাহলে ঈমানই হবে আপনাদের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। সে ঈমান রক্ষার জন্য আপনি যে-কোনো কুরবানী মাথা পেতে নেবেন।

আমি এই কুরবানী মেনে নিতে প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ। আপনারা কেন প্রস্তুত হবেন না—সেটা ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। আপনার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র ঈমান আর আত্মসম্মান থাকে, তাহলে তা প্রমাণ করুন। অন্যথায় আপনাকে গুরুত্ব দিয়ে, আপনার কথা শুনে কোনো লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। আপনার যদি ঈমানই না থাকে, আত্মসম্মানই না থাকে, তাহলে এমন মানুষের কথা শুনে কী লাভ হবে? আপনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, এটা করা যাবে না, এটা করতে হবে। আমিও আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনার মধ্যে ঈমান থাকলে, নিজের ঈমানের ব্যাপারে ছাড় দেবেন না। নিজের ঈমান, ইসলাম ও দেশের সার্বভৌমত্ব নিলামে তুলে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ঈমান-আকীদা সব বিসর্জন দিয়ে যদি আপনি নিজের আদর্শবিরোধী সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার ঈমানে দুর্বলতা আছে। তাই, আপনার কাজ হলো ঈমানকে শক্তিশালী করা এবং নিজ কর্মপদ্ধতি নিয়ে পুনর্বিবেচনা

করা। কারণ, যার ঈমান মজবুত, যে তার ঈমান রক্ষা করতে চায়, সে কখনো এমন কোনোকিছু গ্রহণ করতে পারে না, যা তার ঈমান ও ইসলামকে হুমকিতে ফেলে দেয়।

তাই, প্রত্যেক মুসলিমেরই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং ইসলাম ও কুরআনের সম্মান রক্ষায় নিজেদের ঘুমন্ত আত্মসম্মানকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দান করবেন। ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। এটাই হলো দীন কায়েমের পথ। দীন কায়েম করা এবং কালিমার পতাকা বুলন্দ করার আর কোনো পথ নেই। এ পথ ছাড়া অন্য সব পথ হলো ইসলামকে ধ্বংস করার পথ, কারণ কাফেরদের আজ্ঞাবাহী হয়ে তাদের আদেশ মেনে চলার দ্বারাই ইসলাম ধ্বংস হয়। সুতরাং এগুলো ইসলাম কায়েম করার নয়, ধ্বংস করার পথ। এই পথ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে নিজ হাতে ইসলামের নাম-নিশানা ও মান-মর্যাদা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া। মনে রাখবেন, শাহাদাত ও কুরবানীর কারণে কখনো কালিমার পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয় না; কালিমার পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মত-পথ গ্রহণ করার দ্বারা।

যখন নফীরে আমের ঘোষণা হবে, তখন জিহাদে বের হওয়ার জন্য আগে থেকেই সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রক্ষা করার জন্য আপনাদের আমি জিহাদ করতে বলছি না। ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন, আমি যদি ক্ষমতাই চাইতাম, তাহলে তোষামোদ করে, দীনের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে, শান্তিপূর্ণ উপায়েই তা অর্জন করতে পারতাম। আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন। সে ক্ষেত্রে তারাই আমাকে রক্ষা করত, বিপুল অর্থ-সম্পদও দিত, এমনকি সামরিক সাহায্য পাঠাতেও দ্বিতীয়বার ভাবত না। ক্ষমতায় থাকার জন্য কেউ কুরবানীর পথ বেছে নেয় না। আপনারা জানেন, আমি ক্ষমতার জন্য লড়াই করছি না, ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করার জন্য আপনাদেরও লড়াই করতে উদ্‌বুদ্ধ করছি না; বরং এটাই হলো কুরআনের আদেশ। আপনারা নিজেরাই কুরআন খুলে দেখুন, এমন পরিস্থিতিতে কুরআন কী করতে বলে, কোন পথে চলতে বলে?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে যে অসীয়ত করেছেন, আমিও আপনাদের সেই একই অসীয়ত করছি। সর্ববস্থায় মুসলিমদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনোভাবেই ভয় পাওয়া যাবে না। মিডিয়ার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, এতে আপনাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে ঈমান ও ইসলামের ওপর দৃঢ়তা দান করুন। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফীকদাতা। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

খাদেমুল ইসলাম আমীরুল মুমিনীন

মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ

## আমীরুল মুমিনীনের দ্বিতীয় ভাষণ

১৪২২ হিজরীর ১৬ই রজব মোতাবেক ২০০১ সালের ৩রা অক্টোবর আমীরুল মুমিনীন রহ. তাঁর ঐতিহাসিক দ্বিতীয় ভাষণটি দেন। এ ভাষণে তিনি সারা পৃথিবীর মুসলিম জনসাধারণ ও উলামায়ে কেরামকে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. বলেছিলেন—

**بسم الله الرحمن الرحيم**

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি ইরশাদ করেছেন—

**﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾**

'(জিহাদের জন্য) বের হও, হালকা অবস্থায় থাকো বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।' [সূরা তাওবা (৯) : ৪১]

যিনি আরও ইরশাদ করেছেন—

**﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾**

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়—আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (স্মরণ রেখ), আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য। তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসবেন এবং তোমরা তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।' [সূরা তাওবা (৯) : ৩৮, ৩৯]

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদদের সর্দার, ইমামুল মুরসালীন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যিনি বলেছেন—

**بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذلّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ**

‘আমাকে কিয়ামতের পুর্বমুহূর্তে তরবারি দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যেন এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই। আমার রিযিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। লাঞ্ছনা ও অপমান লিখে রাখা হয়েছে তার জন্য, যে আমার বিরোধিতা করে। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।’ [মুসনাদে আহমাদ : ৫১১৫]

হামদ ও সালাতের পর,

হে মহান মুসলিম জাতি, হে মানবজাতির কল্যাণে আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ জাতি, যারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে,

পৃথিবীর পূর্বপশ্চিমের মুসলমানগণ, হে ওইসকল লোকেরা, যারা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছ;

হে সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ,

নিঃসন্দেহে আপনারা খেয়াল করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং ব্রিটেন ও খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারী ইউরোপীয় দেশগুলোর সহায়তায় নতুন এক ক্রুসেডের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ন্যাটো, রাশিয়া, সাবেক সোভিয়েত জোটের দেশগুলো; এ ছাড়াও পুরো কুফরি বিশ্ব, বিভিন্ন দেশের মুরতাদ ও নামধারী মুসলিম শাসকবৃন্দ। তারা ইসলামী ইমারতের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে সম্মিলিত সেনাবাহিনী তৈরি করছে। এই হামলার পেছনে যে উদ্দেশ্যগুলো তারা ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটিই হলো আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে উৎখাত করা এবং তাদের ভাষায় সন্ত্রাসের (মুজাহিদদের) ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করা।

নিঃসন্দেহে আপনারা এটাও বুঝতে পারছেন, যে বিষয়গুলোকে তারা এই ক্রুসেডের কারণ হিসেবে উল্লেখ করছে, তা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের বাহানামাত্র। তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তো আল্লাহ তাআলা আমদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

‘তারা ক্রমাগত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন ত্যাগ করে আর কাফের অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সব আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তারাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।’ [সূরা বাকারা (২) : ২১৭]

শুধু ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার কারণেই তারা এই ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্মূল করতে চায়। অন্যথায় পৃথিবীর কোন আইন কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয়? আর সে ব্যক্তির কারণে পুরো একটি জাতিকে শাস্তি দেওয়ার অনুমতিই বা কোন সংবিধানে পাওয়া যায়? অথচ এ ব্যাপারে সব আসমানী শরীয়ত ও মানবরচিত আইন পর্যন্ত একমত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ। সুতরাং তারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে চায়, কারণ, আমরা একটি স্বাধীন ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। কোথাও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাদের জন্য নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনের এই হামলা থেকেও বেশি কষ্টের।

হে বিশ্বের মুসলমানগণ,
এখন আর এটা নিয়ে আলোচনার সময় নেই যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যে হামলা করা হয়েছে, তা ঠিক ছিল না ভুল? যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে। এই হামলাকে যারা সমর্থন করার, তারা করেছে আর যারা বিরোধিতা করার, তারা বিরোধিতাও করেছে। এখন আলোচনার বিষয় হলো—আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে নতুন ক্রুসেড শুরু হচ্ছে, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কী? এই ক্রুসেডারদের সাথে যারা গভীর সম্পর্ক রাখবে, তাদেরকে সবধরনের সহযোগিতা করবে, তাদের হুকুমই বা কী?

এ ব্যাপারে উম্মতের উলামা ও ইমামগণ একমত যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আগ্রাসি শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরযে আইন। এ জিহাদে বের হতে সন্তানের জন্য পিতার অনুমতি লাগবে না, গোলামের জন্য মালিকের অনুমতি লাগবে না, স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি লাগবে না, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য পাওনাদারের অনুমতি লাগবে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এটাই হানাদারদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম এবং মুসলমানদের কর্তব্য।

আর মুসলমানদের মধ্যে যারা এই ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করবে, তাদের হুকুম স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই কুরআনে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾

'হে মুমিনগণ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দেন না। সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোনো মুসীবতে পড়ে যাব। (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে অন্য কিছু ঘটাবেন, ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, সে জন্য অনুতপ্ত হবে।' [সূরা মায়েদা (৫) : ৫১, ৫২]

এই আয়াতদুটিতে আল্লাহ তাআলা বেশ কিছু বিষয় স্পষ্ট করেছেন। যেমন—

১. ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে অন্তরঙ্গতা, তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা নিষেধ করেছেন।

২. যারা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের বিধান তাদের মতোই বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৩. তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব বলে জানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা এ কথাও বলেছেন যে, মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের পরিপন্থি বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

'তুমি দেখতে পাবে, তাদের অধিকাংশই কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে, তা অতি মন্দ; কেননা (সে কারণে) আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা শাস্তির ভেতর থাকবে। তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে (মূর্তিপূজারীদেরকে) বন্ধু বানাত না।' [সূরা মায়েদা (৫) : ৮০, ৮১]

এ সকল আয়াত এবং অন্যান্য আরও দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, [ইসলামকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে] মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। এ কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়।

হে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম এবং পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা দীনের দাঈগণ, আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হলো এই সত্যগুলো প্রকাশ করা। হক কথা বলতে গিয়ে কোনো তিরস্কারের ভয় করবেন না। আহলে ইলমদের থেকে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা নিয়েছেন, সেই ওয়াদার দাবি এটাই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

'আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়), যখন আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৭]

সুতরাং আপনারা মানুষের কাছে দীনকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন, তাদেরকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসাহিত করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾

'হে নবী, মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করো।' [সূরা আনফাল (৮) : ৬৫]

হে ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ভাইয়েরা,
আপনাদের প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন।' [সূরা তাওবা (৯) : ১১১]

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন একটি শস্যদানা সাতটি শীষ উদ্‌গত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ দানা জন্মায়। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ।' [সূরা বাকারা (২) : ২৬১]

হে মুসলিম যুবকরা,

আপনাদের প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং অস্ত্র হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ﴾

'মুশরিকদেরকে (যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদের গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থাকবে। তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সূরা তাওবা (৯) : ৫]

সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাইয়েরা,

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ وفي رو اية يُقَاتِلونَ عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী (প্রভাবশালী) রূপে লড়াই করতে থাকবে, তাদের বিরোধীরা ও সাহায্য পরিত্যাগকারীরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।' [সহীহ মুসলিম : ১৯২৩]

এই হাদীসে মুসলিমদেরকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছে—

১. তায়েফায়ে মানসুরা (সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী দল) : যারা ইসলামকে ধারণ করে, ইসলাম মেনে চলে এবং ইসলামের জন্যই লড়াই করে।

২. তায়েফায়ে মুখালিফা (বিরোধিতকারী দল) : তারা হলো ইহুদী, খ্রিষ্টান, অন্যান্য কাফের, মুরতাদ ও নামধারী মুসলিম।

৩. তায়েফায়ে খাযিলা (সাহায্য পরিত্যাগকারী দল) : যারা তায়েফায়ে মানসুরাকে নুসরত না করে বসে থাকে এবং মানুষকেও তাঁদের সাহায্য না করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

এ ছাড়া আর কোনো দল নেই। তাই প্রত্যেক মুসলিমের ভাবতে হবে, সে এই দলগুলোর কোনটিতে আছে? এই হাদীসে এ কথাও বলে দেওয়া আছে যে, এই বিজয়ী দলের বিরোধিতাকারী মুশরিক ও সাহায্য পরিত্যাগকারী নামধারী মুসলিম—কেউই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা সব সময়ই বিজয়ী থাকবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে আমাদের যে বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন, সে বিজয়ের ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ ইয়াকীন আছে। কিন্তু এই বিজয় তখনই আসবে, যখন আমরা আল্লাহর দীনকে একনিষ্ঠভাবে সাহায্য করব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

'আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দীনের) সাহায্য করবে।' [সূরা হজ (২২) : ৪০]

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

'তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দীন)-এর সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচল রাখবেন।' [সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৭]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে আমেরিকা তার দলবল ও মিত্রদের নিয়েও আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ﴾

'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের পরাজিত করার মতো কেউ থাকবে না।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬০]

আমেরিকা আর তার দল যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, মহান শক্তিধর আল্লাহ তাআলার শক্তির সামনে তারা কিছুই না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

'কাফেররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তারা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না। (হে মুসলিমগণ,) তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত করে রাখো।' [সূরা আনফাল (৮) : ৫৯, ৬০]

﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

'(হে মুসলিমগণ), তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত বড়ই দুর্বল।' [সূরা নিসা (৪) : ৭৬]

আমেরিকা যত বড় বাহিনী আর যত অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়েই আসুক না কেন, আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। কারণ, আমরা তো সেই সত্তার বাহিনী, যিনি বলেছেন—

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা ফাতহ (৪৮) : ৭]

আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তিতেও আমরা ভীত না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ﴾

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।' [সূরা মুনাফিকুন (৬৩) : ৭]

তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট দেখেও আমরা বিচলিত নই। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

'যারা কুফরি করেছে, তারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সে সব তাদের পরিতাপের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই পরাজিত হবে।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৬]

আমেরিকার উন্নত প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও আমাদের মনোবলে চিড় ধরাতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾

'তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলি তাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর (আযাব) তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসল, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।' [সূরা হাশর (৫৯) : ২]

﴿وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَأُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾

‘কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিমদের শত্রুদেরকে) সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নেমে আসতে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে, তাদের কতককে তো তোমরা হত্যা করছিলে আর কতককে করছিলে বন্দি।’ [সূরা আহযাব (৩৩) : ২৬]

সুতরাং হে মুসলিমগণ,
সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রাখুন, যিনি আপনাদের ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

‘যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের রব আল্লাহ। (তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো।) আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস হয়ে যেত খানকাহ, গির্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ, যে জায়গাগুলোতে বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। সব কাজের পরিণতি আল্লাহরই হাতে।’ [সূরা হজ (২২) : ৪০, ৪১]

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
খাদেমুল ইসলাম আমীরুল মুমিনীন
মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ

হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার প্রতিটি কথাতেই অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে। আপনার কথাগুলো শুধু কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পর্বতসমান দৃঢ়তা নিয়ে আপনি এই কথাগুলোকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যে যুগে হক কথা ঘোষণা করা তো দূরের কথা, হক চিনতে পারা লোকের সংখ্যাই কমে এসেছে, সে যুগে এসে আপনি হকের

পক্ষে দীনের ওপর অবিচলতা, ত্যাগ ও কুরবানীর এমন এক দাস্তান তৈরি করেছেন, যা দেখে সাহসী মানুষরাও হতভম্ব হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় আপনার এই অবস্থান চিরকাল নুরের হরফে লেখা থাকবে, এই পথের পথিকদের জন্য তা আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে আজীবন। আপনার এই ভূমিকা বিপথগামী ও পশ্চাদপসরণকারী নেতা এবং আপসকামী ও শৈথিল্যবাদী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক দলীল হয়ে থাকবে।

আপনি চাইলে লাভক্ষতির দোহাই দিয়ে নিজের ক্ষমতা রক্ষা করতে পারতেন। আপনার দেশের মানুষ নিহত হবে, ঘরছাড়া হবে, সবকিছু গুড়িয়ে দেওয়া হবে, মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, সম্পদ লুট করা হবে, ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে—এইসব বাস্তবসম্মত কারণ দেখিয়ে আপনি চাইলেই শায়খ উসামাকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা করেননি। সব জুলুম-অত্যাচার আপনি সয়েছেন, নিজের ক্ষমতা আর তিলে তিলে গড়ে তোলা হুকুমতকে বিসর্জন দিয়ে মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা ও কাফেরদের থেকে সম্পর্কহীনতার এক অবিশ্বাস্য নজির স্থাপন করেছেন। এই উম্মতকে আপনি তাওহীদে আমালী ও প্রায়োগিক ঈমানের অমূল্য এক শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি শিখিয়েছেন—**'এই যুদ্ধ ঈমান ও কুফরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—হয় ঈমানের পথ, নয় কুফরের পথ। তৃতীয় কোনো পথ এখানে নেই। আমাদের অবশ্যই ঈমানের পথ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করাই হলো সবচেয়ে বড় সফলতা।'** ঠিক আল্লাহ তাআলা যেমনটা বলেছেন—

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

'তারা ক্রমাগত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন ত্যাগ করে আর কাফের অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সব আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তারাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' [সূরা বাকারা (২) : ২১৭]

কান্দাহারের তৎকালীন গভর্নর ও আমীরুল মুমিনীনের নায়েব মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রহমানী রহ.-ও আমাদেরকে আমলী তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আল-জাযীরার সাংবাদিক আহমাদ যাইদান মোল্লা মুহাম্মাদ হাসানের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তখন আহমাদ যাইদান তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আপনারা যদি উসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দিতেন অথবা তাঁকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতেন, তাহলে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ এখন যে মর্মান্তিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে, এই

পরিস্থিতি হয়তো তৈরি হতো না। উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর না করার যে সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন, এ কারণে কি আপনারা অনুতপ্ত?'

লক্ষ করুন, মোল্লা মুহাম্মাদ হাসানের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। তিনি বলেছিলেন—

> 'আপনারা ভালো করেই জানেন, তালেবান মুজাহিদরা মজবুত আকীদা ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী। এই আকীদা ও ঈমানের জন্যই তারা জিহাদ করে। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, উসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর না করার কারণে মুজাহিদরা অনুতপ্ত হবে? আমাদের ঈমান ও আকীদার গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি হলো আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে যেমন কুফরি বিশ্বাস থেকে রক্ষা করব, তেমনই কাফেরদের হাত থেকেও তাদের নিরাপত্তা দেব। সুতরাং উসামা বিন লাদেনকে কাফেরদের হাতে তুলে না দেওয়ার কারণে আমরা অনুতপ্ত হব—এই কল্পনাও তো আমরা কখনো করিনি। আর এটা সম্ভবও না। তিনি তো আমাদের গর্ব ও অহংকারের প্রতীক। কাফেরদের বিরুদ্ধে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন, এ জন্য আমরা গর্বিত। শুধু শায়খ উসামা না, সাধারণ কোনো মুসলিমকেও কোনো অবস্থাতেই আমরা কাফেরদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আর ভবিষ্যতেও কখনো এমনটা হবে না।'[৩১]

শায়খ উসামার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে আহমাদ যাইদান জিজ্ঞেস করেছিলেন—'উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক এখন কেমন? তিনি এখন কোথায় আছেন? তার সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ আছে? আল-কায়েদার সাথে তালেবানের সম্পর্ক বর্তমানে কেমন? পশ্চিমা বাহিনীর বিরুদ্ধে তারাও কি আপনাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করে?'

মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রাহমানী জবাবে বলেছিলেন—

> 'শায়খ উসামা নেতৃস্থানীয় একজন মুজাহিদ। তিনি কোথায় আছেন বা কোথায় থাকেন—সে ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারব না। তবে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয় যে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই এবং পুরো মুসলিম উম্মাহ একটি হাতের ন্যায়, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে। সর্বস্তরের মুসলমানরা আমাদের সমর্থন করে, সহযোগিতা করে—এটাই আমাদের শক্তির উৎস। আমরাও তাদের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। তারা তাদের জান-মাল আর দোয়া দিয়ে আমাদের সাথে জিহাদে শরীক হন। প্রতিটি মুসলিমের সহযোগিতাই আমাদের প্রয়োজন। আর শায়খ উসামা সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আমরা আশা করি, আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর সুরক্ষার দায়িত্ব নেন এবং শত্রুরা যেন কোনোভাবেই তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।'

---

[৩১] ২০০৮ সালের ২৫শে জুলাই আল-জাযীরার সাংবাদিক আহমাদ যাইদানের নেওয়া মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রহমানী রহ.-এর সাক্ষাৎকার। পুরো সাক্ষাৎকারের লিংক : https://tinyurl.com/3jnnmsbm



মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রাহমানী



আল-জাযীরার সাংবাদিক আহমাদ যাইদানকে দেওয়া সাক্ষাৎকার চলাকালে
মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান রাহমানী রহ.

এমন আরেকজন বীর মুজাহিদ হলেন মোল্লা দাদুল্লাহ রহ.। রক্ত দিয়ে যারা এই উম্মতের সম্মান ও গৌরবের ইতিহাস লিখেছেন, তিনি সে কাফেলার অন্যতম এক সদস্য। আল-জাযীরার সাংবাদিক আহমাদ যাইদানের প্রশ্নের জবাবে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা শুনে যে-কেউ বিস্মিত হতে বাধ্য। আহমাদ যাইদান প্রশ্ন করেছিলেন—'আল-কায়েদার সাথে আপনাদের সম্পর্ক এখন কেমন? তাদের সাথে কি আপনাদের কোনো যোগাযোগ আছে?'

মোল্লা দাদুল্লাহ রহ. উত্তরে বলেছিলেন—

> ‘পুরো বিশ্ব জানে, আমরা আল-কায়েদার মুজাহিদদের জন্য আমাদের হুকুমত উৎসর্গ করেছি। এটি আমাদের দীনী দায়িত্ব ছিল। যাদের জন্য আমরা আমাদের হুকুমত উৎসর্গ করলাম, তাদের সাথেই আমাদের সম্পর্ক থাকবে না এটা কীভাবে সম্ভব? এখন তো আমরা এবং তাঁরা একই ফ্রন্টে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। বিজয় বা শাহাদাত অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ আমরা করেই যাব ইনশাআল্লাহ। আমাদের উভয়ের লক্ষ্যই হলো জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। আমাদের দীন এক, আমাদের লক্ষ্য এক, আমাদের শত্রুও এক। ইনশাআল্লাহ আমরা আল-কায়েদার ভাইদের সাথেই থাকব, যতদিন না আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের সকলের শত্রু ক্রুসেডারদের পরাজিত করি।’

এরপর আহমাদ যাইদান তাকে জিজ্ঞেস করেন—‘আল-কায়েদাকে সমর্থন করার কারণেই তো আপনারা শাসনক্ষমতা হারিয়েছেন। এ জন্য কি আপনারা অনুতপ্ত?’

মোল্লা দাদুল্লাহ রহ. উত্তরে বলেন—

> ‘শহীদকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন জিহাদ ও শাহাদাতের এত এত মর্যাদা দেখে শহীদ বলে, যদি সম্ভব হতো, তাহলে আমি চাইতাম, আমাকে বারবার জীবিত করা হোক আর আমি বারবার জিহাদ করে শহীদ হই। শহীদের মতো আমরাও এই কথাই বলি, আমরা যদি শতবারও ক্ষমতা লাভ করতাম আর আল-কায়েদার এই মুজাহিদদের জন্য আমাদের ক্ষমতা হারাতে হতো, তাহলে প্রতিবারই হাসিমুখে আমরা আমাদের ক্ষমতা, আমাদের জীবন তাদের জন্য কুরবান করতাম।’[৩২]



আহমাদ যাইদানকে দেওয়া সাক্ষাৎকার চলাকালে মোল্লা দাদুল্লাহ রহ.

[৩২] আত-তাবরিআহ : শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী

এমনইভাবে পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মোল্লা আব্দুস সালাম যইফকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল— 'আপনাদের এই সিদ্ধান্তের [শায়খ উসামাকে সমর্থন] কারণে কি আপনারা অনুতপ্ত?'

তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলেছিলেন—'না, আমরা যা করেছি, তা শরীয়তের নির্দেশনা মেনেই করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবটুকু চেষ্টাই ব্যয় করেছি। সামনেও যদি কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবু আমাদের অবস্থান বিন্দুমাত্র বদলাবে না।'

এই একই প্রশ্ন সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ-এর পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের অফিস প্রধান মুহাম্মাদ তৈয়ব আগাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন, সেটিও দেখার বিষয়।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'অনেক আফগান নাগরিক মনে করে, শায়খ উসামা বিন লাদেনের প্রতি তালেবান সরকারের সমর্থনের কারণেই আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে। উসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো। এ ব্যাপারে তালেবানের মতামত কী?'

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

> 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমেরিকার নেতৃত্বে বৈশ্বিক কুফরি জোট আমাদের ওপর হামলা করেছে একটি কারণেই। তা হলো, আমরা শরয়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং কোনো কুফরি শক্তির অধীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করেছি। এ ছাড়া অন্য যত কারণের কথা কাফেররা বলে থাকে, তা সবই মূলত এই একটি বিষয়েরই শাখা-প্রশাখা। আল্লাহ মাফ করুন, আমরা যদি তাদের কথামতো শায়খ উসামার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, তবু তারা খুশি হতো না। তখন তারা মানবাধিকার ও নারী-অধিকারের কথা নিয়ে আসত। মাদক প্রতিরোধের কথা বলত, অথচ মাদক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের সফলতার কথা স্বয়ং জাতিসংঘও স্বীকার করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন আমাদের বারবার তাগিদ দিয়েছেন। দীনের ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব তিনি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, এই লোকদের বাস্তবতা আল্লাহ তাআলাই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—
>
> ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾
>
> 'ইহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।' [সূরা বাকারা (২) : ১২০]'

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর ভাষ্যমতে এ ধরনের বীর-বাহাদুর, পাহাড়সম দৃঢ়তার অধিকারী লোকদের দ্বারাই কোনো জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ঈমান ও আকীদার বিজয় হয়। কবি বলেন—

**نجومُ سماءٍ كلما غاب كوكبٌ ... بدا كوكبٌ تأوي إليه كواكبه**

তাঁরা আকাশের নক্ষত্র। যখনই কোনো নক্ষত্রের পতন হয়, তখনই আরেকটি নক্ষত্র উদিত হয় আর বাকিসব নক্ষত্র তার কাছে আশ্রয় নেয়।

**وما زال منهم حيث كان مسودٌ ... تسير المنايا حيث سارت كتائبه**

সব সময়ই তাদের মধ্যে একজন মহান নেতা থাকে, তিনি তার বাহিনী নিয়ে যেখানেই যান, সেখানেই শত্রুবাহিনীর মধ্যে হানা দেওয়ার জন্য মৃত্যুও তার দলবল নিয়ে হাজির হয়।

**أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ ... إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِع**

তাঁরাই মোদের পূর্বসূরী, যাদের নিয়ে গর্ব করি,
কোন মুখেতে করো বড়াই, লও তো দেখি তাদের জুড়ি।

## শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনীর দৃষ্টিতে ৯/১১-এর শিক্ষা

শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফি. ৯/১১-এর যুগান্তকারী ঘটনার শিক্ষাগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। 'আর-রু'য়াতুশ শরইয়্যাহ লি আহদাসি আমরিকা (শরয়ী দৃষ্টিতে আমেরিকার ঘটনা)' শিরোনামের প্রবন্ধে শায়খ লেখেন—

'আমেরিকার এই ঘটনা (৯/১১) থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমরা শিখেছি—

১. ঈমান হলো একটি অবস্থানের (Stance) নাম আর ইসলাম একটি অবস্থার (Condition/State) নাম। এই অবস্থান ও অবস্থার জন্য বিনিময় ও মূল্য পরিশোধ করতে হয়। আর মূল্যবান কোনোকিছুর মূল্যায়ন তখনই করা হয়, যখন তার জন্য নিজের জান-মাল ও সবকিছু কুরবান করা হয়।

২. আমরা শিখেছি, সালাফের অনুসরণ কেবল ধারণা বা বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না; বরং কথা ও কাজের মাধ্যমে সালাফের অনুসরণই হলো আসল অনুসরণ। যারা সালাফের অনুসরণের মিথ্যা দাবি করে, [এই ঘটনা] এমন অনেকের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে।

এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে, কারা দ্বিধা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে আর কারা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দীনের জন্য নিজের জান দিতেও প্রস্তুত।

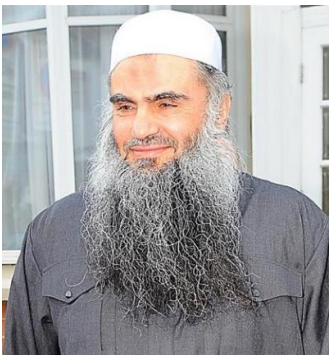
৩. আমরা শিখেছি, যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা শুধু ব্যক্তির কোনো অবস্থার নাম নয়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যেও যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা থাকতে পারে। এই বিষয়টি আমরা আগে জানতাম না, কোনো বইয়েও আমরা পড়িনি। আমরা শুনেছি, যুহদ মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে সাহায্য করে এবং আখিরাতমুখী চিন্তাভাবনা দুনিয়ার বিপদাপদকে সহজ করে দেয়। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা শিখেছি, কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে যুহদ থাকলে তার ক্ষেত্রেও একই ফলাফল হয়। আফগানিস্তান যদি ধনী কোনো দেশ হতো, এখানে যদি স্বচ্ছ কাঁচে ঘেরা উঁচু উঁচু ভবন থাকত, মানুষ যদি আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করত, পশ্চিমা ব্যাংকগুলোতে যদি এখানকার শাসকদের লাখ লাখ টাকা থাকত, তাহলে তালেবান কি এমন ঈমানজাগানিয়া দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারত? আল্লাহর কসম, তারা পারত না। আফগানিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত এই যুহদ ছিল বলেই তালেবান এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. এই ঐতিহাসিক অবস্থান গ্রহণ করতে পেরেছেন। যারা দুনিয়ার ক্ষতির ভয়ে নিজেদের দীনকে বিসর্জন দেয়, তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

৪. আমরা শিখেছি, যারা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ তাআলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করেন। এই মুখোশ উন্মোচন হয় পরীক্ষা ও বালা-মুসীবতের মাধ্যমে। যে-সকল শায়খরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করেছে আর যে নেতারা দীনকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, এখন আর কেউ তাদের বিশ্বাস করে না। এখন আর কেউ তাদের হয়ে কথা বলতে পারবে না। কারণ, তাদের দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, শত চেষ্টা করেও তাদের কথা ও কাজের নোংরামি লুকিয়ে রাখা যায়নি।

৫. এই ঘটনা আমাদের শিখিয়েছে, আল্লাহর ফয়সালা মানুষের ক্ষমতার চেয়েও শক্তিশালী। তাগুতের ক্ষমতা যত বেশিই হোক না কেন, যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন, আল্লাহ যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, দুনিয়ার কোনো শক্তির সাধ্য নেই সে সিদ্ধান্তকে রদ করে। কারণ, আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর মালিক। তিনিই সর্বশক্তিমান ও শক্তিশালী। শয়তানের জাদু কেবল তাদেরকেই প্রভাবিত করে, যারা শয়তানকে ভয় করে চলে। আর যারা কেবল আল্লাহকে ভয় করে, তারা অন্য কোনো শক্তিকে ভয় করে না, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী কোনো জালিমকেও তারা পরোয়া করে না।

৬. ঘটনাটি আমাদের শিখিয়েছে, এই উম্মত কখনো বিলুপ্ত হবে না। ধ্বংস ও পতনের সব উপাদানের চেয়েও এই উম্মত শক্তিশালী। আরও শিখিয়েছে, দৃষ্টির আড়ালেও অনেক কিছু ঘটে। এই ঘটনা প্রমাণ করেছে, আমাদের পূর্বসূরীদের যে ঘটনাগুলো আমরা বইয়ের পাতায় পড়ি, তা নিছক কোনো গল্প বা মনগড়া কোনো কাহিনি না। পৃথিবীতে এখনো ঈমান ও আদর্শের প্রভাব আছে; বরং এই ঈমান ও আদর্শই মানবজীবনে এবং ইতিহাস তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব রাখে। মানুষ আগুন দেখে পালায়, অথচ এই দীনের এমন কিছু অনুসারী আছে, যারা মৃত্যু ও শাহাদাতের খোঁজে পৃথিবী চষে বেড়ায়, আগুন তাদের ভয় দেখাতে পারে না; উলটো তারা সে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আরও উসকে দিতে চায়।

৭. ঘটনাটি আমাদের শিখিয়েছে, প্রতিকূলতা ছাড়া আর কিছুই এই উম্মতকে ময়দানে আনতে পারবে না। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী ও স্পষ্ট হবে, উম্মতের প্রতিক্রিয়া তত শক্তিশালী এবং কঠিন হবে। প্রতিকূলতা যত বাড়বে, উম্মতের প্রতিরোধও তত বাড়বে।'



শায়খ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনী হাফিযাহুল্লাহ

## তোরাবোরার যুদ্ধ

৯/১১-এর পর থেকে ২০০১ সালের ১৩ই নভেম্বর কাবুল পতনের আগ পর্যন্ত শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ক্রমাগত জায়গা পরিবর্তন করেন। কখনো তোরাবোরা পাহাড়ে, কখনো জালালাবাদ শহরে, কখনোবা কাবুল, লোগার বা খোস্ত প্রদেশের কোনো সেফ হাউজে থাকতেন। এই সময় শায়খের সাথে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ. থাকতেন। মাঝে মধ্যে শায়খ রহ. সঙ্গীদের নিয়ে খোলা আকাশের নিচেই রাত কাটিয়ে দিতেন। আফগান ভাইদের মধ্যে শায়খের আস্থাভাজন অনেকেই ছিলেন, বিভিন্ন

কাজে শায়খ তাঁদের সহযোগিতাও নিতেন। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ রহীম আফগানী[৩৩] ছিলেন অন্যতম। ৯/১১-এর পরে চলাফেরার সময় শায়খ তাঁকে সাথে রাখতেন। যেহেতু তিনি আফগান ছিলেন, আবার তাঁর বাড়িও ছিল নানগারহার প্রদেশে।[৩৪] তাই, যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সহযোগিতা করতেন।

শায়খ উসামা রহ.-এর আশা ছিল, তালেবানের প্রতিরোধ দীর্ঘ হবে এবং এই সুযোগে দুর্গম পাহাড় আর উঁচু উঁচু গাছপালায় ঢাকা তোরাবোরার পার্বত্য অঞ্চলকে মার্কিন আগ্রাসিদের জন্য মরণফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলোর পতন আরম্ভ হয় এবং ২০০১ সালের ১৩ই নভেম্বর কাবুলও হাতছাড়া হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আরব-সহ ভিনদেশি মুজাহিদরা দক্ষিণের শহরগুলোতে চলে যেতে থাকেন। অধিকাংশ ভাই লোগার, খোস্ত ও পাকতিয়া প্রদেশের গারদেযে চলে যান আর কয়েকশ' ভাই পূর্বাঞ্চলীয় শহর জালালাবাদে আশ্রয় নেন।

কাবুল পতনের একরাত আগে শায়খ আবু সুলাইমান মাক্কী[৩৫] সাথে শায়খ উসামা রহ. সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের এই সাক্ষাৎটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। পরে তোরাবোরা পাহাড়ের নিচে রেখে যাওয়া শায়খ উসামার একটি গাড়িতে মার্কিনিরা এই সাক্ষাতের ভিডিও ক্যাসেটটি খুঁজে পেয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যায়, শায়খ উসামা রহ. শায়খ আবু সুলাইমান মাক্কীকে ৯/১১ হামলার বিস্তারিত বিবরণ শোনাচ্ছেন। হামলার পরে টাওয়ারগুলির কী অবস্থা হবে—সে সম্পর্কে তার অনুমানের কথা বলছেন। তাঁদের আলোচনায় ভাই আবুল হাসান সায়ীদীর স্বপ্নের বিষয়টিও উঠে আসে, যেটা তিনি ১৯৯৬ সালে জালালাবাদে থাকতে দেখেছিলেন। আমেরিকানরা এই ভিডিও টেপটি পেয়ে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিয়েছিল এবং একে ৯/১১ হামলার সাথে শায়খ উসামার জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দেখছিল।

---

[৩৩] যে-সব বন্দিকে আমেরিকা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এমন গুরুত্বপূর্ণ বন্দি মুজাহিদদের সাথে তিনিও এখন গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দি আছেন। আল্লাহ তাআলা সকলের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

[৩৪] কাবুল পতনের আগ পর্যন্ত শায়খ অধিকাংশ সময় নানগারহার প্রদেশেরই বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। জালালাবাদ নানগারহার প্রদেশেরই একটি জেলা। তোরাবোরা পর্বতও এই নানগারহার প্রদেশেরই একটি জেলা পাচির আগামে অবস্থিত। [সম্পাদক]

[৩৫] শায়খ আবু সুলাইমান মাক্কী ছিলেন একজন ইলমী ব্যক্তিত্ব। রুশবিরোধী জিহাদের সময় আফগানিস্তান আসেন। জিহাদের ময়দানে দরস-তাদরীস আর ইলমী খিদমতের ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন, এতে তার শরীরের নিচের অর্ধেক প্যারালাইজড হয়ে যায়। ওযর থাকার কারণে তার আত্মীয়স্বজন তাকে জিহাদে বের না হতে জোরাজুরি করেন। কিন্তু আল্লাহর এই নাছোড়বান্দা ঘরে বসে থাকতে পারেননি , মাজুর হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের ময়দানে বের হয়ে পড়েন।

যাই হোক, শায়খ আবু সুলাইমান মাক্কীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে শায়খ উসামা ও তাঁর সঙ্গীরা জালালাবাদ চলে যান এবং সেখানকার একটি সেফ হাউজে রাত কাটান। পরদিন সকালে রেডিও-টেলিভিশনে খবর প্রচারিত হয়, নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের হাতে কাবুলের পতন হয়েছে। কাবুল পতনের খবর শুনে শায়খ উসামা সবাইকে সেফ হাউজ ছেড়ে জালালাবাদ শহরের পাশে থাকা জলপাই বাগানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রাত হওয়া পর্যন্ত সবাই সেখানে অপেক্ষা করেন। তারপর শায়খ সবাইকে সাথে নিয়ে তোরাবোরা পাহাড় অভিমুখে রওনা হন। তোরাবোরার পাদদেশেই তুর্কিস্তানি ভাইদের একটি ট্রেইনিং ক্যাম্প ছিল। সেখানে গাড়িগুলো রেখে নিজ নিজ ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সবাই পাহাড়ে ওঠার প্রস্তুতি নেন। দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে অবশেষে তাঁরা তোরাবোরার শীর্ষদেশে পৌঁছান। তোরাবোরার চূড়ায় এটি ছিল শায়খ উসামার দ্বিতীয় সফর।




শায়খ আবু সুলাইমান মাক্কীর সাথে শায়খ উসামার সাক্ষাৎ

কাবুল থেকে যে ভাইয়েরা এসেছিলেন এবং যে ভাইয়েরা আগে থেকেই জালালাবাদে ছিলেন, তাদের সকলকে শায়খ উসামা আগেই তোরাবোরা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশমতো ভাইয়েরাও পাহাড়চূড়ায় উঠে কয়েক দলে ভাগ হয়ে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পরিখা খনন করা, ক্যামোফ্লাজ তৈরি করা-সহ প্রয়োজনীয় যুদ্ধপ্রস্তুতির কাজ চলছিল বেশ জোরেশোরেই।

শায়খ উসামা যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন, সে জায়গাটি ছিল অনেক উঁচুতে। সেখানে একটি কামরাও ছিল। রুশবিরোধী জিহাদের সময় মুজাহিদরা সে কামরাটি ব্যবহার করতেন। ঘন

পাইন গাছের আড়ালে থাকায় প্রাকৃতিকভাবেই ক্যামোফ্লাজ তৈরি হয়ে জায়গাটিকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলেছিল। মিরাজুদ্দীন নামের স্থানীয় এক লোককে মুজাহিদদের রসদ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর লোকেরা আমাদের খাবার ও পানি দিয়ে যেত। খচ্চরের মাধ্যমে তারা গোলাবারুদও নিয়ে আসত। তাদের আরেকটা কাজ ছিল পাহাড়ের ঢালে বিভিন্ন জায়গাতে একটু দূরে দূরে আরও পরিখা খনন করা। সে এলাকার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলেবেঁধে আমাদের কাছে আসত। কেউ আসত কাজের খোঁজে, কেউ আসত শায়খ উসামা ও মুজাহিদদের দেখতে আর কেউবা আসত সহযোগিতা আর মেহমানদারির আগ্রহ নিয়ে।

২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর জালালাবাদ শহরের পতন হয়। তারপর থেকেই মার্কিনিদের দৃষ্টি তোরাবোরার দিকে ঘুরে যায়। মুনাফিক ইনফর্মারদের তথ্যের ভিত্তিতে তারা জানতে পেরেছিল, শায়খ উসামা এখানেই আছেন। আমরা দিনরাত তাদের গোয়েন্দা বিমানের আওয়াজ শুনতে পেতাম। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তারা পাহাড়ের প্রতি ইঞ্চি জায়গার ছবি তুলে পর্যবেক্ষণ করেছিল। এতকিছুর পরেও মার্কিন বাহিনীর কমান্ডার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় কি না—এই আশঙ্কায় নিজ বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ারই সাহস করতে পারছিল না। তার ইচ্ছা ছিল, দালাল আফগান বাহিনীকে দিয়ে এই হামলা করাবে। সে হিসেবে হাজী দীন মুহাম্মাদ, হযরত আলী ও হাজী মুহাম্মাদ যামানের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন ফোর্স গঠন করা হয়। মূল বাহিনী অভিযান শুরুর আগে উন্মাদের মতো বোমা হামলা করে পুরো পাহাড়কে ঝাঁঝরা বানিয়ে ফেলা হয়। এই হামলায় B-52 স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার, F-16 সুপারসনিক ফাইটার, অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার, বাংকার বাস্টার, ৭ টন ওজনের বোমা-সহ নাম না-জানা আরও অসংখ্য অস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ইবনে শায়খ লীবী[৩৬] (আলী মুহাম্মাদ ফাখেরী) রহ. তোরাবোরা পাহাড়ে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা ভাইদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মুনাফিকদের দল একাধিকবার পাহাড়ে হামলা করতে

[৩৬] আফগানিস্তানে সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভাইয়ের অবদান ভোলার মতো না। তিনি খালদুন ট্রেইনিং ক্যাম্পের আমীর ছিলেন। শায়খ আবু যুবাইদা ফিলিস্তিনী ফাক্কাল্লাহু আসরাহুর তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে এই ক্যাম্পটি পরিচালিত হতো। ইবনে শায়খ রহ. তাঁর সুন্দর ব্যবহার, বিনয়, নম্রতা আর সুউচ্চ মনোবলের কারণে সবার কাছেই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তোরাবোরা পাহাড়ের সামরিক নেতৃত্ব শায়খ উসামা রহ. তাঁকে দিয়েছিলেন। পাহাড়ের ওপর মুনাফিকদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তোরাবোরা থেকে সরে যাওয়ার সময়ও তিনিই নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি যখন গ্রেফতার হন, তখন তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছিল। আইএসআই (পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা) এই অর্থের বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু ইবনে শায়খ রহ. তখন শর্ত দিয়েছিলেন, তাঁর সাথে বন্দি অন্য সাথিদেরও ছাড়তে হবে। আইএসআই তাঁর এ শর্ত মানতে রাজি হয়নি। জেলে একবার শায়খ আবু ইয়াহয়া লীবী রহ.-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। ইবনে শায়খ তখন শায়খ লীবীকে বলেন, মার্কিন তদন্তকারী অফিসাররা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ,

আসে। ভাইয়েরা সামান্য অস্ত্র নিয়েই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের প্রতিহত করেন। ভাইদের শক্ত প্রতিরোধের মুখে প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি প্রতিবারই তাদের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

তখন মার্কিনিরা B-52 স্ট্র্যাটেজিক বোম্বারের ঘন ধোঁয়া দিয়ে তোরাবোরা পাহাড়ের ঠিক ওপরে মাঝে মধ্যেই গোলাকার বৃত্ত তৈরি করত। দেখে মনে হতো, তারা বলতে চাচ্ছে—'তোমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে দিনরাত এই বোমা হামলা চলতে থাকে। অধিকাংশ হামলাই হতো পাহাড়ের পাদদেশে থাকা তুর্কিস্তানিদের ক্যাম্পের ওপর। শায়খ উসামা রহ. সুদান থেকে যখন আফগানিস্তান আসেন, তখন এখানেই প্রথমে নেমেছিলেন। তাদের এই ক্রমাগত বোমাবর্ষণেও আল্লাহর রহমতে আমাদের উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি হয়নি। হাতেগোনা কয়েকজন ভাই শহীদ হয়েছিলেন।



একটি B-52 বিমান তোরাবোরা পাহাড়ের ওপর ঘন ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করছে

---

আমি আল-কায়েদার সদস্য। তাঁর এ কথা শুনে শায়খ লীবী রহ. তাঁকে বলেন, মার্কিনিদের কাছে আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে তো আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন। তখন ইবনে শায়খ রহ. বলেছিলেন, আমি তাদের ভয়ে আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করব কেন? আল-কায়েদা তো আমার গর্ব। আল-কায়েদার সাথে সম্পর্কের কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না। তাদের সামনে আমি কিছুতেই নিজেকে ভীতু হিসেবে উপস্থাপন করব না। আমি আল-কায়েদার না হলেও আল-কায়েদা নিয়ে আমি গর্ব করি। ইবনে শায়খ রহ.-কে আফগানিস্তানের বিভিন্ন জেলে অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়। তারপর মার্কিনিরা তাঁকে মিশর সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। সেখান থেকে তাঁকে গাদ্দাফির হাতে তুলে দেওয়া হয়। জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তারা তাকে অনেক চাপ দেয়, কিন্তু তিনি বরাবর অস্বীকার করতে থাকেন। অবশেষে গাদ্দাফির বাহিনী তাঁকে তাঁর সেলেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে আর প্রচার করে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আল্লাহ তাআলা শায়খ ইবনে শায়খের ওপর রহমত নাযিল করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সঙ্গী হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন।

উল্লেখ্য, এই ভয়ভীতি আর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের কাছে খবর আসে, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর সম্মানিতা স্ত্রী, তাঁর ছোট মেয়ে এবং একমাত্র ছেলে মুহাম্মাদ বোমা হামলায় শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সাথে আরও কিছু ভাই সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেছেন। তাদের মধ্যে শায়খ নাসর ফাহমী নাসর মুহাম্মাদ সালাহ-ও ছিলেন। এ খবর শুনে আমরা শায়খ আইমানকে সান্ত্বনা দিতে আসি। সান্ত্বনা দিতে এসে কিছু ভাই কাঁদছিলেন আর শায়খ নিজেই আমাদের সবরের কথা বলে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, এ পথ তো এমনই। স্ত্রী-সন্তানের শাহাদাতের খবরে শায়খ আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করছিলেন এবং বলছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ দিয়ে এই দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন। সে সময় আমরা আরও একটি বেদনাদায়ক খবর পাই যে, কিছু মুজাহিদ ভাই-সহ শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ. শাহাদাতবরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

১৫ই রমযানের পর থেকে বোমা হামলা পাহাড়ের নিচ থেকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে আসতে শুরু করে। বোঝাই যাচ্ছিল, ছদ্মবেশী মুনাফিকরাই মার্কিনিদের তথ্য দিয়েছে, শায়খ উসামা পাহাড়চূড়ায় আছেন। ফলে শায়খ উসামা ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব অন্য কোথাও চলে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। তাই আর বিলম্ব না করে সবাই পাশের একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেন। তোরাবোরা পর্বতমালার মধ্যে এই পাহাড়টিই ছিল সবচেয়ে বেশি উঁচু। কন্ট্রোল রুম থেকে পায়ে হেঁটে এই পাহাড়ে যেতে কয়েক ঘণ্টার মতো সময় লাগত। সে সময় আব্দুল কুদ্দুস[৩৭] নামের বাহরাইনের এক ভাই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে ছিলেন।

এ পাহাড়ের চূড়ার কাছেই আফগান ভাইয়েরা বেশকিছু পরিখা খনন করে গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। শায়খ উসামা ও তাঁর সঙ্গীদের অবস্থানের জন্য এ ধরনের কয়েকটি পরিখা নির্বাচন করা হয়। সেখানে বেশকিছু ইয়েমেনি ভাইও ছিলেন। আফগানরা নিয়ম করে এখানেও খচ্চরের পিঠে খাবার-পানি-সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসত। যদিও আমরা

[৩৭] খোস্ত প্রদেশের জিহাদওয়াল এলাকায় আল-ফারুক ট্রেইনিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি। সোমালি ভাইদের ট্রেইনিং দেওয়ার জন্য যারা সোমালিয়া গিয়েছিলেন, তিনিও তাদের একজন ছিলেন। তোরাবোরা থেকে সরে আসার পর আমরা তাঁর সম্পর্কে আর কোনো খবর পাইনি। তোরাবোরা থেকে সরে আসার সময় যে ভাইয়েরা বোমা হামলার শিকার হয়েছিলেন, তাদের অনেকের ধারণা তিনি সে হামলাতেই শহীদ হয়েছেন। এ খবর যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন। আর যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে যেন তাকে হেফাযত করেন।

তাদের চিনতাম না, কিন্তু কখনো তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হয়নি। তবে নিরাপত্তার জন্য সতর্কতার বিকল্প ছিল না।

খারাপ একটি স্বপ্ন দেখার কারণে শায়খ উসামা এ জায়গায় বেশিদিন থাকেননি। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর পরিখায় একটি বিচ্ছু ঢুকে পড়েছে। যে রাতে এ স্বপ্ন দেখেন, পরদিন সকালেই দেহরক্ষী বাহিনীকে আরেকটু ওপরের দিকে উঠতে বলেন। ওপরের দিকে কোনো পরিখা ছিল না। কিন্তু এক জায়গায় তিনদিক থেকে গাছপালায় ঢেকে প্রাকৃতিকভাবেই একটি কামরার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেটাকেই আরেকটু ঠিকঠাক করে শায়খ উসামা ও তাঁর সঙ্গীদের থাকার জায়গা করে দিই। তখন ছিল শীতকাল। প্রচণ্ড ঠান্ডায় শরীরে কাঁপুনি উঠে যেত। পুরো পাহাড় সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। আমাদের সাথে থাকা মিলিটারি স্লিপিং ব্যাগগুলো অবশ্য এ ক্ষেত্রে বেশ কাজে এসেছিল। এগুলোর ভেতরে তুলা ভরা থাকায় বেশ গরম থাকত। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে এই ব্যাগগুলো যথেষ্ট ছিল।

ওপরে ওঠার প্রথম বা দ্বিতীয় রাতের কথা। ২৪শে রমযানের রাত ছিল সেটি। আমি (বইয়ের লেখক শায়খ আবু খুবাইব সুদানী) রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিলাম। গভীর রাতে হঠাৎই একটি বিমান থেকে বোমা হামলা করা হয়। বোমা গিয়ে আঘাত করে ঠিক সে পরিখাতে, যেখানে শায়খ উসামা একদিন আগেই অবস্থান নিয়েছিলেন, বিচ্ছুর স্বপ্ন দেখে যেখান থেকে তিনি ওপরে চলে এসেছিলেন। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে আশপাশ কেঁপে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা দেখতে পারি, শায়খ উসামা যে পরিখায় ছিলেন, সে পরিখাটি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শায়খ উসামা, শায়খ আইমান ও শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস নিরাপদে থাকায় আমরা সবাই আল্লাহর অনেক শুকরিয়া করি। কিন্তু একটি দুঃখের সংবাদও ছিল। ওই রাতে ওই পরিখাতেই উসামা আদনী (জাম্বিয়াকো) নামের এক ইয়েমেনি ভাই ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি বোমা হামলায় শহীদ হয়েছেন। অবাক করা ব্যাপার হলো, বিধ্বস্ত পরিখা থেকে প্রায় ৫/৬ ঘণ্টার পায়ে হাঁটা দূরত্বে এক জায়গায় কিছু আলজেরিয়ান ভাই অবস্থান করছিলেন। শাহাদাতবরণকারী ইয়েমেনি ভাইটি তাদের সাথেই ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত, তাঁর শাহাদাত লেখা ছিল এই পরিখাতে। এখানে থাকা ইয়েমেনি ভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি ৫/৬ ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে এই পরিখার কাছে চলে আসেন এবং পরিখাতেই বোমার আঘাতে শাহাদাতবরণ করেন। অন্য ভাইদের পরিখাগুলো দূরে হওয়ায় সে রাতের হামলায় তাদের কিছু হয়নি, শুধু এই ইয়েমেনি ভাইটি শহীদ হয়ে যান।



শায়খ উসামা বিন লাদেন ও শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী তোরাবোরার পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন




তোরাবোরা পাহাড়ে শায়খ উসামা রহ. ভাইদের সামনে শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ-এর ফযীলত নিয়ে আলোচনা করছেন

রমযানের শেষদিকে শায়খ উসামা ভাইদের সাথে পরামর্শ করে তোরাবোরা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ ছিল ভাইদের রক্ষা করা। একে তো তীব্র বোমা হামলা হচ্ছিল, তার ওপর খাবার ও গোলাবারুদও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তোরাবোরার সবগুলো প্রবেশপথে মুনাফিক দালাল বাহিনী সৈন্য মোতায়েন করে পুরো পার্বত্য অঞ্চল অবরোধ করে রেখেছিল। এতে নতুন করে খাবার, পানি ও গোলাবারুদ আনাও সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে স্থানীয় কিছু লোকের সাথে কথা বলে ভাইদেরকে আফগান সীমান্ত পার

করে পাকিস্তানে পৌঁছে দেওয়ার চুক্তি করা হয়। শায়খ উসামা রহ. ইবনে শায়খ লীবীকে তোরাবোরা থেকে সরে যাওয়ার পুরো বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। শায়খ উসামার দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে আরও কিছু ভাইকে প্রথমে তোরাবোরা থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৩১ জনের এই দলটিই প্রথম তোরাবোরা ত্যাগ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার চুক্তি যাদের সাথে হয়েছিল, তারা প্রতারণা করে বসে। কথা ছিল, ভাইদেরকে তারা পাকিস্তানের সুন্নীপ্রধান এলাকা ওয়াজিরিস্তানে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা ভাইদেরকে 'পারাচিনার' এলাকার এক শিয়াপ্রধান অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেখানকার বাসিন্দারা প্রথম প্রথম খুব মেহমানদারি করে, খাতির-তোয়াজ করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভাইদেরকে তারা পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

অন্যদিকে শায়খ উসামা, শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী, শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস, শায়খ আবু বাসীর নাসির উহাইশী, প্রিয় ভাই হামযা গামেদী এবং শায়খ উসামার দুই ছেলে উসমান ও মুহাম্মাদ তখনও তোরাবোরায় অবস্থান করছিলেন। তারা দুই দলে ভাগ হয়ে নিরাপদেই বিপজ্জনক অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

শায়খ উসামাকে অবরোধ ভেঙে বের করে আনার গুরুদায়িত্বটি যিনি পালন করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল নুর মুহাম্মাদ রহ.।[৩৮] তিনি স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন। তোরাবোরার চারপাশে যে সেনা অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল, তার একটি অংশে তিনি ও তাঁর লোকেরা পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মুজাহিদদের প্রতি মুহাব্বত আর কাফেরদের প্রতি ঘৃণার তাগিদেই তিনি একদিন শায়খ উসামার সাথে দেখা করার জন্য পাহাড়ে উঠে নিজেকে শায়খের খেদমতে পেশ করেন। তিনি শায়খকে ওয়াদা দেন যে, তিনি শায়খের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না। নুর মুহাম্মাদ রহ. তাঁর সে ওয়াদা রক্ষা করেছিলেন। তিনিই শায়খকে অবরোধ ভেঙে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনেন এবং মুয়াল্লিম আউয়াল গুল রহ.-এর হাতে সোপর্দ করেন। মুয়াল্লিম আউয়াল গুল রহ. অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই শায়খকে জালালাবাদ থেকে বের করে নিয়ে আসেন।

এখানে বিশেষভাবে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। জালালাবাদ শহর পতনের আগে শায়খ উসামা রহ. ও তাঁর সফরসঙ্গীরা মাঝে মধ্যেই মুয়াল্লিম আউয়াল গুল রহ.-এর বাড়িতে গিয়ে উঠতেন। সেখানে দিনকয়েক অবস্থানও করতেন। আউয়াল গুল রহ. জালালাবাদের ট্যাংক ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন। জালালাবাদের পতনের পর তিনি শায়খ উসামার সাথে যোগাযোগ করেন। শায়খ তখন তোরাবোরায় অবস্থান করছিলেন। আউয়াল গুল রহ. শায়খকে জানান,

[৩৮] শায়খ উসামাকে তোরাবোরা থেকে বের হতে সহযোগিতা করায় পেশোয়ারে তাঁকে হত্যা করা হয়।

নর্দার্ন অ্যালায়েন্স তাঁকে জালালাবাদের ট্যাংক ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে বহাল রাখতে চায়। এ পদে থাকলে তিনি তাদের ভেতরের সব খবর শায়খকে পৌঁছাতে পারবেন। এখন শায়খ যা বলেন, সেটাই তিনি করবেন। তাদের এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হবেন না-কি পাকিস্তানে চলে যাবেন? তখন শায়খ রহ. তাঁকে জালালাবাদেই থাকতে বলেন, তবে যথাসম্ভব নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকতে বলেন। বাস্তবেও মুয়াল্লিম আউয়াল গুল রহ. জালালাবাদের সব খবরাখবর শায়খ উসামার কাছে পাঠাতেন।

শায়খ আবু বাসীর আমাকে বলেছেন, তোরাবোরা থেকে নামার পর শায়খ উসামাকে আউয়াল গুল রহ. রিসিভ করেন এবং নিজ গাড়িতে করে প্রায় ত্রিশটির মতো চেক পয়েন্ট কোনো ধরনের তল্লাশি ছাড়াই পার করিয়ে দেন। শায়খ উসামা রহ. গাড়িতে বসে এই আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করছিলেন—

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

‘পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে ভূমিজ সেই সব উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে জন্মাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে, এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন কোনো এক দিনে বা রাতে তাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে (এই মর্মে যে, তার ওপর কোন দুর্যোগ আপতিত হোক) এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। যে-সকল লোক চিন্তা করে, তাদের জন্য এভাবেই নিদর্শনাবলি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি।’ [সূরা ইউনুস (১০) : ২৪]

কড়া পাহারার মধ্যেও কোনো চেকপোস্টে একবারের জন্যও গাড়ি থামাতে হয়নি। শায়খ উসামার সাথে থাকা আফগান ভাইয়েরা স্বচক্ষে দেখেও যেন এটি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারা একে আল্লাহর ওলীর কারামাত বলে ধরে নিয়েছিলেন।

মার্কিনিদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর তারা বুঝতে পারে, মুয়াল্লিম আউয়াল গুলই শায়খ উসামাকে তোরাবোরা থেকে বের করে নিয়ে গেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরে তাঁকে গ্রেফতার করে গুয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শায়খ উসামা রহ. তোরাবোরার অবরোধ ভেঙে বের হওয়ায় মার্কিনিদের মনোবল বিশাল ধাক্কা খায়। শায়খ তাদের হাতের নাগালেই ছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, আর ঘণ্টাখানেক

পরেই শায়খকে গ্রেফতার করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাদের এই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। শায়খকে ধরার এত সুন্দর একটি সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তারা মুণ্ডপাত করছিল আর পুরো দোষ অপারেশনের কমান্ডিং অফিসারকে দিচ্ছিল। তার কাপুরুষতার কারণেই মার্কিন বাহিনীকে সে অপারেশনে না নামিয়ে হাজী দীন মুহাম্মাদ, হাজী যামান ও হযরত আলীর নেতৃত্বাধীন মুনাফিক বাহিনীকে অপারেশনে নামিয়েছিল। আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করুন।

উল্লেখ্য, তোরাবোরার অবরোধ চলাকালে শায়খ উসামা রহ. হাজী দীন মুহাম্মাদের কাছে আবেগঘন ভাষায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি তার অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, কিছুদিন আগেও যে-ব্যক্তি নাস্তিক রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করল, সে এখন কীভাবে ক্রুসেডারদের সাথে মিলে তার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে? চিঠিতে একটি কথা ছিল এমন—'আপনার বাবা আপনার নাম 'দীন-ই-মুহাম্মাদ' রেখেছেন, 'দীন-ই-বুশ' রাখেননি।'

আল্লাহ তাআলা শায়খ উসামাকে উত্তম জাযা দান করুন। মূল্যবান এই নসীহতের মাধ্যমে তিনি তাঁর দায়িত্ব আদায় করেছেন। যদি তিনি জীবিত কাউকে এই নসীহত করতেন, সে হয়তো সাড়া দিত, কিন্তু যাকে তিনি নসীহত করছিলেন, সে তো জীবিতই ছিল না, তার অন্তর মরে গিয়েছিল।

২০০৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি শায়খ উসামা রহ. ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে 'বাশাইর ওয়া তাযকীর ওয়া তাহরীদ ওয়া মুআযারাহ' শিরোনামে একটি বার্তা দেন। এ বার্তায় তিনি তোরাবোরা যুদ্ধের কিছু স্মৃতিচারণ করেছিলেন। শায়খ রহ. বলেছিলেন—

> 'তোরাবোরার মহান সে যুদ্ধে বৈশ্বিক কুফরি জোটের ওপর ঈমানের বিজয় হয়েছিল। এ বিজয় এসেছিল আদর্শের ওপর অবিচলতার মাধ্যমে। আপনাদের সামনে সে মহান যুদ্ধের কিছু স্মৃতিচারণ করছি। এতে আপনারা দুটি বিষয় বুঝতে পারবেন। একটি হলো কাফেরদের ভিরুতা, আরেকটি হলো তাদের শক্তি ক্ষয় করার ক্ষেত্রে পরিখার কার্যকারিতা।
>
> তোরাবোরার যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৩০০ জন। বোমা হামলা থেকে বাঁচতে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে প্রায় এক বর্গমাইলের মতো পরিখা খনন করেছিলাম। পরিখাগুলো এতটুকু বড় ছিল যে, তাতে একসাথে তিনজন অবস্থান করা যেত। ১৪২২ হিজরীর ২০শে রজব মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর যখন মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে, তখন থেকেই তোরাবোরাতে টার্গেট বোম্বিং শুরু

হয়েছিল। রমযানের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাঝে মধ্যে বিরতি নিয়ে বোমাবর্ষণ চলতে থাকে। ২৭শে রমযান থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়। কারণ, তখন মার্কিন বাহিনী নিশ্চিত হতে পেরেছিল, তোরাবোরাতে আমি অধম (শায়খ উসামা রহ.), প্রিয় মুজাহিদ ভাই ড. আইমান আয-যাওয়াহিরী-সহ আল-কায়েদার নেতারা অবস্থান করছে। বিরতিহীনভাবে এই হামলা চলতে থাকে। দিনে রাতে এমন একটি সেকেন্ডও আমরা পাচ্ছিলাম না, যখন মাথার ওপরে মার্কিন বোমারু বিমানের আওয়াজ শোনা যেত না। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুম খালি করে জোটবদ্ধ সব বাহিনীকে সাথে নিয়ে তারা যেন ছোট্ট সেই জায়গাটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে মাঠে নেমেছিল। আফগানিস্তানের মিশন শেষ হওয়ার পর সব মার্কিন যুদ্ধবিমান যেন তোরাবোরায় চলে এসেছিল আর আমাদের ওপর জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেলে দিচ্ছিল। স্মার্ট বোমা, ক্লাস্টার বোমা, বাংকার বাস্টার-সহ হাজার হাজার টনের বোমা তারা আমাদের ওপর ফেলছিল। B-52-এর মতো বোম্বারগুলো একেকটা দুই ঘণ্টা করে মাথার ওপর চক্কর দিত আর প্রতিবারে ২০ থেকে ৩০টি বোমা ফেলত। আর লকহিড C-130 বিমানগুলো রাতের বেলা কার্পেট বোম্বিং করত।

ছোট্ট এই জায়গাটিকে চারপাশ থেকে ঘেরাও করে এভাবেই নজিরবিহীন ভয়াবহ বোমা হামলা করা হচ্ছিল। সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল ব্যাপক মিডিয়া প্রোপাগান্ডা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল দালাল আফগান বাহিনীর স্থল অভিযান। আফগান বাহিনীর সাথে লাগাতার ১৫ দিনের মতো আমাদের লড়াই হয়েছে। আমরা প্রতিদিনই তাদের হামলা প্রতিহত করতাম, তীব্র প্রতিরোধের মুখে তাদের মধ্যেই হতাহত বেশি হতো। প্রতিদিনই তারা পরাজিত হয়ে নিজেদের লোকদের লাশ নিয়ে ফিরে যেত। তারপরেও মার্কিনিরা আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামার সাহস করেনি। তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার পক্ষে এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? তারা তাদের সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তার যে গালগল্প প্রচার করে, তা যে নির্জলা মিথ্যা—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের সারসংক্ষেপ হলো, বৈশ্বিক শয়তানী জোট নিজেদের বিপুল সেনাবাহিনী নিয়েও মাইনাস ১০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় টিকে থাকা মাত্র ৩০০ জন মুজাহিদের ছোট্ট একটি দলের হাতে এক বর্গমাইল পরিখার মধ্যে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধের ফলে আমাদের হতাহতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬%, আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন। আর পরিখার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার পরেও নিহত হয়েছেন, এমন মুজাহিদের পরিমাণ মাত্র ২%।

বৈশ্বিক কুফরি জোট নিজেদের সব শক্তি নিয়েও যদি এক বর্গমাইল এলাকায় আশ্রয় নেওয়া একেবারেই নগণ্য অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করা সামান্য কিছু মুজাহিদকে পরাজিত করতে না পারে, তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর তারা কীভাবে জয়ী হবে? যদি মুসলিমরা দীনের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা কিছুতেই জয়ী হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।'



তোরাবোরা পর্বতমালার ওপর বোমা হামলার চিত্র

## বীরপুরুষের তীর্থভূমি

তোরাবোরা যুদ্ধ আমাদের সামনে বীরপুরুষদের সুবিশাল এক খনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এ সময় এমন অনেকের সাথে আমরা ওঠাবসা করেছি, যাদের সাথে ইতঃপূর্বে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক বা পরিচয় আমাদের ছিল না। কতইনা উত্তম ছিলেন তাঁরা। আমরা তাঁদের দেশে, তাঁদের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তাঁরা আমাদের জন্য বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন। অথচ তাঁরা জানতেন, আমরা যেখানেই যাব, আমাদের পেছন পেছন আমেরিকার যুদ্ধবিমান, বোমা ও মিসাইলও ছুটে আসবে। সবকিছু জেনেও তাঁরা আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন, আমাদের কারণে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের পর্যন্ত কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এক মিরাজুদ্দীন ভাইয়ের কথাই চিন্তা করি। তিনি সবকিছু উজাড় করে দিয়ে আমাদের খেদমত করেছেন, তার যা ছিল, তা-ই আমাদের সামনে হাজির করেছেন। মুনাফিক এজেন্টদের মাধ্যমে ক্রুসেডাররা তাঁকে তাদের সাথে কাজ করার অফারও দিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দুনিয়ার সামান্য লাভের আশায় তিনি দীন বিক্রি করতে

রাজি হননি। শুধু এ কারণেই নরাধম কাফেররা তার বাড়িতে বোমা হামলা করে তার পরিবারের ১৭ জন সদস্যকে হত্যা করেছিল। শুধু তাঁর বৃদ্ধা মা বেঁচে গিয়েছিলেন। আমরা যখন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম, তখন আমাদেরই অনেক ভাই নিজেদের ধরে রাখতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন; অথচ আল্লাহর এই বান্দি আমাদের বলছিলেন—'আমার পরিবারের সদস্যরা শহীদ হয়েছেন, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। শায়খ উসামা ভালো আছেন এতেই আমি খুশি।'

শায়খ উসামা যখন তোরাবোরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন, তখন পাহাড়ের নিচে মিরাজুদ্দীন ভাই শায়খের সাথে দেখা করেন। শায়খ উসামা তোরাবোরা থেকে চলে যাচ্ছেন শুনে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন আর বলতে থাকেন—'আরবরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আফগানদের জন্য এরচেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে!' আল্লাহর কাছে দোয়া করি, মিরাজুদ্দীন ভাই বেঁচে থাকলে, আল্লাহ যেন তাঁকে নিরাপত্তার চাদরে জড়িয়ে নেন আর মৃত্যুবরণ করে থাকলে, তাঁকে যেন জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে নেন।

এক বয়স্ক মুরুব্বির কথা মনে পড়ছে। তিনি মাঝে মধ্যেই হাদিয়া দেওয়ার জন্য আখরোটের বস্তা নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে আসতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম জাযা দিন। আরেকটি ঘটনা এখনো মনের মধ্যে গেঁথে আছে। একবার শায়খ উসামা রমযানের শেষদিকে সেখানকার ছোট্ট একটি গ্রামে এক আফগানের বাড়িতে আশ্রয় নেন। শায়খ যখন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন বাড়ির মালিক শায়খের কাছে অদ্ভূত এক আবদার করে বসে। তিনি শায়খকে বলেন, শায়খ যেন তাঁকে একটি কাগজে লিখে দেন যে, তিনি তার বাড়িতে উঠেছিলেন। কাগজের এই টুকরোটি তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের দেখিয়ে গর্ব করে বলবেন, শায়খ উসামা বিন লাদেন একদিন তাঁর বাড়িতে উঠেছিলেন। শায়খ রহ. লোকটিকে নিরাশ করেননি। তাঁর মেহমানদারির জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শায়খ রহ. তাকে একটি কৃতজ্ঞতাপত্র লিখে দেন।

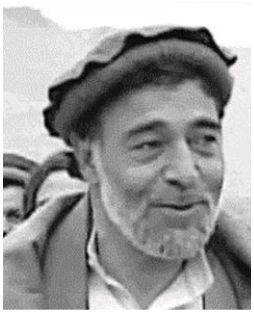
স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী এই ভালো মানুষদের পাশাপাশি এমন কিছু মানুষের দেখাও আমরা পেয়েছি, যারা দুনিয়ার লোভে নিজেদের দীন-ঈমান এবং মুসলিম ভাইদের নিলামে তুলে কুফর ও রিদ্দাহয় লিপ্ত হয়েছে। হাজী দীন মুহাম্মাদ, হযরত আলী ও হাজী যামানের মতো এমন অনেককে দেখেছি, যারা একসময় ইসলামের ঝান্ডাতলে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে, সময়ের বিবর্তনে তারাই আবার ক্রুশের পতাকাতলে নিজের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

'অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে দেবে।' [সহীহ মুসলিম : ১১৮]

এ সকল লোকেরাও এমন ভয়াবহ ফিতনাতেই পতিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিরাপত্তা ও অবিচলতা দান করুন।


হযরত আলী


হাজী যামান


হাজী দীন মুহাম্মাদ

## কিল্লা-ই-জঙ্গির যুদ্ধ[৩৯]

১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালেবান কাবুল জয় করার পর তালেবানবিরোধী সব দল মিলে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স গঠন করে। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সাথে তালেবানের কঠিন এক লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘ যুদ্ধ ও কুরবানীর পর নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের মূল ঘাঁটি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে তালেবানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর যখন মার্কিন হামলা শুরু হয়, তখন নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের অধীনে কেবল বাদাখশান ও পাঞ্জশির প্রদেশ ছিল।

২০০১-এর মধ্যভাগে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. ভিনদেশি মুজাহিদদের নিয়ে একটি ব্রিগেড গঠনের আদেশ দিয়েছিলেন। আরব, পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মুজাহিদদের নিয়ে এই ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের

[৩৯] এই পুরো বিবরণটি শায়খ আব্দুল হাদী ইরাকীর জবানবন্দি থেকে সংগৃহীত।

উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ কুন্দুয ও তাখারে মিলিটারি অপারেশন পরিচালনা করা। আমীরুল মুমিনীন রহ.-এর নির্দেশে উজবেক মুজাহিদদের কমান্ডার বিখ্যাত মুজাহিদ জুমা নামাঙ্গানিকে সেই ব্রিগেড পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডের নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রিগেড-২১ এবং একে তালেবানের মিলিটারি কমান্ড 'কোলো ওর্দু'-র সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

আমীরুল মুমিনীন রহ. এই প্রকল্প নিয়ে অনেক আশাবাদী ছিলেন। তিনি সম্ভাব্য সকল উপায়ে এর সহযোগিতাও করছিলেন। এই ব্রিগেডে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের সংখ্যা ১২০০-এরও বেশি ছিল, তাঁরা সবাই ছিলেন ভিনদেশি। ব্রিগেড পরিচালনার জন্য জুমা নামাঙ্গানি রহ. আরব, পাকিস্তান ও তুর্কিস্তানের প্রথম সারির নেতৃস্থানীয় ভাইদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের শুরুর দিকে মাযার-ই-শরীফের কাছেই এক জায়গায় মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বোমার আঘাতে কমান্ডার জুমা নামাঙ্গানি-সহ ব্রিগেডের ১২ জন আরব ও উজবেক কমান্ডার শহীদ হন।[৪০]

এর পরের ঘটনা আমরা শায়খ আব্দুল হাদী ইরাকী[৪১] (নাশওয়ান আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল বাকী) থেকে জানব। তাঁর কাছ থেকে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিবরণ শুনব, যে যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহস আর অবিচলতা দেখে পুরো বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল; যারা নিজেদের খুন দিয়ে এমন এক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যার বিবরণ তুলে ধরা কোনো কলমের পক্ষে সম্ভব না। আল্লাহ তাআলার এই কথাটিই তাদের অবস্থার যথাযথ বিবরণ তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

'মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোনো পরিবর্তনই করেনি।' [সূরা আহযাব (৩৩) : ২৩]

---

[৪০] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ

[৪১] শায়খ আব্দুল হাদী ইরাকী আল-কায়েদার অন্যতম একজন সামরিক ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন। শায়খ উসামা তাঁকে তানজীমের কাবুল অংশের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কাবুলে নিয়োজিত আরব মুজাহিদদের সামরিক কমান্ডারও ছিলেন। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হলে তিনি তানজীমের দায়িত্বশীলদের কাছে সশরীরে ইরাকযুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি চান। অনুমতি আসার আগ পর্যন্ত তিনি সবরের সাথে অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে অনুমতি পেয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। কিন্তু ইরাকে প্রবেশের আগেই ২০০৭ সালে তুরস্ক থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তুর্কি সরকার তাঁকে ইরাকের দখলদার মার্কিন বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে তাঁকে গুয়ান্তানামো কারাগারে পাঠানো হয়। আল্লাহর কাছে তাঁর এবং সকল বন্দিদের মুক্তি কামনা করি।

শায়খ আব্দুল হাদী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু বলেন—

'কিল্লা-ই-জঙ্গির যুদ্ধ বিস্মৃত এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধের শহীদদের আমরা ভুলে গিয়েছি, আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। অথচ কিল্লা-ই-জঙ্গির শহীদরা রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করেছেন, তবু মাথানত করতে রাজি হননি।

কিল্লা-ই-জঙ্গি ত্যাগ ও কুরবানীর এমন এক দাস্তানের নাম, যে দাস্তানের নায়কদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দুর্দমনীয় মনোবলের যথাযোগ্য শিরোনাম নির্বাচন করতে আমি অক্ষম। তাঁরা লাঞ্ছনার জীবনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়ে গেছেন। শত্রুরা আত্মমর্যাদাহীন মানুষদের লাঠির ভয় দেখিয়ে লাঞ্ছনার জীবনযাপন করতে বাধ্য করতে পারে, তারাও তুচ্ছ দুনিয়ার জীবনের স্বাদ নেওয়ার জন্য সে জীবনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু কিল্লা-ই-জঙ্গির মর্দে মুজাহিদরা সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে তৈরি।

আমি তাদের আমীর ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল, চূড়ান্ত যুদ্ধের সময়ই আমি তাঁদের থেকে দূরে ছিলাম। যার কপালে শাহাদাত লেখা নেই, তাকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের স্থান থেকে দূরে রাখেন—এই বাস্তবতা আমি আগেও কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছি। শাহাদাত সাধারণ কোনো বিষয় না, আল্লাহর বিশেষ পছন্দ ও নির্বাচনের বিষয়।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত বেশ কয়েক মাস আগেই নেওয়া হয়েছিল। সে মতে আমি মুজাহিদদের প্রথম দলটি নিয়ে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। উত্তরাঞ্চলের রণাঙ্গনে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন—এমন মুজাহিদদের বাছাই করে একটি ইউনিট গঠন করি। ইউনিটের প্রতিটি সদস্য ছিলেন ধৈর্যশীল, উত্তম হৃদয়ের অধিকারী ও যে-কোনো কুরবানীর জন্য সদাপ্রস্তুত। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সিংহপুরুষ। কেউ কারো থেকে কম নয়। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা আল্লাহর শত্রু আমেরিকা ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম ময়দানে বীরের মতো লড়াই করতে করতে পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

আমেরিকার ঔদ্ধত্য, ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহে চালানো আগ্রাসন এবং ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থন-সহ আমেরিকার সকল অপরাধের জবাব দেওয়ার জন্য মুজাহিদগণ ৯/১১-এর বরকতময় হামলা চালান। ৯/১১-এর পরেই আফগানিস্তানে মার্কিনিদের নেতৃত্বে নব্য ক্রুসেড শুরু হয়। মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই মাযার-ই-শরীফের ওপর তুমুল বিমান হামলা চালানো হচ্ছিল, যেন আব্দুর রশীদ দোস্তমের বাহিনী ও তার মিত্র হাজারা শিয়ারা শহর ও বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মার্কিন বাহিনীর বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করতে পারে। কারণ, তীব্র বিমান হামলা ও বোম্বিংয়ের পরেও

তখনও পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই তালেবান নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তালেবানের শক্তিশালী এই ঘাঁটিগুলো দখলে নেওয়ার জন্য স্থল অপারেশন ছাড়া মার্কিনিদের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। তালেবানের তীব্র প্রতিরোধের ফলে মার্কিনিদের মধ্যেও হতাশা ছড়িয়ে পড়ছিল, তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়। খোদ তালেবানযোদ্ধারা এবং তাদের সাথে থাকা অন্যান্য মুজাহিদরা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যায়।

আমীরুল মুমিনীনের আদেশ ছিল সুস্পষ্ট—'তোমরা অবিচল থাকো। একজন ব্যক্তিও বেঁচে থাকা পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখো। হায়াত-মওত বুশের হাতে না, সে যতই হুমকি-ধমকি দিক, যারা অবিচল থাকবে, তাদের সে কিছুই করতে পারবে না।'

হামলার তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছিল, মানুষের মনোবলও ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল। হামলার পরিধিও দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছিল। পুরো মাযার-ই-শরীফজুড়ে হামলা শুরু হয়ে তালেবানের মারকায ও শক্তির উৎস কান্দাহার এবং আমীরুল মুমিনীনের রাজধানীর আশপাশের গ্রামগুলোর ওপরেও হামলা ছড়িয়ে পড়ছিল। আমীরুল মুমিনীন ও শায়খ উসামা বিন লাদেনকে পাওয়া যেতে পারে—শুধু এই সন্দেহে তারা এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের পরিমাণও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে, হামলার তীব্রতার তুলনায় যুদ্ধফ্রন্টে থাকা মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম ছিল। মুজাহিদদের অবিচলতা দেখে অবশেষে মার্কিনিরা ৭-৮ টন ওজনের বোমা ব্যবহার করা শুরু করে, যেগুলো পারমাণবিক বোমা না হলেও সাধারণ বোমার মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এ সব ভারী বোমার বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তালেবান মুজাহিদদের মনোবল ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। তাই, কোনো পূর্বপরিকল্পনা ও পূর্বঘোষণা ছাড়াই মাযার-ই-শরীফ থেকে মুজাহিদরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারপর তাখার ফ্রন্ট থেকেও মুজাহিদদের পিছু হটার নির্দেশ জারি করা হয়। তাখার ফ্রন্ট ছিল আরব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরাই আমাদের গল্পের নায়ক।

আমু দরিয়ার তীর থেকে খাজা গার জেলার কেন্দ্রীয় শহর পর্যন্ত মুজাহিদ ব্রিগেডের[৪২] অবস্থান ছিল আর মূল ফ্রন্টলাইনটি ছিল সেখান থেকে তাখার পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে তালেবান মুজাহিদরা অবস্থান করছিলেন। ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনে পুনর্গঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলের সামরিক কমান্ডার মোল্লা ফযল হাফি. তাখার ফ্রন্টের অগ্রভাগ থেকে

[৪২] কয়েকমাস আগে আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশে ভিনদেশি মুজাহিদদের যে ব্রিগেডটি গঠন করা হয়েছিল, এটাই ছিল সেই ব্রিগেড। এতে ১২০০-এর বেশি মুজাহিদ ছিলেন।

সকলকে পিছু হটে কুন্দুযে ফিরে যেতে বলেছিলেন। তাখার প্রদেশের রাজধানী তালেকান থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে কুন্দুযের অবস্থান। বিশেষ করে মার্কিন ক্রুসেডারদের অনুগত নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের হাতে মাযার-ই-শরীফ, সামাঙ্গান, পুল-ই-খুমরি ও বামিয়ান শহরের পতনের ফলে পুরো উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তালেবানের সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এতে তালেবান শিবিরে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল। যদিও আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বারবার অবিচল থেকে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছিল। সে সময় আমীরুল মুমিনীনের প্রসিদ্ধ এই কথাটি খুব বেশি প্রচার করা হতো—زندگی بہ غیرت یا مرگ بہ شہادت (হয়তো ইজ্জতের জীবন, নয়তো শাহাদাতের মওত।)

শুরুতে মনোবল বেশ চাঙ্গা থাকায় ব্রিগেডের ভাইয়েরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত মানতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, দু'দিন ধরে তারা শত্রুপক্ষের সবগুলো হামলা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। সর্বশেষ হামলা প্রতিরোধ করতে দীর্ঘ ১২ ঘন্টা ব্যয় হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে শত্রুপক্ষ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারেনি; অথচ তারা ভারী কামান থেকে অনবরত বোমাবর্ষণ করছিল এবং আকাশপথে ক্রুসেডার আমেরিকার যুদ্ধবিমান থেকেও সাহায্য পাচ্ছিল। তালেবানের অন্যসব ইউনিট যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার প্রায় একদিন পর তালেবান নেতারা ভাইদের পিছু হটার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হন। তা সত্ত্বেও ২৫ জন আরব ভাইয়ের একটি দল পিছু হটতে রাজি ছিলেন না, তাদের রাজি করাতে আরও একদিনের মতো কেটে যায়। এভাবে সব ইউনিট চলে যাওয়ার দুইদিন পর যখন তাঁরা পশ্চাদপসরণ করতে রাজি হন, ততক্ষণে শত্রুরা তাঁদের ঘেরাও করে ফেলেছিল, তবে তাঁদের অবস্থান অবধি তখনও পৌঁছাতে পারেনি।

পিছু হটার জন্য খাজা গার থেকে দাশত-ই-আরচি ও কুন্দুয পর্যন্ত যে রুটটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা ছিল একেবারে উন্মুক্ত, গাছপালাবিহীন, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। পুরো পথে কোথাও কোনো গাড়ি নজরে পড়লেই বিমান থেকে বোমা ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ভাইয়েরা নিরাপদেই এই রাস্তা পার হয়ে যান। কারো তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

ভাইদের এই বাহিনী যখন কুন্দুয শহরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায়, ততক্ষণে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স পুরো কুন্দুয শহরকে ঘিরে ফেলেছে। শহরের একদিকে মাযার-ই-শরীফ থেকে আগত দোস্তম ও তার হাজারা বাহিনী ছিল, অন্যদিকে শূরা-ই- নাযার বাহিনী (শূরা-ই-নাযারের প্রধান নেতা আহমাদ শাহ মাসউদকে এ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে হত্যা করা

হয়েছিল) অবস্থান করছিল। দলদুটি নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রত্যেকেই অন্যের আগে শহরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিল। কারণ, শহরে যে আগে প্রবেশ করবে, শহরের ধনভান্ডারের পাশাপাশি পুরস্কারও তার কপালেই জুটবে। দোস্তমের বাহিনী ছিল মার্কিন মদদপুষ্ট আর শূরা-ই-নাযার ছিল রাশিয়া ও ইরানের আশীর্বাদধন্য। তবে এই অভিযানে মার্কিন বিমানবাহিনী উভয়পক্ষকেই সহায়তা করছিল।

একপর্যায়ে দোস্তম শান্তিপূর্ণভাবে কুন্দুযে প্রবেশের জন্য তালেবানের সাথে আলোচনায় বসে এবং তালেবানকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয়। বিনিময়ে ঘোষণা দেয়, তালেবানযোদ্ধাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। তালেবানের সামনেও শহর থেকে বের হয়ে যাওয়া বা আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ, মার্কিনিরা সামরিক-বেসামরিকের কোনো বাছবিচার না করেই গণহারে বোমাবর্ষণ করছিল। যে-কোনো সময় শহরেও বোমা হামলা শুরু হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই শহরের বাসিন্দাদের পক্ষ থেকেও তালেবানের ওপর অনেক চাপ ছিল। সাধারণ নাগরিকরাও চাচ্ছিল, তালেবান যেন বের হয়ে যায় বা আত্মসমর্পণ করে, এতে মার্কিনিদের বোমা হামলা থেকে শহরটা বাঁচবে। অন্যদিকে দোস্তমও নানা ধরনের ছাড় ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তালেবানকে আত্মসমর্পণ করতে বারবার তাগাদা দিচ্ছিল। মূলত সে চাচ্ছিল, যেভাবেই হোক তার প্রতিদ্বন্দ্বী শূরা-ই-নাযারের কমান্ডার মুহাম্মাদ ফাহিমের আগেই কুন্দুযের দখল নিয়ে কুন্দুযে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। এতে মনিব আমেরিকার কাছে তার অবস্থান শক্তিশালী হবে, মানমর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

তালেবানের সাথে দোস্তমের কী আলোচনা হয়েছিল—তা আমরা জানতে পারিনি। তবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত এলো[৪৩], ভিনদেশি মুজাহিদদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথমে তারাই কুন্দুয থেকে বের হয়ে মাযার-ই-শরীফ চলে যাবে। তারপর অবশিষ্ট

[৪৩] এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ওয়ালীদ আলহাজ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বইয়ে লিখেছেন, দোস্তম কুন্দুযে থাকা তালেবান মুজাহিদদের নিরাপদে সরে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়েছিল। তবে সে শর্ত দিয়েছিল, কুন্দুযে যে-সকল আরব মুজাহিদ আছে, তাদেরকে কুন্দুযেই রেখে যেতে হবে। কিন্তু তালেবান মুজাহিদগণ আরবদের এভাবে রেখে যেতে চাচ্ছিলেন না। তাই তারা দোস্তমের শর্ত বাহ্যিকভাবে মেনে নেন, কিন্তু গোপনে পরিকল্পনা করেন যে, আরব মুজাহিদদেরকেও আফগান মুজাহিদদের সাথে কুন্দুয থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ জন্য তারা আরব মুজাহিদদেরকে আফগানি পোশাক পরিয়ে প্রথম কাফেলাতেই কুন্দুয থেকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই কাফেলার এক গাইড বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে এবং দোস্তমের বাহিনীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয় যে, কাফেলায় আরবরাও আছে। তার সংবাদের ভিত্তিতেই মাযার-ই-শরীফের সামনে দোস্তমের বাহিনী কাফেলাকে ঘেরাও করে এবং গ্রেফতার করে কিল্লা-ই-জঙ্গিতে নিয়ে যায়। [সম্পাদক]

তালেবানযোদ্ধারা দোস্তমের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক দোস্তমের সৈন্যরা কয়েকটি ট্রাকে ৩৫০ জন বিদেশি মুজাহিদকে নিয়ে কুন্দুয থেকে মাযার-ই-শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৫৪ জন ছিলেন আরব, ১০০ জন উজবেক ও তাজিক আর বাকিরা পাকিস্তানি মুজাহিদ এবং কয়েকজন তালেবান। ট্রাকের সাথে দোস্তমের বাহিনীর ৪টি ছোট গাড়িও ছিল। মুজাহিদদের নিরাপত্তা ও পথ দেখানোর জন্য কমান্ডার নাসির খারাবি পশতুনির দলের কিছু লোকও ছিল।

পথিমধ্যে কেউ ট্রাকগুলোর গতিরোধ করেনি। গাড়িবহরটি যখন মাযার-ই-শরীফের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন রাত প্রায় শেষ। এ সময় ড্রাইভিং সিটে থাকা গাইড গাড়ির গতি কমাতে শুরু করে। একপর্যায়ে গাড়ি পুরোপুরি থামিয়ে সে বলে, 'আমাদের গন্তব্য হলো বলখ শহর। আর বলখ যাওয়ার দুটি পথ রয়েছে; একটি দীর্ঘ পথ, যা মাযার-ই-শরীফের পাশ দিয়ে গেছে; অপরটি ছোট, সেটা শহরের মধ্য দিয়ে গেছে। শহরের মধ্যখান দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে, এ রাস্তাটি বিপজ্জনক। কারণ, সেখানে হাজারা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে। তারা আমাদের কথা মানবে না। আমাদের ভয় হচ্ছে, তারা আপনাদের ওপর হামলা করতে পারে। ফলে সেখানে ঝামেলা সৃষ্টি হবে। আবার দীর্ঘ পথটিও বিপজ্জনক। কারণ, দিনের বেলা এ রাস্তায় দোস্তমের গুপ্তচরদের আনাগোনা থাকে। আমরা দোস্তমের অজান্তেই আপনাদের বলখ পৌঁছে দিতে চাই। তাদের সামনে পড়লে তারা আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই, শহরের রাস্তাটি নিরাপদ কি না দেখার জন্য আমরা একটি গাড়ি পাঠাব। সেটি ফিরে এলে কাফেলা আবারও চলা শুরু করবে।'[৪৪]

এ কথা বলে প্রথম গাড়িটি দ্রুতগতিতে শহরের দিকে চলে গেল। প্রথম গাড়িটি ফিরতে দেরি করছে বলে এর একঘণ্টা পর দ্বিতীয় গাড়িটিও চলে গেল। সূর্য ওঠার পর তৃতীয় গাড়িটিও আমাদের রেখে চলে গেল। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নাম করে শেষমেশ চতুর্থ গাড়িটিও চলে গেল। ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বাড়তে লাগল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারা একদম সমতল একটি জায়গায় আছেন, আশেপাশে কোনো পাহাড়, টিলা বা উঁচু কোনো জায়গা নেই। হঠাৎ তারা সাঁজোয়া যানের শব্দ শুনতে পেলেন। কাফেলার অগ্রভাগে যারা ছিলেন, তারা ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই কিছু সাঁজোয়া এগিয়ে

[৪৪] এই গাইড তালেবানের পক্ষের লোক হলেও গাদ্দারি করেছিল। তাই আরবদেরকে প্রথমে এ কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, যেহেতু দোস্তম কাফেলায় আরবদের থাকার বিষয়টি জানে না, তাই সে চেষ্টা করছে দোস্তমের অজান্তেই আরবদেরকে বলখ পৌঁছিয়ে দিতে। কিন্তু বাস্তবে সে দোস্তমের সাথে হাত মিলিয়ে আরবদেরকে তার হাতে তুলে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছিল। (ওয়ালীদ আলহাজের স্মৃতিচারণমূলক বই থেকে সংগৃহীত) [সম্পাদক]

আসছে। কিন্তু সেগুলো সরাসরি তাদের দিকে আসছে না; বরং কিছু যাচ্ছে ডানদিকে আর কিছু বামদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দায়িত্বশীল ভাইয়েরা তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করে একটি বৃত্তাকার ডিফেন্স লাইন তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। সামনে আরব ভাইয়েরা, দুই পাশে উজবেক এবং পেছনে পাকিস্তানি ভাইয়েরা অবস্থান নিলেন। তড়িৎগতিতে সবাই ভাগ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করলেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে ভাইদের অনেক উপকারে এসেছিল। তখনও পর্যন্ত তাদের থেকে অস্ত্র জমা নেওয়া হয়নি। তাই প্রত্যেকের কাছেই অস্ত্র ছিল। ততক্ষণে শত্রুবাহিনী এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলেছে। ভাইয়েরাও যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য নিজ নিজ অস্ত্র লোড করে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

যে চারটি গাড়ি রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ সেগুলোর একটিকে ভাইদের দিকে আসতে দেখা গেল। ভাইয়েরা গাড়িটিকে কাছে আসতে দিলেন। গাড়ি থেকে এক কমান্ডার তড়িঘড়ি করে নেমে ভাইদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট ছিল তার। সে এসে ভাইদের এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল যে, সবকিছু ঠিক আছে। শুধু সামান্য একটি সমস্যা হয়েছে—জেনারেল দোস্তম বিষয়টি জেনে গেছে। সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সে সবাইকে তার ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে বলেছে। এর বিনিময়ে ভাইদের শুধু অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই ভাইয়েরা এ কথা শুনে একটু ধাক্কা খেলেন। এটা কীভাবে সম্ভব? এখনো পর্যন্ত মুনাফিকরা তাদের কাছে আসতে পারেনি। ভাইয়েরা এই মুনাফিকদের ভয়ংকর সব আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, আমেরিকান ক্রুসেডাররা বোমা হামলা করে তাদের সাহায্য করেছে, তবু তারা মুজাহিদদের কাছে ভিড়তে পারেনি। এখন অস্ত্রসমর্পণ করে নিজেদেরকেই তাদের হাতে তুলে দেবেন? যখন সে আফগান গাইড দেখল, ভাইয়েরা কিছুতেই অস্ত্রসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছে না, তখন সে ভাইদের বলল, তাঁরা যেন কুন্দুযে অবস্থানরত মোল্লা ফযলের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর সাথে পরামর্শ করেন। ভাইয়েরা সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। গাইডের কথামতো তাঁরা কুন্দুযে মোল্লা ফযলের[৪৫] সাথে যোগাযোগ করেন।

[৪৫] তিনি ইমারতে ইসলামিয়্যাহর ডেপুটি চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। গুয়ান্তানামোর প্রথমদিকের বন্দি ছিলেন তিনি। ২০১৪-এর জুনে মার্কিন সৈনিক বো বার্গডালের বিনিময়ে আমেরিকা তাঁকে-সহ চারজন নেতৃস্থানীয় তালেবান নেতাকে মুক্তি দেয়। তিনি দোহা চুক্তিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন দখলদারদের বহিষ্কারের পর ইমারতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।



মোল্লা মুহাম্মাদ ফযল হাফিযাহুল্লাহ

মোল্লা ফযল তাঁদেরকে গাইডের কথা মেনে অস্ত্রসমর্পণ করতে বলেন। এতে কুন্দুযে অবস্থানরত বাকি তালেবান মুজাহিদদের জীবন রক্ষা পাবে। তিনি তাঁদের বলেন, 'আমরা এখনো আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করিনি। আপনাদের কারণে যদি কোনো ঝামেলা হয়, তাহলে তারা আমাদের ওপর বোমা হামলা করতে দ্বিধা করবে না। আমীরের আদেশ মানা আপনাদের জন্য জরুরি। আমীরুল মুমিনীনের আদেশ হলো, যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক মুজাহিদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। তাঁর আদেশ পালনের জন্যই আমি আপনাদের অস্ত্রসমর্পণের আদেশ দিচ্ছি।' তা ছাড়া তখন শত্রুবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, তাই ঝুঁকিও বেশি ছিল। সবকিছু বিবেচনা করে মোল্লা ফযল তাঁদেরকে গাইডের কথা মেনে নিতে বলছিলেন। তারপরেও ভাইয়েরা দ্বিধা করছেন দেখে মোল্লা ফযল মোল্লা যাকির আব্দুল কাইয়ুমকে ডেকে ভাইদের সাথে কথা বলতে বলেন। মোল্লা যাকির ছিলেন খাজা গার ও দাশত-ই-আরচিতে আমাদের অপারেশনাল সেক্টরের আমীর।

তাঁর আবেদনের ফলে ভাইয়েরা অস্ত্রসমর্পণ করতে রাজি হন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে শুধু বড় ও দৃশ্যমান অস্ত্রগুলো জমা দিতে সম্মত হন এবং গ্রেনেড, পিস্তল ও ছুরির মতো ছোট অস্ত্রগুলো জামার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। অনেকটা অসন্তুষ্টি আর বিস্ময় নিয়েই তারা নিজেদের অস্ত্র মাটিতে রাখেন। অস্ত্রসমর্পণ শেষ হলে গাইড শত্রুবাহিনীর একটি অংশকে অস্ত্রগুলো গ্রহণ করতে বলে। সে ভাইদেরকে সব ধরনের অস্ত্র জমা দিতে বললে ভাইয়েরা বলেন, তাদের সাথে আর কোনো অস্ত্র নেই। তাঁদের এই জেদের সামনে হার মেনে সে-ও জোরাজুরি করা বাদ দেয় এবং মাযার-ই-শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা করার জন্য সবাইকে গাড়িতে উঠতে বলে।

কনভয়ের সামনের গাড়িতে একজন গাইড-সহ চারজন আহত মুজাহিদ ছিলেন। আহতদের মধ্যে আবু নাসের আবয়ানী[৪৬] ও উসামা হাযরামীও ছিলেন। তাঁরা বেশ কিছুদিন আগে এক বোমা হামলায় আহত হয়েছিলেন। এই গাড়িটি দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করে এবং কাফেলাকে ছাড়িয়ে অনেক আগে চলে যায়। শহরের প্রধান ফটকে পৌঁছালে শিয়া ওয়াহদাত পার্টির সদস্যরা গাড়িটিকে থামায়। গাড়িতে আরব আছে জেনে তারা গাইডকে গাড়ি থেকে নামতে বলে। সে তাদেরকে বারবার এই বলে অনুরোধ করতে থাকে যে, সে তাদেরই একজন, কমান্ডার নাসিরের লোক আর এই আরবরা আত্মসমর্পণ করেছে, সে তাদেরকে জেলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হিযবে ওয়াহদাতের লোকেরা তার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে উলটো তাকে মারধর করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ গালাগাল করতে থাকে। এমনকি আহতদের শারীরিক অবস্থার তোয়াক্কা না করে তাদেরও মারতে শুরু করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সবাইকে তাদের কারাগারে নিয়ে যায়।

সেই আহতদের মধ্যে একজন আফগান তালেবানও ছিলেন। এরপরের ঘটনা তার কাছ থেকেই শুনব। তিনি বলেন—"তারা গাড়ির মধ্যেও সবাইকে খুব মারধর করে। তারপর গাড়ি থামিয়ে আমাদের তল্লাশি নেয়। আমি তাদের বলি যে, তাদের (আরবদের) সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি আহত হওয়ায় গাড়িতে তাদের সাথে আমাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু। তারা আমাকে বলে, আমরা এতকিছু জানি না। তুমি যদি এখান থেকে বের হতে চাও, তবে কত দিতে পারবে, সেটা বলো। তখন আমার মনে পড়ে, ভাইদের কাছে কিছু ডলার আছে। চুরির ভয়ে একটি পিস্তল আর ডলারগুলো গাড়ির ইঞ্জিনে লুকিয়ে রেখেছিলেন তারা। তখন ভাবলাম, তারা তো পুরো গাড়িটিই নিয়ে যাবে, আমি যদি পিস্তলটি দিয়ে কোনোভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারি, তাতে অসুবিধা কী। এই ভেবে তাদের সাথে পিস্তলের বিনিময়ে আমার মুক্তির ব্যাপারে দরকষাকষি করতে শুরু করি। তারা রাজি হলে তাদেরকে পিস্তলের স্থানটি বলে দিই। তারা গিয়ে সেটা বের করে। কিন্তু ফিরে এসে বলে, এটি যথেষ্ট না, আমরা সবুজ কাগজ চাই। অর্থাৎ তারা ডলার চাচ্ছিল। তাই বাধ্য হয়ে আমি তাদেরকে ডলারের স্থানটিও বলে দিই। তারা ডলার পেয়ে আমাকে বলে, তুমি চলে যাও, এই আরবদের আমরা রেখে দিচ্ছি। আমরা তাদেরকে ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করব। আমি তাদের ছেড়ে চলে আসি। আসার সময় আহত ভাইদের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনতে পাই। ততক্ষণে মুনাফিকরা তাদের মারতে

[৪৬] আবু নাসের আবয়ানীর আসল নাম ওয়াযযাহ আব্দুল্লাহ সালেহ হানাশী। আবয়ানের ওয়াযি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। গুয়ান্তানামোতে আমরা একসাথেই বন্দি ছিলাম। তিনি কারাগারেই ইন্তিকাল করেছেন। রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

শুরু করেছিল। পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে ভাইদেরকে মার্কিনিদের হাতে তুলে দেয়।"

যাই হোক, আমরা বড় কাফেলার ঘটনায় ফিরে আসি। তারা ভাইদেরকে কিল্লা-ই-জঙ্গিতে নিয়ে যায়। মাযার-ই-শরীফের উপকণ্ঠে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে এই কিল্লা-ই-জঙ্গি নামের দুর্গটি অবস্থিত। দুর্গের চারপাশ প্রশস্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরও এত প্রশস্ত যে, এর ওপর দিয়ে অনায়াসে একটি ট্যাঙ্ক চলতে পারবে। দুর্গের পেছনে একটি খাল আছে। দুর্গটি আয়তনে অনেক বড়। মূল ভবনটি বহুতলবিশিষ্ট। দুর্গের নিচে ছোট ছোট অনেক কক্ষ আর সুরঙ্গ আছে। মূলত এটি একটি সামরিক দুর্গ ছিল, অবরোধের সময় নির্বিঘ্নে যুদ্ধ পরিচালনার উপযোগী করে বানানো হয়েছিল। এতে অনেক অস্ত্র ও গোলা-বারুদের মজুদও ছিল।



কিল্লা-ই-জঙ্গি

অবশেষে গাড়ির বহর দুর্গে পৌঁছায়। শিয়া ওয়াহদাত পার্টি ও দোস্তমের সিনিয়র কমান্ডাররা, তার গোয়েন্দাপ্রধান, কয়েকশো সৈনিকের বড়সড় এক বাহিনী এবং মার্কিন সেনাবাহিনী ও সিআইএ'র প্রতিনিধিরা তাদের আগেই দুর্গে এসে পৌঁছেছিল। ভাইদেরকে প্রথমে আলাদা আলাদা করে কয়েকটি কামরায় বন্দি করা হয়। তারপর তারা একটি করে কামরা খুলতে শুরু করে এবং ভাইদের বের করে তাদের তল্লাশি নিয়ে নামধাম লিখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

এক মার্কিন অফিসার আর দোস্তম ও হাজারা বাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার মিলে ভাইদের তথ্য সংগ্রহ করছিল। তারা তখন ইচ্ছাকৃতভাবেই ভাইদের সাথে খারাপ আচরণ করছিল আর ভাইদের নিয়ে, জিহাদ ও দীন নিয়ে বিশ্রিভাবে কটূক্তি করছিল। এই মুজাহিদরা

সব নির্যাতন সইতে পারে, কিন্তু দীনের অপমান সইতে পারে না। ভাইয়েরা তাদের এই স্পর্ধা দেখে নিজেদের মধ্যেই চোখে চোখে ইশারা বিনিময় করে করণীয় ঠিক করে নেন। তখনও প্রথম কামরার ভাইদের তথ্য সংগ্রহের কাজই শেষ হয়নি। এরইমধ্যে এক ভাই দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে তদন্তকারী অফিসারের দিকে এগিয়ে যান। অফিসার বিষয়টি টের পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'এই .....জাদা, পকেট থেকে হাত বের কর।' ভাইটি তখনই পকেটের মধ্যে থাকা গ্রেনেডের লিভার থেকে হাত সরিয়ে নেন আর সাথে সাথেই বিকট শব্দে দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। এই ভাই[৪৭] ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। এই বিস্ফোরণের ফলে সেই মার্কিন অফিসার, মাযার-ই-শরীফের গোয়েন্দাপ্রধান, ওয়াহদাত পার্টি এবং দোস্তমের বাহিনীর বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডার নিহত হয়।

অকস্মাৎ এই হামলায় শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যার মতো ছুটতে শুরু করে। কয়েকজন ভাই দ্রুতগতিতে নিহতদের অস্ত্র তুলে নিতে ছুটে যান। কিছু ভাই গিয়ে দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন, যেন শত্রুরা পালানোর সুযোগ না পায়। আর কিছু ভাই বাকি ভাইদের বের করার জন্য তাদের কামরাগুলোর দিকে ছুটে যান। কিছুক্ষণের জন্য চারদিকে সুনসান নীরবতা ছেয়ে যায়। তার একটু পরেই ভয়ংকর সেই নীরবতার চাদর ছিন্ন করে আমেরিকান ও শত্রুদের জন্য যেন জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতবাক হয়ে যায়। তারা হয়তো ভাবতেও পারেনি, সামান্য কয়েকজন বন্দি তাদের এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে এতটা আগ্রাসি হয়ে উঠবে। এমন ঠাট্টা তারা নিজেদের মধ্যে অহরহই করে থাকে। যাদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই, তাদের কাছে এই অপমান স্বাভাবিক মনে হতে পারে; কিন্তু যারা স্বাধীনচেতা, যারা কারো সামনে মাথানত করতে জানে না, যারা জিহাদের স্বাদ আস্বাদন করেছে, যারা শুধু আমীরের আদেশ পালনার্থেই প্রতিপক্ষের প্রতি বিশ্বাস রেখে অস্ত্রসমর্পণ করেছে আর সেই প্রতিপক্ষ তাঁদের ধোঁকা দিয়ে ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তাদের জন্য এই অপমান কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব না।

এরপরেই শুরু হয় ভয়ানক এক যুদ্ধ। শত্রুরা ভয়ার্ত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করতে থাকে। কেউ পালানোর জায়গা না পেয়ে উঁচু দেওয়াল থেকে লাফ দিতে শুরু করে। কিন্তু এই কাপুরুষের একজনও মুখোমুখি হয়ে লড়াই করার সাহস করতে পারেনি। কারণ, তারা তো মরতে আসেনি, তারা এসেছিল টাকার ভাগবাটোয়ারা করতে, আধিপত্যের লালসা মেটাতে আর আমেরিকান প্রভুদের অনুগ্রহ লাভ করতে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইয়েরা শত্রু ও উপস্থিত আমেরিকানদের অধিকাংশকে হত্যা করে ফেলেন।

[৪৭] ভাইদের মধ্যে তিনি আবু আহমাদ সুদানী নামে পরিচিত ছিলেন। তার বাড়ি ছিল মিশরের আসওয়ানে।

আবারও কঠিন এক মুহূর্ত শুরু হয়। ভাইয়েরা কয়েক দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে নেন। সবারই যুদ্ধের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকায় সবকিছু সুচারুরূপেই হচ্ছিল। দায়িত্ব বণ্টন শেষে একদল যান অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র বের করতে, আরেকদল গোলাবারুদ এনে সবার মধ্যে বিতরণ করে, আরেকদল ভারী মেশিনগান ও মর্টার বের করে তা স্থাপন করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর শত্রুদের হতাহত এবং ভাইদের আহতদের জরিপ করার দায়িত্বে থাকা দলটি কাজ শেষ করে ফিরে আসে। ফলাফল ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। প্রায় ১৫ জন মার্কিন ও ২০০ জন মুনাফিক নিহত হয়েছে। শত্রুপক্ষের কেউই জীবিত ছিল না। আর মুজাহিদদের কোনো ক্ষতিই হয়নি। শুধু যে ভাই শুরুতে দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ করেছিলেন, তিনি শহীদ হয়েছেন।

ভাইয়েরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, দুর্গের ভেতরে থেকেই কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। কারণ, ইতোমধ্যে শত্রুবাহিনী বাইরে জড়ো হতে শুরু করেছে। সাঁজোয়া যান এবং ট্যাঙ্ক দিয়ে তারা দুর্গ ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে। বিমান এসে দুর্গের ওপর চক্কর দিচ্ছে। এর কিছুক্ষণ পরেই শত্রুপক্ষ ভারী মেশিনগান আর কামান ব্যবহার করে তীব্র আক্রমণ শুরু করে আর ভাইদের আত্মসমর্পণের আহ্বান করতে থাকে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভাইয়েরা অনুমান করেন, কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো তারা দুর্গে প্রবেশ করবে। তাই শত্রুদের দুর্গে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে পুরো দুর্গে ছড়িয়ে পড়েন।

পরদিন সকাল পর্যন্ত শত্রুরা সিংহের এই গুহার কাছেও যাওয়ার চেষ্টা করেনি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তীব্র বিমানহামলা শুরু হয়, এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে হেভি আর্টিলারি অ্যাটাক। মাগরিব পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এই সময়ের মধ্যে ভাইয়েরা আহতদের নিচতলায় সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেননি। সময় যত গড়াচ্ছিল, শত্রুবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য দুর্গের পাহারায় থাকা ভাইদের সংখ্যাও তত কমছিল। সারারাত এভাবেই চলে যায়। খাবার ও পানিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। রাতের বেলা হামলার তীব্রতা কিছুটা কমলেও সকাল হতে না হতেই আগের চেয়ে শতগুণ বেশি তীব্রতা নিয়ে নতুন করে হামলা শুরু হয়। এবার ট্যাঙ্কগুলোও দুর্গের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু ভাইদের পালটা হামলার মুখে আবারও পিছু হটতে বাধ্য হয়। হামলার তীব্রতা যত বাড়ছিল, চারদিকে ধোঁয়াও তত বাড়ছিল। অস্ত্রভাণ্ডারে থাকা বিস্ফোরকগুলোতে আগুন ধরে দুর্গের ওপরতলা ধ্বংস হয়ে নিচতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া শুরু করেছিল। টানা তিনদিনের বোমা হামলার ফলে অধিকাংশ মুজাহিদ ধ্বংস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান বা গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে যারা দুর্গের নিচে থাকা সুরঙ্গে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন, কেবল তারাই প্রাণে বাঁচতে পেরেছিলেন।

সবাই নিহত হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন শত্রু গোপনে দুর্গে প্রবেশ করে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারা বাকিদের জানায়, ভেতরে লড়াই করার মতো কেউ বেঁচে নেই। একপর্যায়ে তারা বুঝতে পারে, অনেকে আহত অবস্থায় সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। আহতদের বের করে আনার জন্য দু'জন সৈনিক সুরঙ্গে ঢোকে। এক আহত ভাই নিজের পিস্তল বের করে গুলি করে সে দু'জনকে হত্যা করেন। শত্রুরা আহতদের উদ্দেশ্যে বারবার আত্মসমর্পণ করতে বলছিল। কিন্তু আহত ভাইয়েরা তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে সুরঙ্গের ভেতরেই অবস্থান করতে থাকেন। তাদের বের করার জন্য এবার তারা সুরঙ্গগুলোতে পানি ঢেলে দেয়, কিন্তু এতেও কাজ হয় না। অবশেষে সুরঙ্গগুলোতে ডিজেল ও পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন আহত ভাইয়েরা বাধ্য হয়ে বের হয়ে আসেন।

এই গণহত্যা থেকে ৮০ জন ভাই বেঁচে ফিরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তানি। আহতদের মধ্যে জন ওয়াকার নামের এক আমেরিকান ভাইও ছিলেন। তার কারণে বুশ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিল। কারণ, তালেবানের সাথে কোনো আমেরিকান নাগরিক থাকতে পারে—এই কথা সে কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না।

এভাবেই এই মহাকাব্যিক যুদ্ধের ইতি ঘটে।[৪৮] এ যুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়েছিল এমন একদল যুবকের তাজা রক্তে, যারা লাঞ্ছনার জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে রব্বে কারীমের সাথে সাক্ষাৎকে প্রাধান্য দিয়েছিল, যে অপমান নিয়ে আজ মুসলিম জাতি বেঁচে আছে, তাঁরা সে অপমান মেনে নিতে ইনকার করেছিল। দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা ব্যর্থ হননি; বরং তাঁরা তো পৃথিবীর এই বৃহৎ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সাথে ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ মাকামে আল্লাহর চির সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

আমরা এই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী ও জীবন্ত সাক্ষী। এই ঘটনা আমাদের মনে ও হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এই নায়করা আমাদের আগেই সে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন, আমরা যার জন্য এখনো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তাঁরা আমাদের আগেই রহমানের সন্তুষ্টি আর জান্নাত পেয়ে গিয়েছেন। আমরাও তাদের পথেই অটল আছি। এ পথে চলতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত হব না, ধৈর্যহারাও হব না। আল্লাহর কসম, আমরা তো আমাদের

[৪৮] কিল্লা-ই-জঙ্গি গণহত্যার ইতিহাস বিস্তারিত জানতে মুজাহিদ ভাই ওয়ালীদ আল-হাজ-এর জবানবন্দিমূলক সাক্ষাৎকারটি দেখতে পারেন। আল-জাযীরা ভাইয়ের সাক্ষাৎকারটিকে 'শাহিদুন আলাল আসর (কালের সাক্ষী)' শিরোনামে কয়েক পর্বে প্রকাশ করেছে। এমনইভাবে ভাইয়ের লেখা বই 'মাযবাহাতুল কিলআহ ওয়া গায়াহিবু গুয়ান্তানামো'-ও দেখতে পারেন।

সবকিছুই বিক্রি করে দিয়েছি আর তা ক্রয় করেছেন পরম করুণাময় আল্লাহ। এই চুক্তির কারণে আমরা কখনোই আফসোস করব না। যার হৃদয় আছে, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ হলেও ঈমান, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ আছে, আমরা তাদের কাছেই এই ইতিহাস বলে যাব। আল্লাহ তাআলা হয়তো এর মাধ্যমে তাদের উপকৃত করবেন। আমরা আল্লাহর কাছে কবুলিয়ত চাই। তিনি যেন ভাইদের এই কুরবানীর মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে জাগরণ তৈরি করে দেন, উম্মতের যুবকদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন, আমীন।'

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আব্দুল হাদী ইরাকী
৩০শে জিলহজ ১৪২২ হিজরী, ১৪ই মার্চ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ



আব্দুল হাদী ইরাকী
(নাশওয়ান আব্দুর রাযযাক আব্দুল বাকী)
ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানের মাটিতে প্রথম যে মার্কিন সৈনিক নিহত হয়েছিল, সে এই কিল্লা-ই-জঙ্গিতেই নিহত হয়েছিল। জনি মাইকেল স্প্যান নামের এই লোকটি ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র এজেন্ট। ইয়েমেনি মুজাহিদ মুহাম্মাদ তাআযযী (আকরাম রজা) রহ. তাকে হত্যা করেছিলেন। ভাই ওয়ালীদ আল-হাজ হাফি. এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, এই আমেরিকান সৈনিকটি এক ভাইয়ের সাথে মল্লযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এ দৃশ্য দেখে বছর বিশেকের যুবক মুহাম্মাদ তার ৫০ কেজি ওজনের হ্যাংলাপাতলা শরীর নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন। তাঁর হাত তখনও বাঁধা। মুহূর্তের মধ্যে একপাক ঘুরে মার্কিন সৈনিকের পায়ে ঝোলানো পিস্তল ছিনিয়ে নেন এবং কিছু বুঝে

ওঠার আগেই পিস্তলের পুরো ম্যাগাজিন তার দেহে খালি করে ফেলেন। এভাবেই আফগানিস্তানের মাটিতে প্রথম মার্কিনির লাশ পড়ে।



জনি মাইকেল স্প্যান

## ৯/১১-পরবর্তী অপারেশনসমূহ

**إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدّ ... يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا**
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা ধারালো তরবারি থেকেও তীক্ষ্ণ। কত বিপদে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর কত আঘাতই না তারা করেছে।

**شتان، شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا ... الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا**
অন্যদের সাথে তাদের কতইনা তফাত, যারা রবের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে আর হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে ছুটে গিয়েছে, তরবারির বিদ্রুপাত্মক চাহনিও তাঁদের টলাতে পারেনি,

**الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا**
যারা আদর্শ রক্ষার জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে।

**إن أطبقت سدف الظلام وعضنا ناب أكول ... وديارنا طفحت دمًا ومضى به الباغي يصول**
তীব্র আঁধার যখন আমাদের ঘিরে ধরেছিল, হিংস্র পশু যখন ছিঁড়েকুড়ে খাচ্ছিল, আমাদের ঘরে যখন বইছিল রক্তের বন্যা আর আগ্রাসির আস্ফালন যখন পৌঁছেছিল চরমে

**ومن الميادين اختفت لُمع الأسنة والخيول ... وعلت على الأثَات أنغام المعازف والطبول**

ময়দান থেকে যখন আমাদের বর্শা আর ঘোড়াগুলো হারিয়ে গিয়েছিল আর আহাজারি ছাপিয়ে ঢোল-তবলা আর সেতারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল,

**هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول ... لن نوقف الغارات حتى عن مر ابعنا تزول**

ঠিক তখনই তাঁরা প্রলয়ংকারী ঝড়ের মতো ফুঁসে উঠল, শত্রুর ইমারত গুড়িয়ে দিলো আর দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল, আমাদের আঘাত থামবে না, যতদিন না তোরা আমাদের মাটি ছেড়ে যাবি।[৪৯]

৯/১১-এর পর আফগানিস্তানে আমেরিকা উন্মাদের মতো বোমা হামলা শুরু করে, এতে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে আল-কায়েদার অফিসিয়াল মুখপাত্র শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ. একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। আল-জাযীরা বিবৃতিটি প্রচার করে। এই বিবৃতিতে শায়খ সুলাইমান অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আমেরিকাকে হুমকি দেন।[৫০] তিনি বলেন—

> ‘আল্লাহর ইচ্ছায় বিমানের এই তুফান কোনোদিন থামবে না। মার্কিন সরকার ভালো করেই জানে, আল-কায়েদা যদি কোনো ওয়াদা করে বা কোনো হুমকি দেয়, আল্লাহর ইচ্ছায় তা পূরণ করেই ক্ষান্ত হয়। তাই আমেরিকাকে বলছি, ৯/১১-এর মতো হামলা সামনে আরও হবে। আর এগুলো শুধু মুখরোচক কোনো কথা না, অচিরেই তোমরা স্বচক্ষে এর বাস্তবতা দেখতে পারবে। বিমানের এই তুফান কিছুতেই থামবে না। এই তুফান ততদিন চলবে, যতদিন না তোমরা পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে বের হবে, যতদিন না তোমরা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সাহায্য করা বন্ধ করবে, যতদিন না তোমরা ইরাকের জনগণের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেবে, যতদিন না তোমরা জাযীরাতুল আরব থেকে বের হবে এবং কাশ্মীরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে।’

শায়খ উসামা এবং আল-কায়েদা নেতৃবর্গের এ ধরনের বিবৃতিগুলো মার্কিন গণমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। এই বক্তব্যগুলোকে মার্কিন সাংবাদিক, গবেষক ও সমরবিশারদগণ গুরুত্বের সাথে নিয়ে তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করত। শায়খ উসামার বিবৃতি নিয়ে

---

[৪৯] শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. রচিত কবিতা।

[৫০] বইয়ের প্রথম সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছিল, এই হুমকি শায়খ উসামা রহ. দিয়েছিলেন। তবে সঠিক তথ্য হলো, হুমকিটি দিয়েছিলেন শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ.। শায়খের মূল বক্তব্য এই লিংক থেকে দেখা যেতে পারে। https://tinyurl.com/5bj79x66

গবেষণাকারী এক বিশ্লেষক আল-জাযীরায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল—'এই বক্তৃতা-বিবৃতিগুলো দিয়েই উসামা যুদ্ধের অর্ধেক বিজয় অর্জন করে ফেলেছেন। বাকি অর্ধেকের বিজয়ের জন্য তাঁর কাজ করতে হবে।'

শায়খদের ওয়াদামতো বাস্তবেই ৯/১১-এর পর ভাইয়েরা হামলার দ্বিতীয় পর্বের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন। এই হামলাগুলোতেও বিমান ব্যবহার করা হয়। তবে হামলার কৌশলে পরিবর্তন আনা হয়। সিদ্ধান্ত ছিল, ৯/১১-এর পর যথাসম্ভব দেরি না করেই এই হামলাগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম অপারেশন পরিচালনা করেন তিনজন ভাই। আব্দুল জব্বার জ্যামাইকি (রিচার্ড রিড), তিনি ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন; সাজিদ মুহাম্মাদ বাদাত, তিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন এবং যাকারিয়া মুসাবী (সাহরাবী), তিনি ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক। অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য ভাইয়েরা আল-কায়েদার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ভাই আবু আব্দুর রহমান মুহাজিরের কাছে কয়েকটি প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন।


যাকারিয়া মুসাবী (সাহরাবী)


সাজিদ মুহাম্মাদ বাদাত


আব্দুল জব্বার জ্যামাইকি (রিচার্ড রিড)

## মার্কিন বিমানে বিস্ফোরক জুতা অপারেশন

এই অপারেশনের পরিকল্পনা ছিল, আব্দুল জব্বার জ্যামাইকি ও সাজিদ মুহাম্মাদ ভাই আমেরিকাগামী আলাদা দুটি প্লেনে উঠবেন। তাদের জুতার মধ্যে অনডিটেক্টেবল (শনাক্ত করা যায় না এমন) বিস্ফোরক লাগানো থাকবে। বিমান যখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর থাকবে, তখন তারা বিস্ফোরক জুতাগুলো ডেটোনেট করবেন। শায়খ ফাতহী (তারেক আনওয়ার) মিসরী রহ. এই বিস্ফোরক জুতাগুলো প্রস্তুত করেছিলেন।

২২শে ডিসেম্বর ২০০১। আব্দুল জব্বার ভাই প্যারিস বিমানবন্দর থেকে আমেরিকার মায়ামিগামী একটি বিমানে ওঠেন। বিমানে যাত্রী ছিল ১৯৭ জন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু জুতা ভেজা থাকায় বিস্ফোরণ হচ্ছিল না। জুতা থেকে পোড়া গন্ধ বের হয়ে পুরো বিমানে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু মাত্র তিন মাস আগেই ৯/১১-এর ঘটনা ঘটেছিল, তাই জনমনে তখনও আতংক বিরাজ করছিল। পোড়া গন্ধ পেয়ে যাত্রীরা আব্দুল জব্বারকে শনাক্ত করে ধরে ফেলে।

আদালতে আব্দুল জব্বার ভাইয়ের শুনানির সময় বিচারক তাকে [আমেরিকার পতাকা দেখিয়ে] বলেছিল, 'তুমি কি এই পতাকাটি দেখতে পাচ্ছ, মিস্টার রিড? এই পতাকাটি স্বাধীনতার প্রতীক। তুমি এবং তোমার সহযোগীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু এই পতাকা ঠিকই উড়তে থাকবে।' এজলাস থেকে বের হওয়ার আগে আব্দুল জব্বার বিচারকের উত্তরে বলেছিলেন, 'কিয়ামতের আগে একদিন না একদিন অবশ্যই এই পতাকার পতন হবে। আর তোমাদের ও আমাদের মাঝে আসল ফয়সালা তো আল্লাহ করবেন।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি কিছুতেই তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। তোমরা আমাদের দুই মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে হত্যা করেছ, আমাদের নারীদের সম্ভ্রমহানী করেছ। আমি কোনো সন্ত্রাসী নই, আমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমি একজন সৈনিক। আমার আনুগত্য ইসলাম ও উসামা বিন লাদেনের প্রতি।'[৫১] আল্লাহ তাআলা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

আব্দুল জব্বার ভাইয়ের অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে সাজিদ ভাই ভয় পেয়ে যান এবং অপারেশন থেকে বিরত থাকেন। পাকিস্তান থেকে যে ভাইয়েরা তাঁকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তাঁদের সাথেও তিনি যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ২০০৩ সালের নভেম্বরে সাজিদ ভাইকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যেহেতু তিনি হামলা চালানো থেকে বিরত ছিলেন এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দাদের সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিলেন, তাই ২০১০ সালের মার্চে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সাহরাবী ভাইয়ের ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, আমেরিকার ভেতরেই তাঁকে দিয়ে কোনো অপারেশনের পরিকল্পনা ছিল। অপারেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই। তিনি ওকলাহোমার নরমান সিটির এক পাইলট ট্রেইনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ৯/১১-এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ বিষয়টি মার্কিন তদন্তেও উঠে এসেছে। তাকে নিয়ে গুজব আছে যে, তিনি ৯/১১ হামলা পরিচালনাকারী

[৫১] আয-যি'বুল ফারদিয়্যু আদুউয়ু আমরিকা (দ্যা লোন উলফ : আমেরিকান নাইটমেয়ার) : ইয়াহয়া মুহাজির

দলের ২০তম সদস্য ছিলেন—এটি নিছক বানোয়াট কথা। যাই হোক, তাঁর যে অপারেশন করার কথা ছিল, আল্লাহ তায়ালা চাননি বিধায় সে অপারেশন আলোর মুখ দেখেনি। ৯/১১-এর আগেই ২০০১ সালের ১৬ই আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

## মিশন AWACS এয়ারক্রাফট

শায়খ উসামা রহ. হারামাইনের আকাশে একটি মার্কিন AWACS (এয়ারবর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম) বিমান ভূপাতিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আল-খারাজ (প্রিন্স সুলতান) এয়ারবেইজের এক অফিসার বিমানের রুটপ্ল্যানের যাবতীয় তথ্য ভাইদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এই অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অপারেশনের জন্য শায়খ উসামা একদল সাহসী যুবককে বাছাই করেন। তাদের মধ্যে শায়খ আবু হুযাইফা সুদানী হাফি.-ও ছিলেন।

অপারেশনটি পরিচালনার জন্য ভাইদের দুটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দলের কাজ ছিল অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। তাঁরা ৯/১১-এর অনেক আগেই কাজে লেগে গিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল ইয়েমেন থেকে কিছু SAM-7 মিসাইল এনে রিয়াদের একটি বাড়িতে জমা করে রাখা। কাজ শেষ করে এই সেলের আমীর আফগানিস্তানে যান এবং শায়খ উসামার হাতে বাড়ির চাবি ও ঠিকানা হস্তান্তর করেন। পরে শায়খ উসামা বাড়ির চাবি ও ঠিকানা অপারেশন পরিচালনাকারী ভাইদের বুঝিয়ে দেন। এমনটা করার উদ্দেশ্য ছিল দুই দলের মধ্যে যেন কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকে। যাতে কোনো দলের কেউ গ্রেফতার হলে তার দলের সদস্যদের তথ্য ফাঁস হলেও অন্য দলের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে না পারে। কিন্তু এত সতর্কতার পরেও শায়খ যে আশঙ্কা করছিলেন, সেটাই বাস্তব হয়ে যায়। এক ভাই নিজের যুক্তি দিয়ে অন্যান্য ভাইদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, দুই দলের মধ্যে পরিচিতি থাকা দরকার। তার যুক্তির ভিত্তিতে দুই দল নিজেরা পরিচিত হয়।

শায়খ আবু হুযাইফা সুদানী তাঁর 'আল-আমীরুল মানসিয়্যু (ফরগোটেন প্রিন্স)' বইয়ে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> 'সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে দক্ষিণ দিকে আল-খারাজ নামক এলাকায় একটি এয়ারবেইজ আছে। শায়খ উসামা রহ. আমাকে এবং আরও কয়েকজন মর্দে মুজাহিদকে এখান থেকে টেক-অফ করা একটি মার্কিন AWACS বিমান ভূপাতিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ জন্য SAM-7 মিসাইল ব্যবহার করার কথা ছিল। পরিকল্পনা ছিল, আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অন্যায় আগ্রাসনের

তাৎক্ষণিক প্রতিবাদস্বরূপ অপারেশনটি বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিসাইলটি বিমান পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এতে বিমান রেহাই পেয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আমরাও নিরাপদে রিয়াদে আমাদের মারকাযে ফিরে আসি।'




একটি AWACS এয়ারক্রাফট

## অপারেশন জেরবা: তিউনিসিয়া, ১১ই এপ্রিল ২০০২

৯/১১-এর পর সরাসরি ইহুদীদের বিরুদ্ধে এটিই ছিল প্রথম অপারেশন। ২০০২ সালের ১১ই এপ্রিল তিউনিসিয়ার দ্বীপ জেরবাতে অবস্থিত একটি সিনাগগে সাইফ তিউনিসী রহ. এই হামলাটি করেছিলেন। সাইফ ছিলেন দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী, উচ্চ মনোবল ও হিম্মতের মূর্ত প্রতীক। সময় যতই লাগুক, তিনি ছিলেন লক্ষ্য অর্জনে অটল। টানা তিন বছর তিউনিসিয়ায় অবস্থান করে তিনি একাই এই হামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন। আফগানিস্তানে থেকে প্রথমে তিনি বিস্ফোরক, ইলেকট্রনিক্স, নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির ওপর বিশেষ কোর্স করেন। তারপর 'নিযার' নামে তাঁর পাসপোর্ট তৈরি করে ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তান ছেড়ে ইউরোপ চলে যান। সেখান থেকে তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করেন। পুরো প্ল্যান এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যেন মনে হয়, তিনি প্রবাসে ছিলেন, এখন দেশে ফিরেছেন। তিউনিসিয়ায় থিতু হওয়ার পর থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করা শুরু করেন। অবশেষে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে জেরবা দ্বীপে অবস্থিত ইহুদীদের একটি সিনাগগে হামলা চালান। তাঁর এ হামলায় ১৬ জন নিহত আর ৩০ জন আহত হয়। সবাই ছিল ইহুদী। নিহতদের মধ্যে ১৪ জন ছিল জার্মান এবং ২ জন ছিল ফরাসি।




তিউনিসিয়ার মানচিত্রে
জেরবা দ্বীপের অবস্থান



জেরবায় অবস্থিত সিনাগগ

## অপারেশন এমভি লিমবার্গ: মুকাল্লা, ইয়েমেন, ৬ই অক্টোবর ২০০২

আমেরিকার অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করার জন্য শায়খ উসামা বিন লাদেনের একটি স্ট্র্যাটেজি ছিল, জাহাজ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটি রুটে হুমকি তৈরি করে রাখা। এ জন্য শায়খ আরব সাগরকে টার্গেট করেছিলেন। আরব সাগর দিয়ে যাতায়াতকারী মার্কিন ও ইউরোপীয় তেলবাহী জাহাজগুলোর ওপর হামলা করে শায়খ এমন একটি অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করতে চাচ্ছিলেন, যা প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের জীবনকেই প্রভাবিত করবে। তখন তারাই মার্কিন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং মুসলিম উম্মাহর ওপর জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরি করা মার্কিন ফরেন পলিসি পরিবর্তনে বাধ্য করবে।

৯/১১ হামলার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এবং শায়খের উল্লিখিত স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের ৬ই অক্টোবর আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরবের মুজাহিদগণ ফরাসি তেলবাহী জাহাজ এমভি লিমবার্গের ওপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। শায়খ আবু আলী হারিসী, শায়খ কাসিম আর-রীমী, ফাওয়ায রবীয়ী-সহ আরও কয়েকজন ভাই মিলে এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছিলেন। অপারেশনটি পরিচালনা করেছিলেন নাসের আওয নাসের ফারাজ কিন্দী ওরফে আবু খাইসামা হাযরামী এবং হুসাইন বাদাবী ওরফে আবুল হারিস বাদাবী নামের দু'জন ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সকলকে কবুল করে নিন।



শায়খ কাসেম আর-রীমী



ভাই ফুরকান (ফাওয়ায রবীয়ী)



শায়খ আবু আলী হারিসী



আবু খাইসামা হাযরামী



জ্বলতে থাকা ফরাসি তেলবাহী জাহাজ লিমবার্গ

আমেরিকার নেতৃত্বে নব্য ক্রুসেড শুরুর এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বিবৃতিতে শায়খ উসামা রহ. এই অপারেশনের প্রশংসা করে বলেন—

> ‘উম্মতে মুসলিমাকে আমরা দুটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের সুসংবাদ দিচ্ছি। উম্মতের মুজাহিদগণ ইয়েমেনে ক্রুসেডারদের তেলবাহী একটি জাহাজে এবং কুয়েতে দখলদার মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। ইয়েমেনে তেলবাহী জাহাজের ওপর হামলা করে মুজাহিদগণ মূলত ক্রুসেডারদের ধমনিতুল্য সরবরাহ লাইনের ওপর আঘাত হেনেছেন। এই হামলার মাধ্যমে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হলো, রক্তের ঋণ কতটা ভারী হতে পারে। আমাদের উম্মতের ওপর তাদের আগ্রাসন যতদিন

বহাল থাকবে, আমাদের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ যতদিন তারা লুট করতে থাকবে, এ ধরনের হামলা ততদিন হতেই থাকবে।

একই সময়ে কুয়েতে মার্কিন মেরিন কর্পসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা, ইয়েমেনে তেলবাহী জাহাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এবং তালেবান ও আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ—খোদ আমেরিকা যাদের নির্মূল করার ওপর বাজি ধরেছে—তাঁদের পক্ষ থেকে অডিও ও লিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়া আর এ সবকিছু নব্য ক্রুসেড শুরুর ঠিক এক বছরের মাথাতেই সংঘটিত হওয়া কাকতালীয় কোনো বিষয় হতে পারে না। বরং এটি শত্রু-মিত্র সকলের জন্য সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী একটি বার্তা যে, আল্লাহর রাস্তায় চলতে গিয়ে মুজাহিদগণ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, সে কারণে তাঁরা দুর্বল ও হীনবল হয়ে দমে যাননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন, তাদের ক্রোধ তাদের কোনোই কাজে আসেনি।'

এই অপারেশন উপলক্ষ্যে আল-কায়েদা একটি অফিসিয়াল বিবৃতিও প্রকাশ করে। বিবৃতিটি নিচে তুলে ধরা হলো—

**بسم الله الرحمن الرحيم**

## ইয়েমেনে ক্রুসেডারদের তেলবাহী জাহাজে বোমা হামলা প্রসঙ্গে তানজীম আল-কায়েদার বিবৃতি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾

'মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদের গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদের ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থাকবে।' [সূরা তাওবা (৯) : ৫]

আমেরিকা ও তার ক্রুসেডার মিত্ররা ভেবেছিল, তারা মুজাহিদদের খতম করে ফেলেছে, এই অঞ্চলে তাদের কৌশলগত সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করে ফেলেছে। এই স্বপ্ন শুধু তারাই দেখছে না, নিজেদের জাতি ও বহির্বিশ্বে তাদের মিত্রদেরও এই দিবাস্বপ্নে বিভোর করে রেখেছে। অন্যদিকে ইয়েমেনের বিশ্বাসঘাতক, দালাল শাসকগোষ্ঠী ইয়েমেনি তরুণ মুসলিম ও মুজাহিদদের ওপর দমনপীড়ন চালিয়ে গ্রেফতার করতে সম্ভব-অসম্ভব সবরকম চেষ্টাই করেছে।

সেই সাথে বিশ্বব্যাপী জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরুর পর এক বছর আর ইয়েমেনের এডেন বন্দরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোল ধ্বংসের দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। ইয়েমেনের এডেন বন্দরে ইউএসএস কোল যেখানে ধ্বংস হয়েছে, সে জায়গার কাছেই এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আল-মানদেব প্রণালীর অদূরে মুজাহিদগণ আবারও ক্রুসেডারদের স্ট্র্যাটেজিক টার্গেটে হামলা করেছেন। এবার ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি তেলবাহী জাহাজে বোমা হামলা করা হয়েছে। চলমান এই পরিস্থিতিতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক টার্গেটে হামলা করার তাৎপর্য অপরিসীম। এই হামলার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হচ্ছে—

১. নিজেদের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য আমেরিকা ও তার মিত্ররা সামরিক, রাজনৈতিক, নিরাপত্তাগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যত চেষ্টা-তদবীর করেছে, তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

২. অতর্কিত হামলা চালিয়ে শত্রুকে চমকে দেওয়ার মতো শক্তি আল্লাহর রহমতে এখনো মুজাহিদদের আছে। নিজেদের পছন্দমতো জায়গা ও সময় নির্বাচন করে শত্রুর কৌশলগত টার্গেটগুলোতে উপর্যুপরি আঘাত করতেও তারা সক্ষম।

এ হামলাগুলো আল-কায়েদাও করতে পারে, আবার আল-কায়েদার মতো একই আকীদা-মানহাজ ও চিন্তা-চেতনা লালনকারী অন্য যে-কোনো জিহাদী দল করতে পারে। হামলা যে-ই করুক, আমেরিকা ও তার ক্রুসেডার মিত্রদের জন্য দুটোই ক্ষতিকর। কারণ, হামলাটি যদি আল-কায়েদা করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আল-কায়েদা এখনো আগের মতোই শক্তিশালী আছে এবং তারা এখনো সেই একই জায়গায় আঘাত করতে সক্ষম, যেখানে আগেও তারা আঘাত করেছে। এটা আরও প্রমাণ করবে, ওয়ার অন টেররের সফলতার নামে আমেরিকা মিডিয়াতে যে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে আর সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে তাদের যে অভাবনীয় সাফল্যের কথা প্রচার করছে—এগুলো মিডিয়ার মিথ্যাচার আর ভাওতাবাজি ছাড়া কিছুই না। মুজাহিদদের হামলায় জ্বলতে থাকা জাহাজের ধোঁয়ার সাথে সাথে এগুলোও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আর হামলা যদি আল-কায়েদা না করে তাদের মানহাজের অনুসারী অন্য কোনো জিহাদী দল করে, তাহলে বিষয়টি আরও গুরুতর। কারণ, এর সহজ অর্থ হলো, এই উম্মতের মধ্যে উসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা ছাড়াও আরও অনেক কায়েদা (জিহাদী ঘাঁটি) তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং এ কারণে আমেরিকা ও তার ক্রুসেডার মিত্রদের হাজার গুণ বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত।

শত্রুকে আমরা কোনো পরামর্শ দিতে চাই না। তাই এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি সঠিক, সেটাও খোলাসা করছি না। এক ইউএসএস কোলের ঘটনাকে ঘিরেই অনুমান আর সম্ভাবনার সুদীর্ঘ এক চক্রে গত দু'বছর ধরে তারা খাবি খাচ্ছে, কিন্তু কোনো সমাধানেই পৌঁছাতে পারেনি। আমরা তাদেরকে এ অবস্থাতেই রেখে দিতে চাচ্ছি।

৩. এই অপারেশনের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিটি সামনে এসেছে। তা হলো, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্রুসেডারদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে মুজাহিদদের যে-কোনো সময় আক্রমণের আশঙ্কা। আগেও আমরা দেখেছি, সাধারণ একটি নৌকা, যার মূল্য এক হাজার ডলারও হয়তো হবে না, একটি ডেস্ট্রয়ার ধ্বংস করেছে, যার আর্থিক মূল্যই এক বিলিয়ন ডলারের বেশি আর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তার মূল্য তো পরিমাপ করাই সম্ভব না। এমনইভাবে এখন আমরা দেখতে পেলাম, সাধারণ একটি নৌকা বিশালাকার তেলবাহী জাহাজ ধ্বংস করতে সক্ষম। এই হামলাগুলোর আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি, পশ্চিমা অর্থনীতির চালিকাশক্তি খনিজ তেল ঠিক কতটা হুমকির মধ্যে আছে। খনিজ তেলের সর্ববৃহৎ মজুদ আমাদের এই অঞ্চলেই, সবচেয়ে বেশি খনিজ তেল উত্তোলনও করা হয় এখানেই এবং এই তেল আমদানি-রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলোও এই অঞ্চলের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তেলবাহী ফরাসি জাহাজে হামলা সাধারণ কোনো হামলা নয়; বরং এই হামলাটি মূলত আন্তর্জাতিক তেল সরবরাহ লাইনের ওপর দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুচিন্তিতভাবে করা একটি আঘাত।

৪. সামরিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার পাশাপাশি এই অপারেশনের একটি রাজনৈতিক বার্তাও আছে। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও যুদ্ধে যারা আমেরিকাকে সঙ্গ দিচ্ছে, এই বার্তাটি মূলত তাদের জন্য। এই অপারেশনটি তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, আল্লাহ ও মুজাহিদদের হাত থেকে তারাও নিরাপদ না। এই জোটের সাথে থাকলে চড়া মূল্য শোধ করার জন্য তাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। এই মূল্য শোধ করতে হবে কখনো রক্ত দিয়ে, কখনোবা স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়ে।

তেলবাহী জাহাজে হামলার মাধ্যমে আমেরিকার মিত্র ফরাসিদের এই বার্তাটি দেওয়া হলো। এর আগে তিউনিসিয়ার ইহুদী সিনাগগে হামলা করে ১৪ জন জার্মান ইহুদীকে হত্যার মাধ্যমে জার্মানিকেও এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বারবার সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন মুজাহিদদের ওপর আগ বেড়ে হামলা না করে। আগের সতর্কবার্তা যারা বুঝতে পারেনি, তারা যেন এখন ভালোভাবে বুঝে নেয়। কেউ যদি নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে চায়, তারা যেন সময় ফুরোনোর আগেই সিদ্ধান্ত নেয়। এখনো পিছু হটার সময় আছে।

পরিশেষে আমরা ইয়েমেনের বীর জনগণকে এই দুঃসাহসী অপারেশনের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁদের ইতিহাস ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস; গৌরব, জিহাদ ও শাহাদাতের ইতিহাস। এই অপারেশন তাঁদের সেই মহান ইতিহাসে আরেকটি সংযোজনমাত্র। ইসলামের ইতিহাসজুড়ে ইয়েমেনি মানুষদের বীরত্ব ও সাহসিকতার অসংখ্য গল্প স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। সীমান্ত রক্ষায় তারা সর্বাগ্রে থাকতেন, জিহাদের আহ্বানেও তারাই সবার আগে লাব্বাইক বলতেন। আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়া-সহ মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের পাহাড়ে-পর্বতে, মাঠে-ময়দানে আর গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইয়েমেনি শহীদদের কবরগুলো আজও এই ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা মুসলিম উম্মাহকে এই অপারেশনের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বিশ্বের আনাচে কানাচে থাকা মুসলিম যুবকদের এই পথে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। এই পথ গৌরব, মর্যাদা, মহানুভবতা, বীরত্ব ও বাহাদুরির পথ; এই পথ জিহাদ ও শাহাদাতের পথ। এই পথে আমরা ততদিন চলতে থাকব, 'যতদিন না সকল ফিতনা নির্মূল হয় এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।' আল্লাহু আকবর, সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

রাজনৈতিক শাখা
তানজীম কায়েদাতুল জিহাদ
রবিবার
৬ই শাবান ১৪২৩ হিজরী
১৩ই অক্টোবর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

## কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে মার্কিন মেরিন কর্পসের ওপর হামলা: ৮ই অক্টোবর, ২০০২

ইয়েমেনের মুকাল্লায় তেলবাহী ফরাসি জাহাজে হামলার মাত্র দু'দিন পর কুয়েতে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। 'আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বের করে দাও'—এই নববী আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০২ সালের ৮ই অক্টোবর দু'জন কুয়েতি বীর আনাস আহমাদ কান্দারী ও জসিম মুহাম্মাদ হাজিরী কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে প্রশিক্ষণরত মার্কিন মেরিন কর্পসের একটি ইউনিটের ওপর আক্রমণ করেন।

হামলার আগে ভাইয়েরা প্রথমে টার্গেটের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন, তারপর প্রাপ্ত তথ্যগুলো সরেজমিনে যাচাই করেন। সে তথ্যের ভিত্তিতে সৈনিকদের রুটিনের সাথে মিলিয়ে হামলার উপযুক্ত সময় নির্বাচন করেন। ট্রেইনিংয়ের ফাঁকে শত্রুরা যখন নিরস্ত্র অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিল, এমন মুহূর্তে এই দুই বীর তাদের সকল নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে এবং সিসি ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেশিনগান নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই হামলায় শত্রুপক্ষের অনেক সৈনিক হতাহত হয়।[৫২]



মানচিত্রে ফাইলাকা দ্বীপের অবস্থান


জসিম মুহাম্মাদ হাজিরী


আনাস কান্দারী

## ফাইলাকা অপারেশনের তাৎপর্য

১. এই অপারেশনটি প্রমাণ করেছে, যে-সকল মুজাহিদ অস্ত্রচালনা ও যুদ্ধের উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তাঁদের সামরিক দক্ষতাও অত্যন্ত উঁচুমানের হয়ে থাকে। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে না। সব বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে কিতালে অবতীর্ণ হন।

২. মার্কিনিরা হামলা থেকে বাঁচতে আরব ভূখণ্ডের সাথে সাথে আরব দ্বীপগুলোতেও নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। কিন্তু মার্কিন নিরাপত্তানীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই দ্বীপেই অসাধারণ এই অপারেশন সংঘটিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্কিনিদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, জলে-স্থলে, আকাশে কিংবা সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসমান রণতরীতে কোথাও তারা নিরাপদ না।

৩. এই হামলার মাধ্যমেই আমাদের সামনে মার্কিন বাহিনীর অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের দুরবস্থার একটি চিত্র উঠে এসেছে। আকস্মিক এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে অপেশাদারিত্বের পরিচয় তারা দিয়েছে, তা কোনো প্রশিক্ষিত বাহিনীর পক্ষ থেকে আশা করা যায় না। উম্মতের মাত্র দু'জন বীর মুজাহিদই তাদের নাজেহাল করে ছেড়েছে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

[৫২] কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপের অভিযান প্রসঙ্গে আল-কায়েদার বিবৃতি। (ঈষৎ সংশোধিত)

৪. কুয়েতের জনসাধারণকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের ইসলামী পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মার্কিনিরা অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই অপারেশনের মাধ্যমে মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ইসলামী চেতনার বিজয় হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা ত্যাগ ও কুরবানীর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, 'এক উম্মাহ' চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনবিরোধী জিহাদ শুরু হবে কুয়েতের মাটি থেকেই।

৫. মার্কিন দখলদারিত্বের ফলে উম্মত কতটা অপমানজনক পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, এ ঘটনার ফলে তা স্পষ্ট হয়েছে। যে শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশের নাগরিকদের ওপর জোরজুলুম করে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকে, তারাই এ সকল ক্রুসেডারদের সামনে অবনত মস্তকে জি হুজুর করতে থাকে। কুয়েতের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। এই হামলার পর কুয়েতের সব নিরাপত্তা বাহিনীকে চরমভাবে অপমান করা হয়েছিল, নিজ দেশেই তাদের থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, এমনকি কুয়েত সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পর্যন্ত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এই লাঞ্ছনার শেষ কোথায়?

৬. এই ঘটনার ফলে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, আমেরিকা প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে যাচ্ছে। গোলকধাঁধাঁ থেকে বের হতে গিয়ে আরও গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তার ধ্বংস আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। পুরো উম্মতের মধ্যেই আমেরিকার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে। এটিই হলো এই উম্মতের সুস্থতার লক্ষণ, জাগরণের আলামত। এই ঘটনা প্রমাণ করেছে, সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব পেলে এই উম্মত নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। সুতরাং, হে ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ, আপনারা উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদার পথে নিয়ে চলুন।

## ইন্দোনেশিয়ার বালিতে নাইটক্লাবে হামলা : ১২ই অক্টোবর, ২০০২

৯/১১-এর কিছুদিন পর ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আল-জাযীরার প্রতিনিধি তাইসীর আল্লুনিকে শায়খ উসামা রহ. একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি সে সব দেশের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন, যারা আফগানিস্তানে ক্রুসেড শুরুর ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে সহযোগিতা করেছে। তিনি এই দেশগুলোকে নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই দেশগুলোর মধ্যে শায়েখ উসামা বিশেষভাবে অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> 'বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা মূলত আমাদের ও ইহুদীদের মধ্যকার যুদ্ধ। হাজার বছর আগেই আমাদেরকে এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। সুতরাং কোনো দেশ যদি

ইহুদীদের ফাঁদে পা দেয়, তাহলে এর পরিণতি যা হবে, সে জন্য যেন অন্য কাউকে দোষারোপ না করে। যদিও শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস তার বিভিন্ন বক্তব্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিষয়টি শুধু এ দুই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। অন্যান্য দেশকে মূলত নিজেদের অবস্থান নিয়ে পুনরায় চিন্তা করার একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জাপানের সাথে তো আমাদের কোনো শত্রুতা ছিল না। কে জাপানকে ভয়ংকর, কঠিন ও রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে টেনে এনেছে? ফিলিস্তিনে আমাদের সন্তানদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালানো হচ্ছে, তারা কেন এই অত্যাচারের অংশীদার হচ্ছে? আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর পরিণাম জাপানের জন্য সুখকর হবে না। সময় থাকতে তারা যেন নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে। এমনইভাবে আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের মজলুমরা পৃথিবীর সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ারই বা কী ক্ষতি করেছে?'[৫৩]

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া শায়খের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এ জন্য অস্ট্রেলিয়াকে তার অপরাধ অনুযায়ী শায়েস্তা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। শায়খ রহ. অসংখ্য বিবৃতিতে বলেছেন, যে যেমন অপরাধ করবে, তার শাস্তিও তেমনই হবে। তিনি বলতেন—

'তোমরা যেভাবে আমাদের হত্যা করছ, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই হত্যা করা হবে; তোমরা যেভাবে আমাদের ওপর বোম্বিং করছ, ঠিক সেভাবেই তোমাদের ওপরেও বোম্বিং করা হবে; তোমরা যেভাবে আমাদের নিরাপত্তা নষ্ট করছ, আমরাও তোমাদের নিরাপত্তা সেভাবেই নষ্ট করব। আমাদের জবাব শুধু কথায় নয়, তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।'

আল-কায়েদার পক্ষ থেকে বহির্বিশ্বে কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বশীল ছিলেন বীর মুজাহিদ খালেদ শেখ মুহাম্মাদ ফা.আ.। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই হামলা বাস্তবায়নের জন্য তিনি ইন্দোনেশিয়ার কয়েকজন মর্দে মুজাহিদের সাথে মিলে পরিকল্পনা করেন। হামলার টার্গেট ছিল পর্যটন নগরী কুটা'র বালি দ্বীপের একটি নাইটক্লাব। এই নাইটক্লাবে অস্ট্রেলিয়া-সহ নব্য ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী বেশকিছু ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের আনাগোনা ছিল।

২০০২ সালের ১২ই অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। এক ইস্তিশহাদী মুজাহিদ ভাই বালির প্যাডি'স পাব (যা 'প্যাডি'স আইরিশ পাব' নামেও পরিচিত)-এর ভেতরে কাঁধব্যাগে বহন করে আনা বোমার বিস্ফোরণ ঘটান। এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। ক্লাবের ভেতরে থাকা লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাস্তার দিকে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু রাস্তায় তাদের জন্য আরও বড় এক আতংক অপেক্ষা করছিল। প্যাডি'স

[৫৩] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন।

পাবের ঠিক বিপরীত পাশে অবস্থিত 'সারি ক্লাব'-এর সামনে রাস্তায় বিস্ফোরকভর্তি একটি মিতসুবিশি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। প্রথম বিস্ফোরণের ২০ সেকেন্ড পর এই গাড়ি বোমাটিও বিস্ফোরিত হয়। এই দুই হামলায় মোট ২০২ জন নিহত হয়। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ছিল ৮৮ জন, ব্রিটিশ ২৭ জন, আমেরিকান ৭ জন এবং সুইডিশ নাগরিক ছিল ৬ জন। আহত হয় প্রায় ২০৯ জন। এই হামলার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের হৃদয় শান্ত করে দেন।

বালি অপারেশনের এক মাস পর ১৪২৩ হিজরীর ৭ই রমযান, ২০০২ সালের ১২ই নভেম্বর মার্কিন সরকারকে সহযোগিতাকারী দেশগুলোর নাগরিকদের উদ্দেশ্যে শায়খ উসামা রহ. একটি বার্তা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন—

## আল্লাহর বান্দা উসামা বিন লাদেনের পক্ষ থেকে আমেরিকার জালেম প্রশাসনের মিত্র দেশগুলির জনগণের প্রতি

**السلام على من اتبع الهدى، أما بعد**

'নিশ্চয়ই জুলুম প্রতিহত করাই হলো শান্তি অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ আর অপরাধের সমান শাস্তি দেওয়াই হলো প্রকৃত ইনসাফ। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক হামলার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। যেমন: তিউনিসিয়ায় জার্মান নাগরিক হত্যা, করাচিতে ফরাসি নাগরিক হত্যা, ইয়েমেনে বিশালাকার তেলবাহী ফরাসি জাহাজে হামলা, বালি দ্বীপে ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হত্যা, সাম্প্রতিক মস্কো অপারেশন, ফাইলাকায় মেরিন সৈন্যদের ওপর হামলা-সহ বিচ্ছিন্ন আরও কিছু হামলা হয়েছে।

এই সবগুলো ঘটনাই মূলত প্রতিক্রিয়া। মুসলিম সন্তানরা তাদের দীন রক্ষার জন্য আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এই হামলাগুলো করেছে। অত্যাচারীদেরকে তাদের অপরাধের সমান সমান শাস্তি দিয়েছে।

যুগের ফেরাউন বুশ ইরাকে আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে, আমেরিকার মিত্র ইসরাইল মার্কিনিদের বিমান ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ির ওপর বোমা হামলা করছে, নির্দয়ভাবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে—তাদের এই বর্বরতা দেখেও কীভাবে তোমাদের দেশের শাসকরা এই অপরাধীদের দলে যোগ দেয়? নূন্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলেও তো কেউ এই গণহত্যার পক্ষে থাকার কথা না। ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইবোনদের ওপর নির্যাতন তো নতুন কোনো বিষয় নয়, যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর এই অত্যাচার চালানো হচ্ছে। [আমেরিকা-ইসরাইলের এত বর্বরতা দেখেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।] কিন্তু যখনই আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের

প্রতিরক্ষার জন্য কিছু করলাম, তখনই পুরো বিশ্ব নড়েচড়ে বসল, চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল এবং তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধোঁয়া তুলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে ফেলল। হোয়াইট হাউজের দস্যুবাহিনীর সাথে তোমাদের সরকারদের কী সম্পর্ক? তারা কেন এই দস্যুদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? তোমাদের সরকাররা কি জানে না, হোয়াইট হাউজের এই দস্যুবাহিনীই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কসাই?

ভিয়েতনামের কসাই রামসফেল্ড দুই মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে, আহতদের তো কোনো হিসেবই নেই। ডিক চেনি আর কলিন পাওয়েল মিলে বাগদাদে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তা হালাকু খানকেও ছাড়িয়ে গেছে। এত কিছু জানার পরেও তোমাদের শাসকরা কেন আফগানিস্তানে আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য আমেরিকাকে সাহায্য করছে? আমি বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ার কথা বলছি।

অস্ট্রেলিয়াকে আমরা আগেও আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক করেছি। পূর্ব তিমুরকে আলাদা করার মতো ঘৃণ্য কাজেও তারা শরীক ছিল। কিন্তু তারা আমাদের সতর্কবার্তা আমলে নেয়নি। অবশেষে যখন বালিতে তাদের নাগরিকদের ওপর হামলা হয়েছে, তখন তাদের হুঁশ ফিরেছে। কিন্তু এরপরও অস্ট্রেলিয়ান সরকার নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে যে, তারা না-কি এই হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল না।

তিউনিসিয়া, ফাইলাকা, বালি, করাচি ও আম্মানে তোমাদের ও তোমাদের মিত্রদের লাশ দেখে যদি কষ্ট পাও, তাহলে ফিলিস্তিন আর ইরাকে প্রতিদিন আমাদের যে শিশুদের তোমরা হত্যা করছ, তাদের কথা মনে কোরো। আফগানিস্তানে অনুষ্ঠান চলাকালে বোমা হামলা করে যাদের হত্যা করেছ, তাদের কথা স্মরণ কোরো।'[৫৪]

বালি অপারেশনের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন ভাই পরে গ্রেফতার হন। তাঁদের মধ্যে আলী আমরোযি, হুদা বিন আব্দুল হক এবং ইমাম সামুদারা উল্লেখযোগ্য। তাগুত আদালত তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। সে রায়ের ভিত্তিতে গুলি করে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অন্যদিকে হামলার সাথে জড়িত আরেক ভাই নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ তাওব-সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করার জন্য ২০০৯ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। তাঁরা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন, আমীন।

[৫৪] শায়খ উসামার চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

## বালি অপারেশনের বাহাদুর মুজাহিদগণ


ইমাম সামুদারা


নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ তাওব


হুদা বিন আব্দুল হক


আলী আমরোযি

## পূর্ব আফ্রিকায় ইহুদীদের ওপর হামলা : ২৩শে রমযান ১৪২২ হিজরী, ২৮শে নভেম্বর ২০০২

### ইসরাইলি বিমান লক্ষ্য করে দু'টি মিসাইল নিক্ষেপ এবং একটি ইহুদীবাদী হোটেল আক্রমণ

মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোলের ওপর সফল বোমা হামলার আগে ও পরে মুসলিম বিশ্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হলো ফিলিস্তিনে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূচনা। প্রথম ইন্তিফাদার অস্ত্র ছিল পাথর আর দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় পাথরের বদলে ফিলিস্তিনিরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং ইস্তিশহাদী হামলার সূচনা হয়। পরিস্থিতির এই আমূল পরিবর্তনের ফলে শায়খ উসামা রহ. পূর্ব আফ্রিকায় জিহাদী অপারেশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং এবার সরাসরি ইহুদীদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করেন। শায়খ রহ. হারুন ফযল কুমুরীকে এ কাজের দায়িত্ব দেন। হারুন ফযল রহ. নির্বাচিত ১১ জন ভাইকে নিয়ে একটি সেল তৈরি করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—ভাই আবু ইউসুফ তানজানী ওরফে সালেহ নাবহান, আবু সাঈদ কীনী এবং তালহা সুদানী, তিনি পরবর্তীতে পূর্ব আফ্রিকার দায়িত্বশীল নির্বাচিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের ওপর রহমত করুন।


সালেহ নাবহান


হারুন ফযল


তালহা সুদানী



হত্যার ক্ষণিক আগে বাবার পেছনে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টারত শিশু মুহাম্মাদ দুররাহ : ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০০



বাবার কোলে লুটিয়ে পড়া মুহাম্মাদের নিথর দেহ

২০০০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হৃদয়বিদারক একটি ঘটনা ঘটে। ইহুদীরা অসংখ্য টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ফিলিস্তিনি শিশু মুহাম্মাদ দুররাকে তার বাবার কোলেই হত্যা করে। ইহুদীদের এই বর্বরতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুজাহিদরা পূর্ব আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বার্থে হামলার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে কেনিয়ার নাইরোবি অপারেশনের সময়ও ভাইয়েরা মার্কিন দূতাবাসের পাশাপাশি ইসরাইলি দূতাবাসে হামলা করতে চেয়েছিলেন। হামলা করাটা তুলনামূলক সহজও ছিল। কিন্তু ইসরাইলি দূতাবাসের পাশেই কেনিয়ার শিশুদের একটি স্কুল থাকায় তারা হামলা থেকে বিরত ছিলেন।

সব কিছু নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ শেষে দুটি টার্গেট ঠিক করা হয়। এক. দুটি SAM-7 মিসাইল নিক্ষেপ করে ইসরাইলি 'এল আল' কোম্পানির একটি বিমান ভূপাতিত করা এবং দুই. মিসাইল হামলার সাথে সাথে হোটেল প্যারাডাইসেও হামলা চালানো। কারণ, বেশিরভাগ ইহুদী এই হোটেলেই অবস্থান করত। পর্যটন মৌসুমে কেনিয়াতে প্রতি সপ্তাহে 'এল আল' এয়ারলাইন্সের দু'টি ফ্লাইট থাকত। প্রথমবার ইহুদী পর্যটকদের নিয়ে কেনিয়ায় আসত এবং দ্বিতীয়বার কেনিয়ায় থাকা অন্যান্য ইহুদী পর্যটকদের নিয়ে যেত। সব ইহুদী পর্যটক এই হোটেল প্যারাডাইসেই অবস্থান করত।

অপারেশন কীভাবে চালানো হবে—সে ব্যাপারে বেশকিছু প্রস্তাব উঠেছিল। সবগুলো নিয়েই বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনাও হয়েছিল। প্রস্তাবগুলো হলো—

১. নতুন ফ্লাইটে আসা ইহুদীদের লক্ষ্য করে প্রথমে বিমানবন্দরে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হবে, তারপর কেনিয়ায় থাকা ইহুদীদের নিয়ে বিমান যখন আকাশে উড়বে, তখন বিমানের ওপর হামলা করা হবে। কারণ, যত দেরিই হোক কেনিয়ায় অবস্থানরত ইহুদীদের ফিরিয়ে নিতে বিমান আকাশে উড়বেই।

২. বিমানবন্দরেই দুটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হবে। একটি নতুন আসা ইহুদীদের লক্ষ্য করে, দ্বিতীয়টি ফিরতি ফ্লাইটে কেনিয়া ছাড়ার জন্য অপেক্ষমান ইহুদীদের লক্ষ্য করে।

৩. নবাগত ইহুদীদের বহনকারী বাসগুলো যখন বিমানবন্দর ছেড়ে বের হবে, তখন বাসের কাছে প্রথম গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হবে। তারপর কেনিয়া থেকে ইহুদীদের নিয়ে উড়াল দেওয়া বিমান লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়া হবে।

৪. অবতরণের আগেই নবাগত ইহুদীদের বহনকারী বিমানে হামলা করা হবে, তারপর কেনিয়া ছাড়ার জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষমান ইহুদীরা যখন বিমান না পেয়ে হোটেলে ফিরতে শুরু করবে, তখন তাদের লক্ষ্য করে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করা হবে।

৫. ফিরতি ফ্লাইটে কেনিয়া থেকে ইহুদীদের নিয়ে বিমান যখন আকাশে উড়বে, তখন প্রথমে বিমানে হামলা করা হবে। তারপর নতুন আসা ইহুদীদের লক্ষ্য করে হোটেলে গাড়ি বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।

১৪২২ হিজরীর ২৩শে রমযান মোতাবেক ২০০২ সালের ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিবিসি সোয়াহিলিতে একটি খবর প্রচারিত হয়—'হোটেল প্যারাডাইসের রিসিপশন এরিয়ায় একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। রিসিপশন এরিয়ায় তখন ১৫০ জন ইহুদী অবস্থান করছিল।' এ খবর শুনে ভাইয়েরা সিজদায় লুটিয়ে পড়েন, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করেন। হোটেল প্যারাডাইসের হামলাটি ভাই আবু সাঈদ কীনী রহ. চালিয়েছিলেন।

অন্যদিকে মোম্বাসা বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করা ইসরাইলি 'এল আল' বিমান লক্ষ্য করে দুটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মিসাইলদুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ভাই হারুন ফযল তাঁর আল-হারবু আলাল ইসলাম বইয়ে লিখেছেন—অপারেশন পরিচালনার জন্য যে প্রস্তাবগুলো সামনে ছিল, তার মধ্যে প্রথম দুটি প্রস্তাবের কোনো একটি অনুযায়ী যদি হামলা চালানো হতো, তাহলে বিপুল সংখ্যক ইহুদীকে হত্যা করা সম্ভব হতো। কারণ, তখন ইহুদীরা ভাইদের হাতের নাগালেই থাকত। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা তো আর পূরণ হয় না। অপারেশন বাস্তবায়নকারী ভাইয়েরা এ ব্যাপারে দ্বিমত করেন। ইস্তিশহাদী হামলার চেয়ে বিমান ভূপাতিত করার ব্যাপারেই তাদের আগ্রহ ছিল বেশি। ভাইয়েরা শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে, মিসাইল বিমানে আঘাত করবেই। কোনো কারণে যে এটি লক্ষ্যভ্রষ্টও হতে পারে—এ সম্ভাবনার বিষয়টি তারা ভেবেই দেখেননি। অবশেষে আমীর তালহা সুদানীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পঞ্চম প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে বিমানে আক্রমণ করা হবে, তারপর হোটেলে ইস্তিশহাদী হামলা করা হবে।

এই অভিযান সম্পর্কে আল-কায়েদা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়—

'চার বছর আগে যে জায়গাতে ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোটের ওপর হামলা করা হয়েছিল, নাইরোবি ও দারুস সালামের যে ভূখণ্ডে মার্কিন দূতাবাস গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সে জায়গা থেকেই আল-কায়দার মুজাহিদগণ আবারও জেগে উঠেছে। পুনরায় তারা এই জোটের ওপর বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবার তারা আঘাত করেছে ইহুদীদের ওপর। তাঁরা ইহুদীদের জানিয়ে দিতে চায়—'দুনিয়ায় তোমরা বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছ, আমাদের পবিত্র ভূমিকে অবৈধভাবে দখল করেছ, আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অপরাধ করেছ, আমাদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছ, তাদের ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছ, গাছগাছালি ধ্বংস করেছ—মনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেকটি অন্যায়ের সমান বদলা নেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। এগুলো এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমরা তোমাদের ওপর এমন আঘাত হানব, যার ভয়াবহতা তোমাদের নৃশংসতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের সন্তানদের বিনিময়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করা হবে, আমাদের নারীদের বিনিময়ে তোমাদের নারীদের আর বৃদ্ধদের বিনিময়ে বৃদ্ধদের হত্যা করা হবে। আমাদের বাড়িঘরের বদলা নেওয়া হবে তোমাদের প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলো গুড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। তোমরা আমাদের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়েছ, আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছ, আমরাও তোমাদের ভয় ও আতঙ্কের জীবন উপহার দেব। জলে, স্থলে কিংবা আকাশে—যেখানেই থাক না কেন, আমরা সেখানেই তোমাদের পেছনে ছুটে যাব।

ঠিক এই সময়ে ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তু টার্গেট করে মোম্বাসা অপারেশন সংঘটিত হওয়া কাকতালীয় কোনো বিষয় নয়। এই হামলার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই হামলা আমাদের সামনে কিছু বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. মুজাহিদগণ এমন একটি সময়ে নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হয়েছেন, যখন গোটা পৃথিবী তাঁদের বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে নেমেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে তাঁদের হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অভাবনীয় এই সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে, মুজাহিদদের বরকতময় হামলার কারণে বৈশ্বিক তাগুতি শক্তি একেবারে অসহায় ও নাজেহাল হয়ে পড়েছে। তাই তো পাগলের মতো তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

২. ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোট ভেবেছিল, বড় বড় যুদ্ধজাহাজ আর নৌবহর দিয়ে হর্ন অফ আফ্রিকাকে ঘিরে ফেলে এ অঞ্চলে মুজাহিদদের সব কার্যক্রম বন্ধ করে ফেলা যাবে, তাঁদের জাগরণ ঠেকানো যাবে এবং বহির্বিশ্ব থেকে তাদের কাছে কোনো ধরনের সাহায্য-

সহযোগিতা পৌঁছানোর পথ বন্ধ করা যাবে। এতে এ অঞ্চলে তাদের কৌশলগত স্বার্থগুলোও রক্ষা পাবে এবং চার বছর আগে হওয়া হামলার মতো কোনো দুর্ঘটনাও আর ঘটবে না। কিন্তু এই হামলার কারণে তাদের সব স্বপ্ন মাঠে মারা গিয়েছে, তাদের সব চেষ্টা চরমভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

৩. বরকতময় এই হামলাটি ছিল মোসাদের গালে অপমান ও লাঞ্ছনার চরম মাত্রার দ্বিতীয় থাপ্পড়। প্রথম থাপ্পড় তো তারা জেরবার সিনাগগ হামলার মাধ্যমেই পেয়েছিল। মোসাদের মতো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকবার এমন অপমানের মুখোমুখি হয়েছিল। 'যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে, যে-কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারে'—এ ধরনের প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে মোসাদের যে কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত একটি রূপ দাঁড় করানো হয়েছিল, এ হামলার ফলে সেই কাল্পনিক রূপটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এরিয়েল শ্যারন গর্ব করে বলেছিল, 'ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ বা বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রতি যদি কেউ হুমকি তৈরি করে, [সে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, মোসাদের] হাত থেকে সে কিছুতেই রেহাই পাবে না।' কিন্তু এই হামলাটি সেই [অপ্রতিরোধ্য ও দুর্দমনীয়] হাতটিকেই ভেঙে ফেলেছে।

৪. ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোট ও তাদের মিত্ররা নিজেদের বিমানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উন্নত করার পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। তারপরেও শেষ রক্ষা হয়নি। মুজাহিদরা বাহির থেকে বিমানের ওপর হামলা করে বসেছেন। এ হামলাটি তাদের সামনে অসংখ্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উন্নত করলেও বাহির থেকে আসা আক্রমণ কীভাবে প্রতিহত করবে তারা? এর কোনো সদুত্তর তাদের কাছে নেই।

৫. এ অপারেশনের আরেকটি বার্তা হলো, যে-সকল জাতি আমেরিকা ও ইসরাইলের শাসকদের মতো খুনি, রক্তপিপাসু ও দস্যুদের হাতে নিজেদের শাসনক্ষমতা তুলে দেবে, শাসকদের অপকর্মের পরিণতি তাদেরও ভোগ করতে হবে। আল্লাহর আযাব থেকে তারাও রেহাই পাবে না, মুজাহিদরাই তাদের ওপর আসমানি আযাব নামিয়ে আনবে। এটি নিছক কোনো দাবি না। উম্মাহর শত্রুদের ঘুম হারাম করে দেওয়া বালির ঘটনা এবং পরবর্তী অপারেশনগুলোই এই দাবির জলজ্যান্ত প্রমাণ।

৬. এই অপারেশন সারা দুনিয়ার মুসলিমদের সুসংবাদ দিচ্ছে যে, মুজাহিদগণ তাঁদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের সাথে আছেন, তাঁরা নিজেদের পথে অবিচল, আল্লাহর রাস্তার সকল বিপদাপদে তাঁরা আজর ও সওয়াবের প্রত্যাশী, উম্মাহর দুর্দশা দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। আল্লাহর রহমতে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ এখনো তাঁদের হাতেই আছে, নিজেদের

পছন্দমতো জায়গা ও সময় নির্বাচন করে শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আকস্মিক আঘাত হানার সক্ষমতাও তাঁদের আছে।

৭. পরিশেষে এই অপারেশন ঘোষণা করছে যে, আরব-অনারব, সাদা-কালো আর দেশ-পরিচয়ের সব ভেদাভেদ ভুলে পুরো মুসলিম জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া এই আক্রমণকে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করছে।

আফ্রিকা মহাদেশের এই অধিবাসীরাই ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ভূমি দখল করেছে, সম্পদ লুট করেছে, তাদের দিয়ে বেগার খাটিয়েছে, নূন্যতম মানবাধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছে। ইস্পাতকঠিন বাহুবলের অধিকারী নির্যাতিত নিষ্পেষিত আমাদের এই ভাইদের আমরা আহ্বান করছি, মোম্বাসা অপারেশনের বীরদের দেখুন, তাদের পদাংক অনুসরণ করুন, ভূমিদস্যু ও সাম্রাজ্যবাদী এই ইহুদী-খ্রিষ্টানদের জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলুন।

পরিশেষে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আপনারা বিভক্তি ও দলাদলি ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ হোন। জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের এই আগ্রাসনের মোকাবিলায় নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। মুসলিমদের নির্মূল করা, তাঁদের ঈমান-আকীদার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলা এবং মুসলিমদের ভূমি দখল করে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু লুটে নেওয়াই হলো এই আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্য। মুসলিমদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত, এই শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক কিছু করার সক্ষমতা আপনাদের আছে। শত বছরের স্থবিরতা আর শুধু মার খেয়ে যাওয়ার সময় ফুরিয়েছে। পরাজয় ও হতাশার যে গোলকধাঁধায় শত্রুরা আমাদের আজীবনের জন্য বন্দি রাখতে চেয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় তার সমাপ্তি ঘটেছে। ইনশাআল্লাহ সামনের দিনগুলো হবে বিজয়, সম্মান ও মর্যাদার দিন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

‘যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দু’জন লোক—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন—বলল, তোমরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা রাখো, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।’ [সূরা মায়েদা (৫) : ২৩]

আপনাদের এই ভাইয়েরা নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে, সম্পদ ও সময় ব্যয় করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সেটাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে, অবিচলতার সাথে শত্রুর মোকাবিলা

করলে এই উম্মতের পক্ষেও বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব, ইনশাআল্লাহ। এ পর্যায়ে আমরা মুসলিমদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আমেরিকা ও তার দোসররা ইরাকের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করছে, কোনোভাবেই তা মেনে নেওয়া যাবে না। মার্কিনিদের ফাঁদে কিছুতেই পা দেওয়া উচিত হবে না; বরং ইরাকবাসীর উচিত সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করা, একজন দখলদার আমেরিকানও যেন ইরাকের মাটিতে পা ফেলতে না পারে তা নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। মার্কিনিরা যেন বুঝতে পারে, ইরাকের মাটিতে তাদের জায়গা হবে না, ইরাকের আকাশ তাদের ছায়া দেবে না আর ইরাকের জনগণও নিজেদের মধ্যে তাদের উপস্থিতি কিছুতেই মেনে নেবে না। আল্লাহু আকবার, সম্মান তো আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।'[৫৫]

এতক্ষণ যে অভিযানগুলোর কথা আলোচনা করা হলো, এগুলো ছিল শায়খ উসামার প্রসিদ্ধ সেই কসমের বাস্তবায়ন। তিনি কসম করে বলেছিলেন—'হে আমেরিকা, তোমরা ততদিন শান্তির কল্পনাও করতে পারবে না, যতদিন না আমরা ফিলিস্তিনে শান্তিতে বাস করতে পারব এবং যতদিন না তোমাদের কাফের সেনাবাহিনী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমি থেকে বের হয়ে যাবে।' শায়খের কণ্ঠে যেন জলীলুল কদর সাহাবী খালেদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর কথা ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্নাসারীন শহর অবরোধ করার পর শহরের বাসিন্দারা যখন কোনোভাবেই ফটক খুলতে রাজি হচ্ছিল না, তখন তিনি বলেছিলেন—'আমাদের থেকে কোথায় পালাবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যদি মেঘের পেছনে গিয়েও লুকিয়ে থাকো, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন অথবা বৃষ্টির সাথে তোমাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

## আল-কায়েদার অর্জন

এ সকল অভিযানের ফলে আল-কায়েদা কী অর্জন করতে পেরেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবার আমরা পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি।[৫৬]

১. শায়খ উসামা রহ. ও আল-কায়েদার দাওয়াতের ফলেই পৃথিবীজুড়ে ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়েছে। ইসলামের পক্ষে আছে মুসলিম জাতির বীর সন্তানরা

[৫৫] আল-বাত্তার আর্কাইভ

[৫৬] সালেম মাক্কী রচিত 'শিফা-উ সুদুরিল মুমিনীন : বাইনা ইয়াদায়িল আমালিয়্যাত ফিল মুকাল্লা ওয়া ফাইলাকা ওয়া বালি' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

এবং আল-কায়েদার অগ্রসেনানীরা। অন্যদিকে কুফরের পক্ষে আছে মুসলিমদের পবিত্র ভূমি দখল করে ধনসম্পদ লুট করতে থাকা ক্রুসেডার-জায়োনিস্ট জোট।

২. এই অভিযানগুলোর ফলে উম্মতের যুবকদের চিন্তা-চেতনায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জযবা সৃষ্টি হয়েছে এবং মুরতাদ শাসকদের মতো ছোটখাটো তাগুতের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করে সবচেয়ে বড় তাগুত ও প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আঘাত হানার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। যুদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে জানাশোনা আছে এমন যে-কেউ বলবে, সকলের লক্ষ্যকে একটি লক্ষ্যে পরিবর্তন করা, সকলের চেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সেই একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যই নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা সমরবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি।

৩. আফগানিস্তানের ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলোতে যুবকদের মধ্যে আল-কায়েদা প্রশিক্ষণের যে চারাগাছ রোপণ করেছিল, সময়ের সাথে সাথে তা বেড়ে উঠেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার ফলও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে মুজাহিদরা বাতিলকে রীতিমতো নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছেন, তাদের অধিকাংশই আল-কায়েদার আল-ফারুক ক্যাম্প থেকেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৪. হারামাইনের ভূমিতে মার্কিন বিমান ভূপাতিত করার চেষ্টা, তিউনিসিয়ার সিনাগগে বোমা বিস্ফোরণ, ইয়েমেনে দুটি জাহাজকে ধ্বংস করা, কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপের মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা, ইন্দোনেশিয়ায় নাইট ক্লাবে আক্রমণ-সহ এ ধরনের অভিযানগুলোর মাধ্যমে আল-কায়েদা বুঝিয়ে দিয়েছে, জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে হামলা করার জন্য তাদের কাছে মুসলিম ভূখণ্ড বা আরব ভূখণ্ড সব সমান। মুসলিম ভূখণ্ডের ভেতরে থাকা জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের স্বার্থের ওপরেও তারা হামলা করবে। পৃথিবীর কোথাও তারা নিরাপদ না।

৫. এ হামলাগুলোর ফলে প্রমাণিত হয়েছে, ৯/১১-এর আগে ও পরে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমেরিকা যত ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে আর যতগুলো গোয়েন্দা সংস্থা মার্কিন নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে, এ সবই মূলত মিডিয়ার অতিরঞ্জন আর বাড়াবাড়ি। তাদের বানানো এই মিথ্যা উম্মাহর সে সন্তানদের কাবু করতে পারবে না, যারা মনে প্রাণে নিজেদেরকে আল্লাহর পথে সঁপে দিয়েছে।

৬. আফগানিস্তানে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে মার্কিন হামলার ফলে আল-কায়েদার মধ্যে যুগান্তকারী এক পরিবর্তন এসেছে। আল-কায়েদার বাহ্যিক অবয়ব আফগানিস্তানে উধাও হয়ে গেছে, নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসা সংগঠনের স্বভাব থেকে বের হয়ে আল-কায়েদা এক অদৃশ্য জটিল দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে, সাংগঠনিক অবকাঠামো ত্যাগ করে

আল-কায়েদা এখন মতাদর্শ ও আইডিওলজি হিসেবে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আল-কায়েদাকে বিলুপ্ত করা অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মার্কিন সরকার এখন পদে পদে নিজেদের এই চরম বোকামির খেসারত দিচ্ছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

'তোমরা একে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর ভেবো না; বরং তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর।'

[সূরা নূর (২৪) : ১১]

৭. আল-কায়েদা অত্যন্ত সফলতার সাথে উম্মাহর মধ্যে নিজেদের চিন্তা ও আদর্শের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পেরেছে। কেনইবা তা হবে না? আল-কায়েদার এই চিন্তা ও আদর্শ তো ইসলামের স্বচ্ছ আকীদা থেকেই উৎসারিত। ফলে উম্মতও বুঝেশুনেই এই চিন্তা ও দর্শনকে গ্রহণ করেছে, এই আদর্শের ঝান্ডা নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে জীবনমরণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

৮. আল-কায়েদা উম্মাহর সন্তানদের মন থেকে আমেরিকাভীতি দূর করেছে, শত্রুর দুর্বলতাগুলো উম্মাহর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কীভাবে শত্রুকে আঘাত করতে হবে, কীভাবে ঘায়েল করতে হবে আর কীভাবে খতম করতে হবে—আল-কায়েদা সবকিছুই শিখিয়ে দিয়েছে।

## বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই

মুজাহিদরা একদিকে আমেরিকা ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করছেন, অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনেও কঠিন এক হুমকির মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। দরবারি আলেম আর জিহাদের ময়দান ছেড়ে চলে আসা সাবেক জিহাদীদের সৃষ্ট বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় ব্যবহার করে আমেরিকা ইসলামের এমন একটি সংস্করণ তৈরি করতে চাচ্ছে, যেখানে মার্কিন আধিপত্যবাদ ও স্বার্থের জন্য হুমকি তৈরি করে—এমন কোনো চেতনা ও আদর্শের অস্তিত্ব থাকবে না। ইতিদাল ও মধ্যপন্থা এবং উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ-বিরোধিতার মতো চটকদার সব শিরোনামে ইসলামের নতুন এই সংস্করণ প্রচারের কাজ তারা বেশ জোরেশোরেই করছে।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন রশীদ তুয়াইলিয়ী রহ. তার 'হাশীমুত তারাজুয়াত' বইয়ে লিখেছেন—

> 'আল্লাহ তাআলা হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে রাসূলদের পাঠিয়েছেন আর সকল দীনের ওপর এই দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েছেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। দীন প্রতিষ্ঠা ও মুমিনদের বিজয় অর্জনের পথে তিনি কঠিন সব পরীক্ষা রেখে দিয়েছেন। এতে আল্লাহর অন্তহীন হিকমত নিহিত রয়েছে। 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমলকারীদের

বাছাই করতেই' আল্লাহ তাআলা জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। মুমিনরা যদিও দ্রুত বিজয় চায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা বিলম্বিত করতে থাকেন, এর মধ্যেও আল্লাহ তাআলার হিকমত ও মুমিনদের প্রতি দয়া লুকিয়ে আছে। সেই হিকমত কী, সেটাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন—'যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের যাচাই করতে পারেন আর কাফেরদের ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।' বিজয়ের ধারা যদি চলতেই থাকে, কখনো বন্ধ না হয়; কোনো বিপদ-আপদ যদি না আসে, কোনো পরীক্ষা যদি না থাকে; আজকের দিন যদি গতকাল থেকে ভালো হয় আর আগামীকাল যদি আজকের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তাওহীদের সারিতে এমন লোকেরাও ঢুকে পড়বে, 'যারা তোমাদের সাথে বের হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই করবে না এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির জন্য তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে সর্বাত্মক দৌড়ঝাঁপ করবে'। কিন্তু এমনটা হতে পারে না। 'তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এভাবে রাখবেন না। তিনি অবশ্যই ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করবেন।'

আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে—সব পরিস্থিতিতেই আনুগত্য করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা চান, বান্দা সুখের সময় কিছু আমল করবে আর কষ্টের সময়ও কিছু আমল করবে। এ জন্যই বান্দা কখনো সুখে থাকে, কখনো দুঃখে থাকে, কখনো অভাবে থাকে, তো কখনো স্বচ্ছলতায় থাকে। এ সবই আল্লাহর হিকমত এবং কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাদের নির্বাচন করার প্রক্রিয়া।

সাধারণ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহর এই নীতি হয়, তাহলে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বেলায় পরীক্ষা আরও বেশি কঠিন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আঘাত পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, যন্ত্রণা সহ্য করা, নিহত ও বন্দি হওয়া—এ সবকিছুই এ পথের বৈশিষ্ট্য। সম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, চোখের সামনে অনেকের জীবন হারানোর দৃশ্য, আপনজন থেকে বিচ্ছেদ—এগুলো তো এ পথের অপরিহার্য বিষয়, এ সব ছাড়া তো এই পথ কল্পনাই করা যায় না। যেহেতু এই ইবাদতে পরীক্ষা বেশি, তাই আল্লাহর প্রতি বান্দার দাসত্ব ও গোলামি কতটুকু আছে—সেটাও এখানেই প্রকাশিত হয় বেশি। এ পথের পথিকদের তাই সর্বাবস্থায় সবর করার আদেশ করা হয়েছে—'তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় বের হও আর জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো।'

এই পথের দুর্গমতা দেখে, বিপদ ও কষ্ট দেখে, এই ইবাদতের কাঠিন্য দেখে কেউ যদি টিকতে না পারে, পিছুটান দেয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যারা পিছিয়ে যাওয়ার, তারা পিছিয়ে যাবেই; যারা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার, তারা মুখ ফিরিয়ে নেবেই। এমনটা যদি

না হয়, সবাই যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে এই বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার তো কোনো অর্থই থাকবে না; দাঁত কামড়ে যারা বিপদের মোকাবিলা করে, সকল পরীক্ষায় যারা সবর করে, তাদের তো কোনো মূল্যই থাকবে না।'

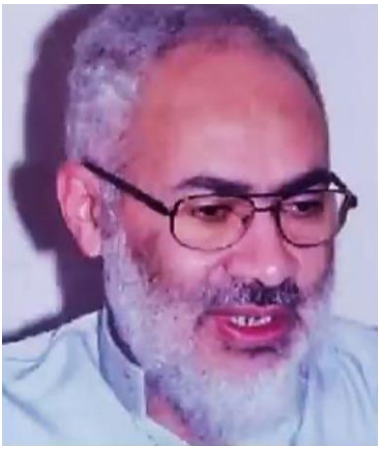
শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. তাঁর 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী' বইয়ে লিখেছেন—

'আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর [মিশরে] ব্যাপকভাবে ধরপাকড় ও হয়রানি শুরু হয়। এই ধরপাকড়ের লক্ষ্য ছিল ইসলামী আন্দোলনের মনোবল ভেঙে দেওয়া। জিহাদী দলগুলো ছিল ইসলামী আন্দোলনের শেকড়, তাই জিহাদী দলগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চিরুনি অভিযান চালানো হয়। যাকি বদর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই পলিসি আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা শুরু হয় এবং ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হতে থাকে। সে প্রকাশ্যে বলতে শুরু করে, ইসলামী দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য এর হৃৎপিণ্ডে আঘাত করতে হবে।

এই ধরপাকড় আর হামলা-মামলার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট—মুসলিম যুবকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করা, তাঁদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া যে, বিদ্রোহ, বিপ্লব আর আন্দোলন করে কোনো লাভ হবে না; বরং এগুলো তোমাদেরকে শুধু বিপর্যয়ের দিকেই নিয়ে যাবে। তাই, বাঁচতে চাইলে সরকারের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং আমেরিকা-ইসরাইলের প্রতি তাদের নমনীয় নীতি মেনে নিতে হবে। 'আন্দোলন করে লাভ নেই' এই মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমেই মূলত এ অঞ্চলে ইহুদীদের সম্প্রসারণবাদী নীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। ইহুদীরা বুঝতে পেরেছিল, তারা যত চেষ্টাই করুক জায়নবাদবিরোধী আন্দোলনকে পুরোপুরি দমন করতে পারবে না। এই আন্দোলনকে নির্মূল করার একটাই উপায়—মুসলিমদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দেওয়া। আর এই হতাশা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক ধরপাকড়, দমন-পীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে হবে; ইসলামী আন্দোলনের এমন ভয়াবহ পরিণতি করতে হবে এবং সরকারবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে হবে, যেন ভবিষ্যতে কেউ আন্দোলনের নামও মুখে উচ্চারণ করার সাহস না পায়। এভাবেই সকলের মনে ভয়-ভীতি ও হতাশা সৃষ্টি হবে।'

ইহুদীরা বুঝতে পেরেছিল, মুসলিমদের কীভাবে কাবু করতে হবে। তাই নিজেদের আঞ্চলিক দোসরদের দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে কিছু জিহাদী দলের মধ্যে হতাশা তৈরি করতে সক্ষম হয়। এমনকি জিহাদী আন্দোলনের অনেক নেতা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিকেও তারা কাবু করে ফেলে। তাঁদের মধ্যে অনেকে এখন মনে করেন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর আন্দোলন

করে কোনো লাভ হবে না। এই হতাশা থেকেই কিছু জিহাদী দল ও নেতারা পুনর্বিবেচনার নামে পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসতে থাকে। তাদের এই পশ্চাদপসরণের বিষয়টিই [আরববিশ্বে] 'তারাজুয়াতুল জামাআতিল ইসলামিয়্যাহ (ইসলামী দলসমূহের পশ্চাদপসরণ)' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ডক্টর ফযল (সায়্যিদ ইমাম) হাফি.-ও পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'তারশীদুল আমালিল জিহাদী (জিহাদী কার্যক্রমের নির্দেশনা)' নামের রিসালা লেখেন। রিসালাটি প্রকাশের পর এমন অনেক শায়খও জিহাদের পথ ছেড়ে দেন, যারা একসময় জিহাদ ও মুজাহিদদের আশা-ভরসার পাত্র ছিলেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে সঠিক পথে অটল অবিচল রাখেন, তাঁদেরকেও উত্তমভাবে হক পথে ফিরিয়ে আনেন।



ডক্টর ফযল সায়্যিদ ইমাম হাফিযাহুল্লাহ

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. তাঁর 'تبرئة أمة القلم والسيف من منقصة تهمة الخور والضعف' বইয়ে তাদের এই তারাজুআত বা পশ্চাদপসরণের সারনির্যাস তুলে ধরেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হলো—

> '[পুনর্বিবেচনার নামে তাদের পশ্চাদপসরণের সারকথা হলো,] মুজাহিদ ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাঁদের কর্মপন্থার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যেই সংশয় তৈরি করা এবং যে-কোনো ভাবে তাঁদেরকে জিহাদের ময়দান থেকে বের করে নিয়ে আসা। এ জন্য কখনো তারা দুর্বলতা ও অপারগতার অজুহাত দেখান, কখনো বলেন—জিহাদের শর্ত পূরণ হয়নি, আবার কখনো বলেন—জিহাদ করে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব না।'

একসময় যারা জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যাদের দেখে মানুষ জিহাদ শিখেছে, তারাই জিহাদ ছেড়ে দিয়ে উলটো জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করা শুরু করলেন, মুজাহিদদের মানহাজ ও কর্মপন্থার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, তাঁদের এই জিহাদবিরোধী প্রচারণায় সাধারণ মানুষের কথা না-হয় বাদই দিলাম, দুর্বলমনা ও অপরিপক্ক চিন্তার অধিকারী মুজাহিদরা কতটা প্রভাবিত হবে! কতটা হতাশা ও নিরাশা তাঁদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে!! এ সকল শায়খরা হয়তো ভুলেই গিয়েছেন, তাঁরা এখন যে কাজটি করছেন, জায়োনিস্ট-ক্রুসেডাররা মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য এই কাজটিই করতে বলে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড নিয়ে লেখা প্রবন্ধ ও বইগুলোতে তারা এই পদ্ধতিই অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ৯/১১-এর পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ওয়ার অন টেররের নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু আমেরিকার এই চাল বুমেরাং হয়। এই আক্রমণের ফলে আল-কায়েদার মধ্যে যুগান্তকারী এক পরিবর্তন সাধিত হয়। আফগানিস্তানে থাকা সিংহভাগ জিহাদী দল একমত হয় যে, শায়খ উসামার আদর্শই জিহাদকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম আর এ জন্যই শায়খের উচিত আল-কায়েদার আদর্শকে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তখন মার্কিন প্রশাসন বুঝতে পারে, তারা বিরাট বড় এক ভুল করে ফেলেছে। এ হামলার কারণে আল-কায়দা এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে আল-কায়েদাকে আর কিছুতেই নির্মূল করা সম্ভব হবে না। আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার এই অবিবেচনাপ্রসূত হামলার কারণেই শতধা বিভক্ত জিহাদীরা এখন এক কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিনিরা আরও বুঝতে পারে, এই যুদ্ধে জিততে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে জিততে হবে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের কথা আমেরিকার সাবেক সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স ডোনাল্ড রামসফেল্ডও বলেছিল। তার ভাষ্যমতে এই লড়াইয়ের লক্ষ্য হলো—'মন ও মস্তিষ্ক জয় করা এবং জনগণের চেতনাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা।'[৫৭]

ওয়ার অন টেররের চার বছরের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করার পর ২০০৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি পেন্টাগন তাদের কোয়াড্রেনিয়াল ডিফেন্স রিভিউ (চতুর্বার্ষিক প্রতিরক্ষা পর্যালোচনা) প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়—'এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে জিততে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করতে হবে। এ জন্য সন্ত্রাসীদের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে।'

[৫৭] মা'রাকাতুল আহরার বইয়ে এ প্রসঙ্গে চমৎকার আলোচনা আছে। সকলকে তা পড়ার জোরালো আবেদন জানাচ্ছি।

মার্কিন গবেষক ও পলিটিক্যাল সাইন্টিস্ট অ্যাডাম গারফিঙ্কল তার বই 'A Practical Guide to Winning the War on Terrorism'-বইয়ে এ ব্যাপারে লিখেছে—

> 'অমুসলিম কোনো শক্তি যখনই মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, এখানকার মুসলিমদের মন ও মস্তিষ্ক জয় করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছে।'

এখানে সে প্রাচীনকালের সে সব দখলদারদের কথা বলছে, যারা শুধু সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করত। এরপর গারফিঙ্কল আধুনিক দখলদার ও নব্য উপনিবেশবাদীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়ে লিখেছে—

> 'এ যুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য ইসলামের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা দেখিয়ে অনবরত প্রচারণা চালাতে হবে, ক্যাম্পেইন করতে হবে। মুসলিমদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে এই ক্যাম্পেইনের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে সামনে আনতে হবে। মানুষকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, আমেরিকা ইসলামের বিরোধী না, সাধারণ মুসলিমদের ওপরেও তারা কোনো খবরদারি করতে চায় না; বরং চরমপন্থি সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করাই আমেরিকার উদ্দেশ্য। তা-ও শুধু এই কারণে যে, এই চরমপন্থিরা আমেরিকার সাথে অন্যায় করেছে। জনসাধারণকে বাস্তবতা থেকে বিমুখ করে বোকা বানিয়ে রাখার জন্য এ ধরনের প্রচারণা ও ক্যাম্পেইন পরিচালনা করাই মূলত পাবলিক ডিপ্লোমেসির আসল উদ্দেশ্য।'[৫৮]

তথাকথিত এই পাবলিক ডিপ্লোমেসি বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু ক্রুসেডার থিংক ট্যাংক কয়েক বছর ধরে আল-কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদী সংগঠন নিয়ে গবেষণা করেছে।[৫৯] দীর্ঘ এই গবেষণা শেষে মার্কিন সরকারকে তারা এমন কিছু পলিসি বাতলে দিয়েছে, তাদের বিশ্বাস, এ ধরনের জিহাদী সংগঠনকে নির্মূল করার জন্য এই পলিসিগুলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর। তাদের বাতলে দেওয়া এই পলিসিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—জিহাদী দল ও তাঁদের সমর্থক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ উসকে দেওয়া। এ জন্য সাধারণ মানুষের সামনে মুজাহিদদেরকে খুনি, রক্তপিপাসু, বর্বর ও হিংস্র হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি আল-কায়েদার মতো গ্লোবাল জিহাদের আদর্শ লালনকারী সংগঠন এবং আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলোর মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ উসকে দিতে হবে, আঞ্চলিক জিহাদী সংগঠনগুলোকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, আল-কায়েদার আদর্শই

---

[৫৮] মা'রাকাতুল আহরার : আহমাদ সামীর

[৫৯] ওয়ার অন টেররের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এ সকল থিংক ট্যাংকের সাধনা ও অধ্যবসায়ও লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে তারা কতটা শ্রম দেয়, তা একটিমাত্র উদাহরণ থেকেই বোঝা সম্ভব। বিখ্যাত মার্কিন থিংক ট্যাংক র‍্যান্ড কর্পোরেশন ২০০৮ সালে 'How Terrorist Groups End' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। দীর্ঘ চার বছর ধরে ১৯৬৮ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৩৮ বছরের মধ্যে সক্রিয় মোট ৬৪৮টি সন্ত্রাসী সংগঠন নিয়ে গবেষণা করে এই গবেষণাপত্রটি তারা তৈরি করেছিল।

একমাত্র আদর্শ না, দুনিয়ার সব জিহাদী দলও আল-কায়েদার আদর্শ লালন করে না। তাই, তাদের জন্যও আল-কায়েদার আদর্শ গ্রহণ করা জরুরি না। ইরাক ও সিরিয়ার ইতিহাসই এর সবচেয়ে বড় দলীল।

এই থিংক ট্যাংকগুলোর বাতলে দেওয়া পলিসি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুধু ক্রুসেডাররা না, হাজার হাজার দরবারি আলেম, পেন্টাগন ফকীহ আর জিহাদ ছেড়ে দেওয়া সাবেক জিহাদীরাও মাঠে নেমেছে। মুজাহিদদের মানহাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সন্দেহ-সংশয় প্রচার করা শুরু করেছে। এই কথা অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, আমরা যখন গুয়ান্তানামো কারাগারে বন্দি ছিলাম, তখন খোদ আমেরিকানরা আমাদেরকে কিছু বই পড়তে দিত। এই বইগুলোতে বিশ্বের নামকরা চারটি ইসলামী দলের পূর্বের জিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে মডারেট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাদের আশা ছিল, বইগুলো পড়ে আমরাও হয়তো বদলে যাব।

ইউএস মিলিটারি অ্যাকাডেমির কমব্যাটিং টেরোরিজম সেন্টারের গবেষক উইলিয়াম এফ. ম্যাককান্টস ও তার সহযোগীদের বক্তব্য হলো—

> ‘তিন শ্রেণির মানুষ যদি জিহাদীদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে, তাহলে জিহাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১. প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, ২. সাবেক জিহাদীরা এবং ৩. সমকালীন শীর্ষস্থানীয় জিহাদীরা।’[৬০]

মার্কিন থিংক ট্যাংক দ্যা হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের এক সেমিনারে দেওয়া বক্তব্যে জেমস ফিলিপস বলেছিল—

> ‘আপনি যদি কাউকে আল-কায়েদায় যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে চান, তাহলে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, তাকে এ কথা বোঝানো যে, “আল-কায়েদা একটি ব্যর্থ যুদ্ধ লড়ছে, আল-কায়েদার উগ্রতার কারণে পুরো মুসলিম বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আল-কায়েদার কোনো লক্ষ্যই বাস্তবসম্মত না, তাদের কারণে মুসলিমরা সামনে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।” আল-কায়েদাকে নির্মূল করার জন্য মুসলিম রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের সাথে নিয়েই আমেরিকার কাজ করতে হবে।
>
> আল-কায়দাকে যদি আমরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে চাই, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধকেও ময়দানের যুদ্ধের মতো সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রধান লক্ষ্য হবে, যে আকীদা সন্ত্রাসীরা নিজ সমর্থকদের মাঝে প্রচার করে এবং যার ভিত্তিতে তাদের যুদ্ধের বৈধতা তৈরি করে, সে আকীদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, তার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা। সাধারণ মুসলিমদের আশ্বস্ত করতে হবে যে, বিন লাদেনের আকীদা ও বিপ্লবী দর্শন

৬০ ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী (ঈষৎ পরিবর্তিত)

বাস্তবতাবিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য, তাঁর এই মতাদর্শ মুসলিমদের ভয়ংকর ক্ষতির দিকে ঠেলে দেবে। তাদের বোঝাতে হবে, সুন্দর জীবনের জন্য, পরিবার নিয়ে বাঁচার জন্য আর সঠিক ইসলাম চর্চার জন্য বিন লাদেনের দর্শনের চেয়েও উত্তম পথ আছে।

এই কথাগুলো যে-কেউ প্রচার করলে হবে না। মুসলিমদের মধ্য থেকেই গণ্যমান্য রাজনীতিবিদ, আলেম, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে এই যুক্তি ও দর্শনগুলোর প্রচারণা চালাতে হবে। অমুসলিমদের কাজ হলো, এই প্রচারণার কাজে তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করা এবং এর পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সরকারের কাজ হলো, মুসলিম রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক হয়ে আল-কায়েদার ইসলামবিরোধী চিন্তা ও দর্শনের মুখোশ উন্মোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া। আলেমদের দায়িত্ব হলো, সন্ত্রাসীদের বিষাক্ত আকীদার ভাইরাস থেকে মুসলিম যুবকদের রক্ষা করা। মুসলিম ফিল্মমেকারদের কাজ হলো, আল-কায়েদা সমর্থিত তালেবান শাসনামলে আফগান নাগরিকরা যে দমবন্ধ করা করুণ পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করেছে, তা ইসলামী বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। আল-কায়েদার আকীদা-বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সাথে সাথে তাদের সবচেয়ে পছন্দনীয় মিলিটারি ট্যাক্টিক আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারেও নেতিবাচক মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করতে হবে। আমেরিকার কাজ হলো, বিন লাদেনকে পশ্চিমাদের সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের জন্যও হুমকি হিসেবে তুলে ধরা। 'বিন লাদেন যত অমুসলিম হত্যা করেছে, তারচেয়েও অনেক বেশি মুসলিম হত্যা করেছে; যতজন আমেরিকানকে হত্যা করেছে, তারচেয়েও ঢের বেশি আফগানকে হত্যা করেছে'—এই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।'[৬১]

রোহান গুণরত্নের[৬২] বক্তব্য হলো—

'মুসলিমদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে যে, "আল-কায়েদা ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে কুরআনের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা বিকৃত ইসলামের চর্চা করে এবং কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে।" সন্ত্রাসবাদের বিদ্যমান ও অনাগত হুমকি মোকাবিলা করতে হলে, সবার আগে "ভালো মুসলিম হতে হলে জিহাদ করতে হবে"—এই চিন্তার মোকাবিলা করতে হবে।'[৬৩]

---

[৬১] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী

[৬২] রোহান গুণরত্ন একজন শ্রীলংকান প্রফেসর এবং গ্লোবাল সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। বর্তমানে সে সিঙ্গাপুরের নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির (NTU) অধীনস্থ এস. রাজারত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (RSIS)-এ "ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড টেররিজম রিসার্চ (ICPVTR)"-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও ইউএস মিলিটারি অ্যাকাডেমির কমব্যাটিং টেরোরিজম সেন্টারের সিনিয়র ফেলো হিসেবেও কাজ করেছে।

[৬৩] ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী : শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী

গুণরত্নের এই বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী তাঁর 'ফুরসানুন তাহতা রায়াতিন নাবী' বইয়ে লিখেছেন—

> 'তার কথার অর্থ হলো, মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদার কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফরযে আইন বিধানটি বাতিল করতে হবে এবং এই বিধানের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। যাতে এই দখলদারগোষ্ঠী নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মুসলিমদের ধনসম্পদ লুট করতে পারে, তাঁদের ভূমিগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে পারে এবং অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমানা আরও বড় হতে পারে। এর দ্বারাই এ সব গবেষণা আর গবেষকদের নোংরা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর সকল জাতি বিশ্বাস করে, আগ্রাসি শত্রুকে প্রতিহত করা একটি স্বভাবজাত মৌলিক অধিকার। সবার জন্য এটা অধিকার হলেও মুসলিমদের জন্য তা অন্যায় আর সন্ত্রাসবাদ। আর হবেই না বা কেন? তথাকথিত এই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা, মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যম সবই তো তাদের অনুগত; ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেডের অংশীদার। তিনি (গুণরত্ন) আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, সন্ত্রাসবাদের বিদ্যমান ও অনাগত হুমকি মোকাবিলা করতে হলে, এই ফরযে আইন বিধানের মোকাবিলা করতে হবে। অর্থাৎ জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোটের সামনে মুসলিমরা যখন আত্মসমর্পণ করবে, অস্ত্র ফেলে দেবে, কেবল তখনই মুসলিমরা মধ্যপন্থি ও শান্তিকামী বলে গণ্য হবে এবং সন্ত্রাসের তকমা থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু, তারা যদি প্রতিরোধ করতে থাকে, তাহলে সন্ত্রাসীই থেকে যাবে।'

আল্লাহর শত্রুরা যদিও রাতদিন এক করে ষড়যন্ত্র করছে, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এতটাই ভয়াবহ যে, পাহাড় পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম, কিন্তু শেষ হাসি তো মুত্তাকীরাই হাসবে। জিহাদের ময়দান ছেড়ে চলে আসা এই লোকগুলোর এতটুকু বিশ্বাসও যদি থাকত! নিশ্চয়ই আল্লাহর দীনই বিজয়ী হবে, চক্রান্তকারীরা নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে পড়বে, এই উম্মতের একটি দল হকের ওপর চিরকাল অটল থাকবে, কোনো অসহযোগিতাকারী কিংবা বিরোধীই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। যেমনটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন—

**لا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتِي قائمةً بأمرِ اللهِ ، لا يَضُرُّهم مَن خذلهم ، أو خالفهم ، حتى يأتيَ أمرُ اللهِ ، وهم ظاهِرُونَ على الناسِ**

'আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর আদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ (সহায়তা) ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা তখনও মানুষের ওপর বিজয়ী থাকবে।' [সহীহ মুসলিম : ১০৩৭]

আমাদের যে ভাইয়েরা স্বেচ্ছায় ময়দান ছেড়ে চলে এসেছেন অথবা যারা বাধ্য হয়ে তাদের মতো পরিণতি বরণ করে নিয়েছেন, কতইনা ভালো হতো, [মুজাহিদ ভাইদের সমালোচনা না করে] তাঁরা যদি নিজেদের জবান সংযত রাখতেন, তাঁদের ঘরগুলো যদি তাঁদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যেত, নিজেদের ভুলের জন্য যদি তাঁরা কান্নাকাটি করতেন, যারা এখনও জিহাদের পথে অবিচল আছেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আরও অবিচলতার দোয়া করতেন আর নিজেদের ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহর কাছে আরেকটি সুযোগ চাইতেন।[৬৪]

কাফেরদের গৃহীত 'হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানার নীতি'র ভয়াবহতা দেখে হতাশা, নিরাশা আর অক্ষমতা নিয়ে হয়তো তারা জিহাদের ময়দান ছেড়েছেন। কমপক্ষে এখন যদি তারা একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কাফের নেতা উতবা বিন রবীয়ার উপদেশটি মেনে নিয়ে [মুজাহিদদের ব্যাপারে সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতেন, তাহলে কতইনা ভালো হতো।] সে কুরাইশকে লক্ষ্য করে বলেছিল—

> 'হে কুরাইশ, আমার কথা মেনে নাও। তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মতো থাকতে দাও। তোমরাও তাঁর পথ থেকে সরে যাও। খোদার কসম, তাঁর থেকে যে বাণী আমি শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আরবরা যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারে, তবে তো তোমাদের কাজটা অন্যরাই করে দিলো। আর যদি সে আরবদের ওপর জয়ী হয়, তাহলে তাঁর রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব, তাঁর গৌরব মানে তোমাদের গৌরব। তখন তাঁকে পেয়ে তোমরাই বেশি সৌভাগ্যবান হবে।'

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো নিজ ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেই ছাড়েন। যেমনটা তিনি বলেছেন—

﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

'তোমরা কি ভেবেছ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে; অথচ আল্লাহ এখনো প্রকাশ্যে দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪২]

আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আমাদের অন্তরগুলো মজবুত রাখেন, তাঁর দীনকে আঁকড়ে থাকার তাওফীক দেন এবং তাঁর সাথে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তখন যেন তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, আমীন।

---

[৬৪] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ : শায়খ আবু মুসআব সূরী

শায়খ হুসাইন বিন মাহমুদের একটি কবিতায়[৬৫] তাঁদের এই অধঃপতিত পরিস্থিতির দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পাঠকদের জন্য কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়া হলো—

**قتل حربيٍ صائلٍ جريمة لا تُغْتَفَر... وهتكُ عرضِ المسلمات مسألة فيها نظر**

(তাঁদের কাছে) আগ্রাসি সৈন্যকে হত্যা করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, কিন্তু মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লড়াই করা ইখতিলাফী বিষয়।

**ضع السلاح ودسّ رأسًا كالنعامة ... و انسى الجهاد، ليس في القتل سلامة**

(তাদের কথা হলো), অস্ত্র ফেলে দাও, উটপাখির মতো বালুতে মাথা গুঁজে রাখো আর জিহাদের কথা ভুলে যাও। খুনখারাবি করে কি শান্তি আসে?

**اركن كتابًا مُنْزَلًا وسنّة صحيحة ... فليس أحق أن تستفتي منك القريحة**

এ সব ছেড়ে তুমি বরং আল্লাহর কিতাব আর সহীহ হাদীস মানার চেষ্টা করো, কারণ, (এটাই হলো সহজাত সঠিক পথ), সহজাত পথ কখনো তোমার মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না।

**شيخ تولّى حاكمًا خيرٌ من ملَكٌ ... هو المعصوم فحط رَحلًا، لا أمّ لَك**

কোনো শায়খ যদি শাসকের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, তবে সে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও নিষ্পাপ। সুতরাং তার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ বসে থাকো।

**أنا أُخيّ ناصحٌ فخذها مني قاعدة ... إن أردت العيش عيشَ حياة واعدة**

তোমার ভাই ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমার একটি উপদেশ শুনে রাখো। যদি তুমি বাঁচতে চাও আর সুখের জীবন চাও,

**بشّ للنصارى والثم جبهة اليهودِ ... واسأل الله وطئ حاكمٍ مِنكَ الخدود**

তাহলে খ্রিষ্টানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলো, ইহুদিদের কপালে চুমু দাও আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ যেন এমন শাসক দান করেন, যে তোমার কপালে চুমু খাবে।

---

[৬৫] শায়খ হুসাইন বিন মাহমুদ 'হাযিহি হিয়াল কায়িদাহ' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে এই কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন, সাহিত্যমানের বিচারে কবিতাটি হয়তো একেবারেই সাধারণ, বরং এর সাহিত্যমান বলতে হয়তো কিছু নেই, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও মর্ম সঠিক। কবিতার ছত্রে ছত্রে উম্মতের বর্তমান অবস্থা, শাসকদের হাল-হাকিকত আর উম্মতের সন্তানদের তারা যে পথের দিকে ডাকছে, সে পথের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

**كن مسلمًا معتدلًا بمقياس راندِ ... وإن يُجهل عليك فاقتدي بغاندي**

র‍্যান্ডের বাতলে দেওয়া মডারেট মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করো, তা যদি না পারো, তবে গান্ধীর অনুসরণ করো।

**ليس لخالدٍ وسعدٍ والمثنى حقيقة ... أضغاث أحلام الأزمان السحيقة**

খালেদ, সা'দ আর মুসান্নারা তো শুধুই কল্পকাহিনি, পুরোনো দিনের রূপকথা। (তাঁদের অনুসরণ করার কোনো মানে হয় না।)

**لا يهمّك غير جمع قوت أهلك ... دينٌ، جهادٌ، ليس هذا من شُغلك**

তোমার কাজ তো হলো পরিবারের দেখাশোনা করা আর তাদের খাবারের জোগান দেওয়া। দীন প্রতিষ্ঠা বা জিহাদ করা তোমার কাজ না।

**لا تكلَّف نفسٌ إلا نفسها ... وإن هتك العلوج عرض أختها**

সবার উচিত শুধু নিজের চিন্তা করা, যদি কোনো নরাধম নিজের বোনের ইজ্জতেও হাত দেয়, তবু ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

**فارق الخوارج والفئات الضالة ... وإن هي في الوغى لجيش الكفر فالّة**

খারেজি আর পথভ্রষ্ট দল থেকে দূরে থাকো, যুদ্ধের ময়দানে তারা তো কাফেরদের সামনে টিকতেই পারবে না।

**هم العدو وليس بوشٌ أو أوباما ... إنما الصديق من لهتك العرض رامَ**

বুশ বা ওবামা না, শত্রু তো এরাই (মুজাহিদগণ)। মনে রাখবে, যে তোমার সম্ভ্রম লুটতে চাইবে, সেই হলো আসল বন্ধু।

**وإن حرّض ابن لادن يومًا لحربِ ... وصاح في الرجال من كل صوبِ**

বিন লাদেন যদি কখনো যুদ্ধের উৎসাহ দেয়, চিৎকার করে যদি জিহাদের কথা বলে

**تزيّنت حوراء تبتغي الوصالا ... فالعُذر منك أن قد دعي الرجالا**

যদি বলে, জান্নাতে সুসজ্জিত হুররা তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, তবু তার ডাকে সাড়া দেবে না। কারণ, সে তো ডেকেছে আসল পুরুষদের, তোমাকে তো ডাকেনি।

২০০২ সালের ২৮শে মার্চ 'যুগের আবু রুগাল ও উম্মাহর সাথে গাদ্দারি' শিরোনামে শায়খ উসামা রহ.-এর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন—

> 'গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাগুলো আমাদের বরকতময় জিহাদেরই অংশ। এভাবেই এই জিহাদ আপন লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। কিছু মানুষ বলে বেড়াত, আমাদের করার কিছু নেই, সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, আমরা কিছুই করতে পারব না। চলমান ঘটনাপ্রবাহ তাদের এ সব খোঁড়া অজুহাত আর হতাশাজনক কথাগুলোকে ভুল প্রমাণ করেছে। এখন আর এ সব কথার কোনো মূল্য নেই, কেউ আর এ কথাগুলোকে গ্রহণ করবে না। উম্মাহ যে রক্তাক্ত অধ্যায় পার করছে, তা দেখে কোনো বিবেকবান মানুষ এ সব ঘুমপাড়ানি কথায় কান দিতে পারে না। সামর্থ্য অনুযায়ী সকলের ওপরেই এখন জিহাদ ফরয। উম্মাহর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য জাতির নেতৃবৃন্দকে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে, উম্মাহর সাথে যে গাদ্দারি করা হয়েছে, তা সকলের সামনে স্পষ্ট করতে হবে। এই জালেম বিশ্বব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করার কারণে যারা নিজেরা কিছু করতে পারছেন না, তারা কমপক্ষে অন্যদের সহযোগিতা করুন। যাদের হিম্মত আছে, যারা পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর, যারা দুনিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়েছে, তাদের কাজ করার সুযোগ করে দিন। মুজাহিদদের সহযোগিতা না করে বসে থাকবেন না, হাত গুটিয়ে বসে দর্শকের ভূমিকা পালন করা আর সম্পদ জমা করা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ বলেছেন—'যখন হারাম মাস চলে যাবে, মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দি করবে, অবরোধ করবে এবং ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাদের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে থাকবে' [সূরা তাওবা (৯) : ৫], এই যুবকরা আল্লাহর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জিহাদের জন্য বের হয়েছেন। এই জিহাদ যদি তাদেরকে ঘর থেকে বের করতে পারে, তাহলে উম্মতের আরও অনেক সন্তানকেও বের করে আনবে। এভাবেই জিহাদের এই কাফেলা এগিয়ে যাবে। আমরা তো জিহাদের সুদীর্ঘ এই কাফেলার গুটিকয়েক সদস্যমাত্র, আমাদের জীবনও সীমিত। অচিরেই আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াব। "সুতরাং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।' [সূরা যিলযাল (৯৯) : ৭-৮][৬৬]

শায়খ উসামা রহ.-এর কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তালেবান আন্দোলন। দীনের ওপর তাদের পাহাড়সম দৃঢ়তার ফলেই উম্মতের হারানো ইজ্জত-সম্মানের পুনর্জাগরণ ঘটেছে, তাঁদের অবিচলতা পশ্চাদপসরণকারীদের সব যুক্তিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, দুনিয়ার সব হিসেব-নিকেশ উলটে দিয়েছে। জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোট ও তাদের দোসরদের সব ষড়যন্ত্র

[৬৬] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

নস্যাৎ করে তাদের চালে তাদেরই মাত দিয়েছে। তালেবানকে বধ করার জন্য রাজনীতির নোংরা যে খেল তারা শুরু করেছিল, তালেবান উলটো সে নীতি থেকেই লাভবান হয়েছে।

আমেরিকা ও তার মিত্ররা মিলে দীর্ঘ দুই দশক ধরে নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে আফগানিস্তানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তারা তালেবানকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার জন্য সব ধরনের উপায় পরীক্ষা করে দেখেছে। তালেবানকে দুর্বল করার লক্ষ্যে হেন কোনো অপরাধ নেই, যা তারা করেনি। তালেবানের খোঁজে নৈশ অভিযান, খানাতল্লাশি, ঘুমন্ত মানুষদের ওপর হামলা চালিয়ে আতংকিত করা, বাড়িছাড়া করা থেকে শুরু করে পুরো জনপদ জ্বালিয়ে দেওয়া, বাড়িঘর গুড়িয়ে দেওয়া, ফসলি জমি বরবাদ করা, বন্দিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করা-সহ হাজারো অপকর্ম করেছে, তাদের অপকর্মের তালিকা করে শেষ করা যাবে না।

এত কিছুর পরেও তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হয়নি। তালেবানযোদ্ধাদের মনে বিন্দুমাত্র হতাশাও তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। 'যুদ্ধ করে কিছু হবে না, যুদ্ধের কারণে আমাদের বিপর্যয় শুধু বাড়তেই থাকবে, আত্মসমর্পণই মুক্তির একমাত্র উপায়'—এ ধরনের পরাজিত মানসিকতা তালেবানের মধ্যে ডালপালা মেলতে পারেনি। বরং ফলাফল যা হয়েছে, তা ছিল অকল্পনীয়। আমেরিকার কৌশলে খোদ আমেরিকাই ধরাশায়ী হয়েছে। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'ষড়যন্ত্রকারী নিজেই ফেঁসে যায় তার ষড়যন্ত্রে।' [সূরা ফাতির (৩৫) : ৪৩]

গোটা পৃথিবী দেখেছে, তালেবানের বরকতময় জিহাদী কার্যক্রম কীভাবে আমেরিকা ও তার মিত্রদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছে। একসময় তারা নিজেরাই অনুভব করতে শুরু করেছে, এখন আর যুদ্ধ করে লাভ নেই, যুদ্ধে তারাই পরাজিত হবে, সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও তালেবানের বিপক্ষে ছোট্ট কোনো বিজয় অর্জন করাও তাদের সাধ্যের বাইরে। এখন নিজেদের জান বাঁচাতে চাইলে আর মানসম্মান যা অবশিষ্ট আছে, তা রক্ষা করতে চাইলে, তালেবানের সাথে আলোচনার টেবিলে বসা ছাড়া গতি নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দোহা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দোহা চুক্তি ছিল তালেবানের ঐতিহাসিক এক বিজয়। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানিতে পাহাড়সম দৃঢ়তা আর অবিচলতার বদৌলতে পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে তালেবান এই বিজয় অর্জন করেছে। আমেরিকা ও তার মিত্ররা চূড়ান্ত অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

আমেরিকা ও তার মিত্ররা নিজেদের বাছাইকৃত মেধা, রিসার্চ সেন্টার আর থিংক ট্যাংক ব্যবহার করে তালেবান ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে—বিশেষ করে আল-কায়েদা—বিভেদ উসকে দেওয়ার অসংখ্য চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। নোংরা রাজনীতির খেলায় তারা সিদ্ধহস্ত হয়েও আল্লাহর রহমতে আফগান জনগণের সাথে তালেবানের সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি।

শুধু তাই না, তালেবানের বিরুদ্ধে জয়লাভের ব্যাপারে চরম হতাশা থেকেই এ অঞ্চলে আমেরিকা আইসোলেশন পলিসির দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে যে, 'সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুধু আফগানিস্তান-কেন্দ্রিক নয়; বরং এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা আমাদের বৃহত্তর সামরিক অপারেশনগুলোর ইতি টানছি।'

আল্লাহ তায়ালা শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের ওপর রহমত নাযিল করুন, তিনি অল্প কথায় মূল বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর **'خط التحول التاريخي'** বইয়ে তিনি লিখেছেন—

> 'যে জাতি হৃদয় দিয়ে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ধারণ করে, আকীদার জন্যই বাঁচে এবং আকীদার জন্যই লড়াই করে, সে জাতি কখনো পরাজিত হয় না; তাঁদের শত্রু যত বেশিই হোক, যত শক্তিধরই হোক আর তাদের পরিকল্পনা যতই নিখুঁত ও নিপুণ হোক না কেন, তারাই বিজয়ী হয়।'

## বিকৃত ইতিহাস ও মেকি বাস্তবতা

বিভিন্ন বই-পুস্তকে ও লোকমুখে মাঝে মধ্যে এমন কিছু অভিযোগ ও আপত্তির কথা শোনা যায়, যেগুলো ইতিহাসকে বিকৃত করে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রটানো হয়েছে। যারা এ ধরনের অপপ্রচার করেন, তাদের মধ্যে অনেকে একসময় জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিন্তু এখন ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কবলে পড়ে সাধারণভাবে চিন্তা করার শক্তিটুকুও হারাতে বসেছেন। আবার এমনও অনেকে আছেন, যারা জিহাদী কাজের জন্য উচ্চমার্গীয় মানদণ্ড সাজিয়ে রেখেছেন। কোনো কাজ তাদের সে কাল্পনিক মানদণ্ডের বিপরীত হলেই তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রুক্ষ ভাষায় সমালোচনা শুরু করে দেন, অপবাদ-অপমান থেকেও রেহাই দেন না। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। কবি বলেছেন—

**وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ... على الحر من وقع الحسام المهند**

সম্ভ্রান্ত মানুষের জন্য ধারালো তরবারির আঘাতের চেয়ে আপনজনের জুলুম বেশি কষ্টদায়ক

একবার কিছু ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শায়খ আবুল ওয়ালীদ (মুস্তফা হামেদ) হাফি.-এর বিভিন্ন লেখায় শায়খ উসামাকে নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে, আল-কায়েদার ব্যাপারে নানা ধরনের অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এগুলোর বাস্তবতা কতটুকু? আমি তাঁদের বলেছিলাম, শায়খ আবুল ওয়ালীদের এ সব দাবির সত্যতা জানার জন্য আপনারা শায়খ আহমাদ আবুল খাইর রহ.-এর লেখা চিঠিটি পড়ে দেখতে পারেন। অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টের ষষ্ঠ কিস্তিতে চিঠিটি আছে। শায়খ আবুল ওয়ালীদের আরোপিত সব অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয়েছে তাতে।

শায়খ আবুল ওয়ালীদ তাঁর বিভিন্ন বইয়ে শায়খ উসামা ও আল-কায়েদার ব্যাপারে যে-সব নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন, সেগুলোর বাস্তবতা সকলের সামনে স্পষ্ট করার জন্য শায়খ আহমাদ আবুল খাইর রহ.-এর পুরো চিঠিটি এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি। আশা করি, এতে সকলেই উপকৃত হবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে জানার ও অনুসরণ করার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে দেখার ও বর্জন করার তাওফীক দান করেন, আমীন।

## শায়খ আবুল ওয়ালীদ মিসরীর প্রতি শায়খ আহমাদ হাসান আবুল খাইর মিসরীর চিঠি

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**মুহতারাম ভাই ও উস্তাদ মুস্তফা হামেদ হাফি.**
আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করছি, আপনারা সকলেই দীনী ও দুনিয়াবি দিক দিয়ে ভালো অবস্থাতেই আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালোই আছি। দোয়া করি, আল্লাহ যেন দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সকলকে সর্বোত্তম অবস্থায় একত্র করেন।

সম্মানিত ভাই,
আমি-সহ আপনার পরিচিত কিছু[৬৭] মুজাহিদ ভাই—যাদেরকে আপনি বিশ্বাস করেন, যাদের সাথে দীর্ঘ সময় আপনি জিহাদের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন—আমরা কিছু বই ও প্রবন্ধের কথা জানতে পেরেছি, যেগুলো আপনার নামে ছাপা হয়েছে। সবগুলোই

[৬৭] ২০০৯ সালের ২২শে আগস্ট এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল। তখন শায়খ আবুল খাইর মিসরী ইরানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। এখানে শায়খ যাদের কথা বলছেন, তাঁরাও তখন শায়খের সাথেই বন্দি ছিলেন। তাঁরা হলেন—শায়খ সাইফ আল-আদল, শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলী, শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস, শায়খ আবু হাফস মৌরিতানী ও অন্যান্য।

আফগানিস্তানের জিহাদ ও মুজাহিদদের নিয়ে লেখা। বিশেষ করে 'সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার' ও 'হারবুল মাত্বারীদ' নামের দুটি বইয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়।

এ বইগুলোতে, বিশেষত 'সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার' নামক বইয়ে এমন কিছু কথা লেখা হয়েছে, যা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বইটিতে সঠিক তথ্যের পাশাপাশি কিছু বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বাস্তবতার সাথে যার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

মুমিন ভাই হিসেবে এবং দীর্ঘ কয়েক বছর একসাথে জিহাদের ময়দানে কাটানোর সুবাদে আমাদের মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার ভিত্তিতে কল্যাণকামিতার উদ্দেশ্যে এবং সকলের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরার নিয়তে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনার নামে প্রকাশিত এই বইয়ে এমন কিছু ঘটনার অবাস্তব বিবরণ তুলে দেওয়া হয়েছে, যে ঘটনাগুলো সরাসরি আমার, আপনার এবং এই ভাইদের সামনেই ঘটেছে। এ ছাড়াও সে ঘটনাগুলোর আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এখনো জীবিত আছেন। সত্যকে আড়াল করে ইতিহাস বিকৃত করার এই চেষ্টা দেখে আমি চুপ থাকতে পারিনি। তাই এ ব্যাপারে আমার ও ভাইদের মতামত তুলে ধরা জরুরি বলে মনে হয়েছে।

আপনার প্রতিবাদী মানসিকতা সর্বজনবিদিত, কঠোর ভাষায় সমালোচনা করার ব্যাপারেও আপনার বেশ সুনাম আছে। আর যে অন্যের সমালোচনা করে, তার উচিত, নিজের ব্যাপারে অন্যদের সমালোচনাকেও সাদরে গ্রহণ করা। তাই আশা করি, আপনি উদার মনে আমার কথাগুলোকে গ্রহণ করবেন। বইটিতে যতগুলো বিকৃতি আছে, সব এখানে উল্লেখ করে খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য না। এখানে যে ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমাদের মতামত তুলে ধরা হবে, তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা হবে। যথা—১. যে ঘটনাগুলো সরাসরি আমার ও আপনার উপস্থিতিতে ঘটেছে, ২. আমাদের দুজনের সাথে সাথে উভয়ের আস্থাভাজন ভাইয়েরা যেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ৩. তাঁরা এখনো জীবিত আছেন। বইয়ে যে-সব ঘটনা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই তিনটি শর্ত যার মধ্যে আছে, শুধু সে ঘটনাগুলো নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে।

মূল আলোচনা শুরুর আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই—
১. দুই মাস আগে বইটি পড়ার আগ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম, উস্তাদ মুস্তফা হামেদ যা লেখেন এবং বলেন, অন্তত তিনি তা সত্য বলে বিশ্বাস করেন বলেই লেখেন এবং বলেন। শায়খের বন্ধুমহল ও আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে আপত্তি ছিল মূলত সত্য প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়ে। আমাদের আপত্তি এ কারণে ছিল না যে, তিনি মিথ্যা তথ্য প্রচার করেন।

আপনার মনে থাকার কথা, আগে যখন আপনি হাশেম মাক্কী[৬৮] নামে লেখালিখি করতেন, তখন আপনাকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলাম, সব সত্য এখনো প্রকাশ করার সময় আসেনি, কিছুদিন দেরি করলে ভালো হবে। কারণ, আমার মনে হয়েছিল, তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি তা প্রকাশের উপযুক্ত ছিল না। তখন তা প্রকাশ করলে শত্রুরাই বেশি লাভবান হতো। তখন যদিও আমি আপনাকে সত্য প্রকাশ না করার পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সত্যগুলোকে কিন্তু আমি অস্বীকার করিনি।

কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু বই, বিশেষ করে 'সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার' বইটি পড়ার পর আমার আগের বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করেছে। এই বইটিতে ইতিহাস বিকৃতির পরিমাণ এত বেশি যে, কোনোভাবেই এর পক্ষে সাফাই গাওয়া বা যুক্তি দাঁড় করানোর সুযোগ নেই। ইতিহাস বিকৃত করে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জঘন্য এই প্রচেষ্টা দেখে আমার বা অন্য ভাইদের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। এর পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে—তা বলা হলে, সবার আগে আপনিই তা অস্বীকার করবেন।

এ কারণে আমার মধ্যে সন্দেহ আছে, বইটি আসলেই আপনি লিখেছেন কি না? স্বভাবতই আপনার মতো সম্মানিত ব্যক্তি থেকে এত মারাত্মক ভুল হওয়া আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। তাই এই পর্যালোচনায় আমি ভুলগুলোকে আপনার দিকে সম্বন্ধ না করে বইয়ের দিকে সম্বন্ধ করব। (তবে বইটি যেহেতু আপনার নামে প্রকাশিত হয়েছে, তাই কথাগুলো আপনাকে সম্বোধন করেই বলা হবে।) কারণ, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আপনার মতো ব্যক্তি এই কথাগুলো লিখতে পারেন। তবে, আমার কাছে, আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছেও আপনার সম্মান ও মর্যাদা সব সময় অক্ষুণ্ন থাকবে। আমরা মনে রাখব, জিহাদের ডাকে আপনি সবার আগে লাব্বাইক বলেছিলেন।

২. যেহেতু এটি (সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার বইটি) পর্যালোচনাধর্মী একটি বই, ইতিহাসের নির্ধারিত একটি সময়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে এতে আর স্বাভাবিকভাবেই সে সময়ের ভালোমন্দ উভয় দিকই আছে—এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কোনো ন্যায়পরায়ণ সমালোচক গঠনমূলক সমালোচনা করতে গিয়ে কখনো প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, তার অবদানকে অস্বীকার করে বসবে না, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বিশ্বাসঘাতক বানিয়ে দেবে না। তা-ও আবার কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়া। যা পড়ে পাঠকদের মনে হবে, কারো সাথে মনে হয় লেখকের শত্রুতা ছিল, কাগজ-কলম পেয়ে ইচ্ছেমতো তার দুর্নাম করে হিসাব বরাবর করে নিচ্ছে, কিন্তু পরিণতি যে কী হবে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি। লেখক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করছেন, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সেই অভিযোগই যদি সন্দেহজনক বা দলীলবিহীন হয়, তাহলে?

[৬৮] শায়খ আবুল ওয়ালীদ একসময় হাশেম মাক্কী নামে লেখালিখি করতেন। সে সময়ের কথা বলা হচ্ছে।

৩. বইয়ের ভাষা থেকে এটা স্পষ্ট, ৯/১১ পরবর্তী পরিস্থিতি লেখককে আহত করেছে। নিজের জন্য, নিজ সহযোগীদের জন্য যে শান্তি, নিরাপত্তা ও বিজয়ের স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রথমে পরীক্ষা করেন, বিপদে ফেলেন, ভালো থেকে খারাপকে পৃথক করেন, তারপর পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। লেখক আল্লাহর এই সুন্নতকে ভুলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির [ইমারতে ইসলামিয়ার পতন ও মুজাহিদদের বিপর্যয়] জন্য নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে [শায়খ উসামা ও আল-কায়েদা] দায়ী মনে করে তাদের ইচ্ছেমতো দোষারোপ করেছেন। যদি আমি ও অন্যান্য মুজাহিদ ভাইয়েরা আপনাকে ভালোভাবে না চিনতাম, আপনার সততা সম্পর্কে না জানতাম, তাহলে আমরা এটাই বলতাম যে, যার কারণে আবুল ওয়ালীদ বিপদে পড়েছিলেন, তার থেকে এখন কথার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিচ্ছেন। অথচ একসময় তিনি (শায়খ আবুল ওয়ালীদ) শুধু তাঁর[৬৯] সবচেয়ে বড় সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন আর এখন তাঁকেই আক্রমণ করে কথা বলছেন, তার ওপর অপবাদ দিচ্ছেন।

মুহতারাম ভাই আমার, বিস্তারিত পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে সংক্ষেপে বইটির ব্যাপারে আমার মূল্যায়ন তুলে ধরছি।

**প্রথম মূল্যায়ন:**

কেউ যদি বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন, তাহলে সহজেই ধরতে পারবেন, বইটি লেখাই হয়েছে মূলত মুজাহিদদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। বিশেষ করে সে সকল মুজাহিদ, যাদেরকে আপনি 'সালাফী জিহাদী' বলে উল্লেখ করেছেন। আপনার দৃষ্টিতে এই সালাফীরা হলো 'আল-কায়েদা ও তার আমীর শায়খ উসামা' এবং তাঁদের অনুসারী চেচনিয়া ও বসনিয়ার মুজাহিদগণ।

আপনার এই আক্রমণ থেকে তালেবানও রেহাই পায়নি। শুধু কিছু উজবেক ও তাজিক মুজাহিদ আপনার এই হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছেন। যতটুকু মনে হয়, ইরান ও আপনার সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার সুবাদেই তারা এই সর্বব্যাপী আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছেন। শুধু যে বেঁচে গেছেন, তা-ই না; বইয়ে তাদের বেশ প্রশংসাও করা হয়েছে।

এ ছাড়া পুরো বইয়ে আর যা-কিছু আছে, তা সবই মূলত এই বিষয়টিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। আমি নিজেই স্বীকার করেছি, গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার

[৬৯] এখানে শায়খ উসামা রহ.-এর কথা বলা হচ্ছে। শায়খ আবুল ওয়ালীদ শায়খ উসামার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন একসময়।

আপনার আছে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, মুজাহিদ ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ নিয়ে আপনার সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ হচ্ছে না; বরং আপনি সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্যায় ও একপেশে আচরণ করেছেন। আপনি তাঁদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন, কিন্তু তা প্রমাণ করার ধার ধারেননি। এটা হলো তাঁদের ওপর আপনার প্রথম জুলুম। তাঁদের অসংখ্য ভালো কাজ ও বড় বড় কুরবানী আছে, আপনি জানা সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। এটা হলো তাঁদের ওপর আপনার দ্বিতীয় জুলুম। একটু পরেই আমরা উদাহরণ-সহ এগুলো আলোচনা করব।

অন্যদিকে, জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হয়েছে আর মুজাহিদদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তার পুরো দায়ভার আপনি চাপিয়ে দিয়েছেন (আপনার ভাষ্যমতে) 'সহীহ আকীদার ধারক-বাহকদের' ওপর। কিন্তু 'ভ্রান্ত আকীদার ধারক-বাহকেরা' মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিল, জিহাদ বন্ধ করার ষড়যন্ত্রে শরীক হয়েছিল এবং এখনো এ নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়, তাদের আপনি দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এমন না যে, আপনি এ সব জানেন না, এ সবকিছুই আপনি জানেন। জেনেশুনেই এমনটা করেছেন। মুহতারাম ভাই, এটা কি তাহলে ইনসাফ হয়েছে?

**দ্বিতীয় মূল্যায়ন:**

বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'সালাফী জিহাদী' বলে আপনি যাদের তুলে ধরেছেন, তাদের এই জিহাদী জাগরণকে রুখে দেওয়া এবং এই মতাদর্শকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য পুরো বইজুড়ে তাঁদের ওপর বেহিসাব অপবাদ দেওয়া হয়েছে এবং যা তারা করেননি, এমন কাজের দায়ভারও তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে বই থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও উদাহরণ এনে এ বিষয়টিকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

**প্রথম উদাহরণ : ৯/১১ হামলা**

বইয়ে ৯/১১ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ কথাই বাস্তবতাবিরোধী এবং ভুলে ভরা। ৯/১১-এর হামলা কে করেছে—এ ব্যাপারে বইয়ে পরস্পরবিরোধী অদ্ভূত কিছু তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। যেমন: এই হামলা আল-কায়েদা করেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বইয়ের ৪২ নম্বর পৃষ্ঠায়[৭০] বলা হয়েছে—

> 'আমেরিকার অভিযোগ যদি সত্য হয় যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভবন ধ্বংসের পেছনে জালালাবাদের তারকা বিন লাদেনর হাত আছে .....।'

[৭০] সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহারের উদ্ধৃতিগুলো বইটির শামেলা সংস্করণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। [সম্পাদক]

আবার এক জায়গায় হামলা আল-কায়েদাই চালিয়েছে বলে স্বীকার করে নিলেও আল-কায়েদার অবদানকে খাঁটো করার চেষ্টা করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাই না-কি আল-কায়েদাকে হামলার সুযোগ করে দিয়েছে। বইয়ের ভাষায় [পৃষ্ঠা ১৪৯]—

> 'তবে লেখকের মত হলো, আমেরিকা ১৯৯৭ সাল থেকেই এই হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তান ও ইউরোপে বসবাসকারী কিছু লোককে এজেন্ট হিসেবে আল-কায়েদায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের মাধ্যমে আল-কায়েদাকে এই হামলার জন্য প্ররোচিত করছিল।'

আরেক জায়গাতে তো এই হামলার সাথে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সম্পৃক্ততার কথাও বলা হয়েছে। (দেখুন সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : পৃষ্ঠা ২১১) অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, এই হামলায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা শুধু এতটুকু ছিল যে, তারা হামলার বিষয়টি আগে থেকে জানা সত্ত্বেও তা আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রিয় পাঠক, বইয়ের বক্তব্যটি পড়ে দেখুন কী বলা হয়েছে [পৃষ্ঠা ২২৫]—

> '৯/১১ হামলায় এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো থেকে বোঝা যায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আগে থেকেই এই হামলার কথা জানত। মার্কিন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ ব্যাপারে একাধিকবার সতর্কবার্তাও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো সতর্কবার্তাই আমলে নেওয়া হয়নি।'

লক্ষ করুন, এখানে দাবি করা হচ্ছে, হামলার ব্যাপারে মার্কিনিরা আগে থেকেই জানত। কিন্তু এ বক্তব্যের আগে যে বক্তব্যটি আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানে দাবি করা হয়েছে, মার্কিনিরা শুধু জানতই না; বরং তারাই ১৯৯৭ সাল থেকে এই হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আবার আরেক জায়গায় দাবি করা হয়েছে, আমেরিকা হামলার বিষয়টি জানার পাশাপাশি এই হামলার পথ সুগম করার জন্য কাজ করেছে।

বইয়ের ভাষায় পড়ে দেখুন—

> 'আরও অবাক করা বিষয় হলো, [খোদ আমেরিকাই] হামলাকারীদের পথ পরিষ্কার করে হামলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এ কারণেই হামলা প্রতিরোধের জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আমেরিকার পক্ষ থেকে শুধু একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা হলো—টুইন টাওয়ারে কর্মরত প্রায় চার হাজার ইহুদীকে সেদিন কাজে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল।[৭১] একইভাবে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, পেন্টাগনের

[৭১] '৯/১১ হামলায় কোনো ইহুদী মারা যায়নি, কারণ তাদেরকে আগে থেকেই কাজে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল।' এটি একটি জনপ্রিয় ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। এর কোনো প্রমাণ নেই। বরং বিভিন্ন গবেষণা ও ৯/১১ হামলার তদন্ত থেকে দেখা

ইহুদী কর্মীরাও সেদিন কাজে যায়নি। কারণ, পেন্টাগনেও একটি বিমান আঘাত হেনেছিল। [পৃষ্ঠা ২২৫]

সুতরাং ২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বর যা ঘটেছিল, সহজ কথায় তা ছিল মার্কিন সরকারের সাজানো ষড়যন্ত্র। বিশ্বের রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প ও সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতি মার্কিন জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য সরকার-ই এই হামলা করিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ জন্য তারা 'একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীগোষ্ঠী'-কে প্ররোচিত করেছে, তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এবং তাদের দিয়ে নিজ দেশের স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে এবং নাগরিকদের হত্যা করিয়েছে। এ সবকিছু করা হয়েছে আমেরিকার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিশ্বযুদ্ধের বৈধতা উৎপাদনের জন্য, যার সূচনা হয়েছিল আফগানিস্তানে হামলার মধ্য দিয়ে। [পৃষ্ঠা ২৩০]

গণবিধ্বংসী অস্ত্র রাখার 'অভিযোগ' এনে যেমন আফগানিস্তান ও ইরাক উভয় যুদ্ধের বৈধতা তৈরি করা হয়েছে। আমার মতে, ঠিক একই কায়দায় এই 'সন্ত্রাসবাদ'-কেও ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন আল-কায়েদাকে প্ররোচিত করেছে, হামলার জন্য উসকানি দিয়েছে, এমনকি হামলা যেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাস্তবায়িত হয়, সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। এভাবে আল-কায়েদার সামনে তারা একটি ফাঁদ পেতেছে আর আল-কায়েদাও আমেরিকার ফাঁদে পা দিয়ে হামলা করে বসেছে। ফলে আমেরিকা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আল-কায়েদাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে আল-কায়েদাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে হামলা করেছে। সাদ্দাম হোসাইন প্রকাশ্যে আমেরিকার সাথে আঁতাঁত করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের (স্টেট টেরোরিজম) চর্চা করেছিল আর আল-কায়েদা আমেরিকার ফাঁদে পড়ে তারই পরিকল্পিত অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের (নন-স্টেট টেরোরিজম) চর্চা করেছে।' [পৃষ্ঠা ২৩০]

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যে বইয়ে [৯/১১-এর মতো] এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সে বই কোনো ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই এমন একটি তত্ত্ব প্রচার করছে, যা কারো কথার সাথেই মেলে না। যারা এই হামলা করেছে, যাদের ওপর হামলা

---

গেছে, হামলায় ২৭০ থেকে ৪০০ জনের মতো ইহুদী মারা গিয়েছে। হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের ধর্মপরিচয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাদের সংখ্যা মোট ১৭০০। এই ১৭০০-এর মধ্যে ২৭০ জন ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। ২৭০ জন ইহুদী নিহত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। তবে মোট নিহত ইহুদীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। অনেক গবেষকের ধারণা হামলায় প্রায় ৪০০-এর মতো ইহুদী নিহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। [সম্পাদক]

করা হয়েছে অথবা যারা এই হামলার সাক্ষী—কারো থেকেই এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। শুধু তাই না, দলীল-প্রমাণবিহীন এই দাবির ভিত্তিতে আবার অনেকগুলো গুরুতর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন: বইয়ে লেখা হয়েছে, ইয়েমেনের এডেন বন্দরে ইউএসএস কোলের ওপর যে হামলা হয়েছিল, আমেরিকা ইচ্ছাকৃতভাবেই এর কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। কারণ, তখন যদি আমেরিকা কোনো প্রতিক্রিয়া জানাত, তাহলে আল-কায়েদার সাথে মিলে তারা যে বৃহৎ অপারেশনের [৯/১১] পরিকল্পনা করে আসছিল, তা বাধাগ্রস্ত হতো এবং একে পুঁজি করে তাদের আসল উদ্দেশ্য ওয়ার অন টেরর শুরু করতে পারত না।

বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী—

> 'ইউএসএস কোলে হামলার ঘটনা যেহেতু ৯/১১-এর আগে ঘটেছিল, তাই আমেরিকার পক্ষ থেকে তখন কোনো শক্ত প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। কারণ, তখন যদি আল-কায়েদার ওপর শক্তিশালী কোনো হামলা করা হতো, তাহলে আমেরিকার পরিকল্পনা ভেস্তে যেত এবং ওয়ার অন টেররের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেত। এ কারণেই ইউএসএস কোল আক্রমণের কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি।' (পৃষ্ঠা ১৪৯)

স্বভাবতই বইয়ের এই দাবি সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করব না। এটা যে সম্পূর্ণ বানোয়াট একটি দাবি, আশা করি আপনিও বুঝতে পারছেন। বইয়ের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমি শুধু একটি প্রশ্ন করব—বইয়ের দাবি অনুযায়ী, আমেরিকা ১৯৯৭ সাল থেকে ৯/১১-এর বিমান হামলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল। আর এ কারণেই ইউএসএস কোলে হামলা করা সত্ত্বেও আল-কায়েদাকে কোনো আঘাত করা থেকে বিরত ছিল, যাতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী যুদ্ধ শুরুর যে পরিকল্পনা আমেরিকা করছিল, তা প্রভাবিত না হয়। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ১৯৯৮ সালে কেন আমেরিকা আফগানিস্তান ও সুদানে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালিয়েছিল? এটা তো আল-কায়েদাকে ব্যবহার করে ৯/১১-এর বিমান হামলার প্রস্তুতি শুরু করার এক বছর পরের ঘটনা। পূর্ব আফ্রিকায় যখন দুটি মার্কিন দূতাবাসে আল-কায়েদা হামলা চালিয়েছিল, তখন কেন আমেরিকা চুপ থাকেনি? যে যুক্তিতে ইউএসএস কোলের হামলার পর আমেরিকা চুপ ছিল, সেই একই যুক্তিতে তো এ ঘটনার পরেও চুপ থাকার কথা।

মোটকথা, বইটি পুরোপুরি ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে। লেখক বেশ ভালো করেই জানেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গির অসংখ্য ত্রুটি আছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন ত্রুটি হলো, তারা সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে নিজেরাই এই মিথ্যা তথ্য উৎপাদন করে প্রচার করেছে।

৯/১১-এর সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিচারে যদি আমরা 'হারবুল মাতারীদ' বইয়ের বক্তব্যগুলোকে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, একাধিক জায়গায় লেখক স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে আচরণবিধি কেমন হবে—সে ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বইয়ের এক জায়গায় বলা হচ্ছে, শত্রু যেমন আচরণ করবে, তার সাথেও একই আচরণ করতে হবে। একই বইয়ের অন্য জায়গায় শত্রুর বিরুদ্ধে এমন গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের সহ্যক্ষমতার বাইরে। বইয়ের ভাষায়—

> 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; আর যে শুরু করে, সে-ই বড় জালেম। [এটাই হলো আমাদের নীতি।] কিন্তু মুসলিমরা অনেক জায়গায় এই সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়মকে অবহেলা করে ভুল করেছে।' (পৃষ্ঠা ৬০)

> 'এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হবে না, যতদিন না আমরা শত্রুকে অসহনীয় ও ধ্বংসাত্মক উপায়ে আঘাত করব।' (পৃষ্ঠা ৮৪)

> 'গেরিলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যাধুনিক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহ করা এখন জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (পৃষ্ঠা ৮৪)

গেরিলাদের জন্য অত্যাধুনিক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে বইয়ে যে মত ব্যক্ত করা হয়েছে, তার সাথে আমরা সামগ্রিকভাবে একমত। কিন্তু এই একই বইয়ে ৯/১১-এর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ স্ববিরোধী একটি বক্তব্য লিখে দেওয়া হয়েছে। বইয়ে লেখা হয়েছে—

> 'সাধারণভাবে নারী, শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা কোনো মানবিক আচরণ হতে পারে না।' (পৃষ্ঠা ৫৯)

এমনইভাবে আরেক জায়গায় ৯/১১-এর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক প্রচ্ছন্নভাবে এই অপারেশনকে নৈতিক ও শরয়ী অধঃপতন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। (পৃষ্ঠা ৭৭)

আমরা জানতে চাই, 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সূচনাকারীই বড় জালেম'—এই নীতি মেনে কি বইয়ের প্রস্তাবিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব? লেখক একদিকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন, অন্যদিকে ৯/১১ হামলায় [লেখকের দাবি অনুযায়ী] বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার সমালোচনাও করছেন। তো আমরা জানতে চাই, ৯/১১ হামলার ফলে লেখকের দাবি অনুযায়ী যে ধরনের বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, এমন বেসামরিক নাগরিকদের কোনো ক্ষতি না করে কি লেখকের প্রস্তাবিত এই গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব?

লেখক তো সমতার নীতি 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সূচনাকারী বড় জালেম'-এর ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করেছেন, এখন আমরা যদি এই নীতি গ্রহণ করেই কাফেরদের ওপর হামলা করি, তারপরেও কি আমাদের তথাকথিত 'নৈতিক ও শরয়ী অধঃপতনের দায়' বহন করতে হবে? লেখক যদি বাস্তবিক অর্থেই বিশ্বাস করেন, বেসামরিক নাগরিক হত্যা করা নৈতিক ও শরয়ী দিক থেকে অধঃপতন, তাহলে লেবাননের হিযবুল্লাহ যখন ফিলিস্তিনে 'বেসামরিক ইহুদী বসতি' লক্ষ্য করে বোমা হামলা করেছিল, তখনও কি তিনি এই 'নৈতিক ও শরয়ী অধঃপতনের' কারণে বিব্রতবোধ করেছিলেন?

অবশ্যই না, বিব্রতবোধ করা তো দূরের কথা, তিনি বরং হিযবুল্লাহর অপারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। হিযবুল্লাহর অপারেশনের ব্যাপারে তিনি ঠিকই আদল ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু ৯/১১-এর ব্যাপারে সেই আদল ও ইনসাফ দেখাতে পারেননি। কিন্তু, এমন তো হওয়ার কথা না। আদল ও ইনসাফের মানদণ্ড তো পরিবর্তন হয় না। কারো সাথে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা থাকলেই কি তার অবদানকে খাঁটো করা বৈধ হয়ে যায়?

### দ্বিতীয় উদাহরণ:
### আল-কায়েদা ও শায়খ উসামার বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগ

বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শায়খ উসামা ও আল-কায়েদার ব্যাপারে অসংখ্য মনগড়া অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু কোনো অভিযোগেরই প্রমাণ দেওয়া হয়নি। এমনকি অভিযোগগুলো সত্য কি না—তা নিয়ে অনুসন্ধান করার নূন্যতম গরজটুকু বইয়ে দেখা যায়নি। এর মধ্যে অধিকাংশ অভিযোগই এমন যে, অন্যরা তো দূরের কথা, শত্রুরাও এগুলো বিশ্বাস করবে না।

কিছু অভিযোগের নমুনা—

১. শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. আমেরিকার এজেন্ট। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তিনি কাজ করেন। আমেরিকা নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে বেছে নিয়েছে এবং তাঁকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি আমেরিকার সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। 'আমেরিকা কীভাবে নিজের শত্রু নির্বাচন করে' শিরোনামের আলোচনায় লেখা হয়েছে—

> 'তাদের দৃষ্টিতে বিন লাদেনের চেয়ে উত্তম কেউ ছিল না। কারণ, তারা তাঁর কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বেশ ভালো করেই পরখ করে দেখেছিল।

তারা বুঝেশুনেই তাঁকে বেছে নিয়েছিল, যাতে তিনি আমেরিকার সামনে এক দুর্ধর্ষ ইসলামী সন্ত্রাসী হিসেবে আবির্ভূত হন। কারণ, যে-শত্রুর সক্ষমতা জানা থাকে না, তার চেয়ে এমন শত্রু বেশি উত্তম, যার সক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও চিন্তার পদ্ধতি জানা থাকে। এ বিষয়টি নিশ্চিত ছিল যে, মুসলিম জাতির মতো একটি জাতি কিছুতেই আমেরিকার সামনে আত্মসমর্পণ করবে না, তারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, তাদের মধ্য থেকে আমেরিকার শত্রু তৈরি হবেই। শত্রুকে নিজ থেকে তৈরি হতে না দিয়ে নিজেই নিজের শত্রু ঠিক করে নেওয়া বা শত্রু হিসেবে কে আবির্ভূত হবে—তাকে নির্বাচন করে শত্রু হিসেবে দৃশ্যপটে হাজির করা-ই হলো বুদ্ধিমানের পরিচয়। আমেরিকাও ঠিক এ কাজটিই করেছে।' (সলীবুন ফী সামা-ই কান্দাহার : পৃষ্ঠা ৪৪)

মুহতারাম ভাই আমার, আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এত গুরুতর একটি বিষয় আপনি কখন জানতে পেরেছেন? যখন আপনি শায়খ উসামার ঘনিষ্ঠ পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন, তখন কি এই ভয়াবহ তথ্যটি জানতেন? আপনিও কি আমেরিকার এজেন্ট হিসেবেই শায়খ উসামার সাথে মিলে কাজ করেছেন? না-কি আমেরিকার তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন শেষে এই সত্যটি আবিষ্কার করেছেন? [আপনার কথামতো, শায়খ উসামা যেহেতু আমেরিকার এজেন্ট ছিলেন, তাকে সহায়তা করার অর্থ আপনিও আমেরিকার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কাজ করেছেন।]

এমন গুরুতর একটি অভিযোগ করতে হলে অবশ্যই অভিযোগকারীর কাছে অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে। আর যদি প্রমাণ না থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে, এই অপরাধে তিনিও জড়িত। [না হলে তিনি এই খবর জানলেন কীভাবে?] উম্মতের চরম কোনো শত্রুকেও যদি শায়খ উসামার মতো একজন মুজাহিদের ব্যাপারে কটূক্তি করতে বলা হয়, সে-ও মনে হয় এত জঘন্য মন্তব্য করতে পারবে না। শায়খ উসামা আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আপনি চাইলে এই অযৌক্তিক অপবাদ না দিয়েও অন্য যে-কোনো বিষয়ে তাঁর সমালোচনা করতে পারতেন।

২. বইয়ে একই ধরনের আরেকটি অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আমেরিকাই শায়খ উসামাকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিল। তাই তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করেননি। বইয়ে বলা হয়েছে—

'আগেই বলা হয়েছে, শায়খ উসামা যেন আফগানিস্তান ছেড়ে না যান—এ জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে তালেবানকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। মোল্লা যইফ বিষয়টি জানতেন। একপর্যায়ে বিন লাদেন আফগানিস্তান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েও ফেলেছিলেন এবং ইমারতও তাঁকে বাধা দিতে চাচ্ছিল না। কিন্তু এতে আমেরিকার ক্ষতি হতো, আফগানিস্তানে হামলা করার

পরিকল্পনা ভেস্তে যেত, তাই আমেরিকা শায়খ উসামাকে আফগান ছাড়তে নিষেধ করে এবং মোল্লা যইফকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে এই রহস্য ফাঁস না হয়ে যায় যে, আফগানিস্তানে হামলার সিদ্ধান্ত আমেরিকা ৯/১১-এর আগেই নিয়ে রেখেছিল।' (পৃষ্ঠা ১৬০)

শায়খ উসামা বিন লাদেনেকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধা দেওয়ার জন্য আমেরিকাই যদি তালেবানের ওপর চাপ দিয়ে থাকে, তাহলে তালেবান কেন বিশ্বের সামনে এই সত্যটি প্রকাশ করেনি? শায়খ উসামাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে তারা যে চাপে পড়েছিলেন, এই বিষয়টি সকলের সামনে আনলেই তো সে চাপ দূর হয়ে যেত। তালেবান কেন স্পষ্ট করে বলেনি যে, শায়েখ উসামা স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ছাড়তে চান, কিন্তু আমেরিকা আমাদেরকে চাপ দিয়ে তাঁকে আফগানিস্তানেই আটকে রাখতে বলছে? না-কি তালেবানও এই ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল? মার্কিন ও ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা আর মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ—সকলে মিলেই কি এই ষড়যন্ত্র করেছে?

না-কি এটা আমেরিকা ও মোল্লা যইফের মধ্যকার গোপন কোনো বিষয় ছিল, তালেবান নেতারা এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না? মোল্লা যইফ তো ইমারতে ইসলামিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আমেরিকানরা যে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছে—এ বিষয়টি কি তিনি ইমারতে ইসলামিয়াকে জানাননি? তা ছাড়া আমেরিকা যদি মোল্লা যইফের সাথে গোপনে ইসলামাবাদে বসে বিষয়টি নিয়ে দেনদরবার করে থাকে, তার মানে তালেবান সরকার এ ব্যাপারে কিছু জানত না। যে দাবি সম্পর্কে তালেবান সরকার কিছু জানেই না, সেই দাবি তারা মানবে—এমন অযৌক্তিক আশা আমেরিকানরা কীভাবে করেছিল? না-কি মোল্লা যইফ রাষ্ট্রদূত হলেও পাকিস্তানে দূতাবাসের সদর দপ্তরে বসে মোল্লা উমরকে না জানিয়েই কিছু করার বিশেষ কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিল? বড় অদ্ভূত ব্যাপার!

সে সময় আমি, আপনি-সহ আমরা সবাই তো আফগানিস্তানেই ছিলাম। এমন একটি দেশের নামও কি আপনি বলতে পারবেন, যে দেশ শায়খকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল? আপনিও জানেন, আমরাও জানি, আফগানিস্তান ছেড়ে যদি তখন কোথাও যাওয়ার সুযোগ থাকত, শায়খ অবশ্যই চলে যেতেন। এতে তালেবানের ওপর থেকেও সব চাপ সরে যেত, শায়খ রহ.-ও স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করার সুযোগ পেতেন।

৩. এ সব অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভূত অভিযোগটি হলো, বইয়ে দাবি করা হয়েছে, আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণ শুরুর পর প্রথম রাতেই আমেরিকা মোল্লা উমরকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু শায়খ উসামা তখন মোল্লা উমরের আশেপাশেই ছিলেন।

মোল্লা উমরকে হত্যা করার জন্য হামলা চালানো হলে শায়খ উসামার জীবন ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় শেষ মুহূর্তে এসে অপারেশনের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।

বইয়ের ভাষায়—

'এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ শেষ করার বিরল একটি সুযোগ পেয়েও আমেরিকা কেন তা হাতছাড়া করেছিল? মোল্লা উমর মসজিদে ছিলেন, আমেরিকা চাইলে প্রথম আঘাতেই তাঁকে হত্যা করতে পারত। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে তারা হামলা করেনি। বিন লাদেন তখন মসজিদের পাশেই অবস্থান করছিলেন বলেই কি তারা হামলা করা থেকে বিরত ছিল? মসজিদ ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপকহারে বোমাবর্ষণ করলে বিন লাদেনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলেই কি এত বড় সুযোগ তারা হাতছাড়া করেছিল? উসামা বিন লাদেনকে বাঁচানোর জন্যই কি মোল্লা উমরকে হত্যা করেনি? এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এটা কি আমেরিকানদের এই দাবির বিরোধী নয় যে, বিন লাদেনই বিশ্বের মধ্যে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তিনিই আফগান যুদ্ধের জন্য দায়ী?

এই সুযোগে তো আমেরিকা চাইলে একটিমাত্র মিসাইল দিয়েই তার জন্য সবচেয়ে বড় দুটি হুমকি থেকে মুক্তি পেতে পারত। ডজনখানেক মিসাইল নিয়ে আকাশে মার্কিন যুদ্ধবিমান তখন মহড়া দিচ্ছিল আর মাটিতে থাকা অত্যাধুনিক স্পাইওয়্যার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করছিল। এত বড় একটি সুযোগ পেয়েও তারা কিছুই করল না। এই ঘটনা কি প্রমাণ করে না, বিন লাদেন ও মোল্লা উমরের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেই আমেরিকার গুপ্তচর ছিল, যারা উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের দুজনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে স্যাটেলাইটের সাহায্যে আমেরিকানদের কাছে তথ্য সরবরাহ করত?

(এই ঘটনার সময় মোল্লা উমর যখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন, তখন মসজিদের সামনেই একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তখন সে গাড়ির ওপর বোমা হামলা হয়েছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে যে গুপ্তচর মোল্লা উমরের ওপর নজরদারি করত, সম্ভবত সেই হামলায় সে নিহত হয়েছিল। কারণ, তখন থেকে নিয়ে কান্দাহার ছাড়ার আগ পর্যন্ত আমেরিকার পক্ষ থেকে মোল্লা উমরের বিরুদ্ধে এ ধরনের দ্বিতীয় কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। সে গুপ্তচর জীবিত থাকলে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে অবশ্যই হামলা চালানো হতো।)

এই বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হলো, মোল্লা উমরের মতো উসামা বিন লাদেনের সাথেও একজন আমেরিকান গুপ্তচর থাকত। তার কাজ ছিল, সব সময় উসামা বিন লাদেনের সুনির্দিষ্ট অবস্থানের ব্যাপারে আমেরিকার

কাছে তথ্য পৌঁছানো, যাতে যে-কোনো হামলা থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং ভুলবশতও তাঁর ওপর কোনো হামলা না হয়।

[উসামা বিন লাদেন যদি আমেরিকার এজেন্ট না হন, তাহলে] মোল্লা উমরকে হত্যার জন্য আমেরিকা পরপর তিনটি বিমান হামলা করতে পারল, কিন্তু যুদ্ধের পুরো সময়ে উসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য একবারও চেষ্টা করল না কেন? দুজনের ব্যাপারে মনোভাবের এত তফাত কেন? বিন লাদেন কি আমেরিকার জন্য এমন কোনো নিরাপত্তাগত অচলাবস্থা তৈরি করে রেখেছিলেন, যা তারা সমাধান করতে পারছিল না? না-কি তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিলেন যে, তার কারণে আমেরিকা এমনসব পলিসি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছিল, তিনি না থাকলে আমেরিকার এই পলিসিগুলো আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেত না?' (পৃষ্ঠা ১৮৩)

এ অভিযোগ যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এর খণ্ডনেরও প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া আপনার বইয়ে আপনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। শায়খ উসামাকে হত্যা করার জন্য আমেরিকা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল এবং তাঁকে খুঁজে বের করার জন্য কী পরিমাণ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছিল—সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বইয়ের এক জায়গায় আপনি নিজেই লিখেছেন—

'অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, মাত্র চার-পাঁচজন আফগান মুজাহিদকে কোথাও মিলিত হতে দেখলেও মার্কিন বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমান তাঁদের ধাওয়া করার জন্য ছুটে যেত। এই বিমানের বৈশিষ্ট্য হলো, রাডারেও এটা ধরা পড়ে না। মাঝে মধ্যে এ ধরনের 'জটিল অপারেশনে' এফ-১৬ বিমানও যুক্ত হতো। একবার তো একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ১০/১৫ জনের একটি জমায়েতে গাইডেড মিসাইল দিয়ে হামলা করে সকলকে হত্যা করেছিল। কারণ শুধু এতটুকু ছিল, সেই স্মার্ট বিমান তার লেজার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখতে পেয়েছিল, জমায়েতে একজন ব্যক্তিকে সবাই অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছে। সে ব্যক্তিটি উসামা বিন লাদেন 'হতে পারেন'—শুধু এতটুকু সন্দেহ হওয়াতে পুরো জমায়েতকেই বোমা হামলা করে হত্যা করেছিল।' (পৃষ্ঠা ২৪৩)

এই কথা থেকে কী বোঝা যায়? আমেরিকা উসামা বিন লাদেনের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল, না-কি তাঁকে হত্যা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল এবং এ জন্য নিজেদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করত?

৪. শায়খ উসামার বিরুদ্ধে আরেকটি অদ্ভূত অভিযোগ হলো, শায়খ না-কি (পারমাণবিক বোমার মতো) আনকনভেনশাল ওয়েপন সংগ্রহের ব্যাপারে রাজি ছিলেন না এবং শায়খের

যে সাথিরা এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রের চেষ্টা করছিলেন, তাদের তিনি বাধা দিয়েছিলেন। বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী—

> 'শায়খ উসামার প্রতিরক্ষা সচিব বেশ কয়েকবার আনকনভেনশাল ওয়েপন সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উসামা বিন লাদেন প্রতিবারই তাতে বাধ সাধেন। বিন লাদেনের সেই প্রতিরক্ষা সচিব অবশেষে কান্দাহারে তাঁর অফিসে মার্কিন বোমা হামলায় নিহত হন। এ ঘটনার পাঁচ বছর আগে উসামা বিন লাদেনের আরেকজন প্রতিরক্ষা সচিবও আকস্মিক দুর্ঘটনায় আফ্রিকার একটি লেকে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। তিনিও এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহের জন্য চেষ্টা-তদবীর করছিলেন। আফ্রিকার সাহেলি অঞ্চলের কিছু দালালের সাথে তিনি যোগাযোগও করেছিলেন।' (পৃষ্ঠা ১৫২)

খুবই অদ্ভূত ও মিথ্যা একটি অভিযোগ। এই দাবিটি মিথ্যা এ জন্য না যে, লেখক এর পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি; বরং এটি মিথ্যা, কারণ সব দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষী এর বিরুদ্ধে। শায়খের আশেপাশে যে ভাইয়েরা কখনো ছিলেন, তাঁরা সবাই জানেন, এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে শায়খের আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বেশি। এ জন্য তিনি বেশ কয়েকজন ভাইকেও বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতার হয়ে এখন বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন।

এই অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আফ্রিকায় কাউকে কখনো পাঠানো হয়নি। কারণ, সবাই জানে আফ্রিকায় এ ধরনের অস্ত্র পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আবু উবাইদা পানশীরী রহ. যখন মারা যান, তখন তিনি এ ধরনের কোনো মিশনেও ছিলেন না। এ ঘটনার সাথে জড়িত সব ভাইয়েরাই বিষয়টি জানেন। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি বাস্তবেই এমন কোনো মিশনে ছিলেন, তাহলে অবশ্যই শায়খ উসামাকে জানিয়ে, তাঁর অনুমোদন ও অর্থায়ন নিয়েই গিয়েছিলেন।

আমরা যদি মেনেও নিই, শায়খের এ ধরনের কোনো দৌড়ঝাঁপের কথা আপনি জানেন না, তবু প্রশ্ন থেকে যায়। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী তো 'জিহাদের নামে ট্র্যাজেডি' সৃষ্টির ক্ষেত্রে শায়খ খুব দক্ষ মানুষ। এমন একজন মানুষ তো নিজ থেকেই এ ধরনের বিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করার কথা। কারণ, [আপনার কথা অনুযায়ী, শায়খ যেহেতু ধ্বংসসাধনে বেশ অভিজ্ঞ আর ধ্বংসাত্মক হামলা চালিয়ে জিহাদের নামে ট্র্যাজেডির জন্ম দেওয়াই শায়খের স্বভাব, সে হিসেবে] এই অস্ত্র ব্যবহার করে আল-কায়েদা অনেক বড় ও সর্বগ্রাসী ট্র্যাজেডির জন্ম দিতে পারত, এতে হয়তো তাদের দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্টও ঘুঁচে যেত। [এমন একজন মানুষ এই অস্ত্র সংগ্রহ করার চেষ্টায় বাধা দেবেন—এ কথা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?]

ধরে নিলাম, শায়খ এমন একটি অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। তখন তিনি সেটা কীভাবে ব্যবহার করতেন? 'নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক' নিহত হলে তো এই 'নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন'-এর কারণে আপনি বিব্রতবোধ করতেন। কোনো 'নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকের' ক্ষতি না করে কীভাবে সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করতেন? [যেহেতু এমন অস্ত্র সংগ্রহ করতে বাধা দেওয়ার কারণেই আপনি শায়খের সমালোচনা করছেন, তাহলে সে অস্ত্র সংগ্রহ করা হলে আপনার সমালোচনা এড়িয়ে কীভাবে তা ব্যবহার করা হতো—সেটাও বলে দেওয়া উচিত।]

৫. এমন আরেকটি অভিযোগ শায়খের ওপর আনা হয়েছে বইয়ে। শায়খ উসামার কাছে রাশিয়া অল্প দামে উন্নতমানের অত্যাধুনিক অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল, শায়খ সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইচ্ছা করেই স্থানীয় বাজারের অনুন্নত অকেজো অস্ত্র ব্যবহার করতে বলেছিলেন। বইয়ের ভাষ্য [পৃষ্ঠা ২০৩]—

> 'নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে তাজিকিস্তানে থাকা রুশ জেনারেলরা উসামা বিন লাদেনের কাছে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা তাঁকে আধুনিক শোল্ডার ফায়ার্ড অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল দিতে চেয়েছিল, কিন্তু উসামা বিন লাদেন তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। একই প্রস্তাব তালেবানের কাছেও দেওয়া হয়েছিল, সাথে এটাও বলা হয়েছিল, তালেবান চাইলে মিলিটারি হেলিকপ্টার বা অন্য যে-কোনো অস্ত্র দিতে রাশিয়া প্রস্তুত। তবে শর্ত হলো, অস্ত্রের অর্ধেক মূল্য নগদ ডলারে পরিশোধ করতে হবে আর বাকি অর্ধেক হেরোইন দিয়ে শোধ করতে হবে।'

কোনো পাগলও কি এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারে? এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা?

একসময় আপনিই যাকে উৎসাহ দিয়েছেন, সবার আগে যার পাশে দাঁড়িয়েছেন, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আপনিই যার ত্যাগ ও কুরবানীর প্রশংসা করেছেন, 'উম্মতের ঢাল' বলে যাকে ঘোষণা দিয়েছেন, এখন আবার আপনিই তাঁর বিরুদ্ধে এত মিথ্যা অপবাদ আর অভিযোগ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা শুধু এটাই বলতে পারি, ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে পুঁজি করেই এই বইগুলো লেখা হয়েছে। শুধু এই বই না, সবগুলো বইয়েরই একই দশা। সেই সাথে লেখক নিজের বিপদাপদের জন্য তাঁকে (শায়খ উসামা) দায়ী করে বইয়ের ছত্রে ছত্রে প্রতিশোধ নেওয়ারও চেষ্টা করেছেন।

বইয়ে আল-কায়েদার ওপর যে অপবাদগুলো আরোপ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো—

> 'সৌদি নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্বে কোনো জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হোক—আল-কায়েদা তা মানতে রাজি ছিল না। একটি সুসংগঠিত তরুণ নেতৃত্বের উত্থান হোক—বিন লাদেন তা-ও সহ্য করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে

বিন লাদেন মনে করতেন, পুরো বিশ্বে তাঁরই আধিপত্য চলে, অথচ এটা শুধুই তাঁর কল্পনা ছিল। এ কারণে তাঁর আশঙ্কা ছিল, নতুন কোনো জিহাদী নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটলে তাঁর এই কাল্পনিক বৈশ্বিক আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। [পৃষ্ঠা ১১৯]

বাস্তবেও তখন পুরো বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন কঠিন চাপের মুখে ছিল। আফগানিস্তানে থাকা কিছু জিহাদী সংগঠন, বিশেষ করে আল-কায়েদা এই চাপ তৈরি করে রেখেছিল। আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল, উজবেক নেতা মুহাম্মাদ তাহের ইয়ালদাশেভের ইস্পাতকঠিন (তাগুতী!!) পাঞ্জা ভেঙে তাঁর দলের মধ্যে ফাটল ধরানো এবং সেখান থেকে একটি সালাফী গ্রুপ তৈরি করে টাকাপয়সা আর যশখ্যাতির লোভ দেখিয়ে তাদেরকে আল-কায়েদার সাথে যুক্ত করা। তখন থেকেই ঝামেলার শুরু, যার কারণে আরব ও উজবেক মুজাহিদদের মধ্যকার জিহাদী ভ্রাতৃত্ব বরবাদ হয়ে গিয়েছিল।' [পৃষ্ঠা ১২০]

সে সময় উজবেক মুজাহিদরা দু'জন রাশিয়ান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করেছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ জেলে বন্দি করে রেখেছিল। কিন্তু তারা জেল থেকে পালিয়ে কাবুলে আল-কায়েদার গেস্ট হাউজে গিয়ে ওঠে এবং আশ্রয় চায়। আল-কায়েদার কাছে তারা অভিযোগ করে, সালাফী হওয়ার কারণে তাদের উজবেক সংগঠন তাঁদের ওপর অত্যাচার করেছে।' (পৃষ্ঠা ১২০)

এগুলো সব ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগ। আপনি ভালো করেই জানেন, আল-কায়েদাই হলো একমাত্র বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন, যারা ফিকহী মতপার্থক্য ও মাযহাবের ভিন্নতাকে ভুলে গিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জিহাদী আন্দোলনকে সহযোগিতা করার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের যে মুজাহিদদের চিন্তা-দর্শন, সামরিক ও সাংগঠনিক তৎপরতার প্রশংসা আপনি করেন, তাঁরাও কিন্তু আল-কায়েদার ট্রেইনিং ক্যাম্পেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সে ক্যাম্পগুলোতে আপনি নিজেও তাঁদের রাজনীতি বিষয়ক দরস দিয়েছেন। পরবর্তী সময়েও আল-কায়েদা তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই উজবেক মুজাহিদীন ও তাঁদের আমীর মুহাম্মাদ তাহের ইয়ালদাশেভকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রেখেছিল। যেহেতু উভয় পক্ষের সাথেই আপনার সম্পর্ক আছে, তাই আশা করি এ বিষয়টিও আপনি জানেন।

আন-নাহদা[৭২] পার্টির করুণ পরিণতির পেছনে যে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার হাত ছিল তা তো আপনি জানেনই। ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা হয়তো বোরহানুদ্দীন রব্বানি ও আহমাদ শাহ

[৭২] ১৯৯০ সালে সোভিয়েত আমলে সেক্যুলার শাসনের বিরোধিতা করে এবং মুসলিমদের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে তাজিকিস্তানে আন-নাহদা পার্টি (Islamic Renaissance Party - IRP) প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের

মাসউদকে এ কাজে ব্যবহার করেছে অথবা তাজিক সরকার ও আন-নাহদার মধ্যে মধ্যস্থতা করে তাদের এই হাল করেছে। মোটকথা, আন-নাহদার এই পরিণতির পেছনে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার হাত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। তাহলে কে বেশি নিন্দার যোগ্য? যাদের ট্রেইনিং ক্যাম্পে আন-নাহদার সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিয়েছে, সেই আল-কায়েদা, না-কি যারা আন-নাহদাকে করুণ এই পরিণতির দিকে নিয়ে গেল, সেই ইরানিরা?

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনি আল-কায়েদার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন যে, আল-কায়েদা সারা বিশ্বের জিহাদকে সৌদি নেতৃত্বের অধীনে আনতে চায়। অথচ আপনি খুব ভালো করেই জানেন, সৌদি সরকার ও সেখানকার দরবারি আলেমদের সাথে আল-কায়েদার বিরোধ সর্বজনবিদিত একটি বিষয়। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে সৌদির বিরোধিতা আল-কায়েদার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য।

আপনি আরও উল্লেখ করেছেন, আল-কায়েদা উজবেক মুজাহিদদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে অর্থের লোভও দেখিয়েছিল। এই কথা আমরা আর কারো থেকেই শুনিনি, আপনার থেকেই প্রথম শুনলাম। অথচ যেখানে ঘটনাগুলো ঘটছিল, সেখানে আমরাও ছিলাম। এমনকি মুহাম্মাদ তাহের ইয়ালদাশেভ থেকেও আমরা এ ধরনের কোনো কথা শুনিনি।

আপনার এ দাবির পক্ষে যে ঘটনাটিকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আপনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটনাটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। আল-কায়েদার মেহমানখানায় যে দুজন উজবেক ভাই আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা গুপ্তচর ছিলেন না, অথচ আপনি তাদের গুপ্তচর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ হলো, মুহাম্মাদ তাহের ইয়ালদাশেভ এ ঘটনার পর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আগের দায়িত্বে বহাল করেছিলেন। মূল বিষয়টি হলো, তাদের ইচ্ছা ছিল, আল-কায়েদার ভাইদের সাথে মিলে যুদ্ধফ্রন্টে যাবেন, তাই পালিয়ে আল-কায়েদার মেহমানখানায় এসে উঠেছিলেন। এ ঘটনা আপনিও জানেন। আপনি এটাও জানেন, আল-কায়েদা আফগানিস্তানে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব প্রচার করত না; বরং নিজ অনুসারী ও অন্যান্য আরবদেরকেও আফগানিস্তানের প্রচলিত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করতে বলত এবং মাযহাবি দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিত। কান্দাহারে তো

---

পতনের মাধ্যমে তাজিকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৯৩ সালে আইআরপি-কে তাজিকিস্তানে নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ আব্দুল্লাহ নুরী-সহ অনেক নেতাকর্মী পালিয়ে আফগানিস্তানে এসে আশ্রয় নেন এবং পরে তাজিকিস্তানের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করেন। ১৯৯৭ সালে সরকার আলোচনার প্রস্তাব দেয়। আইআরপি-সহ সব বিরোধী দল আলোচনায় রাজি হয় এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। আইআরপি-ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি ছেড়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এখানে করুণ পরিণতি বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [সম্পাদক]

আল-কায়েদার একটি শরীয়া অ্যাকাডেমিও ছিল, সেখানে আফগান ভাইদের আসা-যাওয়া তো ছিলই, অনেক আফগান ভাই সেখানে অধ্যয়নও করতেন। তাঁরা সকলেই এর সাক্ষী। এমনকি মুসলিমদের মধ্যে যেন কোনো বিভেদ ও ঘৃণা সৃষ্টি না হয়, সে জন্য আল-কায়েদা নামায-সহ অনেক ইবাদতে ইখতিলাফি সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলোও তরক করার কথা বলত।

মুহাম্মাদ তাহের ইয়ালদাশেভ সেই দুই ভাইকে আল-কায়দার মেহমানখানা থেকে যেভাবে বের করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা অবশ্যই বোকামি ছিল। আবু বিলাল নূবী রহ.-সহ সেখানে উপস্থিত ভাইয়েরা যদি তাঁকে বাধা না দিতেন, তাহলে আল্লাহ না করুন গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভাইয়েরা তাহের ইয়ালদাশেভকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলেন, তিনিও নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নেন। তাঁর এই আচরণে আল-কায়েদা বেশ বিব্রত ও অপমানিত হয়েছিল। কিন্তু শায়খ উসামা রহ. কোনো প্রতিশোধ নেননি, তিনি শুধু এ ব্যাপারে ইমারতে ইসলামিয়ার শরয়ী আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তাহলে এই ঘটনায় কে বেশি তিরস্কারের যোগ্য?

৬. পুরো বইজুড়ে শায়খ উসামার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ বারবার করা হয়েছে যে, অনেক আরব মুজাহিদ বাধ্য হয়ে শায়খ উসামার অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। (পৃষ্ঠা ১০৭)

তাই যদি হয়, তবে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। বলুন তো, আরব হোক বা অনারব— এমন একজনকেও কি আপনি চেনেন, যে বাধ্য হয়ে আল-কায়েদায় যুক্ত হয়েছে বা এখনো আছে? আপনি তো আল-কায়েদার সাথে প্রায় ২০ বছর কাটিয়েছেন, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ সাথিদের সাথেও আপনার গভীর সম্পর্ক আছে, এমন কিছু ঘটে থাকলে তো আপনি অবশ্যই জানতেন।

৭. আল-কায়েদার মুজাহিদদের অপমান করে নানান অভিধায় অভিহিত করা সর্বমহলেই এখন বেশ গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনিও হাতেম তাইয়ের মতো উদার মনে তাঁদের ব্যাপারে এমন অসংখ্য অবমাননাকর শব্দ নির্দ্বিধায় লিখে দিয়েছেন। আপনি লিখেছেন—

> ‘তাঁদের (আল-কায়েদার মুজাহিদদের) অহংকার, আত্মপ্রসাদ ও আত্মমুগ্ধতা এতই বেশি যে, তারা অন্যদেরকে নিচু মনে করে, কখনো কখনো অপমান করতেও দ্বিধা করে না। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সব ইসলামী সংগঠনের উচিত তাদের অধীনতা মেনে নেওয়া।’ (পৃষ্ঠা ৯৬)

৮. লেখকের আরেকটি উদারতা হলো, তিনি এই নেককার মুজাহিদদের ‘কলুর বলদ, বোঝাবহনকারী খচ্চর’ ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দে কটাক্ষ করেছেন। [পৃষ্ঠা ৩৯, ৪৭]

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, এতটুকু আদল ও ইনসাফ দান করুন, যেন এত বড় জুলুম আর না হয়।

বইয়ে আল-কায়েদা ও শায়খ উসামার ব্যাপারে কোনো ধরনের দলীল-প্রমাণ ছাড়াই যত অভিযোগ ও অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এগুলো তার নমুনামাত্র। এ ধরনের অভিযোগ দিয়ে পুরো বই-ই ভরপুর। সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না। বইয়ের সিংহভাগ আক্রমণ যদিও আল-কায়েদার ওপরেই করা হয়েছে, কিন্তু তালেবানকেও একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তালেবানের ব্যাপারেও বেশ ভালো রকমের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো—

১. তালেবানের ব্যাপারে বইয়ের এক জায়গায় বলা হয়েছে, কোনো এক দেশের সাথে তারা একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিটি ছিল, তালেবান দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে হামলা করার জন্য সালাং পাস ব্যবহার করবে না। বইয়ের ভাষায়—

> 'আমেরিকা সালাং পাসকে তালেবানের জন্য রেডলাইন হিসেবে ঘোষণা করে রেখেছিল। শুধু সালাং পাস না, পুরো হিন্দুকুশ পর্বতমালাই আমেরিকার রেডলাইনের আওতাভুক্ত ছিল। [অর্থাৎ তালেবান রেডলাইন অতিক্রম না করে যা খুশি করতে পারবে, কিন্তু রেডলাইন অতিক্রম করতে পারবে না। আর তালেবানও এতে সম্মত ছিল।] এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিও একই ছিল। রাশিয়ান মিলিটারি অফিসার আলেকজান্ডার লেবেডের বরাতে পূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন—'সালাং পাসের দক্ষিণদিকের প্রবেশমুখ জাবাল-ই-সিরাজে অবস্থিত। তালেবান এ মর্মে একটি গোপন চুক্তি করেছিল যে, তারা এই দক্ষিণদিকের প্রবেশমুখ দিয়ে উত্তরাঞ্চলে হামলা চালাবে না। তালেবানের এই গোপন চুক্তি রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বড় মাপের কৌশলগত ভুল ছিল।' (পৃষ্ঠা ৯১, ৯২)

আমরা জানতে চাই, এই চুক্তি যে হয়েছে, তার প্রমাণ কী? এটা যদি গোপন চুক্তিই হয়ে থাকে, তাহলে লেখক তা জানলেন কীভাবে? কার স্বার্থে তালেবান এই গোপন চুক্তি করেছিল? তালেবান কি তবে নিজের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করেছে? সালাং পাস ব্যবহার করে খুব সহজেই যেখানে উত্তরাঞ্চল জয় করা সম্ভব ছিল, সেই সহজ পথ ছেড়ে মোল্লা উমর কেন ঘুরপথে উত্তরাঞ্চল জয় করতে যাবেন? অথচ তিনি জানতেন, এত দীর্ঘ পথে হামলা করতে গেলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হবে, সময়ও নষ্ট হবে। এ সব জেনেও তিনি সে পথই ব্যবহার করেছেন, এই অযৌক্তিক কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

২. তালেবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলা হয়েছে, তালেবানযোদ্ধারা মাযার-ই-শরীফে অবস্থিত ইরানি কনসুলেট দখল করার পর 'পাকিস্তানের নির্দেশে' ইরানি কূটনীতিকদের হত্যা করেছিল। বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী—

> 'প্রতিহিংসাপরায়ণ যোদ্ধারা শহরে অবস্থিত ইরানি কনসুলেটে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর ১১ জন কূটনীতিককে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, তার কিছুক্ষণ আগেই হামলাকারীরা কারো সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এবং কূটনীতিকদের হত্যার নির্দেশ পায়। আর এই নির্দেশ এসেছিল ইসলামাবাদ থেকে।' (পৃষ্ঠা ৮৪)

কি অদ্ভূত কথা! তালেবান যোদ্ধারা তাদের অপারেশনের নির্দেশনা কাবুল বা কান্দাহার থেকে নিচ্ছে না, নিচ্ছে ইসলামাবাদ থেকে!! এটা তো ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার বানানো ন্যারেটিভ। লেখক নিজেও জানেন, ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতি নিজেদের আগ্রাসি নীতির বৈধতা উৎপাদনের জন্য ইরানি গোয়েন্দা সংস্থা এই কিচ্ছা-কাহিনি বাজারে ছেড়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কূটনীতিক হত্যার নির্দেশদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইরান কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি; বরং ওয়ার অন টেরর-সহ বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিলেও ইরান ঠিকই ইমারতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, অথচ তারা তো ইরানি কূটনীতিকদের হত্যার নির্দেশ দেয়নি, বাস্তবায়ন করেছিল মাত্র।

৩. বইয়ে তালেবানের সততার ওপর আক্রমণ করে বলা হয়েছে, কাবুলের ডিফেন্স লাইন মার্কিন বোমা হামলায় ভাঙেনি, ভেঙেছে মার্কিন ডলারের কারণে। বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী—

> 'এটা তো সবাই জানে যে, কাবুলের উত্তর দিকের ফ্রন্টে তালেবানের যে ডিফেন্স লাইন ছিল, তা আমেরিকার B-52 বোমারু বিমান বা ৯ হাজার কেজি ওজনের বোমার আঘাতে ভাঙেনি; বরং মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ডিফেন্স লাইনটি ভাঙা হয়েছিল।' [পৃষ্ঠা ১৯৩]

প্রিয় ভাই আমার, বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ খাতামি ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আলী আবতাহীর সামনেই এক অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন, মার্কিনিরাও তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছিল। সেটাই হলো প্রকৃত তথ্য।

তার বক্তব্যের সারকথা হলো, আমেরিকা টানা একমাস তালেবানের ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করেও যখন কাঙ্ক্ষিত সফলতার দেখা পাচ্ছিল না, তখন ইরান ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসে। ইরান আমেরিকাকে একটি সামরিক মানচিত্র সরবরাহ করে, তাতে কাবুলের ডিফেন্স লাইনের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা ছিল। ইরানের পরামর্শ মোতাবেক আমেরিকা

কাবুল ডিফেন্স লাইনের নির্ধারিত জায়গাগুলোতে হামলা করা শুরু করে এবং বাস্তবেই তারা সফল হয়। কাবুলের ডিফেন্স লাইন দ্রুত ভেঙে পড়ে। জয়েন্ট কমিটির মার্কিন প্রতিনিধিও এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আমেরিকা ও ইরানের নেতারা এ নিয়ে খুব গর্ব করে। তাদের এই স্বীকারোক্তি একাধিক জায়গায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। আল-জাযীরাও 'ইরান ওয়াল গর্‌ব' শিরোনামে তা প্রচার করেছে। ভিডিওটি আমার কাছেও আছে।

প্রিয় ভাই, আমি অবাক হই, আপনি বিভিন্ন ঘটনার গোপন রহস্য আর লুকায়িত কারণ ঠিকই বের করে ফেলেন, তা দৃঢ়তার সাথে প্রচারও করেন, কিন্তু যারা ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে, তারা যে বিষয়গুলোকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে এবং তা নিয়ে গর্ব করে, সেগুলোকে আপনি এড়িয়ে যান, জেনেও না জানার ভাণ করেন।

৪. তালেবানের ব্যাপারে এমন আরেকটি অভিযোগ এনে লেখক দাবি করেছেন, 'ইসলামী ইমারত রাজধানী কাবুলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করার ব্যাপারে এতটাই অবহেলা করেছে যে, একে রীতিমতো ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলেই ধরে নেওয়া যায়। [অর্থাৎ তালেবান ইচ্ছা করেই কাবুলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল রেখেছিল।]' (পৃষ্ঠা ১৫৮)

বইয়ে তালেবানের ব্যাপারে এ ধরনের আরও অনেক অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা নমুনাস্বরূপ এই কয়টিই উল্লেখ করলাম। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তবতাবিরোধী বিকৃত তথ্য বইয়ে স্থান পেয়েছে। এমন কিছু উদাহরণও এখানে উল্লেখ করছি। যেমন—

১. শায়খ উসামা রহ.-এর ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে, একই অভিযোগ বইয়ের একাধিক জায়গাতে আমাদের মরহুম ভাই শহীদ কমান্ডার খাত্তাব রহ.-এর ব্যাপারেও করা হয়েছে। লেখকের দায়িত্ব ছিল, এ সব অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ পেশ করা, কিন্তু তিনি তা করেননি।

২. একজন শায়খের ঘটনা বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, তাঁর দেশের সরকার তাঁকে বারবার হুমকি দিচ্ছিল। তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে আফগানিস্তানে আসেন। ওদিকে তাঁর মসজিদ আর সুবিশাল মাকতাবা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে একটি পাবলিক পার্ক বানানো হয়। আফগানিস্তানে আসার পরেও গুপ্তচররা তাঁর পেছনে লেগে থাকে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য কয়েকবার চেষ্টাও করে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি ছোটখাটো আঘাত নিয়ে বেঁচে যান। অবশেষে হেরাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে একদিন জুময়ার নামাযের পর তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা করা হয়। এতে কয়েকজন মুসল্লি-সহ তিনি নিহত হন।

এই শায়খের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আপনি শুধু এতটুকুই লিখেছেন যে, তিনি 'ইরানের একজন প্রতিবাদী সুন্নি আলেম' ছিলেন। আপনি বেশ জোর দিয়েই দাবি করেছেন, তাঁর হত্যাকাণ্ডের সাথে ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এই হত্যাকাণ্ডের দায় আপনি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ সাক্ষ্য-প্রমাণ তো সব আপনার দাবির বিপরীত কথা বলে। আপনি ঘটনাটিকে যেভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন, এটা তো ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার বয়ান। আসল ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইতিহাস তৈরি করা তো তাদের পুরোনো অভ্যাস।

৩. বইটিতে এমন অদ্ভূত কিছু দাবি করা হয়েছে, যা পড়ে পাঠকমাত্রই বিস্মিত হবেন। কার স্বার্থে এমন উদ্ভট মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে? যেমন:

- বইয়ের এক জায়গায় লেখা হয়েছে, 'কয়েকজন আরব ভাইকে তাঁদের স্ত্রী-সন্তানের সামনে জবাই করা হয়েছিল।' (পৃষ্ঠা ১৭৩)
- অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, গ্রেফতারি এড়াতে কিছু আরব পরিবার আত্মহত্যা করেছিল। বইয়ের ভাষায়—'গ্রেফতারি এড়াতে অনেকগুলো আরব পরিবার একসাথে আত্মহত্যা করেছিল। প্রথমদিকে এটা গুজব মনে হলেও পরে আমরা এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম।' (পৃষ্ঠা ২০৬)
- বইয়ের ১১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, অনেক মুজাহিদ গ্রেফতার হওয়া বা পশ্চিমা কোনো দেশে ফিরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুকেই উত্তম মনে করেছিল এবং নিজ পরিবারকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছিল।'
- বইয়ে বলা হয়েছে, [মার্কিন হামলা শুরুর পর আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে পলায়নের সময়] এতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, অনেক মা তাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, অনেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়েছিল, কিন্তু তারা বুঝতেও পারেননি। যে বাসে তারা উঠেছিলেন, এমন কিছু বাসে পাকিস্তানিরা পরে এমন কয়েকটি নবজাতক আরব শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিল। (পৃষ্ঠা ২০৫)

এ ধরনের কোনো ঘটনাই আসলে ঘটেনি। তখনকার পরিস্থিতিকে বিকৃত করে মুজাহিদদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এগুলো বানানো হয়েছে। বাস্তবেই যদি এগুলো ঘটে থাকে, তাহলে নাম বলুন, কারা নিজের পরিবারকে হত্যা করেছিল? সেই শিশুদের পরিচয় বলুন, যারা হারিয়ে গিয়েছিল। বাসে যে নারীদের গর্ভপাত হয়েছিল, তাদের পরিচয় দিন। আফগানিস্তান থেকে মুজাহিদদের সবগুলো পরিবার বের হওয়ার আগে ও পরে আমরা সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম। এমনকি আমাদের পরিবারও তো সবার সাথে পাকিস্তানে গিয়েছিল। এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা তো আমরা শুনিনি। অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনি কোনো ঘটনা

বলার সময় ঘটনার চরিত্রদের নাম-পরিচয় উল্লেখ করেই তো বলে থাকেন, তাহলে এই ঘটনাগুলো যাদের সাথে ঘটেছে, তাদের নাম-পরিচয়ও আশা করি বলবেন। সবার না হোক, কমপক্ষে একটি পরিবারের পরিচয় হলেও প্রকাশ করবেন আশা করি।

আপনার দাবি অনুযায়ী, জিহাদের নামে ট্র্যাজেডি তৈরিতে বিন লাদেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আপনার এই বইগুলো ইলমের নামে যে পরিমাণ ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়েছে, তা বিন লাদেনের তথাকথিত জিহাদী ট্র্যাজেডি থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

মুহতারাম ভাই, আর দুটি মন্তব্য উল্লেখ করেই আমি চিঠিটি শেষ করব।

**প্রথম মন্তব্য:**

যে ঘটনাগুলো আপনার উপস্থিতিতেই ঘটেছে, সেগুলো যদি আপনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে না মেলে, তাহলে সে ঘটনা লেখার সময় এটা উল্লেখই করেন না যে, আপনি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটি যদি আপনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলে, তাহলে আবার ঠিকই নিজের উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করেন; ঘটনা ঘটার সময় আপনার মতামত কী ছিল, তখন আপনি ঘটনার পক্ষে ছিলেন না বিপক্ষে ছিলেন—তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে নিজের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করার জন্য ঘটনাটিকে ব্যবহার করেন।

[উদাহরণস্বরূপ, আপনি দাবি করেছেন,] আমাদের এক ভাইয়ের সাথে আপনি সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক করেছেন এবং তার সামনে আপনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অনেক দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেছেন। সেখানে দুজনেই পক্ষে-বিপক্ষে নিজ নিজ মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা আপনার এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য সে ভাইকে এই বৈঠক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, এমন কোনো বৈঠকই না-কি হয়নি। এমনকি তিনি না-কি আপনাকে জীবনে মাত্র একবারই দেখেছেন। সাধারণ এক মজলিসে আপনার সাথে তার দেখা হয়েছিল। সে মজলিসে এত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার মতো সুযোগ ও পরিবেশ কোনোটিই ছিল না। (এই ভাইকেই আপনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য এবং বিন লাদেনকে আর্থিক সহায়তাপ্রদানকারী বলে উল্লেখ করেছেন।) বাস্তবেই যদি আপনি ভাইয়ের সাথে বসতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন, বাস্তবতা থেকে কত দূরে আপনি অবস্থান করছেন, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আপনাকে কতটা কাবু করে ফেলেছে। পুরো বইয়েই আপনার এই ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ছাপ বিদ্যমান।

কিছু ঘটনা এমনও আছে, যেগুলো ঘটার সময় আপনি শুধু উপস্থিত ছিলেন তা-ই না; বরং সে ঘটনায় আপনার বেশ শক্তিশালী ভূমিকাও ছিল, কিন্তু আপনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে না মেলার কারণে তার কিছুই উল্লেখ করেননি। পুরো বইয়ে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে।

**দ্বিতীয় মন্তব্য:**

আপনার বইগুলোতে বেশ আগ্রহের সাথে আপনি নিজেকে শায়খ উসামার 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই আগ্রহের হেতু আসলে কী? বইয়ের লেখা থেকে যে ধরনের 'ঘনিষ্ঠতার' (!!) পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ঘনিষ্ঠতাই কি এই আগ্রহের কারণ? না-কি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বাছবিচার না করে যে অপবাদগুলো আপনি দিয়েছেন, একে পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টামাত্র?

**শেষ কথা**

আমার সাথে যে ভাইয়েরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আপনি জানেন, তাঁদের অধিকাংশই আল-কায়েদার মজলিসে শূরার সদস্য। তাঁরা সকলেই আপনার বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। আপনিও তো আমাদের সাথেই ছিলেন। বইয়ে যে হারে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে, বানোয়াট ও মিথ্যা তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে ইরানি ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে—তা দেখে আমরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি।

এই চিঠিতে যা লিখেছি, তা ভাইদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার অতি সামান্য একটি অংশ। অল্প সময়ের মধ্যে ভাইদের মতামত আপনার সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছি শুধু। ইতিহাস বিকৃতির এই মহাযজ্ঞ দেখে অনেক ভাই তো কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। যাই হোক, ভাইদের সকলের মতামত হলো, আপনার নামে এই বইগুলো প্রকাশ করার পেছনে অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো—

১. সুন্নী জিহাদী আন্দোলনকে আক্রমণ করা।
২. শায়খ উসামা ও মোল্লা উমরের ওপর গাদ্দারির অভিযোগ এনে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী জিহাদী নেতৃত্বকে ধ্বংস করা। অথচ আমেরিকা ও পশ্চিমারাও তাঁদের ব্যাপারে এমন গুরুতর অভিযোগ আনার সাহস করেনি।
৩. হিযবুল্লাহ, উজবেক ও তাজিকদের মতো ইরানের মদদপুষ্ট দলগুলোকে সামনে এনে তাদের মহান হিসেবে তুলে ধরা।

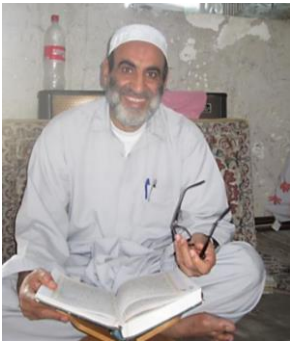
এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখেই ইতিহাসকে এত ব্যাপক আকারে বিকৃত করা হয়েছে। যার ফলে বইয়ের নানান জায়গায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য উঠে এসেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, লেখক তাড়াহুড়ো করে লিখতে গিয়ে মিথ্যাগুলো ভালোভাবে সাজাতেও ভুলে গেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—তারা [ইরান ও তাদের মতাদর্শীরা] তাহলে হামাসকে সহযোগিতা করছে কেন? উত্তর হলো—কেবল মিডিয়া কভারেজ পাওয়ার জন্যই তারা হামাসকে সহযোগিতা করছে। মজলুম ও দুর্বল হওয়ার কারণেই যদি তারা হামাসকে সহযোগিতা করত, তাহলে শুধু হামাস কেন, সারা বিশ্বে তো আরও অনেক নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিম আছে। পৃথিবীর কোন দেশে মুসলিমরা মজলুম না? চেচনিয়া, কাশ্মীর, দারফুর, সোমালিয়া ও বসনিয়ার মতো অসংখ্য দেশে মুসলিমরা গণহত্যার শিকার হচ্ছে, তারা কি তাদের দিকে ফিরেও তাকিয়েছে? বরং আফগানিস্তানের মতো অনেক দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্র করেছে। বিশেষজ্ঞরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও এ সব জানে। এমনকি আল-জাযীরার এক টকশোতে সাবেক ইরানি প্রেসিডেন্ট খাতামির উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শরিয়তি মাহমুদ আহমাদিনিজাদের সমালোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই বলেছিল—'হামাসের প্রতি ইরানের সমর্থন মূলত মিডিয়া কভারেজের উদ্দেশ্যেই।'

আমাদের বিরুদ্ধে গুম, খুন, অপহরণ ও নির্যাতনের যে সিলসিলা তারা শুরু করেছে, শিক্ষা, কর্ম ও স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার থেকে আমাদের সন্তানদের বঞ্চিত করছে—তাদের এ সব কর্মকাণ্ড মুসলিমদের কী উপকারে আসছে? জিহাদী আন্দোলন ও মুজাহিদরা এর দ্বারা কতটুকু লাভবান হচ্ছে? না-কি এটা গোপনীয় কোনো বিষয়, তাই আপনার বইয়ে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে? আমাদের তো বলার অনেক কিছুই আছে। সামনে হয়তো কখনো সুযোগ হবে।

প্রিয় শায়খ, আমরা যদি আপনাকে অতিরিক্ত কিছু বলে থাকি, তাহলে আশা করছি আমাকে ও বাকি ভাইদের এই অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই এ সব বলতে বাধ্য হয়েছি। আশা করছি, এতে আমাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হবে না। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন, আমাদের সকলকে আবারও তাঁর পথের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করেন, যেন আমরা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে পারি এবং এই পথে চলতে গিয়ে যে ভুলগুলো হয়েছে, তা শোধরাতে পারি। আল্লাহ চাইলে ভালো কোনো পরিবেশে আমাদের সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে সহীহ সালামতে রাখুন, আমীন। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আহমাদ হাসান আবুল খাইর
১লা রমাযান ১৪৩০ হিজরী
২২শে আগস্ট ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ



শায়খ আহমাদ হাসান আবুল খাইর
(আব্দুল্লাহ রজব) রহ.

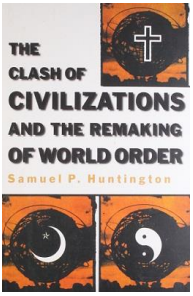
## আল-কায়দার বার্তা

ডক্টর আব্দুল্লাহ নাফীসী 'আল-আলাম বা'দা গাযওয়াতি ম্যানহাটন (৯/১১ পরবর্তী বিশ্ব)' শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> '১৯৯২ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি দেশের জন্ম হলো, তখন আমেরিকায় আওয়াজ উঠল, আমেরিকার ভবিষ্যৎ শত্রু তাহলে কে হবে? কারণ, নিজেদের অস্ত্রভান্ডার খালি করার জন্য আমেরিকানদের সব সময় বহিঃশত্রুর দরকার হয়। তখন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন তার কুখ্যাত বই 'Seize the Moment: America's Challenge in a One-Superpower World' নিয়ে হাজির হলেন। আমেরিকানদের তিনি বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। 'সবুজ দানব' জেগে ওঠার আগেই পুরো বিশ্বের ওপর আমেরিকার স্পিরিচুয়াল লিডারশিপ (আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে 'সবুজ দানব' বলে তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৭৩]
>
> ৯/১১-এর পর পুরো পশ্চিমাবিশ্বই বুঝতে পেরেছিল, তারা ইতিহাসের এক নতুন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক বৈশ্বিক সংঘাত তাদের সামনে অপেক্ষা করছে। স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'দ্যা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস' বইয়ে এই সংঘাতের

[৭৩] আমাদের শত্রুরা কেন সব সময় ইসলামকেই টার্গেট করে? ইসলামের ওপর তারা এত ক্ষিপ্ত কেন? কেন তারা সব সময় ইসলামকে বিকৃত করার চেষ্টায় থাকে? এমনকি ক্ষমতা ও স্বার্থের লড়াইয়েও তারা ইসলামকে আঘাত করে কেন? সংক্ষেপে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হলো—ইসলামের মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে, আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, যা তাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করার মতো শক্তি ধারণ করে। তারা ভালো করেই জানে, তাদের আধিপত্য ও লোভ-লালসার পথে ইসলামই একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিশ্বাসগত প্রতিপক্ষ।

কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হলো—'একই সাথে একাধিক সভ্যতা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে পারে না। পৃথিবীর নেতৃত্ব যে-কোনো একটি সভ্যতাকেই দিতে হবে। তার প্রণীত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।'[৭৪]



দ্যা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস


স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন

হান্টিংটন মিথ্যাবাদী হলেও এ কথাটি সত্য বলেছে। মুসলিম হিসেবে আমরা তার এই তত্ত্বের সাথে একমত। আমরাও মনে করি, পৃথিবীতে একইসাথে দুটি সভ্যতার নেতৃত্ব থাকতে পারে না। আমরা তাকে বলব, আপনি ১৪০০ বছর পরে এসে এই কথা বলছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে অনেক আগেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَاتِلُوْہُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِتْنَۃٌ وَّیَکُوْنَ الدِّیْنُ کُلُّہٗ لِلّٰہِ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং (পৃথিবীতে) আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৯]

এমনইভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমাদের এই দীন পৃথিবীর বুকে কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরেই পৌঁছে যাবে। তামীমে দারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَيَبْلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلَغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يَترُكُ اللهُ بَيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلَّا أدخَلَه اللهُ هذا الدِّينَ، بعِزِّ عَزيزٍ أو بذُلِّ ذَليلٍ؛ عِزًّا يُعِزُّ اللهُ به الإسلامَ، وذُلًّا يُذِلُّ اللهُ به الكُفرَ

'রাত ও দিন যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, অবশ্যই এই দীন ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। কাঁচা-পাকা কোনো ঘর বাদ যাবে না, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরেই এই দীনকে পৌঁছিয়ে

[৭৪] উস্তায আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদের প্রবন্ধ সংকলন।

দেবেন; সম্মানিতদের জন্য সম্মানের সাথে আর নীচ লোকদের জন্য লাঞ্ছনার সাথে। সম্মানিতকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন আর লাঞ্ছিতকে কুফরির মাধ্যমে লাঞ্ছিত করবেন।' [মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯৫৭]

সংক্ষেপে বললে, আল-কায়েদা নতুন কোনো বার্তা নিয়ে আসেনি, শরীয়তবিরোধী বিদয়াতী কোনো দর্শনও তারা প্রচার করে না। আল-কায়েদা শুধু এমন একটি ফরযে আইন বিধান পালনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে, অন্যরা যে ব্যাপারে অলসতা ও উদাসীনতা দেখিয়েছে। তারা আল্লাহর পথে কিতাল করার এবং মুসলিম উম্মাহকে কিতালের জন্য উৎসাহিত করার শপথ নিয়েছে। তাদের এই কিতাল ততদিন পর্যন্ত চলবে, যতদিন না কিতালের আল্লাহপ্রদত্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়। আল্লাহ তাআলা কিতালের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়ে ঘোষণা করেছেন—

حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

'যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং (পৃথিবীতে) আল্লাহর দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৯]

আল-কায়েদার ইতিহাস তুলে ধরাই যেহেতু এই বইয়ের উদ্দেশ্য, তাই কী কী কারণে আল-কায়েদা অস্ত্রধারণ করেছে—এ বিষয়টিও স্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য। তবে মনে রাখতে হবে, 'ফিতনা নির্মূল করে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা'র এই দায়িত্ব শুধু আল-কায়েদার না, প্রত্যেক মুসলিমকেই আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব দিয়েছেন।

## আমরা কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি?

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮২ সালে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ইহুদীরা লেবাননে গণহত্যা চালায়। এই ঘটনা তখন শায়খ উসামার মধ্যে এক প্রতিবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়, জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাঁর মধ্যে তৈরি হয়। তিনি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেন, যে করেই হোক জালেমদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দিন-মাস-বছর পেরিয়ে গেলেও শায়খের মনের এই আগুন আর নেভেনি; বরং এর উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এরপর আফগান জিহাদ শুরু হলো। পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে যুবকেরা আফগানিস্তানে ছুটে আসতে লাগল। শায়খ উসামা ও শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম এই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। উভয়েই চাচ্ছিলেন, বেশি থেকে বেশি মুসলিম সন্তান যেন আফগানিস্তানে আসে এবং জিহাদী চিন্তা-চেতনা গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলতেন—

> 'আমি চাই আরবের প্রত্যেকটি দেশ থেকে কমপক্ষে ৪০ জন মুজাহিদ আসুক। তাঁদের মধ্যে অর্ধেকই হয়তো শহীদ হয়ে যাবে, কিন্তু বাকিরা এই জিহাদী চেতনা নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাবে।'

অন্যদিকে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. চেয়েছিলেন, আফগানের এই জিহাদ যেন শুধুই প্রতিক্রিয়ামূলক জিহাদ না হয়; বরং এই জিহাদের যেন সুসংগঠিত চিন্তা ও আদর্শ থাকে। তিনি এই জিহাদকে সাইকস-পিকোর টেনে দেওয়া সীমানার ভেতরে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, এখান থেকে মুজাহিদদের একটি র‍্যাপিড ফোর্স তৈরি হবে, যারা কোনো সীমারেখা মানবে না। পৃথিবীর যেখানেই নির্যাতিত মুসলিমের আহাজারি শোনা যাবে, তারা সেখানেই ছুটে যাবে, হোক সেটা সুদূর চীনে। আল-কায়েদার দর্শন অনুযায়ী, ইসলামের এই জিহাদী প্রকল্প কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বন্দি থাকতে পারে না; বরং সব সীমানা ভেঙে, সকল গণ্ডি পেরিয়ে এই জিহাদকে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন সারা দুনিয়ার মানুষ বান্দার গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গোলামি করার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।[৭৫] শায়খ উসামা রহ. তাঁর এই লক্ষ্যের কথা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। পূর্বেও এ আলোচনা গত হয়েছে। শায়খ রহ. বলেছিলেন—

> 'আমরা শুধু আফগানিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য এই জিহাদ করছি না। আফগানিস্তান তো ইসলামী বিশ্বের একটি অংশমাত্র। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আরব ও মুসলিম যুবকদের সংঘবদ্ধ করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে একটি ইসলামী সেনাবাহিনীর ভিত তৈরি করা। এই ইসলামী বাহিনী সারা দুনিয়ার মুসলিমদের ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে।'

বাস্তবেও আফগান জিহাদ ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। আফগানিস্তানে জিহাদী দলগুলোর যত অর্জন আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো—বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে জিহাদী আদর্শের বিশ্বায়ন। মুসলিম উম্মাহ সুদীর্ঘকাল যাবৎ কিতালের এই ফরয বিধান থেকে মাহরুম ছিল, মুজাহিদগণ আফগানিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়া ও চেচনিয়াতে জিহাদের এই মৃতপ্রায় ফরযকে পুনর্জীবিত করেছেন। আফগান জিহাদের আরেকটি সাফল্য হলো, মুসলিম যুবকদের চিন্তা ও মননে সুপার পাওয়ারের যে কাল্পনিক রূপ জেঁকে বসেছিল, আফগান জিহাদের ফলে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুপার পাওয়ারকে তারা এখন আর ভয় করে না। যারা সুপার পাওয়ারকেই ভয় করে না, তারা যে মুসলিম দেশগুলোতে চেপে বসা দালাল শাসকদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না—তা বলাই বাহুল্য।

---

[৭৫] উস্তায আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদের প্রবন্ধ সংকলন

মোটকথা আফগান জিহাদ ছিল মুসলিম যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ পর্ব, এই পর্বে তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনাগত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে সারা দুনিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী সুপার পাওয়ার আমেরিকার সাথে।[৭৬]

১৯৯০ সালের ৭ই আগস্ট সৌদি সরকার কুয়েতকে মুক্ত করার অজুহাতে[৭৭] মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীকে হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ডেকে নিয়ে আসে। এই ঘটনা মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি মহা বিপর্যয় ছিল। মুজাহিদগণ একে হারামাইনের মাটিতে আমেরিকার আগ্রাসন হিসেবেই দেখেছিলেন, তবে এই আগ্রাসন হয়েছিল খোদ সৌদি সরকারের সহায়তায়। এ প্রসঙ্গে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

> 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মুসলিম জাতি যতগুলো ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, এই ঘটনা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে ভূমিতে ইসলামের সূচনা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করেছেন, যেখানে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কিবলা কাবা অবস্থিত, সেই পবিত্র ভূমিতে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্রদের আগ্রাসনের চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় আর কী হতে পারে? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'[৭৮]

[১৯৯০ সালের ৭ই আগস্ট মার্কিন বাহিনী যখন সৌদি আরবে প্রবেশ করে], তখনই শায়খ উসামা রহ. বুঝতে পেরেছিলেন, আমেরিকার সাথে যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু তিনি তখন সৌদিতে নজরবন্দি থাকায় কিছু করতে পারছিলেন না। আমেরিকার ওপর আঘাত হানার প্রথম সুযোগটি আসে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে। সে বছর আমেরিকা [জাতিসংঘের নেতৃত্বে Operation Restore Hope-এর নামে] সোমালিয়ায় সামরিক আগ্রাসন চালায়। শায়খ উসামা রহ. তখন সুদানে ছিলেন। আমেরিকাকে আঘাত করার এই সুবর্ণ সুযোগ আল-কায়েদা হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না। আল-কায়েদার পরিকল্পনা ছিল, সোমালিয়ার মাটিতে আমেরিকাকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে জড়িয়ে ক্রমান্বয়ে তার অর্থনৈতিক, মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ধ্বংস করা হবে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমেরিকা বুঝতে পারে, তারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য এক চোরাবালিতে আটকে যাচ্ছে। আফগানের মাটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে দশা হয়েছিল, সোমালিয়াতে তাদেরও একই দশা হবে। কারণ, তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মিলিটারি জেনারেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল না, তারা যুদ্ধ করছিল পুরো একটি জাতির

---

[৭৬] দাওয়াতুল মুকাওয়ামা : শায়খ আবু মুসআব সূরী (ঈষৎ পরিবর্তিত)

[৭৭] বইয়ের 'জাযীরাতুল আরবে মার্কিন উপস্থিতি : লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা' পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[৭৮] শায়খ উসামা রহ.-এর বিবৃতি 'আখরিজুল মুশরিকীন মিন জাযীরাতুল আরব'-এর অংশবিশেষ

বিরুদ্ধে। ফলে ৮০ জন মার্কিন সৈনিকের লাশ পড়তেই ১৯৯৪ সালের মার্চে আমেরিকা সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইতোমধ্যে দিন বদলের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ১৪১৭ হিজরীর সূচনালগ্নে ১৯৯৬ সালের ১৮ই মে শায়খ উসামাকে সুদান ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। শায়খ তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের বহনকারী বিমানের চাকা জালালাবাদ বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করার পর থেকেই নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দান প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামের পবিত্র ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা এবং দীনের নুসরতের জন্য উম্মতকে জিহাদ-কিতালের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের ২৩শে আগস্ট শায়খ উসামা রহ. মুসলিম উম্মাহ, বিশেষ করে জাযীরাতুল আরবের মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম বার্তাটি প্রকাশ করেন। 'أخرجوا المشركين من جزيرة العرب' (জাযীরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও)'-শিরোনামে বার্তাটি প্রকাশিত হয়। এতে হারামাইনের মাটিতে হানাদার মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বার্তায় শায়খ উসামা রহ. বলেছিলেন—

> 'আমরা বর্তমানে বিশেষ একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। পুরো দুনিয়াজুড়ে, বিশেষত ইসলামী বিশ্বে এক বরকতময় নবজাগরণ শুরু হয়েছে। এমন এক বরকতময় সময়ে দীর্ঘ বিরতির পর আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এই বিরতি ইচ্ছাকৃত কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, জালেম ক্রুসেডার জোট আমাদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছিল। এই জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোট উলামায়ে কেরাম ও দীনের দাঈদের ওপর কঠোর দমনপীড়ন চালিয়ে তাঁদের কোণঠাসা করে রেখেছে। তাদের ভয় হলো, উলামায়ে কেরাম সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণ করে উম্মতে মুসলিমাকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবেন, ইবনে তাইমিয়া ও ইয বিন আব্দুস সালামের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা ময়দানে নেমে আসবেন। এই ভয় থেকেই ক্রুসেডার জোট শীর্ষস্থানীয় হক্কানী উলামা-মাশায়েখ ও দাঈদের গুম-খুন ও গ্রেফতার করা শুরু করেছে। তারা শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামকে হত্যা করেছে, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে শায়খ আহমাদ ইয়াসীনকে এবং আমেরিকায় শায়খ উমর আব্দুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। এই জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের নির্দেশেই হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে শায়খ সালমান আওদা, শায়খ সাফার আল-হাওয়ালী-সহ সমমনা অসংখ্য আলেম, দাঈ ও যুবককে বন্দি করা হয়েছে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমিও এই জুলুমের ভুক্তভোগী। মুসলিম জনসাধারণের সামনে আমাকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে; পাকিস্তান, সুদান, আফগানিস্তান-সহ সব জায়গাতেই আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। এই হয়রানির কারণেই

দীর্ঘ একটি সময় বাধ্য হয়ে আপনাদের থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা হিন্দুকুশের পর্বতচূড়ায় খোরাসানের মাটিতে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই সেই জায়গা, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর ধর্মদ্রোহী সামরিক বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়েছে, মুজাহিদদের আল্লাহু আকবার ধ্বনির সামনে কাল্পনিক সুপার পাওয়ার জুজুর অবসান ঘটেছে। আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক সেই ভূমি থেকেই আমরা উম্মতকে জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করছি। এই জায়োনিস্ট-ক্রুসেডাররা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা ও মিরাজের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি দখল করে রেখেছে, হারামাইনের পবিত্র ভূমিকে কলংকিত করেছে। আমরা অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব। আল্লাহ তাআলার নিকট আমরা আশাবাদী, আমাদের তিনি বিজয় দান করবেন। বিজয় দেওয়ার মালিক তো তিনিই, এই ক্ষমতাও কেবল তারই হাতে।'

এই বক্তব্যে শায়খ উসামা রহ. আমেরিকার ভাষাতেই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

**ليس بيني وبينكم من عتاب ... سوى طعن الكلى وضرب الرقاب**

'মুখের ভাষায় তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কথা হবে না, কথা হবে শুধু তির-তরবারির ভাষায়।'

শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী রহ. তাঁর '**عمليات ١١ سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك**' (অপারেশন ১১ই সেপ্টেম্বর : বাস্তবতা ও সংশয়)' বইয়ে লিখেছেন—

'১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো আল-কায়েদা আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখে। তখন থেকেই আল-কায়েদার মুজাহিদরা মার্কিন স্বার্থে শক্তিশালী আঘাত করার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল, এই হামলার মাধ্যমে আমেরিকাকে দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধে টেনে আনা হবে। এই যুদ্ধের পেছনে কৌশলগত লক্ষ্য ছিল, উম্মতে মুসলিমাকে ক্রুসেডার শত্রুর বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা। এ যুদ্ধের প্রধান চালিকাশক্তি হবে উম্মতের সন্তানেরা, যারা স্বজাতির হারানো ইজ্জত-সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেবে এবং দীর্ঘমেয়াদি এই যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে করতে একসময় ক্লান্ত ও হতাশ বানিয়ে ফেলবে। তখন বাধ্য হয়েই শত্রু (আমেরিকা) মুসলিম জাতির ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে পিছু হটবে এবং মহাসাগরের ওপারে নিজের গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নেবে। এর মাধ্যমে শুরু হবে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্ব। মুসলিম জাতি তখন নিজ নিজ দেশে জেঁকে বসা স্বৈরাচারদের বিরুদ্ধে পূর্ণ মনোযোগ দেবে, উম্মতের স্বাধীনতা ও সম্মান ফিরিয়ে আনা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণমাত্রায় সংগ্রাম শুরু করবে। কেবল তখনই এবং এই উম্মতের সন্তানদের হাতেই ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে, ইসলামের পবিত্র ভূমিগুলো

পুনরায় মুসলিমদের হাতে ফিরে আসবে। জাতিসংঘের হাত দিয়ে কস্মিনকালেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আসবে না, জাতিসংঘ তো মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-এর আজ্ঞাবাহী একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র।'

কিন্তু, আমেরিকা শায়খের হুঁশিয়ারি আমলে না নিয়ে নিজ হঠকারিতায় অটল থাকে। তখন শায়খ উসামা রহ. তাঁর কথাকে কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাইরোবি, দারুস সালাম, এডেন, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ব্যতিক্রমী হামলাগুলোর জন্ম হয়। এর মধ্য দিয়ে আল-কায়েদাও তার উদ্দেশ্যে সফল হয় এবং আমেরিকা স্বেচ্ছায় তার জন্য পাতা ফাঁদে পা দেয়।

এরপর একের পর এক শায়খের কয়েকটি বার্তা প্রকাশিত হয়। এ বার্তাগুলোতে শায়খ উসামা রহ. খুব স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ২০০৪ সালের ২৯শে অক্টোবর মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে শায়খের দ্বিতীয় খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। 'আল-হারব আসবাবুহা ওয়া নাতাইজুহা (যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল)' শিরোনামের এই চিঠিতে তিনি বলেন—

'৯/১১-এর অনেক আগে থেকেই তোমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করে আসছিলাম; কখনো কথার মাধ্যমে, কখনো কাজের মাধ্যমে। সাংবাদিকদের দেওয়া আমার সাক্ষাৎকারগুলো এখনো দেখে নিতে পারো। ১৯৯৬ সালে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত স্কট ম্যাকলিওডকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৯৯৭ সালে সিএনএন প্রতিনিধি পিটার আর্নেট অথবা জন মিলারকে দেওয়া ১৯৯৮ সালের সাক্ষাৎকারটি দেখতে পার। আর যদি আমার কথার প্রায়োগিক রূপ দেখতে চাও, তাহলে নাইরোবি, দারুস সালাম ও এডেনের ঘটনা দেখতে পার। আরও জানতে চাইলে আব্দুল বারি আতওয়ান অথবা রবার্ট ফিস্ক-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারগুলোও দেখতে পার।'[৭৯]



রবার্ট ফিস্ক
ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রতিনিধি



স্কট ম্যাকলিওড
টাইম ম্যাগাজিন প্রতিনিধি



তাইসীর আল্লুনী
আল-জাযীরা প্রতিনিধি

[৭৯] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

আল-জাযীরা প্রতিনিধি জামাল ইসমাইল শায়খ উসামা রহ.-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কী চান? উত্তরে শায়খ রহ. বলেছিলেন—

> 'অন্যান্য সাধারণ প্রাণী যা চায়, আমরা তার চেয়ে বেশি কিছু চাই না। আমরা চাই, শত্রুদের দখলদারিত্ব থেকে আমাদের ভূমিগুলো মুক্ত হোক,[৮০]আমাদের মাটিতে কোনো মার্কিন সৈন্য না থাকুক। বাকশক্তিহীন প্রাণীগুলোকেও আল্লাহ তাআলা এমন সহজাত প্রতিবাদী মানসিকতা দান করেছেন যে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কোনো অনুপ্রবেশকারীকে মেনে নিতে পারে না। আল্লাহর ছোট্ট একটি মাখলুক মুরগির কথাই চিন্তা করুন। কোনো সশস্ত্র সৈনিক যদি মুরগির ঘরে হামলা করে মুরগিও কিন্তু তার সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। মুসলিম বা মানুষ না, সাধারণ একটি প্রাণীর যে অধিকার, আমরা সেই অধিকারটুকুই চাই। আমাদের পবিত্র স্থানগুলো দখলমুক্ত হোক—আমরা সেটা চাই। এই জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোট আমাদের প্রথম কিবলা দখল করে সেখানে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, আমেরিকার নেতৃত্বে তারা হারামাইনের পবিত্র মাটিতে হস্তক্ষেপ করেছে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তাই আমরা উম্মতকে উদ্‌বুদ্ধ করতে চাচ্ছি, তারা যেন নিজেদের ভূখণ্ডগুলো মুক্ত করার জন্য জিহাদের পথ বেছে নেয় এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করে কালিমার পতাকা বুলন্দ করে।'

মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠিতে তিনি আরও বলেছিলেন—

> '৯/১১-এর পর যে শপথবাক্য আমরা উচ্চারণ করেছিলাম, সেটাই আমাদের আসল কথা। [মুসলিমদের বিরুদ্ধে] আমেরিকার সব অন্যায় বন্ধ করতে হবে, ইসরাইল থেকে সমর্থন উঠিয়ে নিতে হবে এবং মুসলিমদেরকে তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে; যেন আমরা মুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর দীন কায়েম করতে পারি।'

চিঠির শেষে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

> 'আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমাদের নিরাপত্তা জন কেরি, বুশ কিংবা আল-কায়েদার হাতে না; তোমাদের নিরাপত্তা তোমাদেরই হাতে। যে দেশ নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, তারা যেন আমাদের নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপ না করে।'[৮১]

---

[৮০] চলমান ইসলামী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আহমাদ সামীর রচিত 'মা'রাকাতুল আহরার' বইটি দেখা যেতে পারে।

[৮১] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

আল-জাযীরা প্রতিনিধি জামাল ইসমাইল শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদের আমীর হিসেবে মিশর ও ইসলামী বিশ্বের প্রতি আপনার বার্তা কী?[৮২] তার প্রশ্নের জবাবে শায়খ বলেছিলেন—

> 'আমার এ সব উপাধি ও লকব একপাশে রেখে একজন মুসলিম হিসেবে সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাইবোনদের একটি কথাই বলতে চাই—আমরা যদি সম্মানের সাথে বাঁচতে চাই, ইজ্জতের জিন্দেগি চাই, তাহলে আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতেই হবে। মিশর, আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের সকলকে বলতে চাই, আমাদের সকলের শত্রু ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের সহযোগিতা করবেন। আল-আযহারের স্বকীয়তা রক্ষা করা মিশরের উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। যে আযহার সুদীর্ঘকাল যাবৎ ঔপনিবেশিক শক্তি ও দখলদারদের বিরুদ্ধে, জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে টিকে ছিল, সেই আযহারে এখন সরকারের হুকুম চলে আর তারা ইসরাইলি হাখামকে আল-আযহার পরিদর্শনের দাওয়াত দেয়।
>
> আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে মুসলিম ছাত্রদের উচিত ইত্তিহাদুত তুল্লাব (ছাত্র সংসদ)-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। পিতামাতারও কিছু দায়িত্ব আছে, তাঁরা সন্তানদের কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেবেন; তাদের শেখাবেন, ফিলিস্তিন একটি মুসলিম ভূখণ্ড, ইসরাইলিরা হলো অবৈধ দখলদার আর ইসরাইলের সাথে যত চুক্তি হচ্ছে, এ সব অবৈধ। সন্তানদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমেরিকা মিশর দখল করে রেখেছে, হারাম শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারাও দখল করে রেখেছে, আমাদের তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের এভাবেই গড়ে তুলতে হবে। আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মিশরের প্রতিটি যুবক-তরুণ, ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবী এবং সকল সংগঠনের কর্মীদের একান্ত কর্তব্য।'[৮৩]

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর এক বছরের মাথায় আস-সাহাবকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেছিলেন—

> 'আমেরিকা ও তার মিত্রদের বলছি, অন্যায়ের শাস্তি তোমাদের ভোগ করতেই হবে। তাই, নিজেদের অপরাধের পরিমাণ আর বাড়িয়ো না। সবকিছু হারানোর আগে যত দ্রুত সম্ভব

---

[৮২] শায়খের এই সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৮ সালে নেওয়া হয়েছিল। তখনও ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হয়নি।

[৮৩] বিন লাদেন, আল-জাযীরা ও আমি : জামাল ইসমাইল

ফিলিস্তিন, জাযীরাতুল আরব, আফগানিস্তান-সহ সকল মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের হয়ে যাও। মার্কিন মিত্রদের উদ্দেশ্যে আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কিছু বার্তা দিয়েছি, তাদের আমরা বারবার সতর্ক করেছি, আমেরিকার এই ক্রুসেডে তোমরা নিজেদের জড়িয়ো না। মুজাহিদ যুবকরা ইতোমধ্যেই জার্মানি ও ফ্রান্সকে উপযুক্ত সবক দিয়েছে। এতেও যদি তোমাদের যথেষ্ট না হয়, মনে রেখো, আমাদের তূণীরে এখনো তির আছে।'[৮৪]

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'وصايا فرسان غزوة لندن (অপারেশন লন্ডনের বীরদের অসীয়ত)' শিরোনামে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর আরেকটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে আল-কায়েদার বার্তা স্পষ্টভাবে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন—

'হে ক্রুসেডারদের সহযোগীরা, প্রথমে আমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেছিলাম। ইসলাম এমন এক দীন, যা সকল নবীদের বিশ্বাস করতে বলে, আল্লাহর নাযিলকৃত সকল আসমানি কিতাবে ঈমান রাখতে বলে; ইসলাম এমন এক দীন, যে দীনের অলৌকিক কিতাব আজ অবধি সুরক্ষিত আছে, এতে কোনো বিকৃতি হয়নি; শুধু তাই নয়, এই কিতাব চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছে—পারলে এর মতো কোনো কিতাব এনে দেখাও। [কিন্তু তোমরা আমাদের সে আহ্বানে সাড়া দাওনি।] দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা তোমাদের বলেছিলাম, অন্তত মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন বন্ধ করো। ইসলামের সিংহ, বীর মুজাহিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন তোমাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে তোমরা মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বের হয়ে যাও। শায়খ উসামা বিন লাদেন কি তোমাদের বলেননি, ততদিন পর্যন্ত তোমরা নিরাপত্তার কল্পনাও করতে পারবে না, যতদিন না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা লাভ করব এবং যতদিন না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমি থেকে সকল কাফের সেনাবাহিনী বের হয়ে যাবে? [কিন্তু সে আহবানেও তোমরা সাড়া দাওনি।] উলটো তোমরা আমাদের মাটিতেই আমাদের রক্ত ঝরিয়েছ। তাই আমরাও তোমাদের মাটিতে আমাদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি। আমাদের বার্তা খুবই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন—তোমরা যদি আমাদের ভূমি ছেড়ে না যাও, আমাদের তেল ও সম্পদ লুট করা বন্ধ না করো আর এই দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠীকে মদদ দেওয়া বাদ না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেব না।'[৮৫]

[৮৪] শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

[৮৫] প্রাগুক্ত

আল-কায়েদার অফিসিয়াল মুখপাত্র শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ. তাঁর 'তাহতা যিলালির রিমাহ' শিরোনামের এক প্রবন্ধে 'আমরা কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন—

'যে-সব কারণে আমাদের এই সংগঠন অস্তিত্ব লাভ করেছে, যে কারণগুলোকে সামনে রেখে আমরা এই আন্দোলন পরিচালনা করছি এবং আমাদের কর্মপন্থা ও আচরণবিধি নির্ধারণ করছি, এগুলো নিছক তাত্ত্বিক কোনো বিষয় নয়; বরং যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে এগুলো প্রমাণিত সত্য। বিভিন্ন ঘটনা ও সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ থেকে এই কারণগুলোর সমর্থন পাওয়া যায়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও এগুলোর পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফলে দীন ও উম্মতের নুসরতের জন্য আমরা যা করছি, পরিপূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও ইয়াকীন নিয়েই করছি। এই লেখায় সংক্ষেপে সে কারণগুলো তুলে ধরব। তবে কোনো ঘটনার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং এটা প্রমাণ করার জন্য যে, আমরা এখনো আমাদের নীতিতে অটল আছি, ইহুদী ও মার্কিনিদের ওপর এখনো আক্রমণ অব্যাহত রেখেছি, তাদের জনগণ অথবা স্থাপনা—সবকিছুকেই আমরা লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছি। মার্কিনিদের জন্য যা অপেক্ষা করছে, তা বিগত সময়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম হবে না, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমেরিকা যেন অপেক্ষা করে আর সর্বশক্তি নিয়ে প্রস্তুত থাকে। আমরা এমন দিক থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, তারা যা কল্পনাও করেনি। "আমরা শুধু অপেক্ষায় আছি, কখন আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন অথবা আমাদের হাতেই তোমাদের শাস্তি দেবেন। তাই তোমরাও অপেক্ষায় থাকো, আমরাও তোমাদের শাস্তির প্রহর গুনছি।"

আমেরিকাকে প্রধান শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে অসংখ্য বাস্তবসম্মত কারণ আছে। সব এখানে বলা সম্ভব না। প্রধান কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করছি আর বাকিগুলো পাঠকদের চিন্তা ও গবেষণার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

১. আমেরিকা হলো সমকালীন বিশ্বের কুফরের মাথা। যে গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা দীনকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক্করণের কথা বলে, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করে মানুষকে মানুষের দাস বানায়, আল্লাহর হারাম করা বিষয়গুলোকে হালাল বানায়, আমেরিকা সেই বিশ্বব্যবস্থার মোড়ল। এভাবে সে পৃথিবীর অপরাপর দেশকে মানবরচিত এই আইনকানুন মানতে বাধ্য করে আর যারাই এই আইনের বিরোধিতা করে, তাদেরকে বিদ্রোহী ও বিশ্বব্যবস্থার জন্য হুমকি আখ্যা দিয়ে শাস্তি দেওয়ার বৈধতা উৎপাদন করে, অবরোধ আরোপ করে কোণঠাসা করে রাখে। এই পুরো প্রক্রিয়া দ্বারা আমেরিকার

উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াতে গাইরুল্লাহর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আল্লাহ কিছুতেই এটা হতে দেবেন না, দুনিয়াতে কেবল আল্লাহর আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

২. ইহুদীদের সাথে আমেরিকার জোট। এই জোটই হলো সকল নোংরামি ও অধঃপতনের মূল। চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন, বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা সবকিছুর জন্যই এই ইসরাইল-আমেরিকান জোট দায়ী। সস্তা মিডিয়া আর নিম্নমানের শিক্ষা কারিকুলামের মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে অশ্লীলতা ও নোংরামি প্রচার করে বেড়ায়।

৩. মুসলমানদের ওপর যত জুলুম, নির্যাতন আর অত্যাচার হচ্ছে, এগুলোর জন্যও আমেরিকাই দায়ী। মুসলিমদের ওপর অতীতে যত বিপর্যয় এসেছে আর সামনেও যা আসবে, সবকিছুর পেছনে আমেরিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ রয়েছে। আমেরিকার হাতে মুসলিমদের এই পরিমাণ রক্ত লেগে আছে, যা তারা চাইলেও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

ফিলিস্তিনে ৫০ বছর যাবৎ ইহুদীরা মুসলিমদের ওপর ন্যাক্কারজনক নির্যাতন চালাচ্ছে আর এই নির্যাতনে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে, নিয়মিত সহযোগিতা করছে, আন্তর্জাতিক মহলে ইসরাইলের এই নৃশংসতার বৈধতা তৈরি করছে। আমেরিকার মদদে ইসরাইল একের পর এক জুলুম ও অত্যাচারের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তৈরি করে যাচ্ছে। (সর্বশেষ জেনিনের গণহত্যা এবং তার আগের ও পরের ঘটনাপ্রবাহ ইসরাইলি নৃশংসতার ঐতিহাসিক দলীল হয়ে থাকবে।) ইহুদীরা প্রায় ৫০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে বাস্তুচ্যুত করেছে, প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, আহত হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার ফিলিস্তিনি আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি।

ইরাকে আমেরিকার অবরোধ ও বোম্বিংয়ের ফলে ১২ লক্ষেরও বেশি মুসলিম নিহত হয়েছে। বিগত ১০ বছরে আমেরিকার অবরোধের কারণে শুধু শিশুই নিহত হয়েছে এক মিলিয়নেরও বেশি, অর্থাৎ গড়ে প্রতি মাসে নিহত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮৩ হাজার ৩৩৩ জন আর দৈনিক ২ হাজার ৭৭৭ জন। আল-আমেরিয়া ক্যাম্পে শুধু একদিনেই ৫ হাজার ইরাকি মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। এগুলো কি কোনো সামরিক স্থাপনা ছিল?

সোমালিয়ায় আমেরিকা ১৩ হাজারেরও বেশি অধিবাসীকে হত্যা করেছে। নারী ও শিশুদের ওপর বর্বরতম অত্যাচার চালিয়েছে।

সারা দুনিয়ায় যেখানেই খ্রিষ্টান বা বিধর্মীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছে, আমেরিকা তাদের সমর্থন দিয়েছে। সুদান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মীর,

মেসিডোনিয়া, বসনিয়া-সহ সব জায়গাতে আমেরিকার মদদে স্থানীয় খ্রিষ্টান ও বিধর্মীরা মুসলিমদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছে।

শুধু আমেরিকার বানানো আইনের বিরোধিতা করার কারণে মুসলিম দেশগুলোর ওপর আমেরিকা যে অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তার তো কোনো হিসেবই নেই। আমেরিকার এই জুলুমের কারণে মুসলিমদের বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

শিকারকে যখন বেঁধে জবাই করার জন্য নেওয়া হচ্ছে, তখন গা ঝাড়া দেওয়ার অধিকারটুকুও কি তার নেই? জবাই করার সময় পা ছোঁড়ার অধিকারও কি কেড়ে নেওয়া হয়েছে? জবাইকারী গায়ে রক্তের ছিটা দেওয়াও কি অপরাধ?

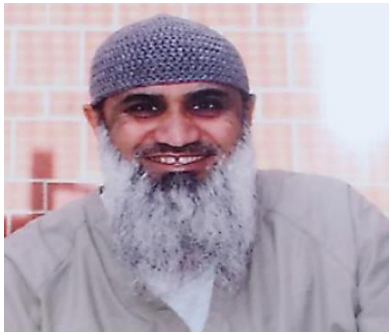
মুসলিমরা এত জুলুম সহ্য করার পর যখন তারা কাফেরদের থেকে সামান্য প্রতিশোধ নেয়, তখন অনেক মুসলিমকেই কুমিরের কান্না করতে দেখা যায়। কাফেরদের দেশে হওয়া এ সব 'সন্ত্রাসী হামলার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই' বলে নির্বোধের মতো তারা ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়ে বেড়ায়, কাফেরদের কাছে মুসলিমদের জন্য সহানুভূতি ও দয়া ভিক্ষা চায় আর মুজাহিদদের কাছে কখনো লোক পাঠিয়ে, কখনো চিঠি মারফত যুগের হুবালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার অনুরোধ জানায়। তারা কি মনে করে, আমরা তাদের কথা মানব?

আল্লাহর কসম, মার্কিনিদের সব চুক্তি আমরা বাতিল করেছি, তারাও আমাদের সাথে কোনো চুক্তি রক্ষা করেনি। আমাদের ওপর এত জুলুমের পরেও যদি তারা বেঁচে থাকে, তবে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এত কিছুর পরেও যদি তাদের সাথে আমাদের দহরম মহরম থাকে, তবে আমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আমরা যদি ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান ও পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাইদের প্রতিশোধ না নিতে পারি, তবে আমাদের আর কোনো ইজ্জত-সম্মানই বাকি থাকবে না। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, কারণ তিনি আমেরিকাকেই এই জোটের মাথা বানিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ভালো থেকে খারাপকে আলাদা করতে চান। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন—

**مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ**

'তোমরা যে অবস্থায় আছ, মুমিনদেরকে আল্লাহ এ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। ভালো থেকে মন্দকে তিনি আলাদা করেই ছাড়বেন।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৭৯]

আমরা আবারও আল্লাহর প্রশংসা করছি। কারণ, তারা নিজেরাই এই যুদ্ধকে ক্রুসেড বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে। ফলে দুই দলের পতাকা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই যুদ্ধে এখন মাত্র দুটি শিবির—ঈমানের শিবির ও কুফরের শিবির। আমরা আরও একবার আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে চাই। কারণ, তিনিই কুফরি বিশ্ব ও তাদের সহযোগী মুরতাদদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। ফলে মুসলিমদের সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়েছে এবং তারাও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে।'[৮৬]



শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ.

## বিজয়ের পথ কোনটি?

আল-কায়েদার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ঘুমন্ত এই জাতিকে জাগিয়ে তোলার বিকল্প ছিল না। জিহাদ-কিতালের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে উম্মতকে এই গুরুতর সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে দখলদারমুক্ত করা এবং দীন কায়েম করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া সম্ভব না।

১৪২৪ হিজরীর ১২ই যিলকদ মোতাবেক ২০০৪ সালের ৪ই জানুয়ারি শায়খ উসামা রহ. মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বার্তায় বলেছিলেন—

'ভিনদেশি আগ্রাসি শত্রুকে কীভাবে প্রতিরোধ করতে হবে—এটা জানতে হলে অতীতের ক্রুসেডগুলোর ইতিহাস দেখতে হবে। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই এই হামলা মোকাবিলা করতে হবে। সে হামলাগুলো কেন হয়েছিল আর কীভাবে তা প্রতিরোধ করা হয়েছিল—তা ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। আমাদের ভূখণ্ডে পশ্চিমাদের আগ্রাসনের ইতিহাস বেশ পুরোনো। তাদের সাথে আমাদের লড়াই কয়েক শতাব্দী ধরেই চলে আসছে এবং সামনেও তা অব্যাহত থাকবে। কারণ, হক-বাতিলের লড়াই কিয়ামত পর্যন্তই চলবে

[৮৬] তাহতা যিলালির রিমাহ : শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস

আর এই লড়াইয়ের মধ্যেই দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

'যদি আল্লাহ তাআলা মানুষের একদলকে অন্যদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।' [সূরা বাকারা (২) : ২৫১]

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মুমিনরা যদি জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে কাফেরদের দমিয়ে না রাখত, তবে পৃথিবীর ওপর কাফেররা আধিপত্য বিস্তার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। সুতরাং এই সংঘর্ষের নীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, দখলদারদের সাথে অস্ত্র ছাড়া কোনো সংলাপ হবে না।

পশ্চিমের সাথে আমাদের স্বাভাবিক যে লড়াই, তার ইতিহাসও আড়াই হাজার বছরের পুরোনো। তখন তাদের না ছিল কোনো ধর্ম আর না ছিল উন্নত আখলাক, শুধুই লুটতরাজের উদ্দেশ্যে তারা আমাদের ভূমি দখল করেছিল। সেই তখন থেকে শামের বিস্তীর্ণ অংশে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিমাদের অধীনতা মেনে বসবাস করেছেন। হাজার বছরের গোলামির এই শৃঙ্খল আমরা ভাঙতে পেরেছি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর। ইসলাম এসে আরবকে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলেছে, জাহিলিয়াত থেকে মুক্তি দিয়েছে, আরবদের হৃদয় ও মননকে আলোকিত করেছে, তাদের শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে, তখন তারা এতটা শক্তিশালী হয়েছে যে, ঈমানের এই কাফেলার সামনে আরব কিংবা আজম—দুনিয়ার কোনো শক্তিই আর দাঁড়াতে পারেনি। তাঁদের আল্লাহু আকবার ধ্বনির সামনে পারস্য, তাতার, তুর্কি, রোম, বার্বার—সব শক্তিই লুটিয়ে পড়েছে। বিশ্বের নেতৃত্ব তখন আমাদের হাতে ছিল। তখন আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাস বানানোর মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছি।

এরপর একসময় দীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ল, আমাদের শাসকরাও দিকভ্রান্ত হয়ে গেল আর আমরাও দুনিয়ার মুহাব্বতে লড়াই করা ছেড়ে দিলাম। এই সুযোগে রোমের খ্রিষ্টানরা আমাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করল, মসজিদে আকসা ছিনিয়ে নিল। কিন্তু তার ৯০ বছর পরেই আমরা পুনরায় দীনের পথে ফিরে আসলাম, সেই সাথে আমাদের শক্তিও ফিরে আসল। এক বিজ্ঞ সেনাপতির নেতৃত্বে সহীহ মানহাজ অনুসরণ করে মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধার করলাম। সেই সেনাপতি ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. আর সহীহ মানহাজটি হলো ইসলামের চূড়া জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। বর্তমানেও আমাদের এই মানহাজ-ই অনুসরণ করতে হবে।

বিগত শতাব্দীতেও দখলদার ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে অধিকাংশ মুসলিম ভূখণ্ডই যুদ্ধ-জিহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই পদ্ধতিকেই এখন পশ্চিমারা বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, যারাই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলে, তাদেরকে সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে 'সন্ত্রাস দমন'-এর নামে হত্যা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে আর মুসলিমদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকরা উদার মনে তাদের সহযোগিতা করে। কারণ, তারা সবাই জানে, তাদের সব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য এই জিহাদ-ই হলো একমাত্র কার্যকর শক্তি।

এটাই হলো আসল পথ, সুতরাং এই পথ অনুসরণ করুন। কারণ, ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কোনো পথে যদি আমরা তাদের দমন করতে চাই, তাহলে অন্তহীন এক গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাব, আমাদের অবস্থাও হবে গাসসানিদের মতো। এক গাসসানি নেতার শখ হয়েছিল, সে রোমানদের পাহারাদার হবে। গাসসানি বাদশাহ হওয়ার মাধ্যমে সে রোমানদের পাহারাদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছিল। বাদশাহ নামের এই রোমান পাহারাদার নিজের আরব ভাইদের খুন করে রোমানদের স্বার্থরক্ষা করত। বর্তমান আরবের শাসকদের অবস্থাও একই, তারা মূলত নব্য গাসসানি।

সুতরাং হে মুসলিমরা,
ফিলিস্তিন ও ইরাকে তারা যে অপরাধ করেছে, আপনারা যদি এ কারণে তাদের শাস্তি না দেন, তাহলে আপনাদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে তারা আপনাদের ওপর আবারও হামলে পড়বে। তখন হারামাইনকেও ছিনিয়ে নেবে। আজ বাগদাদ ধ্বংস করেছে, আগামীতে রিয়াদ ধ্বংস করবে। এভাবে আপনাদের ভূমিগুলো একের পর এক হাতছাড়া হতে থাকবে। হাসবুন্নাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।'

এই বার্তায় শায়খ উসামা রহ. আরও বলেছিলেন—

'যে দাঈ ভাইয়েরা উম্মতের ইসলাহের কথা বলছেন, আপনারা জেনে রাখুন, উম্মতের ইসলাহ করা এবং তাওহীদের পতাকাতলে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শুধু তাত্ত্বিক ভাষণ ও বই-পুস্তক রচনাই যথেষ্ট না। এর জন্য এমন একটি কার্যকরী প্রকল্প হাতে নিতে হবে, যাতে মুসলিম জাতির প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করবে; এর সূচনা হবে আল্লাহর দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটির মাধ্যমে আর শেষ হবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে।'

মুসলিম বিশ্ব ও ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি তাহরীদী চিঠিতে শায়খ উসামা রহ. বলেন—

'আল্লাহ তাআলা যাকে দীনের সাহায্য করার তাওফীক দান করেন, সে-ই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। আর যারা জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পরেও তরবারির ছায়ায় না এসে পেছনে বসে থাকে, তারা বড় ধরনের কবীরা গুনাহে লিপ্ত। আপনাদের বলছি, অতীতে যারা জিহাদের ময়দান থেকে দূরে থেকেছেন, কিন্তু সত্যবাদী ছিলেন, তাদের থেকে শিক্ষা নিন। নিজেদের গুনাহের কারণে তাঁরা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছিলেন, অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

তাবুক যুদ্ধে কাব বিন মালেক রাযি.-এর ঘটনায় আপনাদের জন্য শিক্ষা আছে। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমরা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন, তখন আমিও প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সকালে তাঁদের দেখতে যেতাম। কিন্তু প্রস্তুতি না নিয়েই ঘরে ফিরে আসতাম আর মনে মনে বলতাম, আমি চাইলে তো যে-কোনো সময়ই বের হতে পারব, তাই তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এভাবে দিন গড়াতে লাগল। মুসলিমরা নবীজীর সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে গেল, কিন্তু আমার প্রস্তুতিই আর নেওয়া হলো না। আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। ততদিনে বাহিনী অনেক দূরে চলে গিয়েছে আর তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তারপরেও একবার ভাবলাম, যত দূরেই থাকুক, এখন বের হয়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হই। কিন্তু তখনও বের হওয়া হলো না। হায়! কমপক্ষে তখনও যদি বের হতাম।"

আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষ আজও এই পথে মেহনত করে যাচ্ছে। সত্যবাদীরা জিহাদের ময়দানে ছুটে যাচ্ছে। হে আল্লাহর বান্দা, আপনিও সুযোগকে কাজে লাগান। দেরি না করে এখনই রওনা করুন, কাফেলা এখনো খুব দূরে যায়নি। এমন যেন না হয় যে, যাব যাব করে শেষে আর যাওয়াই হলো না আর আফসোস করে বলতে থাকলেন, হায় যদি তখনই বের হয়ে যেতাম। তাই, জলদি করুন। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا**

'অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে দেবে।' [সহীহ মুসলিম : ১১৮]

আপনারা জানেন, জিহাদ ফরয, তবু কোন জিনিস আপনাদেরকে সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছে? মানুষের রিযিক নির্ধারিত, আয়ু সীমিত আর যে মৃত্যু থেকে আপনারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, নির্ধারিত সময়ে তার সাথে সাক্ষাৎ হবেই, যদিও আপনারা সুরক্ষিত কোনো দূর্গে আশ্রয় নেন—এই কথাগুলো তো আপনারা বিশ্বাস করেন, তাহলে কোন জিনিস আপনাদেরকে জিহাদ না করে বসে থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে?

হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল? নিজ মালিকের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে, সম্পদ ব্যয় করতে কীসের কৃপণতা? যে গোলাম মনিবের দেওয়া সম্পদে খিয়ানত করেছে, যার বিশ্বাসে চিড় ধরেছে, ইয়াকীন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, সে ছাড়া আর কেউ কি মনিবের দেওয়া সম্পদ মনিবের জন্য ব্যয় করতে কৃপণতা করবে? আল্লাহ তাআলার এই কথাটি নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন—

**اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ قِيۡلَ لَهُمۡ كُفُّوۡۤا اَيۡدِيَكُمۡ وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقِتَالُ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً ۚ وَقَالُوۡا رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا الۡقِتَالَ لَوۡلَاۤ اَخَّرۡتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيۡبٍ قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡيَا قَلِيۡلٌ وَالۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا**

‘আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘হাত গুটিয়ে রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো’, পরে যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হলো, তখন তাদের মধ্য থেকেই একটি দল মানুষকে আল্লাহর মতো, বরং আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় পেতে লাগল। বলতে লাগল ‘হে আমাদের রব, আমাদের ওপর জিহাদ ফরয করলেন কেন? আর কিছুদিনের জন্য আমাদের সুযোগ দিলেন না কেন? আপনি বলুন, দুনিয়ার ভোগবিলাস খুবই অল্প সময়ের জন্য। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁদের জন্য পরকাল আরও বেশি উপভোগ্য হবে, সেখানে তোমাদের ওপর সামান্য জুলুমও করা হবে না।’ [সূরা নিসা (৪) : ৭৭]

যারা পরকালকে ভয় করে, তাদের জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট। কোনো মানুষ শয়তান বা জিন শয়তান যদি আপনাকে জিহাদের ব্যাপারে ধোঁকা দেয় আর বলে—জিহাদে বের হলে তুমি মারা যাবে, তোমার সম্পদ ওয়ারিশরা ভাগবাটোয়ারা করে নেবে, অন্য কারো সাথে তোমার স্ত্রীর বিয়ে হবে, তোমার সন্তানরা এতীম হয়ে যাবে, তাহলে সে যেন এই আয়াত তিলাওয়াত করে—

**قُلۡ مَتَاعُ الدُّنۡيَا قَلِيۡلٌ وَالۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا**

‘আপনি বলুন, দুনিয়ার ভোগবিলাস খুবই অল্প সময়ের জন্য। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁদের জন্য পরকাল আরও বেশি উপভোগ্য হবে, সেখানে তোমাদের ওপর সামান্য জুলুমও করা হবে না।’ [সূরা নিসা (৪) : ৭৭]

হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিন। তাঁরা তো আপনাদের আসল জীবনের দিকে ডাকছেন। যারা জিহাদ ছেড়ে বসে থাকে, অন্যদের জিহাদে যেতে বাধা দেয়, অপপ্রচার চালায় আর অন্যদেরও নিজেদের দলে যোগ দিতে বলে, তাদের থেকে সাবধান থাকুন।

তাদের থেকেও সতর্ক থাকুন, যারা হক কথা বলতে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু কথার শেষে কিছু বাতিল কথাও বলে দেয়, তাগুতের প্রশংসা না করে কথা শেষ করতে পারে না। কারণ, এ সকল ব্যক্তিরা সুস্পষ্ট বিচ্যুতির শিকার। তারা যেন নিজেদের ব্যাপারে এবং উম্মাহর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেন, এ সব ভ্রান্ত কথাবার্তা থেকে ফিরে আসেন। এমন লোকদের ব্যাপারেও আপনারা সতর্ক থাকুন, যাদের উদ্দেশ্যই মানুষকে বিভ্রান্ত করা। তারা মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশিয়ে মানুষের মধ্যে কথা ছড়িয়ে দেয়। কারণ, তাদের মিথ্যা কথা মানুষ গ্রহণ করবে না।

ফিলিস্তিন ও ইরাকের মুসলিমদের ওপর বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন—এ কথা দিনের আলোর মতো সত্য। তাঁরা যদি অপারগ হয়, দায়িত্বে অবহেলা করে বা উদাসীনতা দেখায়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের ওপর জিহাদ করা ফরয। এভাবে ক্রমান্বয়ে পরিধি বাড়তে বাড়তে সারা দুনিয়ার মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিমদের সব দেশ একটি দেশের হুকুমে।

এটাই সে সব হক্কানী আলেমদের ফতওয়া, যারা রিয়াদ বা আম্মানের পুতুল শাসকদের পরোয়া করেন না। ফিলিস্তিন ও ইরাকের মুসলিমরা যেহেতু এখন অক্ষম, তাই সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্ডান, তুরস্ক, ইরান ও কুয়েতের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলিমদের ওপর জিহাদ এখন ফরযে আইন। তারাও যদি এই ফরয আদায়ের ব্যাপারে গাফিলতি করে অথবা অক্ষম হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর জিহাদ ফরয হবে। কারণ, ফিলিস্তিন ও ইরাকে জিহাদ করা অবশ্যকর্তব্য, জিহাদ পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই।

আপনারা তাদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন, যারা দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারা নিজেদের যুক্তিতর্ক দিয়ে আল্লাহর রুবুবিয়ত ও নবীজীর নবুওয়তের ব্যাপারেও আপত্তি তোলে। তারা দাবি করে, দাওয়াতের স্বার্থেই তারা এমনটা করে। কিন্তু সাবধান, এ সব ধ্বংসাত্মক যুক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ**

‘(হে মুমিনগণ) তোমরা একে অন্যকে যেভাবে ডাকাডাকি করো, রাসূলকে সেভাবে ডাকবে না। আল্লাহ জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে পালিয়ে যায়। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত, না-জানি তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোনো শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করে।’ [সূরা নুর (২৪) : ৬৩]

হে আল্লাহর বান্দারা,

পথ একদম পরিষ্কার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট আদর্শের ওপর রেখে গিয়েছেন, যেখানে রাত আর দিন সমান। এ পথ থেকে যারাই বিচ্যুত হবে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আপনারা কুরআন পড়ুন, হাদীস পড়ুন, তাহলেই সঠিক পথ খুঁজে পাবেন। কোনো মানুষের কথা-ই শতভাগ গ্রহণযোগ্য হয় না, ব্যতিক্রম শুধু আমাদের নবী, তাঁর প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য। কারো কথা যদি আল্লাহ ও রাসূলের কথার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তাদের কথা ছুঁড়ে ফেলুন; তারা যতই মহান ব্যক্তি হোক, যত জ্ঞানের অধিকারীই হোক অথবা যতবড় ফকীহ হোক না কেন। তবে, তাঁরা যদি মুখলিস ও সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে একে তাঁদের ভুল হিসেবে ধরে নিতে হবে, এ কারণে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা একটুও কমবে না, কিন্তু তাঁদের এ সব ভুলের অনুসরণ করা যাবে না।

ফরযে আইন জিহাদ থেকে দূরে থাকা মুনাফিকদের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদের এই কাজকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা আমাদের সতর্ক করেছেন, যেন আমরা তাদের মতো জিহাদ ছেড়ে বসে না থাকি। সাথে সাথে তাদেরকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করার এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। তাদের অন্তর মোহরবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা যতই ইলম শিখুক, বাস্তবে তাদের কোনো ইলমও নেই, ফিকহও নেই। কারণ আসল ইলম তো আল্লাহর ভয়। আপনারা চাইলে সূরা তাওবা পড়ে দেখুন। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো গভীরভাবে পড়ুন, এ আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে দুটি পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—একটি হলো ইমামুল মুজাহিদীন, খাতামুন নাবিয়্যিনের পথ, আরেকটি হলো জিহাদ ত্যাগকারীদের পথ, এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। এখন আপনি ঠিক করুন কোন পথে চলবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

‘আর যখন কোনো সূরা নাযিল করে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, তখন তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যারা সামর্থ্যবান, তারাও আপনার কাছে অনুমতি চেয়ে বলে—যারা বসে আছে, তাদের সাথে আমাদেরও বসে থাকার সুযোগ দিন। তারা ঘরে থাকা নারীদের সাথে বসে থাকতেই পছন্দ করে। তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা কোনো কিছু সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তাঁরা নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তাঁদের জন্যই রয়েছে কল্যাণ আর তাঁরাই সফল।’ [সূরা তাওবা (৯) : ৮৬–৮৮]

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা,

সৃষ্টিকুলের সর্দার, যিনি মনগড়া কোনো কথা বলেন না, যার জীবনের আগে-পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, যাকে শাফাআতে কুবরার অধিকার দেওয়া হয়েছে, এত এত সম্মান সত্ত্বেও তিনি তাঁর ঈমানদার সাথিদের নিয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর নুসরতের জন্য জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তীব্র গরমের মধ্যেও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাবুকের জিহাদে বের হয়েছেন। আর আপনি নারীদের সাথে ঘরে বসে থাকছেন, আবার নিজেকে নবীর অনুসারী বলে দাবি করছেন! কাপুরুষরা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক তাদের কাপুরুষতা। কবি বলেন—

**يري الجبناء أن العجز حزم ... وتلك خديعة الطبع اللئيم**

কাপুরুষদের ধারণা, অক্ষমতাই হলো বিচক্ষণতা। অথচ তারা জানে না, এটা তাদের নীচ স্বভাবেরই ধোঁকা।

হাদীসে এসেছে,

**الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت**

‘যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী।’ [মুসতাদরাকে হাকেম : ১৯৮][৮৭]

[৮৭] শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

শায়খ উসামা রহ. তাঁর তাহরীদী বার্তাগুলোতে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সহজ কাজ হিসেবে উপস্থাপন করতেন এবং মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন, দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে আল্লাহর সাহায্যে আমেরিকার বিরুদ্ধেও বিজয় অর্জন করা সম্ভব। শায়খের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আল-জাযীরার প্রতিনিধি তাইসীর আল্লুনী শায়খকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

'শায়খ, আল-কায়েদা বর্তমানে এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা সামরিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বস্তুগত সক্ষমতার দিক দিয়ে আল-কায়েদা অবশ্যই আমেরিকার ধারেকাছেও নেই। তাহলে কোন যুক্তিতে আল-কায়েদার মতো একটি সংগঠন সামরিকভাবে আমেরিকাকে পরাজিত করতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?

তার প্রশ্নের জবাবে শায়খ উসামা রহ. বলেছিলেন—

'আলহামদুলিল্লাহ, এর উত্তরে আমি বলব—এখন যে যুদ্ধটি হচ্ছে, তা আল-কায়েদা ও বৈশ্বিক ক্রুসেডার শক্তির মধ্যে হচ্ছে না; বরং এই যুদ্ধটি হচ্ছে বৈশ্বিক ক্রুসেডার শক্তি ও মুসলিমদের মধ্যে। আল্লাহর রহমতে আমাদের এই তানজীম আফগান মুজাহিদদের সাথে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। তখনও মানুষ শুধু এমন কথাই না, এরচেয়েও কঠিন কঠিন কথা বলত—তোমরা কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার স্বপ্ন দেখ? ইত্যাদি। বাস্তবেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন সুপার পাওয়ার ছিল, গোটা বিশ্বই তাকে ভয় পেত, এমনকি ন্যাটো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে তটস্থ থাকত। তখন আমাদেরকে যে শক্তির ভয় দেখানো হয়েছিল, তারা এখন কোথায়? আল্লাহর রহমতে একসময়ের সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই এখন নেই, তা ভেঙে ছোট ছোট কিছু দেশের জন্ম হয়েছে আর তার জায়গায় রাশিয়া রয়ে গেছে। যে আল্লাহ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেছেন আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছেন, তিনি আমাদেরকে এখনও সাহায্য করতে সক্ষম। আল্লাহর সাহায্যেই সেই একই ভূমিতে, একই জাতিকে সাথে নিয়ে আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং পরাজিত করব ইনশাআল্লাহ। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর সাহায্য থাকলে আমেরিকাকে পরাজিত করা শুধু সম্ভবই না, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার চেয়েও সহজ।'

তাইসীর আল্লুনী—

'বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমেরিকাকে পরাজিত করা কেন আরও বেশি সহজ?'

শায়খ উসামা বিন লাদেন—

> ‘আমাদের যে ভাইদের আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বঅভিজ্ঞতা আছে—যেমন: সোমালিয়ার ভাইয়েরা—তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, বাস্তবে আমেরিকার উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা মূলত নিজেদের শক্তিমত্তার ব্যাপারে একধরনের কাল্পনিক ভয়ের আবহ তৈরি করে রেখেছে। তা দেখেই মানুষ ভয় পায় এবং তাদের সাথে কেউ যুদ্ধের সাহস করে না। সোমালিয়াতে যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছে, তখন আফগানিস্তান থেকে আমাদের আল-কায়েদার কিছু ভাইও সোমালি ভাইদের সাথে মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের বিজয়ও দিয়েছিলেন। সোমালি মুজাহিদদের প্রতিরোধের মুখে কল্পনার চেয়েও দ্রুতগতিতে আমেরিকা হার মেনে নিয়েছিল। ব্যর্থতা আর পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে লেজ গুটিয়ে সোমালিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্ব মিডিয়া তখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নিয়ে মাতামাতি করছিল আর এ দিকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মাথা আমেরিকা সোমালিয়া থেকে মার খেয়ে পালাচ্ছিল। সে হয়তো নিজের অতিকায় ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। তার সেই লজ্জাজনক পরাজয়ই প্রমাণ করে মার্কিন বাহিনীর শক্তিমত্তার নামে মিডিয়ার মাধ্যমে সব আজগুবি গালগল্প ছড়ানো হয়েছে। আমরা ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ১০টি বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছি। তারপর আফগানিস্তানে থাকা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করেছি। এত দীর্ঘ জিহাদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা নতুন এক যুদ্ধে জড়িয়েছি। দু’সপ্তাহ ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। আগের যুদ্ধগুলোর সাথে যদিও এই যুদ্ধের অনেক ফারাক রয়েছে, আগের শত্রুর সাথেও এখনকার শত্রুর অনেক তফাত আছে, তবু আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আশাবাদী, তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন আর আমেরিকাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে তার সব দম্ভ-অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা সবই করতে পারেন।’[৮৮]

আল-জাযীরার প্রতিনিধি জামাল ইসমাইলের একটি প্রশ্নের জবাবে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীও একই কথা বলেছিলেন—

> ‘আমেরিকাকে পরাজিত করা কঠিন কোনো বিষয় না। আমেরিকা তো ভিয়েতনামেও পরাজিত হয়েছে, লেবানন ও সোমালিয়া থেকেও লাঞ্ছিত হয়ে বের হয়েছে। তাই, আমরা যদি ইখলাসের সাথে আমেরিকার মোকাবিলা করি, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আমেরিকাও পরাজিত হবে।’

---

৮৮ শায়খ উসামা রহ.-এর চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

এক বার্তায় শায়খ উসামা রহ. বলেছিলেন—

'আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বরং তা হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। চূড়া ছাড়া দীনের [প্রভাব-প্রতিপত্তি] কীভাবে টিকে থাকতে পারে? তা ছাড়া এই উম্মতের বেঁচে থাকার জন্য, ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার জন্য এবং তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই। আমাদের শত্রুরা তাদের সন্তানদের শেখায়—বাঁচতে হলে, লড়তে হবে। তারা মিথ্যাবাদী হলেও এ কথাটি সত্যই বলে। তারা তাদের সন্তানদের এটাই শেখায় আর আমাদের সামনে সম্পূর্ণ উলটো চিত্র প্রকাশ করে।'[৮৯]

## যে পথের বিকল্প নেই

দীর্ঘ এই আলোচনার পর প্রাসঙ্গিকতার বিচারে এখানে শায়খ সুলাইমান আবুল গাইস ফা.আ.-এর একটি চিঠি উল্লেখ করা উচিত বলে মনে হচ্ছে। যুবকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে 'নিদাউন আজিলুন ইলা শাবাবিল মুসলিমীন'- শিরোনামের সে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

**الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخيروهو على كل شئ قدير. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، نبي المرحمة والملحمة، والمبعوث بالسيف بين يدي الساعة**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ**

'যখন তোমরা ইনা নামক সুদি কারবারে জড়িয়ে পড়বে, গরুর লেজ ধরে বসে থাকবে, চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে যাবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। এই লাঞ্ছনা ততদিন থাকবে, যতদিন তোমরা পূর্ণরূপে নিজেদের দীনের দিকে ফিরে না আসবে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৩৪৬২]

হামদ ও সালাতের পর, তরুণদের বলছি,

চারটি সিফাত আপনাদের অর্জন করতে হবে, এই সিফাতগুলোর মাধ্যমেই আপনাদের আন্দোলন গতিশীল হবে এবং আপনাদের মেহনত ফলপ্রসূ হবে। সিফাতগুলো হলো—ঈমান, ইখলাস, বীরত্ব ও আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

৮৯ ২০০৪ সালের ৪ই জানুয়ারি التحريض والحث على الجهاد শিরোনামে প্রকাশিত উম্মতে মুসলিমার উদ্দেশ্যে লেখা শায়খের চিঠি থেকে সংগৃহীত

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ

'একব্যক্তি শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে বলল, মুসা, সভাসদরা তোমাকে হত্যার চক্রান্ত করছে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।'
[সূরা কাসাস (২৮) : ২০]

যে লোকটি এভাবে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মুসা আ.-কে সতর্ক করেছিল, তার বুকভরা ঈমান ছিল, স্বচ্ছ ইখলাস ছিল, ছিল অসাধারণ বীরত্ব, যার কারণে এত কঠিন কাজটি করার সাহস করেছিল আর ছিল মুসার প্রতি আন্তরিক কল্যাণকামিতা। এই গুণগুলোর কারণেই সে এই কাজটি করতে পেরেছিল। উম্মত যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, এ অবস্থায় আপনাদের ওপরেও সেই একই দায়িত্ব বর্তায়, যে দায়িত্ব সেই লোকটি পালন করেছিল। তাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এখন আপনাদের কর্তব্য। আপনাদের ওপর উম্মতের দিগুণ হক রয়েছে, ভারী আমানত আপনাদের কাঁধে এসে পড়েছে।

যুবক ভাইয়েরা আমার,
বোমাবর্ষণের মুহূর্মুহূ শব্দে আজ আমরা কেঁপে উঠছি, রাতের আঁধার কাটলেই শুনতে পাচ্ছি ভয়ংকর বিভৎস সব অত্যাচারের কথা, উম্মতের দেহ আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এগুলো কিছুই ঘটত না, যদি আমরা জিহাদ ছেড়ে না দিতাম। দুনিয়ার মোহ আর মৃত্যুর ভয় আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, ফলাফল কী হয়েছে? ভয় আমাদের ওপর জেঁকে বসেছে, লাঞ্ছনা আর অপমানে আমাদের মাথা নিচু হয়ে গেছে, পরাজিত মানসিকতা আমাদের পর্বতপ্রমাণ আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে।

লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের ভারে নুয়ে পড়া উম্মতের এই করুণ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আপনাদের ইখলাসের সাথে মেহনত করতে হবে, ত্যাগ ও কুরবানীর শপথ নিয়ে জিহাদের ময়দানে নেমে আসতে হবে, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু আর আগ্রাসি প্লাবনের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে— **كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ** 'আল্লাহর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে!' এ ছাড়া আর কোনো পথেই উম্মতের এই অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব না।

যুবক ভাইয়েরা আমার,
চারিদিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। আপনার জাতি ও সমাজের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। পূর্ব থেকে পশ্চিম সব জায়গায় আমরা অন্যের গোলামি করছি। আমাদের রবের শরীয়ত বাদ দিয়ে মানুষের বানানো শরীয়ত দিয়ে আমাদের শাসন করা হচ্ছে। অন্ধের মতো প্রবৃত্তির পেছনে ছুটছি। আমাদের ভূমি দখল করা হয়েছে, সম্ভ্রম লুট করা হয়েছে,

সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে, আমাদের মাটিতেই আমাদের দীন ও শরীয়ত থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

সারা দুনিয়ায় এমন একজনও কি পাবেন, যে দখলদারদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে পেরেছে? অথবা উপনিবেশবাদের চক্রান্ত আর প্রতারকদের প্রতারণা থেকে রেহাই পেয়েছে? তাহলে আমাদের আর কী বাকি আছে? সামান্য কোনো সম্মানও কি আছে, যা দিয়ে নিজেদের বিবেককে কমপক্ষে ধোঁকায় রাখা যায়? এতটুকু ইজ্জতও কি আছে, যা দিয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়? শত্রুর পক্ষ থেকে কি আর কোনো শান্তির আশা করা যায়? নিজেদের কোনো স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনাও কি আমাদের আছে? তাহলে কেন আমরা ভয় পাচ্ছি? কাকে ভয় পাচ্ছি? কীসের ভয় পাচ্ছি? আর এই ভয় কতদিনই বা থাকবে? জবাই করা বকরির চামড়া ছাড়ালে কি তার কষ্ট হয়? আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'শয়তানই তার দোসরদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদের ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৭৫]

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,
ধ্বংসাত্মক এক যুদ্ধ আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। এ যুদ্ধ শুধু আমাদের জীবন কেড়ে নেবে না বা দেহগুলো ছিন্নভিন্ন করেই ক্ষান্ত থাকবে না, এ যুদ্ধ সাজানোই হয়েছে এমনভাবে, এর মাধ্যমে আমাদের ভূমিগুলো কেড়ে নেওয়া হবে, সম্ভ্রম লুট করা হবে, সম্পদ আত্মসাৎ করা হবে এবং ইহুদী ও ক্রুসেডারদের স্বার্থ অনুযায়ী ইসলামী বিশ্বের চেহারা বদলে দেওয়া হবে। এই যুদ্ধ এতটাই কাছে যে, বড়দের সাথে পরামর্শ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা, আমরা নিজেরাও চিন্তার সুযোগটুকু পাব না। তাহলে আমাদের করণীয় কী?

যুবক ভাইয়েরা আমার,
আমাদের করণীয় একটিমাত্র কাজ। এর কোনো বিকল্প নেই, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথও নেই। তা হলো কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

'সুতরাং আপনি কিতাল করুন আল্লাহর পথে, আপনার দায়দায়িত্ব আপনার নিজের ওপর। আর মুমিনদেরকে অনুপ্রাণিত করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ কুফফার শক্তিকে রুখে দেবেন। আল্লাহ তাআলা প্রবল শক্তিধর, কঠিন শাস্তিদাতা।' [সূরা নিসা (৪) : ৮৪]

আজ আমরা ইহুদী ও ক্রুসেডারদের যৌথ শক্তির মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছি। তাদের কুফরির ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাও সর্বজনবিদিত। তারা মুসলিমদের শেকড় উপড়ে ফেলতে চায়। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন—**كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً** 'তাদের সাথে কীভাবে সন্ধি হতে পারে, তারা যদি কখনো তোমাদের ওপর জয়ী হয়, তাহলে সন্ধি বা রক্তসম্পর্ক—কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করবে না।' পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্যও তারা ঘোষণা করে দিয়েছে, তাদের ইচ্ছাও স্পষ্ট। তারা গর্বভরে এগুলো প্রচার করে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে যারাই বাধা দেবে, তাদের বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ করবে। এই যার অবস্থা, যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এতটা আগ্রাসি, তার বিরুদ্ধে কিতাল করা তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। এমন শত্রুর সাথেও যারা বন্ধুত্ব রাখবে, তাকে সহযোগিতা করবে, শুধু কথার মাধ্যমেই হোক না কেন, সে তো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার মতো কুফরি কাজে লিপ্ত হলো।

তাই, মহান এই কাজে এগিয়ে আসুন। এর মধ্যেই আপনাদের ইজ্জত, সম্মান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিহিত আছে। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

সারা দুনিয়ার মুসলিম ভাইয়েরা, খালেদ, মুসআব ও মুসান্নার সন্তানেরা,
এটাই হলো আল-কায়েদার বার্তা। আমাদের সম্মানিত শায়খগণ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে তা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম দেশগুলো মানবরচিত আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছে, মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলো দখলদারদের কবজায়, তাঁদের সম্পদ কাফেররা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, বিদ্যমান এই বাস্তবতাকে পরিবর্তনের একমাত্র উপায় সেটাই, যা শায়খ উসামা রহ. বলেছেন—**'সরাসরি আমেরিকার শক্তিক্ষয় করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে, যতদিন না আমেরিকা দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বে হস্তক্ষেপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্যও তার না থাকে।'**

## মোকাবিলার সঠিক পদ্ধতি

হুসাম উমাবী তাঁর 'القاعدة التي غيرت تاريخ أمريكا'-নামের একটি লেখায় বলেছেন—

'ওষুধের কার্যকারিতা নির্ভর করে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে পারার ওপর। ডাক্তার যদি রোগীর সুস্থতা চান, তাহলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারবেন না। আগে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর রোগ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। একই

কথা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উম্মত আজ রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উম্মতের সুস্থতার জন্য সঠিকভাবে রোগটি নির্ণয় করতে হবে, তারপর সেই রোগের কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এতে সুস্থতার সম্ভাবনা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। বাস্তবতা হলো, এই উম্মত অসুস্থ হলেও কখনো মারা যাবে না। এই বিষয়টিই উম্মতের সুস্থতা অর্জনে মানসিকভাবে শক্তি জোগায়।

অনেকেই ভাইরাস প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, আবার অনেকে ভাইরাসের উৎপত্তির কারণটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। প্রথম শ্রেণি নিজেদের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করে হয়তো ভাইরাস প্রতিরোধে কিছু সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারবেন, কিন্তু ভাইরাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি মিলবে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণি ভাইরাস উৎপত্তির কারণটিকেই ধ্বংস করার দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণে ভাইরাস থেকেও পুরোপুরি মুক্তি পাবেন, আবার তাঁদের শক্তি ও সময়ও অনেক বেঁচে যাবে। আল-কায়েদাও এই দ্বিতীয় শ্রেণির মতোই চিন্তা করেছে এবং এর আলোকেই তাদের কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে।'

কিতাল ফরয হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই হয়তো শায়খ উসামার সাথে একমত হবেন। কিন্তু কিতালের পদ্ধতি কী হবে? আগে কাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে? আমেরিকার গোলাম স্থানীয় শাসকশ্রেণি, যারা নিকটবর্তী শত্রু এবং মারাত্মক কুফরিতে আক্রান্ত? না-কি সরাসরি আমেরিকা, যে দূরবর্তী শত্রু, কিন্তু যার কুফরি সকলের কাছেই স্পষ্ট? কাকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে? এ ব্যাপারে অনেকের দ্বিধা থাকতে পারে।

ষাটের দশক থেকে নিয়ে ৯/১১-এর আগ পর্যন্ত জিহাদী ধারার বিভিন্ন দল ও সংগঠন সাধারণভাবে প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ আঞ্চলিক জিহাদের নীতি অনুসরণ করেছে। এ ধরনের প্রায় সবগুলো সংগঠনই নিজ নিজ অঞ্চলের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই নিজেদের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু জিহাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার যখন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করে, তখন এ সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন, এই নীতি অনুসরণ করে জিহাদ করা সম্ভব না।

কুয়েত স্বাধীন করার অজুহাতে হারামাইনের মাটিতে মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীর আগমন ছিল যুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক টার্নিং পয়েন্ট। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল-কায়েদার স্ট্র্যাটিজি ও পলিসি নির্ধারণ করে দেন। শায়খ রহ. সিদ্ধান্ত দেন—সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। কারণ, আমেরিকা দূরবর্তী শত্রু হলেও তার কুফরি সকলের কাছে স্পষ্ট।

আগেও আলোচনা হয়েছে, হারামাইনের মাটিতে আমেরিকাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে শায়খ রহ. যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। হারামাইনের পরিস্থিতিকে শায়খ রহ. এভাবে উপস্থাপন করেছিলেন—

১. একশ্রেণির নামধারী আলেম আলে সৌদের শাসনের বৈধতা তৈরি করছে।
২. অন্যদিকে আলে সৌদ হারামাইনের মাটিতে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিকে বৈধতা দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আলে সৌদের মোকাবিলা করার দুটি উপায় রয়েছে—
ক. সরাসরি আলে সৌদের মোকাবিলা করা। সে ক্ষেত্রে এমন আলেমদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে, যারা আলে সৌদের বৈধতা তৈরি করছে। কিন্তু এ কৌশল নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে। কারণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। দীর্ঘ সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনমনে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা ও ভক্তি তৈরি হয়েছে।

খ. তুলনামূলক নিরাপদ উপায় হলো সরাসরি আমেরিকার ওপর আঘাত করা। এতে আলে সৌদ তাদের রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। তখন মুসলিমদের দৃষ্টিতে তারা নিজেরাই নিজেদের বৈধতা হারাবে। একই সাথে যে-সকল নামধারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দরবারি আলেম তাদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করবে, তাদের গ্রহণযোগ্যতাও নিজ থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে মানুষের সামনে এ যুদ্ধের বৈধতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।[90]

শায়খ উসামা রহ. মুজাহিদদের দুষ্প্রাপ্য রত্ন মনে করতেন। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-ও বলতেন, মুজাহিদরা হলো সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংখ্যালঘু। এ জন্যই শায়খ উসামা রহ.-এর ইচ্ছা ছিল, বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রামরত মুজাহিদদের মেহনতকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বজনস্বীকৃত যে-কোনো একটি শত্রুর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা। সর্বজনস্বীকৃত সেই শত্রু হলো সাপের মাথা ও যুগের হুবাল আমেরিকা। শায়খ রহ. খেয়াল করেছিলেন, মুজাহিদরা বিচ্ছিন্নভাবে যে-সব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তারা সবাই মূলত এই আমেরিকার গোলাম। এক সরকারের পতন হলে তার স্থানে আমেরিকা আরও শক্তিধর সরকারের উত্থান ঘটায়। পূর্বের সরকারের চেয়ে নতুন সরকার হয় আরও কর্তৃত্ববাদী। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার পূর্ণ বন্দোবস্ত এরা করে রাখে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ও সামরিক অঙ্গনে, মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা এমন কিছু ব্যক্তিকে নিজেদের হাতে রাখে, যারা সকাল-সন্ধ্যা সরকারের গুণগান গাইতে থাকে। এভাবে তারা অবৈধ সরকারের বৈধতা উৎপাদন করে আর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। মুজাহিদদের সরকারবিরোধী লড়াই যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে,

[90] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ

শক্তিও কমে আসে, হিম্মতে চিড় ধরতে থাকে, একের পর এক আঘাতে মনোবল ভেঙে যেতে থাকে, তখন তারা হাল ছেড়ে দেন। পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লড়াই করে আর কোনো লাভ নেই। এভাবে তারা আত্মসমর্পণ করেন। তারপর শুরু হয় পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসার লজ্জাজনক অধ্যায়। ব্যর্থতা ও পরাজিত মানসিকতার প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে পশ্চাদপসরণের সুরতে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এর অনেক নজির আছে। মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া-সহ আরও অনেক দেশে জিহাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত বড় একটি অংশের সাথে এমনটি ঘটেছে।

এ কারণেই শায়খ উসামা রহ. সাপের মাথা আমেরিকার ওপর—বিশেষত তার নিজ ভূখণ্ডে—আঘাত করাকে প্রধান লক্ষ্য বানানোর বিষয়ে জোর দিয়েছেন। কারণ, আমেরিকা যদি পরাজিত হয়ে মুসলিম দেশগুলো থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমেরিকার মদদপুষ্ট দালাল শাসকদের পরাজিত করা সহজ হয়ে যাবে। আমেরিকা হলো কুফরের মাথা, এই মাথা যদি কেটে ফেলা যায়, দুই বাহু একাই নিস্তেজ হয়ে যাবে। একই কথা সায়্যিদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছিলেন। হুরমুযানকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি যেহেতু পারস্যবাসীর ব্যাপারে বেশি জানো, আমাকে পরামর্শ দাও [কীভাবে তাদের পরাজিত করব?] সে বলেছিল, পারস্যের একটি মাথা ও দুটি বাহু আছে। উমর রাযি. বললেন, মাথা কোনটি? সে বলল, নাহাওয়ান্দ। তারপর সে দুই বাহুর কথাও বলল। পরে সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমার মতে আপনি যদি দুই বাহু কেটে ফেলেন, তাহলে মাথা এমনিতেই দুর্বল হয়ে যাবে। তখন উমর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর শত্রু, তুমি মিথ্যে বলেছ; বরং আমি তো সবার আগে মাথা কাটব। মাথা কাটলে বাহুদুটি একাই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

আল-কায়েদার নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য শায়খ উসামা রহ. মাঝে মধ্যে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন। তিনি বলতেন, উম্মতের শত্রুরা হলো একটি বিষবৃক্ষের মতো, যার শেকড় হলো আমেরিকা। ধরুন, এই শেকড়টি ৫০ সেন্টিমিটার পুরু, এর ডালপালা অনেক এবং এগুলোর আকৃতিও বিভিন্ন ধরনের। ন্যাটো জোটভুক্ত দেশসমূহ এবং আঞ্চলিক গোলাম সরকারগুলোও এই ডালপালারই অংশ। আমরা এই গাছটিকে কেটে ফেলতে চাচ্ছি, কিন্তু আমাদের শক্তি সীমিত। এমতাবস্থায় গাছ কাটার সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো, গাছের শেকড় অর্থাৎ আমেরিকার ওপর করাত চালানো। করাত চালাতে চালাতে আমরা যদি শেকড়ের ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কেটে ফেলি আর তখন গাছের একটি শাখা ধরুন ব্রিটেনের ওপর করাত চালানোর সুযোগ আসে, তবু আমরা সেই শাখার ওপর করাত চালাব না; বরং শেকড় আমেরিকার ওপরেই করাত চালানো অব্যাহত রাখব। কারণ, শেকড় বাদ দিয়ে আমরা যদি শাখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এতে আমাদের মেহনত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং শক্তির অপচয় হবে। আর যদি আমেরিকারূপী শেকড়ে করাত চালানো অব্যাহত থাকে, তাহলে একসময় না

একসময় তা দ্বিখণ্ডিত হবেই। আর শেকড় যদি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, বাকি অংশগুলো আপনা-আপনি নিস্তেজ হয়ে যাবে। এর বাস্তব একটি উদাহরণ হলো সোভিয়েত ইয়নিয়নের পতন। মুজাহিদগণ যখন আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নরুপী গাছের শেকড় কেটে দেন, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ডালপালাও একে একে ভেঙে পড়তে থাকে। একেবারে দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত তার সব ডালপালা একাই লুটিয়ে পড়ে, সেগুলোর পেছনে আলাদাভাবে কোনো মেহনতই করতে হয়নি।

অনেকে শায়খের সাথে দ্বিমত করে মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁরা শায়খকে বলতেন, আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে কিছুই করতে পারব না, আপনি শুধু শুধু আমাদেরকে ঝামেলায় ফেলবেন ইত্যাদি। শায়খ উসামা রহ. খুব নরমভাবে তাঁদের বলতেন—

> 'আপনারা চাচ্ছেন, আমরা একের পর এক দালালদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকি এবং সব দালালকে শেষ করে একেবারে শেষে দালাল সর্দার পর্যন্ত পৌঁছাই। এত দীর্ঘ লড়াই না করে বরং শুরুতেই সর্দারের ওপর আক্রমণ করি, দেখবেন ফলাফল ভালো হবে।'[৯১]

শায়খ রহ. আরও বলতেন—

> 'মুরতাদ শাসকদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া, তাদের ইরতিদাদ নিয়ে কথা বলা—এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ ভালোভাবে বোঝে না, তাই এ ধরনের দাওয়াতের সাথে তারা খুব একটা একাত্ম হতে পারে না। বরং অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের দাওয়াতকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে। সাধারণ জনগণ দাওয়াতের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালে জিহাদী আন্দোলনের জন্য বৈরী পরিবেশ তৈরি হবে। সাথে সাথে জনগণের সমর্থন না থাকায় এই জিহাদ টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।'[৯২]

এই নীতি গ্রহণের পেছনে শায়খ উসামা রহ.-এর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের সহানুভূতি অর্জন করা। আমেরিকার কুফর, জুলুম, অত্যাচার এবং মুসলিমদের চিরশত্রু ইহুদীদের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কেউই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে না। তবে এই নীতির ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। শায়খ ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী তাঁর 'তাওজীহাতুন আম্মাহ লিল-আমালিল জিহাদী (জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা)'-তে এই ব্যতিক্রমগুলো উল্লেখ করেছেন—

---

৯১ القصة غير المروية لأحداث الحادي عشر (১১ই সেপ্টেম্বরের না বলা গল্প) : শায়খ আবু বাসীর রহ.-এর জবানবন্দি

৯২ অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস, প্রথম কিস্তি

‘১. বৈশ্বিক কুফরের মাথা আমেরিকার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা—এটি হলো মূলনীতি। নিজ নিজ দেশের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সে অঞ্চলের মুসলিম জনসাধারণের জিহাদের যে অধিকার, তার সাথে এই মূলনীতি সাংঘর্ষিক নয়। তাই, ফিলিপাইন ও বার্মার জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সেখানকার মুসলিম ভাইদের অধিকার। পৃথিবীর যেখানেই মুসলিমদের ওপর জুলুম করা হবে, সেখানেই জালেমের বিরুদ্ধে মুসলিমরা জিহাদ করবে।

২. আমাদের সাধারণ মূলনীতি হলো, আমরা পারতপক্ষে আঞ্চলিক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াব না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ—আঞ্চলিক সরকার যদি মার্কিন বাহিনীর সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেমন: আফগানিস্তান; অথবা আঞ্চলিক সরকার যদি মার্কিনিদের প্রতিনিধি হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেমন: সোমালিয়া ও জাযীরাতুল আরব; অথবা স্থানীয় সরকার যদি মুজাহিদদের উপস্থিতি মানতে না চায়, যেমন: উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, শাম ও ইরাক।’

শায়খ উসামা রহ. যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন, তা হলো, শত্রুর নানামুখী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে কিংবা ইস্যুর ভিড়ে আল-কায়েদা যেন তার সুনির্ধারিত স্ট্র্যাটেজি থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। এ জন্য আল-কায়েদার নেতৃবর্গের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিগুলোতে নিয়মিত এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে প্রধান লক্ষ্য যেন সব সময় স্পষ্ট থাকে।

হুসাম উমাবী তাঁর ‘القاعدة التي غيرت تاريخ أمريكا। (আল-কায়েদা: আমেরিকার ইতিহাস পালটে দেওয়া এক নাম)’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—

‘এ কারণেই আমেরিকার সবচেয়ে বড় ভয় হলো, তার নিজ ভূখণ্ডেই তার ওপর আক্রমণ হবে অথবা বহির্বিশ্বে থাকা তার স্বার্থের ওপর আঘাত আসবে। আর তাই ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে—এ কাজটি আমেরিকা খুব ভালো পারে—জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সে এই স্ট্র্যাটেজির ব্যর্থতা বোঝানোর চেষ্টা করে। কারণ, এই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আমেরিকা ও আমেরিকার স্বার্থগুলোই মুজাহিদদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। আমেরিকা ছলে-বলে-কৌশলে তাদেরকে এই স্ট্র্যাটেজি থেকে সরিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। সে বোঝানোর চেষ্টা করে, কাফেরে আসলীর চেয়ে মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু মানুষ শায়খ উসামার এই স্ট্র্যাটেজিকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য বলে বেড়ায়, বোস্টন ম্যারাথন বোম্বিং[৯৩], উমর ফারুক অপারেশন[৯৪] আর পার্সেল অপারেশনের[৯৫] পর আমেরিকার অভ্যন্তরে তো কোনো অপারেশনই হয়নি। তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বিগত বছরগুলোতে, বিশেষত আরব বসন্তের পর মুজাহিদদেরকে আঞ্চলিক যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার জন্য [কাফেরদের পক্ষ থেকে] অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। যার কারণে সরাসরি আমেরিকার ওপর আক্রমণ বিলম্বিত হচ্ছে। তবে আমেরিকার ওপর হামলা হতে দেরি হওয়ার অর্থ এই না যে, এই স্ট্র্যাটেজিই ব্যর্থ। এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় না যে, মুজাহিদরা আমেরিকার ওপর আঘাত করা বাদ দিয়ে আমেরিকার চাহিদা মতো যুদ্ধকে নিজেদের ভূমিতে টেনে এনেছে। বরং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অনিবার্য কিছু কারণে যদিও মুজাহিদগণ সরাসরি আমেরিকার ওপর আঘাত করতে পারছেন না, তবে যদি তারা নিজেদের শক্তির হেফাযত করেন এবং [কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে] আঞ্চলিক যুদ্ধে জড়িয়ে শক্তিক্ষয় না করেন, তাহলে এটাই তাদের সফলতা। কারণ, আবার যখন আমেরিকার ওপর আঘাত করার সুযোগ তৈরি হবে, তখন তারা নিজেদের এই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে নতুনভাবে অপারেশন করতে পারবেন। হোয়াইট হাউজের রাজনীতিবিদরা এই বিষয়টিকেই ভয় করে।'

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ২০শে জানুয়ারি শায়খ উসামা রহ. 'السبيل لإنهاء الحرب (যুদ্ধের সমাপ্তি যেভাবে হবে)' নামে মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর তৃতীয় চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—

'৯/১১-এর মতো নতুন কোনো হামলা আমেরিকাতে না হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, আমরা তোমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেদ করতে পারছি না; বরং অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে যথাসময়ে তোমাদের মাটিতেই এর বাস্তবতা দেখতে পাবে।'

---

[৯৩] ২০১৩ সালের ১৫ই এপ্রিল আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বোস্টনে আয়োজিত ১১৭তম বার্ষিক ম্যারাথন চলাকালে ফিনিশ লাইনের কাছে জোখার সারনায়েভ ও তামেরলান সারনায়েভ নামের চেচেন বংশদ্ভূত দুই ভাই দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এতে ৩ জন নিহত ও প্রায় ২৬০ জন আহত হয়।

[৯৪] ২০০৯ সালের ২৫ই ডিসেম্বর উমর ফারুক নামের এক নাইজেরিয়ান মুসলিম যুবক আমস্টারডাম থেকে আমেরিকার ডেট্রয়েটগামী মার্কিন যাত্রীবাহী বিমান নর্থওয়েস্ট এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ২৫৩-তে বোমা হামলার চেষ্টা করেন। কিন্তু হামলাটি ব্যর্থ হয় এবং তিনি গ্রেফতার হন।

[৯৫] ২০১০ সালের ২৯শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রগামী একটি কার্গো বিমানে দুটো পার্সেলে বোমা শনাক্ত করা হয়। পার্সেলদুটোতে দুটো প্রিন্টার কার্ট্রিজ ছিল। কার্ট্রিজের মধ্যে ইলেকট্রিক টাইমার-সহ PETN বিস্ফোরক লুকোনো ছিল। পার্সেলদুটির একটি যুক্তরাজ্যের ইস্ট মিডল্যান্ডস বিমানবন্দরে শনাক্ত করা হয়, আরেকটি দুবাইয়ে শনাক্ত করা হয়। এই হামলাটিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, শায়খ উসামার মতো আইকনিক ব্যক্তিও জিহাদী দলগুলোকে তাঁর 'আমেরিকার বিরুদ্ধে একমুখী জিহাদের নীতি'র দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হননি। জিহাদী দলগুলো চাইলে সরাসরি আল-কায়েদার সাথে একীভূত হয়ে এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারত, আবার চাইলে আল-জাবহাতুল ইসলামিয়া (গ্লোবাল ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ অ্যাগেইন্সট জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডারস) জোটে শরীক হয়েও এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারত। দুটো পথই তাদের সামনে খোলা ছিল। কিন্তু কেউই সাড়া দেয়নি; আশ্চর্যের বিষয় হলো, গতানুগতিক সাংগঠনিক পদ্ধতিতে নিজ নিজ দেশের মুরতাদ সরকারকে হটিয়ে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 'আঞ্চলিক জিহাদের ধারণা' তালেবানের শাসনামলে [১৯৯৬-২০০১] নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সংগঠন একেই নিজেদের মানহাজ হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। অথচ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এই যুগে আঞ্চলিক জিহাদের এই ধারণা বারবার ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এরইমধ্যে ৯/১১-এর ঘটনা ঘটে যায় এবং আমেরিকা ইমারতের ওপর হামলা করে বসে। এতদিন যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে একমুখী জিহাদের দাওয়াতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিল না, এই হামলার মাধ্যমে আমেরিকা নিজেই তাদেরকে নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে আনে।[৯৬]

শায়খ আবু মুসআব সূরী তাঁর 'দাওয়াতুল মুকাওয়ামা' গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'কুফরের আঁতুড়ঘর আমেরিকার অভ্যন্তরে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে ১৯ জন বীর মুজাহিদের এই হামলা সর্বদিক দিয়েই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা ছিল। এই ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া পরে সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বজুড়ে যে নতুন প্রকৃতির যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, বিশেষত আফগানিস্তানে এবং যেভাবে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে—এ সব কিছু থেকে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি সরিয়ে আমরা বলতে পারি, শায়খ উসামা রহ.-এর এই সিদ্ধান্তের বদৌলতেই এই যুদ্ধ সঠিক দিশা লাভ করেছে। তাঁর মেহনতের ফলেই আসল শত্রু আমাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছে, যে এতদিন পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের অন্য সকল শত্রুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। আমেরিকা ও তার মিত্রদের মদদপুষ্ট ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদীদের থেকে শুরু করে মুসলিম দেশগুলোর মুরতাদ শাসক—যাদের বিরুদ্ধেই আমরা লড়াই করেছি, সব ফ্রন্টেই তিনি আমাদের আসল শত্রুকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আর পার্শ্বযুদ্ধ এড়িয়ে এই প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

[৯৬] দাওয়াতুল মুকাওয়ামাহ : শায়খ আবু মুসআব সূরী (ঈষৎ পরিবর্তিত)

..... এই যুক্তির আলোকে আমরা যদি মেনে নিই যে, শত্রুর পক্ষ থেকে বাস্তবেই আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এটাও মেনে নিতে হবে যে, শরীয়তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শত্রুর মোকাবিলা করা এখন আমাদের দায়িত্বে পরিণত হয়েছে এবং এই দিফায়ী জিহাদ সকল মুসলিমের ওপর ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾.

'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, তবে সীমালংঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও, হত্যা করো এবং তাদেরকে সে স্থান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।' [সূরা বাকারা (২) : ১৯০, ১৯১]

মনে রাখতে হবে, যুদ্ধে নামলে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হবেই। যারা জিহাদ করতে চায়, তাঁদের সামনে এ বিষয়টিও স্পষ্ট থাকা উচিত যে, 'লড়াইয়ের পদ্ধতি বাছাই করা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লড়াইয়ের দুটি পদ্ধতি আছে—একটি হলো, শত্রুর চাহিদামাফিক আমরা আঞ্চলিক মুরতাদ শাসক ও তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমাদের শক্তির অপচয় করব, বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে আমরা এটাই করে আসছি এবং এর কারণে অসংখ্য ময়দানে ব্যর্থতা ও বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতিরও শিকার হতে হয়েছে। লড়াইয়ের আরেকটি পদ্ধতি হলো, আমাদের সকল আঞ্চলিক শত্রুর পৃষ্ঠপোষক প্রধান শত্রু অর্থাৎ আমেরিকা, ইসরাইল ও ন্যাটো জোটের দেশসমূহের বিরুদ্ধে আমরা সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হব।'[৯৭]

শায়খ আব্দুল্লাহ নাফীসী হাফি. ২০০৬ সালে 'هل تنتهي مشكلتنا مع الغرب بتأمين مصالحه في منطقتنا (উপসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমা স্বার্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কি তাদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব নিরসন হবে?)' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন—

'আমেরিকা হলো পশ্চিমাদের জন্য অভিকর্ষ কেন্দ্র (Center of Gravity) সমতুল্য এবং ভূতপূর্ব ইউরোপিয়ান ও ব্রিটিশ হেজেমনির উত্তরাধিকারী। এই আমেরিকাই জায়নবাদী প্রকল্পের অস্তিত্ব ও সামরিক উন্নয়নের প্রধান মদদদাতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের যে পরিস্থিতিকে বানের পানিতে ভেসে আসা খড়কুটোর সাথে তুলনা করেছেন, এখন উম্মত সেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে

[৯৭] দাওয়াতুল মুকাওয়ামা : শায়খ আবু মুসআব সূরী (ঈষৎ পরিবর্তিত)

উত্তরণের জন্য পশ্চিমা শক্তির অভিকর্ষ কেন্দ্র আমেরিকার মোকাবিলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় উম্মতের সামনে নেই। এ বিষয়টি সব সময় স্পষ্ট রাখতে হবে যে, কেবল মার্কিন প্রশাসনের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যই আমরা এই লড়াই করছি।

এই লড়াইয়ের লক্ষ্য কী হবে? বিখ্যাত মুসলিম স্ট্র্যাটেজিস্ট ডক্টর হামিদ আব্দুল মাজিদ কুওয়াইসী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার মতে, এ লড়াইয়ের লক্ষ্য হবে, পশ্চিমাদের অভিকর্ষ কেন্দ্র তথা আমেরিকার ওপর তীব্র আঘাত করার মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে পঙ্গু বানিয়ে রাখা এই বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, সারা দুনিয়ার সকল ইসলামী আন্দোলনকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, পশ্চিমারা তাদের সকলকেই নিজেদের টার্গেট মনে করে। নাম ও পতাকার ভিন্নতা তাদের কাছে কোনো বিষয় নয়। এরা একদিকে সামরিক শক্তি ব্যয় করে জুলুম অত্যাচারের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করছে, আবার এরাই দিনরাত জলপাইয়ের ডাল দুলিয়ে শান্তির বার্তা দিচ্ছে। তাই মনে রাখতে হবে, ওদের লক্ষ্য হলো ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা, ইসলামের কিতাব ও রাসূল, ইসলামী শরীয়ত, ইসলামের ভাষা ও আন্দোলন, ইসলামের জনশক্তি এবং বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা—সবকিছুই তাদের টার্গেট।[৯৮]

## বিচ্ছিন্নতার আহ্বান

আফগানিস্তানে পরাজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়। মার্কিন আধিপত্যবাদের চাহিদামাফিক পুরো পৃথিবীকে গঠন করার জন্য বিশ্বের ওপর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার চাপিয়ে দেয়। শায়খ আবু মুসআব সূরীর ভাষায় এটা ছিল 'মুসলিম উম্মাহকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোটের অনুগত গোলাম বানানোর' এক মাস্টারপ্ল্যান। আমেরিকা পৃথিবীর কোনো দেশকেই এই বিশ্বব্যবস্থার বাইরে যেতে দেয় না। মুসলিম হিসেবে আমাদের চিন্তার জায়গাটি হলো, আমেরিকা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত কোনো সরকারব্যবস্থাকে কিছুতেই মেনে নেবে না। কারণ, আমেরিকা হলো এই কুফরি বিশ্বব্যবস্থার মোড়ল আর এই বিশ্বব্যবস্থা দাঁড়িয়েই আছে রাষ্ট্র থেকে দীনকে পৃথক্করণের সেক্যুলার নীতির ওপর। তাই, স্বাভাবিকভাবেই কোনো দেশ যদি আমেরিকার এই সেক্যুলার নীতি ভঙ্গ করে, আমেরিকা তাকে বিদ্রোহী হিসেবে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা

[৯৮] হুসাম উমাবীর লেখা القاعدة التي غيرت تاريخ أمريكا (আল-কায়েদা : আমেরিকার ইতিহাস পালটে দেওয়া একটি নাম) শীর্ষক পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত

আরোপ-সহ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এর অসংখ্য উদাহরণ আছে।

এ সব কারণেই শায়খ উসামা রহ. বিশ্বাস করতেন, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো যুগের হুবাল আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জায়োনিস্ট-ক্রুসেডার জোটের চাপিয়ে দেওয়া এই বিশ্বব্যবস্থাকে খতম করা। এ ব্যাপারে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. বলেন—

> 'মুসলিমদের ওপর যে মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে, এর মৌলিক দুটি কারণ আছে। এক. মুসলিম দেশগুলোর ওপর চেপে বসা মার্কিন আধিপত্যবাদ এবং দুই. এই আধিপত্যবাদকে তোষণ করে চলা শরীয়তের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী শাসকগোষ্ঠী, যারা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মার্কিন আধিপত্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় দীন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হলো মুসলিমদের ওপর চেপে বসা মার্কিন আধিপত্যবাদকে খতম করা, এই মার্কিন আধিপত্যবাদই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। মার্কিন আধিপত্যবাদ খতম করার জন্য ততদিন পর্যন্ত আমেরিকার শক্তি ক্ষয় করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে, যতদিন না আমেরিকা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বে হস্তক্ষেপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্যও তার অবশিষ্ট না থাকে।'[৯৯]

পূর্বেও আলোচনা হয়েছে, এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শায়খ উসামা রহ. মুজাহিদদের বিচ্ছিন্ন মেহনতকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বসম্মত একটি শত্রুর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে চাচ্ছিলেন। আর সর্বসম্মত এই শত্রুটি হলো যুগের হুবাল ও সাপের মাথা আমেরিকা।

শায়খ উসামার এই দাওয়াত আমেরিকার অস্তিত্ব ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কিন স্বার্থের জন্য কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে—আমেরিকা তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কারণ, ততদিন পর্যন্ত শুধু আল-কায়েদা আর তার মুষ্টিমেয় সদস্যই অল্পকিছু হামলা করে আমেরিকাকে ভালো রকমের নাকানিচুবানি খাইয়েছিল এবং বিপুল রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিল। এখন শায়খ উসামার আহ্বানে যদি অন্যান্য জিহাদী দলগুলোও সাড়া দেয় এবং নিজেদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে হামলা করে, তাহলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা বলাই বাহুল্য।

---

[৯৯] অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস (আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা-AQAP-এর আমীর শায়খ আবু বাসীর নাসির আব্দুল কারীম উহাইশী রহ.-এর উদ্দেশ্যে লেখা শায়খ উসামার চিঠি থেকে সংগৃহীত)

দুঃখের বিষয় হলো, ৯/১১-এর আগ পর্যন্ত অধিকাংশ জিহাদী দলই শায়খের এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ৯/১১-এর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ যখন ওয়ার অন টেররের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক ক্রুসেডের ঘোষণা দেয়, তখন আমেরিকার আসল চেহারা প্রকাশ পায় এবং তার সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ জনসম্মুখে চলে আসে। এর সাথে অনেক জিহাদী দলও বুঝতে পারে, মুসলিমদের প্রধান শত্রু যুগের হুবাল আমেরিকাকে সরাসরি তাদের সামনে এনে দাঁড় করানোর মাধ্যমে শায়খ উসামা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এই সংঘাতকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল-কায়েদা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, মালি থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য জিহাদী সংগঠন আল-কায়েদার সাথে একীভূত হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে আমেরিকা বুঝতে পারে, সবাইকে এক কাতারে এনে সে মস্তবড় ভুল করে ফেলেছে। আমেরিকা এটাও বুঝতে পারে, এই যুদ্ধে জিততে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে জিততে হবে, যার কথা সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড আগেই বলেছিল। অর্থাৎ মুসলিম জনসাধারণের মন ও মস্তিষ্ক জয় করার জন্য সামরিক আগ্রাসনের সঙ্গে সমান তালে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতাও চালাতে হবে। আর এই তৎপরতার মূল লক্ষ্য হবে, সন্ত্রাসীদের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের জনসমর্থনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

আমরা আগেও বলেছি, হাজারো দরবারি আলেম, পেন্টাগন ফকীহ আর জিহাদ পরিত্যাগকারী সাবেক জিহাদী এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে আমেরিকার সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। এর সাথে আছে ডজনখানেক ক্রুসেডার থিংক ট্যাংক ও রিসার্চ সেন্টার, যারা বছরের পর বছর আল-কায়েদা ও অন্যান্য অসংখ্য জিহাদী সংগঠন নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে মার্কিন সরকারের সামনে কিছু পলিসি পেশ করেছে। তাদের মতে, জিহাদী সংগঠনগুলোকে প্রতিহত করা এবং তাদের নির্মূল করার জন্য এই পলিসির চেয়ে কার্যকর কোনো পলিসি হতে পারে না। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন যে পলিসিগুলো তারা প্রস্তাব করেছে, বাস্তবে সবগুলোর সারাংশ একই—উম্মতের সাথে মুজাহিদদের দূরত্ব তৈরি করা এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ উসকে দেওয়া। অন্যভাবে বললে, আল-কায়েদার প্রধান আশ্রয়দাতা মুসলিম জনসাধারণ থেকে আল-কায়েদাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং অন্যান্য জিহাদী দলগুলোকে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া।

২০০৬ সালের ১৮ই নভেম্বর মিডিয়াতে আল-কায়েদা ওপর করা একটি গবেষণার কথা ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকান থিংক ট্যাংক র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত এই গবেষণার তত্ত্বাবধানে ছিলেন অ্যাঞ্জেল রাবাসা। এই গবেষণায় মার্কিন প্রশাসন ও নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, তারা যেন আল-কায়েদাকে শুধু সামরিকভাবে প্রতিরোধ না করে; বরং

আল-কায়েদার আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ শুরু করে। গবেষণায় বেশ জোরালোভাবে বলা হয়, যেহেতু পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী দল বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী আল-কায়েদার আকীদা-বিশ্বাসের সাথে একমত না এবং আল-কায়েদার আকীদাতে এমন কিছু দুর্বল পয়েন্ট আছে, যেগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব; তাই, তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আল-কায়েদা ও আঞ্চলিক জিহাদী দলগুলোর মধ্যে বিভেদ উসকে দেওয়ার জন্য গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের মধ্যকার কর্মপন্থাগত মতভিন্নতাকে ব্যবহার করে তাদের সম্পর্কে চিড় ধরানোর চেষ্টা করার জন্যও আমেরিকার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[১০০]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন-সহ অন্যান্য ক্রুসেডার রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা তাদের গবেষণাতে যে-সব পলিসির কথা বলে, তা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, সন্ত্রাস সমনের নামে তারা মূলত ইসলামকে দমন করতে চায়। কিন্তু তারপরেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, যে-সব জিহাদী সংগঠন আমেরিকার বিরুদ্ধে একমুখী জিহাদের নীতির সাথে একমত হয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেকেই ক্রুসেডারদের এই চক্রান্ত ধরতে পারে না। বিভিন্ন কারণে তারা অনেক সময় বৈশ্বিক জিহাদের মানহাজ ছেড়ে তাদের পুরোনো সেই আঞ্চলিক জিহাদের মানহাজে ফিরে যায় আর নিজেদের অজান্তেই কাফেরদের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হলো ইরাক ও শামের পরিস্থিতি। ইরাক ও শামের জিহাদকে ঘিরে যে পরিমাণ ষড়যন্ত্র হয়েছে, তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ইরাক জিহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল, আমেরিকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইরাকের মুজাহিদগণ, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে ইরাকের বরকতময় সেই জিহাদ মুখ থুবড়ে পড়ল। শামের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। শামের আঞ্চলিক জিহাদী দলগুলোকে আল-কায়েদার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দেওয়ার জন্য কিছু জিহাদী সংগঠন জাবহাতুন নুসরার ওপর চাপপ্রয়োগ করতে শুরু করে এবং গ্লোবাল জিহাদের আদর্শ ত্যাগ করে আল-কায়েদার বাইয়াত ভঙ্গ করতে বাধ্য করে। শুধু এতটুকুই না, আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর জাবহাতুন নুসরা যখন হাইআতু তাহরীরিশ শাম নামে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর থেকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে তারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এমনকি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট থেকে দু'জন ক্রুসেডার গবেষক প্যাট্রিক হেনি ও জেরোম ড্রেভনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত একটি গবেষণায় হাইআতু তাহরীরিশ শামের সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতার প্রশংসা করে একে 'অন্যান্য জিহাদী দলের জন্য মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ

[১০০] গবেষক আকরাম হিজাযীর লেখা القاعدة بين خطاب الفتنة وخطاب السياسة শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত

করে বলা হয়েছে যে, হাইআতু তাহরীরিশ শামের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সফল হলে আল-কায়েদার অন্যান্য শাখাও এই মডেলটিকে অনুসরণ করবে। গবেষণায় বলা হয়েছে—

> 'এটা স্পষ্ট যে, হাইআতু তাহরীরিশ শামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব গ্লোবাল জিহাদকে ধারণ করে না। বরং গ্লোবাল জিহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা লালন করে। এমনকি তারা (হাইআতু তাহরীরিশ শাম) উগ্রবাদ মোকাবিলায় এমন কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করেছে, যা মার্কিন ড্রোন দিয়েও সম্ভব ছিল না। HTS প্রভাব বিস্তারের যে পলিসি গ্রহণ করেছে, এর ফলে সিরিয়ার মাটিতে আল-কায়েদার দৃশ্যমান কোনো অস্তিত্বই আর বাকি থাকবে না। সিরিয়ান বিপ্লব শুরুর পর দীর্ঘ ৯ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা এই প্রথমবারের মতো ঘটতে চলেছে।
>
> দৃশ্যটি আসলেই দেখার মতো—একটি চরমপন্থি সংগঠন পূর্বের আদর্শ ত্যাগ করে প্রচলিত বিপ্লবী কাঠামোতে প্রবেশ করছে এবং আল-কায়েদার উগ্রবাদী সদস্যদের মধ্যপন্থি (মডারেট) বানিয়ে ফেলছে। এরই সঙ্গে দলের মধ্যে থাকা অতিমাত্রার উগ্রবাদী চিন্তাধারা লালনকারীদের দমন করছে এবং পশ্চিমের সাথে সমঝোতায় আসার জন্য আলাপ-আলোচনার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইদলিব ইস্যুতে বাজি রেখে বলা যায়, সিরিয়ার এই পরিবর্তনের সফলতা-ব্যর্থতার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, এমনকি এর ভিত্তিতে আল-কায়েদার অন্য কোনো শাখা আল-কায়েদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারে।'[১০১]

সামরিক, অর্থনৈতিক ও গোয়েন্দাবৃত্তির ক্ষেত্রে বিপুল সক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা একাকী কোনো যুদ্ধে জড়ায় না। আগে মিত্র দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে, তারপর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। আর আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শায়খ উসামা রহ. আমেরিকার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও একমুখী জিহাদের যৌক্তিক দাওয়াত দিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর এই দাওয়াতে সাড়া দিলো না, অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের আদেশ করেছেন, ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছেন এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সতর্ক করেছেন। কী অদ্ভূত বৈপরীত্য আমাদের মাঝে। আরও দুঃখের বিষয় হলো, জিহাদপন্থি কিছু লোকই একতার বদলে বিচ্ছিন্নতার দাওয়াত দেয়, আল-কায়েদার অঙ্গসংগঠনগুলোকে আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলে। এরচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!

---

[১০১] সিরিয়ার জিহাদ নিয়ে আল্লাহর শত্রুরা আরও কত ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে, তা বিস্তারিত জানতে চাইলে প্যাট্রিক হেনি ও জেরোম ড্রেভনের যৌথ উদ্যোগে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্র How Global Jihad Relocalises and Where it Leads: The Case of HTS, the Former AQ Franchise in Syria দেখা যেতে পারে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যারা জিহাদী সংগঠনগুলোকে আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলে, তারা ইসলাম ও কুফরের মাঝে চলমান এই সংঘাতের বাস্তবতা জানে না। মনে হয় তারা বোঝেই না যে, বুশ আর মার্কিন থিংক ট্যাংকগুলো এ সংঘাতকে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিতে চাইলেও বাস্তবে এ সংঘাত আকীদা ও বিশ্বাসের সংঘাত, যেমনটা আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াতে আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন। তারা কি সে সব দলের পরিণতি দেখেনি, যারা আল-কায়েদার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, যুগের হুবাল আমেরিকার আধিপত্যবাদবিরোধী একমুখী জিহাদের আদর্শ ত্যাগ করে আমেরিকাকে তারা চলমানে সংঘাতে নিরপেক্ষ বানানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। উলটো আমেরিকা তাদের বিরোধীদেরকে প্রতিনিয়ত সমর্থন দিয়ে তাদের শক্তি ক্ষয় করেছে এবং একসময় তাদের পুরো জিহাদী মিশনকেই বানচাল করে দিয়েছে। এ ধরনের দলগুলোর মধ্যে দাওলা ও জাবহাতুন নুসরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান যারা করে, তারা কি জানে না, আল্লাহর দীনের নুসরত একমাত্র সে ব্যক্তিই করতে পারবে, যে দীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে ধারণ করে?

সীরাতের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়, চাচা আবু তালেবের ইন্তিকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলে শাইবান বিন সালাবা গোত্রের এক প্রতিনিধিদলের কাছে তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তাদের সেই প্রতিনিধিদলের মধ্যে মাফরুক বিন আমর, হানী বিন কাবীসা, মুসান্না বিন হারেসা এবং নুমান বিন শারীক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে মাফরুক বিন আমর দেখতেও যেমন সুপুরুষ ছিল, তেমনই ছিল বাকপটু। আবু বকর রাযি. তার কাছাকাছি বসা ছিলেন। তাই, আবু বকর রাযি. তার সাথে কথা বলা শুরু করেন।

আবু বকর রাযি. : তোমাদের গোত্রের লোকসংখ্যা কত?

মাফরুক : আমরা হাজারেরও বেশি হব। আমরা সংখ্যায় কম হলেও যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার লোক নই।

আবু বকর রাযি. : তোমাদের প্রভাব কেমন?

মাফরুক : এখন আমরা অভাবে আছি, তাই প্রভাব কম। তবে আমরা সকলেই চেষ্টা করছি।

আবু বকর রাযি. : শত্রুর সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কেমন হয়?

মাফরুক : আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন চূড়ান্ত ক্রোধান্বিত থাকি আর চূড়ান্ত ক্রোধ নিয়ে যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই, তখন আমরা যুদ্ধও করি ভয়ংকরভাবে। আমরা সন্তানদের চেয়ে ঘোড়ার বেশি যত্ন নিই, গর্ভবতী উটনীর চেয়ে অস্ত্রকে বেশি ভালোবাসি।

তবে বিজয় তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, কখনো তিনি আমাদের বিজয়ী করেন, আবার কখনো আমাদের ওপর অন্যদের বিজয় দান করেন। আপনি সম্ভবত কুরাইশ গোত্রের?

আবু বকর রাযি. : (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়ে) তোমরা কি জানতে পেরেছ যে, একজন রাসূলের আগমন ঘটেছে? ইনিই সেই রাসূল।

মাফরুক : হ্যাঁ, আমরা শুনেছি তিনি নিজেকে রাসূল বলে দাবি করেন। তো আপনি কীসের দাওয়াত দেন?

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল। আমি চাই, তোমরা আমাকে আশ্রয় দেবে ও সাহায্য করবে। কারণ, কুরাইশ আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বাতিলকে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী, সুপ্রশংসিত।

মাফরুক : হে কুরাইশি ভাই, আপনি আর কীসের দাওয়াত দেন?

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

**قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ**

‘হে নবী, (তাদেরকে) বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা কিছু হারাম করেছেন, আমি তা (তোমাদের) পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, অভাবের ভয়ে নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরও রিযিক দিই এবং তাদেরও (দেবো)। আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোনো রকমের অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আর আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করবে না। এই সব বিষয়ে, আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করো।’ [সূরা আনআম (৬) : ১৫১]

মাফরুক : আপনি আর কীসের দাওয়াত দেন?

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' [সূরা নাহল (১৬) : ৯০]

মাফরুক : আল্লাহর কসম, আপনি তো উন্নত চরিত্র ও ভালো কাজের দাওয়াত দিচ্ছেন। যারা আপনার বিরোধিতা করেছে, আপনাকে অস্বীকার করেছে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী।

হানী বিন কাবীসার জন্য কথা বলার সুযোগ তৈরি করে সে বলল, 'ইনি হানী বিন কাবীসা, আমাদের একজন মুরুব্বি ও ধর্মগুরু।'

এরপরে হানী কথা বলা শুরু করল। সে বলল, 'হে কুরাইশি ভাই, আপনার কথা শুনলাম। আপনার সাথে এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, আগে বা পরে কখনো আপনার সাথে আমাদের কথাও হয়নি, দেখাও হয়নি। তাই আমি মনে করি, একটিমাত্র বৈঠকের কথাবার্তাতেই আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার আনা দীনের অনুসরণ করা ভুল ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করা ঠিক না। তা ছাড়া আমাদের গোত্রের লোকদের না জানিয়ে এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়াও ঠিক হবে না। তাই, সবচেয়ে ভালো হবে, এখন আপনিও ফিরে যান, আমরাও ফিরে যাই। আপনিও বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা করুন, আমরাও চিন্তা করি।' এতটুকু বলে মুসান্না বিন হারেসাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি হলেন মুসান্না বিন হারেসা। আমাদের মুরুব্বি ও যুদ্ধের সেনাপতি।'

তখন মুসান্না বলল, 'আপনার কথা শুনলাম। হানী বিন কাবীসার সাথে আমি একমত, আপনার সাথে এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, আগে বা পরে কখনো আপনার সাথে আমাদের কথাও হয়নি, দেখাও হয়নি। তাই অল্প সময়ের এই কথাবার্তাতেই আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার দীনের অনুসরণ করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমরা ইয়ামামা ও সামাওয়ার দুটি জলাশয়ের মধ্যে বাস করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এই দুই জলাশয় কী? সে বলল, একটি হলো পারস্য সম্রাট কিসরার কর্তৃত্বাধীন নদী অঞ্চল, আরেকটি আরবদের আওতাধীন জলাশয়। কিসরার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে যারা থাকে, তাদের অপরাধের ক্ষমা নেই, তাদের কোনো অজুহাতও শোনা হয় না। তবে আরবদের আওতাধীন অঞ্চলে যারা থাকে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের ওজর-আপত্তিও আমলে নেওয়া হয়। কিছুদিন হলো কিসরার সাথে আমরা একটি চুক্তি করেছি যে, আমরা নিজেরাও নতুন কোনো

মতের প্রচার করব না এবং কোনো নতুন মত প্রচারকারীকে আশ্রয়ও দেব না। আর আমার মনে হয়, আপনি যে দীনের দিকে আহ্বান করছেন, এ বিষয়টি রাজা-বাদশাহরা পছন্দ করবেন না। তবে, আপনি যদি চান, তাহলে আমরা আপনাকে আরবদের অংশে রেখে আশ্রয় দিতে পারব এবং সাহায্যও করতে পারব। তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সত্য কথা বলে ভালোই করেছ। তবে আল্লাহর দীনের নুসরত কেবল তাকে দিয়েই সম্ভব, যে দীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরে।'[১০২] [অর্থাৎ এক পরিস্থিতিতে দীনের সাথে থাকবে আর পরিস্থিতি বদলে গেলে দীনের সঙ্গত্যাগ করবে, এমন মানসিকতা থাকলে তাকে দিয়ে দীনের কাজ হবে না।]

উস্তায সায়্যিদ কুতুব শহীদের ওপর আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন। এ বিষয়টি তিনি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াত وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً। 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করছে'-এর তাফসীরে তিনি লিখেছেন—

> 'এই আয়াতের অর্থ হলো, কাফেরদের কোনো ব্যক্তি বা দল, কাউকে বাদ না দিয়ে সবার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। তারাও তো তোমাদের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে, তোমাদের কোনো ব্যক্তি বা দলকে তারা ছাড় দেয় না। বাস্তবে এই যুদ্ধ হলো তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার যুদ্ধ, কুফর ও ঈমানের যুদ্ধ, হেদায়েত ও গোমরাহির যুদ্ধ। এ যুদ্ধ এমন দুটি দলের যুদ্ধ, যাদের মধ্যে কোনো শান্তিচুক্তি সম্ভব না, চূড়ান্ত কোনো সমঝোতাও সম্ভব না। কারণ, তাদের মধ্যকার এই বিরোধ কোনো শাখাগত বা ছোটখাটো বিরোধ না; এই বিরোধ কোনো স্বার্থকেন্দ্রিক বিরোধ না যে, সমন্বয় করা যাবে; এটা সীমানাকেন্দ্রিক কোনো বিরোধ না যে, সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা যাবে। মুশরিক তথা মূর্তিপূজক ও আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিম উম্মাহর চলমান সংঘাতকে যদি মুসলিমরা অর্থনৈতিক, জাতীয়তাবাদী কিংবা কৌশলগত সংঘাত হিসেবে বোঝে অথবা তাদেরকে এভাবে বোঝানো হয়, তাহলে চলমান এই সংঘাতের ব্যাপারে তাদের চরমভাবে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এই যুদ্ধ আকীদার যুদ্ধ, আকীদা থেকে উৎসারিত মানহাজ ও দীনের যুদ্ধ।'

[১০২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৩/৩৯২-৩৯৩ (দারু ইবনি কাসীর); দালাইলুন নুবুওয়্যাহ : ২/৪২৪-৪২৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

তাই, যারা আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাওয়াত দেয়, তারা কমপক্ষে উতবা বিন রবীয়ার সেই ঐতিহাসিক উপদেশ কেন গ্রহণ করছে না? উতবা বিন রবীয়া কুরাইশের উদ্দেশ্যে বলেছিল—

> ‘হে কুরাইশ, আমার কথা মেনে নাও। তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মতো থাকতে দাও। তোমরাও তাঁর পথ থেকে সরে যাও। খোদার কসম, তাঁর থেকে যে বাণী আমি শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আরবরা যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারে, তবে তো তোমাদের কাজটা অন্যরাই করে দিলো। আর যদি সে আরবদের ওপর জয়ী হয়, তাহলে তাঁর রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব, তাঁর গৌরব মানে তোমাদের গৌরব। তখন তাঁকে পেয়ে তোমরাই বেশি সৌভাগ্যবান হবে।’

## মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শেষের শুরু

৯/১১-এর হামলা আমেরিকার ওপর ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কারণ, হামলাটি হয়েছিল আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে তাদের গর্ব-অহংকার ও শক্তিমত্তার প্রতীকগুলোর ওপর। এই ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছিল, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজনীতিতে বড় ধরনের ক্ষমতার পালাবাদল ঘটবে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সেই বাস্তবতাই দেখতে পাচ্ছি। বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন আন্তর্জাতিক জোটের উত্থান ঘটছে, যারা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যকে ধ্বংস করবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে।

এই হামলার প্রভাব ও ফলাফল নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না। এ বিষয়ে অনেক লেখক, গবেষক ও বিশ্লেষক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক—সব দিক থেকেই এই হামলার প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। আমরা এখানে এই হামলার শুধু একটি শাখা-বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব, তা হলো ২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে আমেরিকার দোহা চুক্তি। সাইফুদ্দীন আনসারী তাঁর ‘غزوة نيويورك وواشنطن قراءة تأصيلية (নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন হামলা : একটি অনুসন্ধানী পর্যালোচনা)’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ‘৯/১১-এর মাধ্যমে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপরাধী রাষ্ট্র (ক্রিমিনাল স্টেট) আমেরিকার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই হামলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তির সূচনা করে দিয়েছে।’

আগেও আমরা উল্লেখ করেছি, শায়খ উসামা রহ. যখন ৯/১১-এর পরিকল্পনা করছিলেন, তখনই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই হামলার জবাবে আমেরিকা অত্যন্ত কঠোর প্রতিক্রিয়া

দেখাবে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এমনকি সে যুদ্ধ দশ-বিশ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর এর মধ্য দিয়েই আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যাপক আকারে ক্ষয় করা হবে। ফলে তার পরাশক্তি রূপ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডাও মুখ থুবড়ে পড়বে। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করবে।

৯/১১ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ শায়খের এই ধারণাকেই সত্য প্রমাণ করেছে। পুরো বিশ্ব দেখেছে, ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, সে যুদ্ধে তিলে তিলে কীভাবে সে নিঃশেষ হয়েছে। সারা দুনিয়ার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আমেরিকা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে সুবিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল, অত্যাধুনিক সব যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করেছিল, সেই আমেরিকা তার ৪০টির বেশি মিত্র রাষ্ট্রকে সাথে নিয়েও আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদ ও তাঁদের মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কোনো বিজয় অর্জন করতে পারেনি। শেষমেশ যখন বুঝতে পেরেছে, এ যুদ্ধে কিছুতেই সে বিজয় লাভ করতে পারবে না, তখন নিজের অবশিষ্ট মানসম্মান নিয়ে কোনোমতে এই বিপদ থেকে বেরোনোর জন্য তালেবানের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময় মার্কিনিদের জনমত জরিপ করে দেখা গেছে, আফগান ও ইরাক যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর বস্তুগত ও লোকবলের ক্ষয়ক্ষতি যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন জনগণের মধ্যে মার্কিন সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থনও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল, তাঁর দীনকে তিনি সম্মানিত করবেন, তাঁর বান্দাদের বিজয় দান করবেন এবং শত্রুদের পরাজিত করবেন। ফলে আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হলো। মার্কিন রাজনীতিবিদদের শিরা-উপশিরায় রক্তের সাথে সাথে দম্ভ-অহংকারও প্রবাহিত হয়। সে অহংকারের কারণেই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ অধিকাংশ জনগণের এই দাবিকে এ কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল যে, 'সেনাপ্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমাদের ব্যাপারে শত্রুর কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাবে। তাই, শত্রুকে আমাদের ভূমিতে এসে লড়াই করার সুযোগ না দিয়ে শত্রুর ভূমিতে ঢুকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত আর বদরের প্রাক্কালে আবু জাহেলের সিদ্ধান্তের মধ্যে কী অদ্ভূত মিল! আবু সুফিয়ান পরামর্শ দিয়েছিল—'তোমরা তো তোমাদের ব্যবসায়িক কাফেলার নিরাপত্তা দিতে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও লোকজনকে রক্ষা করতে বের হয়েছিলে। আল্লাহ তো তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাই, এখন আর অগ্রসর না হয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়াই ভালো হবে।' কিন্তু দাম্ভিক আবু জাহেল আবু সুফিয়ানের পরামর্শে কর্ণপাত না করে বাহিনী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করে। যাওয়ার আগে সে বলেছিল—'আল্লাহর কসম, আমরা ফিরে যাব না। আগে আমরা বদর ময়দানে অবস্থান নেব, সেখানে তিন দিন থাকব, উট জবাই

করে ভোজসভার আয়োজন করব, মদপান করব, গায়িকারা আমাদের গান গেয়ে শোনাবে, তারপর মক্কায় ফিরব। গোটা আরব যখন আমাদের এই অভিযানের কথা শুনবে, তারপর থেকে কোনো বাহিনীই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করবে না।' তার এই অহংকারের কারণেই কুরাইশ বাহিনী মুসলিমদের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয় এবং মুশরিকদের বড় বড় সব নেতাও নিহত হয়।

দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আমেরিকা বড় গলায় বলে বেড়িয়েছে, ইমারতের মুজাহিদদের সাথে কোনো সংলাপ হবে না, কোনো আলাপ-আলোচনা বা চুক্তিও হবে না।[১০৩] তালেবানকে তারা সন্ত্রাসী ও খুনির দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আজ তাদেরকে সেই তালেবানের সামনেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে, তাদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসে দোহা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। সর্বস্তরের লেখক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দোহা চুক্তি ছিল আমেরিকার পরাজয় ও আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশ।




দোহা চুক্তি স্বাক্ষরের ঐতিহাসিক মুহূর্ত

[১০৩] ২০১০ থেকেই আমেরিকা তালেবানের সাথে আলোচনায় বসতে আগ্রহী ছিল। সে সময়ও তালেবানের শর্ত ছিল, আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও মিত্রদেশগুলোর সেনাপ্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেই কেবল তাঁরা আমেরিকার সাথে আলোচনায় বসবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু আমেরিকা তখন তালেবানের এই শর্ত মানতে রাজি হয়নি এবং যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। এরপর আরও একাধিকবার আলোচনার কথা উঠেছে এবং আমেরিকা নিজের সিদ্ধান্ত তালেবানের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিটি চেষ্টাই বিফলে গিয়েছে। অবশেষে ২০১৮ সালে তালেবানের যে শর্তকে আগে বারবার তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, সে শর্ত মেনে নিয়েই আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

সংলাপের জন্য ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে অনেক আগেই কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকাও অবনত মস্তকে ইমারতে ইসলামিয়ার সে সব শর্তে রাজি হয়েই সংলাপে বসেছিল। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শর্ত হলো—

১. সংলাপের জন্য কাতারকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখতে হবে। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, আফগানিস্তান আগ্রাসনে শরীক ছিল—এমন কোনো দেশের মাটিতে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা বা সংলাপে তারা বসবে না।

২. আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা ও তার মিত্রদেশগুলোর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে—এই সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত ধরেই সংলাপ অগ্রসর হবে। সেনাপ্রত্যাহারের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হবে।

৩. সংলাপে শরয়ী শাসনের ব্যাপারে কোনো ধরনের আলোচনা ইমার তে ইসলামিয়া মেনে নেবে না।

৪. আফগান পুতুল সরকারের হাতে আটক ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের সাথে সাথে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ইমারতের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকেও মুক্তি দিতে হবে এবং কালো তালিকা থেকে তাঁদের নাম প্রত্যাহার করতে হবে, যেন তাঁরা সংলাপে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫. সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ-সহ ইমারতে ইসলামিয়ার ওপর আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরোপ করা সকল অন্যায় বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

৬. আমেরিকা ও মিত্রদেশগুলোর সেনাপ্রত্যাহারের চুক্তি স্বাক্ষর করার আগে কাবুল সরকারের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা তালেবান মেনে নেবে না।

৭. আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিংবা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর আমেরিকা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সেই সাথে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা কোনো সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারবে না এবং আফগান ভূখণ্ডের ওপর কোনো ধরনের সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না।

৮. যদিও ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে 'কোনো জিহাদী দলকে আমেরিকা ও তাঁর মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি তৈরির সুযোগ দেওয়া হবে না' মর্মে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, একই সাথে এ ধরনের কোনো দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়ানোর বিষয়টিকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে, ইমারতে ইসলামিয়া নিজেই তা ঠিক করবে।

এমনইভাবে কোনো নির্যাতিত মুমিন যদি ইমারতে ইসলামিয়ার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাদের আশ্রয় দেওয়ার অধিকারও ইমারতের থাকবে।

## দোহা চুক্তি: পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

দোহা চুক্তি এমন কিছু বিষয়ের জন্ম দিয়েছে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। এই বিষয়গুলো এতটাই আশ্চর্যজনক যে, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে এগুলোকে যুক্ত করলে মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না। এমন কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো—

১. মানুষ হতবাক হয়ে যায়, যে তালেবান একসময় নিজেদের ক্ষমতা হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, শূন্য থেকে উঠে আসা সেই তালেবান এত বড় বিজয় কীভাবে অর্জন করল? তা-ও আবার এমন একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যার জাগতিক শক্তিমত্তার কারণে সে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র ও সুপার পাওয়ার হিসেবে স্বীকৃত? আমেরিকা ও তার ৪০টির বেশি মিত্রদেশ মিলে দীর্ঘ ২০ বছর যুদ্ধ করেও তালেবান ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সামরিক বিজয় অর্জন করতে পারেনি, এই কথা কি বিশ্বাস করার মতো? এত দীর্ঘ যুদ্ধের পর অবশেষে সৈন্য প্রত্যাহারের মতো লজ্জাজনক শর্ত মেনে নিয়ে এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হলো, দুনিয়ার তাবৎ গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক যে চুক্তিকে আমেরিকার পরাজয় বলে আখ্যায়িত করছে? অন্যদিকে মার্কিন জনগণের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একে আমেরিকার বিজয় বলে আখ্যায়িত করে বলছে, যে উদ্দেশ্যে আমেরিকা আফগান যুদ্ধ শুরু করেছিল, সে উদ্দেশ্য না-কি তারা হাসিল করে ফেলেছে, তাই এখন আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই। তার ভাষ্যমতে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের কারণ ছিল, শায়খ উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করা এবং আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করে জিহাদী দলগুলো যেন আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি তৈরি করতে না পারে—তা নিশ্চিত করা।

সুবহানাল্লাহ! এই যুদ্ধে আমেরিকা দুই ট্রিলিয়নেরও বেশি ডলার ব্যয় করেছে, ৬ হাজারেরও বেশি নিয়মিত ও চুক্তিবদ্ধ সৈনিক নিহত হয়েছে, হাজার হাজার সৈনিক আহত হয়েছে এবং আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে; যারা নিরাপদে দেশে ফিরতে পেরেছে, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে—আমেরিকার মতো শক্তিধর একটি দেশ এই সামান্য দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য এত এত ক্ষতি মেনে নিয়েছে—এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যার, সর্ববৃহৎ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি যার, সেই আমেরিকা কি চাইলে নিজের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মাধ্যমে এই দুটি

লক্ষ্য অর্জন করতে পারত না? এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এটাই বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলার কথাই সত্য। তিনি বলেছেন—

**اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ**

'যারা কুফরি করেছে, তারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সে সব তাদের পরিতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৬]

২. ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে সংলাপের জন্য যে শর্তগুলো দেওয়া হয়েছিল, শুধু এই শর্তগুলোই ছিল স্বতন্ত্র বিজয়ের শামিল। এগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, ইমারতে ইসলামিয়ার সামনে আমেরিকা কতটা অসহায় ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। শাসনব্যবস্থা থেকে ইসলামকে দূরে রাখার মতো কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত সুপার পাওয়ার আমেরিকা ইমারতে ইসলামিয়ার ওপর চাপিয়ে দিতে পারেনি, যেটা সে অন্যান্য অনেক সরকারের সাথে করেছে। সংলাপের আগেই ইমারতে ইসলামিয়া সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, শরয়ী শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে কোনো আলোচনা হবে না। যার কারণে আমেরিকা এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলারও সাহস পায়নি। অথচ আফগানিস্তানে আমেরিকার হামলা করার উদ্দেশ্যই ছিল তালেবানের শরয়ী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা।

৩. দোহা চুক্তির মাধ্যমে ইমারতে ইসলামিয়া নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অবাক করা বিষয় হলো, তাঁরা কেউই অভিজ্ঞ ও পোড়-খাওয়া রাজনীতিবিদ নন, আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে দক্ষ কোনো মনোবিজ্ঞানীও নন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সম্পর্কে বিস্তর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কোনো আইনবিদও নন, এমনকি তাঁদের কেউই হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড বা সরবোন ইউনিভার্সিটির মতো প্রথিতযশা কোনো ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটও নন; বরং তাঁরা সকলেই এমন একটি ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালিত হয় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত অনুযায়ী, যে ইউনিভার্সিটি তাদের শিখিয়েছে কীভাবে বীরপুরুষ তৈরি করতে হয়, কীভাবে নিজের অবস্থানে অনঢ় থাকতে হয়। 'ইউনিভার্সিটি অফ আফগান জিহাদ' হলো তার নাম। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে পরাজিত করার ক্ষেত্রে এই ইউনিভার্সিটির বিশ্বজোড়া সুনাম আছে। তাঁরা সকলেই জিহাদের ময়দান থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, যেখানে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তাঁদের শিখিয়েছে—ইজ্জত শুধুই আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্য।

৪. এমনই আরেকটি বিচিত্র বিষয় আমরা দেখেছি এই চুক্তিতে, যা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, ইমারতে ইসলামিয়া আমেরিকাকে অপমানিত অপদস্থ করে চূড়ান্তভাবে পরাজিত

করেছে। তা হলো—ইমারতে ইসলামিয়ার যে প্রতিনিধিগণ মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে সামনাসামনি বসে দোহা চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সিংহভাগই আমেরিকার হাতে বন্দি ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানকারী খোদ মোল্লা আব্দুল গনী বেরাদার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পাকিস্তানের দালাল সরকারের কারাগারে দীর্ঘ ৯ বছর বন্দি ছিলেন। আমেরিকার পক্ষ থেকে যখন নতুন করে আলাপ-আলোচনার আগ্রহ দেখানো হয়, তখন তালেবানের দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পরপর তিনি কাতারে অবস্থিত ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক অফিসের প্রধান নিযুক্ত হন এবং প্রায় দুই বছর দখলদার আমেরিকার সাথে বিভিন্ন মেয়াদে আলাপ-আলোচনা করেন। অবশেষে তাঁর নেতৃত্বেই দোহা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইমারতের প্রতিনিধিদলের মধ্যে গুয়ান্তানামো কারাগারের কয়েকজন সাবেক কয়েদিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মোল্লা আব্দুস সালাম যইফ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যিনি তালেবান সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমেরিকার সাথে আলোচনা শুরু হওয়ার পর ইমারতে ইসলামিয়ার আমীর শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদা হাফিযাহুল্লাহ নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে আরও পাঁচজন তালেবান নেতাকে কাতারস্থ ইমারতের রাজনৈতিক অফিসে নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকেও আমেরিকার সাথে সংলাপের দায়িত্ব নিয়োজিত প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার লাঞ্ছনাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই পাঁচজন গুয়ান্তানামো কারাগারে দীর্ঘ ১৩ বছর বন্দি ছিলেন। তালেবানের হাতে বন্দি মার্কিন সেনাসদস্য বো বার্গডালের বিনিময়ে ২০১৪ সালের জুনে তাঁদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন—

১. মোল্লা মুহাম্মাদ ফাযেল, উপমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (সাবেক চিফ অফ জেনারেল স্টাফ)।
২. মোল্লা নুরুল্লাহ নুরী, ভারপ্রাপ্ত সীমান্ত ও উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী (বলখ প্রদেশের সাবেক গভর্নর এবং উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের সাবেক প্রধান সমন্বয়ক)।
৩. মোল্লা খাইরুল্লাহ খায়েরখাহ, ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী (সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও হেরাত প্রদেশের সাবেক গভর্নর)।
৪. মোল্লা আব্দুল হক ওয়াসিক, তালেবান গোয়েন্দা বিভাগ (জিডিআই)-এর মহাপরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী (সাবেক সহকারী গোয়েন্দা প্রধান)।
৫. মোল্লা মুহাম্মাদ নবী উমরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী (সাবেক বর্ডার ব্রিগেড কমান্ডার)।

# জেলখানা থেকে দোহা চুক্তির প্রতিনিধিদলে[১০৪]



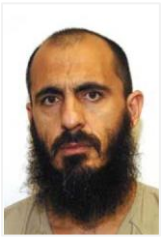
মোল্লা আব্দুস সালাম যইফ
হাফিযাহুল্লাহ



মোল্লা খাইরুল্লাহ খায়েরখাহ
হাফিযাহুল্লাহ



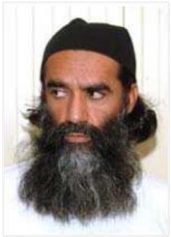
মোল্লা আব্দুল গনী বেরাদার
হাফিযাহুল্লাহ



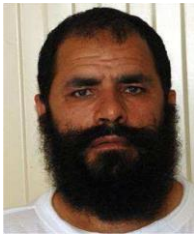
মোল্লা মুহাম্মাদ নবী
উমরী
হাফিযাহুল্লাহ



মোল্লা আব্দুল হক
ওয়াসিক
হাফিযাহুল্লাহ



মোল্লা নুরুল্লাহ নুরী
হাফিযাহুল্লাহ



মোল্লা মুহাম্মাদ ফাযেল
হাফিযাহুল্লাহ





মার্কিন সেনাসদস্য বো বার্গডাল, গুরুত্বপূর্ণ পাঁচজন তালেবান নেতার
বিনিময়ে যাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে

[১০৪] এই ৭ জনের মধ্যে মোল্লা আব্দুল গনী বেরাদার ছাড়া বাকি সকলেই গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দি ছিলেন। শেষের চারজনের ছবি কারাগারে থাকাকালে তোলা।

৫. এমনই আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, করোনা মহামারি শুরুর আগেই দোহা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার কী কুদরত! আমেরিকা যদি করোনার পরে চুক্তিতে স্বাক্ষর করত, তাহলে মানুষ মনে করত, তালেবানের জিহাদ নয়, করোনার কারণে আমেরিকা দুর্বল হয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো চাইছিলেন, আমেরিকাকে প্রথমে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাবেন, যেন সারা দুনিয়ার মানুষ দেখতে পায়, তালেবান মুজাহিদদের হাতে কীভাবে তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটেছে। এরপরে আল্লাহর সৈনিকদের মধ্যে খালি চোখে দেখা যায় না—এমন একটি ভাইরাসের হাতে আরও বড় ধরনের বিপর্যয় চাপিয়ে দিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বেন। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন—

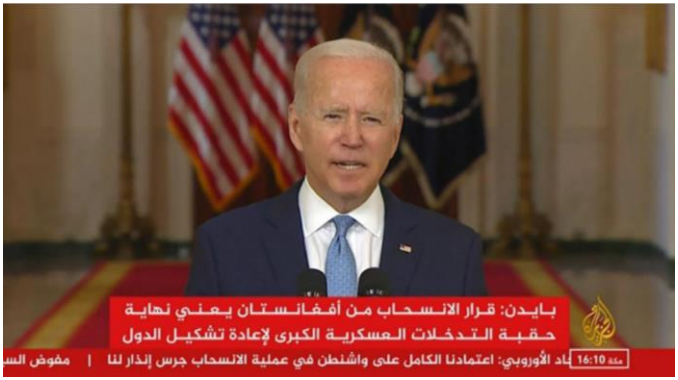
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ

‘আপনি বলে দিন, তোমরা আমাদের জন্য দুটি সুন্দর ফয়সালার কোনো একটির অপেক্ষা করছ। আর আমরা অপেক্ষা করছি, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি দেবেন, কিংবা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি।’ [সূরা তাওবা (৯) : ৫২]

দোহা চুক্তির শর্তানুযায়ী ২০২১ সালের ৩১শে আগস্ট এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাবাহিনীর সর্বশেষ ইউনিটের প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। এর কিছুদিন পর অন্য এক বক্তব্যে ঐতিহাসিক আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দিয়ে বাইডেন বলে—‘সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুধু আফগানিস্তান-কেন্দ্রিক নয়; বরং এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা আমাদের বৃহত্তর সামরিক অপারেশনগুলোর ইতি টানছি।’

অর্থাৎ সরকার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন দেশে আমেরিকা এতদিন যে হস্তক্ষেপ করে এসেছে, তার সমাপ্তি ঘটেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে এমন ঘোষণা আসা এটাই প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. তো এটাই চেয়েছিলেন। বর্তমানে আমরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে পরিবর্তন দেখছি, বিভিন্ন দেশ মার্কিন আধিপত্যবাদ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে—এ সবকিছুই শায়খের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীকেই সত্য প্রমাণ করছে। এতকিছুর পরেও কি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে, ৯/১১ হামলার মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তির সূচনা হয়েছে?




আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সামরিক হস্তক্ষেপের ইতি টানছি। —বাইডেন

## গুণীজনের দৃষ্টিতে দোহা চুক্তি : শিক্ষা নাও, হে আরবজাতি

সিরিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ডক্টর মোস্তফা ইউসুফ লাদাবী আস-সুমুদ ম্যাগাজিনের ১৬৯তম সংখ্যায় এক প্রবন্ধে দোহা চুক্তির ফলাফলের ব্যাপারে মন্তব্য করে লিখেছেন—

‘তালেবান দুই দশক ধরে মার্কিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে আর দুই বছর তাঁদের সাথে সংলাপ করেছে। এই দুই বছরের সংলাপে তাঁরা যা চায়, তা অর্জন করে ফেলেছে; তাঁদের এতদিনের সংগ্রাম সফল হয়েছে। নিজেদের পুরো ভূমিটাই দখলদারদের থেকে উদ্ধার করেছে, এক ইঞ্চি মাটিও তারা দখলদারদের কাছে ছাড়তে রাজি হয়নি, নিজেদের ভূমিকে ভাগাভাগি করে নিতেও রাজি হয়নি; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কোনো মার্কিন সৈনিকের উপস্থিতি তারা মেনে নেয়নি, কোনো কিছুর বিনিময়েই মার্কিন উপস্থিতির সাথে আপস করেনি; আন্তঃআফগান সংলাপ কিংবা জাতীয় কোনো বিষয়ে আমেরিকার যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছে। সাহসিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করে তাঁরা বলেছে, আমেরিকা যদি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে অথবা নিজ থেকে তাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে, তাহলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার অধিকার তাঁদের থাকবে। তালেবানের এই বিজয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, শত্রু কেবল শক্তিধরকেই সমীহ করে চলে; যারা তাকে আঘাত করতে পারে না, ধ্বংস করতে জানে না, কষ্ট দিতে জানে না, তাদের সাথে সে আলোচনায়ও বসতে রাজি না। যারা হাতিয়ার ফেলে শত্রুর তোষামোদ করতে শুরু করে, তাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি

করে, তাদের নিরাপত্তা দেয়, শত্রুর আঁচলের নিচে আশ্রয় নিয়ে তার বেগার খাটতে পছন্দ করে, তার ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস রাখে, তাদের সাথে শত্রু কখনো আপস করে না। তাই, কেউ যদি আলাপ-আলোচনার পথে অগ্রসর হতে চায়, দুর্বলতা নিয়ে যেন এ পথে অগ্রসর না হয়, শত্রুর চাপিয়ে দেওয়া কোনো শর্তের সামনে যেন মাথানত না করে, হাতিয়ার যেন ফেলে না দেয়, যুদ্ধের পোশাক যেন খুলে না রাখে; বরং আলোচনা চাইলে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে যেন আলোচনায় বসে, হাতে বন্দুক রেখে যেন টেবিলে যায়। কারণ, শত্রু দুর্বলের সাথে আলোচনায় বসে না।'

আস-সুমুদের একই সংখ্যায় আল-জাযীরার প্রতিনিধি তাইসীর আল্লুনী মন্তব্য করে বলেছেন—

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলোচনার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি আমেরিকার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে বড় মাপের একটি পরাজয়। যাদেরকে তারা এতকাল 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, মার্কিন নেতারা যাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার হুমকি-ধমকি দিয়েছে, ২০০১ সালে জর্জ বুশ, ডিক চেনি ও রামসফেল্ড প্রকাশ্যেই যাদের হুমকি দিয়েছে, সেই তালেবান 'সন্ত্রাসীদের' সাথে আলোচনার জন্য আমেরিকা তাদেরই রাজনৈতিক কার্যালয়ে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। আর এই মার্কিন প্রতিনিধি তালেবানকে যোগ্য প্রতিপক্ষের মর্যাদা দিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করছে। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তালেবানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কোনো সামরিক বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর আমেরিকা নিজের মানসম্মান বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই, খলিলজাদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেভাবেই হোক আমেরিকার ভাবমূর্তি রক্ষা করে সম্মানজনক কোনো চুক্তির মাধ্যমে যেন আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে বের করে আনে। যাতে ওয়াশিংটন দেশের নাগরিকদের সামনে বলতে পারে, 'আমরা আফগানিস্তানে এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছি' অথবা 'আমরা চলে এলেও আফগানিস্তানকে মূল্যবান অনেক কিছুই আমরা দিয়ে এসেছি'। এ কারণেই সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানের শাসনব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে এবং তাতে তালেবানের অংশগ্রহণ কতটুকু থাকবে, তা ঠিক করে দেওয়ার জন্য খলিলজাদ বারবার একটি রূপরেখা চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু, সে ভালোভাবেই জানত, বিদেশি শক্তি চলে যাওয়ার পর থেকে আফগানিস্তানের শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হবে এবং তালেবানই যেহেতু সবচেয়ে শক্তিশালী দল, তাই তারা নিজেদের মতো করেই শাসনব্যবস্থা চালাবে।'

ব্লগার তারেক মুতাইরী তাঁর এক টুইটে লিখেছেন—

'আমেরিকার দৃষ্টিতে যে তালেবান এতদিন 'সন্ত্রাসী' সংগঠন ছিল, কী এমন হলো যে, সেই সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে বসে আমেরিকা এখন শান্তিচুক্তি করছে? এটা গণতন্ত্র

কিংবা মানবাধিকারের কারিশমা না, আদর্শ ও আইডিওলজির ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেও এটা তারা অর্জন করেনি; বরং এই অর্জনের একমাত্র কারণ হলো হকের পথে জিহাদ ও কিতাল। তাঁদের থেকে শিক্ষা নাও, হে আরবজাতি। তালেবানের জাগতিক সক্ষমতা কতটুকু? তাঁদের কি হাজার হাজার যুদ্ধবিমান আছে? হরেক রকমের অস্ত্র বা গোলাবারুদ আছে? কোনো সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজ আছে? ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে? কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আছে? সুবিশাল কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে? আন্তর্জাতিক কোনো মিত্র আছে? বিলিয়ন ডলারের বাজেট আছে? আমেরিকার সাথে কোনো দিক থেকে কি তাদের ক্ষমতার সামান্যতম ভারসাম্য আছে? কিছুই নেই। এ সব শর্তের কথা তারাই শোনায়, যারা কাপুরুষের মতো বসে থাকতে চায় আর অন্যদের বাধা দিতে চায়। তালেবান এ সব অযৌক্তিক শর্তের ধার ধারেনি, তাই আজ তারা বিজয়ী হয়েছে।'

আস-সুমুদের ১৭৬তম সংখ্যায় তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. মেহমেদ কানবিকলির একটি টুইটের লেখা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

'মার্কিনিরা মোল্লা মুহাম্মাদ নবী উমরীকে বন্দি করে হাতকড়া পরিয়ে যখন জেলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন হয়তো চিৎকার করে গালিগালাজও করেছিল, পৃথিবীর ভয়ংকরতম সন্ত্রাসী বলে বলে তাঁকে ডেকেছিল, নানাভাবে হেনস্তা করেছিল। এরপর সময়ের চাকা ঘুরে এমন একটি দিন আসল, যখন আমেরিকার সেই সাবেক কয়েদি সেনাপ্রত্যাহারের শর্তে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনার টেবিলে বসল। হা-হুতাশ করে কখনো বিজয় অর্জন করা যায় না; বিজয় তারই পদচুম্বন করে, যে বিজয় অর্জনের জন্য দীর্ঘ সফরের কষ্ট অম্লান বদনে মেনে নেয়।'

আস-সুমুদের একই সংখ্যায় বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল বারী আতওয়ানের মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন—

'তালেবানের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লাঞ্ছিত অপদস্থ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে-মুখে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনীকে নিরাপদে বের হতে দেওয়ার আকুতি—এই দৃশ্যের মধ্যে আরব, বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। তালেবানকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি, তাঁদের নেতাদের কোনো প্রাইভেট প্লেন নেই, তাঁরা রেশমি কাপড়ের দামি জামাও পরেন না, মিথ্যা কী জিনিস তাঁরা জানেন না। এ জন্যই তাঁরা বিজয়ী হতে পেরেছেন, আমেরিকাকে নিজেদের শর্ত মানতে বাধ্য করতে পেরেছেন।'

## তবু কি এটা পাগলামি?

আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ যখন তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, মানুষ মুজাহিদদের পাগল বলে গালি দিত। এরপর যখন শায়খ উসামা রহ. আমেরিকাকে 'কাগজের বাঘ' বলে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন, তখনও মানুষ সেই আগের আচরণ করতে লাগল। তারা যেন বেমালুম ভুলে গেল, একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই কয়েক বছর আগে মুজাহিদগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে। মানুষ মুজাহিদদের ব্যাপারে বলতে লাগল, 'লোকগুলো ধর্মের নামে ধোঁকায় পড়ে গেছে'। কেউ কেউ বলতে লাগল—'তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? কল্পনার রাজ্যে বাস করছ? হাওয়ায় ফসল ফলানোর চিন্তা করছ? আমেরিকার সাথে তোমরা কীভাবে যুদ্ধ করবে? তোমাদের তো বাঁচার কোনো উপায়ই নেই দেখছি, আমেরিকা তো তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠ থেকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে।' এ ধরনের আরও কত কথা! যুদ্ধের শুরুর দিকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তো স্পষ্ট ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল—'We will smoke them'।

এই যুদ্ধের ব্যাপারে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি এমনই ছিল। কিন্তু ঈমান যাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে, যারা এই দীনের প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, এই সংঘাতের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর সাহায্য থাকলে বড় বড় দলের ওপর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলও বিজয়ী হতে পারে।

সীরাতের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, চাচা আবু তালেবের ইন্তেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের কাছে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন এবং তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, 'আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারব না। কারণ, পারস্য সম্রাট আমাদের আশ্রয় দিয়েছে; তাকে উপেক্ষা করে কাউকে আশ্রয় দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'আমার সাথে ওয়াদা করো, আল্লাহ তাআলা যদি পারসিকদের ওপর তোমাদের বিজয় দান করেন, তাদের নারীদেরকে তোমাদের স্ত্রী বানিয়ে দেন এবং তাদের ছেলেদেরকে তোমাদের গোলাম বানিয়ে দেন, তাহলে এর কৃতজ্ঞতা হিসেবে তোমরা ৩৩ বার আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে (সুবহানাল্লাহ পড়বে), ৩৩ বার আল্লাহর প্রশংসা করবে (আলহামদুলিল্লাহ পড়বে) এবং ৩৪ বার আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে (আল্লাহু আকবার পড়বে)।' তারা বলল, 'আপনি কে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল।' তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে চলে আসেন।

নবীজীর চাচা আবু লাহাব সব সময়ই তাঁর পেছনে লেগে থাকত এবং মানুষ যেন রাসূলের কথা না শোনে, সে চেষ্টা করত। এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে আসার পর আবু লাহাব তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এই লোকটিকে চেনেন?' সে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি। সে আমাদের বংশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন মানুষ। কিন্তু, আপনারা তাঁর কোন বিষয়ে জানতে চান?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ আগে তাদের যা যা বলেছিলেন, তারা সবিস্তারে তা আবু লাহাবকে শোনাল এবং বলল, 'তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল দাবি করলেন।' আবু লাহাব বলল, 'তাঁর কথায় কান দেবেন না, সে পাগল। মাথার সমস্যার কারণে সে আবোল তাবোল বকে।' তারা বলল, 'তিনি যখন পারসিকদের ওপর আমাদের বিজয়ী হওয়ার কথা বললেন, তখনই আমরা বিষয়টি ধরতে পেরেছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং পারস্যের ব্যাপারে তিনি যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, বকর বিন ওয়ায়েল সেগুলোকে পাগলামি বলেই ধরে নিয়েছিল। কারণ, তৎকালীন সময়ে পারস্য ছিল সুপার পাওয়ার, বিশ্বের প্রভাবশালী দুই সাম্রাজ্যের একটি। আরবরা পারসিকদের বানানো আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা কল্পনাও করতে পারত না।

বিভিন্ন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন, অভাব-অনটন আর প্রচণ্ড দুর্বল অবস্থাতেও কীভাবে আল্লাহর ওয়াদার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হয়। এই গুণটিই মুমিন ও মুনাফিককে আলাদা করে। এমন একটি ঘটনা গযওয়ায়ে আহযাবেও ঘটেছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখন পরিখা খনন করছিলেন, তখন একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে শাম, পারস্য আর ইয়েমেন বিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই সুসংবাদ দিচ্ছিলেন, তখন মুসলিমরা করুণ পরিস্থিতির শিকার। ক্ষুধা-পিপাসা আর শত্রুর আক্রমণের ভয়ে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁরা প্রকৃত মুমিনের মতো দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই সুসংবাদগুলোকে গ্রহণ করলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, এই সুসংবাদ এমন ব্যক্তির জবান থেকে নির্গত হয়েছে, যিনি নিজ থেকে কিছু বলেন না; আল্লাহর পক্ষ থেকে যা ওহী আসে, তিনি শুধু তা-ই বলেন। পক্ষান্তরে এই সুসংবাদের কথা শুনে মুনাফিকরা বলাবলি করছিল—'মুহাম্মাদের কথা শুনে কি তোমরা অবাক হচ্ছ না? এখানে আমরা নিরাপদে

বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজনটুকু সারতে পারছি না, আর সে আমাদের কাবা তাওয়াফ করা আর পারস্য ও রোম সম্রাটের ধনভান্ডার দখল করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আল্লাহর কসম, সে আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে।'

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-ও প্রতিকূল পরিবেশে ঘাবড়ে যাননি; বরং সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, যে কথা শুনে যে-কারো অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা। তাঁর এই দুর্দমনীয় অবস্থান সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেছিলেন—'আল্লাহ আমাদের বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন আর আমেরিকা আমাদের পরাজয়ের হুমকি দিয়েছে, আমরা দেখব, দুই ওয়াদার কোনটি সত্য হয়।'

আমীরুল মুমিনীন বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে যে আগুন লাগবে, তা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তবু তিনি নত হননি, আত্মসমর্পণ করেননি, দীনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি হননি। অন্যরা যখন তাঁকে প্রেসিডেন্ট বুশের হুমকির কথা বলে ভয় দেখাল, তিনি এতটুকু ভয় না পেয়ে ঐতিহাসিক এই কথাটি উচ্চারণ করলেন। আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আল্লাহ তাআলাই তো বলেছেন—

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'আর মুমিনদের সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের ওপরেই নিয়েছি।' [সূরা রুম (৩০) : ৪৭]

হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এবার শান্তিতে ঘুমান। আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন, তার বাহিনীকে বিজয় দান করেছেন, কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। আপনার কথাগুলো আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়া তাকিয়ে দেখছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির অধিকারী, সুপার পাওয়ার আমেরিকা আফগানিস্তানের মাটি থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে; ঠিক যেমন তার পূর্বসূরীরা এই মাটি থেকে পরাজিত হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ও তার সহযোগীরা যে সুবিশাল সেনাবহর আর সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আফগানিস্তানে এসেছিল, তা তাদের কোনো কাজেই আসেনি। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বড় আক্ষেপের সাথে স্বীকার করে নিয়েছে, এই একটি শিক্ষা পেতে তাদের বিশটি বছর লেগে গিয়েছে। সে বলেছে—'চলমান ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করছে যে, কোনো সামরিক শক্তির পক্ষেই আফগানিস্তানে স্থায়ীভাবে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কারণ আফগানিস্তান বাস্তবেই সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান।'

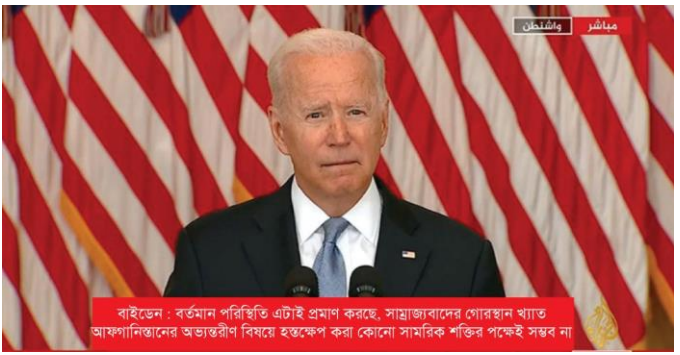
হে আমীরুল মুমিনীন, আফগানিস্তানের পাড়া-মহল্লা মার্কিনিদের নাপাকি থেকে পবিত্র হয়েছে, আবারও প্রতি ইঞ্চি মাটিতে ইমারতে ইসলামিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সব রিসার্চ সেন্টার, থিংক ট্যাংক আর মানবাধিকার সংস্থা দাবি করেছিল, মার্কিন সেনাপ্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে বিশৃঙ্খলা শুরু হবে, মার্কিনিদের সহযোগীদের ধরে ধরে হত্যা করা হবে, তাদের রক্তে আফগানিস্তানের রাস্তা লাল হয়ে যাবে, তাদের সে সব দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তালেবান মক্কা বিজয়ের নববী আদর্শ অনুসরণ করে কাবুল বিজয়ের দিনকে ক্ষমার দিন বলে ঘোষণা দিয়েছে, ক্রুসেডারদের যারা সহযোগিতা করেছে, তাদের জন্যও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়েছে—اذهبوا فأنتم الطلقاء (যাও, তোমরা মুক্ত)।

কিন্তু আফগানিস্তানের পবিত্র মাটি মুনাফিকদের ভার বহন করতে চায়নি, ইমারতে ইসলামিয়ার ছায়াতলে যারা জীবনযাপন করতে চায় না, আফগানের মাটিও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কাফেরদের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য বর্ডার ক্রসিং আর কাবুল বিমানবন্দরে এমন হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল, নাউযুবিল্লাহ।

হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার দুঃসাহসী বীর সৈনিকরা সাদামাটা আফগানি বেশভূষা আর লম্বা দাঁড়ি ও পাগড়ি নিয়ে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের তাকবীর ধ্বনিতে দুনিয়ার সকল জালেম ও স্বৈরাচারের অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। দীর্ঘ এই যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সবক তাঁরা হাসিল করতে পেরেছেন, তা হলো—আদর্শের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং তাগুত ও অহংকারী আইয়িম্মাতুল কুফরের সামনে নত না হওয়া-ই হলো আসল বিজয়।




কাবুলের প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস থেকে তালেবান মুজাহিদদের
বিবৃতি প্রদানের ঐতিহাসিক মুহূর্ত




আফগানিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান হিসেবে মেনে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বীকারোক্তি

## ক্রুসেডারদের সহযোগী হাজারো আফগানের আফগানিস্তান ত্যাগের আগ মুহূর্তের কিছু ছবি







## মা'রাকাতুল আহরার

'মা'রাকাতুল আহরার' নামের একটি মূল্যবান বই পদে পদে আমাকে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। বইটি লিখেছেন আহমাদ সামীর। বইয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো, মুসলিম ভূখণ্ডগুলো এখনো উপনিবেশই রয়ে গেছে, আমাদের স্বাধীন কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই, আমাদের ধনসম্পদ এখনো অন্যরা লুটেপুটে খাচ্ছে, আমরা এমন এক বিশ্বব্যবস্থায় বাস করছি, যা শত্রুর বানানো নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছিল—'এই খেলার নিয়ম আমরা বানিয়েছি, আমাদেরও সে নিয়ম মেনেই খেলতে হবে, তাদেরও সেই নিয়ম মেনেই খেলতে হবে।'

এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের দুটি পথ আছে, তৃতীয় কোনো পথ নেই। হয়তো আমরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব এবং আমাদের ওপর চেপে বসা ভিনদেশি আধিপত্যবাদকে ধ্বংস করব। এই পথ বেছে নিলে সকলকেই যুদ্ধে নামতে হবে, না দেখার ভাণ ধরে নির্লিপ্ত থাকা যাবে না এবং যে-কোনো পরিণতি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ পথ যদি আমরা গ্রহণ না করি, তাহলে দ্বিতীয় পথ হলো নীরবে সব সহ্য করে নিতে হবে এবং সমাজের দীনী ও দুনিয়াবি অধঃপতন দেখেও কোনো অভিযোগ করা যাবে না।

পাঠকদের জন্য মা'রাকাতুল আহরার বই থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো—

> 'আপনি কি আগে কখনো দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করেছেন? নিজেকে কখনো প্রশ্ন করেছেন দুনিয়াতে আসলে কী হচ্ছে? আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলার নিয়মগুলো কারা তৈরি করেছে আর কীসের ভিত্তিতেই বা তৈরি করেছে? একবারও কি আপনার খটকা লেগেছে, আমরা বড় এক মিথ্যার মধ্যে বসবাস করি আর কিছু মানুষ চায়, আমরা এই

মিথ্যাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি? আপনার কি কোনোদিন এই আশা জেগেছে যে, পৃথিবীটা বদলে যাক, আমাদের বসবাসের উপযোগী ভিন্ন এক পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করুক? যদি আপনি উপলব্ধি করে থাকেন, যে দুনিয়ায় আমরা বাস করছি, তাতে কোথাও গণ্ডগোল আছে, তাহলে এই বইটি আপনার সামনে আরও অনেক কিছুই স্পষ্ট করে দেবে। আর যদি অধঃপতিত এই বাস্তবতার মধ্যে থেকেও আপনি তা অনুভব করতে না পারেন, তাহলে বইটি পড়ার আগে আরও একবার চিন্তা করে দেখুন।

চলুন তবে, গল্পের গোড়া থেকে শুরু করি।

সালটা তখন ১৯৪৫। সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয়েছে। আমেরিকা ও মিত্রশক্তির অন্যান্য দেশগুলো নতুন বিশ্বের সম্পত্তি ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। স্মরণকালের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার নেশা কি আর এত সহজে কাটে! বিজয়ী শক্তিগুলো বিশ্ব মানচিত্রকে সামনে রেখে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে মানচিত্র নতুন করে সাজালে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের স্বার্থ হাসিল হবে। বেশ চিন্তাভাবনার পর তারা একটি ওয়ার্ল্ড অর্ডার (বিশ্বব্যবস্থা) তৈরি করল। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে তুলনামূলক ভারসাম্য বজায় রেখে এই বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করা হলো। পূর্বদিকে আছে মিত্রশক্তির শক্তিশালী সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর পশ্চিমে আছে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। কিন্তু এই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেও পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেমে থাকেনি। সোভিয়েত ও আমেরিকার দ্বন্দ্ব এতটাই চরমে পৌঁছে যায় যে, ১৯৮৯ সালে দুই মেরুর সীমান্তরূপী বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়। এর কিছুদিন পর সোভিয়েত ইউনিয়নও ধ্বংস হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গোটা পৃথিবী নতুন এক যুগে প্রবেশ করে। পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার জন্ম হয়। এই বিশ্বব্যবস্থায় পুরো বিশ্বের একক নেতৃত্ব আমেরিকার হাতে চলে আসে। বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য পাওয়ার সাথে সাথেই ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইরাকের আগ্রাসন থেকে কুয়েতকে মুক্ত করার অজুহাতে আমেরিকা তার সুবিশাল সেনাবহর নিয়ে আমাদের মাটিতে এসে ঘাঁটি গাড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার উপস্থিতি স্পষ্টভাবে এটাই ঘোষণা করছিল যে, এখন থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং এর সব প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো। এটি ছিল আমেরিকার বৈশ্বিক আধিপত্যের সবচেয়ে বড় আলামত। কারণ, মধ্যপ্রাচ্য সাধারণ কোনো অঞ্চল নয়, ভূরাজনৈতিকভাবে এর অবস্থান যেমন পুরো বিশ্বের কেন্দ্রে, তেমনই এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশাল ভান্ডার। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলের প্রতি শক্তিধরদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু পুরোনো বিশ্বব্যবস্থায় আমেরিকার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নের কারণে আমেরিকা এ অঞ্চলে আগ্রাসন চালানোর

সুযোগ পায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তার সামনে সে সুযোগ চলে আসে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তখনই সে মধ্যপ্রাচ্যে সেনা মোতায়েন করে এবং এই আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে আরবের গোলাম শাসকদের সাথে চুক্তিও করে ফেলে। এভাবে ঘুমন্ত আরব জাতির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন না হয়েই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে নিজের দখলদারিত্বকে শক্তিশালী করে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ধ্বজাধারী আমেরিকার দৃষ্টিতে আমাদের এই ভূখণ্ড লুটতরাজের অভয়ারণ্য এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত বাজার ছাড়া কিছুই না। বিশ্বের ওপর মার্কিন আধিপত্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এ জন্যই আরব জাতির স্বাধীনচেতা মনোভাব জাগিয়ে তোলার যে-কোনো সম্ভাবনাকে তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করে। তাদের এই নীতির কারণেই আরবের কোনো দেশই স্বনির্ভর হতে পারেনি, সবাই পরনির্ভরশীল। গম উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভর নই, ওষুধ ও অস্ত্রও অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয়, পারমাণবিক অস্ত্রের মতো উল্লেখযোগ্য কোনো অস্ত্রও নেই আমাদের। এগুলোর কোনো একটির ক্ষেত্রেও আপনি স্বনির্ভরতা অর্জন করতে যাবেন, নানাভাবে আপনাকে বাধা দেওয়া হবে। যেন তাদের বানানো সিস্টেমের গোলামি থেকে কখনো বের হতে না পারেন, আজীবন শুধু তাদের সেবা করে যাবেন, তাদের কর্তৃত্ববাদী পলিসি মেনে চলবেন আর জড়বস্তুর মতো তাদের বিশ্বশাসনের হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করে যাবেন।

তিক্ত হলেও সত্যটা সকলের জানা থাকা উচিত। প্রকৃত বাস্তবতা হলো—আমাদের দেশগুলো এখনো পরাধীন, চেপে বসা নব্য উপনিবেশবাদের থাবায় জর্জরিত, আমাদের স্বাধীন কোনো ইচ্ছা নেই, আমাদের ধনসম্পদ উপনিবেশবাদীরা ইচ্ছেমতো লুট করছে, আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যা শত্রুর বানানো নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। পুরোনো ঔপনিবেশিক শক্তির সামরিক আগ্রাসন শেষ হওয়ার পর আমাদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা পুরোটাই ছিল ধোঁকা। এটা কোনো স্বাধীনতা না, স্বাধীনতার নামে কাল্পনিক এক মোহে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে আমাদের। প্রকৃতপক্ষে সবদিক থেকে আমরা আজও পরাধীন। আমাদের সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি সবকিছুই অন্যের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি সামরিকভাবেও আমরা আগ্রাসনের শিকার। পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক মজুদ যে ভূখণ্ডে, সে ভূখণ্ডের বাসিন্দা হয়েও আমরাই সর্বাধিক দরিদ্র। এই দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমাদের ওপর নব্য উপনিবেশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ শোষণের ফলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশগুলোর ধ্বংসাবশেষের ওপর আমরা এখন বাস করছি আর পশ্চিমারা সেই ধ্বংসস্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অবশিষ্ট সম্পদটুকুও

প্রতিনিয়ত শুষে নিচ্ছে। এই তামাশা বন্ধ করারও কেউ নেই। বন্ধ করা তো দূরের কথা, জাতির এই দুরবস্থা নিয়ে চিন্তা করার মতো মানুষও নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এই পরিস্থিতির কথাই বলে গিয়েছেন—

يُوشِكُ أن تَدَاعَى عليكم الأممُ من كلِّ أُفُقٍ ، كما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها

'শীঘ্রই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সেভাবে ডাকাডাকি করবে, বড় একটি থালায় কয়েকজন খেতে বসে যেভাবে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।' [সুনানে আবু দাউদ : ৪২৯৭]

আমাদের জাতি বর্তমান পরিস্থিতিকে কীভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসেবে গ্রহণ করে নিল? দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পায়—এটা কি কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায়? সবাই জানে, আমাদের এই অঞ্চল পুরো পৃথিবীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস। সারা দুনিয়ার মধ্যে খনিজ তেলের সবচেয়ে বড় মজুদ আমাদের এখানেই, আরও নানা ধরনের খনিজ সম্পদের বিপুল ভান্ডার আমাদের এ অঞ্চলের মাটিতেই লুকিয়ে আছে। এ ছাড়াও পানি, কৃষি ও প্রাণীসম্পদের উপস্থিতি তো আছেই। ভৌগোলিকভাবেও আমাদের এই ভূখণ্ড পুরো পৃথিবীকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করেছে। বিশ্বরাজনীতি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রণালি ও খাল আমাদের এ অঞ্চলেই অবস্থিত (হরমুজ প্রণালি, আল-মানদেব প্রণালি, জিব্রাল্টার প্রণালি ও সুয়েজ খাল)। এগুলোর উপস্থিতিই অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে এ অঞ্চলের গুরুত্বের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারপরেও আমরাই সবার চেয়ে পিছিয়ে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে শুধু একটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে কেউ আমাদের বাধা দিতে পারত না, কিন্তু এখন এতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েও আমরাই লাঞ্ছিত। অদৃশ্য থেকে কেউ একজন আমাদের দমিয়ে রাখছে!

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিবর্তনকে যতটা সহজভাবে উপস্থাপন করে, বাস্তবে ততটা সহজ না। প্রকৃত পরিবর্তন আনতে চাইলে স্বাধীনতার জন্য পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ করতে হবে। চিন্তার দাসত্ব থেকে শুরু করে ক্ষমতার দাসত্ব—সব দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। যে উপনেবশবাদ আমাদের ওপর চেপে বসেছে, তা থেকে বাস্তব স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। শুধু কিছু চেহারা বা নাম বদলালে এই স্বাধীনতা অর্জন হবে না। চেহারা ও নাম বদলানোর স্বাধীনতা তো খোদ দখলদাররাই দিয়ে রাখবে, কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তন আর স্বাধীনতা তাদের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যে স্বাধীনতা খাদ্যদ্রব্যে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতা এনে দেবে, শত্রুদের মতো আমাদেরও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হতে দেবে, মার্কিন সহায়তার নামে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অস্ত্র নয়, বরং আমাদের ইচ্ছামতো অস্ত্র

আমাদের মাটিতেই তৈরি করার সুযোগ দেবে, এই মাটির প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা এই মাটির বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেবে, তারা নিজেদের উপকারে তা ব্যয় করতে পারবে আর আমাদের জাতি নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে, সেটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা আমাদের সমাজ ও শাসকদেরকে দীনের অনুগামী বানাবে, কোনো বহিঃশক্তির মন জুগিয়ে তারা চলবে না, সেটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। মোটকথা, আমাদের তো সেই পরিবর্তনই দরকার, যে পরিবর্তনকে তারা অসম্ভব বলে প্রচার করে। যে পরিবর্তন আমাদের মাটি ও মানুষের ওপর চেপে বসা বহিঃশক্তির আধিপত্যকে খর্ব করবে, সে পরিবর্তনই হলো প্রকৃত পরিবর্তন আর যে পরিবর্তন বহিঃশক্তির আধিপত্যকে ধ্বংস করার ব্যাপারে চিন্তা করবে না, তা পরিবর্তনের নামে প্রতারণা এবং মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। এমন ধোঁকাবাজের সংখ্যাই এখন বেশি।

বহিঃশক্তির আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব কোনো বিষয় না, কিন্তু এটি দীর্ঘ একটি যুদ্ধ। জাতি যদি নিজেকে এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ থেকে দূরে রাখে, তাহলে সমাজের দীনী বা দুনিয়াবি কোনো অধঃপতনেই তারা আর অভিযোগ করবে না, ধীরে ধীরে অনুভূতিশূন্য হয়ে যাবে। মানুষ যদি এই 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'-কে যথাযথভাবে বুঝতে না পারে এবং এই যুদ্ধের যে-কোনো পরিণতি মেনে নিয়ে তাতে অংশগ্রহণ করার হিম্মত না করে, তাহলে পরিবর্তনের এই ইচ্ছা চিরকালই কল্পনা থেকে যাবে। সময়ের সাথে সাথে কল্পনার এই তালিকাও বড় হতে থাকবে।

স্বাধীনতাকে যদি আমরা যথাযথভাবে না বুঝি, তাহলে স্বাধীনতার অসম্পূর্ণ একটি ধারণা-ই আমাদের মধ্যে আজীবন রয়ে যাবে। আমরা মনে করি, স্বাধীনতা মানে ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি মাটি দখলদারদের থেকে মুক্ত থাকা। প্রকৃতপক্ষে একটি জাতি স্বাধীন হওয়ার অর্থ শুধু ভূখণ্ড স্বাধীন হওয়া নয়; বরং কোনো জাতি যখন নিজের আদর্শ ও মূল্যবোধ সামনে রেখে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে, যে জাতির সিদ্ধান্তে কোনো বহিঃশত্রু হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যে জাতির অর্থনীতির ওপর কোনো বহিরাগতের নিয়ন্ত্রণ চলে না, যে জাতির কোনো পদক্ষেপেই কোনো বাধানিষেধ থাকে না, তারাই হলো স্বাধীন জাতি। স্বাধীন জাতি তো তারা, যারা কথা বললে, সবাই তাদের কথা শোনে; চুপ থাকলে, সবাই তটস্থ থাকে; আর সিদ্ধান্ত দিলে, সকলেই সে সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকে। এটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সবার আগে এই বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে। এটিই হলো এই স্বাধীনতার একমাত্র পথ। আর এই বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য সবার আগে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে একে উৎখাত করতে হবে। আমরা যদি মানুষের মস্তিষ্ক থেকে একে উৎখাত করতে পারি, তাহলে দুনিয়ার বাস্তবতা থেকে সহজেই এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এর জন্য 'আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি' নামক বিষয়টির বাস্তবতা

ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটি যদি ভালোভাবে বুঝতে পারি, তাহলে চিরকালের জন্য আমাদের মস্তিষ্ক থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাবে।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে ধোঁকার ওপর। এই বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা বোঝার জন্য এবং আমরা যে মিথ্যা এক দুনিয়ায় বাস করছি, তা অনুধাবনের জন্য মাত্র কয়েক মিনিটের চিন্তাই যথেষ্ট।

ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—আমরা সবাই জানি যে, টেলিভিশনে আমরা যা দেখি, যে রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো শুনি, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক যে খবরাখবর আমরা দেখি, এগুলো মূলত তাদেরই বানানো। তারা চেয়েছে, আমরা যেন এভাবে দেখি, তাই আমাদের সামনে এভাবে তা উপস্থাপিত হয়েছে। সবাই বোঝে, যা দেখা যায়, তা কিছুই না। আসল খেলা তো চলে পর্দার পেছনে। যার যত ক্ষমতাই আমরা দেখি না কেন, আসল ক্ষমতা নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতেই কুক্ষিগত। মানুষ এ বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে বলেই এখন আর তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা বুঝতে পেরেছে, এই বিশ্বব্যবস্থা যতদিন আপন গতিতে চলবে, ততদিন পরিবর্তন বলতে কিছুই হবে না।

এই বিশ্বব্যব্যবস্থাকে আমরা হলিউডের সিনেমা মনে করতে পারি। সিনেমার পরিচালকই মূলত সকলের ভূমিকা ঠিক করে দেয় কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে। টেলিভিশনের পর্দায় আপনি যা কিছু দেখেন, তা কিন্তু বাস্তব না, কিন্তু পরিচালক এগুলোকে বাস্তব হিসেবে দেখাতে চান বলেই আপনি তার বানানো অবাস্তব চিত্রকেও চোখের সামনে বাস্তবে হতে দেখেন। সিনেমার নায়ক 'নায়ক' হতে পেরেছে, কারণ পরিচালক তাকে নায়কের ভূমিকা দিয়েছে। পরিচালক চেয়েছে, সিনেমার কোনো এক চরিত্রকে আপনি মারা যেতে দেখবেন, তাই সেই চরিত্র মারা যাচ্ছে। বাস্তবে এরা কেউই কিন্তু নায়ক বা মৃত না। আপনি যেহেতু টেলিভিশনের পর্দায় সিনেমা দেখছেন, তাই এই সিনেমার পেছনে কত ক্যামেরা ছিল, কত ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট ছিল, কত ক্রু ছিল, তা কিছুই আপনি দেখতে পাবেন না। কান্নার অভিনয় করতে গিয়ে হেসে ফেলার দৃশ্য আপনি দেখবেন না, স্ক্রিনরাইটারের সংলাপ মনে করিয়ে দেওয়ার দৃশ্য অথবা পরিচালকের চিৎকার করে দেওয়া দিকনির্দেশনার দৃশ্যও আপনি দেখবেন না। ফাইনাল শটের আগে নেওয়া অসংখ্য শটও আপনাকে দেখানো হবে না।

ঠিক তেমনই এই বিশ্বব্যবস্থায় জনগণের সম্পর্ক শুধু পর্দায় দেখানো ঘটনার সঙ্গে। তারা এমন এক সিস্টেমের গোলামে পরিণত হয়েছে, যেখানে স্বর্ণের চেয়েও কাগজের দাম শুধু এ জন্য বেশি যে, এই সিস্টেম কাগজকে দামি বলে ঘোষণা দিয়েছে। এই সিস্টেম পুরো পৃথিবীজুড়ে এক অদৃশ্য যুদ্ধ বাঁধিয়ে রেখেছে, এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে-কোনো ধরনের

প্রতিরোধকে তারা সন্ত্রাস নাম দিয়ে রেখেছে আর আসল সন্ত্রাসকে মানবতার মুক্তির জন্য পবিত্র যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যা, অশ্লীলতাকে স্বাধীনতা, নৈতিক অধঃপতনকে প্রগতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের বানানো মিথ্যা ও কল্পনা যেটাকে বাস্তবতা বলে প্রতিষ্ঠিত করে, সেটাই হলো বাস্তবতা; বাস্তবে যেটা ঘটে, সেটা বাস্তব না। ঠিক সিনেমার মতো।

তাদের এই মিথ্যা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারণ এই মিথ্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকেই তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকলে 'বিপ্লবী' আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না থাকলে 'সন্ত্রাসী', 'উগ্রবাদী' বা 'চরমপন্থি'। আপনার দেশের মানুষ যদি আপনাকে শাসক হিসেবে নির্বাচন করে, তবু আপনি শাসক হতে পারবেন না। কার্যকরভাবে শাসক হতে হলে আপনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাগবে। এই বাস্তবতাগুলো মানুষ জানে না, তা নয়; মানুষ জানে ঠিকই, কিন্তু ভুলে যায় বা ভুলে যাওয়ার ভাণ করে। এ জন্য আমরা বারবার বলি, চেতনার বিনির্মাণই হলো আমাদের প্রথম যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো, জনগণকে এ কথা বোঝানো যে, তারা মিথ্যা ও কল্পনার আন্তর্জাতিক এক সিস্টেমের হাতে বন্দি। তাদের মধ্যে এই অনুভূতি এমনভাবে জাগ্রত করতে হবে, যেন তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এই অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বোঝাতে হবে, এই বিশ্বব্যবস্থা থেকে যতদিন বের না হতে পারবে, ততদিন বাস্তবিক অর্থে কোনো পরিবর্তনই আসবে না।

এই যুদ্ধ রাজনৈতিক কোনো যুদ্ধ না যে, শুধু রাজনীতিবিদরাই এটা নিয়ে চিন্তা করবে; এটা দুনিয়াদারদের ক্ষমতার কোনো লড়াই না যে, আপনি নিজেকে তা থেকে দূরে রাখবেন; এ যুদ্ধে হক-বাতিলের সীমারেখা মুছে যায়নি, যেমনটা অনেকে দাবি করে থাকে। বরং এটা হক ও বাতিলের মধ্যে, আযাদি ও গোলামির মধ্যে, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট ও চূড়ান্ত যুদ্ধ। এটা প্রকৃত স্বাধীনতাকামীদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ থেকে কারোরই দূরে থাকার সুযোগ নেই, মুখ ফিরিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আপনার দীনই আপনাকে এই যুদ্ধে ঠেলে দেবে, কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন, এ যুদ্ধে আপনি কী করেছেন। তাই, পিছে থাকবেন না। এই উম্মত যখনই আল্লাহর দেওয়া বিধান থেকে পিছে থেকেছে, জিহাদ থেকে পিছে থেকেছে, তখনই লাঞ্ছিত হয়েছে।

'জিহাদ' শব্দটি 'কিতাল' শব্দ থেকেও ব্যাপক। জিহাদের মধ্যে কিতালও অন্তর্ভুক্ত, এমনইভাবে যতগুলো ক্ষেত্রে আমরা শত্রুর আগ্রাসনের শিকার হয়েছি, সব ক্ষেত্রেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানও এর অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদকে যদি আরও ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে আপনি নিজের জন্য যে মেহনত করেন, সেটাও জিহাদ হতে পারে। কারণ, এই যুদ্ধের জন্য আমাদের আত্মিক পরিশুদ্ধিরও দরকার আছে। জাতিকে তাদের বোধগম্য ভাষায় বাস্তবতা বোঝানোর চেষ্টা করা, পরিপূর্ণ হকের দিকে তাদের দাওয়াত দেওয়া, তাদেরকে যে মিথ্যা ও সংশয়ের মধ্যে রাখা হয়েছে, সে সংশয় দূর করা, এই সবগুলোরই দরকার আছে। আর সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের সবটুকু দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার দরকার তো আছেই। তাই, এ সবকিছুই এই লড়াইয়ের মধ্যে শামিল। সবকিছুই পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত।'

## তালেবান আন্দোলন: জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাক

শায়খ আবু মুসআব সূরী ফা.আ. আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে ১৯৯১ সালের মে মাসে তাঁর 'الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا (সিরিয়ার জিহাদী বিপ্লব)' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন। বইয়ে তিনি বলেছিলেন—

'সামসময়িক ইসলামী আন্দোলনগুলো শুরুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে। তাদের নানামুখী অর্জন আর সফলতার গল্প শুনতে শুনতে কান ভারী হয়ে গেছে। কিন্তু এই আন্দোলনগুলো যে লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, সেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আজ অবধি প্রায় সব দেশের ইসলামী আন্দোলনেরই একই দশা। এই ব্যর্থতার কারণে কোথাও কোথাও ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে অদ্ভূত কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের জন্ম হয়েছে। এর ফলে ইসলামী আন্দোলনে ফাটল ধরেছে, কোথাও তাগুতী ব্যবস্থার সাথে ইসলামী আন্দোলন মিশে এক ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের এই করুণ দশা দেখে এই আন্দোলনের কর্মীদের উচিত একটু বিরতি নিয়ে নিজেদের অনুসৃত কর্মপদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা।

[ইসলামী আন্দোলনসমূহের] তথাকথিত কিছু গবেষক মনে করে, বর্তমান দুনিয়ার জাহিলী বাস্তবতাই হলো আসল। তাই এই বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। অথচ বিষয়টি পুরো উলটো। আল্লাহর দীন হলো আসল ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহর দীনের সাথে সামঞ্জস্য তৈরির জন্য মানুষের উচিত বিদ্যমান জাহিলী বাস্তবতাকে বাদ দেওয়া এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনা, তাহলেই আল্লাহর দীনের সাথে তাদের সামঞ্জস্য তৈরি হবে। এই পরিবর্তনের পথ একটিই, তা হলো—জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াত প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবজীবনে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে তাগুতের গোলামি থেকে বের করা। জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অনেক বিপদ-আপদ, বালা-

মুসীবতের মুখোমুখি হতে হবে। এই কষ্ট ও পরীক্ষা দেখে যারা ঝরে পড়ার, তারা ঝরে পড়বে; যারা পেছনে ফিরে যাওয়ার, তারা পেছনে ফিরে যাবে; আর যারা সত্যবাদী, তারা পরীক্ষায় উতরে যাবে, তাদের মধ্যে কেউ আবার শহীদ হবে আর কেউ সবরের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং একসময় আল্লাহ তাআলা বিজয় দেবেন, জমিনের কর্তৃত্ব দান করবেন। কেবল তখনই ইসলামী নেযাম কায়েম হবে।'

বিস্তারিত আলোচনা শুরুর আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে দিতে চাই। কুরআন ও সুন্নাহতে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থায় দীন প্রতিষ্ঠার যে পথ ও পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সর্বোচ্চ মেহনত করেছেন, সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন, কিন্তু তবু জাগতিক বিচারে উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেননি, আমাদের এই কথাগুলো তাদের উদ্দেশ্যে না। কারণ, সঠিক পন্থায় মেহনত করার পরেও জাগতিক সফলতা অর্জন করতে না পারা ব্যর্থতা নয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَ أَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

'একবার স্বপ্নে আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হলো, তখন কোনো কোনো নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে ছোট্ট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দুজন লোক; আবার কেউ এমনও ছিলেন, তাঁর সাথে কেউ নেই।' [বুখারী : ৫৭০৫; মুসলিম : ২২০]

এই নবীগণ বছরের পর বছর উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা আল্লাহর আদেশের ওপরেই আছেন। দাওয়াতের জন্য যে গুণগুলোর প্রয়োজন—সবর, হিকমত, হৃদয়গ্রাহী ভাষা, শক্তিশালী যুক্তি—আল্লাহ তাদের সবই দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেননি। এত দীর্ঘ সময়ের দাওয়াতে মাত্র একজন-দু'জন মানুষ ঈমান এনেছে। তাই বলে কি এটা তাঁদের ব্যর্থতা? এ কারণে তাদেরকে ব্যর্থ বলা যাবে? 'তাঁরা দাওয়াতের কাজে ত্রুটি করেছেন' এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারবে? নাউযুবিল্লাহ, অবশ্যই না। তাহলে বাস্তবতা কী? আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন—

اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ

'আপনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দান করেন।' [সূরা কাসাস (২৮) : ৫৬]

তাই, আমাদের এই কথাগুলো ইসলামী আন্দোলনের সে সব কর্মীদের উদ্দেশ্যে, যারা শরীয়তের দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করেছেন, দীনের ব্যাপারে আপস করেছেন, অক্ষমতা, দুর্বলতা আর পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে দীনের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয় বিষয়েও ছাড় দিয়েছেন। অবশেষে তারা এই বিশ্বব্যবস্থার একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হয়েছেন, বিশ্বব্যবস্থার মোড়লরা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করে আর তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে তারা কুফর ও রিদ্দাহয় জড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের আফিয়াত ও ইস্তিকামাত দান করুন, আমীন।

শায়খ আবু মুসআব সূরীর উপরিউক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে জিহাদী, সালাফী, সুরুরী, তাবলীগী-সহ দীন কায়েমের জন্য যারাই মেহনত করছেন, ইসলামী আন্দোলনের সকল ঘরানার জন্যই নিজেদের কর্মপন্থা নিয়ে পুনরায় চিন্তা করা দরকার। ইসলামী আন্দোলন শুরুর পর প্রায় ১০০ বছর হতে চলল, সুদীর্ঘ এই সময়ে আমরা অসংখ্য সভা-সমাবেশ করেছি, লাখো মানুষের অংশগ্রহণে অসংখ্য বিক্ষোভ করেছি, আকর্ষণীয় কত স্লোগান দিয়েছি, আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'আল্লাহু গায়াতুনা, আর-রাসূলু কুদওয়াতুনা, আল-কুরআনু দুস্তুরুনা, আল জিহাদু সাবীলুনা, ওয়াল মাউতু ফী সাবীলিল্লাহি আসমা আমানীনা'-এর মতো রক্তগরমকরা স্লোগান, কিন্তু আমাদের অর্জনের খাতা সব সময় শূন্যই থেকে গেছে। সংগ্রাম ও সংঘাতের দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দিয়ে এখন কমপক্ষে আত্মসমালোচনা করা উচিত। যে পথে আমরা চলছি, যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত, একটু পেছনে ফিরে দেখা উচিত। নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত—**তালেবান কীভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সফল হলো? আর অন্যরা কেন বিফল হলো?**

প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই তালেবান কীভাবে ইসলামী ইমারত কায়েম করতে সফল হলো, যা পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল, অথচ তার আগে ১৯৯২ সালে পরস্পরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত নিফাকে আক্রান্ত জিহাদী দলগুলো ক্ষমতা পেয়েও তা রক্ষা করতে পারল না? সুদানের ওমর আল-বশীর ৩০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও কেন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারল না? অন্যদিকে ক্ষমতার আকাশপাতাল তফাত থাকা সত্ত্বেও তালেবান কীভাবে ৩০টি বছর যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকল? প্রথমে মুজাহিদীন দলগুলোর সাথে লড়াই করল, তারপর আমেরিকা ও তার ৫০টি মিত্রশক্তির সাথে লড়াই করল। ৯/১১-এর একদিন পর এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ঘটনার সাথে জড়িতদের কীভাবে জবাব দেওয়া হবে? সে তখন বলেছিল, এ মুহূর্তে আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারছি, যে দেশ সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়েছে, সে দেশকে আমরা মানচিত্র থেকে মুছে দেব। সে স্পষ্ট ভাষায় হুমকি দিয়ে বলেছিল—'We will smoke them'। তালেবান এ সব হুমকির কথা জানত। এত ভয়ানক হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও তারা কীভাবে যুদ্ধের ময়দানে অটল-অবিচল থেকে

বর্বর এই বাহিনীকে পরাজিত করল? অন্যদিকে দোহা চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা ও তার মিত্রদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করে আফগানিস্তান থেকেই বা কীভাবে বহিষ্কার করল? দীর্ঘ ২০টি বছর আমেরিকা ও তার মিত্ররা মিলে তালেবানকে ধ্বংস করে তাদের বানানো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, কিন্তু তালেবান কীভাবে সেই আমেরিকাকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মার্কিন প্রতিনিধিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো যে, আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে শরীয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? দুই যুগেরও কম সময়ে তালেবান এতটা সাফল্য কীভাবে অর্জন করতে পারল, অথচ অন্যান্য ইসলামী দল কয়েক দশক চেষ্টা করেও তালেবানের একশ ভাগের একভাগ সফলতাও অর্জন করতে পারল না? এ ধরনের আরও অসংখ্য প্রশ্ন আছে। এর উত্তরে আমরা সেটাই বলতে পারি, যা আল্লাহ বলেছেন—

**ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ**

'এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান দান করেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।' [সূরা জুময়া (৬২) : ৪]

তালেবানের সফলতার পেছনে অনেকে অনেক কারণ দেখাতে পারবেন, এমনইভাবে বিভিন্ন দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয় বিভিন্ন ইসলামী দল কেন তালেবানের মতো সফল হতে পারল না—তার পেছনেও অনেকে হাজারো কারণ দাঁড় করাতে পারবেন। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর ওয়াস্তে নিরপেক্ষ মনে, সততার সাথে একটু চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারব, এই সব প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা দুটি আয়াতেই দিয়ে রেখেছেন। আয়াতদুটি হলো—

**وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ**

'যারা **আমার পথে কষ্ট স্বীকার করে**, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে আমার পথ দেখিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।' [সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯]

**وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ**

'যদি **তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও**, তবে তিনি তোমাদের স্থানে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, তারপর তাঁরা তোমাদের মতো হবে না।' [সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৩৮]

তালেবনের সফলতা আর অন্যান্য দলের ব্যর্থতার কারণ হলো, তালেবান আল্লাহ তাআলার এই বাণী যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا**

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে **চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন**, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে **কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না**। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হলো।’ [সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৬]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার ইবাদতের আদেশ করেছেন। কিন্তু এই ইবাদত নিজেদের মনোমতো করলে হবে না, বরং ইবাদত হতে হবে কিতাব ও সুন্নত মোতাবেক। কোনো মানুষের কথাই শতভাগ সঠিক ও অনুসরণীয় হয় না; শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ব্যতিক্রম, তাঁর প্রতিটি কথাই শতভাগ অনুসরণীয়। এই মূলনীতিটি মেনে চলার কারণেই তালেবান সফল হতে পেরেছে, আর অন্যরা এই মূলনীতি অমান্য করার কারণেই ব্যর্থ হয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-সহ তালেবান নেতারা প্রথম দিন থেকেই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মর্ম যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। দীনের নুসরত কী তা-ও বুঝেছিলেন। ইমাম মালেক রহ.-এর কথা তাঁরা হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছিলেন—এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যে উপায়ে পরিশুদ্ধি অর্জন করেছিলেন, শেষ প্রজন্মের সংশোধনও সেই উপায়েই হবে। বাইয়াতে আকাবা, বাইয়াতে রিযওয়ান, আসহাবুল উখদুদ, আসহাবে কাহাফ, মুসা আ.-এর ইতিহাস এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের সেই কথাও তাঁরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, যা তিনি প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন। হেরা গুহার ঘটনায় ভয়ে কাঁপতে থাকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রী খাদীজা রাযি. যখন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বিস্তারিত শুনে বললেন, ‘হায় আফসোস, আপনার জাতি যখন আপনাকে বের করে দেবে, তখন যদি আমি আপনাকে সাহায্য করার মতো শক্তিশালী যুবক হতাম!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে বললেন, ‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?!’ ওয়ারাকা বললেন, ‘হ্যাঁ, যারাই আপনার মতো দাওয়াত নিয়ে এসেছে, তাদের সাথেই মানুষ শত্রুতা করেছে। আপনাকে মিথ্যাবাদী বলা হবে, নির্যাতন করা হবে, দেশছাড়া করা হবে, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করা হবে।’ তখনও জিহাদের আয়াত নাযিল হয়নি, ওয়ালা-বারার আয়াত নাযিল হয়নি, কোনো আহকামের আয়াতও নাযিল হয়নি, প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে মাত্র। কিন্তু ওয়ারাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাঁর কওম তাঁকে বের করে দেবে।

প্রথম দিন থেকেই তালেবান মুজাহিদগণ বুঝতে পেরেছিলেন, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর দীনের নুসরত করা, দুর্বল মুমিনদের সাহায্য করা সহজ কোনো বিষয় না। চাচা

আবু তালেবের ইন্তিকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এক এক করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে যাচ্ছিলেন আর তাদের কাছে প্রস্তাব রাখছিলেন যে, তারা যদি তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয় এবং সাহায্য করে আর তাদের আশ্রয়ে থেকে যদি তিনি দীনের তাবলীগ করতে পারেন, তাহলে তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত। রাসূলের এই দাওয়াত পেয়েও একমাত্র আনসাররা ছাড়া আরবের কোনো গোত্রই সাড়া দেয়নি। পরোপকারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর যুদ্ধপ্রিয় জাতি হিসেবে তৎকালীন আরব গোত্রগুলোর বেশ নামডাক ছিল, কিন্তু তারপরেও তারা রাসূলের এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। যদিও তারা তখন মুশরিক ছিল, কিন্তু তারা ভালোভাবেই জানত, আল্লাহর দীনের নুসরতের অর্থ কী। তারা জানত, এই দায়িত্ব যেনতেন কোনো দায়িত্ব না, এই দায়িত্ব কাঁধে নিলে কঠিন পরিণতি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, চরম বিপদ আর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। তারা জানত, এই দাওয়াত রাজা-বাদশাহরা পছন্দ করবে না, এই দীন কায়েমের জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, লাশের পাহাড় দাঁড় করাতে হবে, ধনসম্পদের কুরবানী দিতে হবে, গোত্রের নেতা ও মুরুব্বীদের হারাতে হবে। তারা জানত, রাসূলের এই প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া মানে আরব ও আজমের শত্রুতা কিনে নেওয়া, লাখো তরবারি নিজেদের দিকে টেনে আনা।

আরও সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, তালেবান নেতারা প্রথম দিন থেকেই হক ও বাতিলের মধ্যকার চলমান লড়াইয়ের প্রকৃতি ও বাস্তবতা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তাআলার এই কথাগুলো তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো খুশি হবে না, যতদিন না আপনি তাদের আদর্শের অনুসরণ করবেন।' [সূরা বাকারা (২) : ১২০]

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

'তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যদি পারে তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত করে মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দীন ত্যাগ করে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তারা জাহান্নামি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' [সূরা বাকারা (২) : ২১৭]

তালেবান শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল, মার্কিনিরা উসামার বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে, বাস্তবে উসামা মূল সমস্যা না। মূল সমস্যা হলো দীন ও ইসলাম। উসামার

কারণে তারা হামলা করছে না, হামলা করছে ইসলামের কারণে। এ কারণেই আমীরুল মুমিনীন রহ. এক ভাষণে বলেছিলেন—'দীনের জন্য, ইসলামের জন্য জান দিতে পারা দুনিয়ার তামাম স্বাদ ও সৌভাগ্যের চেয়েও বড় বিষয়। কারণ, মৃত্যু তো একদিন আসবেই। তাই মৃত্যুটা যদি ইসলামের জন্য হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা অনেক বড় সফলতা। ঈমান ও ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করতে পারাই হলো সবচেয়ে বড় কামিয়াবি।'

এতটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট উপলব্ধি নিয়ে তালেবান মুজাহিদগণ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, এর জন্য যে-কোনো মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত ছিলেন, দীনের নুসরতের জন্য নিজেদের মূল্যবান সবকিছুই উৎসর্গ করতে রাজি ছিলেন। তাঁদের এই শর্তহীন ত্যাগ ও কুরবানীর কারণেই আল্লাহ তাআলার সেই ওয়াদা তাদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়েছে—'যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করে, আমি তাঁদেরকে আমার পথ দেখিয়ে দেব।' এ জন্য প্রতিটি পদক্ষেপেই তারা আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য লাভ করতে পেরেছেন। আল্লাহর এই নুসরতের কারণেই পুরো দুনিয়া দেখেছে, কীভাবে তারা জিহাদের ময়দানে অটল অবিচল থেকেছেন, ইজ্জত-সম্মান আর আত্মমর্যাদার নজিরবিহীন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. ও তালেবানের অন্যান্য নেতাদের অবিচলতা ও পর্বতসমান দৃঢ়তা দেখেই সারা দুনিয়া অবাক হয়েছে। শত বাধা আর চাপ উপেক্ষা করে তালেবান নিজেদের ঈমান নিয়ে বাতিলের মোকাবিলা করেছে, এই দীর্ঘ সময়ে কত ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-কষ্ট আর বেদনা তারা সয়েছেন, কিন্তু দীনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি হননি। নিজেদের ক্ষমতা ও রাজত্ব ত্যাগ করেছেন, তবু একজন মুসলিমকে কাফেরদের হাতে তুলে দেননি। এতসব কুরবানীর বদৌলতেই তো তারা আল্লাহর নুসরত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, যুদ্ধ ও রাজনীতি—উভয় ময়দানেই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করতে পেরেছেন, সারা দুনিয়া যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে, যে বিজয় কল্পনাকেও হার মানিয়েছে আর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে সালাফদের বদর, খাইবার, হিত্তীন ও আইনে জালুতের কথা।

দুর্বলতার দোহাই দিয়ে যারা দীনের ব্যাপারে ছাড় দেয়, আল্লাহ তাআলা তালেবানকে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আমেরিকা আর তার অর্ধশত মিত্র বাহিনীর সামনে তালেবানের কী ছিল? কিছুই তো ছিল না। তাঁদের অস্ত্র বলতে ছিল আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল আর এই বিশ্বাস যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আসে; আল্লাহ যা চান, তা-ই হয় আর যা চান না, তা হয় না; অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, যার আশ্রয় নিলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; তাঁদের বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার যে-কোনো জিনিস থেকে আল্লাহর দীন বেশি দামি, বেশি মূল্যবান এবং রাজত্ব আল্লাহ যাকে চান, তাকে দেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন—এগুলোই ছিল তাদের পুঁজি।

কিন্তু অন্যদিকে ঠিক উলটো চিত্র। দুর্বলতার অজুহাতে, বিদ্যমান বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার কথা বলে ক্ষমতাসীন সরকার কিংবা বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেওয়া পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে দীনের স্বতঃসিদ্ধ নীতি-আদর্শকে পাশ কাটিয়ে চলাটাই এখন অনেক অনুসরণীয় ব্যক্তি, চিন্তাবিদ এবং ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ দার্শনিকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এই পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আল্লাহর দীনের মধ্যে রদবদল করার আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের এই নীতিভ্রষ্ট আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ইসলামী আন্দোলনগুলো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর এই বিচ্যুতির ফলে—শায়খ আবু মুসআব সূরীর ভাষায়—ইসলামী রাজনীতির নামে বিচিত্র সব দৃষ্টিভঙ্গি, বিকৃত তত্ত্ব, বিচ্ছিন্ন মতবাদ আর তাগুতী ব্যবস্থার ইসলামী সংস্করণের জন্ম হয়েছে।

ফলে এই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পশ্চাদপসরণের সিলসিলা শুরু হয়েছে। দীনের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া, কুরআন-হাদীসের চেয়ে যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া আর 'লক্ষ্য ঠিক থাকলে অবৈধ মাধ্যম গ্রহণ করাও বৈধ'—এর মতো বাতিল চিন্তাচেতনা ইসলামী আন্দোলনে ঢুকতে শুরু করেছে। অবশেষে এই আন্দোলন দীনও হারিয়েছে, দুনিয়াও হারিয়েছে। তারা না পেরেছে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, না পেরেছে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জন করতে আর না পেরেছে শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য কোনো ধরনের প্রস্তুতি নিতে। ব্যর্থতা আর পরাজিত মানসিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে তখন, যখন তাদের শায়খগণ উম্মতের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ে অদ্ভূত সব ফতওয়া দেওয়া শুরু করেন। যেমন: ৯/১১-এর পর শায়খ ইউসুফ কারযাবী রহ. একটি ফতওয়া[১০৫] দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন,

---

[১০৫] ২০০১ সালের ৮ই অক্টোবর 'আশ-শারকুল আওসাত' পত্রিকায় শায়খ ইউসুফ কারযাবীর এই ফতওয়াটি প্রকাশ করা হয়েছিল। সে বছরের ১৭ই অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Islamic Scholars Reject Bin Laden's Call for Jihad Against Americans শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে শায়খের এই ফতওয়ার প্রশংসা করা হয়। শায়খ কারযাবীর সাথে আরও কয়েকজন আলেমের তত্ত্বাবধানে ফতওয়াটি লেখা হয়েছিল। ফতওয়ায় বলা হয়েছিল—'আমরা মনে করি, এই অপরাধ (৯/১১) যারা ঘটিয়েছে এবং যারা অপরাধীদের উৎসাহ দিয়ে, টাকাপয়সা দিয়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে সহযোগিতা করেছে, তাদের সকলকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা উচিত। যারা নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে, তাদের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে, তাদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। এই কাজে সব মুসলিমেরই সাধ্যানুযায়ী অংশগ্রহণ করা কর্তব্য। মোটকথা, যাদের ব্যাপারে ধারণা করা হচ্ছে যে, তারা এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় জড়িত অথবা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ শুরু করা হয়, তাহলে সামরিক বাহিনীতে থাকা মুসলিমদের জন্য সহীহ নিয়তে (!) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ। এর কারণ আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, দেশের প্রতি তাদের (মার্কিন মুসলিমদের) আনুগত্যের ব্যাপারে যেন কেউ প্রশ্ন তুলে তাদেরকে হেনস্তা না করতে পারে।'

আশ-শারকুল আওসাতের লিংক: https://tinyurl.com/v3ht3bm4

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির লিংক: https://tinyurl.com/483bj2cj

আমেরিকান মুসলিমদের জন্য তাদের ক্রুসেডার দেশের সাথে মিলে আফগানিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা জায়েয! আরেক ফতওয়ায় তিনি মুসলিমদের উৎসাহ দিয়েছিলেন, তারা যেন ৯/১১-এর হামলায় আহত নিরপরাধ (!) মার্কিনিদের রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

অধঃপতনের এই ধারাবাহিকতা দেখে কমপক্ষে এখন ইসলামী আন্দোলনগুলোর উচিত নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করা যে, কীভাবে তারা এই অন্ধকার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল? অথচ প্রতিদিনই তারা তিলাওয়াত করছে—

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا**

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো ইখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হলো।' [সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথাটিও তারা অসংখ্যবার পড়েছে—

**تركتُكم على البيضاءِ ليلِها كنهارِها لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالِكٌ ، ومن يَعِشْ منكم فسَيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بما عرَفتُم من سُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ المهديِّينَ الرَّاشدينَ**

'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল আদর্শের ওপর রেখে যাচ্ছি, যার রাতও দিনের মতো আলোকিত। এ পথ থেকে কেবল তারাই বিচ্যুত হবে, যাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। আমার সুন্নত সম্পর্কে তোমরা যা জান, তা মেনে চলবে এবং আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করবে।' [জামে তিরমিযী : ২৬৭৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২]

ইসলামী আন্দোলনের এই করুণ পরিণতির কথা খুব সুন্দরভাবে আমীনা কুতুব তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাই শহীদ সায়্যিদ কুতুবের শাহাদাতের স্মৃতিচারণ করে তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন।[১০৬] ১৯৮৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কুয়েতভিত্তিক ম্যাগাজিন আল-মুজতামা'-এর ৮৮৩তম সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পাঠকদের জন্য কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়া হলো—

[১০৬] আল-হাসাদুল মুর : শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী

**أخي إنه لحديث يطول ... وفيه الأسى وعميق الشجون**

ভাই, এ এক দীর্ঘ গল্প, যেখানে বেদনা আর গভীর বিষণ্নতা জমে আছে।

**رأيت تبدل خط الحداة ... بما نالهم من عناء السنين**

আমি দেখেছি পথপ্রদর্শকদের পথ বদলে গেছে, দীর্ঘ এই সংগ্রামে তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে।

**فمالوا إلى هدنة المستكين ... ومدوا الجسور مع المجرمين**

তারা এখন আপসের পথে ঝুঁকেছে, অপরাধীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

**رأوا أن ذلك عين الصواب ... وما دونه عقبات الطريق**

তাদের ধারণা, এটাই হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত আর এর বাইরে সব পথ কণ্টকাকীর্ণ।

**بتلك المشورة مال السفين ... تأرجح في سيره كالغريق**

আমাদের নৌকাও এ দিকে ঝুঁকেছে, এখন তা দুলছে ডুবন্ত মানুষের মতো।

**وفي لجة اليم تيه يطول ... وظلمة ليلٍ طويلٍ عميق**

সাগরের গভীরে পথ হারিয়েছে, চারিদিকে অন্ধকার; দীর্ঘ, গাঢ় রাতের মতো।

**حزنت لما قد أصاب المسير ... وما يملك القلب غير الدعاء**

কাফেলার এই দুর্দশা দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি, এ হৃদয়ের আর কিছু নেই, কেবল দোয়া ছাড়া।

**بأن ينقذ الله تلك السفين ... ويحميَ ربانها من بلاء**

আল্লাহ যেন এই নৌকাটিকে উদ্ধার করেন, এর নাবিকদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

**وأن يحذروا من ضلال المسير ... ومما يدبر طي الخفاء**

তারা যেন সচেতন হয় ভুল পথের ব্যাপারে এবং সেই সব ষড়যন্ত্র থেকে, যা গোপনে সাজানো হচ্ছে।

**ترى هل يعودون أم أنهم ... يظنون ذلك خط النجاح؟**

বলো তো, তারা কি ফিরে আসবে? না-কি তারা একেই সফলতার পথ মনে করে?

**وفي وهمهم أن مد الجسور ... سيمضي بآمالهم للفلاح**

তারা বিভ্রমে আছে; ভাবছে, শত্রুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়লেই তারা সফল হতে পারবে।

**وينسون أن طريق الكفاح ... به الصدق والفوز رغم الجراح**

তারা ভুলে গেছে, সংগ্রামের পথে আছে সততা আর সেই পথেই আসে বিজয়, যদিও ক্ষতবিক্ষত হতে হয়।

**ولكنني رغم هذي الهموم ... ورغم التأرجح وسط العباب**

তবু এত দুঃখের মধ্যেও, তীব্র ঢেউয়ে টালমাটাল এই পরিস্থিতিতেও আমি আশাহত নই।

**ورغم الطغاة وما يمكرون ... وما عندهم من صنوف العذاب**

যদিও অত্যাচারীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আর তাদের হাতে যন্ত্রণা দেওয়ার নানা উপকরণও রয়েছে,

**فان المعالم تبدي الطريق ... وتكشف ما حوله من ضباب**

তবু পথের চিহ্ন এখনো স্পষ্ট, চারপাশের কুয়াশা কেটে তা এখনো ধরা দেয়।

**وألمح أضواء فجر جديد ... يزلزل أركان جمع الضلال**

আমি দেখতে পাচ্ছি নতুন ভোরের আলো, যা মিথ্যার ভিত কাঁপিয়ে তুলবে।

**وتوقظ أضواؤه النائمين ... وتنقذ أرواحهم من كلال**

এই আলো জাগাবে ঘুমন্তদের আর তাদের ক্লান্ত আত্মাকে মুক্ত করবে।

**وتورق أغصان نبت جديد ... يعم البطاح ندي الظلال**

নতুন একটি গাছের ডালপালা গজিয়ে উঠবে, যা ছায়া দেবে সমগ্র প্রান্তরে।

**فنم هانئا يا شقيقي الحبيب ... فلن يملك الظلم وقف المسير**

প্রিয় ভাই, তুমি শান্তিতে ঘুমাও, জুলুম-নির্যাতন কিছুতেই এই কাফেলাকে থামাতে পারবে না।

**فرغم العناء سيمضي الجميع ... بدرب الكفاح الطويل العسير**

যতই কষ্ট হোক, এই দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের পথে সবাই চলতে থাকবে।

**فعزم الأباة يزيح الطغاة ... بعون الإله العلي القدير**

কারণ সাহসী মানুষের দৃঢ় সংকল্প আল্লাহর সাহায্যে অন্যায়কে পরাজিত করবেই।

এত কিছুর পরেও আমরা ইসলামী আন্দোলনের অবদান ও মেহনতকে অস্বীকার করি না। এই ইসলামী আন্দোলনের ফলেই হাজারো-লাখো মুসলিম সন্তান আল্লাহর পথের দিশা পেয়েছে, এই আন্দোলন সায়্যিদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুবের মতো অসংখ্য মনীষীর জন্ম দিয়েছে। যে নীতি-আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আন্দোলনের সূচনা, সেই আদর্শের ওপর অটল-অবিচল থেকে নিজেদের সততার প্রমাণ দিয়েছেন—এমন অগণিত মহান ব্যক্তিও এই

আন্দোলন থেকেই বের হয়েছেন। ইকামতে দীনের এই আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন তার নীতি ও আদর্শ কী ছিল—তা আন্দোলনের স্লোগান থেকেই বোঝা যায়। 'আল্লাহু গায়াতুনা, আর-রাসূলু কুদওয়াতুনা, আল-কুরআনু দুস্তুরুনা, আল-জিহাদু সাবীলুনা, আল-মাউতু ফী সাবীলিল্লাহ আসমা আমানীনা' এটাই ছিল আন্দোলনের স্লোগান, আন্দোলনের প্রাণশক্তি; জিহাদী আকীদা আর দীনের অপরিবর্তনীয় আদর্শের এক অপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু এই আন্দোলন ধীরে ধীরে তার আদর্শ ত্যাগ করেছে। আমরা এই পরিবর্তনের নিন্দা করি। যারা আন্দোলনের হাল ধরেছেন, তারা জিহাদের ওপর অবিচল থাকতে পারেননি, তাগুতের সাথে হাত মিলিয়েছেন, তাগুতের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাদেরকে বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একসঙ্গে চলাফেরা করেছেন, এমনকি তাদেরকে আইন প্রণয়নের অধিকার পর্যন্ত দিয়েছেন এবং তাদের জন্য দোয়াও করেছেন। আর এগুলো তাঁরা করেছেন দাওয়াতী ও সামাজিক কিছু সুবিধা লাভের আশায়। এ ব্যাপারে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফি. তাঁর বই **الحصاد المر الإخوان المسلمين في ستين عام** (ইখওয়ানুল মুসলিমীন: ৬০ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা)-এ বিস্তারিত লিখেছেন। এ ছাড়াও আরও অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। তাই এখানে তা আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. সূরা কলামের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াত ﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

> 'এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পক্ষ থেকে সমঝোতার প্রস্তাবের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায়ীরা এই কাজ করে থাকে। ক্রেতার সাথে দামের বনিবনা না হলে তখন দু'জনের বলা দামের মাঝামাঝি একটি দামে ক্রেতাকে রাজি করিয়ে নেয়, একটা মধ্যপন্থি সমাধান খোঁজে। যেন ক্রেতাও সন্তুষ্ট থাকে, আবার বিক্রেতাও সন্তুষ্ট থাকে। কাফেরদের পক্ষ থেকে এমনই একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসা আর আকীদা কি এক? ব্যবসায়ী দামাদামির সময় নিজের পক্ষ থেকে এক-আধটু ছাড় দিতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কখনো ছাড় দেওয়া যায় না। আকীদার প্রশ্নে কোনো ছোট-বড় নেই, আকীদার প্রশ্নে সবকিছুই সমান, সব মিলিয়েই আকীদা। আকীদার ক্ষেত্রে যেমন কোনো ছাড় চলে না, তেমনই কারো আনুগত্যও চলে না।
>
> ইসলাম ও জাহিলিয়াত কখনোই একসাথে মিলতে পারে না, কোনো পথেই এই দুটির মিলন হওয়া সম্ভব না। ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যকার এই বৈরী অবস্থান সর্বযুগে, সর্বস্থানে একই রকম। অতীতের জাহিলিয়াত, বর্তমানের জাহিলিয়াত কিংবা ভবিষ্যতের জাহিলিয়াত—ইসলামের দৃষ্টিতে সব সমান। জাহিলিয়াত ও ইসলামের মধ্যে যে দূরত্ব,

তা কিছুতেই ঘোঁচানো সম্ভব না, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ সেতুও নির্মাণ করা সম্ভব না, কোনো ভাগাভাগি বা সমঝোতাও সম্ভব না। এই সংঘাতে আপস-মীমাংসার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোষামোদ করত, যাতে তিনি তাদের প্রতি নমনীয় হন, তাদের দেবদেবীর অসারতা বর্ণনা না করেন এবং মূর্তিপূজা নিয়ে কটাক্ষ না করেন। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, মুশরিকদের কিছু রীতিনীতি যদি তিনি মেনে নেন, তাহলে মুশরিকরাও তাঁর আনা কিছু রীতিনীতি মেনে নেবে, এতে আরবদের সামনে কিছুটা হলেও মুশরিকদের মান-ইজ্জত রক্ষা পাবে। মোটকথা, তারা সমঝোতার মাধ্যমে অর্ধার্ধি একটা সমাধানে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের ব্যাপারে নিজ অবস্থানে অনঢ় ছিলেন, দীনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। দীনের ব্যাপারে কারো তোষামোদেও গলে যাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। হ্যাঁ, অন্য ক্ষেত্রে তিনি অনেক দয়ালু, অনেক নরম মানুষ, উদারচিত্তের অধিকারী, সহজ সমাধানের পক্ষপাতী, কিন্তু দীন তো দীন। দীনের ব্যাপারে তাঁর হাতে কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন— **فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ** 'আপনি মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের অনুসরণ করবেন না'। এ জন্যই মক্কায় চরম সংকটকালেও তিনি দীনের ব্যাপারে কোনো আপস-মীমাংসার প্রস্তাবে সাড়া দেননি, অথচ তাঁর এই অনঢ় অবস্থানের কারণে তাঁর পুরো বংশকে অবরোধ করা হয়েছে, তাঁর গুটিকয়েক সাথি-সঙ্গীকেও উঠিয়ে নিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়েছে, তাঁরা ধৈর্য ধরেছেন, কিন্তু দীনের ব্যাপারে ছাড় দেননি। অত্যাচারীদের মন নরম করার জন্য অথবা অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য যা বলা সম্ভব, তা বলেছেন। কিন্তু আকীদার প্রশ্নে কোনো লুকোচুরি করেননি।'

সূরা বনী ইসরাইলের ৭৪-৭৫ নম্বর আয়াত ﴿**وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا**﴾ -এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন—

'আপস-মীমাংসার যে-সব ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন, সেগুলো সে যুগেই সীমাবদ্ধ না; বরং সব যুগেই দাঈদের সাথে ক্ষমতাসীনরা এই কৌশলই অবলম্বন করে। শাসকশ্রেণি দাঈদেরকে উসকানি দিতে থাকে, যেন তারা দাওয়াতের সঠিক ও আসল রূপের ব্যাপারে সামান্য হলেও ছাড় দেয় এবং মাঝামাঝি একটি সমাধানে রাজি হয়ে যায়, এ জন্য তারা বিপুল অর্থবিত্তের লোভও দেখায়। অনেক দাঈ শাসকদের এই চক্রান্তের কাছে হারও মেনে নেয়। তারা একে হালকা বিষয় মনে করে। তারা ভাবে, শাসকশ্রেণি তো আমাকে পুরোপুরি দাওয়াত ছেড়ে দিতে বলছে না, তারা দাওয়াতে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতে বলছে, যেন তাদের

অবস্থান আর আমার অবস্থান একটু কাছাকাছি আসতে পারে। এই সুযোগে শয়তান দাঈকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। দাঈর মনে সে ঢুকিয়ে দেয়, আদর্শের ব্যাপারে একটু-আধটু ছাড় দিয়ে যদি শাসকদেরকে একটু হলেও দাওয়াতের পক্ষে আনা যায়, তাহলে মন্দ কী! বরং এটাই তো দাওয়াতের বিপুল সম্ভাবনা খুলে দেবে। এই ভেবে তারা আদর্শের ব্যাপারে হালকা ছাড় দিতে রাজি হয়। কিন্তু দেখা যায়, শুরুতে হালকা ছাড় দিলে ধীরে ধীরে তা চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। দাঈ যদি একেবারে তুচ্ছ কোনো বিষয়েও ছাড় দেয় আর সেখানেই ক্ষান্ত থাকার ইচ্ছা করে, তবু পারে না। কারণ, ছাড় দেওয়ার এই মানসিকতা পদে পদে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্ষমতাসীনরাও দাঈদেরকে এভাবে খুব ধীরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে থাকে। দাঈরা যখনই কোনো বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি হয়ে যায়, তখনই তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায় আর শাসকরাও বুঝতে পারে, দরকষাকষি চালিয়ে গেলে, অর্থের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করলে, তাদেরকে শুধু দুয়েকটি বিষয় না পুরো চুক্তিই মানানো যাবে।'

তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের অন্য এক জায়গায় আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ব্যাপারে দাঈদের সতর্ক করতে গিয়ে সায়্যিদ কুতুব শহীদ রহ. লিখেছেন—

'নবী-রাসূলদের পর যারা দাওয়াতের উত্তরাধিকার লাভ করেন, সেই দাঈদের মধ্যে অনেক বেশি আগ্রহ-উদ্দীপনা কাজ করে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিতে চান। এই আগ্রহ থেকেই তারা ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। এ জন্য তারা দাওয়াতের সূচনালগ্নে তাদের দৃষ্টিতে অমৌলিক কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে থাকেন এবং ক্ষমতাধরদের সাথে কিছু বিষয়ে তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, যাতে তারা দাওয়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিরোধী না হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে তারা এমন অনেক পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেন, যা দাওয়াতের সূক্ষ্ম মানদণ্ড কিংবা দাওয়াতের সুনির্ধারিত সরল পদ্ধতির সাথে খাপ খায় না। এগুলো তারা করেন মূলত দাওয়াতের দ্রুত বিজয় দেখার জন্য, দ্রুত প্রচারের জন্য এবং অবশ্যই দাওয়াতের মাসলাহাতকে সামনে রেখে। অথচ তারা এটা বোঝেন না যে, ছোট-বড় সব ধরনের বিকৃতি থেকে বাঁচিয়ে সুনির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দাওয়াত দেওয়াই হলো আসল মাসলাহাত। ফলাফল গায়েবের বিষয়, আল্লাহ ছাড়া কেউই ফলাফল জানে না।

দাঈদের জন্য ফলাফল নিয়ে চিন্তা করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাদের কাজ হলো, দাওয়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথ অনুসরণ করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া আর ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শেষ পরিণাম অবশ্যই ভালো হবে। তাই, দাঈদের

উচিত ডানে-বামে না ঝুঁকে সম্পূর্ণ সোজা থেকে দাওয়াতের কাজ করা, এর ফলে কী পরিণতি হবে তা নিয়ে চিন্তা না করা। কখনো মনে হতে পারে, এভাবে দাওয়াতের কাজ করলে বড় কোনো বিপদ হতে পারে, এ ধরনের ধারণা ও কল্পনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া-ই তো দাওয়াতের জন্য আসল বিপদ, চাই বিচ্যুতির পরিমাণ অল্প হোক বা বেশি; তাই এই বিপদ থেকে কীভাবে বাঁচা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। কীভাবে দাওয়াত দিলে ভালো হবে, সেটা আল্লাহই ভালো জানেন আর তিনিই তো এই পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছেন, এ নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়নি। তাদের দায়িত্ব একটাই—আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত এই পদ্ধতি থেকে সরে না যাওয়া এবং এই পথে অবিচল থাকা।'

হ্যাঁ, লাভক্ষতি আর মাসলাহা-মাফসাদার ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, এ জন্য কখনো ছাড়ও দেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু দীনের মৌলিক বিষয়ে কখনো ছাড় দেওয়া যাবে না, ফলাফল যা-ই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা আসহাবুল উখদুদের প্রশংসায় পুরো একটি সূরা নাযিল করেছেন। তারা কী করেছিল? দীনের ব্যাপারে একবিন্দু ছাড়ও তারা দিতে রাজি হয়নি। তাদের এই অনঢ় অবস্থানের কারণেই তো তাদেরকে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দীনের ব্যাপারে তাদের এই অনমনীয় মানসিকতাকে মহাসাফল্য বলে ঘোষণা করেছেন।

অপরদিকে নবীজীর জীবনেই এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে প্রয়োজনের তাগিদে স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দীনের মৌলিক বিষয়ে কোনো আপস করা হয়নি। গযওয়ায়ে আহযাবের ঘটনা—মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশ চিন্তিত ছিলেন। কাফেরদের অবরোধ দুর্বল করার জন্য তিনি একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। গাতফানের নেতা উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী ও হারিস বিন আউফ মুররির কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তারা যদি নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে কুরাইশ থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং যুদ্ধ বন্ধ করে, তাহলে মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর তাদের প্রদান করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত তাদেরকে ফুসলানোর জন্য এই প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন, চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। কিন্তু যখন দেখলেন, তারা এই প্রস্তাবের ব্যাপারে আগ্রহী, তখন তিনি সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদার সাথে পরামর্শ করলেন। রাসূলের প্রস্তাবে তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্ত কি আপনি নিজের জন্য নিয়েছেন? যদি আপনি নিজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে আছি। না-কি এটা আল্লাহর তরফ থেকে কোনো আদেশ? যদি আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ হয়ে থাকে, তাহলেও আমরা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নেব। না-কি আপনি আমাদের স্বার্থে এমনটা করতে চাচ্ছেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা আমি তোমাদের বাঁচানোর জন্য করতে চাচ্ছি। গোটা আরব তো এক হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে।' তখন সা'দ বিন মুআয রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আর এই লোকগুলো একসময় শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। আমরা আল্লাহকে চিনতামও না, তার ইবাদতও করতাম না। তখন মেহমানদারি বা ক্রয় করা ছাড়া আমাদের একটি খেজুরে হাত দেওয়ার সাহসও তাদের ছিল না আর এখন আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন, হেদায়েত দিয়েছেন, আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে সম্মানিত করেছেন, এখন তাদেরকে আমাদের খেজুর দিয়ে দেবো?! আল্লাহর কসম, তাদের জন্য তরবারি ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং বললেন, 'তোমরা যেটা ভালো মনে করো।' তারপর উয়াইনা আর হারিসকে দূত পাঠিয়ে বলে দিলেন, 'তোমরা চলে যাও, তোমাদের জন্য আমাদের কাছে তরবারি ছাড়া আর কিছু নেই।' [আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার: ইবনে আব্দুল বার; ১/১৭৪]

আল্লাহ তাআলা সুদানের ইসলামী আন্দোলনকে পূর্ণ ৩০ বছর দেশ শাসনের সুযোগ দিয়েছিলেন। শুরুতে ক্ষমতা লাভের পর তারা যে ভালো কাজগুলো করেছে—যেমন: মুজাহিদদের আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি—সেগুলোকে কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক চাপের কথা বলে, কখনো মাসলাহাতের অজুহাতে, কখনোবা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে তারা নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ছাড় দেওয়া শুরু করে। অথচ এই নীতি-আদর্শের কথা একসময় তারাই জোর গলায় বিশ্বের সামনে প্রচার করেছে। আদর্শের ব্যাপারে ছাড় দিতে দিতে একসময় দীন-দুনিয়া দুটোই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। এমনইভাবে ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতালাভ করেছিল। সারা দুনিয়ার মুসলিমরা এই ভেবে খুশি হয়েছিল যে, শরীয়া আইনে পরিচালিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবার। কিন্তু খুনখারাবি, রক্তারক্তি আর বিশৃঙ্খলা ছাড়া আফগানদের তারা কী দিতে পেরেছিল? কিছুই না। উলটো তারা নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। যারা ইসলামের পতাকাতলে রুশ ভল্লুকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে, তারাই একসময় ক্রুসেডারদের সাথে মিলে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করেছে। কী নির্মম পরিণতি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ইস্তিকামাত দান করুন, আমীন। সামসময়িক আরেকটি উদাহরণ হলো রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। ইসলামী আন্দোলনগুলো এখন তাকে রোল মডেল মনে করে, তুরস্কের উন্নতি ও অগ্রগতির রূপকার হিসেবে উপস্থাপন করে। সেই এরদোগান প্রকাশ্যে তার সরকারকে সেক্যুলার সরকার হিসেবে উপস্থাপন করেন, জায়নবাদী ইহুদীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেন, সমকামী ও বিকৃত যৌনাচার (LGBTQ)-এর বৈধতা বহাল রাখেন, তার কয়েক হাজার সৈনিক আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,

তুরস্কের ইনসারলিক এয়ারবেইজ ব্যবহার করে মার্কিন বিমানগুলো ইরাকে ও আফগানিস্তানে বোমা হামলা করে ইত্যাদি। এরচেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে!

শায়খ উমর বিন মাসউদ হাদুশী তাঁর 'القول السديد في معالم التوحيد' বইয়ে লিখেছেন—

> '১৯৮১ সালের ১১ই আগস্ট আল-মুজতামা ম্যাগাজিনের ৫৩১তম সংখ্যায় অধুনা ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রাশেদ ঘানুশীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন—"হাসান আল-বান্নার আন্দোলন মারাত্মক একটি রাজনৈতিক ভুল করেছিল, যে ভুল থেকে তারা এখনো বের হতে পারেননি। তারা ইসলামী আন্দোলনকে সমাজের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যে-কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের কাজ হলো নিজেদের কর্মপন্থার পক্ষে জনসমর্থন তৈরি করে বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করা। কিন্তু তারা ইসলামী আন্দোলনকে এ ধরনের ভূমিকায় দেখতে চাননি। ইসলামী আন্দোলনকে জনগণের অভিভাবক বানানোর এই ইচ্ছার কারণেই আজ অবধি তারা নিজেদেরকে অন্যান্য কমিউনিস্ট, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের মতো ভাবতে সংকোচ বোধ করেন। জনগণের অভিভাবক হয়ে নয়, জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে আমাদের রাজনীতি করতে হবে। আমাদের সমাজ যদি কোনোদিন নাস্তিক বা কমিউনিস্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের বাধা দেওয়ার আমরা কে?'"

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের অধঃপতন যতটুকু না দুর্বলতার কারণে হয়েছে, তারচেয়েও বেশি হয়েছে কর্মপন্থা ও যোগ্য লোকের অভাবের কারণে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট কর্মপন্থা আর এমন উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন, যার অন্ধকার রাতটাও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই পথ থেকে কেবল তারাই বিচ্যুত হবে, যাদের ধ্বংস অনিবার্য। পথভ্রষ্ট ছাড়া কেউ এই পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে যেতে পারে না। তিউনিসিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাজি কায়েদ এসেবসি'র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত রাশেদ ঘানুশী বলেছিলেন—**'প্রজ্ঞাবান, আত্মমর্যাদাশীল ও দেশপ্রেমিক এই নেতার মৃত্যুতে আমাদের সান্ত্বনা কেবল এটাই যে, তিনি দেশকে উজ্জ্বল এক পথের ওপর রেখে গেছেন, দেশকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন!!!'** এসেবসি তো তিউনিসিয়াকে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা রশীদ ঘানুশীর দৃষ্টিতে কি তাহলে এই গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের পথই সঠিক পথ? এ ধরনের ঘটনা দেখেই বোঝা যায়, ইসলামী আন্দোলন মূলত যোগ্য লোকের সংকটে ভুগছে। ইসলামী আন্দোলনে এমন নেতা নেই, যারা এই দীনের প্রকৃতি বোঝে, যারা বিপদাপদে মাথা নোয়ায় না, প্রতিকূল পরিবেশেও হাল ছাড়ে না। এই সংকট মূলত এমন নেতৃত্বের সংকট, যারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে আখিরাত বিকিয়ে

দেয় না, যাদের আইডল হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম। যারা সা'দ বিন মুয়াযের মতো বলবে—'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আমরা আপনার কথা শোনা ও মানার ব্যাপারে আপনাকে ওয়াদা দিয়েছি, অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং হে আল্লাহর নবী, আপনি যেদিকে ইচ্ছা এগিয়ে যান। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে উত্তাল সাগরেও ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরা আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আমাদের কেউ পেছনে থাকবে না। আপনি যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন, যার থেকে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা নিতে থাকুন, আমাদের যে সম্পদ রয়ে যাবে, তারচেয়ে সে সম্পদই আমাদের কাছে বেশি প্রিয়, যা আপনি গ্রহণ করবেন।'

হে ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা, আসুন আমরা একটি কথার ওপর একমত হই—বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ যেন আমাদের গায়া (লক্ষ্য) হয়, রাসূল যেন আমাদের কুদওয়া (আদর্শ) হয়, কুরআন যেন আমাদের দুস্তুর (সংবিধান) হয়, জিহাদ যেন আমাদের সাবীল (পথ) হয় আর আল্লাহর পথে মৃত্যু যেন হয় আমাদের আসমা আমানীনা (সর্বোচ্চ আশা) হয়।

শায়খ উসামা রহ. 'তাওজীহাতুন মানহাজিয়্যাহ'-তে সহওয়া আন্দোলনে সক্রিয় যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন—

'সহওয়া আন্দোলনের প্রাণশক্তি যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দীন কায়েমের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু সক্ষমতা প্রয়োজন, আপনাদের মধ্যে তারচেয়েও বেশি সক্ষমতা আছে। এই সুপ্ত শক্তির বিস্ফোরণের জন্য নিজেদের চিন্তাচেতনাকে অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

**لا تَكونوا إمَّعةً، تقولونَ: إن أحسنَ النَّاسُ أحسنَّا، وإن ظلموا ظلَمنا، ولَكن وطِّنوا أنفسَكم، إن أحسنَ النَّاسُ أن تُحسِنوا، وإن أساءوا فلا تظلِموا**

'তোমরা অনুকরণপ্রিয় হোয়ো না। এ কথা বোলো না যে, লোকেরা যদি সদ্ব্যবহার করে, তবে আমরাও সদ্ব্যবহার করব আর তারা যদি অন্যায় আচরণ করে, তবে আমরাও অন্যায় আচরণ করব; বরং তোমাদের হৃদয়ে এ কথা গেঁথে নাও, লোকেরা সদাচরণ করলে তো সদাচরণ করবেই, এমনকি তারা অসদ্ব্যবহার করলেও তোমরা (তাদের সাথে) অসদ্ব্যবহার করবে না।' [জামে তিরমিযী : ২০০৭]

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যখন চিন্তাভাবনা না করে অন্ধভাবে কারো অনুসরণ করেন, তখন বড় বড় কল্যাণ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যান। অনেক সময় তো আখিরাতও

তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষণীয় একটি ঘটনা আপনাদের শোনাই। ইতিহাসবিখ্যাত দু'জন ব্যক্তি খালেদ বিন ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। আমর ইবনুল আস ছিলেন আরবের প্রবাদপ্রতিম বিচক্ষণ একজন মানুষ আর খালেদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন কিংবদন্তি সমরনায়ক। এত বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা সত্ত্বেও প্রায় ২০ বছর পর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। ২০টি বছর ইসলামের নুর তাঁদের সামনেই ছিল, কিন্তু তাঁরা সেই নুর থেকে মাহরুম ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাঁদের সাথেই চলাফেরা করেছেন, সত্য চেনার মতো উপযুক্ত মেধা ও জ্ঞানও তাঁদের ছিল, কিন্তু তবু ইসলাম গ্রহণ করতে এত দেরি হয়েছিল কেন?

কারণ, অন্ধ অনুসরণ। তাঁরা নিজেরা বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশের রথী-মহারথীদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নিজেদের বিচার-বিবেচনাকে কাজে না লাগিয়ে 'দারুন নদওয়া'র নেতাদের অনুসরণ করতেন। অবশেষে নবুওয়তের প্রায় ২০ বছর পর মক্কা বিজয়ের ক্ষণিক আগে তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন খালেদ বিন ওয়ালীদের এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'খালেদ, তোমার বিবেক এতদিন কোথায় ছিল? ২০ বছরেও তুমি এই আলো দেখলে না?' জবাবে তিনি মহামূল্যবান একটি কথা বলেছিলেন। অন্ধ অনুকরণের রোগে যারা আক্রান্ত, তাদের উচিত খালেদ রাযি.-এর এই কথা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সামনে বড় বড় কিছু মানুষ ছিল, তাদের বিচারবুদ্ধিকেই আমরা চূড়ান্ত মনে করতাম।' তিনি যাদের কথা বলেছিলেন, তারা হলো ওয়ালীদ বিন মুগীরা, আমর বিন হিশাম (আবু জাহেল), উতবা বিন রবীয়া, শাইবা বিন রবীয়া, আস বিন ওয়ায়েল এবং উমাইয়া বিন খলফ। এই লোকেরা মানুষকে বুঝিয়ে রেখেছিল যে, সত্য চেনার ক্ষমতা কেবল তাদেরই আছে। এভাবে তারা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

খালেদ রাযি. যখন এই অন্ধ অনুকরণ থেকে নিজের বিবেককে মুক্ত করলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটালেন, তিনি হয়ে উঠলেন আল্লাহর তরবারি, যে তরবারি পারস্য আর রোম সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলামী শাসনের অধীনে এনেছিল।

তাই আমি বলি, অনেকের মধ্যেই বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সম্ভাবনাময় এই ব্যক্তিরা কাপুরুষ নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে কিংবা জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা ব্যক্তিদের আনুগত্য করে নিজেদের সেই সম্ভাবনাকে কবর দিয়ে রাখেন। সঠিক মানহাজকে

পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই উম্মতের মুক্তি নেই। বিপদ-আপদের ভয়ে এই পথ ছাড়া যাবে না। বিপদাপদ তো কিয়ামত পর্যন্তই এই দাওয়াতের সঙ্গে থাকবে।'

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কি এখনো শিক্ষা নেবে না? না-কি তাদের অবস্থাও বনু কুরাইযার মতো হয়েছে। বনু কুরাইযার লোকদের যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য দলে দলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির করা হচ্ছিল, তখন তারা তাদের নেতা কাব বিন আসাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কাব, তারা আমাদের সাথে কী করবে বলে মনে হয় তোমার? জবাবে কাব বলেছিল, 'তোমরা কি কখনো নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করবে না? দেখছ না, যে তোমাদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, সে কেমন নির্লিপ্ত? যাকে একবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না? আল্লাহর কসম, তোমাদের হত্যা করা হচ্ছে।'

## মিসকুল খিতাম

আল-কায়েদার সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাসের শেষে এই আন্দোলনের পুরোধা ও ইমাম শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর শাহাদাত উপলক্ষ্যে তাঁর কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই। শায়খ উসামার পর যে দুই মহান ব্যক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি, দীনের নুসরতে যারা শায়খের পাশে থেকে আজীবন লড়াই করেছেন, আল-কায়েদার সুবিশাল এই দুর্গ নির্মাণের পেছনে যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই দুই বীরপুরুষ, মিশরের গর্ব শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী ও শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ.-এর ব্যাপারেও কিছু কথা লেখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে বলে মনে করি।

## আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ. স্মরণে

এই তিন মহান নেতার আলোচনায় যাওয়ার আগে সেই মর্দে মুজাহিদের ব্যাপারে কিছু কথা আরজ করা উচিত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই দীনকে শক্তিশালী করেছেন, শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করেছেন। আল্লাহর সাহায্য আর এই মর্দে মুজাহিদের দৃঢ় অবস্থান যদি না থাকত, তাহলে হয়তো ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এই ঘটনাগুলোর জন্মই হতো না। আত্মত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে যিনি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, একজনমাত্র মানুষের জন্য যিনি নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন আর সেই কারণে পুরো দুনিয়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু তিনি কোনো পরোয়া করেননি। তাঁকে যখন হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, শায়খ উসামাকে হস্তান্তর না করলে আমেরিকা পুরো বাহিনী নিয়ে আফগানিস্তানে হামলা করবে এবং আপনার ইমারত ও ক্ষমতা ধূলিসাৎ করে দেবে, তখন তিনি সদর্পে তাঁর সেই

বিখ্যাত উক্তি করেছেন—**'আল্লাহর কসম, তারা যদি আফগানিস্তানের ইট-পাথরকেও পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে দেয়, তবু আমি উসামাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেব না।'**

আপনি কোন ধাতুতে গড়া ছিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমেরিকার বিরুদ্ধে শায়খ উসামার কার্যক্রমকে আপনি চাইলেই শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করতে পারতেন অথবা (আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে কল্পনা করতে পারি) আপনি চাইলেই শায়খকে আফগানিস্তান ছাড়ার আদেশ দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি কিছুই করেননি। আপনার পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। আপনি বরং পুরো বিষয়টিকে উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, শায়খ উসামার প্রতি আর আফগানিস্তানে তার নিঃস্বার্থ অবদানের প্রতি হৃদয়ের গভীরে আপনি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা লালন করতেন। আপনি জানতেন, শায়খ উসামা দুনিয়ার আয়েশি জীবনকে দু'পায়ে ঠেলে নিজের জান ও মাল নিয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমিতে এসেছেন শুধুই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে।

আপনি লাভবান হয়েছেন, হে আমীরুল মুমিনীন। প্রথম দিন থেকেই আপনি হক ও বাতিলের মধ্যকার এই সংঘাতের বাস্তবতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এক বক্তৃতায় আপনি বলেছিলেন—

> 'আমেরিকার কথামতো উসামা বিন লাদেনকে বহিষ্কার করার কোনো মানে হয় না। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আমাদের ওপর অবরোধ আরোপ করেছে। তাদের দাবি, আমরা যেন আরব মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দিই। তাদের দাবি মেনে নিয়ে আমরা যদি আরব মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তান থেকে বের করেও দিই, তবু তাদের সাথে আমাদের লড়াই শেষ হবে না। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি তাদের লক্ষ্য না, যেমনটা তারা বলে; বরং আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতকে ধ্বংস করাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য। এখন যদি তাদের কথামতো তারা যাদেরকে চায় তাঁদেরকে বহিষ্কার করি, তবু তাদের দাবি শেষ হবে না। এরপর তারা দাবি করবে, নারীদের ব্যাপারে যেন আমাদের শরয়ী আইন পরিবর্তন করি, বিরোধীদের ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত বিধান বাতিল করি, অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করি এবং শেষমেশ শরয়ী শাসনব্যবস্থাই যেন বাতিল করি। এর বাস্তব প্রমাণ হলো সুদান। তারা আমেরিকার কথামতো মুজাহিদদের বহিষ্কার করেছিল। সেই যে সুদানের সংকট শুরু হয়েছে, আজ পর্যন্ত তা শেষ হয়নি।'

ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, হে আমীরুল মুমিনীন। আপনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, দৃঢ়তা ও অবিচলতার উপকরণ এবং বিজয় ও ক্ষমতার রহস্য লুকিয়ে আছে ত্যাগ ও কুরবানীর মধ্যে, দীনের নুসরতের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে এবং দুর্বল মুমিনদের সহযোগিতার

মধ্যে। আপনি প্রথম দিন থেকেই বুঝেছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর দীন এবং দুর্বল মুমিনদের সাহায্য করা সহজ কোনো বিষয় না। আনসাররা ছাড়া আরবের কোনো গোত্রই এ ব্যাপারে রাসূলকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি। চাচা আবু তালেবের ইন্তিকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এক এক করে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে যাচ্ছিলেন আর তাদের কাছে প্রস্তাব রাখছিলেন যে, তারা যদি তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেয় এবং সাহায্য করে আর তাদের আশ্রয়ে থেকে যদি তিনি দীনের তাবলীগ করতে পারেন, তাহলে তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত। রাসূলের এই দাওয়াত পেয়েও একমাত্র আনসাররা ছাড়া আরবের কোনো গোত্রই সাড়া দেয়নি। পরোপকারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর যুদ্ধপ্রিয় জাতি হিসেবে তৎকালীন আরব গোত্রগুলোর বেশ নামডাক ছিল, তবু তারা রাসূলের এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। যদিও তারা তখন মুশরিক ছিল, কিন্তু তারা ভালোভাবেই জানত, আল্লাহর দীনের নুসরত অর্থ কী। তারা জানত, এই দায়িত্ব যেনতেন কোনো দায়িত্ব না, এই দায়িত্ব কাঁধে নিলে কঠিন পরিণতি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, চরম বিপদ আর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। তারা জানত, এই দাওয়াত রাজা-বাদশাহরা পছন্দ করবে না, এই দীন কায়েমের জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, লাশের পাহাড় দাঁড় করাতে হবে, ধনসম্পদের কুরবানী দিতে হবে, গোত্রের নেতা ও মুরুব্বীদের হারাতে হবে। তারা জানত, রাসূলের এই প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া মানে আরব ও আজমের শত্রুতা কিনে নেওয়া, লাখো তরবারি নিজেদের দিকে টেনে আনা।

ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, হে আমীরুল মুমিনীন। যুগের কিসরা-কায়সার আর ক্ষমতাধর তাগুতের সামনে আপনি নমনীয় হননি, ভেঙে পড়েননি। তাগুতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি ইতিহাস তৈরি করেছেন। যে ফকীহরা পেছনে থাকার দাওয়াত দেয়, যে নেতারা পথভ্রষ্টতা আর পশ্চাদপসরণের কথা বলে, যে দাঈরা ছাড় দিতে বলে, আংশিক সমাধানের কথা বলে, পরাজিত মানসিকতার কথা বলে, তাঁদের আপনি শিখিয়েছেন, ইজ্জত-সম্মান এবং নীতি ও আদর্শের ওপর কীভাবে পাহাড়ের মতো অবিচল থাকতে হয়।

ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, হে আমীরুল মুমিনীন। আপনি এক ভাষণে বলেছিলেন—

> ‘যদি মুসলিমরা আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর ইতিহাস আমাদের কথা এভাবে মনে রাখে যে, আমরা ইসলামী নীতি-আদর্শের ওপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছি, তাহলে আল্লাহর দরবারে এটাই আমাদের জন্য উত্তম হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, ইতিহাস যদি আমাদেরকে এভাবে মনে রাখে যে, আমরা নীতি ও আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়ে জিহাদের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে ভোগ-বিলাসের জীবন বেছে নিয়েছি, তাহলে এটাই হবে আমাদের জন্য চরম ব্যর্থতা।

যারা মনে করে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, তারা অজ্ঞ; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই।'

ব্যবসা নিশ্চয়ই লাভজনক হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন। কারণ, আপনার অবিচলতা আর দৃঢ়তার সামনে পাহাড়ও হার মেনেছে। বাইয়াতে আকাবার ইতিহাস, আসহাবুল উখদুদ ও আসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং মুসা আ. ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত আপনি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন এবং প্রথম দিন থেকেই হৃদয় দিয়ে তা ধারণ করেছেন। হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহম করুন এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হিসেবে আপনাকে কবুল করুন, আমীন।



আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ.

আমীরুল মুমিনীন রহ.-এর স্মৃতিচারণের এই অংশে আরও একটি বিষয় যুক্ত করা জরুরি বলে মনে হচ্ছে। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর শায়খ হামুদ বিন উকলা শুয়াইবী, শায়খ আলী আল-খুদাইর এবং শায়খ সুলাইমান আল-উলওয়ান ফা.আ. আমীরুল মুমিনীনের অবস্থানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি পাঠকদের জন্য এখানে উল্লেখ করছি।

## শায়খ হামুদ বিন উকলা শুয়াইবী, শায়খ আলী আল-খুদাইর এবং শায়খ সুলাইমান আল-উলওয়ানের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. এবং তাঁর সঙ্গী মুজাহিদীনের প্রতি চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ (আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন এবং হকের ওপর অবিচল রাখুন),

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

দোয়া করি, আমাদের এই চিঠিটি যখন আপনার কাছে পৌঁছাবে, তখন আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে থাকবেন।

আমীরুল মুমিনীন,

আমরা গর্ববোধ করছি যে, আপনার মতো মানুষ এই উম্মতে এখনো আছে। আপনারা মুমিনদের ইজ্জত-সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'মুমিনরাই বিজয়ী' আল্লাহর এই ঘোষণাকে আপনারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। জাগতিক বিজয়ই একমাত্র বিজয় নয়, সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয় তো দীন ও আদর্শের বিজয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, **وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ** 'তোমরা হীনম্মন্য হোয়ো না, চিন্তা কোরো না; যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী'—এই আয়াতে মুমিনদেরকে বিজয়ী বলা হয়েছে। কিন্তু বিজয়ের এই আয়াত কোনো বিজয়ের দিন নাযিল হয়নি, যেদিন সাহাবায়ে কেরাম উহুদ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, এই আয়াতটি সেদিন নাযিল হয়েছিল। এই আয়াত থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আসল বিজয় হলো দীন ও আদর্শের ওপর অবিচলতার বিজয়। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, **اَلإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى** 'ইসলাম সব সময় বিজয়ী হয়, কখনো পরাজিত হয় না।' ইমাম বুখারী রহ. এই হাদীসটি তা'লীকান (শিরোনাম হিসেবে) উল্লেখ করেছেন আর ইমাম তহাবী রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইসলাম ও মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তারাই বিজয়ী। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন— **وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ** 'প্রকৃত সম্মান তো আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের জন্য।' অর্থাৎ ইজ্জত-সম্মান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং যে মুমিনরা দীনকে মজবুতভাবে ধারণ করে, তাদের জন্য নির্ধারিত। যে মুমিন সত্য আদর্শকে মজবুতভাবে ধারণ করবে, সে আল্লাহর দেওয়া সম্মানের কারণেই সম্মানিত, কুরআন ও সুন্নাহর ফরমানেই সে বিজয়ী।

আমীরুল মুমিনীন,

অনেক মুসলমান যদিও আপনাদের ব্যাপারে জানে না, তবু এতে আপনাদের মর্যাদা একটুও কমবে না। কারণ, আপনারা এই উম্মতের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন, পথের দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এই ইতিহাস আমরা নিজ হাতেই লিখব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা জানিয়ে দেব—আপনারাই হলেন পৃথিবীর যোগ্য নেতা। যদি এই যুদ্ধে আপনারা শহীদ হয়ে যান, ইতিহাসে আপনাদের জীবনচরিত লেখা হবে সোনার হরফে। আল্লাহর দরবারে আমরা সবাই আপনাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেব, আপনারাই ছিলেন উম্মতের প্রতি সবচেয়ে আন্তরিক ও প্রকৃত কল্যাণকামী। আমরা আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেব, এমন এক সময়ে আপনারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, যখন ক্রুসেডার আমেরিকার সামনে অধিকাংশ মুসলিম মাথানত করে রেখেছিল; যখন মুসলিমদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল না, যারা আমেরিকাকে 'না' বলতে পারে। কিন্তু আপনারা সিংহের মতো আমেরিকার সব আদেশ-নিষেধকে প্রত্যাখান করেছেন। মুসলিমদের কত সৌভাগ্য, আপনাদের মতো মানুষ তারা পেয়েছে।

আমীরুল মুমিনীন,

আপনাদের কাজকর্মে সমতা আর ইনসাফের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে; ইজ্জত-সম্মান, মদদ-নুসরত আর ওয়ালা-বারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। মহৎ এই গুণগুলোর সঠিক অর্থ আপনারাই উম্মতকে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী জিহাদ যখন সেক্যুলার, কমিউনিস্ট ও রাফেযীদের হাতে ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, জিহাদ-পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যাপারে আমরা যখন নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক তখন আপনাদের উত্থান সেই নিভু নিভু আশার প্রদীপকে রক্ষা করেছে। সারা দুনিয়ার মুসলিম আজ আপনাদের আশায় বুক বেঁধে আছে। চাতক পাখির মতো সবাই চেয়ে আছে, কখন আফগানিস্তানের পবিত্র মাটি থেকে বিজয়ের সংবাদ আসবে। আল্লাহ তাআলা যখন আফগানিস্তানের শাসনভার আপনাদের হাতে ন্যস্ত করলেন আর আপনারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করলেন, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। আপনাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই জিহাদকে হেফাযত করেছেন। তাঁর সাহায্যেই আপনারা যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত একটি দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। সারা দেশে এখন আদল-ইনসাফ আর সত্য দীনের জয়জয়কার। আপনারা শিরকের বিরুদ্ধে লড়েছেন, মাজারপূজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, সম্পদ বণ্টনে সমতা রক্ষা করেছেন, বিচার-আচারে আদল কায়েম করেছেন। এখন কেউ যদি বলে, আপনাদের শাসনের প্রভাবে নেকড়ে আর বকরি একই ঘাঁটে পানি খায়, আশা করি তা অতিরঞ্জন হবে না। আপনারা এখানেই থেমে যাননি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের ওপর আমল করার জন্য পুরো বিশ্বকে আপনারা চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং

কুফরি দুনিয়ার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মূর্তি গুড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের এই সাহসী সিদ্ধান্তে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়েছি। অবশেষে উম্মত এমন মানুষ পেয়েছে, যারা মূর্তিসংহারী ইবরাহীমের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করছে, আলাইহিস সালাম। আপনাদের কাজে আমরা খুশি হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি। কয়েক শতাব্দী ধরে তাওহীদের প্রকৃত মর্ম উম্মতের মধ্যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল, মুসলিমদের দেশে দেশে নানা নামে নানা ধরনের মূর্তি স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, আপনারা সেই মুর্তি সংস্কৃতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ যে খোদার ইবাদত করে, সেই খোদার মূর্তি অক্ষত থাকবে আর আমীরুল মুমিনীন স্বাচ্ছন্দ্যে তার পাশে বসবাস করবেন—এটা আপনি মেনে নিতে পারেননি। তাওহীদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যখন আপনারা সেই মিথ্যা খোদার মূর্তি ধ্বংস করলেন আর তার পূজারীদের লাঞ্ছিত করলেন, খুশি ও আনন্দে আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল। কত বছর, কত দশক আর কত শতাব্দী পর তাওহীদের ঝান্ডা বুলন্দ হলো!! আপনারা আরও অগ্রসর হলেন, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী যিম্মিদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিলেন, ঠিক যেমন ইসলামের প্রথম যুগে তারা অপমানিত জীবনযাপন করত এবং জিযয়া আদায় করত। এ দৃশ্য দেখে আমরা বলতে লাগলাম, আফগানিস্তানে এ যুগের উমরের আবির্ভাব হয়েছে।

এত এত পরীক্ষার পর অবশেষে আসল পরীক্ষাও চলে এলো। আপনাদের কাছে আশ্রয় নেওয়া নিরপরাধ মুহাজিরদের বিরুদ্ধে পুরো বিশ্ব ক্ষেপে উঠল। তাঁদের দোষ এটাই যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র রব বলে বিশ্বাস করে। পূর্ব-পশ্চিমের সব কাফের, ইহুদী, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক, কমিউনিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, মুরতাদ আর মুনাফিক মিলে আপনাদের বিরুদ্ধে জোট গঠন করল, আপনাদের ইজ্জত-সম্মান আর ক্ষমতা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু আপনারা এ পরীক্ষাতেও উতরে গেলেন। পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে আপনারা তাদের সামনে দাঁড়ালেন। তাদের সুবিশাল সেনাবাহিনী কিংবা গণবিধ্বংসী অস্ত্র—কোনোকিছুই আপনাদের ভয় দেখাতে পারল না। আপনারা ইজ্জত ও সম্মানের পথে অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। অথচ সারা দুনিয়া আপনাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করল, অনেকের আকীদা বদলে গেল, মুসলিম নামধারী অনেকের মধ্যে ইসলামবিধ্বংসী চিন্তা প্রকাশ পেতে থাকল। চূড়ান্ত বৈরী এই পরিস্থিতিতেও আপনারা অবিচল থাকলেন, দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কাফের জোট পূর্ণ শক্তি আর অত্যাধুনিক সব অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আপনাদের ওপর। সর্বগ্রাসী এই আক্রমণের দৃশ্য ইতিহাসে হয়তো কেউ দেখেনি, ক্ষুদ্র একটি মুমিন বাহিনীর বিরুদ্ধে এত বড় বাহিনীর হামলার ঘটনাও হয়তো কখনো ঘটেনি। আপনারা ক্ষমতা ছাড়লেন, জান ও মালের কুরবানী দিলেন, পদে পদে আপনাদের ঈমান ও ইখলাস বৃদ্ধি পেতে থাকল।

হানাদার বাহিনীর সুবিশাল এই জোটের চেয়েও বড় ও শক্তিশালী ছিল আপনাদের ঈমান। এটাই আমরা বিশ্বাস করি।

আমীরুল মুমিনীন,

যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু আমরা আপনাকে সুনিশ্চিত বিজয়ের আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এই বিজয়ের আলামত ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আর প্রকৃত যে বিজয় আপনারা অর্জন করে ফেলেছেন, তার জন্যও আপনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের এই বিজয় আদর্শিক বিজয়, শত্রুবাহিনীর অধঃপতিত নীতি ও আদর্শের ওপর আপনারা ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন। শত্রুরা তাদের বক্তৃতায় বলে বেড়ায়, তারা ন্যায়ের পক্ষে, মানবাধিকারের পক্ষে, স্বাধীনতা ও সাম্যের পক্ষে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ তাদের চেহারার মুখোশ খুলে দিয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই এখন দেখতে পারছে, জায়োনিস্ট-ক্রুসেডারদের চেহারা কতটা কুৎসিত আর কদাকার। মানুষ বুঝতে পারছে, নিরপরাধ মানুষকে কারা হত্যা করে, কারা কোনো জীবের প্রতি নূন্যতম দয়াও দেখায় না। আমরা দেখেছি, তাদের বানানো আইনে স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু, ধর্মীয় সহাবস্থান আর ইন্টারফেইথের যে বুলি তারা আওড়ায়, তার বাস্তবতা কতটুকু সেটাও আমরা বুঝেছি। এ সব বুলির আড়ালে তারা আসলে আমেরিকার জংলি সভ্যতা আর ক্রুসেডীয় বিশ্বাসের প্রচার করতে চায়। আদর্শিক এই যুদ্ধে আপনারা তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছেন, এই বিজয় আপনাদের জন্য মোবারক হোক। আপনারা গোটা বিশ্বকে দুটি শিবিরে ভাগ করে দিয়েছেন। ক্রুসেডারদের বানানো প্রতিটি মিথ্যা ও প্রতারণাকে আপনারা আপনাদের ঈমান, তাওয়াক্কুল আর অবিচলতার মাধ্যমে ধ্বংস করে গাফেল ও উদাসীনদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন।

আমীরুল মুমিনীন,

আপনাদের সুদৃঢ় অবস্থান যেভাবে কাফেরদের মিথ্যা দাবির মুখোশ খুলে দিয়েছে, একইভাবে মুসলিমদের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় অনেক আকীদা-বিশ্বাসকেও পুনর্জীবন দান করেছেন। আপনাদের থেকেই আমরা শিখেছি, মুসলিমদের কাছে শক্তির মানদণ্ড কী হওয়া উচিত। আপনাদের অবিচলতা ওয়ালা-বারার আকীদাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, জিহাদের দর্শনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে, জয়-পরাজয়ের প্রকৃত অর্থকে স্পষ্ট করেছে, আল্লাহর জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর সবক দিয়েছে। আমরা শুনেছি, মুহাজিরদের থেকে সমর্থন উঠিয়ে নেওয়ার বিনিময়ে আপনাদের ক্ষমতা বহাল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মুনাফিকদের পক্ষ থেকে কখনো লোভ দেখিয়ে আর কখনো ভয় দেখিয়ে আপনাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে আপনারা আদর্শের ব্যাপারে আপস করতে রাজি হন, তাদের এ সব প্রস্তাবে সাড়া দিলে অবশ্যই আপনারা বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হতে পারতেন, কিন্তু যে অন্তরে ঈমান মিশে

আছে, সে অন্তর এমন নীচু কাজ কিছুতেই করতে পারে না। আরবরা ইহুদী সামাওআল বিন আদিয়াকে নিয়ে গর্ব করে। বিখ্যাত আরব কবি ইমরুল কায়েস তার কাছে কিছু সম্পদ আমানত রেখেছিল। শামের বাদশাহ হারেস বিন জাবালা গাসসানী সেই সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য সামাওআলকে অনেক জোরজবরদস্তি করেছিল, তার ছেলেকে তার সামনেই হত্যা করেছিল, কিন্তু সামাওআল সম্পদের সন্ধান দিতে রাজি হয়নি। সে ইমরুল কায়েসের বংশধরদের জন্য সে সম্পদ রক্ষা করেছিল। সেই থেকে আরবরা সামাওআলের বিশ্বস্ততা ও অবিচলতাকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে। আপনারা যে অবিচলতা দেখিয়েছেন, তা সামাওআলের অবিচলতা থেকেও হাজার গুণ বড়। মুসলিমদের উচিত দৃঢ়তা আর অবিচলতার উদাহরণ দিতে চাইলে যেন আপনাদের দিয়ে দেয়।

আমীরুল মুমিনীন,

আপনাদের অবস্থানের প্রতি আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ, যদি না আপনারা বদলে যান, হীনম্মন্যতার শিকার হন কিংবা এই অবস্থান থেকে পিছিয়ে আসেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের আমৃত্যু এই পথে অবিচল রাখেন। আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা এবং উলামায়ে কেরাম, দাঈ ও তালেবে ইলমদের বড় একটি অংশ আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থন এখনো আছে, সামনেও থাকবে। পরাজিত মানসিকতার শিকার মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি, যারা আপনাদের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করছে, তাদের কথায় ও আচরণে আপনারা ব্যথিত হবেন না, তাদের তিরস্কার যেন আপনাদের হিম্মতে চিড় ধরাতে না পারে। তারা মনে করে, আপনাদের জাতির এই পরিণতির জন্য আপনারাই দায়ী। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা যা করেছেন, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। শরীয়তের অসংখ্য দলীল আপনাদের অবস্থানকেই সমর্থন করে। এ সিদ্ধান্তের কারণে আপনাদের ওপর এবং আফগান জাতির ওপর যে বিপর্যয় ও পরীক্ষা নেমে এসেছে, সেটা তো আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে আল্লাহ এই বিপদ দিয়েছেন, তিনিই তো বিপদের সময় তার ওপর তাওয়াক্কুলের আদেশ করেছেন, তার নির্দেশ মানতে বলেছেন, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব এবং কাফেরদের সাথে শত্রুতা রাখতে বলেছেন, সম্ভাব্য সকল পন্থায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন এবং তিনিই আপনাদের বিজয় ও ক্ষমতার ওয়াদাও করেছেন। আল্লাহর সব নির্দেশ মানার পরেও যদি দুনিয়ার বিজয় অর্জিত না হয়, আল্লাহ তাআলা সেটাকেও বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসহাবুল উখদুদ তো দুনিয়ার বিজয় অর্জন করতে পারেনি, তবু আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করে বলছেন—إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, তাঁদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। এটাই তো মহাসাফল্য।' আসহাবুল

উখদুদ কী এমন কাজ করেছিল, যাকে মহাসাফল্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে? তাঁরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছিল, দীনের ওপর অটল-অবিচল ছিল, আদর্শের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি; এমনকি এ কারণে তাদের জান পর্যন্ত দিতে হয়েছে। দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে তারা হয়তো পরাজিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মহাসাফল্যের অধিকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যে ঘোষণা অন্য কারো ব্যাপারে দেননি।

আমীরুল মুমিনীন,
আপনার কাছে এবং ইমারতে ইসলামিয়ার অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। আপনার নায়েব মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান, মৌলবী জালালুদ্দীন হক্কানী, মৌলবী আব্দুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, মোল্লা দাদুল্লাহ, মোল্লা রইস আব্দুল্লাহ, ট্যাংক ব্রিগেডের কমান্ডার মোল্লা খাসকার-সহ ইমারতে ইসলামিয়ার অন্যান্য সকল নেতাদের প্রতি, তাঁদের সমর্থক মুজাহিদীন ও অন্যান্য মুজাহিদ নেতাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ—আপনাদের এই জিহাদ অব্যাহত রাখুন, নিজেদের অবস্থানে শক্ত থাকুন। আপনাদের দেখে তাওহীদবাদীদের চক্ষু শীতল হয়েছে, রহমানের সেনাবাহিনী খুশি হয়েছে। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে আপনাদের সাহায্য করে যাব, মুমিনদেরকে আপনাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে যাব। আপনারা আপনাদের অবস্থান বদলাবেন না, ভয় পাবেন না, নরম হবেন না, নিশ্চয়ই আপনারাই বিজয়ী হবেন। আপনাদের আদর্শে অটল থাকুন, বরকতময় কাজের এই ধারা অব্যাহত রাখুন, জিহাদের মাধ্যমে উম্মতের শির উঁচু রাখুন। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা আনন্দিত হব, ইমারতে ইসলামিয়া বিজয়ীরূপে পূর্বের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে আমাদের মাঝে আবারও ফিরে আসবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশের ওপর অবিচল থাকুন। বিজয় দেওয়ার দায়িত্ব তো তারই হাতে।

পরিশেষে, পৃথিবীর সকল মুসলিমের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, সম্মিলিত কুফফার জোটের বিরুদ্ধে চলমান এই জিহাদে আপনারা ইমারতে ইসলামিয়াকে সাহায্য করুন। আফগান জাতিকে আমরা আহ্বান জানাই, আপনারা আল্লাহর জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকুন, ইমারতে ইসলামিয়াকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করুন এবং আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। আমীরুল মুমিনীন ও মুজাহিদদের প্রতি আমাদের অসীয়ত, বিজয় ও তামকীনের (ক্ষমতা অর্জনের) শর্তগুলো আপনারা পূরণ করার চেষ্টা করুন, যে শর্তগুলোর কথা কুরআনে ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের যে আয়াতগুলোতে তামকীনের শর্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এমন কিছু আয়াত আপনাদের খেদমতে আরজ করছি।

১. ঈমান, নেক আমল এবং শিরক থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকা বিজয় ও তামকীনের অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।’ [সূরা নুর (২৪) : ৫৫]

২. আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা তামকীনের অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

‘মূসা তার কওমকে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই জমিন আল্লাহর। তার বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান, তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শেষ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।’ [সূরা আ’রাফ (৭) : ১২৮]

৩. আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল তামকীনের শর্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

‘আর মুসা বলল, হে আমার কওম, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তারই ওপর তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।’ [সূরা ইউনুস (১০) : ৮৪]

৪. ভেতরে ও বাইরে সৎ থাকা এবং দাসত্বের মর্ম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা তামকীনের শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

‘আর উপদেশ দেওয়ার পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।’ [সূরা আম্বিয়া (২১) ১০৫]

৫. আল্লাহর রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতকে স্বীকার করা এবং শরীয়তের ওপর অটল-অবিচল থাকা তামকীনের শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ**

‘নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহই আমাদের রব, অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে) তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা কোরো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।’ [সূরা হামীম সাজদাহ (৪১) : ৩০]

এ ছাড়াও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিজয় ও তামকীনের আরও অনেকগুলো শর্ত উল্লেখ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশ কিছু হাদীসেও বিজয় ও তামকীনের শর্তের কথা উঠে এসেছে। এমন একটি হাদীস এখানে আরজ করছি। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমাম আহমাদের শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন—

**كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيِّمُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**

‘আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে একটি বাহনে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, হে বৎস, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শেখাব না, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, আল্লাহর (আহকামের) হেফাযত করো, তিনি তোমার হেফাযত করবেন। আল্লাহর (আহকামের) হেফাযত করো, তুমি তাঁকে সামনেই পাবে। সুখের সময় তুমি তাঁকে স্মরণ রাখো, দুঃখের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। যদি কিছু চাইতে হয়, তবে আল্লাহর কাছেই চাও। যদি সাহায্যের দরকার হয়, তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। ভবিতব্য সবকিছু লেখা হয়ে গেছে, কলমের কালিও শুকিয়ে গেছে। যদি সকল সৃষ্টি মিলে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যেটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রাখেননি, সে উপকার তারা করতে পারবে না।

এমনইভাবে সকলে মিলে যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যেটা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিখে রাখেননি, সে ক্ষতিও তারা করতে পারবে না। জেনে রাখো, অপছন্দনীয় মুসীবতের ওপর ধৈর্যধারণ করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সবরের পরেই বিজয় আসে, অভাবের পরেই সচ্ছলতা আসে আর কষ্টের পরেই আসে শান্তি।' [মুসনাদে আহমাদ : ২৬৬৯; জামে তিরমিযী : ২৫১৬]

জেনে রাখুন, আপনারা যদি বিজয় ও তামকীনের শর্তগুলি বাস্তবায়নের জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করবেন এবং শত্রুদের লাঞ্ছিত করবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা, তিনি কখনো ওয়াদাখেলাফি করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, সেদিন সাহায্য করব।' [সূরা গাফির (৪০) : ৫১]

তিনি আরও বলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ

'যারা কুফরি করেছে, তারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সেসব তাদের পরিতাপের কারণে পরিণত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।' [সূরা আনফাল (৮) : ৩৬]

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দুটি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফের। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ তাআলা নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা।' [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসবে, দীন বিজয়ী হবে এবং পৃথিবীজুড়ে দীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন—

لَيَبْلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلَغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يَترُكُ اللهُ بَيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلَّا أَدخَلَه اللهُ هذا الدِّينَ، بعِزِّ عَزيزٍ أو بذُلِّ ذَليلٍ؛ عِزًّا يُعِزُّ اللهُ به الإسلامَ، وذُلًّا يُذِلُّ اللهُ به الكُفرَ

'রাত ও দিন যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, অবশ্যই এই দীন ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। কাঁচা-পাকা কোনো ঘর বাদ যাবে না, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরেই এই দীনকে পৌঁছিয়ে দেবেন; সম্মানিতদের জন্য সম্মানের সাথে আর নিচ লোকদের জন্য লাঞ্ছনার সাথে। সম্মানিতকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করবেন আর লাঞ্ছিতকে কুফরির মাধ্যমে লাঞ্ছিত করবেন।' [মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯৫৭]

কবি যেন আপনাদের কথাই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বড় সুন্দর ভাষায় কবি বলেছেন—

كُن كَالسَمَوأَلِ إِذ سارَ الهُمامُ لَهُ ... في جَحفَلٍ كَسَوادِ اللَيلِ جَرّارِ

তুমি সেই সামাওআলের মতো হও, যার কাছে এক শক্তিশালী শত্রু এসেছিল এমন এক সেনাদল নিয়ে, যা ছিল গভীর রাতের আঁধারের মতো বিশাল ও ভয়ংকর।

جارُ اِبنِ حَيّا لِمَن نالَتهُ ذِمَّتُهُ ... أَوفى وَأَمنَعُ مِن جارِ اِبنِ عَمّارِ

ইবনে হাইয়ার প্রতিবেশী (সামাওআল) ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার আশ্রয়ে কেউ এলে, তিনি তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতেন। তিনি ইবনে আম্মারের মতো আরবের বিখ্যাত আশ্রয়দাতার চেয়েও বেশি নিরাপত্তাদাতা ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

بِالأَبلَقِ الفَردِ مِن تَيماءَ مَنزِلُهُ ... حِصنٌ حَصينٌ وَجارٌ غَيرُ غَدّارِ

তাইমা অঞ্চলের 'আবলাক আল-ফারদ' নামক দুর্গে ছিল তাঁর বাসস্থান, সেটি ছিল নিরাপদ একটি দুর্গ আর তার ভেতরের আশ্রয়দাতা ছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা থেকে শতভাগ মুক্ত।

إِذ سامَهُ خُطَّتَي خَسفٍ فَقالَ لَهُ ... مَهما تَقُلهُ فَإِنّي سامِعٌ حارِ

যখন তার (সামাওআলের) সামনে অপমানজনক দু'টি প্রস্তাব দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, "তুমি যা-ই বলো না কেন, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।"

فَقالَ ثُكلٌ وَغَدرٌ أَنتَ بَينَهُما ... فَاِختَر وَما فيهِما حَظٌّ لِمُختارِ

তখন বলা হলো, 'তোমার সামনে দুটি পথ আছে—হয় নিজের সন্তানের বলি দাও, না হয় মেহমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো। তুমি বেছে নাও, যদিও এই দুটির কোনোটিই ভালো পরিণতি নয়।'

فَشَكَّ غَيرَ قَليلٍ ثُمَّ قالَ لَهُ ... اِذبَح هَدِيَّكَ إِنّي مانِعٌ جاري

তিনি খানিক দ্বিধায় পড়েছিলেন, তারপর বললেন, "তুমি চাইলে আমার সন্তানকে বলি দাও, কিন্তু আমি আমার মেহমানকেই রক্ষা করব।"

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين

ইতি
আপনাদের ভাই
হামুদ বিন উকলা শুআইবী
আলী বিন খুদাইর আল-খুদাইর
সুলাইমান বিন নাসের আল-উলওয়ান
১৬/১০/১৪২২ হিজরী

শায়খ হানী আস-সিবায়ী হাফি. তাঁর বই 'التجلية في الرد على التعزية'-তে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ.-এর ব্যাপারে লিখেছেন—

'আমি প্রায় নিশ্চিত, মোল্লা উমর আমাদের এই শতাব্দীতে এলেও তিনি আসলে প্রথম শতাব্দীর মুসলিমদের সেই বরকতময় কাফেলার মানুষ। তাঁর মধ্যে যুহদ, তাকওয়া, সবর, বাহাদুরি, বদান্যতা আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর যে অপূর্ব মিলন ঘটেছে, তা থেকেই এই ধারণা আরও পোক্ত হয়। মহান বীর, ন্যায়পরায়ণ শাসক, জিহাদ, ইখলাস ও অবিচলতার প্রতীক এই মানুষটির জীবনী তো কলেজ-ভার্সিটিতে আমাদের তরুণ ও যুবকদের পাঠ্য হিসেবে পড়ানো উচিত।

আগে আমরা আরবী সাহিত্যের বইগুলিতে সামাওআলের বিশ্বস্ততার গল্প পড়তাম। তার কাছে ইমরুল কায়েসের কিছু আমানত রাখা ছিল। ইমরুল কায়েসের শত্রু কোনো এক আরব বাদশাহ আমানতের সম্পদগুলো সামাওআল থেকে নেওয়ার জন্য তার দুর্গ অবরোধ করে। কিন্তু সামাওআল তাকে সে সম্পদ দিতে অস্বীকার করে। অবরোধকারীরা সামাওআলের এক ছেলেকে হত্যা করে ফেলে, কিন্তু সামাওআল তারপরেও আমানতের খেয়ানত করতে রাজি হয়নি। পরে ইমরুল কায়েসের ওয়ারিশদের কাছে তার আমানত রাখা বর্ম ও সম্পদ হস্তান্তর করে। সামাওআল তখন গর্ব করে বলেছিল—

وفيتُ بأدرع الكندي إني ... إذا ما خان أقوامٌ وفيتُ

আমি (ইমরুল কায়েস) কিন্দির (আমানত রাখা) বর্মগুলো রক্ষা করেছি, যখন সবাই খেয়ানত করছিল, আমি তখন আমানত রক্ষা করেছি।

সামাওআলের এই আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার ঘটনা জাহিলী যুগে ঘটেছিল। তাহলে ইসলামের আমানতদারিতা কতটা মহান হবে! এ কথা বললে একটুও বাড়াবাড়ি হবে না যে, শায়খ উসামা বিন লাদেন, ডক্টর আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং অন্যান্য বিদেশি মুজাহিদদের প্রতি মোল্লা মুহাম্মাদ উমর যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, তাদের রক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, মানবজাতির ইতিহাসেও নজিরবিহীন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'[১০৭]

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-এর স্মরণে অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে হৃদয়গ্রাহী একটি কবিতা লিখেছেন শায়খ হামেদ বিন আব্দুল্লাহ আলী। পাঠকদের জন্য কবিতাটি এখানে তুলে দেওয়া হলো—

**كففتُ الدمعَ عن عيني فراحتْ ... تكفُّ الكفَّ عن عيني بكفّي**

আমি চোখের অশ্রু থামানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমার হাতকেই সরিয়ে দিতে লাগল।

**وقالت: دعْ دموعَ العينِ سحًّا ... فلو سحّتْ بحارٌ لا توفّي**

সে বলল: "চোখের অশ্রু ঝরতে দাও অবিরাম, চোখের অশ্রু দিয়ে যদি সাগরও হয়ে যায়, তবু এই শোক ঘুঁচবে না।"

**وزادت: كيفَ لا أبكي عظيمًا ... به الأمجادُ نيشانٌ بكِتْفِ**

আরও বলল: "আমি কীভাবে এমন এক মহাবীরের জন্য না কেঁদে থাকব, যার কাঁধে ছিল গৌরবের পদক, সম্মানের চিহ্ন।

**به كلّ المكارم مثل تاجٍ ... على قِرْمٍ كريمٍ مستعِفّ**

তাঁর মধ্যে ছিল সব গুণ, রাজমুকুটের মতো; এক মহান, পরহেজগার, উদার বীরের মাথায় জ্বলজ্বল করত সে মুকুট।

**جسورٌ بالمعارك لا يُجارى ... كليثِ بالفوارس مسْتخِفّ**

যুদ্ধে তিনি ছিলেন অসীম সাহসী, কারো সাথে তার তুলনা চলে না। তিনি ছিলেন সিংহের মতো, যে কোনো শিকারীকেও পরোয়া করে না।

**على الأعداء بالهيجا شديدٌ ... وبالأفغانِ معروفٌ بعطْفِ**

শত্রুর বিরুদ্ধে ছিলেন প্রচণ্ড কঠোর, কিন্তু আফগানদের প্রতি ছিলেন অবারিত স্নেহশীল।

[১০৭] আত-তাজলিয়া ফির-রদ্দি আলাত-তা'রিয়াহ : শায়খ হানী আস-সিবায়ী

**به الأفغانُ قد عزّت فصارت ... تدكُّ معاقل الأعداء بخسْف**

তাঁর দ্বারা আফগানরা পেল সম্মান ও শক্তি এবং তাঁর নেতৃত্বে শত্রুর দুর্গে বজ্রের মতো কঠিন শক্তিতে আঘাত হানতে লাগল।

**تجلّت عزّة الإسلام فيهِ ... كعزِّ الأولينَ بكلّ حرْفِ**

তাঁর মাঝে ইসলামের গৌরব প্রকাশ পেল, পূর্বপুরুষের মধ্যে যেমন গৌরব ছিল।

**ولما خطّ بالأفغان دربًا ... إلى العلياء مقرونًا بسيْفِ**

যখন তিনি তরবারির ধার আর আত্মত্যাগের শক্তি দিয়ে আফগানদের জন্য সম্মানের পথ বানিয়ে দায়িত্ব আদায় করলেন,

**ترجّل شامخًا فالموت حقُّ ... وآجال البريّة مثل قطْفِ**

মাথা উঁচু করে জীবন থেকে অবসান নিলেন, কারণ মৃত্যু সত্য। প্রতিটি প্রাণের আয়ু যেন গাছে পাকা ফল, একদিন ছিঁড়ে পড়বেই।

**يحينُ كما يحينُ حصادُ زرعٍ ... بإذن الله لا يأتي بحيفِ**

যেমন ফসল কাটার সময় আসে ঠিক সময়ে, তেমনই আল্লাহর হুকুমেই মৃত্যু আসে, কোনো জুলুম নেই এতে।

**وألقى بالخلود زمامَ رحْلٍ ... وبالتاريخ خُطّ بخيروصفِ**

তিনি অমরত্বের যাত্রায় পা রাখলেন, ইতিহাস তাঁকে মনে রাখল শ্রেষ্ঠ গুণাবলির কারণে।

**وكان مجاهدًا فيهم حكيمًا ... وينهي عن مقاتلةٍ بعسْفِ**

তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী মুজাহিদ, যিনি অন্যায় যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করতেন।

**وعن طيشِ الجهول، وعن غُلوّ ... تدثّر بالجهاد بلبْس زيْفِ**

তিনি মূর্খতার উগ্রতা ও অতিরঞ্জন থেকে দূরে ছিলেন, জিহাদের পোশাক পরে তিনি কোনো প্রতারণার আশ্রয় নেননি।

**عدمتُ الشعر لا يختارُماّ ... يكيل له المديح بكلّ صنفِ**

কবিতারা সব হারিয়ে গেছে, তাঁর প্রশংসা করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাই না।

**أغيظ عدوّنا و أنال أجرًا ... وأرمي الكافرين بمثل قصفِ**

আমিও যেন (তাঁর মতো) শত্রুর মনে ক্ষোভ জাগাই এবং সওয়াব লাভ করি, আর কাফেরদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠি বজ্রের মতো।

## শায়খ উসামা রহ.-এর শাহাদাত: যে শোক যায় না ভোলা

আমার যা দেখার ছিল, সব দেখার পর; যা জানার ছিল, সব জানার পর; যখন মৃত্যু তার নখর মেলল কাছে এসে, যখন রাত হিংস্র হয়ে প্রভাতকে গ্রাস করতে এলো, তখন মৃত্যুই হয়ে উঠল পরম আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের জন্য শান্তির সুর। সে (মৃত্যু) আমাদের সারি থেকে বেছে নিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের। সে তুলে নিল তাঁদের, যারা ছিল আমাদের মাঝে মহান, যারা আঁধার চিড়ে দিনের আলো নিয়ে আসত। সবচেয়ে সম্মানিত, শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষদের সে বেছে নিল সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা শাহাদাতেরর জন্য। তাদের প্রতি রইল আমাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর চিরন্তন শান্তির সালাম।[১০৮]



শায়খ উসামা রহ.-এর শাহাদাতের পর অনেকেই শোকপ্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে শায়খ আবুল মুনযির শানকীতী হাফি.-এর **'على خطى الشيخ أسامة** (শায়খ উসামার পদচিহ্ন ধরে)' শিরোনামের লেখাটি ছিল ভিন্ন ধরনের। শায়খ রহ.-এর শাহাদাতের চারদিন পর ১৪৩২ হিজরীর ৩রা জুমাদাস সানী শুক্রবার তিনি এই লেখাটি লিখেছিলেন। শায়খের লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

**الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.**

'শায়খ উসামা ছিলেন উম্মতের কণ্ঠস্বর। তাঁর ভারী ও বিষণ্ন কণ্ঠে আমরা শুনতে পেতাম আহতদের আর্তচিৎকার, এতীম ও বিধবাদের আহাজারি আর দুধের শিশুদের অবুঝ কান্না। জুলুমের কষাঘাতে জর্জরিত উম্মতের অশ্রু ঝরে পড়ত তাঁর দু'চোখ বেয়ে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল উম্মতের হৃৎস্পন্দন ও অনুভূতির দর্পণ। তাঁর কাজে ফুটে উঠত উম্মতের সুপ্ত

[১০৮] বিখ্যাত কবি আবু মাযেন সূরীর লেখা একটি কবিতার শুরুর কয়েকটি লাইন।

আবেগ। লাখো মুসলিমের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রাখা দুঃখ-বেদনাগুলোই তাঁর কথায় জীবন্ত হয়ে উঠত।

৩০টি বছর তিনি জিহাদের ঝান্ডা ধারণ করেছেন, দীন ও উম্মতের হেফাযত করেছেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁকে কবুলিয়ত দান করেছিলেন, মুসলিমদের হৃদয়ে তাঁর মুহাব্বাত ও ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছিলেন আর কাফেরদের জন্য তাঁকে বানিয়েছিলেন যমদূত। শান্ত ভঙ্গিতে বলা তাঁর কথাগুলো পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে যেত, মানুষের হৃদয়ের গভীরে জায়গা করে নিত, বন্ধুদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করত আর শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। তাঁর জিহাদী জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণই যেন উঠে এসেছে আল্লাহ তাআলার এই কথায়—اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ 'তাঁরা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর।'

তাঁর নির্দেশনা ও আহ্বান শুনে মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হতো আর তাঁর হুমকি-ধমকিতে কাফেররা দিশেহারা হয়ে যেত।

**فبأس يذوب الصخر من حر ناره ... ولُطفٌ له بالماءِ ينبجسُ الصَّخرُ**

তার কঠোরতা এমন, যার উত্তাপে পাথর পর্যন্ত গলে যায় ... আর কোমলতাও এমন যে, পাথর ফেটে পানির ফোয়ারা উৎসারিত হয়

দীন ও উম্মতের স্বার্থে তাঁর যা-কিছু ছিল, সব কুরবান করেছেন; নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করেছেন, পরিবার-পরিজন ও দেশ ছেড়েছেন। তিনি শুধু ত্যাগ করেছেন, কিন্তু কিছুই চাননি; দিয়েই গিয়েছেন, কিছুই গ্রহণ করেননি। এটাই তো আল্লাহর কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশী সাদিকীনের স্বভাব। এত কুরবানী আর ত্যাগ সত্ত্বেও অসুস্থ অন্তরের অধিকারী কিছু মানুষ তাঁকে অবজ্ঞা করে। কী আশ্চর্যের বিষয়, জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা কিছু পাপিষ্ঠ লোক মহান মুজাহিদদের ব্যাপারে মন্তব্য করার সাহস করে কীভাবে?

তারা তো দু'টি অপরাধে অপরাধী। জিহাদ না করে বসে থেকে একটি অপরাধ করেছে, আবার মুজাহিদদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করে আরেকটি অপরাধ করেছে।

**هو البطل الشهم الأغر السميدع الـ ... همامُ السريُّ الأكرمُ المتكرّمُ**

তিনি তো সাহসী, সম্মানিত, মহাবীর, শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী, মহৎ ও উদার।

**وقد جحدت قومٌ عظيم مقامه ... وقالوا بما قالوا ضَلالًا وأبهموا**

কিছু লোক তাঁর মহান মর্যাদা অস্বীকার করে বিভ্রান্তিকর কথা বলেছে, কিন্তু সবই ছিল অস্পষ্ট।

**وما أنكرت أعداؤه عن جهالة ... مناقبَه العُظمى ولكنَّهم عَمُوا**

তাঁর শত্রুরা অজ্ঞতার কারণে তাঁর মহৎ গুণগুলো অস্বীকার করেনি; বরং দেখেও অন্ধের মতো এড়িয়ে গিয়েছে।

আমাদের শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ইজ্জত ও সম্মানের পথে অবিচল ছিলেন। সবাই যখন মাথানত করেছিল, তখন তিনি শত্রুর সামনে মাথা উঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি আমাদের সামনে বীরত্ব ও আত্মমর্যাদার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কুফরের সম্মিলিত বাহিনী আর অহংকারী জালেমদের বিরুদ্ধে তিনি একাই রুখে দাঁড়িয়েছেন। তারা যখন একের পর এক ষড়যন্ত্র করেছে, নানামুখী চক্রান্ত করেছে, তখনও কাপুরুষতা তাকে কাবু করতে পারেনি; মৃত্যুকে বরণ করতে রাজি হয়েছেন, তবু লাঞ্ছনার চাদর গায়ে জড়াননি।

**قالت فَلا كذبَتْ شَجاعَتُه ... أقْدِمْ فنَفْسُكَ مَا لهَا أجَلُ**

তার বীরত্ব তাকে বলল—আর বীরত্ব কখনো মিথ্যা বলে না—অগ্রসর হও, তোমার কোনো বিনাশ নেই।

**فَهُوَ النِّهَايَةُ إنْ جَرَى مَثَلٌ ... أوْ قيلَ يَوْمَ وَغًى مِن البَطَلُ**

কারণ, যদি কোনো প্রবাদ তৈরি হয় কিংবা যুদ্ধের ময়দানে বলা হয়, কে বীর? তবে সে-ই তো হবে বীর।

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বগাঁথাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সম্মান, বিজয় ও গৌরবের দিনগুলির কথা আপনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আপনার কারণেই আমরা নতুন করে মাথা উঁচু করতে পেরেছি, অস্ত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছি। আপনার উসিলাতেই আমরা আমাদের পূর্বসূরী খালেদ, সা'দ, মুসান্না ও মিকদাদের মতো বীর মুজাহিদদের পথে চলার সাহস করেছি।

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে দীনকে শক্তিশালী করেছেন, আপনার মাধ্যমেই জিহাদকে মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আপনার মাধ্যমেই কাফেরদের লাঞ্ছিত করেছেন। আপনি অহংকারী মার্কিনিদের মাথানত করতে বাধ্য করেছেন, যারা এতকাল নিজেরা সুরক্ষিত থেকে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আপনি তাদের ঘরে ঢুকে তাদের ওপর যুদ্ধের আযাব নামিয়ে এনেছেন, চিরকালের জন্য তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের ইতিহাস রচনা করেছেন।

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
যদি দীন ও সত্যের বাণী ঘোষণা করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি তা করেছেন।
যদি শত্রুকে লাঞ্ছিত করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি শত্রুকে লাঞ্ছিত করেছেন।
যদি কাফেরদের ক্রোধান্বিত করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি তাদের ক্রোধান্বিত করেছেন।
যদি আল্লাহর পথে হিজরত করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি হিজরত করেছেন।
যদি আল্লাহর রাহে জিহাদ করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি জিহাদ করেছেন।
যদি আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, আপনি সম্পদ ব্যয় করেছেন।

**ألست الذي ما زال كهلًا ويافعًا ... له المكرمات الغر والنائل الغمر**

তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যে যৌবনেও এবং প্রৌঢ় বয়সেও উজ্জ্বল মর্যাদা আর অপরিসীম সম্মানের অধিকারী?

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
আপনি আমাদের মধ্যে সালাফের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন। তালেবে ইলম ও মুজাহিদদের মধ্যে ইবনুল মুবারক যেমন ছিলেন, জালেম শাসকদের সামনে ইবনে হাম্বল যেমন ছিলেন, কিংবা ইবনে তাইমিয়া যেমন ছিলেন তাতারদের সামনে অথবা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীন যেমন ছিলেন, আমাদের মাঝে আপনি ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতিচ্ছবি।

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
আপনার যত প্রশংসাই করা হোক, আপনার শানে যত কবিতা ও কাসীদা লেখা হোক, আপনার হক আদায় করা কারো পক্ষেই সম্ভব না। আপনার খুনের বদলা নিতে যত কাফেরকে হত্যা করা হোক, যত ক্রুসেডারের রক্ত ঝরানো হোক, তা যথেষ্ট না। আপনার বিচ্ছেদে যত কান্না করা হোক, এ শোক তবু শেষ হবে না। আপনার বিচ্ছেদে যদি শান্ত মানুষগুলোও ডুকরে কেঁদে ওঠে, তাদের তিরস্কার করা সাজে না।

**فيا قلبي وشيمتك التأسي ... نهيتك عن نهاك فكن جزوعا**

হে আমার হৃদয়, তুমি তো সব সময় ধৈর্য ধরাই শিখেছ। তোমাকে শান্ত হতে বলেছিলাম, আজ বলছি, অধীর হয়ে কাঁদো!

**عذرتك أن تراع فبعد هذا ... يشق على الحوادث أن تروعا**

এই ঘটনায় তোমার ভয় পাওয়াকে আমি ক্ষমা করলাম। কারণ, এ আজকের পর আর কোনো ঘটনাই ভয় দেখাতে পারবে না।

হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি,
আপনি যুদ্ধের ময়দানে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহর দরবারে এই তুচ্ছ দুনিয়া কিছুতেই আপনার উপযুক্ত প্রতিদান হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করুন।

হে আমাদের শায়খ, আমি জানি না, আপনার বিদায়ে আমি কাঁদব, না-কি সেই জাতির জন্য কাঁদব, যার জন্য আপনি নিজের জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ করেছেন! আমি জানি না, আপনার বিচ্ছেদে আমি কাঁদব, না-কি উম্মতের সে সকল বড় ব্যক্তি, নামি নেতা ও মুরুব্বীদের দুরবস্থার জন্য কাঁদব, যারা সনদ-ডিগ্রি, পদ-পদবি, বড়-বড় চাকরি ও উপাধি নিয়ে পড়ে আছেন আর সুরার জলসায় কী নিয়ে গল্পগুজব করবেন—তা নিয়েই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন?

এই অভিজাতশ্রেণি আপনাকে ১০টি বছর ঘরছাড়া থাকতে দেখেছে, দেশে দেশে ছুটতে দেখেছে, কিন্তু তারা আপনার থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছে। শুধু কি তাই? শত্রুর মোকাবিলা বাদ দিয়ে তারা আপনাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে চেয়েছে আর এই ক্রুসেডীয় আক্রমণের সামনে শান্তি ও সমঝোতার তত্ত্ব হাজির করেছে। আপনি যখন দীনের পতাকা হাতে দিকে দিকে ছুটে বেড়িয়েছেন, মুসলিমদের জন্য লড়াই করেছেন, তখন তারা আপনাকে পরিত্যাগ করেছে।

وأنَّ لَهُ فِي حَوطَةِ الدِّينِ هِمَّةً ... بِها يستحِقُّ النَّصْرَ مِنْ كلِّ ناصِرِ

দীনের প্রতিরক্ষায় তাঁর যে অটুট উদ্যম, তা-ই তাঁকে সকলের সহযোগিতা লাভের যোগ্য করে তোলে।

কিন্তু, হে আমাদের শায়খ, তারা শুধু আপনাকেই ত্যাগ করেনি; বরং উম্মতের নির্যাতিত-নিপীড়িত সব সদস্য থেকেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।
তারা সন্তানহারা মায়েদের ত্যাগ করেছে।
তারা আহত বিধবাদের ত্যাগ করেছে।
তারা বাস্তুহারা এতীমদের ত্যাগ করেছে।
তারা ব্যথায় কাতর জখমিদের ত্যাগ করেছে।
তারা রক্তে রঞ্জিত শহীদদের ত্যাগ করেছে।
আল্লাহর শরীয়তের অপমান ও পদদলিত হওয়া দেখেও তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।
শুধু কি তাই? কুফরের নেতা ভ্যাটিক্যানের ফাদারের মৃত্যুসংবাদ শুনে তথাকথিত এই অভিজাতশ্রেণি, বড় বড় শায়খ আর সংস্থাগুলো শোকপ্রকাশ করেছে, শান্তি প্রার্থনা করেছে, অথচ তাদের কাছে যখন আপনার শাহাদাতের খবর পৌঁছেছে, তখন একটি শব্দ উচ্চারণ করার গরজটুকু অনুভব করেনি!

আমি জানি না, কেন কাঁদব? আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এ জন্য? না-কি সে সকল আলেমদের দুরবস্থার জন্য, যারা আপনার জিহাদের বিরোধিতা করেছে, আপনার শত্রু আমেরিকা ও তার দোসরদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

আমি জানি না, আপনার বিচ্ছেদের জন্য কাঁদব, না-কি উম্মতের দুরবস্থার জন্য কাঁদব, যারা শত্রু-মিত্রের মধ্যে তফাত করতে পারে না? কখনো তারা ধর্মত্যাগী নাস্তিকদের সম্মানের উঁচু আসনে বসায় আর উম্মতের কল্যাণকামীদের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। আবার কখনো শত্রুর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রক্ষাকারী মুনাফিকদের সম্মান দিয়ে চলে আর যারা উম্মতের জন্য লড়াই করে, উম্মতের আদর্শের প্রতিরক্ষা করে, তাদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাদের ব্যাপারে নবীজীর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীই যেন সত্য হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেছিলেন—

**سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ.**

'অচিরেই মানুষের ওপর ধোঁকাবাজির বছরগুলি আসবে। সে সময় মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যুক বলে প্রচার করা করা হবে। আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার বলা হবে এবং আমানতদারকে বিশ্বাসঘাতক বলা হবে।'

[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০৩৬]

যদিও আমরা আমাদের শায়খকে হারিয়ে বেদনাহত হয়েছি, কিন্তু তাঁর বিজয়েও আমরা আনন্দিত হয়েছি। আমাদের ও শত্রুদের বিজয়ের মানদণ্ড কখনো এক হতে পারে না। আমাদের শায়খ যখন দুনিয়া ত্যাগ করে হিজরত ও জিহাদের পথ বেছে নিয়েছেন, তখন তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বিজয়ী হয়েছেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্রুসেডার ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে জিহাদের অগ্নিশিখা প্রজ্বলনের তাওফীক দিয়েছেন আর তিনিও এই আগুন সফলভাবে জ্বালাতে সক্ষম হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এই আগুন জ্বলতেই থাকবে।

**قد قدحت العزّ زندًا غير كاب ... وَلَبِسْتَ المَجدَ بُرْدًا غَيرَ بَالِي**

তুমি এমন চকমকি পাথর ঘষেছ, যেখান থেকে সম্মানের আগুন জ্বলে উঠেছে। তুমি গায়ে এমন গৌরবের পোশাক জড়িয়েছ, যা কখনো পুরোনো হবে না।

তিনি বিজয়ী হয়েছেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন আর তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেছেন। তিনি বিজয়ী হয়েছেন, কারণ তিনি বীরপুরুষদের মতো লড়াই করতে করতে সসম্মানে মৃত্যুবরণ করেছেন, কাপুরুষের মতো পিছু হটতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেননি।

**وأمَّا القائِلونَ قَتيلُ طَعْنٍ ... فذلك مصرع البطل الجليد**

যারা বলে, সে শত্রুর আঘাতে নিহত হয়েছে; তাদের বলে দাও, অদম্য বীর-বাহাদুররা তো এভাবেই মৃত্যুবরণ করে।

তিনি বিজয়ী হয়েছেন, কারণ তিনি জীবদ্দশায় যেমন অনুসরণীয় ছিলেন, তাঁর মৃত্যুও তেমনই অনুসরণীয়ভাবেই হয়েছে। মুজাহিদদের বিজয়, ক্রুসেডারদের পরাজয়, তাগুতের পতন আর জিহাদী আন্দোলনের বিস্তৃতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিজয়ের এই ধারাবাহিকতাকে পূর্ণতা দান করেছেন আর তাঁর চক্ষু শীতল করেছেন। এই বিজয়গুলি তাঁর শাহাদাতের মর্সিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আর ঘোষণা দিয়েছে—আপনার দায়িত্ব আদায় হয়েছে, পরিশ্রম, কষ্ট আর মেহনতের সময়ও শেষ হয়েছে। বিশ্রাম ও প্রতিদানের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

উম্মতের শত্রুরা মনে করে, মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে তারা জিহাদকে খতম করে ফেলবে। তারা তো বোকার স্বর্গে বাস করছে। তারা জানে না, কোনো ব্যক্তি যখন নিজ আদর্শের কারণে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তখন সে আদর্শ আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ তার প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয়। শত্রুদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করার জন্য জিহাদের যে আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে, আমাদের নেতৃবৃন্দের রক্তের ছোঁয়ায় সে আগুন আরও সর্বগ্রাসী হয়ে উঠবে।

হে ক্রুসেডাররা, তোমরা হয়তো আমাদের নেতাকে হত্যার মাধ্যমে বড় একটি বিজয় অর্জন করেছ, যেমনটা কবি বলেছেন—

**يا عصبة الشرك ما أعلى جدودكُمُ ... لقد ظفرتم برب النصر والظفر**

হে শিরকপন্থীদের দল, কী সৌভাগ্য তোমাদের! বিজয় ও সাহায্যের খোদার কসম, তোমরা জয়লাভ করেছ।

**لقد ظفرتم بمن ما هزّ مُنصلَهُ ... إلا تَحكَّم في الهامات والقَصَر**

তোমরা তো তাঁকে পেয়েছ, যাঁর তরবারি একবার কাঁপলেই, উঁচু উঁচু সব মাথা আর রাজ-রাজড়ারা সব নত হয়ে যেত।

কিন্তু তোমাদের এই বিজয় আমাদের শক্তি খর্ব করতে পারবে না, এতে আমাদের জিহাদও দুর্বল হবে না, ইনশাআল্লাহ। জেনে রাখো, আজ তোমরা এক উসামাকে মেরেছ, অদূর ভবিষ্যতে লক্ষ উসামা তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। মনে রেখো, উসামা একটি উম্মত আর গোটা উম্মতই হচ্ছে উসামা। তাই সাবধান, তোমরা কোনো একজন ব্যক্তির সাথে লড়াই করছ না, তোমরা তো এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুরো একটি উম্মতের বিরুদ্ধে লড়াই করছ।

إذا مات منا سيد قام بعدهُ ... نظير له يغني غناه ويخلفُ

আমাদের কোনো শীর্ষ নেতা যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন এমন নেতা-ই তার স্থলাভিষিক্ত হয়, যে তার অভাব পূরণ করে।

জেনে রেখো, মুজাহিদরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে, শায়খ উসামার জন্য যুদ্ধ করে না। মুজাহিদদের এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। তাই তোমরা যুদ্ধের অপেক্ষা করো, বীর-বাহাদুরদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈয়ার হও আর ভয়াবহ সব দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুতি নাও।

হে মুসলিম উম্মাহ,

আমরা নির্যাতিত নিপীড়িত আহত এক জাতি। কান্নার সময় আমাদের নেই, হা-হুতাশ করারও কোনো সুযোগ নেই। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাই একমাত্র সান্ত্বনা। তাই আপনারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করুন, আজকের পর থেকে মুসলিম ভূখণ্ডে মার্কিনিদের কোনো পতাকা উড়তে দেওয়া হবে না। আপনারা আমাদের মহান শায়খের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে তাঁর রক্তের বদলা নেওয়ার শপথ গ্রহণ করুন। অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন প্রত্যাখ্যান করুন। শত্রুর ওপর বজ্রকঠিন আঘাত হানুন, যে আঘাত তাদের সব আনন্দের কথা ভুলিয়ে দেবে, বিষাদে বিষাদে ভরিয়ে দেবে তাদের জীবন। আপনারা মেহনত বাড়িয়ে দিন, আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতিদানও বাড়িয়ে দেবেন।

যে ব্যক্তি যুদ্ধে বের হতে চায়, সে যেন আজই বেরিয়ে পড়ে, এক মুহূর্তের জন্যও যেন দেরি না করে। যে ব্যক্তি ১০ জন মুজাহিদকে সহযোগিতা করতে চায়, সে যেন ২০ জনকে সহযোগিতা করে। যে ১০০ কাফেরকে জাহান্নামে পাঠানোর নিয়ত করেছে, সে যেন ২০০ কাফেরকে জাহান্নামে পাঠানোর হিম্মত করে। মনে রাখবেন, যুদ্ধে কখনো তারা জিতবে, কখনো আমরা আর সময় পরিবর্তনশীল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

‘যদি তোমাদেরকে কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালেমদের ভালোবাসেন না।’ [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

'আর শত্রু সম্প্রদায়ের অনুসন্ধানে তোমরা দুর্বল হোয়ো না। যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাক, তাহলে তারাও তো আঘাত পাচ্ছে, যেভাবে তোমরা আঘাত পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে যা আশা করছ, তারা তা আশা করছে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা নিসা (৪) : ১০৪]

যুদ্ধে দুই দলের মধ্যে তারাই বিজয়ী হয়, যারা প্রচণ্ড ধৈর্যশীল এবং প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়। যেমন কবি বলেন—

سَقَيْنَاهُمُ كَأْسًا سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا ... وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَوْتِ أَصْبَرَا

আমরা তাদের তেমনই (দুঃখ ও কষ্টের) এক পেয়ালা পান করিয়েছিলাম, যেমন তারা আমাদের করিয়েছিল, কিন্তু মৃত্যুর সামনে তারা ছিল অনেক বেশি ধৈর্যশীল।

আল্লাহ না করুন, দীনের শত্রুরা যেন আমাদের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল না হতে পারে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর মজবুত মনোবলের ক্ষেত্রেও যেন আমাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে। তাই, আপনারা জিহাদের ওপর ধৈর্য ধরুন, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবর করুন, যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকুন। মনে রাখবেন, শত্রুরা আমাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর আমাদের মধ্যে বিভেদ উসকে দেওয়ার জন্যই আমাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে। তাই ঐক্যের ব্যাপারে মনোযোগী হোন, আমীরদের কথা শোনা ও মানার ব্যাপারে গুরুত্ব দিন আর আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে।' [সূরা সাফফাত (৩৭) : ১৭৩]

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

'আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।' [সূরা মায়েদা (৫) : ৫৬]

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, সেদিন সাহায্য করব।' [সূরা মুমিন (৪০) : ৫১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

'হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন।' [সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ৭]

এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত ওয়াদা। আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি আপনারা বিশ্বাস রাখুন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং জিহাদের পথে সফর অব্যাহত রাখুন।

হে আল্লাহ, উম্মতের এই শহীদকে কবুল করুন; উম্মতের মধ্যে ও তাঁর পরিবারের মধ্যে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা উত্তমভাবে পূরণ করে দিন; তাঁর শাহাদাতকে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী আগুনে পরিণত করুন এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য আলোকবর্তিকা বানান। সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।'

শায়খ উসামা রহ.-এর শাহাদাতের স্মৃতিচারণ করে الرجولة (বাহাদুরি) শিরোনামের একটি অসাধারণ কবিতা[১০৯] লেখা হয়েছিল। পাঠকদের জন্য তা উল্লেখ করা হলো—

**ماذا فعلت بنا يا أسامة ... فالكل يرمي علينا سهامه**

উসামা, আপনি আমাদের এ কী দশা করলেন? সবাই তো আমাদের দিকে তির ছুঁড়ছে।

**وصرنا نلامُ ومهما فعلنا ... فبأي عذرٍ نرد الملامه**

আমরা যত কিছুই করি, তিরস্কার আমাদের পিছু ছাড়ছে না। এই তিরস্কার থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী?

**فأنتَ تُقاتلُ جيشَ الصليبِ ... ونحنُ نُهرولُ خلف الحمامة**

আপনি একাই ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন আর আমরা তো শান্তির পায়রার পেছনে ছুটেছি।

**ولمّا ارتضينا بسلمٍ مذلٍ ... بغوا واستباحوا لديني حرامه**

যেদিন আমরা অবমাননাকর চুক্তি মেনে নিয়েছি, সেদিন থেকেই তারা আমাদের দীনের সম্মানহানি শুরু করেছে।

[১০৯] আল-জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ আর্কাইভ থেকে কবিতাটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

**و أنت تقودُ أسود الوغى ... ونحنُ نقلِدُ فعل النعامة**

আপনি তো রণাঙ্গনের বীরদের নেতৃত্ব দিয়েছেন আর আমরা কাপুরুষের মতো উটপাখির অনুকরণ করেছি।

**قعدنا لنبكيَ مثلَ النساءِ ... على ما يدورُبأرضِ الشهامة**

বীরত্ব ও সাহসিকতার ময়দানে যখন নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছিল, আমরা তখন নারীদের মতো বসে বসে কেঁদেছি।

**وبالأمسِ كنا نُعَدّ رجالًا ... وكدنا نصدقُ تلك العلامة**

দু'দিন আগেও আমাদেরকেই বাহাদুর মনে করা হতো আর আমরাও একেই সত্য মনে করতাম।

**فنزهو بطول الشوارب منا ... وصوتٌ غليظٌ وعَرضٌ وقامة**

শাহী গোঁফ, গুরুগম্ভীর কণ্ঠ, দেখার মতো শরীর আর সুগঠিত দেহ নিয়েই তো আমরা গর্ব করতাম।

**حتى أتيت فصُغت المعاني ... فبدّل كلُ دعي كلامه**

কিন্তু, আমাদের মিথ্যা সব স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়ে আপনি এলেন, বীরত্ব ও সাহসিকতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন আর সব বক্তার বক্তব্যও বদলে গেল।

**لأن الرجولة قول وفعلٌ ... وأن الرجولة تعني الكرامة**

কারণ, পৌরুষ ও বাহাদুরি তো কথা ও কাজের নাম, পৌরুষ ও বাহাদুরি মানে আত্মসম্মান।

**وأن الرجولة توحيد ربٍ ... بكل العبادةِ ثم استقامة**

বাহাদুরি মানে সকল ইবাদতে এক রবের দাসত্ব মেনে নিয়ে অবিচল থাকা।

**وأن الرجولة حبٌ لدين ... يكون الجهاد بأعلى سنامه**

বাহাদুরি মানে দীনকে ভালোবেসে দীনের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের পথ বেছে নেওয়া।

**وأن الرجولة زُهد وتركٌ ... لدُنيا وجاهٍ رفيع مقامه**

বাহাদুরি মানে দুনিয়া ও পদমর্যাদার লোভ-লালসা ছেড়ে দিয়ে যুহদ অর্জন করা।

**وأن الرجولة عزمٌ وصبرٌ... على النازلاتِ وعسر الإقامة**

বাহাদুরি মানে বিপদাপদ আর প্রতিকূলতায় সবর ও আযীমতের ওপর অটল থাকা।

**وأن الرجولة كروفرٌ... ونصرٌ منَ اللهِ يُرجَى تمامه**

বাহাদুরি মানে তো শত্রুর ওপর হামলা করা আর আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ বিজয়ের আশা রাখা।

**وأن الرجولة ثوب ولحية ... ونوريفوقُ بياض العمامة**

বাহাদুরি মানে তো পোশাক ও দাড়িতে এমন নুরের ঝলকানি, যা সফেদ পাগড়িকেও ছাড়িয়ে যাবে।

**فهل بعد تلك الفعال فعالٌ ... ومن ذا يطالك قدرًا وهامة**

আপনার মহান এই কাজগুলোর পর আর কোনো মহান কাজ কি বাকি আছে? সম্মান ও মর্যাদায় আপনার সমকক্ষই বা কে হতে পারে?

**أعيدوا كتابة كل المعاجم ... فإن الرجولة تعني أسامة**

সব অভিধান সংশোধন করে নাও, আজ থেকে বাহাদুরি অর্থ 'উসামা'।

## শায়খ উসামা রহ.: যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার প্রতিচ্ছবি

যদিও আমি প্রায় নয়টি বছর শায়খ উসামা রহ.-এর সাথে ছিলাম এবং শায়খকে খুব কাছ থেকে দেখার তাওফীক হয়েছিল, তবু এই মহান মানুষটির উত্তম আখলাক আর জীবনচরিত নিয়ে কিছু লিখতে নিজেকে অপারগ মনে হয়। শায়খের অনেক মুহিব্বীন অবশ্য এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন এবং বিস্তারিত লিখেছেন। তাই সেগুলো পুনরায় এখানে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। শায়খ রহ.-এর সুমহান চরিত্রের এমন কিছু দিক আমি শুধু এখানে উল্লেখ করব, যেগুলো আমি নিজ চোখে দেখেছি। এই ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যাবে শায়খ রহ.-এর আখলাক কতটা উঁচু মাপের ছিল।

এটা তো সবাই জানে, শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পরিবারের সম্পদের পরিমাণ কয়েক শত মিলিয়ন ডলার। কেউ কেউ তো বলেছেন, শুধু শায়খ উসামা-ই প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের মালিক ছিলেন। শায়খের কাছে এত সম্পদের উল্লেখযোগ্য কোনো মূল্যই ছিল না। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজে ব্যয় করা ছাড়া এ সম্পদ থেকে তিনি অন্য কোনো উপকার লাভ করেননি।

একদিন আমি আর তালহা সুদানী রহ. সুদানে শায়খের বাড়িতে শায়খের সঙ্গে বসে বিলাসিতা আর দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে কথা বলছিলাম। তখন শায়খ উসামা রহ. আমাদের শোনালেন, আশির দশকে তিনি তাঁর চার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জেদ্দার একটি সাধারণ এলাকায় খুবই সাধারণ একটি বাড়িতে থাকতেন। বাড়ির ছাদ ছিল কাঠের। তাঁর বড় ভাই বকর বিন লাদেন তখন পরিবারের মুরুব্বী ছিলেন। এত ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও নিজের ছোট ভাই এত

সাধারণ একটি বাড়িতে থাকছে—এটা বকর বিন লাদেন মানতে পারেননি। তিনি চাচ্ছিলেন, তার ভাই তাদের সামাজিক মর্যাদার উপযোগী একটি বাড়িতে থাকবেন। তাই, শায়খকে উপহার দেওয়ার জন্য তিনি নিজ খরচে একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করেন। এতটুকু বলে শায়খ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, অনুমান করুন তো দেখি, সেই প্রাসাদ নির্মাণে কত খরচ হয়েছিল?' সুদানের ধনীদের যে ঘরবাড়ি আমি দেখেছি, সে হিসেবে বললাম, 'এক মিলিয়ন রিয়াল।' শায়খ উসামা রহ. মুচকি হাসলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি হাসি চেপে রাখছেন। তিনি বললেন, 'আরেকটু বাড়ান।' আমি বললাম, 'দুই মিলিয়ন।' তিনি আরেকটু বাড়াতে বললেন। এভাবে বাড়াতে বাড়াতে পাঁচ মিলিয়ন, দশ মিলিয়ন, বিশ মিলিয়ন পর্যন্ত বললাম। কিন্তু তারপরেও শায়খ বললেন, আরেকটু বেশি। একপর্যায়ে আমি বলেই উঠলাম, 'শায়খ, এটাও কি সম্ভব?' তখন তিনি বললেন, 'সেই প্রাসাদ নির্মাণে ৮০ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু হারামাইনের ধনকুবেরদের রাজপ্রাসাদের সামনে এই ৮০ মিলিয়ন রিয়ালের প্রাসাদও কিছুই ছিল না।'



শায়খ উসামার বড় ভাই বকর বিন লাদেন হাফি.

কথাটা শুনে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, এ-ও কি সম্ভব? ৮০ মিলিয়ন রিয়াল, মানে [তৎকালীন হিসেবে] ২০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এখন যদি হোয়াইট হাউজ নির্মাণ করা হয়, তবু এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। প্রিয় পাঠক, একটু কল্পনা করে দেখুন, তখনকার ৮০ মিলিয়ন রিয়ালের বর্তমান মূল্যমান কত হতে পারে? আশির দশকে ৮০ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল ব্যয় করে বানানো একটি প্রাসাদে দুনিয়ার কী পরিমাণ বিলাসিতা আর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকতে পারে—কল্পনা করতে পারবেন? এই কল্পনার ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। কিন্তু, প্রিয় পাঠক, এমনটি কিছুতেই

ভাববেন না যে, শায়খ উসামা রহ. এক মুহূর্তের জন্যও সেই প্রাসাদে থাকার চিন্তা করেছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে বড় ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, তাঁর কিংবা তাঁর সন্তানদের, কারোরই এই প্রাসাদে থাকার আগ্রহ নেই।

১৯৯১ সালে শায়খ উসামা যখন পাকিস্তান থেকে সুদানে আসেন, তখন সুদানে অবস্থানরত ভাইয়েরা খার্তুমের রিয়াদ নামক এলাকায় শায়খের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া নেন। তিনতলা বিশিষ্ট বাড়িটি আহামরি কোনো ইমারত ছিল না, তবে ভাইয়েরা শায়খের অবস্থা বিবেচনা করে দামি দামি ফার্নিচার আর আসবাবপত্র দিয়ে পুরো বাড়ি সাজিয়েছিলেন। বিলাসবহুল খাট, আরামদায়ক সোফা আর চেয়ার-টেবিল এনে পুরো ভবন নতুন করে সাজানো হয়েছিল। শায়খ উসামা যখন বাড়িটিতে ওঠেন, বাড়ির সব বিলাসবহুল ফার্নিচার সরিয়ে ফেলতে বলেন। শায়খের কথামতো সব ফার্নিচার একটি গুদামে জমা করে রাখা হয়। পুরো ভবনে খুবই সাধারণ মানের কিছু আসবাব রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি।

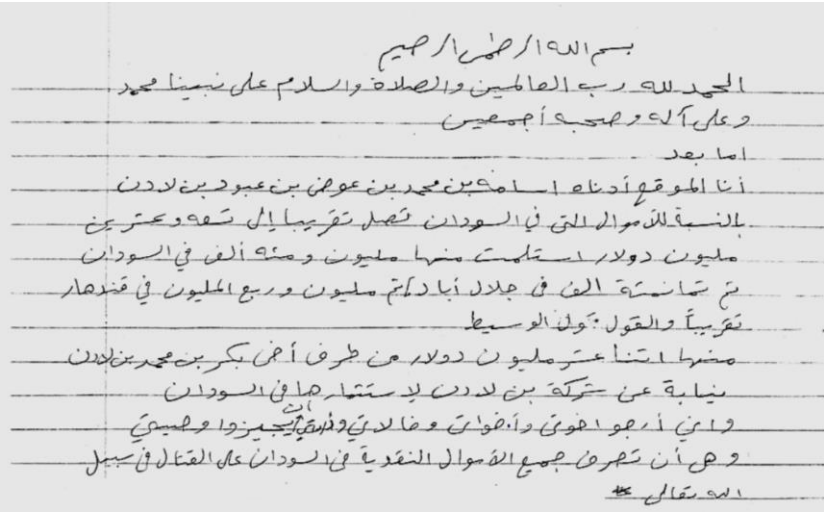
খার্তুমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সোবা নামক অতি সাধারণ এক এলাকায় শায়খ একটুকরো জমি কিনেছিলেন। বসবাসের জন্য সেখানে চারটি মাটির ঘরও বানিয়েছিলেন। প্রতিটি ঘরে ৪ x ৪ মিটারের দুটি করে কামরা, দুই কামরার মাঝখানে ৩ x ৪ মিটারের একটি করিডোর, একটি রান্নাঘর, একটি বাথরুম এবং বাইরে একটি ছোট উঠোন ছিল। এই ঘরগুলোতে টিনের চাল দেওয়া হয়েছিল এবং গরম কমানোর জন্য চালের নিচে ম্যাসোনাইট বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছিল। শায়খ উসামা এই ঘরে ওঠার আগেই সুদান ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাকদীর তাঁকে আফগানিস্তান নিয়ে যায়। এই ঘটনা আগেও আলোচনা হয়েছে।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর যুহদ ও আরাম-আয়েশের প্রতি ঘৃণার বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে শায়খুল মুজাহিদীন ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন—

> ‘আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ভাই আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে হেফাযত করেন। তাঁর মতো কোনো মানুষ আমি দুনিয়াতে দেখিনি। এত ধনী হয়েও তিনি গরীবদের মতো জীবনযাপন করেন। হজ বা উমরায় গেলে জেদ্দায় তাঁর বাড়িতে উঠতাম। তাঁর বাড়িতে কোনোদিন চেয়ার-টেবিল দেখিনি। চার স্ত্রী নিয়ে তাঁর সংসার ছিল, কিন্তু কোনো বাড়িতেই চেয়ার-টেবিল ছিল না। জর্ডান বা মিশরের একজন সাধারণ শ্রমিকের বাড়িও উসামার বাড়ির চেয়ে সুন্দর হয়ে থাকে, তাদের বাড়ি নানা ধরনের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো গোছানো থাকে। এত সাদাসিধে জীবনযাপন করেন তিনি, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে যদি মুজাহিদদের জন্য সহযোগিতা চান, মুহূর্তেই মিলিয়ন রিয়ালের চেক লিখে দেবেন।’[১১০]

[১১০] উসামা বিন লাদেন : মুজাদ্দিদুয যামান ওয়া কাহিরুল আমরিকান : ফারিস আয-যাহরানী

অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টের চতুর্থ কিস্তিতে শায়খ উসামার একটি অসীয়তনামা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সুদানে থাকা তাঁর সমস্ত সম্পদ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ব্যয় করার অসীয়ত করেছেন এবং তাঁর ভাই-বোন, মামা-খালা ও সন্তানদেরকে এই অসীয়ত পূরণ করতে বলেছেন। উল্লেখ্য, শায়খ উসামা রহ. অনেক আগেই তাঁর সমস্ত সম্পদ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। শায়খের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি থেকে আমি শুনেছি, আফগান জিহাদে তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন, আশির দশকের গোড়ার দিকে সিরিয়ার জিহাদে তারও কয়েকগুণ বেশি অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন। তারপর যখন আফগান জিহাদ শুরু হয়, তখনও শায়খ দু'হাত খুলে খরচ করেছেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, পেশোয়ারের একাউন্টিং অফিসে শায়খ মুস্তফা আবুল ইয়াযীদ রহ.-এর সহযোগী হিসেবে আমিও তিন/চার মাস কাজ করেছিলাম। তখন আমরা শায়খের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে শুধু জিহাদ পরিচালনার জন্যই প্রতি মাসে দুই লাখ ডলারেরও বেশি খরচ করতাম। এ ছাড়াও গোলাবারুদ ক্রয়, অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তো আলাদা আলাদা খরচ ছিলই। সেখানেও এরচেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় হতো। সেই খরচগুলোর হিসাবের জিম্মাদারি ছিল অন্য ভাইদের হাতে। পাশাপাশি ইয়েমেনের কমিউনিস্টবিরোধী জিহাদ, মিশর, সোমালিয়া, আলজেরিয়া-সহ আরও অনেক জায়গার জিহাদেও শায়খ বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা পাঠাতেন।



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
أنا الموقع أدناه أسامة بن محمد بن عوض بن عبود بن لادن
بالنسبة للأموال التي في السودان تصل تقريبا إلى ثمانية وعشرين
مليون دولار استلمت منها مليون وستمائة ألف في السودان
ثم ثمانمائة ألف في جلال آباد ثم مليون وربع المليون في قندهار
تقريباً والقول بقول الوسيط
منها اثنا عشر مليون دولار من طرف أخي بكر بن محمد بن لادن
نيابة عن شركة بن لادن لإستثمارها في السودان
وإني أرجو إخوتي وأخواتي وخالاتي وذرية أبي رحمه الله وصيتي
وهي أن تصرف جميع الأموال النقدية في السودان على القتال في سبيل
الله تعالى

সুদানে থাকা সমস্ত সম্পদ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ব্যয় করার অসীয়ত করে লেখা শায়খ উসামা রহ.-এর অসীয়তনামার একটি অংশ।

## অসীয়তনামার অনুবাদ

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين**

‘আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন আওদ বিন আবূদ বিন লাদেন সুদানে থাকা আমার ২৯ মিলিয়ন ডলারের সম্পদের ব্যাপারে এই অসীয়ত করছি। এর মধ্য থেকে সুদানে থাকাকালে ১১ লক্ষ, জালালাবাদে থাকাকালে ৮ লক্ষ এবং কান্দাহার থাকাকালে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আমি ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি, তবে যে প্রতিনিধির মাধ্যমে এই ব্যয় করা হয়েছে, সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে তার কথাই চূড়ান্ত হবে।

এর মধ্যে ১২ মিলিয়ন ডলার বিন লাদেন কোম্পানির তরফ থেকে বড় ভাই বকর বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেনের মাধ্যমে পেয়েছি সুদানে বিনিয়োগ করার জন্য। সুদানে থাকা সম্পদের ব্যাপারে আমার অসীয়ত হলো, এই সমস্ত সম্পদ কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ব্যয় করা হবে। আমার ভাই-বোন, খালা ও সন্তানদের কাছে আমার আবেদন, তারা এই অসীয়ত পূরণ করবেন।’

তাকদীরের কী অদ্ভূত লিখন, এত কুরবানী সত্ত্বেও নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশনের পর থেকেই তানজীমের আর্থিক জোগান সংকুচিত হতে থাকে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সুদানের বিনিয়োগ থেকে শায়খের যে লভ্যাংশটুকু আসত[১১১], বশীর সরকার সেটাও বন্ধ করে দেয়। ফলে তানজীম জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং সবাইকে পেটে পাথর বাঁধার প্রস্তুতি নিতে বলে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি কাজের জন্য সামান্য বাজেট রেখে সব ধরনের বাজেট একেবারে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা হয়। বিবাহিত ভাইদের ভাতাও কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, অনেক ভাই ভাতা হিসেবে যে অর্থ পেতেন, তা স্থানীয় মুদ্রায় এক্সচেঞ্জ করার সময় বড় নোটের বদলে ছোট নোট নিতেন, যাতে রুপি একটু বেশি পাওয়া যায়।

একদিন আমরা কান্দাহার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন আরব কলোনির ছোট্ট মসজিদে যোহরের নামায আদায় করে বসে আছি, তখন শায়খ উসামা রহ. কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমেই আল্লাহর অনেক প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন—

[১১১] নাইরোবি ও দারুস সালাম অপারেশনের পর বশীর সরকার শায়খ উসামার সব ধরনের প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং শায়খের সব কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই পুরো সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার ছিল।

‘আমি কখনো ভাবতেও পারিনি, আমার জীবনে এমন একটি দিন আসবে, যেদিন পাঁচ হাজার ডলার পেয়েই আমি এত খুশি হব। গতকাল আরবের এক শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার ডলার আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। একমাত্র আমার আল্লাহই জানেন, এই পাঁচ হাজার ডলার পেয়ে আমি কত খুশি হয়েছি।’

খুব অল্প কিছু কথা। এক মিনিটও হয়তো লাগেনি কথাগুলো বলতে। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি কথাই আমাদের সবার হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল। আমরা মৃদু স্বরে আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলাম, সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা আনন্দাশ্রু ছিল না। টাকাপয়সা এসেছে, এতে আমাদের অবস্থার একটু উন্নতি হবে—এই ভেবে খুশিতে চোখে পানি আসেনি। কখনোই না। আমাদের মনে এই চিন্তাই আসেনি। বরং আমরা তো সেই সংকটেও তিনবেলার পরিবর্তে কমপক্ষে দু’বেলা খেতে পারতাম, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তাঁর পরিবারের লোকেরা যখন ‘শিয়াবে আবু তালেব’-এ অবরুদ্ধ জীবন কাটাচ্ছিলেন, তখন ক্ষুধার তাড়নায় শিশুদের কান্না উপত্যকার বাইরে থেকেও শোনা যেত, এত কঠিন পরিস্থিতি ছিল। আমাদের তো আলহামদুলিল্লাহ এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়নি। আমাদের সেই অশ্রু ছিল পর্বতসম হিম্মতের অধিকারী মহান সেই মানুষটির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার অশ্রু। এই মানুষটি তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন। শত শত মিলিয়ন ডলারের মালিক ছিলেন তিনি। চাইলেই দুনিয়ার সবচেয়ে আয়েশি জীবন বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু বিলাসিতার জীবন ছেড়ে আল্লাহর কাছে যা আছে, সেটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কারণ, এটাই উত্তম ও চিরস্থায়ী। তিনি আমাদের সাথে কান্দাহার এয়ারপোর্টের এই জীর্ণ কলোনিতে অতি সাধারণ জীবনযাপন করছেন। লোকে বলে, এই কলোনি না-কি নেটওয়ার্কের বাইরে। একসময় গ্রাম্য লোকদের ছাগল-ভেড়া এখানে এসে আশ্রয় নিত। এখানে কোনো নেটওয়ার্ক তো দূরের কথা, সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই, ইলেক্ট্রিসিটি নেই। এমনকি পয়ঃনিষ্কাশনেরও স্বাস্থ্যসম্মত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভাইয়েরা এখানে আসার পর নিজ নিজ ঘরের টয়লেটের পেছনে এক মিটার গর্ত খুঁড়ে ছনের তৈরি ছাদ বানিয়ে তার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে কোনোরকম একটু ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কলোনির সব ঘর আর দেওয়ালে মাকড়সার জাল, সাপখোপ আর ইঁদুর-বাদুড়ের গর্ত দিয়ে বোঝাই ছিল।

প্রিয় পাঠক, সেই কলোনিতে শায়খের যে প্রাসাদ (?) ছিল, আপনি যদি তার আঙিনা দিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাহলে সেই দৃশ্যকে ভাষায় প্রকাশ করার মতো শব্দ আপনার অভিধানে খুঁজে পাবেন না। শুধু পাবেন চোখ ঝাপসা করে নেমে আসা দু’ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আর এই মহান শায়খের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধামিশ্রিত কিছু শব্দ। হয়তো আপনি বিড়বিড় করে বলবেন, ‘শায়খ, আপনি তো আপনার পরবর্তীদের কষ্টে ফেলে দিলেন’। শায়খ উসামা রহ.-এর সেই প্রাসাদে

চারটি ঘর ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল প্রায় বিধ্বস্ত। ভাইয়েরা এটাকে ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর বাকি তিনটি ঘর ছিল তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের থাকার জন্য। প্রতিটি ঘরের সামনেই খড়ের চাটাই দিয়ে ছাউনি দেওয়া বসার জায়গা ছিল, গরমে সেখানে বসে বিশ্রাম নেওয়া যেত। শায়খ উসামা রহ. তাঁর বাড়ির আঙিনায় একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রও বানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসল ও শাকসবজি চাষের পরীক্ষা চালাতেন। এর মধ্যে কিছু কিছু পরীক্ষা এতটাই সফল হয়েছিল, যা হয়তো গিনেস বুকেও জায়গা করে নিত। উদাহরণস্বরূপ, সুদানে থাকাকালে শায়খ রহ. সূর্যমুখী ফুলের ওপর কিছু বিশেষ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এতে যে ফুলগুলো হয়েছিল, তার মধ্যে প্রতিটি ফুলের ব্যস ৪২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা হয়তো নেই, শুধু এতটুকুই বলা যায়—'শায়খের হাতে বরকত ছিল'।

প্রিয় পাঠক, শায়খের একটি ঘরের সামনে আপনি একটি তাঁবুও দেখতে পাবেন। তাতে শায়খের কলিজার টুকরো ছেলেরা থাকতেন। যেহেতু শায়খের ঘরগুলোতে দুটি কামরা, একটি রান্নাঘর আর একটি টয়লেট ছিল, তার মধ্যে একটি কামরায় শায়খ ও তাঁর স্ত্রীরা থাকতেন, অন্য কামরায় শায়খের কন্যারা থাকতেন। তাই ঘরে ছেলেদের জায়গা ছিল না। তাঁরা সেই তাঁবুতে থাকতেন।

অদ্ভূত ব্যাপার হলো, সেই কলোনিতে কয়েক বছর আমরা শায়খের পাশেই থেকেছি, তবু আমরা কেউই জানতাম না, এমনকি কেউ কল্পনাও করিনি যে, তাঁর কলিজার টুকরো সন্তানেরা এই তাঁবুতে থাকেন। এ কথা আমরা কারো থেকেই শুনিনি, শায়খের মুখ থেকেও শুনিনি, তাঁর কোনো সন্তানের মুখ থেকেও শুনিনি। শায়খ চাইলে বাড়ির উঠোনে ছেলেদের জন্য একটি ঘর বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। নিঃসন্দেহে তিনি ছেলেদের তরবিয়ত করতে চেয়েছিলেন; সবর, সাদাসিধে জীবনযাপন, পৌরুষ, যুহদ আর দুনিয়াবিমুখতার মতো মহৎ গুণগুলো তাঁদের মধ্যেও আনতে চেয়েছিলেন। কারণ, এই গুণগুলোই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথে মানুষকে সাহায্য করে।

হে মুজাহিদদের ইমাম, তাওহীদবাদীদের চোখের শীতলতা, আল্লাহ যেন আপনাকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নেন, আমাদেরকে যেন আপনার সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকামে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় ব্যথিত হয়, তবে আমরা মুখে এমন কোনো কথা বলব না, যা আমাদের রবের অপছন্দ। হে উসামা, আপনার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত। দীর্ঘ কষ্টের সফর শেষে আপনি এখন তৃপ্তিতে ঘুমোতে পারেন। খুশি থাকুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করছি, অবশ্যই আমরা এই সফর শেষ করব।

যতদিন আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন এই দীনের নুসরতের জন্য সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দেব। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে বিজয় পর্যন্ত সুদৃঢ় রাখেন অথবা আপনার মতো এবং হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের মতো শাহাদাতের অমিয় সুধা পানে ধন্য করেন, আমীন।



বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছেন শায়খ উসামা রহ.।
পেছনে ঘোড়ার আস্তাবল আর পাশে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হাউজ দেখা যাচ্ছে।

শায়খ উসামার ছেলে হামযা রহ.-এর লেখা একটি কবিতায় তাঁদের তখনকার জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—

**أبتاه أين هو المفر ومتى يكون لنا مقر؟ ... آه أبي كيف ما أبصرت دائرة الخطر؟**

বাবা, আমরা আর কত পালাব, কবে আমরা স্থির হব? বাবা, তুমি কি দেখনি, বিপদ কীভাবে আমাদের ঘিরে ধরেছে?

**أكثرت ترحالي أبي بين البوادي والحضر... أكثرت من سفري أبي بين وادٍ ومنحدر**

বাবা, কত শহর আর গ্রামে ঘুরলাম আমি, কত উপত্যকা আর ঢালু ভূমি পাড়ি দিলাম।

**حتى نسيت عشيرتي وبنى العمومة والبشر... ما بال منزلنا اختفى عنى فليس له اثر؟**

এখন তো ভুলেই গিয়েছি, কারা আমার স্বজন আর কারা-ই বা আত্মীয়। আমাদের ঘরের কী হলো, বাবা? তার কোনো চিহ্নই এখন নেই।

**ما بال أمي لم تعد عجبًا هل طاب لها السفر؟ ... وأخي الحبيب فديته مر الزمان وما حضر**

আমার মায়েরই বা কী হলো, এখন আর তিনি অবাক হন না, সফরেই কি তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন? আমার আদরের সেই ভাইটি কোথায়, এত দীর্ঘ সময় যার অপেক্ষা করলাম, অথচ সে যে এখনো আসল না।

**لم لا نرى في دربنا إلا الحواجز والحفر ... ألا إن أمريكا أتت في الخرج تعبث والخبر**

আমাদের পথে কেন শুধু বাধা আর খানাখন্দকের দেখা মেলে? আল-খারাজ ও আল-খুবারে আমেরিকা যখন বিশৃঙ্খলা করতে হাজির হলো,

**فهاجرت مغتربًا إلى أرضٍ بها النيل انحدر ... خرطوم بعد أن فتحت أبوابها أبت لي أن أقر**

তুমি হিজরত করলে নীল নদের দেশে। খার্তুম প্রথমে তোমার জন্য দরজা খুলে দিলেও অবশেষে সে-ও অস্বীকার করল তোমাকে রাখতে ।

**ثم ارتحلت مشرقًا حيث الرجال أولي الغرر ... كابول ترفع رأسها رغم الخصاصة والخطر**

এরপর তুমি হিজরত করলে এমন ভূমিতে, যেখানে শুভ্র ললাটের বীররা থাকে, সেই কাবুল নগরীতে, যে ক্ষুধা-যাতনা সত্ত্বেও মাথা উঁচিয়ে রাখে,

**كابول يبسُم ثغرها تؤوي وتنصر من حضر ... الشيخ يونس خالص قد بدا ليث يُهاب إذا زأر**

যারাই আসে তার কাছে, তাদেরই মুচকি হেসে আশ্রয় দেয়। সেখানে আছেন শায়খ ইউনুস খালেস, তিনি যখন গর্জে ওঠেন, সবাই সিংহের মতো ভয় পায় তাঁকে,

**وأخو الرجولة والإباء أميرنا الملا عمر ... أبي لماذا أرسلوا و ابل من القذائف كالمطر**

আরও আছেন আমাদের আমীর মোল্লা উমর, অদম্য সাহস আর প্রকৃত পৌরুষ যার বৈশিষ্ট্য। বাবা, তারা কেন এখানেও বৃষ্টির মতো বোমা ফেলে?

**لم يرحموا طفلًا ولا شيخًا يحطمه الكبر ... أبتاه ماذا قد جرى حتى يلاحقنا الخطر**

দুধের শিশু কিংবা অশীতিপর বৃদ্ধকেও কেন দয়া করে না? বাবা, কী এমন হলো যে, বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ে না?

**أفداؤك البيت العتيق جريمة لا تغتفر ... أثبت أبي لا تبتغى عرض الحياة من البشر**

বাইতুল আতীক (কাবা)-কে মুক্ত করার ইচ্ছা করাও কি অমার্জনীয় কোনো অপরাধ? বাবা, তুমি অটল থাকো, মানুষের কাছে দুনিয়ার কোনো সম্পদ চেয়ো না।

**الخلد موعدنا إذا شاء الإله لنا الظفر ... قل لي أبي فيما أرى قول مفيد ومختصر**

আল্লাহ যদি আমাদের বিজয় চান, তাহলে আমরা অবশ্যই জান্নাতে মিলিত হব। বাবা, আমার এই কথার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত হলেও উপকারী কোনো নসীহত করো।

এই কবিতার উত্তরে শায়খ উসামা রহ. নিচের কবিতাটি লিখেছিলেন—

**أبني يكفى أني شبعًا بالآهات والحسر... عقد اللسان فمقلتي نبع ووجداني سقر**

হে আমার ছেলে, হা-হুতাশ আর আফসোস অনেক করেছি, আমার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, চোখ থেকেও অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে আর অনুভূতি কষ্ট দিচ্ছে।

**ماذا أقول ونحن في دنيا التكاسل والبطر... ماذا أقول لعالم أعمى البصيرة والبصر**

উদাসীনতা আর অহংকারের এই দুনিয়ায় আমার কী আর বলার আছে? অন্তর্দৃষ্টি আর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া আলেমকেই বা কী বলার আছে?

**أمم تباع وتشترى بيع السنابك بالغرر... عفوًا بني فلا أرى بالدرب غير شديد منحدر**

এখানে তো জাতিগুলোর কেনা-বেচা হয় সস্তা দামে। ক্ষমা করো, পুত্র, পথের মধ্যে আমি শুধু খাঁড়া ঢালই দেখতে পাচ্ছি।

**عقد مرت سنو اته بين التشرد والسفر... عما تسائلني؟ عن قوم أصابهم الخدر**

বছরের পর বছর কেটে গেছে নির্বাসন আর সফরে। কীসের কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি? এমন জাতির কথা, যাদের বোধশক্তি অসার হয়ে গেছে?

**ها نحن في مأساتنا ذهب الأمان وبقى الخطر... دنيا الجر ائم بني الطفل يذبح فيها كالبقر**

হ্যাঁ, আমরা অনেক দুর্দশায় আছি। কোনো নিরাপত্তা নেই, আছে শুধু বিপদের ঘনঘটা। দুনিয়া অপরাধে ভরে গেছে, যেখানে শিশুদেরও গরুর মতো জবাই করা হচ্ছে।

**صهيون تقتل أخوتي والعرب تعقد مؤتمر... أذناب أمريكا غدوا عميًا فليس لهم نظر**

ইহুদীরা আমার ভাইদের খুন করে আর আরবরা শুধু প্রতিবাদ সম্মেলন করে বেড়ায়, আমেরিকার এই দালালগোষ্ঠী চোখ থাকতেও যেন অন্ধ হয়ে গেছে।

**حبر على ورق فلا صدقوا ولا ظهر الأثر... لم لم يسوقوا قوة تحمى الصغير من الضرر**

কাগজের পাতায় লেখা জুলুমের বিবরণ দেখে তারা বিশ্বাস করেনি, তাদের ওপর কোনো আলামতও প্রকাশিত হয়নি। তাহলে শিশুদের রক্ষার জন্য কেন তারা সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছে না?

**هذه وربك وصمة كبرى يساق لها الخبر... غدرٌ يُجمّع أمره أيذود عنا أم غدر**

খোদার কসম, এ এক বিশাল কলঙ্ক, যার সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাদ্দারদের এই চক্র কি আমাদের রক্ষা করবে, না-কি আবারও করবে গাদ্দারি?

**خانوا الرسول وربنا وخانوا الرعية في سحر... إلى متى نقص الرجال والخوالف في غرر**

তারা রাসূলের সাথে গাদ্দারি করেছে, আমাদের রবের সাথেও গাদ্দারি করেছে আর প্রতারণা করেছে জাতির সাথে। আর কতকাল বীরপুরুষদের অভাব থাকবে আর এই কাপুরুষরা থাকবে নেতৃত্বে?

**يجب التحرك كيفما أتى لدفع الضرر... أقسمت بالله العظيم بأن أقاتل من كفر**

ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য যেভাবেই হোক কিছু তো করতেই হবে, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, প্রত্যেক কাফেরের সাথেই আমি যুদ্ধ করব।



হামযা বিন উসামা রহিমাহুল্লাহ কবিতা আবৃত্তি করছেন।

## মাশায়েখের স্মৃতিচারণ[১১২]

### শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী রহ.



আবু উবাইদা পানশীরী রহ.

**سيذكرني قومي إذا جد جدهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر**

তীব্র সংকটকালেই জাতি আমাকে স্মরণ করবে, কারণ অন্ধকার রাতেই তো চাঁদের অভাব অনুভূত হয়।

আবু উবাইদা পানশীরী রহ.। তাঁর নাম আলী রাশীদী। তিনি একাই একটি উম্মত ছিলেন। এ যুগে তাঁর আগমন ঘটলেও তিনি ছিলেন সালাফে সালিহীনের যুগের সোনালি মানুষদের মতো। তিনি ছিলেন রাতের সাধক আর দিনের ঘোড়সওয়ার, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক এবং জিহাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

তাঁর জীবন অসংখ্য জিহাদী কার্যক্রম দিয়ে ভরপুর ছিল। তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পুরুষোচিত গুণাবলির সাথে সাথে ছিলেন বিনয়ী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, উদার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতায় পরিপূর্ণ একজন মানুষ। অনমনীয় মানসিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা আর দক্ষ পরিচালনা তাঁকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। সাংগঠনিক ও সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার মতো বড় বড় দায়িত্ব পালন করলেও অধিকাংশ সময় তিনি আড়ালেই থেকেছেন। সকলেরই খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। নম্রতা, সাদাসিধে চালচলন আর

[১১২] আল-বাত্তার বুলেটিনের ১২তম সংখ্যায় প্রকাশিত أبطال الإسلام في هذا الزمان শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

সদালাপের জন্যও বেশ পরিচিতি ছিল তাঁর। কখনো কারো সাথে রূঢ় আচরণ করতেন না, কাউকে অবজ্ঞা করেও কখনো কথা বলতেন না। সব সময় হকের পক্ষে থাকতেন।

**رحلت عن الحياة فما جزعنا ... برغم الحزن والدمع الصبيبِ**

দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন আপনি, আমরা বিচলিত হইনি। যদিও অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরেছে আর হৃদয় হয়েছে ব্যথিত।

**رضينا بالقضاء رضىً يقينًا ... وتسليمًا لغفار الذنوب**

তাকদীরের ফয়সালা আমরা মেনে নিয়েছি আর গুনাহ ক্ষমাকারী রবের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি।

তিনি মিশরের জিহাদী আন্দোলনের প্রথম সারির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৮১ সালে আনওয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ, আনওয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডে জড়িত আব্দুল হামীদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে তাঁর ভায়রা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ একটা সময় মিশরীয় পুলিশে চাকরি করেছেন। জেল থেকে মুক্তির পর আফগানিস্তানে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। যে-সব আরব ভাই সবার আগে আফগানিস্তান এসেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। ১৯৮৩ সালে তিনি আফগানিস্তানে হিজরত করেন। পরিবারের লোকদের তিনি পেশোয়ারে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং এক আরব ভাইকে পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এই আরব ভাই এক ত্রাণ সংস্থায় কাজ করতেন এবং তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। পরিবারের ব্যবস্থা করার পর তিনি আফগানিস্তানে পাড়ি জমান। সেখানে এক কাফেলার সাথে মিলে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করেন। সাথে তাঁর বন্ধু আবু সাহল মিসরী (আবু সাহল কাবীর) এবং আরব ও আফগান ভাইদের একটি দলও ছিল। সে সময় আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে যেতে এক মাসের মতো সময় লাগত। একে তো অনেক দূরের পথ, এবড়োখেবড়ো রাস্তা আর তুষারপাত, তার ওপর শত্রুবাহিনীর হামলার ভয় এবং জায়গায় জায়গায় পেতে রাখা অ্যাম্বুশ। সব মিলিয়ে পথ ছিল খুবই দুর্গম ও বিপদসংকুল।

এই সফরে তিনি কুরআনে কারীম হিফয করেন। এভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কাফেলা একসময় গন্তব্যে পৌঁছায়। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে পাঞ্জশির উপত্যকায় তিনি থাকা শুরু করেন। উপত্যকাটি অনেক দুর্গম, তা ছাড়া সে সময় রুশ বাহিনী আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে রসদ সরবরাহের জন্য এই উপত্যকাকে সাপ্লাই লাইন হিসেবে ব্যবহার করত, তাই এ অঞ্চলে হামলাও হতো অনেক বেশি। পাঞ্জশির থেকে তিনি অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং অতুলনীয় সাহসিকতার পরিচয় দেন। মাঠপর্যায়ে অসংখ্য জিহাদে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকায় জিহাদী অপারেশনের প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তিনি আরব ভাইদের রাহবার হয়ে

ওঠেন। তাঁর এই কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কিছুদিন পর তিনি পাঞ্জশির ছেড়ে শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানীর দলে যোগ দেন এবং গারদেয ও খোস্তের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। পাঞ্জশিরে দীর্ঘদিন থাকার সুবাদে তিনি আবু উবাইদা পানশীরী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

১৯৮৬ সালে পেশোয়ারে শায়খ উসামার সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এরপরে জাজির বিখ্যাত মা'সাদাতুল আনসার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কৌশলগতভাবে এই যুদ্ধটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, কাবুল, লোগার-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ফ্রন্টে রসদ সরবরাহের জন্য রুশ বাহিনী এই অঞ্চলকে সাপ্লাই লাইন হিসেবে ব্যবহার করত। ১৪০৭ হিজরীর শাবান ও রমযান মাসের বিখ্যাত যুদ্ধে শায়খ আবু উবাইদা পানশীরী শায়খ উসামার ডেপুটি হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধেই তিনি সামরিক দক্ষতা আর অভিনব রণকৌশলের বিরল নমুনা প্রদর্শন করেন। এরপর থেকে প্রায় সব যুদ্ধ ও ট্রেইনিংয়ে শায়খ উসামার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নেতৃত্ব দিতে থাকেন এবং শায়খ উসামার পরেই দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। তাঁর সোহবত লাভের জন্য এবং তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সবাই আগ্রহভরে অপেক্ষা করত। শরয়ী ইলমে পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি সমরবিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। আপনি যদি তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে আসেন, তবে তাঁর মতো আন্তরিক ও সঠিক পরামর্শদাতা দ্বিতীয় কাউকে পাবেন না।

আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর বিরাট অবদান ছিল। প্রথম দিন থেকেই তিনি এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি শায়খ উসামার ডান হাতে পরিণত হন। ট্রেইনিং ক্যাম্পের যাবতীয় দেখাশোনা তিনিই করতেন। তাঁর কার্যক্রম শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আফগান জিহাদ শেষ হওয়ার পর আরও কয়েকটি মহাদেশে জিহাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। সেই সুবাদে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে তিনি সফরও করেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। সারাটা জীবন তিনি এই কাজেই ব্যয় করেছেন। পূর্ব আফ্রিকা, বিশেষত সোমালিয়াতে জিহাদী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাঁর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্ক

শায়খ উসামা রহ. কোনো মজলিসে বসলেই শায়খ আবু উবাইদাকে খুঁজতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রশংসা করতেন। কখনো কোনো বিষয়ে পরামর্শের দরকার হলে তাঁর মতামত খুব গুরুত্ব সহকারে শুনতেন। পেশোয়ারে থাকাকালে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. বলতেন, 'আমার ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক অনুগ্রহ আছে। তার মধ্যে একটি হলো, আমি আফগান

জিহাদে শরীক হতে পেরেছি। আরেকটি হলো, শায়খ আবু উবাইদার মতো ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পেরেছি।'

১৪০৯ হিজরীর ২রা রমযান জালালাবাদ যুদ্ধে মুজাহিদরা যখন কৌশলগত কারণে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেন, শত্রুরা তখন ৩৬টিরও বেশি ট্যাংক নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। সারাকা ক্যাম্প লক্ষ্য করে ১১টিরও বেশি স্কাড মিসাইল নিক্ষেপ করেছিল, বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাসযুক্ত বোমাও ফেলেছিল, তবে আল্লাহ তাআলা তা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়েছিলেন।

শফীক মাদানীর শাহাদাতের পর যখন শায়খ উসামা দেখলেন, শত্রুরা চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর মুজাহিদরা তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি সামারখেল পাহাড়ের পেছনে যাহরানী ঘাঁটির দিকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল শায়খ উসামার অসাধারণ একটি সামরিক সিদ্ধান্ত। শায়খ আবু উবাইদা সবার শেষে সে জায়গা ত্যাগ করেছিলেন। সব মুজাহিদ যেন নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে এবং কেউ যেন বন্দি না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। শায়খ উসামা রণাঙ্গন থেকে যখন তোরখাম ঘাঁটিতে এসে পৌঁছান, তখন শায়খ আবু উবাইদাকে নিয়ে প্রচণ্ড চিন্তিত ছিলেন। রণাঙ্গন থেকে যারাই তোরখামে[১১৩] আসছিলেন, তাদেরকেই শায়খ জিজ্ঞেস করছিলেন, শায়খ আবু উবাইদা নিরাপদে যাহরানী ঘাঁটিতে সরে আসতে পেরেছেন কি না? আল্লাহর রহমতে শায়খ আবু উবাইদা সেখান থেকে সফলভাবেই সরে আসতে পেরেছিলেন। লিবিয়ান এক ভাই আহত হয়েছিলেন, তাঁকে নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্যই শায়খের দেরি হয়েছিল। শত্রুর ঘেরাও থেকে তিনিই সবার শেষে বের হয়েছিলেন। খবরটি শায়খ উসামাকে জানানো হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

## শায়খ আবু উবাইদা ও তার পরিবারের যুহদ

শায়খ আবু উবাইদা যখন সুদানে ছিলেন, তখন মুসাফিরের মতো থাকতেন। শোনা যায়, শায়খের ছেলে আহমাদের জন্মের সময় শায়খের স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখন তাঁর একজন খাদেমার প্রয়োজন দেখা দেয়। শায়খ স্ত্রীকে কয়েক ঘণ্টা সহযোগিতা করার জন্য একজন খাদেমা নিয়ে আসেন। সে খাদেমা এসে দেখে, পুরো ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি খাট। একটি শায়খ আবু উবাইদার জন্য আর দুটি শায়খের সন্তানদের জন্য, অথচ শায়খের সন্তান মোট চারজন। হলরুমে একটি চাটাইয়ের বিছানা, একটি ফ্রিজ আর একটি গ্যাস স্টোভ। এ ছাড়া

[১১৩] পাকিস্তান সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল। এখানে মুজাহিদদের একটি ঘাঁটি ছিল।

পুরো ফ্ল্যাটে আর কিছুই নেই। এ অবস্থা দেখে খাদেমা অবাক হয়ে বলেছিল, 'এ কেমন বাড়ি, ভালো কোনো ফার্নিচার নেই, টেলিভিশন নেই!'

## ভিক্টোরিয়া হ্রদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

১৪১৬ হিজরীর যিলকদ মাসে শায়খ আবু উবাইদা তানজানিয়া সফরে গিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া হ্রদ পার হওয়ার জন্য একটি জাহাজে উঠেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন। জাহাজে ধারণক্ষমতারও অনেক বেশি যাত্রী উঠেছিল। সেদিন ফজরের পর জাহাজ যখন হ্রদের মধ্যভাগে পৌঁছায়, পানির স্রোতে আর যাত্রীর ভারে জাহাজটি কাত হয়ে পড়ে এবং যাত্রীদের নিয়ে সেখানেই ডুবে যায়। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরেছিল। শায়খ আবু উবাইদার শ্বশুরালয়ের এক আত্মীয়ও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য অভিযান চালানো হলেও শায়খ আবু উবাইদার দেহ পাওয়া যায়নি। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, শায়খের কোনো দৃশ্যমান কবর হবে না।

শায়খ সাইফ আল-আদল শায়খ উসামা ও শায়খ আবু হাফসকে শায়খ আবু উবাইদার ওফাতের সংবাদ দেন। খবর শুনে শায়খ আবু হাফস রহ. কান্নায় ভেঙে পড়েন। শায়খ উসামা খুব কষ্টে কান্না চেপে রেখে সাইফ আল-আদলকে বলেন—'জিহাদী দলগুলোর ভাগ্যে শায়খ আবু উবাইদা রহ.-এর মতো কোনো ব্যক্তি আর জুটবে না।'

শায়খ আবু উবাইদা বেশ কয়েকজন সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলো—মারইয়াম, আ'লা, আব্দুর রহমান ও আহমাদ। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁদেরকে নিজ অনুগ্রহে আগলে রাখেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিশর সরকার তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। হাস্যকর ব্যাপার হলো, তিনি যে মৃত্যুবরণ করেছেন—এ ব্যাপারে মিশর সরকারের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। এমনকি তখন শায়খের স্ত্রীও সন্তানদের নিয়ে মিশর ফিরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে হেফাযত করুন। শায়খের অনেক বড় একটি আশা ছিল ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ ও আল-কায়েদাকে একীভূত করা। এ জন্য তিনি অনেক দৌড়ঝাঁপও করেছিলেন। এ কারণেই যে-দিন আল-কায়েদা ও ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ একীভূত হয়, সেদিন শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী তাঁর ভাষণে শায়খ আবু উবাইদার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—

> 'আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি কয়েকজন সম্মানিত ভাইকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই। ঐতিহাসিক এই ঘটনার সাক্ষী হতে পারলে তারা অবশ্যই আনন্দিত হতেন। তাঁদের মধ্যে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শহীদ আবু উবাইদা পানশীরীকে। হে আবু উবাইদা, আপনি শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকুন। আপনার বহুল আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়ন হচ্ছে।'

অকুতোভয় গুমনাম এক মহান সৈনিক নীরবে-নিঃশব্দে চলে গেলেন। যারা চেনার, তাঁরা তাকে ভালো করেই চিনতে পেরেছিল আর যারা না চেনার, তাঁরা চিনতে পারেনি। আল্লাহর কসম, এই যুগে জিহাদের নুসরত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পর যাদের সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে শায়খ অন্যতম। তাঁদের মধ্যে আরও আছেন—শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা বিন লাদেন, শায়খ আবু হাফস (কমান্ডার) সুবহী আব্দুল আযীয আবু সিত্তা রহ. প্রমুখ।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

**مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ»، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ»، وفي رو اية وصَاحبُ الهَدمِ شَهِيدٌ**

‘তোমরা তোমাদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ মনে কর? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদদের সংখ্যা অনেক কম হবে। তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে শহীদ কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে শহীদ; যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ; মহামারিতে যে মারা যায়, সে-ও শহীদ; পেটের পীড়ায় যে মারা যায়, সে-ও শহীদ আর পানিতে ডুবে যে মারা যায়, সে-ও শহীদ। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, যারা কোনো কিছুতে চাপা পড়ে মারা যায়, তারাও শহীদ।’ [সহীহ মুসলিম : ১৯১৫]

আল্লাহ যেন আমাদেরকে এমন লোকদের সোহবত দান করেন, যাদের সহচররা কখনো হতাভাগা হয় না।

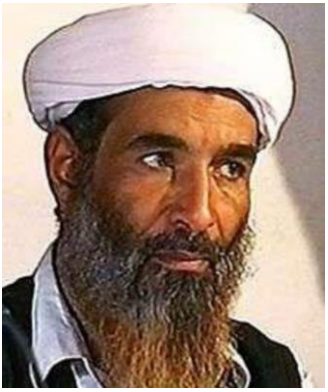
**يا طائرًا ما يستكين ولا يلينُ ... ويرى الجهاد عقيدة وتفانِ**

তুমি তো সেই পাখি, যে কখনো ক্লান্ত হয় না, মাথানত করে না, জিহাদকে যে আকীদা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরই জন্য নিজেকে কুরবান করেছে।

**قد نلتَ ما ترجوه شهمًا ماجدًا ... ما كنتَ يوما في الدُّنَا بجبانِ**

তুমি যে সম্মান ও মর্যাদা চেয়েছিলে, তা তো পেয়েছ। দুনিয়াতে কখনো তুমি ভীরু কাপুরুষ ছিলে না।

## শায়খ (কমান্ডার) আবু হাফস মিসরী রহ.



আবু হাফস কমান্ডার—ভাইয়েরা তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। তাঁর মূল নাম হলো সুবহী আব্দুল আযীয আবু সিত্তা জাওহারী। তিনি আবু সিত্তা গোত্রের মানুষ ছিলেন। এটি একটি আদনানী গোত্র, যারা ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে মিশরে এসে বসবাস শুরু করেছিল। ১৯৫৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি মিশরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। বুহায়রা জেলার কাফর আদ-দাওয়ার শহরে অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার (কৃষি প্রকৌশলী) হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে মিশরীয় সেনাবাহিনীতে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট পদে রিজার্ভ অফিসার হিসেবেও কাজ করেন।

আফগান জিহাদের শুরুর দিকে ১৯৮১ সালে তিনি আফগানিস্তানে হিজরত করেছিলেন। তাঁর হিজরত ও জিহাদের উদ্দেশ্যই ছিল এই উম্মতের হৃত গৌরব ও সম্মান পুনরুদ্ধার করে উম্মতকে পুনরায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখানো। তাঁর এই নির্ভেজাল নিয়তের বদৌলতেই হয়তো আল্লাহ তাআলা তাঁকে অভাবনীয় সম্মান দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সে সব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যাদের নাম শুনলেই ইসলামের শত্রুদের শরীরে কাঁপন ধরে যেত। মিশরীয় সেনাবাহিনীতে কাজের সুবাদে এবং দীর্ঘ মিলিটারি ট্রেইনিংয়ের ফলে সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর বেশ ভালো দখল ছিল। তাঁর সমরদক্ষতা এতটাই উচ্চমানের ছিল যে, কোনো অপারেশনের পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নে তিনি অংশগ্রহণ করলে, সে অপারেশনের অভিনবত্ব দেখেই আন্দাজ করা যেত, এর পেছনে আবু হাফস মিসরীর হাত আছে।

তিনি আল-কায়েদার অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শায়খ আবু উবাইদা পানশীরীর শাহাদাতের পর শায়খ উসামার সহকারী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। আদব-আখলাক, মহানুভবতা, দয়া, সহনশীলতা, উদারতা ও যুহদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি। দলাদলি ও রেষারেষিকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন, ভাইদের আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন। সব সময়ই তিনি ভাইদের এমন কিছু শেখানোর চেষ্টা করতেন, যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে।

জাজির মা'সাদাতুল আনসার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদেরকে তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তির বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিজয় দান করেছিলেন। এই যুদ্ধে শায়খ অসীম সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধারাই তাঁর এই বীরত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। এরপরে জালালাবাদের যুদ্ধেও তিনি শরীক হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে বোমার আঘাতে তাঁর বাহু ও পাঁজর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং বুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। অকুতোভয়, বাহাদুর এই মুজাহিদের কৃতিত্বের কথা বলে শেষ করার মতো না।

রুশবিরোধী জিহাদ শেষ হওয়ার পর মুজাহিদদের মধ্যে যখন ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়, শায়খ আবু হাফস সযত্নে এই ফিতনা এড়িয়ে যান। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু শায়খ উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সুদান চলে যান। উম্মতে মুসলিমাকে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে বাঁচাতে এবং নবুওয়ত ও রিসালাতের ভূমিতে চেপে বসা কাফেরদের ধ্বংস করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি যুবকদের নিয়ে সোমালিয়া ও ওগাদেনের মাটিতে হিজরত করেন। মার্কিনিরা জাযীরাতুল আরবের মতো একই কায়দায় সেখানেও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সোমালিয়াতে মার্কিনিদের সাথে প্রথম সংঘর্ষেই বেশ কিছু মার্কিন সৈন্য নিহত হয়, যদিও লড়াইটি খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি। সামান্য এই পরাজয়ের পরেই মার্কিনিরা রাতের অন্ধকারে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। শায়খ উসামা রহ. আমেরিকাকে কাগজের বাঘ বলে অভিহিত করতেন। সোমালিয়া থেকে এভাবে পলায়ন করার ফলে শায়খের এই কথার বাস্তবতা সকলের সামনেই ফুটে ওঠে।

সোমালিয়ায় আমেরিকার পরাজয়ের পর আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত হন যে, অল্প সামর্থ্য নিয়েও তাঁরা আমেরিকাকে পরাজিত করতে পারবেন। কারণ, তাঁরা যতটা ভেবেছিলেন, আমেরিকা তার চেয়েও অনেক দুর্বল। ফলে আমেরিকার সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য যুবকদের প্রস্তুত করা এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেইনিং ক্যাম্প তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

তখন আল্লাহ তাআলাও পরিস্থিতি তৈরি করে দেন। ওমর আল-বশীর মার্কিনিদের চাপের মুখে শায়খ উসামার সব অবদান আর সেবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে শায়খ ও তাঁর সঙ্গীদের সুদান থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। মুজাহিদরাও সুদান ছেড়ে হিজরত ও জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানে পাড়ি জমান। সেই সাথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, যার জন্য শায়খ উসামা ও তাঁর সঙ্গীরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

যুবকরা যখন জানতে পারে, শায়খ উসামা ও তাঁর সাথি-সঙ্গীরা আফগানিস্তানে ফিরে এসেছেন, তখন চতুর্দিক থেকে তারাও দলবেঁধে, কেউ একাকী আফগানিস্তান অভিমুখে ছুটে আসতে থাকে। ট্রেইনিং ক্যাম্পগুলোতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়, নতুন উদ্যমে শুরু হয় জিহাদের প্রশিক্ষণ।

শায়খ আবু হাফস রহ. ছিলেন মৌমাছির মতো। তাঁর যেন কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো বিরক্তি নেই। তানজীমের পুরো সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি। ট্রেইনিং ক্যাম্পের দেখাশোনা থেকে শুরু করে তালেবানের সাথে যৌথ ফ্রন্ট পরিচালনা এবং বহির্বিশ্বের সব ধরনের অপারেশনের তদারকি তিনিই করতেন, পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে তিনি শরীক থাকতেন। এ জন্য বিরতিহীন কাজ করে যেতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, যারা মুসলিম ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করবে। প্রশিক্ষণ নিতে আসা যুবকদের তিনি উপদেশ দিয়ে বলতেন, কোনো একটি বিষয়ে যেন তারা বিশেষ দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করে। চাই সেটা আর্টিলারি হোক, কভার দেওয়া হোক অথবা মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইন, রেইড বা বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহারে হোক। যাতে তাঁদের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত সেই বাহিনীর সূচনা হয়। কিন্তু সেই বাহিনী দেখার আগেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

বহির্বিশ্বে অপারেশনের যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করে যুগের হুবাল আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদা প্রথম যে হামলাটি চালায়, তাতেই পুরো বিশ্ব নড়েচড়ে বসে, আমেরিকা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। একটি হামলা থেকেই আমেরিকা বুঝে নেয়, এমন এক শত্রুর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, যে কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। তার সব গবেষণা, বিচার-বিশ্লেষণ আর হিসেব-নিকেশ এই এক হামলাতেই এলোমেলো হয়ে যায়। কারণ, হামলাটি হয়েছিল এমন এক জায়গাতে, যেখানে হামলার কথা তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। আফ্রিকাতে অবস্থিত আমেরিকার প্রধান গোয়েন্দা কার্যালয়ে হামলাটি হয়েছিল। অবশ্য এই হামলার পরিকল্পনাকারীর নাম শুনলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না, কারণ তাঁর মতো ব্যক্তি এ ধরনের হামলা করবেন,

এটাই স্বাভাবিক। তিনি আর কেউ নন, উম্মাহর সিংহপুরুষ শায়খ আবু হাফস কমান্ডার রহ.। এত বড় একটি হামলার পর তাঁর ব্যাপারে আমেরিকা যে কঠোর অবস্থান নেবে, সেটাও প্রত্যাশিতই ছিল। আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় তাঁর নাম দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নেয় এবং তার ব্যাপারে তথ্য দিলে আমেরিকা ২৫ মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করে, যা তখন পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসে সর্বোচ্চ পুরস্কার ছিল।

আল্লাহর রহমতে এর পর থেকেই একের পর এক হামলা হতে থাকে। এডেন বন্দরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোল থেকে শুরু করে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের বরকতময় অভিযান পর্যন্ত যতগুলো হামলা হয়েছে, সবগুলোর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে শায়খ আবু হাফস রহ. নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। যে ভাইয়েরা এই অপারেশনগুলো বাস্তবায়ন করতেন, শায়খ রহ. তাঁদেরকে অনেক বেশি মুহাব্বত করতেন। বিশেষ করে ৯/১১ হামলার প্রধান কারিগর বীর মুজাহিদ মুহাম্মাদ আতা'র ব্যক্তিত্ব দ্বারা শায়খ প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি শায়খকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ফিলিস্তিনের জন্য আমাদের পক্ষে আর কী করা সম্ভব?' তাঁর এই প্রশ্নটি শায়খের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। মাঝে মধ্যেই তিনি মুহাম্মাদ আতার স্মৃতিচারণ করতেন আর তাঁর এই প্রশ্নের কথা আলোচনা করতেন।

হে মুহাম্মাদ আতা, আপনারা অনেক করেছেন। আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আপনারা আমেরিকাকে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করেছেন। আপনাদের এই মহান কীর্তি ও ঐতিহাসিক বিজয়ে আফগানিস্তান ও মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে তাকবীরধ্বনি উচ্চকিত হয়েছে, খুশির বন্যা বয়ে গেছে, মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে, মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে আর আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা আনন্দে চোখের পানি ছেড়ে এই ভেবে কেঁদেছেন যে, অবশেষে আল্লাহ তাআলা এমন কাউকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যে তাদের সাহায্য করছে, তাদের রক্তের বদলা নিচ্ছে, তাদের কেড়ে নেওয়া অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছে আর নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের চোখের পানি দেখে সত্যিকার অর্থেই ক্রোধান্বিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি এই শক্তিশালী বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার পর আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা সেই মানুষদের প্রতি, যারা পর্দার আড়ালে থেকে সর্বস্ব উজাড় করে মেহনত করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের শায়খ শহীদ আবু হাফস কমান্ডার রহ.-ও অন্তর্ভুক্ত।

আফগানিস্তানে ক্রুসেড শুরুর পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর, শায়খ উসামা বিন লাদেন এবং ইমারতে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দই ছিল তাদের প্রধান টার্গেট। যেভাবেই হোক তারা এই মহান ব্যক্তিদের খতম করতে চাচ্ছিল। এ জন্য যা যা করা সম্ভব, সব তারা করেছিল। তাঁদের

গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ দিয়েছিল, তাঁদের ব্যাপারে তথ্য দিলে মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার সম্বলিত লিফলেট আর পোস্টার বিলি করেছিল।

মার্কিনিরা যখন হন্যে হয়ে অন্যদের সাথে শায়খ আবু হাফসকেও খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখনও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং আগের মতোই আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করছিলেন, যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে যাচ্ছিলেন। শেষ সময়ে এসে তিনি মেরুদণ্ডের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবু তাঁর জিহাদী কার্যক্রমে ভাটা পড়েনি। জাজির যুদ্ধে তিনি ছিলেন টগবগে যুবক। তীব্র ঠান্ডার পরোয়া না করে তখন তিনি বিভিন্ন কাজ করতেন। সে সময়ই মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়েছিলেন। তখন সে আঘাতের তীব্রতা অনুভব না করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই আঘাতই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তিনি ভাইদেরকে তীব্র ঠান্ডা এড়িয়ে চলার নসীহত করতেন। শায়খ সব সময় শাহাদাতের দোয়া করতেন। শাহাদাতের জন্য তিনি পাগলপাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর হাড়ও ক্ষয়ে গিয়েছিল, শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বয়স বেড়ে গিয়েছিল এবং যে বিজয়ের জন্য তিনি বছরের পর বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সে বিজয়ের কিছু অংশও তাঁর দেখা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে এলো।

জীবনের শেষ দিকে যেখানে তিনি থাকতেন, সেখানে তাঁর সাথে আরও অনেক ভাই অবস্থান করতেন। মাঝে মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ২০ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অনেক ভাই আপত্তি জানিয়ে বলতেন, এত মানুষ একসাথে থাকলে জায়গাটি শত্রুর নজরে পড়ে যাবে। তাঁদের কথা শুনে শায়খ মুচকি হেসে বলতেন, 'জামাতের সাথে মৃত্যুবরণ করাও রহমত'। বাস্তবেই ভাইদের সে আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল। ক্রুসেডের সূচনালগ্নেই রমযান মাসের কোনো এক বরকতময় রাতে শায়খের আশ্রয়স্থল লক্ষ্য করে কয়েকটি যুদ্ধবিমান একযোগে হামলা করে। সে হামলায় শায়খের সাথে ১৬ জন ভাই একসঙ্গে শহীদ হন। শায়খ যেন মুহাব্বাতের এক মিছিল নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হন। আল্লাহ তাআলা সকলকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ভাই অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন শায়খ উমর আব্দুর রহমানের ছেলে আসাদ রহ.।

হামলার পরদিন ভাইয়েরা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে শায়খ আবু হাফসের দেহ খুঁজে বের করেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন, চেহারায় অপার্থিব এক আলো খেলা করছিল, ঠোঁটে মুচকি হাসি লেগে ছিল, শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নও ছিল না। তাঁর

দেহ থেকে মেশকের খুশবু ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই সেই খুশবু পেয়েছিলেন।

ভাইয়েরা যখন তাঁকে দাফন করছিলেন, তখন তাঁদের উস্তাদ ও শায়খের বিরহে সবাই যেমন কাঁদছিলেন, একই সাথে তাঁরা খুশিও ছিলেন। কারণ, অবশেষে তিনি কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেছেন। যে শাহাদাতের খোঁজে তিনি জিহাদের এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন, দীর্ঘ ২৫টি বসন্ত দীনের নুসরতে ব্যয় করেছেন, আল্লাহর শত্রু ক্রুসেডার, ইহুদী ও তাদের দোসরদের শায়েস্তা করেছেন এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। দীর্ঘ এই সময়ে তিনি শত্রুদের অনেক ক্ষতিও করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে শহীদদের মনযিলে পৌঁছিয়ে দিন।

তাঁর শাহাদাতে আল্লাহর শত্রুরা বেজায় খুশি হয়েছিল। শায়খের শাহাদাতের অনেক পরে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। যে ভাইয়েরা দাফনে শরীক ছিলেন, এমন একজন ভাই মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তার কাছ থেকেই তারা শায়খের শাহাদাত সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই তারা ভাইকে শায়খের কবর দেখিয়ে দিতে বলেছিল। ভাই বাধ্য হয়ে শায়খের কবর দেখিয়েছিলেন। সেটা যে শায়খেরই কবর, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মার্কিনিরা কবর খুঁড়ে তাঁর দেহ বের করেছিল এবং ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও চুলের নমুনা সংগ্রহ করেছিল।

শায়খের ওফাতে ভাইয়েরা খুব মর্মাহত ছিলেন। ভাইদের কাছে তিনি শুধু একজন নেতা ছিলেন না, একই সঙ্গে তিনি ভাইদের মুরুব্বি, পিতা, চাচা ও বড় ভাই সমান ছিলেন। তিনি মুজাহিদ যুবকদের খুব ভালোবাসতেন। অসহায় আফগান শ্রমিকদের প্রতিও তার ভালোবাসা ছিল দেখার মতো, তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসতেন। এমন কেউ ছিল না, যে তাঁকে ভালোবাসত না। তাঁর সাথে একবার বসলে আপনিও তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হবেন। মজলিসে তাঁকে কখনো স্থির দেখা যেত না। কখনো কাউকে পরামর্শ দিতেন, কাউকে নসীহত করতেন, আবার কখনো কারো মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। সব সময়ই ঠোঁটের কোণে একটুকরো মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে রাখতেন। প্রতিটি কাজেই নবীজীর অনুকরণ করতেন, এমনকি নবীজীর মতো করেই মুচকি হাসতেন। শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণেই শায়খের ছেলে মুহাম্মাদ বিন উসামার সাথে তিনি নিজের এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথে তাঁদের একত্র করুন, আমীন।

## শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী (আব্দুল্লাহ আহমাদ আব্দুল্লাহ) রহ.



**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد**

আমরা মহান এক ব্যক্তিকে হারিয়েছি, সম্মানিত এক মানুষকে কবরস্থ করেছি। তাঁর বিচ্ছেদ আমাদের সুমহান চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজিও যেন বিরহে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাঁর সাথে বিদায় নেওয়া আখলাক ও উত্তম চরিত্রের জন্যও আমাদের অশ্রু ঝরছে। আবু মুহাম্মাদ সাধারণ কোনো মানুষ ছিলেন না, তিনি একাই একটি জাতি ছিলেন, নিজের মধ্যে পুরো উম্মতকে তিনি ধারণ করতেন। আমরা তাঁকে এমন এক সময়ে হারিয়েছি, যখন তাঁরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তিনি এমন এক সময়ে আমাদের ছেড়ে গেলেন, যখন সহযোগীর সংখ্যা কমে গেছে আর নীচ লোকেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার রাতে তিনি পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে আমাদের পথ দেখাতেন, উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে সঠিক পথের দিশা দিতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী, অবহেলা যার স্বভাবেই ছিল না; তিনি ছিলেন সাহসী, শত্রুর কোনো পরোয়া যিনি করতেন না। কবি যেন তাঁর কথাই বলেছে কবিতায়—

**همام له شيمة كالشمول ... تميت الهموم وتحيي الهمم**

তিনি এমন হিম্মতের অধিকারী, যার হিম্মত আর দয়া সকল দুশ্চিন্তাকে দূর করে আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে।

**تنسمت نعمته بالثناء ... ونشر الثناء نسيم النعم**

তার অনুগ্রহ আর দান-দক্ষিণায় প্রশংসার সুবাস থাকে আর প্রশংসা করাই তো একটি সুবাসিত অনুগ্রহ।

**يد تقع الهمام تحت الحسام ... بها والأقاليم تحت القلم**

তার হাত বড় বড় অহংকারীকেও তরবারির নিচে নিয়ে আসে এবং সব রাজ্যকে কলমের অধীন বানিয়ে ফেলে।

শায়খ আবু মুহাম্মাদ মিসরী, মূল নাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ উলফী। ১৯৬৩ সালে মিশরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.-এর থেকে ইলম অর্জনের জন্য জর্ডান সফর করেন। নাস্তিক রুশ বাহিনীর হাতে আফগান মুসলিমদের নিপীড়নের কথা শুনে ১৯৮৮ সালে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে হিজরত করেন এবং রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তাদের পরাজয়ের পর শায়খ উসামা বিন লাদেন এবং অন্যান্য মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে মিলে জিহাদের পথে চলতে থাকেন। সুদানে থাকাকালে শায়খ উসামার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৯৩ সালে যখন আমেরিকা সোমালিয়ায় আগ্রাসন চালায়, তখন সোমালি মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। শায়খ উসামা রহ. যখন আফগানিস্তানে ফিরে আসেন, তখন শায়খ আবু মুহাম্মাদও তাঁর সাথে ফিরে আসেন। আফগানিস্তানে ফেরার পর তিনি আগের মতোই জোরদার মেহনত অব্যাহত রাখেন। আল-কায়েদার সাথে ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ একীভূত হওয়া এবং শায়খ উসামার হাতে শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী বাইয়াত হওয়ার আগ পর্যন্ত শায়খ আবু মুহাম্মাদ ছিলেন আল-কায়েদার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ১৯৯৮ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি ও তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালামের দুই মার্কিন দূতাবাসে যে বোমা হামলা হয়েছিল, তার পেছনেও শায়খের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আফগানিস্তানে ফেরার পর তিনি আল-ফারুক ক্যাম্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুসলিম যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর বিনয় এত বেশি ছিল যে, জিহাদের ময়দানে নবাগত ভাইদের সাথে এমনভাবে মিশতেন যে, তাঁকে আলাদা করে চেনারও সুযোগ ছিল না। তিনি খুব লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কারো ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রেও শায়খ অত্যন্ত নম্র আচরণ করতেন। একাধিকবার তিনি আমার বিভিন্ন ভুল শুধরে দিয়েছেন, কিন্তু সব সময়ই তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল আর নরম।

৯/১১-এর ঐতিহাসিক হামলার পর কৌশলগত কারণে তিনি আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে ইরানে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি-সহ আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘদিন রাফেযীদের কারাগারে বন্দি থাকেন। অবশেষে জাযীরাতুল আরবের মুজাহিদদের হাতে বন্দি এক ইরানি কূটনীতিকের বিনিময়ে তিনি এবং আরও কয়েকজন ভাই জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু তারপরও তাঁকে ইরানে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। সেখানে থাকাকালেই তাঁকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করা হয় এবং আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। এভাবেই এক বীর মুজাহিদের জীবনাবসান ঘটে, শাহাদাতকে তিনি আলিঙ্গন করেন গর্বভরে; সেই সাথে শেষ হয় হিজরত, জিহাদ আর সবরের সুদীর্ঘ এক আখ্যান। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কখনো তাঁর চোখে পানি দেখিনি;

এত কষ্ট আর বেদনা সয়েছেন, কিন্তু কখনো তাঁকে অভিযোগ করতে শুনিনি। তাঁর ব্যাপারে আমরা এই ধারণাই রাখি।

হে আবু মুহাম্মাদ, আপনি তো এই নিকৃষ্ট দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন আর আমাদেরকে এই অসহনীয় কষ্টে রেখে গেছেন। আপনাকে হারিয়ে আমরা মর্মাহত, তবে এতটুকু সান্ত্বনা আমরা পেয়েছি যে, আপনি সম্মানের সাথে শহীদ হিসেবে দীনের ওপর অবিচল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আপনি আদর্শের প্রশ্নে ছাড় দেননি, ওয়াদায় কোনো রদবদল করেননি। আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, নেককার ও শহীদদের দলভুক্ত করে নিন, আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনাকে জায়গা দিন এবং আমাদেরকেও আপনার সাথে শহীদ হয়ে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে লাঞ্ছনা, অপমান আর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।[১১৪]

মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের ধারাবাহিক শাহাদাত প্রসঙ্গে শায়খ আবু ইয়াহইয়া লীবী রহ.-এর একটি কথা মনে রাখার মতো। তিনি বলেন—

> ‘আমাদের এই মহান দীন মজবুত আকীদা-বিশ্বাস, সুউচ্চ মূল্যবোধ আর চিরন্তন নীতি ও আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দীনের জন্য যত বেশি শহীদের রক্ত প্রবাহিত হয়, দীন ততই সমুন্নত হয়। শহীদদের জীবন এ পথকে আলোকিত করে রাখে, সেই আলোতে এ পথের পথিকরা অগ্রসর হয়। শহীদরা হলেন আলোর মিনার, যা দেখে দিকভ্রান্ত মুসাফিররা পথ খুঁজে পায়। ইসলাম যদি কোনো ব্যক্তির জীবনমরণের ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে তো সেদিনই এর নাম-নিশানা মুছে যেত, যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালে চারিদিকে মুরতাদ হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, দীন ত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবু বকর সিদ্দীককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর হিম্মত, দৃঢ় সংকল্প আর দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মুরতাদদের মোকাবিলা করেছিলেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করেছিলেন এবং সকলকে আবার দীনের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—
>
> **وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ**
>
> ‘মুহাম্মাদ তো একজন রাসূলমাত্র। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি আবার পেছনে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।’ [সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪৪]

[১১৪] আল-কায়েদা জাযীরাতুল আরবের সম্মানিত আমীর শায়খ খালেদ বাতরাফীর লেখা থেকে সংগৃহীত।

এটাই হচ্ছে পথ। ইনশাআল্লাহ আমরা এই পথে অবিচল থাকব, এই সফর অব্যাহত রাখব, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দীনের ওপর অবিচল রাখুন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সঙ্গী হিসেবে কবুল করুন এবং শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন, আমীন।'

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর মূল্যবান কিছু কথার মাধ্যমে আল-কায়েদার সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাসের ইতি টানতে চাই। মুজাহিদ ভাইদের উদ্দেশ্যে শায়খ রহ. একবার বলেছিলেন—

'দীনের নুসরত করার মতো লোক যখন দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে, তখন আপনারা এগিয়ে এসেছেন। খতীব ও মুহাদ্দিসগণ যখন পেছনে বসে থেকেছেন, তখন আপনারা ময়দানে বের হয়ে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করেছেন। ভীরু-কাপুরুষ আর লোভী লোকেরা যখন মুখ বুজে বসে থেকেছে, তখন আপনারা দীপ্তকণ্ঠে হকের আওয়াজ উচ্চকিত করেছেন। মুসার বিরুদ্ধে লড়তে আসা জাদুকররা যে কথা বলেছিল, আপনারা ছাড়া বাকিরাও এখন সেই কথাই বলছে, إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ 'আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে কি আমাদের জন্য কোনো পুরস্কার আছে?' আল্লাহদ্রোহী ফেরাউন তখন তাদের যে উত্তর দিয়েছিল, এখনকার ফেরাউনরাও সেই একই উত্তর দিচ্ছে, قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ 'হ্যাঁ, তাহলে তোমরা আমার নৈকট্য লাভ করবে।' আপনারা তো রহমানের কাছে পুরস্কার কামনা করেন। আপনারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছেন, তাই দুনিয়ার তুচ্ছ স্বাদ আপনাদের প্রতারিত করতে পারেনি। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

وقفتم وما في الموتِ شكٌّ لو اقفِ ... وحطمتم الأوهام والوهم يُكسرُ

তোমরা দীনের তরে দাঁড়িয়েছ, মৃত্যু তো সবারই হবে। কোনো আত্মত্যাগকারী মৃত্যুর ব্যাপারে কখনো সন্দেহ করে না। তোমরা কল্পনার মূর্তিকে ভেঙে চুরমার করেছ, এই কল্পনা তো ভাঙারই ছিল।

تخوضون بحر الموتِ لا ترهبونه ... ومن لا يهاب الموت لا شيء يَحذرُ

তোমরা নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছ মৃত্যুর সাগরে। যে মৃত্যুকে ভয় করে না, সে তো কোনোকিছুরই পরোয়া করে না।

যুগ যুগ ধরে মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে তাগুতের চারপাশে যে ভয়ের বলয় তৈরি করা হয়েছে, আপনারা সেই বলয় গুড়িয়ে দিয়েছেন। রক্তের নজরানা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আপনারা এই পথকে আলোকিত করেছেন। নিজেদের জীবন দিয়ে সীরাতে মুস্তাকীমকে তাঁদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যেন তারা এই পথে অটল থাকতে পারে এবং তাগুত ও অপরাধীদের পথ থেকে বাঁচতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

‘আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও যদি হেদায়েত লাভ করে, লাল উটের মালিক হওয়া থেকেও তা তোমার জন্য বেশি উত্তম হবে।’ [সহীহ বুখারী : ৪২১০]

আপনারা পথচলা অব্যাহত রাখুন, দুর্গম পথ দেখে ভয় পাবেন না। জাযীরাতুল আরবের পবিত্র ভূমিকে মুশরিক, যিন্দিক আর মুলহিদদের থেকে পবিত্র করার শপথ নিন, কিছুতেই মনোবল হারাবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

‘আর শত্রু সম্প্রদায়ের অনুসন্ধানে তোমরা দুর্বল হোয়ো না। যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাক, তাহলে তারাও তো আঘাত পাচ্ছে, যেভাবে তোমরা আঘাত পাচ্ছ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে যা আশা করছ, তারা তা আশা করছে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ [সূরা নিসা (৪) : ১০৪]

বিরোধী আর সাহায্য না করে বসে থাকা ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য দেখে আপনারা বিচলিত হবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর বিধানের ওপর কায়েম থেকে লড়ে যাবে। তারা শত্রুদের মোকাবিলায় অপ্রতিরোধ্য হবে, বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থাতেই অটল থাকবে।’ [সহীহ মুসলিম: ১৯২৪]

তাগুত ও জালেম শাসকদের আমরা সে কথাই বলব, যা আমাদের পূর্ববর্তী মুমিনরা বলেছেন—

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

‘তাঁরা বলল, সেই সত্তার কসম, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে, তার ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা খুশি করো। তোমার কর্তৃত্ব তো কেবল এই দুনিয়ার জীবনের ওপরেই চলবে।’ [সূরা ত-হা (২০) : ৭২]

হে মুজাহিদগণ,

আপনারা সবর করুন, যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকুন আর আল্লাহর কাছে আজর ও সওয়াবের আশা রাখুন। এই হিজরত ও জিহাদ, ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্ত, শরীর থেকে ছিন্ন হওয়া অঙ্গ আর কতল ও কিতালের এই পথই তো নবীদের পথ। আপনারা শত্রুদের ভয় দেখাবেন আর শত্রুরাও আপনাদের ভয় দেখাবে—এটাই তো নিয়ম। আপনারা ভালো করেই জানেন, বর্তমানে উম্মতের সর্বাধিক উত্তপ্ত ময়দান হলো দু'টি—ফিলিস্তিন ও ইরাক। তাই, তাদের সহযোগিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন।'[১১৫]

সর্বোত্তম কথা তো সেটাই, যা সংক্ষিপ্ত; কিন্তু অর্থবহ। মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা শায়খ উসামার তৃতীয় খোলা চিঠিতে এমনই একটি কথা লিখেছিলেন। শায়খের সে কথা দিয়েই এই বইটি শেষ করছি। 'যুদ্ধ বন্ধ করার উপায়'—সম্পর্কে শায়খ রহ. লিখেছিলেন—

> 'যুদ্ধে হয়তো আমরা জয়ী হব, নয়তো তোমরা জয়ী হবে। জয় যদি আমাদের হয়, তাহলে চিরকালের জন্য এটা তোমাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের ইতিহাস হয়ে থাকবে। আল্লাহর রহমতে পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছে। আর যদি তোমাদের জয় হয়, তাহলে ইতিহাস পড়ে দেখো, আমরা এমন জাতি, যারা জুলুম দেখে ঘুমিয়ে থাকতে পারি না, পুরো জীবন ব্যয় করে হলেও আমরা রক্তের বদলা নিয়েই ক্ষান্ত হই। দিন-রাতের পরিবর্তন ততদিন বন্ধ হবে না, যতদিন না আমরা ৯/১১-এর মতো আরও প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমাদের আক্রমণে ধীরে ধীরে তোমরা হতাশ হয়ে যাবে, তোমাদের জীবন বিষিয়ে উঠবে আর অসহনীয় এক পরিস্থিতি তৈরি হবে। অন্যদিকে আমাদের তো হারানোর কিছুই নেই। সমুদ্রের পানিতে যে সাঁতার কাটে, সে কি আর বৃষ্টি দেখে ভয় পায়? তোমরা আমাদের ভূমি দখল করেছ, আমাদের ইজ্জত-সম্মান পদদলিত করেছ, আমাদের রক্ত প্রবাহিত করেছ, সম্পদ লুণ্ঠন করেছ, ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছ, ভিটেমাটিছাড়া করেছ, আমাদের নিরাপত্তা ছিনিয়ে নিয়েছ; তাই, আমরাও তোমাদের সাথে একই আচরণ করব।
>
> তোমরা হয়তো আমাদের ইজ্জতের জিন্দেগি কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু ইজ্জতের মওত থেকে কিছুতেই মাহরুম করতে পারবে না। ফরয জিহাদ না করে বসে থাকাকে আমাদের দীন ভয়াবহ অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছে আর তরবারির ছায়াতলে মৃত্যুবরণ করাকে সর্বোত্তম মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করেছে। নিজেদের শক্তিমত্তা আর অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেখে তোমরা প্রতারিত হোয়ো না। এ সবের বদৌলতে হয়তো কিছু লড়াই তোমরা জিতবে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এগুলোই তোমাদের পরাজয় ডেকে আনবে। এগুলোর চেয়ে সবর ও অবিচলতার শক্তি হাজারগুণ বেশি। আর শেষ পরিণতিই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে।

[১১৫] শায়খ উসামার চিঠি ও বক্তৃতা সংকলন

আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সাধারণ কিছু অস্ত্র নিয়ে ১০ বছর তাদের মোকাবিলা করেছি। এই ১০ বছরে ধীরে ধীরে তাদের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর রহমতে এরপর তাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে। তাদের থেকে শিক্ষা নাও। তোমাদের বিরুদ্ধেও সেই একই অবিচলতার সাথে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, যতদিন না তোমরা নিশ্চিহ্ন হও কিংবা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আমাদের হাতে যতদিন অস্ত্র থাকবে, এই প্রতিরোধও ততদিন চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

**أقسمت لا أموت إلا حرا ... وإن وجدت الموت طعما مرا ... أخاف أن أذل أو أغرا**

কসম খোদার, আমি স্বাধীনতা নিয়েই মরব,
হোক না তা তিক্ত স্বাদের, তবু মৃত্যুকে না ডরব।
ভয় তো করি সেই জীবনে
লাঞ্ছনা বা প্রতারণা দিয়ে, যে জীবনটাকে গড়ব।

**والسلام على من اتبع الهدى**

যারা হেদায়েতের অনুসারী, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'



দিন-রাতের পরিবর্তন ততদিন বন্ধ হবে না, যতদিন না আমরা ৯/১১-এর মতো আরও প্রতিশোধ গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

## ফিলিস্তিনের ভাইদের প্রতি আমাদের বার্তা :

আপনাদের রক্ত আমাদেরই রক্ত, আপনাদের সন্তানদের রক্ত আমাদের সন্তাদেরই রক্ত। সুতরাং রক্তের বদলা শুধুই রক্ত, ধ্বংসের বদলা শুধুই ধ্বংস। মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা আপনাদেরকে কস্মিনকালেও ছেড়ে যাব না; যতক্ষণ না বিজয় অর্জিত হয় অথবা আমরাও সেই স্বাদ আস্বাদন করি, যা আস্বাদন করেছিলেন হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)।

সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আসমানকে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সুউচ্চ করেছেন! আমেরিকা ও সেখানে বসবাসকারীরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না, যতক্ষণ না ফিলিস্তিনে আমরা পূর্ণ নিরাপদে বসবাস করতে পারি এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূত-পবিত্র ভূমি থেকে সকল কুফরি শক্তি সমূলে উৎপাটিত হয়।

– শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ